পাদকঃ শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন　　সহকারী সম্পাদকঃ শ্রী[illegible]

১. বর্ষ]　　শনিবার, ১লা মাঘ, ১৩৫০ সাল।　　Saturday, 15th January, 1944.　　[১০ম সং

সাময়িক প্রসঙ্গ

ভবিষ্যতের প্রশ্ন

গত অক্টোবর মাসে বাঙলার গভর্নর [illegible]য়াছিলেন যে, বর্তমান খাদ্যসংকটের মোড় [illegible]রাইতে হইলে আড়াই লক্ষ টন খাদ্যশস্য প্রয়োজন। সম্প্রতি জানা গিয়াছে ভারত সরকারের পক্ষ হইতে গত তিন মাসে ৩ লক্ষ ৮০০ হাজার টন খাদ্যশস্য বাঙলা দেশে আসিয়াছে; ইহার উপর সরকারী বিজ্ঞপ্তি সূত্রে আমরা এই কথা শুনিতেছি যে, দেশে এবার আমন ধান প্রচুর ফলিয়াছে; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও বাঙলা দেশে দুর্ভিক্ষের সমস্যা একেবারে কাটিয়া গিয়াছে, এমন কথা বলা চলে না। পক্ষান্তরে আমন ধানের এই আমদানীর মুখে ইতিমধ্যেই বাঙলার নানাস্থানে চাউলের দর চড়িতে আরম্ভ করিয়াছে, আমরা এইরূপ সংবাদই পাইতেছি। বহু স্থানেই দর নামিতে নামিতে হঠাৎ পুনরায় বৃদ্ধি পাইতেছে। এখনই যদি ধান চাউলের দর এইরূপে বাড়িতে থাকে, তবে মার্চ-এপ্রিল মাসে অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইবে, ভাবিতে আমাদের আশঙ্কা হইতেছে। দেখা যাইতেছে, ভারতসচিব মিঃ আমেরী সেদিন [illegible] শহরের বক্তৃতায় বাঙলা দেশের দুর্ভিক্ষের প্রসঙ্গ অবতারণা করিয়াছিলেন। তিনি বলেন, বাঙলা দেশের প্রকৃত অবস্থার প্রতি ভারত সরকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবামাত্র তাঁহারা সমস্যার সমাধানের জন্য সকল রকম চেষ্টায় ব্রতী হন। অন্যান্য প্রদেশ হইতে রেলপথের সাহায্যে দ্রুতগতিতে বাঙলায় খাদ্যশস্য প্রেরণ করা হয়। এখন উৎপন্ন শস্য বণ্টনের যদি সুব্যবস্থা করা হয়, লাভখোর এবং মজুতদারদিগকে দমন করিবার জন্য যদি কার্যকর ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়, তবে পুনরায় দুর্ভিক্ষ ঘটিবার কোন কারণ নাই। ভারতসচিব আমাদিগকে ভরসা দিয়াছেন; কিন্তু সে ভরসা সার্থক হইবার পক্ষে কতকগুলি সর্ত রহিয়াছে। এইসব সর্ত প্রতিপালিত হইবার মত কার্যকর ব্যবস্থা কতটা অবলম্বন করা হইতেছে, আমরা জানি না। এমন অবস্থায় ভারত সরকারের ঐরূপ সর্তবদ্ধ আশ্বাসবাণী প্রকৃতপক্ষে আমাদের সান্ত্বনার হেতু হয় না; কারণ আমরা জানি, ঐসব সর্তে যে সব দিকে সতর্কতা অবলম্বন করিবার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করা হইয়াছে, যদি যথাকালে তদনুরূপ সতর্কতা অবলম্বন করা [illegible] দেশে ছিয়াত্তরের মন্ব[illegible] ঘটা সম্ভব হইত না। [illegible] সাহেবের উক্তির মধ্যে [illegible] রহিয়াছে। তিনি বলিয়াছেন, [illegible] সরকার হঠাৎ এইরূপ ক্ষেত্রে [illegible] হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না। প্রাদেশিক গভর্নমেণ্টের অবলম্বিত নীতি সমস্যা সমাধানে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছে, প্রথমে এ সম্বন্ধে তাঁহাদের সুনিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া দরকার। যদি তৎপূর্বে প্রাদেশিক গভর্নমেণ্টের কার্যে হস্তক্ষেপ করা যায়, তবে ভারতবাসীদের হাতে স্বাধীনতা সম্প্রসারণের এবং তাঁহাদের হাতে ভারত শাসনের দায়িত্ব অর্পণের যে নীতি প্রতিপালনে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ আছি, তাহার বিরোধী কাজ করা হয়। তবে ভারত গভর্নমেণ্ট ইহা স্পষ্ট করিয়াই জানাইয়াছেন যে, ভারতবাসীদের জীবনধারা স্বাভাবিক রাখিবার জন্য যদি প্রয়োজন হয়, তবে যুদ্ধজনিত অবস্থার নিমিত্ত তাঁহাদের উপর ন্যস্ত বিশেষ ক্ষমতা এক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতে তাঁহারা ইতস্তত করিবেন না। মিঃ আমেরী

তাঁহার এই উক্তিতে প্রাদেশিক গভর্নমেণ্টের মারফতে ভারতবাসীদের হাতে স্বাধীনতা সম্প্রসারণ এবং দায়িত্ব প্রদানের ব্যাপারে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের উদারতার মহিমা আর এক দফা কীর্তন করিয়া লইয়াছেন; কিন্তু প্রাদেশিক গভর্নমেণ্ট স্বাধীনতা এবং প্রদেশিক মন্ত্রীদের শাসন ব্যাপারে দায়িত্বের প্রকৃত মূল্য কি, আমাদের জানিতে কিছুই বাকী নাই। এজন্য তাঁহার ঐসব [illegible] আমরা একেবারে নিরর্থক মনে করি। [illegible] প্রাদেশিক গভর্নমেণ্টের স্বাধীনতা এবং [illegible] হাতে ন্যস্ত দায়িত্বের [illegible] ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের [illegible] সম্পর্কে ভারতের প্রতি কর্তব্য [illegible] তাঁহাদের উদাসীনতাকে চাপা দিবারই কৌশলমাত্র। পরাধীন ভারত সে উদাসীনতার ফল বহুবার ভোগ করিবার করিয়াছে। এখন বাঙলা দেশে পুনরায় দুর্ভিক্ষের অবস্থা দেখা না দেয় এবং দুর্ভিক্ষের ফলে ব্যাপক যে সমাজ-বিপর্যয় ও ধ্বংসলীলা আরম্ভ হইয়াছে, অবিলম্বে তাহার প্রতিকার হয়, আমরা ইহাই দেখিতে চাই। 'যদি'র উপর ঘাড়ে দিয়া ভবিষ্যতের জন্য এ প্রশ্ন ফেলিয়া রাখিবার সময় নাই। ভবিষ্যতের আতঙ্ক এড়াইতে হইলে এখনই কার্যে অবতীর্ণ হওয়া প্রয়োজন, কর্তৃপক্ষকে এই কথাটাই শুধু বলিতে চাই।

মহামারীর প্রতিকার

দুর্ভিক্ষের পরে জাতির জীবনে স্বভাবত যে [illegible] দেখা দেয়, বাঙলাদেশ [illegible] সেই সংকটময় অবস্থা [illegible] কলেরা, বসন্ত, ম্যালেরিয়ায় [illegible] উজাড় করিয়া ফেলিতেছে। দেশব্যাপী এই সংকটের প্রতিকারের জন্য গভর্নমেণ্ট হইতে কি কি ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে, সে সম্বন্ধে এ পর্যন্ত আমরা বিশেষ কিছু জানিতে পারি নাই ; অন্তত এ সম্বন্ধে সরকারের সুনির্দিষ্ট কোন ব্যাপক পরিকল্পনা পাওয়া যায় নাই। সেদিন বাঙলা সরকারের জন-স্বাস্থ্য বিভাগের মন্ত্রী খান বাহাদুর জালালুদ্দিন আহম্মদ এই বিষয়ে বেতারযোগে একটি বক্তৃতা দিয়াছেন। তাঁহার এই বক্তৃতায় এ সম্বন্ধে সরকার পক্ষের অবলম্বিত নীতির কিছু বিস্তৃত পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি বলেন, পীড়িতদের চিকিৎসার জন্য হাসপাতালের সংখ্যা পূর্বে ৬ হাজার ছিল, এখন উহা বৃদ্ধি করিয়া ২০ হাজার করা হইয়াছে এবং অল্প দিনের মধ্যে ঐ সংখ্যা ৪০ হাজার করা হইবে। মন্ত্রী মহাশয় আরও বলেন যে, সরকার এক কোটি লোকের শুশ্রূষার উপযুক্ত কুইনাইন সংগ্রহ করিয়াছেন। ইহার মধ্যেই বাঙলার বিভিন্ন অঞ্চলে ৫০ হাজার পাউণ্ড কুইনাইন প্রেরণ করা হইয়াছে। জনস্বাস্থ্য বিভাগের মন্ত্রী এ সব কথাই কাগজপত্রে হিসাবের উপর নির্ভর করিয়া বলিয়াছেন। বলা বাহুল্য, এই সব ব্যাপারে সরকার পক্ষ হইতে কাগজপত্রে যেসব হিসাব দেখান হয়, অতীতের অভিজ্ঞতা হইতে সেগুলিতে আশ্বস্ত হইবার মত মনের বল আমরা হারাইয়া ফেলিয়াছি। বাঙলার পল্লী অঞ্চলের ব্যাধিপীড়ার প্রতিকার সম্পর্কে জন-স্বাস্থ্য বিভাগের মন্ত্রী অনেক কথাই বলিয়াছেন; কিন্তু দেশের বাস্তব অবস্থা দেখিয়া আমরা সেসব প্রতিকার-ব্যবস্থার কার্যকারিতা উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না। দেশের সকল অঞ্চলে মহামারীর তাণ্ডবলীলা চলিতেছে, প্রত্যহ এ সম্বন্ধে ভয়াবহ সংবাদ আমরা পাইতেছি। জনস্বাস্থ্য বিভাগের মন্ত্রীর মতে, ঐ সব সংবাদ অনেকটা অতিরঞ্জিত। সরকার পক্ষের এ যুক্তি আমাদের কাছে অনেকটা মামুলী হইয়া গিয়াছে। মহামারীর ধ্বংসলীলা সম্বন্ধে সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদ যদি অতিরঞ্জিতই হয়, তবে সরকার পক্ষ হইতে প্রকৃত তথ্য প্রকাশের ব্যবস্থা করা হয় না কেন? মেজর জেনারেল স্টুয়ার্ট একজন দায়িত্বশীল সামরিক কর্মচারী। কিছুদিন পূর্বে তিনি একটি বিবৃতিতে বলেন, ব্যাধিগ্রস্তের চিকিৎসার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সংবাদপত্রে যেসব সংবাদ প্রকাশিত হয়, সেগুলি তিনি অতিরঞ্জিত বলিয়া মনে করেন না। তাঁহার ন্যায় একজন লোকের কথার নিশ্চয়ই কিছু মূল্য আছে। সুতরাং অবস্থার গুরুত্ব স্বীকার করিতেই হয়। সে গুরুত্ব অতিরঞ্জিত বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলে না। অবশ্য দেশজোড়া এইরূপ সমস্যার প্রতিকারের পথে অসুবিধা যে নাই আমরা এমন কথা বলি না। জনস্বাস্থ্য বিভাগের মন্ত্রী এসম্বন্ধে চিকিৎসকের অভাবের কথা বলিয়াছেন ; চিকিৎসার জন্য বণ্টিত কুইনাইন চোরাবাজারে গিয়া পড়িতে পারে, এমন আশংকাও তিনি ব্যক্ত করিয়াছেন ; কিন্তু এই ধরণের অসুবিধা দূর করা সম্ভব নয়, আমরা ইহা মনে করি না ; উপযুক্ত বেতন এবং ভাতা প্রভৃতির ব্যবস্থা হইলে বাঙলাদেশে ব্যাধিতের সেবাকার্যের জন্য অনেক চিকিৎসক পাওয়া যাইতে পারে এবং বণ্টন-ব্যবস্থা যদি সুপরিচালিত হয়, তবে ডাক্তারি চোরাবাজারে যাহাতে কুইনাইন গিয়া না পড়ে, ইহা করা যায় বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। বাঙলাদেশে জনসেবাপরায়ণ কর্মীর অভাব নাই। বাঙলার তরুণ সম্প্রদায় সেবাকার্যে সকল সময়ই অগ্রণী। সরকার যদি এক্ষেত্রে তাহাদের সহযোগিতা আকর্ষণ করিতে পারেন, তবে সেবাকার্যে সততা সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারে এবং আন্তরিকতার বলে তাহা সা কিন্তু সেজন্য সরকারী নীতি উদার এবং স্বদেশপ্রেমপূর্ণ প্রবর্তন করা প্রয়োজন।

উৎকট যুক্তি

ভারতবর্ষকে কেন স্বাধী যাইতেছে না, ভারতসচিব নি ইয়র্ক শহরের বক্তৃতায় সে সম্বে দিয়াছেন। বলা বাহুল্য, সাম্রাজ্যবাদীদের একঘেয়ে মাম এক্ষেত্রে আমেরী সাহেব করিয়াছেন। তিনি বলে লাণ্টিক সনদের এক বৎস অর্থাৎ প্রায় সাড়ে তিন বৎসর লিনলিথগো ভারতবাসীদিগকে শ্রুতি দান করিয়াছিলেন যে, ভারতবাসীদিগকে তাহাদের প্রণয়ন করিবার অধিকার প্রদান এই প্রতিশ্রুতি সম্বন্ধে সন্দে করিবার উদ্দেশ্যে দুই বৎসর স্টাফোর্ড ক্রীপস্ ভারতে তিনি ভারতবাসীদিগকে সক এমনকি ব্রিটিশ সাম্রাজ্য হইতে হইবার অধিকার পর্যন্ত দিতে র ছিলেন। তবে সর্ত ছিল এই ভারতের সকল দলকে এক হই কিন্তু সে সুযোগ গ্রহণ করা হয় এখনও তেমন কোন চেষ্টা হই কেবল প্রতিদ্বন্দ্বী দলগুলি করিতেছে যে, ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট সমস্ত দাবীই পুরাপুরি গ্রহণ হইবে এবং অন্যান্য পক্ষের দা করিতে হইবে।" ভারতের পরিস্থিতি সম্বন্ধে যাঁহাদের আছে, আমেরী সাহেবের উক্তি বুঝিয়া লইতে তাঁহাদের বেগ পা না। প্রকৃতপক্ষে অখণ্ড ভারতে স্বাধীনতার আদর্শ সম্বন্ধে এ লীগ ব্যতীত ভারতের অন্য নীতিক দলের মধ্যে কিছুমাত্র মত ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট যদি ভারতের সম্বন্ধে গণতান্ত্রিক রীতিসম্ম স্বীকার করিতেন, অর্থাৎ আটলা নির্দেশিত নীতিকে মর্যাদা দিতে মোস্লেম লীগের জনকয়েক মোড়লের মুখ বহু পূর্বে বন্ধ হ এবং জাতির ঐক্যমত সংহত হই তাঁহারা এই সোজা পথ ধরিতে রা তাঁহারা ভারতের রাজনীতিক যুক্তি জোর গলায় জাহির করিতে দেখাইতে চাহিতেছেন যে, আটলা জগতের বিভিন্ন জাতির যে অধিক হইয়াছে, ভারত সম্পর্কে তাঁহাদে এমনই অকৈতব যে, উক্ত

শুভ-বার্তা ঘোষিত হইবার বহু পূর্বেই তাঁহারা ভারতকে সে অধিকার দিয়া রাখিয়াছেন; সুতরাং ভারতের ক্ষেত্রে আটলান্টিক সনদ প্রয়োগ করিবার প্রশ্ন অবান্তর। ভারতের স্বাধীনতা সম্পর্কে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের এই কূটনীতির খেলা মানবতার অধিকারে জাগ্রত জগতে বেশী দিন থাটিবে বলিয়া আমরা মনে করি না।

নূতন লাটের অভিমত

বাঙলার নবনিযুক্ত লাট মিঃ রিচার্ড ক্যাসি সাদাসিধা মিস্টার রূপেই গভর্নরের কাজ করিতে আসিতেছেন। এইরূপ অবস্থায় মনে করা গিয়াছিল যে, তিনি অনেকটা সাদাসিধাভাবেই তাঁহার ভবিষ্যৎ কর্মনীতি সম্বন্ধে মনের কথা ব্যক্ত করিবেন। কিন্তু সম্প্রতি রয়টারের মারফতে তাঁহার যে কয়েকটি উক্তি এদেশে প্রেরিত হইয়াছে, সেগুলি পাঠ করিয়া আমাদিগকে নিরাশ হইতে হইয়াছে। মিঃ ক্যাসি অস্ট্রেলিয়ান বলিয়া এদেশে তাঁহার নিয়োগে যে আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছে, তিনি কূটনৈতিক জবাব দিয়া সেই অপ্রিয় প্রসঙ্গ এড়াইবার চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি অস্ট্রেলিয়ার গভর্নমেণ্টের নীতির দায়িত্ব লইতে চাহেন নাই। সেই সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ার গভর্নমেণ্টের অন্তরে ভারত-প্রীতির ভাব যে বৃদ্ধি পাইতেছে, সে কথাও তিনি আমাদিগকে শুনাইয়াছেন। অস্ট্রেলিয়ার গভর্নমেণ্ট সেদেশে ভারত গভর্নমেণ্টের প্রতিনিধিস্বরূপে একজন হাই কমিশনার রাখিবার প্রস্তাব করিয়াছেন—মিঃ ক্যাসির মতে, ইহা তাঁহাদের ভারত-প্রীতির পরিচয়; বলা বাহুল্য, ভারতের জনমত অস্ট্রেলিয়ার গভর্নমেণ্টের এই প্রস্তাবে সন্তুষ্ট হইতে পারে না। দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারত গভর্নমেণ্টের হাই-কমিশনার আছেন; কিন্তু তাহাতে ভারতবাসীদের মর্যাদা সেদেশের গভর্নমেণ্ট স্বীকার করিয়া লইয়াছেন, কোন ভারতবাসীই ইহা মানিয়া লইবে না। কৃষ্ণাঙ্গ ভারতবাসীরা স্থায়িভাবে অস্ট্রেলিয়ায় বসবাস করিলে, সে দেশ কলঙ্কিত হয়। অস্ট্রেলিয়ার গভর্নমেণ্টের 'শ্বেতাঙ্গ-অস্ট্রেলিয়া' নীতিতে জাতীয় অবমাননার এই আঘাত ভারতবাসীকে পীড়িত করে; ভারত সরকারের নিযুক্ত একজন চাকুরিয়া অস্ট্রেলিয়ার ক্যানবেরাতে গিয়া দপ্তর বসাইলেই সে অবমাননার জ্বালা ভারতবাসীদের অন্তর হইতে দূর হইবে না। মিঃ ক্যাসি তাঁহার উক্তিতে বাঙলার বর্তমান সমস্যা সম্বন্ধে সুস্পষ্টভাবে কিছুই বলেন নাই। রাজবন্দীদের সমস্যা বাঙলার একটি প্রধান সমস্যা। সংবাদপত্রের প্রতিনিধি-একটি প্রধান সমস্যা। সংবাদপত্রের প্রতিনিধিগণ সাহসের সঙ্গে তাঁহাকে তৎসম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়াছিলেন; কিন্তু এ সম্বন্ধে মিঃ ক্যাসি যে উত্তর দিয়াছেন, তাহাতে ভরসার কিছু পাওয়া যায় না। তিনি বলিয়াছেন যে, এক বৎসরের মধ্যে তিনি পুনরায় লণ্ডন পরিদর্শনের আশা রাখেন। তিনি মনে করেন যে, এ বিষয়ে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের সঙ্গে পূর্বে এ বিষয়ে ব্যক্তিগতভাবে আলাপ-আলোচনা করা দরকার। ইহা দ্বারা কি ইহাই বুঝিতে হইবে যে, ভারতে আসিয়া এক বৎসরকাল সমস্ত অবস্থা প্রত্যক্ষ করিবার পর লণ্ডনে গিয়া তথাকার গভর্নমেণ্টের সঙ্গে পরামর্শ করিবার পর মিঃ ক্যাসি বাঙলার রাজবন্দীদের সম্বন্ধে তাঁহার মতামত গঠন করিবেন? তাহা হইলে বুঝা গেল যে, রাজবন্দীদের সম্পর্কে অন্তত এক বৎসরকাল মিঃ ক্যাসির নিকট হইতে কিছুই প্রত্যাশা করা যায় না।

আর্ট স্কুলের গোলযোগ

ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুলের ধর্মঘট এখনও মিটে নাই। কর্তৃপক্ষ এই ব্যাপারে যত সংখ্যক ছাত্রের ত্রুটি স্বীকার দাবী করিয়াছিলেন, সে সংখ্যা পূর্ণ না হইলে তাঁহারা নিজেদের পণ পরিত্যাগ করিবেন না। সুতরাং ছাত্রদের অদৃষ্টে যাহাই ঘটুক, স্কুল বন্ধই থাকিবে এবং গোলযোগের মীমাংসার জন্য কোন চেষ্টা করা হইবে না। আর্ট স্কুলেও দীর্ঘকালীন গোলযোগ অনুরূপভাবেই অমীমাংসিত রহিয়াছে। এই গোলযোগের সম্বন্ধে তদন্ত করিবার জন্য একটি কমিটি নিযুক্ত করা হয়। পাঠকবর্গ সম্ভবত ইহা অবগত আছেন। ইহা ছয়-সাত মাস পূর্বের কথা। এই সুদীর্ঘকালের মধ্যেও কমিটি তাঁহাদের সিদ্ধান্ত করিয়া উঠিতে পারেন নাই এবং তাঁহাদের রিপোর্ট প্রকাশ করেন নাই। বাঙলা, বিহার ও উড়িষ্যার মধ্যে কলিকাতার এই আর্ট স্কুল বিশেষভাবে খ্যাতিলাভ করিয়াছে। কর্তৃপক্ষের সুপরিচালনার অভাবে এই স্কুলটির শিক্ষাকার্যে বিঘ্ন জন্মিলে বাঙলাদেশের পক্ষে একটি গুরুতর ক্ষতি ঘটিবে বলিয়াই আমরা মনে করি। অচিরে আর্ট স্কুলের এই গোলযোগের যাহাতে অবসান হয়, কর্তৃপক্ষ তৎসম্বন্ধে অধিকতর অবহিত হউন, আমাদের ইহাই অনুরোধ।

অনর্থক আড়ম্বর

ভারতবর্ষের খাদ্য-সমস্যা, বিশেষভাবে বাঙলাদেশের অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনার জন্য বিলাতি শ্রমিক দলের এক ডেপুটেশন সেদিন ভারতসচিবের সহিত সাক্ষাৎ করেন। অধ্যাপক মিঃ হেরল্ড ল্যাস্কি এই ডেপুটেশনের নেতা ছিলেন এবং পার্লামেণ্টের শ্রমিক দলের সদস্য মিঃ সোরেন্সেন ডেপুটেশনের পক্ষ হইতে ভারতসচিবের নিকট নিজেদের বক্তব্য উপস্থিত করেন। ডেপুটেশন কি কি প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত হয় নাই; সে বিষয়ে একটু [illegible] মাত্র পাওয়া গিয়াছে। প্রথমত, ডে[illegible] ইহাই বক্তব্য ছিল যে, [illegible] দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ [illegible] হইবে; দ্বিতীয়ত, [illegible] প্রতিকারের জন্য [illegible] অবিলম্বে তাহা [illegible] ভবিষ্যতে এইদেশে [illegible] না দিতে পারে, [illegible] প্রতিকার-ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। ডেপুটেশনের [illegible] এবং [illegible] আকারে [illegible] কিছু [illegible] কিন্তু ভারতসচিব এ সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন, সেটুকু আপাতত অপ্রকাশ [illegible] হইয়াছে। কারণ, এই আলোচনা গোপন রাখিবার জন্যই উভয়পক্ষ পরস্পরের নিকট স্বীকৃত হইয়াছেন। এমন [illegible] পরিণতি আমাদের ভাগ্য পরিবর্তনে বিশেষ কিছু সাহায্য করিবে, এমন বিশ্বাস আমরা করি না; আমাদের মতে, এই ধরনের আবেদন-নিবেদনের কিছুই সার্থকতা নাই। ভারতের বর্তমান সমস্যার যদি কোন দিন সমাধান হয়, [illegible] হইবে না; [illegible] জোরেই এ দে[illegible] ইংলণ্ডের ভারত-[illegible] জনমতের গুরুত্বকে [illegible] নৈতিক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত [illegible] হন, তবে শুধু সেই দিক [illegible] চেষ্টা সার্থক হওয়া সম্ভব বলিয়া [illegible] মনে করি।

মার্কিন ও ভারত

রায় বাহাদুর মেহেরচাঁদ খান্না সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাজ্য পরিদর্শন করিয়া দেশে ফিরিয়াছেন। সেদিন লাহোরে একটি বক্তৃতায় তিনি বলেন, মার্কিন যুক্তরাজ্যে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের পৃষ্ঠপোষকতায় ভারত-বিরোধী প্রচারকার্য বিশেষভাবে চলিতেছে, ঐ প্রচারকার্যের প্রতীকার করিবার জন্য রায় বাহাদুরের মতে ভারতের জাতীয়তাবাদীদের পক্ষ হইতে সেখানে প্রচারকার্য পরিচালনা করা প্রয়োজন। রায় বাহাদুরের যুক্তির মূল্য আছে আমরা স্বীকার করি; কিন্তু ঘুমন্ত ব্যক্তিরই ঘুম ভাঙ্গানো যায়, জাগিয়া যদি কেহ ঘুমাইবার ভাণ করে তাহার ঘুম ভাঙ্গানো সম্ভব হয় না।

রতিরামদাসের 'কৃষ্ণ-ধামালী'

শ্রীযতীন্দ্র সেন

উত্তর বঙ্গে ও পশ্চিম আসামের প্রত্যন্ত-ভাগে প্রচলিত "জাগ-গানে"র কথা অনেকে শুনিয়াছেন। সাময়িক পত্রিকাদিতে, বিশেষত আনন্দবাজার পত্রিকা'র রবিবাসরীয় সংখ্যা ও বিশেষ সংখ্যাগুলিতে এ সম্বন্ধে বহুবার আলো- [illegible] করিয়াছি। "কৃষ্ণ-ধামালী" বা [illegible] বহু পালায় বিভক্ত [illegible] অন্যতম পালা। [illegible] লীলাখণ্ড [illegible] এই জন্য ইহাকে [illegible] বলা হইয়া থাকে। প্রাচীন [illegible] পৌরাণিক [illegible] অনুবর্তনের ভিতর দিয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল ঠিক সেই রূপ ভাবেই বঙ্গ সাহিত্যে চণ্ডীদাসের আবির্ভাবের পর হইতে তাঁহার "শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনে"র অনুকরণে এক সময়ে বাঙলা দেশের নানা অঞ্চলের বহু কবি কৃষ্ণলীলা বিষয়ক বহু সংগীত ও পালা গান রচনা করিয়াছিলেন, এইরূপ অনুমিত হয়। "জাগ-গান" এইরূপ কতকগুলি পালা গানের সমষ্টি। উত্তর বঙ্গের "জাগ-গানে"র অনুরূপ দু'একটি বিক্ষিপ্ত গানের সন্ধান আমরা পূর্ব [illegible] পাইয়াছি। কেবল ভাব, ভাষা, [illegible] ও [illegible] নয়, উভয় [illegible] পদও এক:— কোথাও [illegible] অবিকল অভিন্ন, কোথাও কোথাও বা দুই একটি শব্দের [illegible] পদের, কোথাও কোথাও বা অংশ বিশেষের ঈষৎ তারতম্য বা পরিবর্তন লক্ষিত হয়।

ইহা হইতে অনুমিত হয়, চণ্ডিদাসের "শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনে"র মতই কৃষ্ণ-লীলা বিষয়ক এই গানগুলিও এক সময়ে বাঙলার সর্বত্র প্রচার লাভ করিয়াছিল; গায়কের অজ্ঞতা অথবা ইচ্ছাক্রমে এবং লোক মুখে মুখে কালক্রমে ইহার আংশিক পরিবর্তন সাধিত হইয়াছিল। এখনও এই ধরণের গান পল্লী অঞ্চলে লোক-মুখে গীত হইতে শোনা যায়, তবে তাহা আর বিশেষ অনুষ্ঠান-উপলক্ষে বা বিশেষ আয়োজন সহকারে গীত হয় না। কাজেই এই গানগুলি ক্রমশ বিস্মৃতির অতলগর্ভে ডুবিয়া যাইতেছে। কেবল উত্তর বঙ্গের উত্তরাঞ্চলে এবং তৎসন্নিহিত আসামের অন্তর্গত স্থানগুলিতে মদন ত্রয়োদশীতে অনুষ্ঠিত 'মদন-কামে'র পুজা উপলক্ষে "জাগ-গানে"র পালা-গুলি এখনও গীত হয়,—যদিও এইরূপ অনুষ্ঠানের ব্যাপকতা ক্রমশই কমিয়া আসিতেছে। ইহার ফলে কালক্রমে হয়ত এইরূপ অনুষ্ঠান-আয়োজনের অভাবে এই "জাগ-গানে"র পালাগুলিও লুপ্ত হইয়া যাইবে।

এখন, "জাগ-গানের" এই বিশেষ পালাটির নাম "কৃষ্ণ-ধামালী" হইল কেন, সে সম্বন্ধে [illegible] করা যাক। "ধামালী" শব্দে তরল ভাবে অশ্লীলতা দোষে দুষ্ট গান বুঝায়। এই ধরণের গান পূর্বে বিবাহ বা আমোদপ্রমোদ উপলক্ষে গীত হইত।

সপ্তদশ শতাব্দীর মুসলমান কবি দোনা গাজী চৌধুরী রচিত "সয়ফুল মুলুক বদিউজ্জমাল" কাব্যে বিবাহ উপলক্ষে আনন্দ-অনুষ্ঠানের বর্ণনা প্রসঙ্গে আমরা এই "ধামালী"র উল্লেখ পাইয়াছি:—

> কেহ পান গুয়া খাএ আনন্দে ধামালী গাএ
> কতুকে করএ নানা কেলি।
> আড়েতে লুকাই পাসে কেহ কার পরে হাসে
> ফেলাএ কাহার অঙ্গ ঠেলি।"

ডাঃ এনামুল হক এম-এ, পি এইচ-ডি লিখিয়াছেন—"...আনন্দে **ধামালী** (অশ্লীল গান) গাহিত...।" *

"জাগ-গানে"র অন্তর্গত "কৃষ্ণধামালী" পালাটি রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা বিষয়ক। কাজেই তাহা আদিরসবহুল এবং তাহাতে তরলভাবে কিছু বাড়াবাড়ি থাকা স্বাভাবিক বলিয়াই এই পালাটির নাম "কৃষ্ণ-ধামালী" হইয়াছে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে "কৃষ্ণ-ধামালী" ও অন্যান্য পালাসহ আমি যে "জাগ-গান" সংগ্রহ করিয়া দিয়াছি, তাহাতে তাহার রচয়িতার নামের কোন উল্লেখ নাই। অপর একটি "কৃষ্ণ-ধামালী" পালা আমাদের হস্তগত হইয়াছে। এই পালা গানটি রচয়িতা হিসাবে আমরা রতিরাম দাসের নাম, তাঁহার পরিচ[য়] তাঁহার সমসাময়িক ও পূর্ববর্তী উত্ত[র] বঙ্গ ও আসামের ভৌগোলিক [ও] ঐতিহাসিক বর্ণনা তাঁহার কা[ব্যে] আমরা পাইয়াছি।

তাঁহার পরিচয় আমি প্রসঙ্গান্ত[রে] দিয়াছি এবং পরে-প্রকাশিতব্য অপ[র] একটি প্রবন্ধে আরও দিতে চেষ্টা করিব[।] বর্তমান প্রবন্ধে তাঁহার "কৃষ্ণ-ধামালী" কাব্যের আলোচনাই আমাদের প্রধা[ন] লক্ষ্য।

মৎ কর্তৃক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যাল[য়ে] প্রদত্ত "জাগ-গানে"র অন্তর্গত "কৃষ্ণ-ধামালী" অপেক্ষা রতিরামের "কৃষ্ণ-ধামালী"র ভাষা অপেক্ষাকৃত মার্জি[ত,] কবিত্বশক্তিমণ্ডিত ও অনেকাংশে ভাষা[র] প্রাদেশিকতা দোষ বর্জিত। ইহা হইতে রচনার প্রাচীনতার দিক দিয়া রতিরামে[র] "কৃষ্ণ-ধামালী" পরবর্তী কালের বলি[য়া] মনে হয়।

কবি তাঁহার এই কাব্য-গীতিক[ার] শেষাংশে ইটাকুমারীর সেই সময়ে[র] জমিদার, রংপুরের প্রজা-বিদ্রোহের অন্য[] তম অধিনায়ক 'শিবচন্দ্র রায়ের কীর্তি[] গাথার অবতারণা যেভাবে করিয়াছে[ন] তাহাতে তাঁহাকে শিবচন্দ্র রায়ের সম[] সাময়িক বলিয়া মনে হয়। তাহা হইতে তাঁহার এই "কৃষ্ণ-ধামালী" পালাটি[র] রচনা-কাল কিঞ্চিন্ন্যূন দেড়শত বৎস[র] পূর্বের বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে।

রতিরামের "কৃষ্ণ-ধামালীর" বিশেষ[ত্ব] এই যে, তিনি রাধাকৃষ্ণের প্রেম-ব্যাপারে[] খাঁটি বাঙালী জীবনের পরিবেশ [ও] পারিপার্শ্বিকতার ভিতর দিয়া ফুটাই[য়া] তুলিয়াছেন।

বৈষ্ণব কাব্যের রাধাকৃষ্ণের যমুনাবিহা[র,] নৌকাবিলাস, রাস-লীলা ইত্যাদি ব্যাপ[ার] সর্বজনবিদিত। কিন্তু রতিরাম রাধা-কৃষ্ণের প্রেম-প্রসঙ্গের ভিতর শাকতোল[া,] মাছ-ধরা ইত্যাদি সাধারণ গ্রাম্য জীবনে[র] ঘটনাগুলিকেও অতি সুন্দরভাবে, কবি[ত্ব-] কুশলতার সঙ্গে স্থান দিয়াছেন। শাকের ক্ষেতেও কবি রাধাকৃষ্ণের পূর্ব[-] রাগ-প্রসঙ্গ টানিয়া আনিয়াছেন:—

* "আরাকান রাজসভায় বাঙলা সাহিত্য"— ৯৬ পৃঃ।

"খ্যরিয়া (১), বতুয়া (২) শাকে ক্ষেত
গেইছে (৩) ভরি'।
রাধা যায় শাক তুলিতে নয়া ডালি ধরি'॥
সরু কাপড়া পরণে রাধার কেবল নয়া ধোপ।
নচা-পচা (৪) শাক দেখিয়া রাধার
হইল লোভ॥"

কেবল রাধার লোভ নয়, বাড়ির কর্তা আয়ান ঘোষও শাক ভালবাসেন। বিশেষ করিয়া সেই কারণেই রাধাকে শাক তুলিতে হয়। কিন্তু শাক তুলিবার বিপদও কিছু কম নয়ঃ—

"দেওয়ানিয়া (৫) ভালবাসে খ্যরিয়া শাক ভাজা।
শাক তুলিতে মোক্ (৬) কল্লে ভাজা-ভাজা॥
লাজ নাই, লজ্জা নাই, গাবুর (৭) বউরী (৮)।
শাক তুলিতে এমন বউক্ পাঠায় কেমন করি॥
ঐ যে আইসে নন্দের বেটা জুয়ান
জাওয়ান কানু।
কেনে আইসে আইলে আইলে বুঝিতে
না পানু॥
কেমন করি চৌকে (৯) চায়, গিলিয়া যেন খায়।
জুয়ান বউরী দেখি এই ভিতি (১০) ধায়॥
চিট্‌ল (১১) চাউনি চৌকে, মুখে মধুর হাসি।
রাস্তাৎ ঘাটাৎ (১২) পাইলে আঞ্চল (১৩)
ধরে আসি॥"

শাক তুলিতে তুলিতে আরম্ভ হইল রাধার পায়ে কাঁটা ফুটিবার ছলঃ—

খ্যড়িয়া খ্যড়িয়া (১৪) আনু (১৫)
খ্যরিয়ার বন হাতে (১৬)।
আর ত পারোঁ (১৭) না মুই এত
পন্থ যাইতে॥"

অতঃপর কৃষ্ণের রাধার পায়ের কাঁটা তুলিতে অগ্রসর হওয়া এবং তদুপলক্ষে প্রেমনিবেদনের ব্যাপার কবি সুকৌশলে বর্ণনা করিয়াছেন।

"আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে" না হইলেও আষাঢ়েরই বর্ষণ মুখর কোন এক দিনে বৃষ্টিপাতজনিত জলস্রোতের সঙ্গে সন্তরণশীল মাছ ধরার উপলক্ষে বড় দীঘিতে জল আনিবার নালার ধারে রাধার সঙ্গে কৃষ্ণের সাক্ষাৎ হইলঃ—

"আষাঢ় মাসে ভরু বরিষা (১৮) উজাই
নাগিল (১৯) মাছ।
মাছ ধরিতে যায় রাধা কানাই লাগিল পাছ॥*
বড় দীঘির বড় ধোরে (২০) বড় দিছে
(২১) নেটা (২২)।
সেইখানেতে রাধার কাছে আইল নন্দের বেটা॥
কানাই বলে মেঘে বর্ষে কেমন জলের ধার।
আকাশ হাতে পড়ে যেমন রূপার শতেক তার॥

(১) কাটা নটে শাক; (২) এক প্রকার শাক, বেতো শাক; (৩) গিয়াছে; (৪) নধর, কোমল; (৫) বাড়ির কর্তা; (৬) আমাকে; (৭) যুবতী; (৮) বউ; (৯) চক্ষে; (১০) দিকে; (১১) চট্‌ল, চঞ্চল; (১২) পথে; (১৩) আঁচল।
(১৪) খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া; (১৫) আসিলাম; (১৬) হইতে; (১৭) পারি; (১৮) ভরা বর্ষা; (১৯) উজাইয়া, অর্থাৎ স্রোতের বিপরীত দিকে বাইতে লাগিল; (২০) দীঘি বা পুষ্করিণীতে জল আসিবার নালায়; (২১) দিয়াছে;

ফাঁক নাই, ফুক না, পড়ছে জলের ধারা।
আকাশ-পাতাল ঢাকুছে মেঘে চান্দ,
সুরুজ, তারা॥
খাল, বিল, দীঘি, নদী সব একাকার।
দেওয়া নোয়ায় (২৩), পিথিসিং (২৪)
প্রেমের পাথার॥"

অতঃপর—

"ধোরের (২৫) ধারে যায়া (২৬) রাধা
ভাবে সাত পাঁচ।
হাতের বাঁশী মাটীত্ (২৭) থুইয়া
কানাই মারে মাছ॥
রাধার মুখের দিগে কানাই এক দৃষ্টে চায়।
ডাগ্গর (২৮) চৌক্ দুটি, পলক নাহি তায়॥
হাসিয়া কইছে রাধা—'এ কেমন চাউনি।
এমন চাউনিতে সাপে ধরয়ে পাখিণী॥
চক্ষু দিয়া দংশ তুমি কেনে কালা সাপ।
মামীক্ দংশিয়া কেনে কর মহাপাপ॥
কাল সাপের বিষে আমার অঙ্গ জর জর।
কোন মতে দাঁড়ায়া আছি অঙ্গে [illegible]॥
যমুনার জলে থাকে সেই কালিয় [illegible]
দংশিয়া দংশিয়া মোক্ [illegible]

* * * *

এ সাপ বিষম সাপ [illegible] জলে [illegible]।
পাছে পাছে ফিরে [illegible] যমুনার কূলে কূলে॥"

ইহার উত্তরে কৃষ্ণ রাধাকে বলিতেছেন—"আমি সাপের ওঝা, মন্ত্র, ঔষধ সবই জানা আছে, কাজেই ভয় নেই।"

"কানাই বলে ভয় নাই, আমি সাপের ওঝা।
কত মন্তর, জ্ঞান জানি [illegible]॥
গাঙের জল পড়িয়া দেই [illegible]।
বিষ নামিবে, কাদো (২৯) [illegible], [illegible]
তোমার [illegible]"

প্রত্যুত্তরে রাধা বলিতেছেন—"তুমি আবার কেমন সাপের ওঝা, আর সাপুড়িয়া! তোমার মন্ত্রে আর ঔষধে দেখি বিপরীত ফল দাঁড়ায়।"

"কানাইক্ তখন রাধা কয় মুচ্‌কি হাসিয়া।
কেমন তুমি সাপের ওঝা, সাপের সাপুড়িয়া॥
সাপুড়িয়া বাঁশীর সুরে সাপ বাহির
হয়া আইসে।
তোমার বাঁশীর সুরে সাপ জাগিয়া
উঠিয়া বইসে॥
তোমার বাঁশীর সুরে সাপ কানের
ছিদ্দির (৩০) দিয়া।
বসত বাড়ি কৈল সাপ হৃদের গর্তে গিয়া॥
ঘুমায় না, ঘুমায় না সাপ, জাগিয়া থাকে সোজা।
তোমার বাঁশীর সুরে সাপ খায় মোর কলিজা॥"

(২২) নালার মধ্যে মাছ ধরিবার জন্য যে গর্ত করিয়া দেওয়া হয় তাহা,—অতি অগভীর জলধারার ক্ষীণ স্রোত ঠেলিয়া মাছ এই কর্দমময় গর্তে আসিয়া পড়ে; (২৩) নয়, নহে; (২৪) পৃথিবীতে; (২৫) দীঘির নালার; (২৬) যাইয়া; (২৭) মাটিতে; (২৮) ডাগর, বড়; (২৯) কাদা; (৩০) ছিদ্র; (৩১) টিপ্-টিপ্, ফোঁটা ফোঁটা; (৩২) খাইলি, খেলি; (৩৩) পাছে, পরে; (৩৪) স্নান।

* মৎ কর্তৃক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত "কৃষ্ণ-ধামালীতে" অনুরূপ দুইটি পংক্তি আছেঃ—
"জ্যৈষ্ঠ মাসে ঝড় বরিষণ, উজাই লাগিল মাছ।
রাধে চলিল গাঙ-ছিনানে, কানাই লাগিল পাছ॥"

অতঃপর কবি কৃষ্ণের বড়শী দ্বারা মাছ ধরার প্রসঙ্গ বর্ণনা করিয়াছেনঃ—

"ছিপ্‌ছিপানি (৩১) বিষ্টি পড়ে, ঘাড়ে
নিল ছিপ্।
অন্তরে আগুন জ্বলে করিয়া ধিপ্ ধিপ॥"

* * * *

রাধা কয়—'কি মাছ ধরেন, রুই না কাতল।
রুই মাছের মুড়া মিঠা, আর মিঠা কোল॥

* * *

রুইয়ের মাথা ছাড়িয়া তুই খালু (৩২) [illegible]

কি মাছ [illegible]
কত [illegible]
এ [illegible]
আমাক্ [illegible]
[illegible]
সহিত দুষ্টের [illegible]
[illegible]ঃ—
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
তবুও এই বড়শী হইতে [illegible] গেল না। তাহার [illegible]—
"[illegible]
[illegible] (৩৫)
[illegible] (৩৬) [illegible]
[illegible] ও [illegible]
[illegible]ন [illegible]—
"এক ভিতি [illegible]
কোন্ ভিতি যাইমো [illegible]
[illegible]

তদুত্তরে কৃষ্ণ রাধার [illegible] করার কথা বলিতেছেনঃ—

"কানাই বলে—'কেনে ভয় দেখাও [illegible]
তোমাক্ ছাড়িয়া আমি যামো (৩৭) কোন্
ভিতি॥
তরাসে কাঁপিছে গাও, ডরে কাঁপে মাথা।
তোমার অঙ্গে লুকাইমো, কে ধরিবে হেথা॥
তোমার অঙ্গ কাঞ্চা সোনা, উঠে সোনার ঢেউ।
তোমার অঙ্গে লুকাইলে, না দেখিবে কেউ॥
সোনার অঙ্গে সোনার হারে শোভা নাহি হয়।
ছিঁড়ি ফেলাও কণ্ঠের হার, কাক্ (৩৮) করেন
ভয়।

(৩৫) এখন; (৩৬) হইলাম; (৩৬ ক) যা'বেন যা'বে,—উত্তরবঙ্গের স্থানীয় লোকের ভাষায় অনাবশ্যকভাবে সম্প্রমাটক ক্রিয়া পদের ব্যবহার হয়; (৩৭) যাইব; (৩৮) কাহাকে; (৩৮ ক) আশ্বিন; (৩৯) রাত্রিটুকু; (৪০) বাদলা (৪১) বৃষ্টি; (৪২) কাশফুল; (৪৩) এখানে ওখানে; (৪৪) বালি; (৪৫) জ্যোৎস্না; (৪৬) শেফালিকার; (৪৭) ঘরে থাকিতে; (৪৮) ভ্রমর; (৪৯) যূথী, যুঁই; (৫০) নূপুরে

এই মোর বাহু দু'টি নীলমণির মত।
গলা জড়াইলে আমি, শোভা হইবে কত!!"

রাস-অধ্যায় বর্ণনা প্রসঙ্গে কবি প্রকৃতি বর্ণনায় অপূর্ব কবিত্বশক্তির পরিচয় দিয়াছেন :—

"আশিন (৩৮ ক) গেইছে, কাত্তিকের আজ গেল
আধেক দিন।
রাত্তির কোনা (৩৯) একটুক্ বাড়ছে, পাওয়া
যানা চিন্॥
[illegible] (৪০) নাই, ঝড়ি (৪১) নাই, কাশিয়ার
ফুল (৪২) দুটে।
[illegible] ইরিত্তিক (৪৩)
ছুটে॥
[illegible] (৪৪)।
[illegible] নীলা॥
[illegible] দিয়া চান্দ্।
[illegible] ছান্দ্॥
[illegible] (৪৫) [illegible]
[illegible]
[illegible]॥
[illegible]
[illegible]॥
[illegible]।
[illegible]॥
[illegible] (৪৬) [illegible]
মন।
[illegible] (৪৭) [illegible] হয় না
মন॥
[illegible]।
[illegible] (৪৮) উড়ে [illegible] (৪৯)
ফুলের গায়॥"

এইরূপ প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে কৃষ্ণের আকুল-করা বাঁশী বাজিয়া উঠিল। কেবল রাসপূর্ণিমার জ্যোৎস্নার প্লাবনেই নয়, বাঁশীর সুরের প্লাবনে আকাশ-পাতাল জাতিকুল সব ভাসিয়া গেল :—

"এমন [illegible] নদীর কূলে বাঁশীতে দিল শান্।
[illegible] মালা চিকন কালা, করে রাধা গান॥
বাঁশীর সুরে ভাসিয়া গেল আকাশ পাতাল
মাটি।
জাতি, কুল, ধরম, করম, ভাসিল সব মাটি॥
রূপসী যতেক ছিল, ব্রজের বউরী।
সকলে বাহির হৈল, নাই কেউ বৈরী॥
সকলে মিলিল আসি' নিকুঞ্জের বনে।
ডালি ভরি' ফুল তুলি আনে জনে জনে॥
ফুলের কঙ্কণ পরে, ফুলের নেপুর (৫০)।
ফুলের হার, ফুলে তাড়, সবে ভরপুর॥
কানে দিল ফুলের কুণ্ডল, মাথাত ফুলের
সিঁথি।
ফুল-সাজে সাজিল যতেক ব্রজের যুবতী॥"

অতঃপর ব্রজগোপিনীগণ কৃষ্ণকে জব্দ করিবার জন্য নানারূপ ফন্দী আঁটিতে লাগিলেন। এই স্থানে এবং অন্যত্রও স্থানে স্থানে কবি আদি রসের ও তরল ভাবের একটু বাড়াবাড়ি করিয়াছেন। কৃষ্ণ গোপিনী-গণের যুক্তি আড়াল হইতে শুনিতে পাইয়া রসভূয়িষ্ঠ ভাষায় যথোপযুক্ত উত্তর দিলেন। কৃষ্ণের কথা শুনিয়া গোপিনীগণ হাসিয়া মাটিতে লুটাইতে লাগিলেন।

"কানাইর কথা শুনি হাসিয়া আটখান্।
এ পড়ে উহার গায়ে, ছুটে রসের বাণ॥
যতেক গোপিনী ছিল, তত হৈল কানু।
নাচিতে লাগিল সবে, ডগমগ তনু॥
পায়ের নেপুর বাজে, হাতের কঙ্কণ।
মধুর বাঁশরী বাজায় মদনমোহন॥
নাচিতে নাচিতে উঠে রসের তরঙ্গ।
মধুর শব্দে বাজে রসের মৃদঙ্গ॥
ভুবন ভরিয়া গেল এ রসের গানে।
ভাঙ্গিল শিবের ধ্যান, উঠে দেবী সনে॥
* * *
নাচিছে গোপিনীগণ নাচার নাই শেষ।
খুলিল মাথার খোপা, আউলাইল কেশ॥
ঘামে (৫১) সবার মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম।
আপনি [illegible] তাহা মুছাইল শ্যাম॥
[illegible] নাচিতে সবার ছিঁড়িয়া গেল ডুরি।
[illegible] কাঁচুলি, আর খইসে যত শাড়ী॥"

ইহার পর কবি কৃষ্ণ ও গোপিনীগণের এই রাসলীলার মিলনকে এক অতি উচ্চ ও মহান্ ভাবের স্তরে পৌঁছাইয়া দিয়াছেন। কৃষ্ণ যেন গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ জল-বিশিষ্ট সমুদ্র এবং গোপিনীগণ নদী। এই সব নদী যেন সমুদ্রে মিলিত হইয়া আপন আপন সত্তা হারাইয়া ফেলিয়াছে।

"সোগ্‌গু (৫২) জল, কোন ঠাঁই নাই।
সমুদ্দুর হইছে আজ আপনি কানাই॥
আদি নাই, অন্ত নাই, নাই কুল-কিনার।
এ সমুদ্রে ঝাঁপ দিলে উঠে শক্তি কার॥
গণিতে না পারি কত আসিছে কামিনী।
সোগ্‌গুলি হইছে নদী যতেক গোপিনী॥
রসের বাতাসে আজ উঠিছে হিল্লোল।
রাসের সমুদ্দুরে বাড়িছে কল্লোল॥
* * *
শত শত গোপিনী-গাঙেরে সঙ্গে করি'।
ভাসেরা (৫৩) ভুবন ধায় গঙ্গা,—হরি হরি॥
ঝম্প দিয়া পড়ি' মিশে সেই কালো জলে।
রতিরাম দাস রাস গায় কুতূহলে॥"

রতিরামের 'কৃষ্ণ ধামালী' পালা এই-খানেই শেষ হইয়াছে। পালাটির এই প্রধান অংশের পর কবি উত্তর বঙ্গের ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক পরিচয় এবং তৎসহ আত্মপরিচয় দান করিয়া ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কর্তৃক নিযুক্ত রংপুরের ইজারদার দেবী সিংহের অমানুষিক, নৃশংস অত্যাচার কাহিনী ও তৎপর রংপুরের প্রজাবিদ্রোহের অন্যতম ও প্রধান অধিনায়ক ইটাকুমারীর রাজ-কল্প ভূম্যধিকারী শিবচন্দ্র রায়ের কীর্তি-গাথা বিবৃত করিয়াছেন। চারণ কবি রতিরাম কর্তৃক বিবৃত দেবী সিংহের এই অত্যাচার কাহিনী সম্বন্ধে অধুনা-প্রকাশিত এক প্রবন্ধে আলোচনা করিয়াছি।

রাজতুল্য ভূম্যধিকারী শিবচন্দ্রের বংশধরগণ অদ্যাপি ইটাকুমারী গ্রামে বসবাস করিতেছেন। প্রায় সতের বৎসর পূর্বে গাথা-সংগ্রহ ব্যপদেশে কবির এই জন্মভূমিতে গমনের এবং এই জমিদার গৃহে আতিথ্য লাভের সুযোগ হইয়াছিল। বর্তমান জমিদার গোপালবাবু গাথা-সংগ্রহ ব্যাপারে নানাভাবে এবং তাঁহাদের বংশের একটি বংশপত্রিকা দানে আমাকে যেরূপ আনুকূল্য করিয়াছিলেন, তাহা আজীবন কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করিব।

'ধামালী' অর্থে যেরূপ অশ্লীল বা তরল রুচির গান বুঝায়, রতিরামের 'কৃষ্ণ-ধামালী' ঠিক সেরূপ পর্যায়ের নহে। বরং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে মৎ কর্তৃক প্রদত্ত 'জাগ্-গানের' অন্তর্গত 'কৃষ্ণ-ধামালী' স্থানে স্থানে এতদূর অশ্লীলতা দোষে দুষ্ট যে, তাহা লিখিতে স্বতঃই লেখনী কুণ্ঠিত হয় এবং আমাকে সেই সব স্থান পরিবর্জন করিতে হইয়াছে। রতিরাম স্থানে স্থানে আদি রস লইয়া একটু বাড়াবাড়ি করিতে যাইয়াই সতর্ক হইয়াছেন এবং সুকৌশলে তরলভাব এড়াইয়া তাঁহার গীতিকার সুর উচ্চভাবের উদাত্ত স্বর-গ্রামে বাঁধিয়া লইয়াছেন।

মূল 'কৃষ্ণ-ধামালী' পালার শেষাংশে তিনি উচ্চ দার্শনিক তত্ত্বেরও আভাস দিয়াছেন। রাস-লীলায় কৃষ্ণের সহিত রস-আবেশে রোমাঞ্চিতা, পুলক-বিহ্বলা গোপিনীগণের মিলন ব্যাপারের সহিত জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার মিলন এবং ভগবৎ সত্তার সহিত মুমুক্ষু জীবগণের লয়প্রাপ্তি বা নির্বাণের উপমা রতিরাম উচ্চস্তরের কবি-কুশলতার সহিত দান করিয়াছেন। আমাদের এই গ্রাম্য কবি, যখন ইংরেজি শিক্ষা এদেশে প্রচলিত হয় নাই, তখনও যে ইতিহাস, ভুগোল ও দর্শনশাস্ত্রে বিশেষ প্রাজ্ঞ না হইলেও নিতান্ত যে অজ্ঞ ছিলেন না, তাহা তাঁহার এই 'কৃষ্ণ-ধামালী' গীতিকা হইতে জানা যায়।

---

(৫১) ঘামে; (৫২) সব, সকল; (৫৩) ভাসাইয়া।

রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন

- শ্রীপ্রমথ নাথ বিশী -

মিঃ ভকিল

জাহাংগীর ভকিল ইঁহাদের পরে আসেন। নি অক্সফোর্ডের উচ্চ ডিগ্রিধারী। পাশ রিবার পরে 'ইণ্ডিয়ান এডুকেশন সার্ভিসে' বেশের সুযোগ পাইয়াছিলেন, কিন্তু দেশের কাজ করিবার ইচ্ছা থাকাতে এই রাজকীয় চাকুরিতে তিনি প্রবেশ করেন নাই। কিল পত্নী ও ছোট্ট একটি মেয়েকে লইয়া আশ্রমে আসিলেন। তিনি ইংরেজি ও র্শনশাস্ত্র পড়াইতেন।

ভকিল ইংরেজিতে সুন্দর কবিতা লখিতেন। শেষে বাঙলা শিখিয়া বাঙলাতেও কবিতা লিখিতেন। তাঁহার সংগে আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব হইয়াছিল।

বিদ্যা, বুদ্ধি, কাণ্ডজ্ঞান ও ধর্মজ্ঞানের সমন্বয় তাঁহার চরিত্রে ছিল। বাহির হইতে তাঁহাকে দেখিলে cynic বলিয়া মনে হইত, কিন্তু বস্তুত তাহা নয়। মল্লিকজীর মত সকলের সংগে তিনি সমানভাবে মিশিতে পারিতেন না, কেবল নিজের ভাবে ভাবিত স্বল্পসংখ্যক লোকের সংগেই তাঁহার ঘনিষ্ঠতা হইত।

এমন দিন যাইত না যেদিন চারবেলার মধ্যে একবেলা তাঁহার বাড়িতে আমার আহার না জুটিত।

আশ্রম পরিত্যাগের পরে বোম্বাই শহরে ছোট একটি বিদ্যালয় তিনি স্থাপন করিয়া চালনা করেন। সম্প্রতি তিনি বিদ্যা-চর্চার চেয়ে ধর্ম-সাধনার দিকেই বেশী ঝুঁকিয়াছেন।

ভীমরাও শাস্ত্রী

পণ্ডিত ভীমরাও শাস্ত্রী, জাতিতে মারাঠী, বেঁটে, মোটা, মেদচিক্কণ দেহ। বিশ্বভারতী স্থাপিত হইবার অনেক আগে তিনি আসিয়াছিলেন। পণ্ডিতজী প্রাচীন ভারতীয় সংগীতের শিক্ষক ছিলেন, সংস্কৃতও পড়াইতেন।

সংস্কৃত অভিনয়ে তিনিই আমাদের হাতে খড়ি দেন—এ বিষয়ে তাঁহার বিশেষ উৎসাহ ছিল। তাঁহারই শিক্ষায় ও উৎসাহে আমরা অনেকবার কৃতিত্বের সংগে একাধিক সংস্কৃত নাটক আশ্রমে অভিনয় করিয়াছি। এখন তিনি কোলহাপুরে সংস্কৃত ও সংগীতের প্রধান শিক্ষক।

বিশ্বভারতী স্থাপিত হইলে ইউরোপ হইতে অনেক প্রসিদ্ধ পণ্ডিত শান্তি-নিকেতনে আসেন, কিন্তু সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে তাঁহাদের সংগে আমার পরিচয় ছিল না। পণ্ডিত বা পাণ্ডিত্য কোতূহল বাড়াইলেই তাঁহাদের কাছে আসিত। একবার কেবল দলবৃদ্ধির জন্য Sylvian Levi-র সাধারণ ক্লাসে গিয়া আমি বসিয়াছিলাম। সেদিন তিনি কথা প্রসংগে বলিলেন যে প্রাচীনকালে পারসীকেরা ময়ূরের মাংস খাইত; ভারতীয়েরাও ময়ূরের মাংসের স্বাদের কথা অবগত ছিল, সে মাংস অতি সুস্বাদু।

ফলে, তার পর দিনে আশ্রমের পোষা ময়ূরটিকে আর দেখা গেল না। সবাই বলিল শিয়ালে খাইয়াছে। হইতেও বা পারে। কিন্তু নবলব্ধ মাংসতত্ত্ব যে এই অন্তর্ধানের মূলে নাই তাহাই বা কেমন করিয়া নিশ্চিত হইব।

শান্তিনিকেতনের উৎসব

শান্তিনিকেতনে বার মাসে তের পার্বন। এই সব উৎসবকে অহৈতুক বা ভাববিলাস মনে করিবার কারণ নাই। প্রাত্যহিক নিয়মের চিহ্নিত পথ হইতে অভ্যাসের জড়তাগ্রস্ত মনকে জাগাইয়া রাখিবার জন্যই এগুলির আবশ্যক; তন্দ্রিত মনের চেয়ে মানুষের বড় বিপদ আর কি হইতে পারে!

ঋতু উৎসবগুলি শান্তিনিকেতনের জীবনের প্রধান অংগ। বর্ষশেষ, বর্ষারম্ভ, বর্ষামঙ্গল, শেষবর্ষণ, শারদোৎসব, নবান্ন, শ্রীপঞ্চমী, বসন্তোৎসব তো গোড়া হইতেই ছিল; শেষের দিকে হল-চালনা, বৃক্ষরোপন প্রভৃতি প্রাচীনকালের উৎসবও সমারোহের সংগে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই সব অনুষ্ঠানের রাখীবন্ধন প্রভৃতিও মানুষকে একসূত্রে গ্রথিত করিবে বলিয়া রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস ছিল।

এখানকার উৎসবের বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে এগুলি প্রকৃতিমুখী; ইহার ক্রমবিকাশ ও পরিণতি ঋতু-উৎসবের দিকেই নিশ্চিত গতি। ইহার সম্যক রূপ অবগত হইতে হইলে ইহার সংগে রবীন্দ্রনাথের কবি-জীবনকে মিলাইয়া লইয়া দেখিতে হইবে। তাঁহার কবি-জীবনের সংগেই সমান তালে পা ফেলিয়া শান্তিনিকেতনের জীবন চলিয়াছে। রবীন্দ্র-জীবন ও শান্তি-নিকেতন একই প্রবাহের সমান্তরাল দুই তটরেখা, একটিকে ছাড়িয়া অপরটির দর্শন একদেশ দর্শন মাত্র।

রবীন্দ্রনাথের জীবনের চল্লিশ হইতে পঞ্চাশের কোঠা, নৈবেদ্য, খেয়া, স্বদেশী আন্দোলনের প্রবন্ধাদি, গোরা, গীতাঞ্জলি দ্বারা চিহ্নিত, শান্তিনিকেতনের প্রতিষ্ঠা ও ব্রহ্মচর্যাশ্রম সেই যুগের সৃষ্টি। আবার পঞ্চাশের পরে যখন বৃহত্তর রবীন্দ্রনাথের উদ্ভব, বলাকা, ফাল্গুনীর যুগ, বিশ্ব-ভারতীর সৃষ্টি সেই যুগধর্মানুযায়ী। ইহার পরবর্তী রবীন্দ্র-জীবনের [illegible] করিলে দেখা যায় তাঁহার সমগ্র প্রতিভা-প্রবাহ মানুষ ও ভগবানের দুই উপকূলের দ্বারা সীমায়িত প্রকৃতির উপসাগরের মধ্যে দিয়া যেন আত্মবিসর্জন করিয়াছে। প্রকৃতির মধ্যেই মানুষ ও ভগবানের সমন্বয় তিনি উপলব্ধি করিয়াছেন। বলাকার পরবর্তী তাঁহার অধিকাংশ কাব্য ও সংগীত এই সমন্বয়ের সাক্ষ্য বহন করিতেছে। তাঁহার বাল্যকালের প্রকৃতি-প্রীতি শেষ বয়সে [illegible] অর্থলাভ করিয়াছে। অবশ্য এই পরিণতি তাঁহার কাব্যে অনুধাবন করা যায়, কিন্তু ইহার [illegible] প্রত্যক্ষতর ক্ষেত্র শান্তিনিকেতন। শান্তিনিকেতনের ঋতু-উৎসবের ক্রমবিকাশ [illegible] রবীন্দ্র-জীবনের প্রকৃতির সহিত [illegible] মিলনের ক্রমবিকাশ মাত্র। এই দিক দিয়া বিচার করিলে রবীন্দ্রনাথের ধর্মকে এক প্রকার আধ্যাত্মিক প্রকৃতিবাদ বলা যাইতে পারে।

এখানে আর এক শ্রেণীর উৎসব আছে যাহা প্রধানত মানব সম্পর্কিত। ইহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পৌষ-উৎসব; ৭ই পৌষ মহর্ষির দীক্ষা দিন; ৮ই পৌষ আশ্রমের প্রতিষ্ঠা দিন।

আনন্দবাজার নামে একটা মেলা মাঝে মাঝে এখানে বসিত। ছেলেমেয়েরা ছোট ছোট দোকান খুলিত; তাহারাই ক্রেতা তাহারাই বিক্রেতা; যে-টাকা লাভ হইত আশ্রমের দরিদ্র-ভাণ্ডারে তাহা প্রদত্ত হইত। রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত থাকিলে এই মেলায় তিনি বেড়াইতে আসিতেন। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা তাঁহার মত নিরীহ খরিদ্দার পাইয়া খুশি হইত। অপরে যাহা কিনিত না সেই সব জিনিস তাঁহার হাতে দিয়া দাম আদায় করিয়া লইত। একবার একটি

বেল তিনি চার আনা দিয়া কিনিবামাত্র মেলার সব বেলের দর চড়িয়া গিয়া আপেলের দরে বিক্রীত হইতে লাগিল।

এইরকম একটা উপলক্ষ্যে একবার রামানন্দবাবুর কনিষ্ঠ পুত্র মুলু ও আমি একটা ঐতিহাসিক প্রদর্শনী খুলিয়াছিলাম। তাহাতে রামের খড়ম, সীতার চিরুণী, চণ্ডীদাসের হস্তাক্ষর প্রভৃতি সব বিস্ময়কর ঐতিহাসিক বস্তু ছিল। লোকে উৎসাহের সংগে উচ্চ দর্শনী দিয়া ঢুকিয়া জিনিসগুলি দেখিল। দর্শকরা একেবারে প্রতারিত হয় নাই। রাম মানে রামানন্দবাবু; সীতাদেবী তাঁহার কন্যা, আর চণ্ডীদাস আমাদের পাকশালার একজন পাচক। ইঁহাদের খড়ম, চিরুণী ও হস্তাক্ষর দেখিয়া বোধ করি ঐতিহাসিক প্রদর্শনীমাত্রেরই প্রতি তাঁহাদের অবিশ্বাস জন্মিয়া গিয়াছিল।

মাঝে মাঝে অকালে উৎসব পণ্ড হইয়া যাইত, এমন একটা ঘটনা অন্তত আমার মনে আছে।

সেবারে বসন্তোৎসব খুব ধুম করিয়া হইবে স্থির হইল। রবীন্দ্রনাথ নূতন গানের পালা লিখিয়া গানের দলকে শিখাইয়া তুলিলেন। আম্রকুঞ্জের সভাস্থল আলপনা ও আবীরে সজ্জিত হইল; আমের ডালে ডালে বাতির ব্যবস্থা হইল, সকলে পীতবর্ণের ধুতি ও শাড়ি পরিয়া প্রস্তুত হইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল; পূর্ব আকাশে পূর্ণচন্দ্র উঠিলেই সভারম্ভ হইবে। আমরা যখন পূর্ব আকাশে পূর্ণচন্দ্রের প্রতীক্ষা করিতেছিলাম তখন বিধাতা পুরুষ পশ্চিম আকাশে যে আর এক আসর সাজাইয়া তুলিতেছিলেন, তাহা কেহ লক্ষ্য করি নাই। আম্রবাগানের আড়ালে পশ্চিম দিক কখন ঝড়ের মেঘে ভরিয়া গিয়াছে, বাতাস রুদ্ধবক্ষ করিয়া আদেশমাত্রের অপেক্ষা করিতেছিল। কালবৈশাখীর ঝড় যখন বিপুল সমারোহে আসন্ন উৎসবের ঘাড়ের উপরে আসিয়া পড়িল, তখনই প্রথম আমরা জানিতে পারিলাম। তার পরে ঝাপটের পর ঝাপট; ঝড় থামিতেই বৃষ্টি নামিল, বৃষ্টির সাপটের পর সাপট; কয়েক মুহূর্তের মধ্যে আসন্ন উৎসবের ভূমি ও ভূমিকা ঝড়ে জলে একাকার হইয়া গিয়া সে এক করুণ কুঞ্জভঙ্গের পালা। সেদিনকার অগীত উৎসবের অভিজ্ঞতা রবীন্দ্রনাথের একটি গানে বোধ করি আছে।

কিন্তু সাধারণত শান্তিনিকেতনের প্রকৃতি আমাদের উৎসবাদির প্রতি কৃপাপর ছিল; আমাদের প্রায় সমস্ত উৎসবই খোলা আকাশের উৎসব, দেবতার রোষ কদাচিৎ তাহাদের উপর পড়িত।

চোর-ধরা

একবার মেয়েদের বোর্ডিঙে চুরি আরম্ভ হইল। প্রায় প্রতি রাত্রেই চোর আসিত। চোর যে-ই হোক সে অত্যল্প কালের মধ্যে বুঝিয়া ফেলিল চুরির এমন নিরাপদ স্থান অল্পই আছে। চোর যে ধরা পড়িত না, তার প্রধান কারণ চোর পালাইয়া গৃহে পেঁৗছিলে তবে মেয়েরা জাগিয়া উঠিয়া গোলমাল শুরু করিত। এই রকমে কিছুদিন যায়, একদিন মধ্য রাত্রে চোরোত্তর কোলাহল শুনিয়া আমি জাগিয়া উঠিলাম, আমার ঘর মেয়ে বোর্ডিঙের কাছেই ছিল। আমি দেখি বোর্ডিঙের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হেমবালাদেবীকে ঘিরিয়া মেয়েরা জটলা করিতেছে; তাহাদের আলোচনার বিষয় চোরের গন্তব্য দিক্।

আমি শুধাইলাম, ব্যাপার কি?

হেমবালা দেবী বলিলেন, চোর রেললাইনের দিকে গিয়েছে।

সে রাত্রি আবার ঘোর অন্ধকার; এমন নিরেট অন্ধকারে চোরের গন্তব্য স্থান বুঝিয়া নেওয়া সামান্য বুদ্ধির কাজ নয়।

—কিছু নিয়েছে কি?

একসংগে তিন চারটি কণ্ঠস্বর বলিয়া উঠিল—আমার বাক্স।

বুঝিলাম কণ্ঠস্বরের মালিকাদের বাক্সগুলি খোয়া গিয়াছে। এতগুলি বাক্স লইয়া যাওয়া একজন চোরের কর্ম নয়, কাজেই চোর একাধিক আসিয়াছিল।

হেমবালা দেবী বলিলেন, তুমি একটু ওই দিকে এগিয়ে দেখতো।

সর্বনাশ! এতগুলি চোরের সন্ধানে আমি একা, তাহাতে আবার রাত্রি এমন অন্ধকার। কিন্তু 'না' বলা তো চলে না। মানুষের একটা বয়স আছে যখন মেয়েদের কাছে কিছুতেই ভীরুতা প্রকাশ করিতে চায় না। তাই মুখে বলিলাম—তা যাচ্ছি। মনে ভাবিলাম, কাজেই কোথাও কিছুক্ষণ গা ঢাকা দিয়া থাকিয়া আসিয়া বলিব, অনেক খুঁজিলাম, চোর তো পাইলাম না।

হেমবালা দেবী বলিলেন, অন্ধকারে যাবে, এই আলোটা নিয়ে যাও। এই বলিয়া একটা লণ্ঠন আমার হাতে তুলিয়া দিলেন।

আরো সর্বনাশ! অন্ধকারে গা-ঢাকা দিবার সুযোগও গেল! এখন আলো দেখিয়া সকলে আমার গতিবিধি লক্ষ্য করিতে পারিবে, অন্ধকারে গা-ঢাকা দেওয়া আর চলিবে না। কিন্তু বেশিক্ষণ ভাবিবার অবসর ছিল না, অনেকগুলো উৎকণ্ঠিত দৃষ্টি আমাকে খোঁচা মারিতেছিল। কাজেই লণ্ঠন মাত্র সহায় লইয়া গভীর অন্ধকারে, খোলা মাঠের মধ্যে, অনেকগুলি চোরের অভিমুখে আত্মবিসর্জন করিলাম। তবে আমার স্বপক্ষে এইটুকু ছিল যে, মাঠের মধ্যে চোর কোথাও ছিল না, ততক্ষণ তাহারা বোধ করি গৃহে ফিরিয়া সুখনিদ্রায় মগ্ন।

আমি কিছুক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিলাম চোর তো মিলিল না।

অন্ধকারের মধ্য হইতে একটি কণ্ঠ বলিল মাসিমা আমার হাত-বাক্সটা ফেলে গিয়েছে।

আমি বললাম, আজ রাতে ধরা নাই পড়লো, কালকে রাতে ধরা দেবে।

হেমবালা দেবী বলিলেন, কেমন ক'রে জানলে যে কাল আসবে?

—ওই যে হাত-বাক্সটা ফেলে গিয়েছে, ওটার লাভ তো কম নয়।

হাতবাক্সের মালিকার দৃষ্টি অন্ধকার ভেদ করিয়া আমার প্রতি সঙীন চালনা করিল।

পরদিন সকালে চোর ধরিতে পারি নাই, শুনিয়া নেপালবাবু আমাকে গঞ্জনা দিয়া বলিলেন—ও তোর কর্ম নয়। (যেন চোর-ধরা আমার কর্ম বলিয়া আমি ঘোষণা করিয়াছি।) আমাকে ডাকিস, আমি চোর ধরবো। (যেন সারা জীবন তিনি চোর ধরায় হাত পাকাইয়াছেন।) কয়েকদিন পরে আবার চোর আসিল। সেদিন জ্যোৎস্না রাত। স্পষ্ট বোঝা যাইতেছে চোরের সাহস ক্রমে বাড়িয়া গিয়াছে, এখন আর কৃষ্ণ পক্ষের জন্য সে অপেক্ষা করে না। নেপালবাবুর কথা আমার মনে ছিল। আমি তাঁহাকে খবর দিলাম। তিনি খড়ম পড়িয়া খট্ খট্ করিতে করিতে কোঁচার কাপড় কোমরে জড়াইয়া চলিয়া আসিলেন। চোর ধরার উপযুক্ত পোষাক বটে। তিনি ঘটনাস্থলে আসিয়াই বলিলেন, চোর ওই দিকে গিয়েছে, চল ধরে আনি। (যেন চোর মুলোর শাক, ক্ষেতে গিয়া উপড়াইয়া আনিবার অপেক্ষা মাত্র।) আমি ও বিভূতি গুপ্ত (বুধবারের আমার সেই যুগ্মসম্পাদক) তাঁহার সংগে চলিলাম। চোর ধরায় আমাদের কোন অভিজ্ঞতা নাই জানিয়াও নেপালবাবু আমাদের যে কেন সংগে লইলেন জানি না, বোধ করি চোরধরার সরল উপায় দেখাইয়া দিবার জন্যই হইবে। তিনি কিছুদূর গিয়াই সোজা খোয়াই-এর মধ্যে নামিয়া পড়িলেন, বলিলেন, চোরের লুকাইয়া থাকিবার এমন স্থান আর নাই। বুঝিলাম চোর নেপালবাবুর দ্বারা হত হইবার জন্যই এখানে বমাল অপেক্ষা করিয়া আছে। খোয়াই-এর মধ্যে উঁচু নীচু ঢিবি, তার গায়ে আবার কাঁকর-ছড়ানো। এতক্ষণে বুঝিলাম নেপালবাবু কেন আমাদের সংগে আনিয়াছিলেন। উঁচুতে উঠিবার সময়ে কাঁকরে তাঁহার খড়ম ফস্কিয়া হড় হড় করিয়া নামিয়া আসে, আর তিনি বলেন, তোরা আমাকে ঠেলে তোল। আমরা দুজনে প্রাণপণে তাঁহাকে ঠেলিতে থাকি। কি আশ্চর্য! তিনি উপরে ওঠেন। আবার নীচে নামিবার সময় বলেন, সাবধান, আমাকে টেনে রাখিস। আমরা প্রাণপণে তাঁহাকে টানিয়া রাখি। তিনি সন্তর্পণে নীচে নামিয়া পড়েন।

এই রকম ভাবে খোয়াই অতিক্রম করিয়া তিনজনে চলিতেছি; একজন চোর ধরিবেন, আর দুইজন চোর-ধরণে-ওয়ালাকে ধরিবেন। সেই জ্যোৎস্না রাত্রে, নির্জন খোয়াই-এ ভাগ্যিস আর কোন দর্শক উপস্থিত ছিল না। আমরা হাসিয়া ফেলিলে তিনি ধমক দিয়া ওঠেন,—হাসছিস্ কেন? এই কি হাসবার সময় হ'ল? চোর যে—হুসিয়ার, টেনে রাখিস্। হাসির সঙ্গে চোরের কি সম্বন্ধ শেষ করিবার আগেই খোয়াই-এর উৎরাই আসিয়া পড়ে, তিনি বলেন, 'হুসিয়ার টেনে রাখিস্'। এই রকমে ঘণ্টা দুই ঘোরা হইল কিন্তু চোর কোথায়? আর চোর কাছেই কোথাও থাকিলেও সেদিকে আমাদের দৃষ্টি দিবার অবকাশ ছিল না। আমাদের দুজনের মনোযোগ তাঁহার নিরাপত্তার দিকে, তাঁহার মনোযোগ আমাদের কর্ত্তব্য বুদ্ধির দিকে, চোরের জন্য আর কিছু অবশিষ্ট ছিল না। মাঝে মাঝে তিনি দাঁড়ান, একাগ্রভাবে কি যেন শোনেন, তার পরে বলেন, 'উঁহু।' কখনো দিক পরিবর্তন করেন; কখনো পিছনে ফিরিয়া চলেন; কখনো বসিয়া বসিয়া কি যেন লক্ষ্য করেন; কখনো মুখে তর্জনী স্থাপন করেন, কখনো ভিজা জায়গায় পায়ের চিহ্ন দেখিয়া রবিনসন-ক্রুসোর মত চমকিয়া ওঠেন; আমরা যদি বলি—ওতো আপনারই খড়মের দাগ, অমনি তাঁহার মুখেচোখে যে কি নীরব ধিক্কার ফুটিয়া ওঠে! তা বটে! আমরা যে এ বিষয়ে নিতান্ত নাবালক! গোয়েন্দা যদি খড়ম পায়ে চোরকে অনুসরণ করিতে পারে, খড়ম পায়ে দিয়া চোরের আসা কি এতই অসম্ভব। এ যেন অভিনব শার্লক হোমসের সঙ্গে যুগল ওয়াট্‌সন।

অবশেষে নেপালবাবুকেও স্বীকার করিতে হইল যে চোর এদিকে আসে নাই। হায়! সংসারে চির-জয়ী কে আছে? ফিরিবার পথেও ওই-ভাবে ফিরিলাম, কখনো তাঁহাকে ঠেলিয়া, কখনো তাঁহাকে টানিয়া। বলা বাহুল্য অন্য রাত্রের মত সে রাত্রেও চোর ধরা পড়িল না কিন্তু অভিজ্ঞতা কম হইল না। ইহার পরে চুরি হইলে নেপালবাবুকে আর খবর দিতাম না, তাহাতে চোরের সুবিধা হইত, কিন্তু আমাদের সুবিধাও কিছু কম হইত না।

যাত্রাগান

যাত্রাগান শুনিতে চিরকাল আমার ভাল লাগে। যাত্রা শুনিবার সুযোগ পাইলেই আমি আসরে গিয়া বসিতাম। বোলপুর শহরে গ্রীষ্মকালে নানা উপলক্ষে যাত্রা অভিনয় হইয়া থাকে। খবর পাইলেই আমি যাইতাম; রাত্রির অন্ধকার বা পথের দূরত্ব কিছুই বাধা মনে হইত না; সারা রাত্রি গান শুনিয়া ভোরে ফিরিয়া আসিতাম। কিন্তু কোনদিন যে নিজেও যাত্রা লিখিব এমন কল্পনাও করি নাই।

হঠাৎ একদিন বিভূতি গুপ্ত বলিল যাত্রা পালা লিখিলে হয়, এই বলিয়া সে একটা পালার লেখা দুই চার পাতা দেখাইল। আমার ভাল লাগিল, পালাটা আমি লিখিয়া শেষ করিয়া ফেলিলাম। পালা তো লেখা হইল এইবার অভিনয়ের কি করা যায়? দু চারজন বন্ধুবান্ধবকে আইডিয়াটা বলিলাম, তাহারাও উৎসাহ অনুভব করিল।

কিন্তু যাত্রা লেখা এক কথা, আর দশজনকে টানিয়া লইয়া অভিনয় করা সে আর এক কথা; সেটা তত সহজ নয়। সৌভাগ্যক্রমে এই সময়ে এমন একজনকে পাইলাম যাঁহাকে আমাদের দলের অধিকারী বলা যাইতে পারে। ইনি নিত্যানন্দ বিনোদ গোস্বামী, সংক্ষেপে গোঁসাইজি। গোঁসাইজি শান্তিপুরের গোস্বামী বংশের সন্তান। বৈষ্ণব শাস্ত্রে ও বৌদ্ধ দর্শনে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য বলিয়া জানিতাম, কিন্তু এখন তাঁহার যে পরিচয় পাইলাম তাহাতে বুঝিলাম তাঁহার রস-জ্ঞান পাণ্ডিত্যের চেয়ে কম নয়; গানে বাজনায়, অভিনয়ে, সাহিত্যালোচনায় রসে ভরপুর—একেবারে মালপোয়ার মত। তাঁহার উপরেই প্রযোজনার ও অভিনয় শিক্ষার ভার পড়িল, তিনি দলের অধিকারী হইয়া দাঁড়াইলেন।

নাটক ও যাত্রা সাহিত্যের মধ্যে সব চেয়ে জটিল শিল্প, তাহার একদিকে লেখক, অন্য দিকে দর্শক, কিন্তু মাঝখানে আছে অভিনেতা, প্রযোজক, গায়ক, নর্তক, মঞ্চসজ্জাকর, চিত্রশিল্পী। এতগুলি লোকের সমবেত চেষ্টায় লেখকের রস সম্পূর্ণ উদ্বোধিত হইয়া তবে দর্শকের কাছে পৌঁছায়, তাহাদের চেষ্টার সফলতায় রসের সার্থকতা; তাহাদের চেষ্টা বিফল হইলে ভালো লেখাও ব্যর্থ হইতে পারে। যথার্থ নাটক যৌথশিল্প, কেবলমাত্র ব্যক্তিগত শিল্প নয়।

এখন লোক পরিচালনায় আমার কিছুমাত্র শক্তি নাই, আমি একা চলিতে পারি, পাঁচজনকে লইয়া চলিতে জানি না, আর একা চলিতে গেলে পাঁচজন যেস্থানে যাইবে খুব সম্ভবত আমি তাহার বিপরীত পথ ধরিয়া বসিব। এরূপ ক্ষেত্রে গোঁসাইজিকে না পাইলে পালা লেখাই হইত, অভিনয়ের আসর পর্যন্ত গিয়া পৌঁছিত না। কাজেই যাত্রা পালাগুলির অভিনয়ের জন্য প্রধান কৃতিত্ব গোঁসাইজির।

অভিনেতার দল জুটিয়া গেল। কাজ বড় কম নয়, গান লেখা, গানে সুর দেওয়া, ছেলেদের শেখানো, বাদক সংগ্রহ, অভিনয় শিক্ষা; কিন্তু আশ্রমের সব শ্রেণীর লোকের এমন উৎসাহ যে কোন কাজই কঠিন বলিয়া মনে হইল না; এমন কি জগদানন্দ-বাবুর মত প্রবীণ লোক ও তেজেশবাবুর মত গম্ভীর লোকও অভিনয়ের দিন আলখাল্লা পরিয়া বেহালা হাতে করিয়া আসরে নামিলেন। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও মাঝে মাঝে খোঁজ লইতেন, আমাদের পালা গানের অভ্যাস কি রকম অগ্রসর হইতেছে।

তারপর একদিন রাত্রে আশ্রমের প্রাঙ্গণে আসর বাঁধিয়া, সামিয়ানা টানাইয়া, আলো জ্বালিয়া অভিনয়ের উদ্যোগ হইল। দর্শকদের মধ্যে সকল শ্রেণীর লোক ছিল, চাকর বাকর হইতে আরম্ভ করিয়া স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত। তিনি আসরে বসিয়া ধৈর্যের সঙ্গে আগাগোড়া শুনিয়াছিলেন।

আমাদের প্রথম পালার নাম 'বীরভূমেশ্বর পরাজয়'। কাহিনীটার খানিকটা পৌরাণিক খানিকটা কাল্পনিক। রামচন্দ্রের অশ্বমেধের অশ্ব যেন বীরভূমে আসিয়া প্রবেশ করিয়াছে; বীরভূমের রাজা সেই অশ্ব ধরিয়াছেন; তাঁহার সঙ্গে রামচন্দ্রের যুদ্ধ ও বীরভূমেশ্বরের পরাজয়। এখন রামচন্দ্রের অনুচরদের মধ্যে প্রধান হনুমান। হনুমান সাজিবে কে? বাঙলা দেশের বাহিরে হনুমানের অসীম প্রতিপত্তি; অবাঙালী পিতা পুত্রের নাম হনুমান প্রসাদ রাখিয়া গৌরব অনুভব করে, কিন্তু এমন সাহস কোন বাঙালী পিতার নাই। কাজেই হনুমান সাজিতে কেহ রাজি হয় না। তখন মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত (যিনি এই রচনা অলংকরণ করিতেছেন) অকুতোভয়ে হনুমানরূপে অলংকৃত হইয়া আসরে অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহার অভিনয় এমন স্বাভাবিক হইয়া ছিল যে তাহাতে মুগ্ধ হইয়া শিল্পীগুরু নন্দলাল বসু মণীন্দ্রভূষণকে আসরের মধ্যেই একটি পদক দিয়া সম্মানিত করিয়াছিলেন। বিভূতি গুপ্ত ও সরোজ-রঞ্জনের তলোয়ার খেলা দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইয়া গিয়াছিল। গোঁসাইজি ও লেখকের জন্য এক জোড়া কমিক ভূমিকা ছিল। Burlesque জাতীয় অভিনয়ে গোঁসাইজির অসামান্যতা ছিল।

(শেষাংশ ২৮৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

অন্য কোনো পৃথিবী

শ্রীগোরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বি, এস-সি

আমার পৃথিবী তুমি বহু বরষের;
তোমার মৃত্তিকাসনে
আমারে মিশায়ে ল'য়ে অনন্ত গগনে
অশ্রান্ত চরণে, করিয়াছ প্রদক্ষিণ
সবিতৃমণ্ডল, অসংখ্য রজনী দিন
যুগযুগান্তর ধরি'।—

কবির ভাষায় বৈজ্ঞানিকের মতবাদ, বিজ্ঞানীর প্রমাণ ও আবিষ্কার ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরেছে। কিন্তু বিজ্ঞানীর আবিষ্কার-ক্ষমতা ও উদ্ভাবনী শক্তি এখানেই ক্ষান্ত হয়নি। সকল গ্রহ উপগ্রহই আমাদের পৃথিবীরই মতন, কোনোটা বা বড় কোনোটা আবার ছোট এবং প্রত্যেকটিই পৃথিবীরই মত অবিরাম, অবিশ্রামভাবে দুর্বার বেগে সূর্যের চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করে চলেছে—এ রহস্যও বিজ্ঞানীর কাছে যেদিন আর অজানা রইলো না, সেদিন থেকে তাঁর সকল জিজ্ঞাসা, অশান্ত কৌতূহল আরো দুর্গম পথে ধাবিত হয়েছে। তাঁর মনে প্রশ্ন জেগেছে, পৃথিবীর "অন্তরে যে জীবন-রসধারা অহর্নিশি ধরে করিতেছে সন্তরণ" গ্রহ উপগ্রহ কি সে "জীবন-রসধারা"র সম্পদে সম্পদশালী নয়? "এ-আকাশ, এ-ধরণী, এই নদী' পরে শুভ্র শান্ত সুপ্ত জ্যোৎস্না-রাশি"—এই যে অনির্বচনীয় দৃশ্য এ কি শুধু আমাদের পৃথিবীরই একান্ত নিজস্ব, অন্য কোথাও কি এ দৃশ্য পুরাতন নয়? সেই গ্রহ উপগ্রহেও কি—

আছে কি হোথায় নবীন জীবন,
আশার স্বপন ফলে কি হোথায়,
সোনার ফলে?

প্রশ্নের পর প্রশ্ন তাঁদের নাড়া দিয়ে গেছে। উত্তরও বড় সহজে পাওয়া যায়নি। "বাহিরিয়া জগতের মহাদেশ মাঝে অতি দূর দূরান্তর জ্যোতিষ্ক সমাজে সুদুর্গম পথে"—বিজ্ঞানীরা এ প্রশ্নের আংশিক উত্তর পেলেও আজো তাঁরা সন্তুষ্ট হ'তে পারেন নি।

অক্সিজেন আর জল—এই দুটো বাদ দিয়ে কোনো প্রাণীর অস্তিত্বের কথা আমরা কল্পনায়ও আনতে পারি না। এ ছাড়া রাসায়নিক নিয়মে শৈত্যেরও এমন একটা পরিমাণ আছে যে পর্যন্ত মানুষেরই মত কোনো জীব সকল সক্রিয়তা, সজীবতা ও কর্মক্ষমতা বজায় রাখবার জন্য তা' সহ্য ক'রে থাকতে পারে; তেমনি আবার কোনো প্রাণীর পক্ষেই চুল্লী অর্থাৎ ফার্নেসের প্রবল ও প্রচণ্ড উত্তাপ সহ্য করা একেবারেই সম্ভব নয়। তবু প্রচণ্ডভাবে উত্তপ্ত গ্রহ অপেক্ষা বেশ ঠাণ্ডা গ্রহে জীবনের অস্তিত্ব অনেকটা সহজ এবং স্বাভাবিক। এখানে শুধু যে সম্ভাবনাই বৃহৎ তা' নয়, গ্রহ-জগতের ইতিহাসও এই কথাই বলে। নক্ষত্রের তাপ কমার সঙ্গে সঙ্গেই গ্রহও তাপ হারায়, কারণ প্রত্যেক গ্রহেই সেখানকার নক্ষত্রই সূর্যের কাজ করে। সুতরাং যদি ধ'রে নিই কোনো উত্তপ্ত গ্রহে এখন জটিল ধরণের জীবনের অস্তিত্ব বিদ্যমান, তবে এটাও নিশ্চয় ক'রে বুঝে নিতে হবে যে, সেখানে সুপ্রাচীন অতীতে এর চেয়েও ভীষণ ও অসহনীয় পারিপার্শ্বিক ও অবস্থার মধ্যে এখনকার চেয়ে সহজ সরল প্রাণীর বাস ছিলো, তাদের আত্মরক্ষা ও প্রতিরোধের প্রয়োজনের তুলনায় শক্তি ছিলো কম। আবার যদি কল্পনা করি যে, বেশ অনুকূল ও সহজ অবস্থার মধ্যেই কোনো গ্রহে জীবনযাত্রা শুরু হয়েছে তবে সেখানকার ক্রমবর্ধমান শৈত্যের সঙ্গে অধিবাসীরা মানিয়ে ক্রমশ খাপ খাইয়ে নিয়েছে এবং নিচ্ছে, এও খুবই সত্য। ধরা যাক্, এখন থেকে কোটি কোটি বছর পরে সূর্যের উত্তাপ একেবারে নিঃশেষে ফুরিয়ে যাচ্ছে (প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানী স্যার জেমস জীনস্ একে অবশ্যম্ভাবী ও অপরিহার্য ব'লে মত প্রকাশ করেছেন, সেই জন্যে সূর্যকে তিনি "The dying sun" অর্থাৎ "ম্রিয়মান সূর্য" বলে অভিহিত করেন)। তখন এমন কি বিষুবরেখাও নিরন্তর কঠিন বরফে আচ্ছন্ন। এ রকম অবস্থা ও পরিবেশ আপাতভাবে অস্বাভাবিক ও ভীষণ ঠেকলেও তখনও কি মানুষের পক্ষে এই পৃথিবীতেই সাফল্য ও সম্ভাবনাময় শান্তিপূর্ণ অস্তিত্ব বজায় রাখা সম্ভব হবে না? তখন প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ভূগর্ভস্থ শহর তৈরী ক'রে সেখানে বাস ক'রেও কি মানুষ রেহাই পাবে না? নিরন্তর সূর্যকিরণের অভাব দূর করবে তখন বেগনী-পারের আলো। জীবজন্তু, গাছপালা সেই দুর্দিনের পূর্বেই হয়ত ভূপৃষ্ঠ থেকে অদৃশ্য হ'তে পারে, কিন্তু ভূগর্ভস্থ ঐ নতুন জগতে তাদের বাঁচা ও প্রবৃদ্ধি কেনই-বা সম্ভব হবে না, যদি ভাবীকালের বিজ্ঞানীরা খুসীমত সেই জগতে অবিরাম বসন্ত, গ্রীষ্ম অথবা শরৎ কালকে ধ'রে রাখতে পারেন? তাছাড়া গাছ-পালা বা জীবজন্তুর কোনো দরকারই হয়ত তখন আর নাও থাকতে পারে। মানুষের যাবতীয় দৈনন্দিন প্রয়োজন তখন হয়ত বিজ্ঞানীর ল্যাবরেটরী একাই মিটাতে থাকবে। এই যদি পৃথিবীর মানুষের পরিণামের বাস্তব ভবিষ্যদ্বাণী হয় তবে যে-সকল গ্রহে তাপমান যন্ত্রে কখনো ১০০° ডিগ্রীর বেশী ওঠে নি, সেখানে আমাদেরই সমান বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন (কে বলতে পারে, হয়ত বেশীও হ'তে পারে!) কোনো জাতের পক্ষে অন্ততঃপক্ষে প্রাণটা ধারণ ক'রে থাকা এখনো খুবই সম্ভব।

আমাদের সৌরজগতের মধ্যে খোঁজ নিলে দেখা যায়, সূর্যের সবচেয়ে কাছে বুধ এতো বেশী উত্তপ্ত যে, এর পৃষ্ঠে এমনকি দস্তাও গ'লে যাবে। প্রকাণ্ড দুটো গ্রহ বৃহস্পতি আর শনি আবার এতো বেশী ঠাণ্ডা ব'লে জানা গেছে যে, সেখানে কোনো হিসেবেই জীব ও জীবনের অস্তিত্ব সম্ভব নয়। ইউরেনস্, নেপচুন আর ছোট্ট প্লুটো—এই সব বহির্গ্রহগুলি কল্পনাতীতভাবে শীতার্ত। আর বাকী রইলো পৃথিবীর দু'পাশের সবচেয়ে কাছাকাছি প্রতিবাসী গ্রহ—মঙ্গল ও শুক্র; প্রথমটি সম্বন্ধে বহু বছর ধ'রে কল্পনা ও গবেষণার অন্ত নেই, আর দ্বিতীয়টি চিররহস্যাবৃত।

মঙ্গল গ্রহের দিনরাত আমাদের পৃথিবীর দিনরাতের চেয়ে একটু বড়ো। আর এই গ্রহটি সূর্য থেকে যথেষ্ট দূরে আছে ব'লে এতটা তাপ পায় না, যাতে হাওয়ার পরমাণু গরমে উধাও হ'য়ে চলে যেতে পারে। কিন্তু তার হাওয়াতে কোন্ কোন্ বাষ্পের মিশেল আছে, এখনো তা' স্থির জানা যায় নি। শীতকালে মঙ্গল গ্রহের মেরুদেশে খানিকটা সাদা আলো দূরবীনে চোখে পড়ে, গরমিকালে সেটা আর দেখা যায় না। অতএব ওটা যে বরফের আভাস, সেকথা ধ'রে নেওয়া যেতে পারে। মঙ্গল গ্রহকে নিয়ে পণ্ডিতে পণ্ডিতে একটা তর্ক চলছে অনেকদিন ধ'রে। একদা একজন ইতালীয় বিজ্ঞানী মঙ্গলে লম্বা লম্বা আঁচড় দেখতে পেলেন, বললেন, নিশ্চয়ই এ-গ্রহের বাসিন্দেরা মেরুপ্রদেশ থেকে বরফ-গলা জল পাবার জন্যে খাল কেটেছে। আবার কোনো কোনো বিজ্ঞানী বললেন, উঁহু, ওটা চোখের ভুল। ইদানীং জ্যোতিষ্ক-লোকের দিকে মানুষ ক্যামেরা চালিয়েছে। সেই ক্যামেরা-তোলা ছবিতেও কালো দাগ দেখা দিয়েছে। কিন্তু ওগুলো যে কৃত্রিম খাল, আর বুদ্ধিমান জীবেরই কীর্তি, সেটা নিতান্তই আন্দাজের কথা। অবশ্য এ-গ্রহে প্রাণী থাকা অসম্ভব নয়, কেননা, এখানে হাওয়া জল আছে।

পৃথিবীর নিরিখে দেখলে মঙ্গলকে বরং ঠাণ্ডা ব'লেই মনে হবে। দিনের বেলায় সর্বোচ্চ তাপ ওঠে ৫০° ফারেনহীট, আবার সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে এই তাপ কমতে কমতে সমস্ত রাত ধ'রে ১৫০° ডিগ্রীর কাছাকাছি কমে যায়। রাতের এই শৈত্যের হাত থেকে নিস্কৃতি পাবার জন্যে আমাদের মঙ্গলগ্রহের প্রতিবাসীরা (যদি অবশ্য তাদের থাকা সম্বন্ধে আমরা সন্দিহান না হই!) উপযুক্ত উপায়ই নিশ্চয় অবলম্বন করেছে। কাজেই এখানকার উত্তাপের পরিমাণ নিয়ে যতই মতদ্বৈধ থাকুক, জীবনের অস্তিত্বোপযোগী উষ্ণতামণ্ডলে যথেষ্ট। সেখানে বায়ুমণ্ডলের বিদ্যমানতারও একাধিক প্রমাণ মিলেছে। পৃথিবী থেকে দেখা যায়, এর গায়ে যে আঁচড়গুলি আছে, তা' মঙ্গলগ্রহের ধারের দিকটাতে তত বেশী স্পষ্ট নয়, তার কারণ তখন আমরা আঁচড়গুলি দেখছি তির্যকভাবে অর্থাৎ মঙ্গলের বায়ুমণ্ডলের অনেকটা দৈর্ঘ্যের ভিতর দিয়ে। এখানে বায়ুমণ্ডলের জলীয় বাষ্প নিয়ে প্রামাণ্য মতামত প্রকাশ করেন ডাঃ ভি এম্ স্লাইফার (Dr. V. M. Slipher)। আরিজোনায় ফ্ল্যাগস্টাফে তাঁর ল্যাবরেটরী, নাম লাওয়েল অবজারভেটরী। তিনি জানালেন, শুধু তাপের দিক দিয়েই নয়, মঙ্গলের বায়ুমণ্ডলে এমন দুটো জিনিস অর্থাৎ জল আর হাওয়া (অক্সিজেন) রয়েছে, যা সহজেই সেখানে জীবনের স্পন্দন স্বাভাবিক ও সম্ভব ক'রে তুলতে পারে।

মঙ্গলগ্রহে যে কৃত্রিম খাল নিয়ে রীতিমত মতান্তর রয়েছে, সেগুলি বাস্তবিকপক্ষে যদি সত্যিও হয়, তবু একটা মুস্কিল হয়েছে এই যে, যতই বুদ্ধিমান আর কৌশলীই হোক্ না, সেখানকার বাসিন্দেরা, এতো বিরাট প্রশস্ত খাল বানানো কি ক'রে তাদের দ্বারা সম্ভব যা' আমরা পৃথিবীর লোক পাঁচ কোটি মাইল দূরে ব'সেও দেখতে পাই? আর এক কথা। সেখানকার গড়পড়তা তাপের পরিমাণ এতো কম ব'লে জমি বা মাটি খুব শক্ত ব'লে ধ'রে নেওয়া যেতে পারে। এবং সেটাও এই খাল তৈরীর ব্যাপারে কম অন্তরায় নয়। তাছাড়া যে সমস্ত বড়ো বড়ো দূরবীন দিয়ে এই সব তথ্য বের করা হয়েছে, তাদের আলো-ধরার ও আলো-জড়ো-করার শক্তি এতোই বেশী যে, নগণ্যতম ও সামান্যতম জিনিসও তার মধ্যে ধরা পড়ে, ফলে আপাতদৃষ্টিতে এই কৃত্রিম খালের অনাবশ্যক গুরুত্ব হয়ত অস্বাভাবিক-ভাবে বেশী।

মঙ্গলের বায়ুমণ্ডলে এ্যামোনিয়া গ্যাসের প্রাধান্য বিজ্ঞানীর পরীক্ষায় জানা গেছে। উদ্ভিদ্ ও শাকসব্জীর পচনের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম-জাত এই এ্যামোনিয়া গ্যাস সেখানে উদ্ভিজ্-জন্ম ও বর্ধনশীলতাই প্রমাণিত করেছে। আর একথাটাও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, অন্য জীবজন্তুর অস্তিত্ব সেখানে অবশ্যম্ভাবী না হোক্, অসম্ভব নয়, কারণ জীবজন্তু মাত্রেই খাদ্যের জন্য উদ্ভিদের ওপর একান্তভাবেই নির্ভরশীল।

"দুটি উপগ্রহ মঙ্গলগ্রহের চারিদিকে ঘুরে বেড়ায়। একটির এক পাক শেষ করতে লাগে ত্রিশ ঘণ্টা, আর একটির সাড়ে সাত ঘণ্টা, অর্থাৎ মঙ্গলগ্রহের এক দিন-রাত্রির মধ্যে সে তাকে ঘুরে আসে প্রায় তিনবার। আমাদের চাঁদের চেয়ে এরা প্রদক্ষিণের কাজ সেরে নেয় অনেক শীঘ্র।" মঙ্গলের এই দুটি চাঁদের মধ্যে বড়টির আয়তন আমাদের চাঁদের ষাট ভাগের এক ভাগ মাত্র। ইনি ওঠেন পশ্চিম দিকে আর অস্ত যান পূবে এই এঁর বৈশিষ্ট্য। এঁর অমাবস্যা ও পূর্ণিমা আমাদের চাঁদের মতোই। ছোটটি আরও বিচিত্র। মঙ্গলের আকাশে একবার উঠলে, পুরো তিনটে দিন ইনি আর অস্ত যান না, আর এই সময়ের মধ্যেই এঁর দুবার অমাবস্যা ও দুবার পূর্ণিমা হয়।

এই তো গেলো মঙ্গলগ্রহের কাহিনী। এর পরেই শুক্রগ্রহ। "এই গ্রহের পথ পৃথিবীর পথের চেয়ে আরো তিন কোটি মাইল সূর্যের কাছে। সেও কম দূরে নয়। যথোচিত দূরে বাঁচিয়ে আছে তবু এর ভিতরকার খবর ভালো করে পাইনে। সে সূর্যের আলোর প্রখর আবরণের জন্যে নয়। বুধকে ঢেকেছে সূর্যেরই আলো, আর শুক্রকে ঢেকেছে এর নিজেরই ঘন মেঘ। বিজ্ঞানীরা হিসাব করে দেখেছেন, এই গ্রহের উত্তাপ পৃথিবীর চেয়ে প্রায় ৯০° ডিগ্রী বেশী হবার কথা। এই উত্তাপে জলের বিশেষ রূপান্তর হয় না। কাজেই ওখানে জলাশয় আর মেঘ দুইয়ের অস্তিত্বই আশা করতে পারি।" এটা ঠিক, শুক্রগ্রহের জলবায়ু ও আবহাওয়া আমাদের পৃথিবীর থেকে স্বতন্ত্র। পৃথিবীর চেয়ে সূর্যের কাছে ব'লে শুক্রগ্রহের উষ্ণতা পৃথিবীর চেয়ে বেশী এবং বুধের চেয়ে অনেক কম। কাজেই এই গ্রহটি গরমও বটে, আবার স্যাঁতসেঁতেও বটে। কিন্তু মনুষ্য-বাসের পক্ষে এই গ্রহটি যতই অস্বস্তিকর ও অসুবিধাজনকই হোক না কেন মনুষ্যেতর কোনো প্রাণীর বাসের সম্ভাবনার কথা একেবারে হেসে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এর বায়ুমণ্ডল সম্বন্ধে বিজ্ঞানীরা কোনো খোঁজ-খবর পাননি, অক্সিজেন কিংবা জলীয় বাষ্পের কোনো চিহ্নই তাঁদের পরীক্ষায় ধরা পড়েনি। তবু তাঁরা বলেছেন, শুক্রগ্রহে বায়ুমণ্ডল থাকা অসম্ভব নয়, হয়তো আছে কিন্তু তাঁদের বিশ্লেষণে তাকে পাওয়া যাচ্ছে না। হয়তো অত গভীর স্তর অবধি তাঁদের দৃষ্টি পৌঁচচ্ছে না।

সূর্যালোক প্রতিফলনের ওপরই কোনো গ্রহ সম্বন্ধে আমাদের জানা নির্ভর করে। মেঘাবৃত কোনো গ্রহ সম্বন্ধে ঠিক এই কারণেই কিছু জানার যো নেই। তবে সূর্যালোকের চেয়েও তীব্র ও তীক্ষ্ম লাল—উজানী আলোর সাহায্যে দূরবীনের দৃষ্টি তেমন গ্রহের তলও ভেদ ক'রে যেতে পারে। এবং সে খবর লিপিবদ্ধ ক'রে রাখার জন্য বিশেষ ও স্বতন্ত্র ফোটোগ্রাফ-প্লেট দরকার। সম্প্রতি এই ধরণের প্লেটের বিশেষ চলন হ'লেও এর সম্পূর্ণ উন্নতির এখনও অনেক বাকী। কাজেই আশা আছে অদূরে কিংবা সুদূরে ভবিষ্যতে জ্যোতির্বিজ্ঞানীমণ্ডলী তমসাবৃত শুক্রগ্রহের রহস্যের আবরণ উন্মোচন করতে পারবেন। আপাতত শুক্রগ্রহের বায়ুমণ্ডল সংক্রান্ত যে কথা তাঁরা জোরের সঙ্গে বলতে পেরেছেন, সে হোলো সেখানে কার্বন ডায়ক্সাইডের সামান্য অথচ নিশ্চিত বিদ্য-মানতা নিয়ে। সুতরাং কোনো না কোনো দিন অক্সিজেনের দেখাও হয়তো সেখানে পাওয়া সম্ভব হ'তে পারে।

অন্যান্য নক্ষত্রজগতের গ্রহের সম্বন্ধে খবর নেওয়া যাক। আমাদের সৌর-জগতের মধ্যে তো, ধ'রলে মোটামুটি অন্ততঃ দুটি গ্রহের সন্ধান পাই যেখানে কোনো না কোনো রকমের প্রাণের স্পন্দন বর্তমান। যে কোটি কোটি নক্ষত্রের অস্তিত্ব বর্তমানে সুপরিজ্ঞাত তাদেরও নিশ্চয়ই অগুন্তি গ্রহ উপগ্রহ আছে। এই গ্রহের মধ্যে কতকগুলি কি জীবের বাসের পক্ষে অনুকূল নয়? এটা আপাততভাবে খুবই সহজ ও সরল ব'লে মনে হয় বটে, কিন্তু কয়েক বছর আগেও নক্ষত্র-জগতের এতো গ্রহমণ্ডলীর অস্তিত্ব-সম্ভাবনার পক্ষে কোনো যুক্তিই মেলেনি। অল্প কিছুদিন হোলো নক্ষত্র-জগৎ সৃষ্টি সম্বন্ধে একটি নূতন মত প্রচার করেছেন কেম্ব্রিজের এক তরুণ পণ্ডিত। লিট্‌লটন্ (Lyttleton) তাঁর নাম। আকাশে অনেক-জোড়া নক্ষত্র পরস্পরকে প্রদক্ষিণ করছে। এঁর মতে, একটা ভবঘুরে জ্যোতিষ্ক ঘুরতে ঘুরতে এসে অপরটির গায়ে পড়ে ধাক্কা মেরে তাকে অনেক দূরে ছিট্‌কে ফেলে দিয়ে চ'লে গেল। চ'লে যেতে যেতে পরস্পর আকর্ষণের জোরে মস্ত বড়ো একটা জ্বলন্ত বাষ্পের টানা সূত্র বের হ'য়ে এসেছিল; তারই ভিতর মিশিয়ে ছিলো এদের উভয়ের উপাদান সামগ্রী। কিন্তু এভাবে গ্রহ-মণ্ডলীর জন্ম সচরাচর ঘটে না। নক্ষত্র-কুলের ভবঘুরে বৃত্তি লক্ষ্য ক'রে কয়েক বছর আগে স্যার জেমস্ জীনস্ হিসেব ক'রে দেখিয়েছেন যে, এমনতরো ঘটনা (অথবা দুর্ঘটনা!) ঘটতে পারে অন্ততপক্ষে পাঁচশো কোটি বৎসর অন্তর। এর পরে

(২... পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

যে পথে সে আসিবে

শ্রীহাসিরাশি দেবী

ভাদ্রের বর্ষণমুখর রাত্রি......রাত্রি প্রায় একটা; মাঝে মাঝে সজল হাওয়া ছুটে চলেছিল বুকের মধ্যে কাঁপন জাগিয়ে।......

কলকাতার জনবহুল রাজপথ এখন প্রায় নিস্তব্ধ; ক্বচিৎ দু'একখানা মোটরকে চাকার দু'ধারে জল ছিটিয়ে বোঁ বোঁ শব্দে অদৃশ্য হতে দেখা যায়, আর দেখা যায় ট্রাফিক পুলিশকে পথের মোড়ে মোড়ে প্রস্তর মূর্ত্তির মত দাঁড়িয়ে থাকতে।

এরই মধ্যে একখানা রিক্সা ছুটে চলেছিল; অর্থাৎ রিক্সা চালকের হাতের মুঠোয় তার ঘণ্টি বেজে উঠছিল,—ঠুং—ঠুং—ঠুং......।

পথের পাশের আলোতে মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছে ওর আরোহীর বিষাদ-ক্লান্ত মুখখানা। মাঝে মাঝে সে সুর ভাঁজছে কোন একটা ভুলে যাওয়া গানের দুই একটা লাইনের।......

বড় রাস্তা ছাড়িয়ে গাড়ি গলিতে ঢুকেছে অনেকক্ষণ। হঠাৎ ওর আরোহী যেন সজাগ হয়ে উঠলো নিজের গতি সম্বন্ধে:—"এই, রোক্‌কে—রোক্‌কে......"

গাড়ি থামলো কাছে কোথাও এসে,—শেষবার ঠুং ঠুং করে বেজে ঘণ্টিও গেল নীরব হয়ে; আরোহী নিরঞ্জন নামলো একখানা বস্তির সামনে। খোলার ঘর,—সামনে এতটুকু বারান্দা......তার ওপোর এসে পড়েছে খোলা জানালা বেয়ে এতটুকু লণ্ঠনের আলো। মনে হয় ঘরের মধ্যের হয়তো কেউ এখনও জেগে আছে, আর সব প্রায় নীরব আর সব প্রায় অন্ধকার; সেই অন্ধকারের মধ্যে থেকে ক্বচিৎ কখনও কানে আসে কোনও কলহান্তরিতার কণ্ঠ, কোনও শিশুর কান্না।

সবই যেন কেমন একটা বিষণ্ণতায় আচ্ছন্ন।......

রিক্সার ভাড়া চুকিয়ে, বৃষ্টির আক্রমণ থেকে মাথা বাঁচাতে বাঁচাতে দরোজায় এসে নিরঞ্জন ডাক দিল:—

"সুপ্তি, সুপ্তি, জেগে আছ?"

কেউ উত্তর দিল না; নিরুত্তরে যে মেয়েটি দরোজা খুলে দিল, ধূম-ধূসর হ্যারিকেনের আলোয় দেখা গেল, তার শাড়ি-সেমিজ যেমন ময়লা, তেমনি ছেঁড়া, জায়গায় জায়গায় তালিমারা। রুক্ষ, অসংযত মাথার চুলগুলো টেনে বাঁধা; মুখ শুখনো, চোখে নিদ্রাহীনতার রুক্ষতা।

ভিতরে প্রবেশ করে নিরঞ্জন দরোজা বন্ধ করে দিলে; মুহূর্তের দৃষ্টিতে তার ছেঁড়া বিছানায় ঘুমন্ত রুগ্‌ন শিশুটি থেকে আরম্ভ করে অন্য পাশে ঢাকা দেওয়া ভাতের থালাটি পর্য্যন্ত কিছুই বাদ রইল না। বিরক্তিতে মুখ বিকৃত করে সে সুপ্তির মুখের দিকে তাকাল—"বলেই তো গিয়েছিলাম যে, ফিরতে আমার রাত হবে, ভাত রাখতে হবে না, যা হোক কিছু খেয়েই ফিরবো এখন, ভাত রাখবার মানে?"

নিরঞ্জনের সে বিরক্তিকে অগ্রাহ্য করেই সুপ্তি যেন খোকার পাশে গিয়ে বসলো; জবাব দিলে—"তোমার নয় ও—আমার।"

"তুমি খাওনি! —কেন? শরীর খারাপ হলো নাকি আবার?"

এগিয়ে এসে সে কপালে হাত রাখলে সুপ্তির—"কৈ, গরম নয়তো! তবে খাওনি কেন?"

সুপ্তির কুঞ্চিতভ্রূ একটু সংকুচিত হয়ে উঠলো যেন; খোকার কপালে জলপটী দিতে লাগলো নির্ব্বাকে, কোনও উত্তর দিলে না, উত্তর দেওয়ার হাত থেকে তাকে রেহাই দিতে খোকাও হঠাৎ কেঁদে উঠলো ককিয়ে; সুপ্তি ওকে থামাতে মনোযোগ দিলে।

নিরঞ্জন একটু থমকে দাঁড়ালো; তারপর ওর আধময়লা পাঞ্জাবীর পকেট থেকে একটা বেলফুলের মালা বের করলে অতি সন্তর্পণে, অতি ধীরে ধীরে। হঠাৎ ছুটে-আসা বাদল হাওয়ায় সে-মালার গন্ধ ঘরময় ছড়িয়ে দিতেই সুপ্তি চমকে উঠলো,—নিজেরও অজ্ঞাতে!

কবেকার কোন্ ঝরাফুলের সৌরভটুকু আজ যেন ঐ গন্ধে মিশে বিস্মৃতির দেশ পার হয়ে এসেছে!......

উন্মনা হয়ে পড়লো সে।

নিরঞ্জন ডাকলে—"সুপ্তি—!"

সুপ্তি কি ভাবছিল; মুখ ফিরিয়ে দেখলে নিরঞ্জনের হাতের মালাটা অপেক্ষা করছে তার এলোমেলো রুক্ষ চুলের অগোছালো খোঁপার শোভা বর্দ্ধনের জন্য, কিন্তু যথাস্থানে পৌঁছতে পারছে না কোনও অব্যক্ত লজ্জায়, কুণ্ঠায়; কৃতকর্ম্মের অনুশোচনা ওকে বোধহয় বাধা দিচ্ছে।

সুপ্তি তবু নির্ব্বাক; খোকা ওর কোলে কাঁদছে, সান্ত্বনা দেবার চেষ্টায় দোল দিচ্ছে অল্প অল্প।

কিন্তু সে থামতে চায় না।

নিরঞ্জন বসলো পাশে এসে; সুপ্তির খোঁপায় সযত্নে মালাটাকে জড়িয়ে দিতে দিতে প্রশ্ন করলো—"রাগ করেছ আমার ওপোর?—"

"রাগ!"

সুপ্তি হাসবার ব্যর্থ চেষ্টা করলে,—"তোমার ওপর রাগ কেন করবো?"

"তবে ভাত খাওনি যে!"

"খিদে হয়নি বলে।"

আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ!

কুণ্ঠিত নিরঞ্জন প্রশ্ন করলে,—"খোকা আজ কেমন আছে?"

সুপ্তি মুখ তুলে তাকালো; যেন অনেক দিনের অনেক না-বলা কথা আজ নীরবে ঐ-চোখের দৃষ্টিতে ভাষারূপে মূর্ত্ত হয়ে উঠতে চায়!

নিরঞ্জন এ-দৃষ্টির আঘাত সহ্য করতে পারলো না, মুখ ফিরিয়ে তাকালো অন্যদিকে, যেন সে ঐ অন্ধকারের বুকেই প্রাণপণে হাতড়ে হাতড়ে আজ এই প্রশ্নের উত্তর আবিষ্কার করতে চায় একান্ত অসহায়তায়, একান্তভাবেই আজ যেন সে স্বীকার করতে চায়,—জানে সে ঐ প্রশ্ন জানে!......

নিস্তব্ধ নিশীথে সুপ্তির বুকের স্পন্দনধ্বনি শুনে সে চমকে জেগে উঠেছে, রোগ-যন্ত্রণাকাতর শিশু-সন্তান তার বুকের মধ্যে কেঁদে উঠেছে অকস্মাৎ, বিকৃত অন্তরাত্মার মত—!

স্বপ্ন তার ভেঙে গেছে সেই আঘাতে।

খোলা জানালা পথে কাতর দৃষ্টিতে খুঁজেছে মুক্ত আকাশের এতটুকু আলো, কিন্তু তা পায়নি। পেয়েছে মানুষের জ্বালা, এতটুকু বদ্ধ-গলিপথের মোড়ে গ্যাশলাইটের এতটুকুর অস্পষ্ট ইঙ্গিত।

তিন বৎসর......মাত্র তিনটি বৎসর চলে গেছে। এই তিন বৎসর আগের একটি রাত্রির শেষ!

সম্মুখের পূর্ব্বাকাশে শুকতারা জ্বলছে, আর নীচে জ্বলছে হাওড়া ষ্টেশনের আলো;......

পেছনে ফেলে-আসা গঙ্গার বুকে ষ্টীমার ছাড়বার বাঁশী বাজছে থেকে থেকে,—ধাঙড়দেরও সাড়া পাওয়া যাচ্ছে যেন।

চঞ্চল চরণে দু'জন যাত্রী এসে দাঁড়াল টিকিট ঘরের সম্মুখে!

টিকিট চাই তাদের আজ......তা সে যেখানকারেরই হোক-!

আজ তারা যাবে! আজ তারা শুধু কলকাতার রাজপথেই এসে দাঁড়ায় নি, সমাজ-শৃঙ্খলা, শাসনেরও বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে এক পথে যাবে বলে।

"সামনের দিকে হাত বাড়িয়ে ছেলেটি চাইল,—"টিকিট—"

প্রৌঢ় টিকিট মাস্টার চশমার ভিতর দিয়ে একবার সন্দেহাকুল দৃষ্টিপাত করলেন এই দুটি তরুণ-তরুণীর ওপর। প্রশ্ন করলেন—"কোথায় যাবেন?"

"যাব! তাইতো! দিন একটা জনবহুল জায়গার। যেখানে চেনা-পরিচয় না থাকলেও চিনতে কষ্ট হয় না কিছুর।"

মাস্টার চমকে তাকালেন ছেলেটার দিকে; দেখলেন অধরোষ্ঠে তার সংকল্প-দৃঢ়তার আভাস; হয়তো সেখানে বাধা দেওয়ার চেষ্টা ব্যর্থ হবে।

আর মেয়েটি!

চোখে তার ভয়চকিত দৃষ্টি, মুখে পাণ্ডুর বিষণ্ণতা! যেন, এই সে প্রথম কোনও গুরুতর অপরাধে ইচ্ছা করেই অপরাধী হয়েছে!

মাস্টার হাসলেন একটু! ......অতীতের কোন স্মরণীয় অপরাধের বোঝা হয়তো এই মুহূর্তে তাঁর পক্ষে দুর্বহ হয়ে উঠলো; তাই হাতের টিকিটখানা এগিয়ে দিয়ে মৃদুস্বরে বললেন,—"জায়গাটা ভাল।"

মেয়েটির মুখের ওপর এসে পড়েছিল উজ্জ্বল আলোর খানিকটা; সেই আলোকে দেখা গেল—সুন্দর সে মুখ, তারুণ্যের আভায় উজ্জ্বল। কানের দুল দুটো ঝিক্‌ঝিক্ করে দুলছে, পরনের রঙীন শাড়ি পেঁচিয়ে পরা, পায়ে স্যাণ্ডেল!

টিকিট ঘরের গেট পার হয়ে চলে গেল ওরা দুজনে।

ওদের চলে-যাওয়া পথের দিকে তাকিয়ে তাকিয়েই বোধ হয় তন্দ্রালু চোখ দুটো বুজে এলো স্টেশন মাস্টারের,—চমকে উঠলেন তিনি।

এর বছরখানেক পরের একটি বেলা-শেষের আলোকচ্ছটায় সেই দুটি যাত্রীর মুখ দেখে চমকে উঠলেন তিনি! বিস্মিত বিস্ফারিত চোখ মেলে দেখলেন মেয়েটির মাথায় কাপড়,—সিঁথিতে সিঁদুর।

কোলে থেকে একটি সুন্দর শিশু দূরের দিকে তাকিয়ে অর্ধস্ফুট কাকলিতে কাদের ডাকছে—"আ-আ-আ—"

মা তার,—তাকে বুকে জড়িয়ে চলতে চলতে একটা চুমো খেলে সস্নেহে, অনন্ত মমতায়।

সেই শিশু আজ ঐ রুগ্ন; দীর্ঘদিন শয্যাশায়ী; অর্থাভাবে উপযুক্ত পথ্যহীন, চিকিৎসা বন্ধ!......

ঢং,......ঢং......।

রাত দুটো।

বৃষ্টির ধারা থেমে এসেছে বোধ হয়, হাওয়ার গতিও এসেছে মন্দা হয়ে।

নিরঞ্জন উঠে জানালা খুলে দিলে ওদিককার;

বড় গরম হচ্ছে যেন!—

সুপ্তি ডাকলে—"শুনছো!"

নিরঞ্জন দাঁড়িয়েছিল অন্যমনস্কভাবে, মুখ ফেরাতে সুপ্তি বললে—"তুমি শুয়ে পড়লে পারতে; আবার কাল সকাল থেকে সুটিং আছে তো!"

নিরঞ্জনের মুখে ভেসে উঠলো বেদনার্ততা। বললে,—"থাকগে!—"

"শোবে না?"

হাসবার ব্যর্থ চেষ্টা করলে নিরঞ্জন:—

"কে বললে শোব না! বেঁচে আছি যতক্ষণ, ততক্ষণ বাঁচবার মত যা কিছু সমস্তই করতে হবে বই-কি:—উঠতে হবে, খেতে হবে, ঘুমাতেও হবে;—যা বলবে সব।"—

"তবে শোবে না! রাত দুটো যে বেজে গেল!"

"আমি নিশ্চিন্তে ঘুমাবো, আর তুমি একা জেগে থাকবে খোকাকে নিয়ে?"

"থাকলামই বা, কত রাত্রে যে তুমি ফিরতেই পার না কাজের জন্যে, সে সব রাত্রিও তো কেটে গেছে আমার, কিছুই তো আটকে থাকে নি।"

"রাতজাগা অভ্যাস হয়ে গেছে আমার, তুমি ভেব না।"

"কিন্তু যখন অভ্যাস ছিল না, তখন?"

"তখন!"—

সুপ্তি হাসলো—"তখন আমি ছিলাম প্রফেসর সেনের মেয়ে......আর এখন? এখন আমি তোমার স্ত্রী,......খোকনের মা। মিস্ সেনের সঙ্গে খোকনের মা'র আজ কোনও সামঞ্জস্য নাই।"

নিরঞ্জনের চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসে। সম্মুখে তার ঐ নিষ্পাপ শিশু আর তার মা আজ যেন নিজেদের আবেষ্টনী তার কাছ থেকে আলাদা করে নিয়েছে; ঐ তারা সরে যাচ্ছে, নিরঞ্জনের কাছ থেকে—ঐ তারা নিজেদের সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে কোন্ দূর নক্ষত্রালোকে! আর সে...... আলো অন্ধকার,—আর স্বর্গ-নরকের মধ্যে বেলের গুঁড়ের গন্ধটা আবার যেন মাতামাতি শুরু করলে।

"শুনছো, —ওগো শুনছো!"

সচকিতে দুই হাতে চোখ ড'লে উঠে বসলো নিরঞ্জন;—"কে ডাকে? সুপ্তি! কেন?"

"খোকার—খোকার গা'টা যে বড্ড গরম হয়ে উঠেছে; কি রকম করছে যেন; ভয় করে যে!......

"পাগ্‌লি! ভয় কি? শুনেছি ছেলে-পুলের অমন কত হয়, তাই নিয়ে ভয় করলে চলে!"

নিরঞ্জন এগিয়ে এলো।

সুপ্তির কোলে তার সন্তান! তারই শিশুকালের প্রতিকৃতি হয়তো আজ আবার নতুন হয়ে ফিরে এসেছে সুপ্তির জীবনে! তাই আজ তার চোখের কোলে কোলে কাজলবিহীন কালিমা, মুখে দারিদ্র্য-দুঃখের বিশীর্ণতা!

নিরঞ্জন খোকাকে নিজের কোলে তুলে নিতে গেল:—"তুমি যে সারারাত শোওনি সুপ্তি,—ওকে আমার কাছে দিয়ে তুমি একটু শোও, ঘুমিয়ে নাও একটু......"

"না, ও থাক, ও আমার কোলেই থাক; ঘুম যদিই আসে, তবে এই দেওয়ালে পিঠ রেখেই ঘুমাতে পারবো। কিন্তু তুমি?"

"আমি কি?"

"তুমি আজ কাজে যাবে না?"

"তাই ভাবছি; কাজ তো তোমাদেরই জন্যে; সেই তোমরাই যদি পড়ে রইলে এভাবে, তবে কার জন্যে কাজ করবো?"

"ছিঃ, তুমি না পুরুষমানুষ!"

বিশ্বের বেদনার সঙ্গে যেন শত ধিক্কার ঝরে পড়লো সুপ্তির কণ্ঠস্বরে।

নিরঞ্জন সে কথার উত্তর দিলে না, সুপ্তি বলে উঠলো,—"বসে থাকলে কি করে চলবে? ঘরভাড়া দু' মাসের বাকী, তারপর দুধ, দোকানের আলকাবাকী জিনিস, নিত্য তাগাদা দিচ্ছে! হয়তো আর ধার দেবে না তারা।"

নিরঞ্জন শুধু নির্বাক।

খোকা আবার চমকে কেঁদে উঠলো; সুপ্তি ডাকলে,—"শুনছো!"

"কেন?"

"খোকার গায়ের তাতটা যেন বড্ড বেশী ঠেকছে, একবার ডাক্তার ডাকলে হয়না! আজ আট-দশ দিন একেজ্বরী......!"

নিরঞ্জন হাসতে গেল:—

"ডাক্তার ডাকবো কি দিয়ে সুপ্তি? পয়সা?"

সুপ্তি খানিকটা চুপ করে বসে রইল; তারপর খোকার গলা থেকে কালো কারে বাঁধা একটা ছোট সোনার পদক বার করে হাতে গুঁজে দিল নিরঞ্জনের,—

"এই নাও, এইটা বিক্রী করে.... ...."

আর বলতে হলো না; নিরঞ্জন ওর মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলে,—"এটা কি?"

"সেই পদকটুকু,—খোকার মুখ দেখে তুমি যা ওকে দিয়েছিলে!"

"উঃ—"

নিরঞ্জনের হাঁতের মুঠোয় কে যেন গলানো শিশা ঢেলে দিলে খানিকটা। মুখখানা তার যন্ত্রণায় বিবর্ণ হয়ে উঠলো! ভগবানকে ডাকতেও ভরসা হয়না তার। ডাকলে,—"সুপ্তি!"

সুপ্তি মুখ নিচু ক'রে ব'সেছিল খোকার

দিকে চেয়ে,—উত্তর দিলে না। এগিয়ে এলো নিরঞ্জন ঃ—

"কাঁদছো?—সুদীপ্ত,—কাঁদছো।"

সত্যিই সুদীপ্ত কাঁদছে।

ওর কোটরাগত দু'চোখ উপচে পড়ছে জলের ফোঁটা; কম্পিত কণ্ঠে বললে ঃ—

"না, কাঁদবো না আর; লোকে বলে কাঁদলে সন্তানের অকল্যাণ হয়,—আমি কাঁদবো না, খোকা আমার সেরে উঠবে।"...

নিরঞ্জন নির্বাকে খানিকটা দাঁড়িয়ে রইল, তারপরে সন্তর্পণে পদকখানা খোকার মাথায় ছোঁয়ালে ঃ—

"এটা যত্নে তুলে রাখো সুদীপ্ত, আমি ম্যানেজারের কাছ থেকে আগাম টাকা চাইব মাইনের,—বলবো, আমার খোকা, আমার খোকনের অসুখ; দেয়,—ভালো, না দেয়,... এ কাজে জবাব দেব তখনই;—তারপর হয় কোনও কলে নয় কারখানায় চাকরী জুটিয়ে নেব একটা। যা পাব মাসকাবারে, তাতেই চ'লবে আমাদের।......"

কি একটা জবাব দিতে গিয়ে সুদীপ্ত হঠাৎ চীৎকার ক'রে উঠলো ঃ—"খোকা,...... খোকন আমার......"

নিরঞ্জন ওর পরিত্যক্ত পদকখানা কুড়িয়ে নিয়ে ছুটে বার হয়ে গেল দরোজা খুলে... এইটা বিক্রী ক'রেও আজ তাকে ডাক্তার আনতে হবে, খোকাকে বাঁচাতে হবে......।

সে চ'লে গেল।......

ঘণ্টাখানেক পরে চোরের মত চুপি চুপি দরোজা ঠেলে সে যখন ঘরে এসে দাঁড়ালো, তখন তার চোখে অশ্রু ছিল না,—সংগেও কেউ আসেনি।......

নিরঞ্জন চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল।.....

সমস্ত ঘর নিস্তব্ধ; রাত্রের হ্যারিকে তখনও একপাশে জ্বলছে আর স্পন্দনহ সন্তানকে বুকে নিয়ে বসে আছে তার কণ্ঠ তারও নির্বাক, দৃষ্টি তারও প্রশ্নহী নিরঞ্জন এগিয়ে এলো,...এক পা, দুই পা. তারপর দুই হাতে হঠাৎ মুখ ঢেকে ব' পড়লো মেঝের ওপোর।......দুটি ব প্রতি শব্দ একসংগে মিশে সেই নিস্ত ঘরে যেন মুখর হ'য়ে উঠলো ঃ—হারি গেল! হারিয়ে গেল! সংসারের জনবহ পথে চ'লতে চলতে ওদের জীবনের অতী ইতিহাসের মত, খোকার মত, খোকার গল পদকটুকুও কোথায় হারিয়ে গেল,—সুদীপ্ত মত নিরঞ্জনও তাকে আটকাতে পারলো ন

অন্য কোনো পৃথিবী

(২৭৯ পৃষ্ঠার পর)

অবশ্য আরো একটা মত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তার মর্ম এই যে বিশ্বসীমানা ক্রমশই বিস্তৃত থেকে বিস্তৃততর হ'য়ে উঠছে। কাজেই নক্ষত্র-জগতের গ্রহমণ্ডলীর সংখ্যাও বাড়ছে না—একথা বলা চলে কি করে? অন্য জগতের সমসাময়িক বাসিন্দেরা হয়তো আমাদের প্রাধান্য ও গরিমা নাও স্বীকার করতে পারে।

অন্য কোনো পৃথিবীর কিংবা সেখানকার অধিবাসীদের অস্তিত্ব স্বীকার করা-না-করার আগে আমাদের পৃথিবী এবং নিজেদের অস্তিত্বের কথাটা ভেবে দেখা উচিত। আমাদের পৃথিবীতে জীবন এলো কোথা থেকে? "আদিকালে পৃথিবীতে জীবনের কোনো চিহ্নই ছিলো না। প্রায় সত্তর আশি কোটি বছর ধ'রে চলেছিলো নানা আকারে তেজের উৎপাত। কোথাও অগ্নিগিরি ফুঁসছে তপ্ত বাষ্প, উগরে দিচ্ছে তরল ধাতু, ফোয়ারা ছোটাচ্ছে গরম জলের। নীচের থেকে ঠেলা খেয়ে কাঁপছে ফাটছে ভূমিতল, উঠে পড়ছে পাহাড় পর্বত, তলিয়ে যাচ্ছে ভূখণ্ড। কেমন কোরে কোথা থেকে প্রাণের ও সংগে সংগে মনের উদ্ভব হোলো তার ঠিকানা পাওয়া যায় না। তার আগে পৃথিবীতে সৃষ্টির কারখানা-ঘরে তোলাপাড়া ভাঙাগড়া চলছিল প্রাণহীন পদার্থ নিয়ে। তার উপকরণ ছিলো মাটি, জল, লোহা পাথর প্রভৃতি; আর সংগে সংগে ছিল অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন প্রভৃতি কতকগুলি গ্যাস্। এমন সময় দেখা দিল প্রাণ, একরকম অপরিস্ফুট ছড়িয়ে পড়া প্রাণ পদার্থ, ঘন লালার মতো অঙ্গভাগহীন। তখনকার ঈষৎ গরম সমুদ্রজলে ভেসে বেড়াত। তার নাম দেওয়া হয়েছে প্রোটোপ্লাজম্। বহু-যুগ লাগলো এর মধ্যে একটি পিণ্ড জমতে; সেইগুলির একশ্রেণীর নাম দেওয়া হয়েছে অমীবা; নিজের দেহটাকে ভাগ করে করে তার বংশ বৃদ্ধি হয়। এই অমীবারাই আর এক শাখা দেখা দিল, তারা দেহের চারদিকে আবরণ বানিয়ে তুললে, শামুকের মতো। সমুদ্রে আছে এদের কোটি কোটি সূক্ষ্ম দেহ। বিশ্বরচনার মূলতম উপকরণ পরমাণু; সেই পরমাণুগুলি অচিন্তনীয় বিশেষ নিয়মে অতি সূক্ষ্ম জীবকোষরূপে সংহত হোলো। এদের নিজেকে বহুগুণিত করার শক্তির দ্বারা ক্ষয়ের ভিতর দিয়ে মৃত্যুর ভিতর দিয়ে প্রাণের ধারা প্রবাহিত হ'য়ে চলে। এই জীবানুকোষ প্রাণলোকে প্রথমে একলা হ'য়ে দেখা দিয়েছে। তারপর এরা যত সংঘবদ্ধ হ'তে থাকল ততই জীব-জগতে উৎকর্ষ ও বৈচিত্র্য ঘটতে লাগল।

যদিও সম্পূর্ণ প্রমাণ নেই, এবং সে প্রমাণ পাওয়া আপাতত অসম্ভব তবু একথা মানতে মন যায় না যে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এই জীবন ধারণযোগ্য চৈতন্য প্রকাশক অবস্থা একমাত্র এই পৃথিবীতেই ঘটেছে, যে এই ক'রে ক'রে তার বংশবৃদ্ধি হয়। এই একমাত্র ব্যতিক্রম।"

সচিত্র উন্মাদ আশ্রম

শ্রীশক্তিপদ রাজগুরু

ঠিক পাগলা গারদ বা উন্মাদ ভবন নয়—থাকে ওখানে সাধারণ মানুষই, তবে একটু অসাধারণ পর্যায়ের!

শহরের শ্রী হয়ে এসেছে ক্ষুণ্ণ! এখানে ওখানে ছড়ান নোংরা ভাঙ্গা ডাস্টবিন, ময়লা ছেঁড়া মাদুর তুলো বের করা বালিসের রাজত্ব! ...ঠাঁই ঠাঁই জলকচু—কাল কাসিন্দে গাছের বন! ঘোলাটে গঙ্গাজলের কলটা থেকে অঝোরে ঝরে চলেছে লালচে বারিরাশি! ওর পাশেই মজা খালটার ধারে দাঁড়িয়ে রয়েছে কোন রকমে হুমড়ি খাওয়া হলদে রঙ-এর বাড়িখানা! একটা ময়লা রং-এর টিনে সাইনবোর্ড...বাঁকা বাঁকা অক্ষরে লেখা—'সচিত্র উন্মাদ আশ্রম।' বারান্দার জীর্ণ রেলিং-এর সঙ্গে ঝোলান একটা ততোধিক জীর্ণ ঘড়ি—কাঁটা দুটো টেনে বারটার ঘরে জড় করে দেওয়া রয়েছে—বারটা সর্বদাই বেজে রয়েছে ওদের ঘড়িতে!

দুপুরের খর রোদ অলসভাবে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে—খালের বুকে বড় বড় নৌকাগুলোতে জমেছে দিশী বিদেশী মাঝির আড্ডা! হালের মাচানটার উপর ঝুমরো মাঝি বসে বসে তামাক টানছে তারিফ করে। খালটার দুপাশে জন্মেছে আপাঙ কাটানটে গাছের বন। নিথর রোদে ঘাসের বুকে সবুজ কচুরীপানার ভেলভেট রং-এর ফুলগুলো প্রাণ স্পন্দনে কাঁপছে! বীরেন আসছে আশ্রমের দিকে।

শীর্ণ খর্বকায় চেহারা—নাকটা খাড়া হয়ে উঠে আছে—সে যেন বিদ্রোহ ঘোষণা করতে চায় অদৃশ্য কোন শক্তির বিরুদ্ধে। খদ্দরের পাঞ্জাবিটা বিনা নোটিশেই কাঁধের কাছে ফাট ধরেছে, স্যাণ্ডেলের স্ট্রাপ দুটো ক্ষয়-প্রাপ্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে কয়েক সেণ্টিমিটারে—যে কোন মুহূর্তে ওটুকুর ব্যবধান লুপ্ত হয়ে যাবে। হাতের ক্যানভাসের রংচটা ব্যাগটা ময়লা মাদুরের উপর ছুড়ে ফেলে দিয়ে ক্লান্ত দেহখানাকে ছেড়ে দিল তারই পাশে।

ওদিকে শিকহীন জানলাটার পাশে ২নং সেটে ক্যাবলরাম কাগজের উপর তুলি বুলিয়ে চলেছে অবিশ্রান্ত গতিতে—হাতের বিড়িটা পুড়তে পুড়তে লাল রং-এর গণ্ডী দেওয়া সুতোটাও পার হয়ে গেছে তবুও টানার বিরাম নাই!

ক্যাবলরাম আড় চোখে একটু বীরেনের দিকে চেয়ে বলে ওঠে আর্টিস্টিক স্টাইলে—

"কেন পান্থ ক্ষান্ত হও হেরে দীর্ঘ পথ
উদ্যম বিহনে কারও পুরে মনোরথ!"

ঘাবড়ে যাও কেন! বুঝলে ভায়া—

বীরেন বল নোতুন লেখক! সুতরাং লেখার নাম শুনে তড়াক করে বিছানা থেকে উঠে বার করে বসল খানকয়েক পাণ্ডুলিপি!

'আরে তুমিও ক্ষেপেছ ক্যাবল! মিঃ বটব্যাল—নাম শুনেছ বিরিঞ্চাক্ষ বটব্যাল। বর্তমান বাঙলার মস্ত সাহিত্যিক। তিনি বলেছেন, বীরেন লিখে যাও, তুমি রবি ঠাকুর হবে, না হয় ছোটখাট একটা সেক্সপীয়র হবে!'

সামনের চাঁপা গাছটার সবুজ পাতার আড়ালে লুকিয়ে রয়েছে সুন্দরীর হাসির মত দু'একটা চাঁপার কলি, বাইরের দিকে চোখ বুলিয়ে ক্যাবলরাম বলে উঠে—'কিছু জুটল কি হে—না এমনিই ঘুরে এল দরজায় দরজায়?'

আমতা আমতা করতে থাকে বীরেন—'না আজ বিশেষ কিছুই হল না—দু'একদিনের মধ্যে।'

জলের বাটিটার মধ্যে তুলিটা ফেলে দিয়ে বলে ওঠে—'যাক যথেষ্ট হয়েছে,'...বালিশের তলা থেকে বের করে দিলে একটা চকচকে সিকি!

'এই নাও গঙ্গার জলে নেয়ে চলে যাও—'অন্নপূর্ণা নাই যে' বেলা হয়ে গেছে অনেক!' বীরেন সিকিটার দিকে ম্লান নিষ্প্রভ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে—'এই নিয়ে দশ আনা হল!'

ক্যাবলরাম নির্বিষ্টচিত্তে তুলি বুলোতে বুলোতে জবাব দেয়—'ওসব হবে পরে—'

পাশের ঘর থেকে একটা আর্তনাদ আসতে বীরেন চমকে ওঠে! আশ্বাসের সুরে বলে ওঠে ক্যাবল—যাওনা তুমি, ও বুড়ো এমনিই চেঁচায় পড়ে পড়ে সারাদিন। ধীরে ধীরে বীরেন বার হয়ে আসে! পাশেই ঝুলে-পড়া ফাটা বারান্দাটা, শেওলাতে যাম রেলিংগুলো সবুজ হয়ে গিয়েছে...মাঝে মাঝে গজিয়েছে দু'একটি 'কুকসিমে' 'অশথগাছ'। জানালার মলিন কপাটগুলো অন্তর্হিত হয়ে গেছে—খড়খড়িগুলো দাঁড়িয়েছে একটা বিচিত্র বস্তুতে! চুণ বালিগুলো ঝরে পড়েছে ঘরের মেঝেতে—ঝরে-পড়া রাবিসের মাঝে দেখা দিয়েছে নোনা ধরার দাগ!

ছেঁড়া একখানা মলিন কাঁথার উপর পড়ে রয়েছে একটা সজীব নরকঙ্কাল! গালের চোয়ালের হাড়গুলো বেরিয়ে এসেছে, লম্বাটে মুখখানাতে মৃত্যুর করালছায়া—কোন অজানা লোকের বিভৎসতার ছাপ ফুটে উঠেছে তার চাউনীতে! নিষ্প্রভ চোখ দুটো ভীষণভাবে জ্বলতে থাকে!

বীরেনকে দেখেই বিকৃত কণ্ঠে চীৎকার করে ওঠে, "জামা পরেছ আর আমাকে চার পয়সার মুড়ি এনে দিতে পার না? ভদ্দর লোক—? নেহি মাংতা—!"

উত্তেজনার আবেগে রগের শিরগুলো দড়ির মত মোটা হয়ে ফুলে ওঠে। সারাটা দেহে দেখা দেয় ব্যথা কাতরতার ছাপ—আর্তনাদ করে ওঠে পরক্ষণেই!

পার্বতী গেছে কোথাও রোজগারের চেষ্টায়! ঐ মেয়েটাই যা দেখাশুনা করে রুগ্ন বাবার। বিবাহযোগ্যা হয়েছে মুখে তা সকলেই বোঝে, কিন্তু কথাটা কুঞ্জলালকে বোঝাবার চেষ্টা করলেই বিপদ, পড়ে পড়েই তাকে দশকথা ইনিয়ে বিনিয়ে শুনিয়ে দেবে! অবশ্য এ নিয়ে এখানকার কেউ অনুযোগ করে না—করা আবশ্যকও বোধ করে না। তা ছাড়া করবার সময় নাই!

বীরেন মুড়ি কিনে ফিরছে কুঞ্জলালের জন্য—সামনেই পার্বতী! মলিন কাপড়খানা নিটোল দেহখানাকে ঢাকতে বৃথা চেষ্টা করছে—নীচেতলার মুরলীর কাঁধে একটা কেরোসিন কাঠের সিংগলরীড বাঁয়া ফ্লুট হারমোনিয়াম—পিছু পিছু পার্বতী! একটা কিছু না করলে চলবে কেন—? অগত্যা গান গেয়েই রোজগারের চেষ্টা দেখতে হয়!

পার্বতীকে দেখে কুঞ্জলাল গর্জন করে ওঠে—কই দেখি কি এনেছিস! একরকম ঝাপটা দিয়ে তার হাতের পয়সাগুলো ছিনিয়ে নিল! সামনেই পড়েছিল একটা তোবড়ান টিনের গেলাস—শীর্ণ পাকাটির মত হাতখানা দিয়ে সজোরে ছুড়ে দিলে পার্বতীর দিকে! —হারামজাদী কই—গাঁজা কই—তোর পিণ্ডি দোব আজ হতভাগী—যম তোকে নেয় না?"

পাশের ঘরে অর্শহারী অঙ্গুরী, বঙ্গবীর দন্তচূর্ণ, আশনবিকাশ বটি আবিষ্কারক মেগেন্দ্র লালচে ছোপ লাগান দাঁতকটা বের করে বাবা মেয়ের ঝগড়া মিটুতে আসে! কিন্তু দরকার হয় না!

সঙ্গে সঙ্গে কুঞ্জলাল চোখ কপালে তুলে দিয়ে কেমন করতে থাকে—পার্বতী মেজে থেকে গেলাস কুড়িয়ে নিয়ে খানিকটা জল দিতে থাকে তার চোখে মুখে!

বীরেন লিখে চলেছে অবিশ্রান্ত গতিতে! চারিদিকে রাত্রির নিথর মূর্তি দিক দিগন্তে ছড়িয়ে পড়েছে। ঐ এলবার্ট জুট

মিলের কালো কালো চিমনীগুলো টিনের সেডটা রাত্রির স্বল্পালোকিত আঁধারে মনে হয় কোন প্রেতপুরী—সামনের জলাভূমিতে, বনে বাতাসের কানাকানি। না-জানা ভাষায় জানিয়ে যায় রাত্রির ভালবাসা—আনন্দে তাদের সারাদেহে খেলে যায় শিহরণ।

নীচেকার ঘরগুলোতে হৈ চৈ তখনও থামেনি—'দয়াময়ী অপেরা পার্টি'র রিহার্সেল চলছে! মুরলী মেগেন্দ্র কানু সতীশ অনেকেই আছে! অধিকারী মশায় অর্শের ব্যারামের জন্য তক্তপোষের উপর তুলোর ছোট গদির উপর বসে মোশন দিচ্ছেন—এ্যাই কেলো, ভূতে পেয়েছে নাকি? ব্যাটা নাকে কথা কইছিস যে! চাপ চাপ গহনা—দাসী বাঁদী হাবসী খোজা—একি যা-তা কাণ্ড! ভাল করে পার্ট কর, কুঁজো হলে চলবে না—মস্ত রাণী! ওরে ব্যাটা হতভাগা শুনলি! চারিদিকে ঘুরবি ঘুরবি—নইলে জমকাবে কেন?

যাকে উদ্দেশ করে কথা সেই কেলোর কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই! বিড়ীটাতে বাঁদরের মত মুখ বিকৃত করে কতক্ষণ ভিউয়েশন দিয়ে টান দেওয়া যায় তারই পরীক্ষায় ব্যস্ত!

মুরলী হারমোনিয়ামটা ছেড়ে বলে ওঠে, বুঝলেন অধিকারী মশায়, রাণী যদি করতে পারে তবে ওই যে দাঁড়িয়ে রয়েছে...!

সামনে সাপ দেখার মত চমকে ওঠে অধিকারী মশায়! পরক্ষণেই চীৎকার করে ওঠেন—আবার এসেছিস তুই! হ্যা—ঐ আগুনের খাপরার মত মেয়েকে আমি দলে আনব! আমার কি বাহাত্তুরে ধরেছে নাকি! যা বলছি......এখান থেকে! বাপ বুড়ো মরতে বসেছে আর উনি এসেছেন ঢলাঢলি করতে! দড়ি কলসি নিয়ে খালে ডুবতে পারিস না! যাত্রাদলের রাণী করবেন! ভাগ—ভাগ বলছি!"

দরজার বাইরে এসে এক ঝিলিক হাসিতে মুখখানা রাঙিয়ে তুলে পার্বতী জবাব দেয়—"যাব না—এটা কি তোমার কেনা জায়গা নাকি! কই তাড়াও দেখি কেমন মরদ!"

তার দস্তভঙ্গী দেখে অধিকারী মশায় নরম হয়ে আসেন! ঘরখানা ভরিয়ে তোলেন হাঁকডাকে—"নে নে তোরা সব হাঁ করে দেখছিস কি! ওহে বেন্দ, সখীর দলের পাঁচ পায়ের নাচটা একবার রপ্ত করে নাও, সেই যে দ্বিতীয় অঙ্ক—তৃতীয় গর্ভাঙ্কের রাজপ্রাসাদের সিনে—গানখানা 'এস হে পরাণ প্রিয়—' পাঁচ পায়ের নাচ হবে!...... নাচরে ব্যাটা হতভাগা......এই এক—তিন পাঁচ! পাঁচ তিন .....দুই......"

দড়ির মত পাক দেওয়া শরীর নিয়ে অধিকারী মশায় নাচ শুরু করেন!...... পার্বতী মুখ টিপে টিপে হাসতে থাকে!...

বীরেনের কলমও চলেছে বিরামহীন গতিতে! মোমবাতিটা পুড়ে পুড়ে মাঝে খাল হয়ে এসেছে, তবুও লেখার বিরাম নেই! আলোটার চারিপাশে দেখা দেয় রঙের সাতনরী। বাইরের আকাশে মিটমিটে তারার মেলা! উজ্জ্বল ছায়া-পথ—জ্বলন্ত নীহারিকাপুঞ্জের অর্থহীন দৃষ্টি...বাইরের ধরিত্রীকে ভরিয়ে তুলেছে! ......চীৎকার তখনও থামেনি যাত্রা-দলের......! নীরবতার বুকে চাবুক মারার মত তীব্র আর্তনাদ করে ওঠে—কুঞ্জলাল। পার্বতী ঘরে নাই—কোথায় গেছে কে জানে!

বাড়িখানার মালিকও কেউ নাই—প্রজাও কেউ নেই! একটা ছোট খাট স্বাধীন রাজ্য!......যেখানে কেউ কারও ন্যায্য অধিকারে হাত দেয় না! সবাই সমান!... দয়াময়ী অপেরা পার্টির রাণী 'কেলো'—বঙ্গবাসীর দন্তচূর্ণ আবিষ্কারক মেগেন্দ্র—ওস্তাদ মুরলী—এলবার্ট জুট মিলের মহেন্দ্র—কুঞ্জলাল—পার্বতী সকলেই সমান ......ফাঁক রয়ে গেছে বীরেন ক্যাবলরামের বেলায়—একটা ঘর দুজনার অধিকারে! বাড়িটার প্রকৃত মালিক কে তার পাত্তা আজও হয়নি, অবশ্য এ নিয়ে অনেক বড় বড় মাথা ঘামছে; মায় হাইকোর্টের ব্যারিস্টাররা অবধি! সেই সুযোগে ওটা পরিণত হয়েছে উন্মাদ আশ্রমে। হয়ত এ নামের মূলে আছে কোন ইতিহাস—সে আমি জানি না......!

কাল থেকে হয়েছে পার্বতীর জ্বর। রোদে রোদে ঘুরে! রাস্তায় গান গেয়ে যা দুপয়সা আসে তাও বন্ধ!......জ্বরের তাড়সে তৈলহীন চুলগুলো উস্কো-খুস্কো হয়ে সারাটা মাথায় মুখে ছড়িয়ে পড়েছে...। চোখ দুটো টকটকে লাল! কাপড়খানা জড়সড় করে চাপা দিয়ে পড়ে রয়েছে! কুঞ্জলাল মাঝে মাঝে শীর্ণ পা দুখানা দিয়ে লাথি মেরে চলেছে—"মর—মর তুই! আর যেন উঠতে না হয়! ঠ্যাংএ দড়ি বেঁধে ওই খালধারে ফেলে দিয়ে আসব! মর তুই!"

শীর্ণ কোটরাগত চোখ দুটো চিক্ চিক্ করে ওঠে বুভুক্ষু অন্তরের দীপ্তিতে!

সামনেই মুরলীকে দেখে কুঞ্জলাল বলে ওঠে—"দেখ 'গোদানীর' কীর্তি......! ঘাপটি মেরে পড়ে রয়েছে! বসে বসে খাট লেবার মতলবে! এ্যাই ওঠ!"

বীরেন সেদিন টুইশানির মাইনেটা পেয়েছে—বারান্দা দিয়ে আসছিল নিজের আড্ডাতে......পা দুখানা যেন তাকে টেনে নিয়ে গেল ঘরের মধ্যে! কখন ও যে একটা টাকা দিয়েছিল কুঞ্জলালকে তা বুঝতেই পারেনি!......সেদিনটা ভালভাবেই কুঞ্জলালের! পয়স মুড়ি আর খানিকটা জলসুটে তৃপ্তির সঙ্গে গিলে চলেছে! হাড় ক'খানা যেন হাওয়া খেয়ে রয়েছে! ঐ অস্থিপঞ্জরের কারাগা শীর্ণ আত্মা কালের সঙ্গে তাল ......কাঁপছে—ওকি থামবে না—!.

ডাগর চোখদুটো মেলে পার্বত দিকে চেয়ে রয়েছে!......

......বীরেন পা দুটো নাড়া অলসভাবে! ভাঙ্গা বিবর্ণ দিয়ে লুটিয়ে পড়েছে ঘরের মধে ফালি সোনালী রোদ—ক্যাবলের চমক ভাঙ্গে বীরেনের!

মাটির হাঁড়িটায় নানা রংএর ধোয়ার ফলে জলটা হয়েছে, ঘো ছেঁড়া মাদুরখানার পাশে ছোট্ট বাক্সটা উপুড় করে টেবিলে পরিণ হয়েছে......তুলিগুলো 'রেডি' করতে ......প্রশ্ন করে ক্যাবল—"বীরু ঘু ত—টুইশুনীতে যাবি না!"

আড়ি-মুড়ি ছাড়তে ছাড়তে..... দেয় বীরেন—"ব্যাটা দেবে ত মোটে টাকা, বলে কিনা ছেলে কিছু পারছে না!......আপনি পড়ান মোটে ঘণ্টা, ওতে কি কিছু হয়—একটু বে 'কনফাইন' করে রাখবেন।

"তাই ছেড়ে দিয়ে এলি।"

তুলো বের করা ফাটা বালিসটা জোরে আঁকড়ে ধরে জবাব দেয়—"ছা না ত কি, ব্যাটা ভুড়িয়াল বেনের—ম কান্ত আদুরে গোপালর রূপ দেখ এমনি ছেড়ে দিয়ে আসিনি—বেশ দু কথা শুনিয়ে দিয়ে এসেছি!"

"এইবার! লিখে তোপাচ্ছ হাতী ঘোড়া! কাগজ কিনবে কিসে! আর হাতের ব্যবস্থা......!"

তন্দ্রাজড়িতকণ্ঠে বলে ওঠে বীরে "ঘাবড়াও মাৎ ব্রাদার! রাম না হ আগেই রামায়ণ হয়েছিল......! 'আগা কাল' কাগজে চাকরী পেয়েছি একটা, স এডিটার!"

আনন্দের আতিশয্যে ক্যাবলরাম সাম বাক্সটাকে উলটে দিল......আর এব হলেই পায়ে পড়ত আর কি! দুজ হাসি সারা বাড়ির গোলমাল ভেদ ক আকাশে ছড়িয়ে পড়ল প্রভাতের অরু কিরণের সঙ্গে!

ফ্যাসাদ আসে একটার পর একটা—কখন বা অনেকগুলো একসঙ্গে। মুরলী অ মেগেন্দ্র—লেগেছিল ঝগড়া, ক্রমশ হাতাহা তারপরই এই ফ্যাসাদ! আধভাঙা তব

...খের পায়ার এক ঘায়েই মুরলীর মাথাটা ...টে গেছে খানিকটা।

কারণ ঐ পার্বতীকে নিয়েই! অবশ্য ...ক যা অনুমান করেছেন, তার জন্য নয়! পার্বতী আর মুরলী যেত গান গেয়ে রোজকার করতে! হ'তও দু-চার পয়সা... ...তায় বাজারের সামনে বা কলেজের ...টের বাইরে,—দু-একখানা সস্তাদরের ...নেমার গান—হিন্দী হ'লে ত কথাই নাই ....ব্যস! রোজকার মন্দ হ'ত না! আজ ...ল মেগেন্দ্র ঐ রকম একটা কিছু ...বার মতলব করেছে! নিজের 'বংগবীর ...তচূর্ণ', 'অনশন বিকাশ বটিকা' ত আছেই ...র উপর পার্বতীকে নিয়ে যেতে পারলে ...টবে ভালই। পার্বতীও অমত করে নি... ...ল বাধিয়েছে ঐ মুরলী—ওর ব্যবসা আর ...বে না!

কপালের পাশ দিয়ে জমা রক্ত গড়িয়ে পড়ছে, ছেঁড়া পপলিনের জামাটা ভিজে গেছে জায়গায় জায়গায়। হাতে একটা ফরমা ইট তুলে নিয়ে চীৎকার করছে, "খুন করেংগা শালাকো—পুলিশে না দিই ত নাম নাই! আমার নামে একটা কুকুর পুষবি!

শীতলাতলায় যাত্রা হবে ......দয়াময়ী অপেরা পার্টির কেলো সেজেগুজে তৈরী হচ্ছে—'রাণী'র জন্য—মুখে রং মেখে, ভ্রূ দুটো কান অবধি টেনেছে, আর ওই চীৎকার!" মেগেন্দ্রকে ধরে রয়েছে! সে-ও মাঝে মাঝে গর্জন করতে থামে না—ওস্তাদ আমীর রে! সারাদিন নাচিয়ে গাইয়ে দিস্ ত মোটে দশ আনা! আমি দোব দেড় টাকা! এক রুপেয়া আট আনা! পারে-গা শালা!

মুরলীকে কেউ ধরে নি। নিজে থেকেই দু' এক পা এগিয়ে আসছে, হাতের ইটটা তুলে আবার পিছিয়ে যাচ্ছে আপনা থেকেই —'ভারি দেনেয়ালারে—চকখড়ি গুড়ো করে "বংগবীর দন্তচূর্ণ", তেঁতুল কাঁইয়ের তৈরী 'অনশন বটি,'—বেশী চালাকি করবি ত দেব সব ফাঁস করে!"

জ্যামুক্ত ধনুকের মত লাফ দিয়ে ওঠে মেগেন্দ্র—"তবে রে শালা!"

রাণীবেশী কেলো ছিটকে পড়ল দূরে, কোন রকমে টাউর খেয়ে সামলে নিল! ...রলী গিয়ে খিল দিয়েছে ঘরে!

মীমাংসা হ'ল রাত্রিবেলা ক্যাবলরামের মধ্যস্থতায়। ওরা তিনজনেই একসংগে ...বে; বখরা হবে সমান তিন অংশ!

আশ্রমবাসীদের বছরের আর কয়েকটি ...স থাকে একটা বিপদ, অন্নচিন্তা! কিন্তু ...র্ষাকালে আসে আর একটা! সারাটা বাড়ি ঝাঁঝরার মত ফুটো, কড়িকাঠ-বরগার গা বেয়ে লক্ষ ধারায় ঝরে পড়ে বারিরাশি। নুইয়ে পড়া আকাশের বুকে জাগে মহাকালের ক্রন্দনধ্বনি! মেঘমেদুর আকাশ ভরে যায় কোন অদৃশ্য রূপসীর অশ্রু-রেখায়!

সামনের জলাটা ভরে গেছে! মজা খালের বুকে ঘন সবুজ কচুরীপানাগুলো পরিণত হয়েছে ভাসমান দ্বীপপুঞ্জে! ভায়োলেট রংয়ের থোকা থোকা ফুলগুলো সীমাহীন আকাশের দিকে চেয়ে ভিজছে! এলবার্ট জুট মিলের চিমনীগুলো দিয়ে বের হচ্ছে বিসর্পিল রেখায় গাঢ় ধূম্ররাশি—কলঙ্কী আকাশের সাথে যেন ওর মিতালী! বাঁধাহারা হাল্কা মেঘের দল দেশ-বিদেশের ডাকে ভেসে চলেছে!

বীরেনের সামনে জেগে ওঠে অতীত দিনের স্মৃতি-ভারাক্রান্ত কাহিনী! কোন্ স্বপ্নঘেরা গ্রামপ্রান্তে নেমেছে আজ বাদল মেঘের ছায়া-কাজল কালো জলরাশি—নেচে উঠেছে কার আহ্বানে! ঘন কেয়াবনের তীব্র সুবাস—জল-ভারাক্রান্ত বাতাস আমোদিত করে তুলেছে! মায়ের কথা, তাঁর স্নেহাতুর চোখ দুটো, আজও মনে পড়ে, পড়বে চিরদিনই। এমনি কোন মেঘমেদুর দিনের শেষে—সন্ধ্যার নির্ণিমেঘ আঙিনায় নেমে এসেছিল রাত্রির নীরবতা—সেই দিনে সে হারিয়েছিল তার মা'কে! সেদিন ছিল বন্দন মুক্তির অভিষেক! সামনের চিমনীগুলো, ঐ জলাটা ঝাপসা হয়ে আসে! চোখ দুটো অশ্রুপূর্ণ হয়ে ওঠে!

সব কিছু ভেদ করে কানে আসে কুঞ্জলালের চীৎকার ধ্বনি! আর তত তীব্রতা নেই—ক্ষীণ হয়ে এসেছে তার কণ্ঠস্বর! আর হয়ত বেশী দিন না—ধরণীর আলো ছায়া, সকালের সোনালী মিষ্টি রোদ দিনান্তের সাতনরীর সাথে ওর চোখে আর মায়াজাল রচনা করবে না! এসেছে ওর কানে নতুন কোন জগতের ডাক।

কাল সারারাত্রি কাউকে ঘুমোতে দেয়নি। শুয়ে থেকে পিঠে হয়েছে 'বেড-সোর,' তার উপর ওষুধ-পথ্যও নাই! কাশতে কাশতে বুকটা টেনে ধরে, চোখদুটো যেন বার হয়ে আসতে চায় কাশির ধমকে, একটু পরেই লুটিয়ে পড়ে অসহায়ভাবে চোখদুটো বুজে আসে!

মেগেন্দ্র মাঝে মাঝে কবিরাজিও করে—পাচন-জারক টুকিটাকি অনেক কিছুই জানেও...! সুতরাং চিকিৎসার ভার ওরই উপর!

মুরলী বলে ওঠে—"বাবু, হাসপাতালের গাড়ি আনলে হয় না—"

হতাশভাবে মাথা নাড়ে বীরেন—ওকে আর এ জীবনে সেখানে পেঁছুতে হবে না।

সেইদিন রাত্রে আশ্রমে এসেছিল নিথর নীরবতা, রাত্রিশেষে তারকার ম্লান আলো অনুসন্ধিৎসু নয়নে চেয়েছিল ঐ ধ্বসে-পড়া বাড়িটার দিকে—কি যেন এখানে হাতড়াচ্ছে!

নীরবতা ছিন্নবিচ্ছিন্ন ক'রে উঠেছিল পার্বতীর আর্ত কণ্ঠস্বর!...রোগজীর্ণ বুড়ো কুঞ্জলাল রঙীণ ধরণীর মায়া কাটিয়েছে, এতদিন পর—আজ রাত্রিশেষে!

শীর্ণ কংকালখানার উপর একটা চাদর ফেলে দিল মেগেন্দ্র—ওর দিকে চাইতে ভয় লাগে!

কাহিনীটা আমি লিখতাম না—লিখবার মত কিছু নেইও এতে...কোন হতভাগ্যের ডায়েরির কয়েকপাতা মাত্র! শেষের কাহিনীটুকু যোগাড় হয়ে গিয়েছিল বিচিত্রভাবে, যার জন্য এ কাহিনীর অবতারণা—নইলে আর সাধারণ কতকগুলো মানুষের কাহিনী লিখতে বসতাম না রাত্রি জেগে!

বি বি এফ সি আই কোম্পানীর গাড়ি! দিক্‌হীন মরুপ্রান্তরের বুক চিরে রক্ত-পিংগল বর্ণের বন্ধ্যা ধরণীর বুকের উপর দিয়ে চড়াই উৎরাইএর ভাঁজে ভাঁজে শূন্যের বাঁধনহারা রশ্মি!...ছোট ছোট খেজুরগাছগুলো শতজন্মের অভিশাপ বুকে নিয়ে রয়েছে...ক্লান্ত প্রান্তরের শেষে পাহাড়ের কাছে ধোঁয়াটে ছায়ার দিকে—আত্মীয়, বংশধর ওরা! এখানে-ওখানে ছড়ান ... গাছের জংগল!

দেউলি থেকে আসছেন এক ভদ্রলোক—উস্কোখুস্কো চেহারা, চুলগুলো খাড়া হয়ে রয়েছে!...বহুদিনের যবনিকা ভুলে মনের দ্বারে এসে ঘা দেয় ওর মূর্তিটা—যেন পরিচিত!—হ্যাঁ, নিশ্চয়ই পরিচিত! কিন্তু সাহস করে কথা কইতে পারলাম না!...টুণ্ডলা জংশনে গাড়িখানা পেঁছতেই খর্বকায় সেই ভদ্রলোক সুটকেশটা হাতে নিয়ে নেমে গেলেন...ভিড়ের মধ্যে আর তাঁকে দেখতে পেলাম না!..দেখি, ওপাশে তাঁর বেঞ্চিটার উপর পড়ে রয়েছে একখানা খাতা—বোধ হয় ডায়েরি!...হ্যাঁ, ঠিক তাই!...

...পাঁচ বছর। পাঁচটা বছর চলে গেল আজ দেখতে দেখতে!...এল আমার বন্ধন-মুক্তির দিন!...আজও মনে পড়ে—যেদিন ছেড়েছিলাম আশ্রমের ওদিকে!...মেগেন্দ্র, মুরলী, কেলো, পার্বতী, ক্যাবলরাম...ওদিকে!...কি যে মায়ায় বেঁধেছিল ওরা জানিনা—যেদিন ইনটার্ন হয়ে এলাম, চোখ দিয়ে ঝরেছিল দুঃখের অশ্রু—ওরাই ছিল আপন! সব চেয়ে আপন!... বাঙলার আকাশ-বাতাস থেকে আমার সত্তা মুছে গিয়েছিল...বাইরের আলো-বাতাস--উদার ছায়াঘেরা পৃথিবীর ভালবাসা—মুক্ত সুনীল আকাশ আমি দেখিনি আজ পাঁচটা বছর! ...আমার চোখে নেমেছিল জেলখানার বাঁধা অশত্থগাছের জালবোনা ছোট্ট একফালি

আকাশ, কয়টা তারকামাত্র, কোনদিন বা একটু পড়ন্ত সোনালী রোদ!...আজ আমার মুক্তি-দিবস! আবার ফিরে যাব ব'ঙলায় 'আগামীকাল' পত্রিকা আপিসে! ঐ মহেন্দ্র-মুরলী-পার্বতী-ক্যাবলের উন্মাদ আশ্রমে! দু'হাত মুঠো করে ধরব—বাইরে রোদ—ওদিকে আমি ভালবাসি...! ভালবাসি!!

বোধহয় দু'একদিনের মধ্যেই লেখা—আর লেখা হয়নি তার পর!

...কিছুদিন পর ঐ আশ্রমের পাড়াটা দিয়ে যাবার সময় দেখি—পুরোনো বাড়িখানা কারা নির্দয়ভাবে ভেঙে ফেলেছে!...তৈরি হচ্ছে নূতন একখানা বাঙলো প্যাটার্নের বাড়ি!... হাইকোর্টের মামলা নিষ্পত্তির পর বাড়িখানা থেকে বার ক'রে দিয়েছিল ভিখেরির দলকে! ...মহেন্দ্র, মুরলী, কেলো, পার্বতী—ঘূর্ণি-হাওয়ায় কে কোন্ দিকে ছড়িয়ে পড়েছে জানি না!...জানবার ইচ্ছাও নেই!

...অনেকদিন হয়ে গেছে, যাচ্ছি একটা রাস্তা ধরে...কি একটা কাজে। রাস্তার বাঁ-হাতি একটা সরু গলির মোড়ে...পার্বতী সিগারেট টানছে!...তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে চলে—কি জানি যদি দেখা হয়ে যায়!

বীরেনের ডায়েরিখানা আমার কাছে গেছে, তার কোনো পাত্তা করতে পারি মাঝে মাঝে দু'চার পাতা উলটে-দেখি—মনে আসে অনেক কথা—মেগেন্দ্র-ক্যাবল-পার্বতী-বীরেন—ওরা উন্মাদ ছাড়া আর কিছুই নয়! ধ ধরণীতে দুঃখকষ্টের তীব্র তাড়না দারিদ্র্যের মাঝেও যারা বাঁচতে চায় প্রাণ তারা আর কিছু বটে কিনা জানিনা—অনেকের মতে উন্মাদ, তাতে সন্দেহ

রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন

(২৭৭ পৃষ্ঠার পর)

কৃতী ছাত্রের কৃতিত্বের দ্বারা বিদ্যালয়কে বিচার করিবার নিয়ম প্রচলিত, আমার মনে হয়, এ বিচার ন্যায় বিচার নয়। অকৃতী ছাত্রের দ্বারাই বিদ্যালয়ের পরিমাপ হওয়া উচিত। কেবল ইটের সরে ইট সাজাইয়া অট্টালিকা খাড়া করা যায় না, তাহাদের শক্ত করিয়া ধরিয়া রাখিবার জন্য ইট-গুঁড়ানো সুরকির প্রয়োজন; অকৃতী ছাত্ররা সেই সুরকী। শিকলের শক্তি তাহার দুর্বলতম গ্রন্থিটির উপরেই নির্ভর করে। শান্তি-নিকেতনের সেই অকৃতী ছাত্র দলের আমি অন্যতম।

যে বীথিকা গৃহে আমার আশ্রম জীবনের প্রথম রাত্রি অতিবাহিত হইয়াছিল, সতেরো বছর পরে সেই ঘরেই আমার আশ্রম জীবনের শেষ রাত্রি প্রভাত হইল। তখন গ্রীষ্মাবকাশে আশ্রম নির্জন। ইতিমধ্যেই পায়ে-চলা পথগুলির উপরে ঘাসের সবুজ আভা দেখা দিয়াছে।

অদূরে বটগাছ তলায় জগদানন্দবাবু বসিয়া বইয়ের প্রুফ দেখিতেছিলেন। তাঁহাকে গিয়া প্রণাম করিলাম। তিনি অর্ধমনস্কভাবে প্রতিবার যেমন বলিয়া থাকেন, তেমনি বলিলেন, কি, চললে? আবার কবে আসছ? আমি বলিলাম—আমি তো আর আসবো না। এবারে তিনি কাগজ হইতে মুখ তুলিয়া অন্যমনস্কভাবে মাঠের অপর প্রান্তে তাকাইয়া রহিলেন। আমি চলিয়া আসিলাম।

আমার মোটর ছাড়িয়া দিল। শালের শ্রেণী নিশ্চল; শিরিষ গাছে বাঁধা দোলনাটা অকারণে কাঁপিতেছে; বাঁয়ে দেহলী ভবন শূন্য; ডাইনে মেয়ে বোর্ডিংয়ের চালের উপর দুটি শালিখ; মোটর স্টেশনের পথে পড়িল; পূবে সূর্য ওঠার মাঠ; পশ্চিমে শান্তিনিকেতন পল্লী, মাঝখানে প্রান্তরের হৃদয়বিদীর্ণ রক্তচিহ্নিত পথটির অফুরন্ত দীর্ঘতা; পুঞ্জিত তরুরাজির অন্তরালে নীচু বাঙলার টালির ছাদের চকিত রক্তিমা; বাঁধের জলের ক্ষণিক ইস্পাতের আভাস; মোটর ভুবনডাঙা গ্রামের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল—এক মুহূর্তে বহুকালের শান্তিনিকেতন তরুশ্রেণীর যবনিকার আড়ালে অন্তর্হিত হইয়া গেল। আবার মোটর মাঠের মধ্যে পড়িল। নাঃ, পিছনে পরিচিত আর কোন চিহ্নই দেখা যায় না, চতুর্দিক অকাল কুয়াশায় ঝাপসা; আর সম্মুখে কেবল অন্তহীন ধূসর পথ।

প্রথম পালাটির আশ্চর্য সফলতা দেখিয়া আমাদের উৎসাহ বাড়িয়া গেল। তখন দ্বিতীয় পালা লিখিয়া ফেলিলাম—'ঘোষ-যাত্রা।' এই পালাটি মুদ্রিত হইয়াছিল, এখন সম্পূর্ণরূপে দুষ্প্রাপ্য। 'ঘোষ যাত্রা'ও আসরে উৎসাহের সঙ্গে অভিনীত ও গৃহীত হইল। তারপরে লিখিলাম কর্ণ মর্দন, অর্থাৎ কর্ণ বধের পালা। কর্ণ মর্দন নামটার মধ্যে বোধ করি কিঞ্চিৎ শ্লেষ ছিল; স্থানীয় কোন কোন লোক চটিয়া গেলেন, শেষে এমন হইল শ্লেষটা লেখকের উপরে প্রায় আসিয়া পড়ে আর কি! লেখকের বাঁচিয়া গেলেও যাত্রা পালা রচনার শেষ হইল। তখন আমাদের যাত্রার গান এমন লোকপ্রিয় হইয়াছিল আশ্রমের অনেকের মুখেই সর্বদা যাইত। এখনও হয় তো দু'চারটা কারো কারো মনে থাকিতে পারে।

বিদায়

ক্রমে আমার শান্তিনিকেতন ছাড়ি সময় আসিল। এবার বৃহত্তর পৃথি প্রবেশ করিতে হইবে; সেখানকার পথ রীতি নীতি, ভাল মন্দ সবই অজ এতদিন যাহা সত্য মনে করিয়াছি, য জীবনের নিয়ম বলিয়া মানিয়াছি তাহা সেখানে স্বপ্ন বলিয়া উপহসিত হইবে সেখানে গিয়া কি মনে হইবে না, ' ছাড়া সৃষ্টি মাঝে বহুকাল করিয়াছি বা আবার বহুকাল সেখানে বাস কা একদিন কি শান্তিনিকেতনের জীবন স্বপ্ন বলিয়া মনে হইবে না? হয় দুটোই স্বপ্ন, দুই রকমের স্বপ্ন? যদি হয় তবে কবির স্বপ্নের চেয়ে কা স্বপ্নকে সুন্দরতর সত্যতর মনে করি কি থাকিতে পারে? কিম্বা কবির স্বপ্ন স্বপ্ন বলিব কেন? তাহার যে বাস্তব আছে, তাহাকে স্বপ্ন না বলিয়া Visi বলাই উচিত।

মাটির গায়ে লেখার খেলা

শ্রীশরদিন্দু রায়

প্রাচীন মেসোপটেমিয়ার কথা। সমৃদ্ধিশালী দেশ, নগরে নগরে ঐশ্বর্যের মেলা। অধিবাসীরা প্রায় সকলেই লক্ষ্মীর বরপুত্র, কাজেই সরস্বতীর সঙ্গে তাদের আড়ি। লেখা-পড়ার কথা শুনলে তাদের গায়ে জ্বর আসত। বিশেষত 'লেখা' ব্যাপারটা এত কম লোকেরই জানা ছিল যে, দেশের রাজাও লেখাপড়া জানা থাকলে গর্ব করে বেড়াত। লিখন-প্রণালীতে অনভিজ্ঞ হলেও এদেশের অধিবাসীদের কার্য-কলাপের স্মৃতি অবলুপ্ত হয়নি। মাটির উপর আঁচড় কেটে তারা তাদের লেন-দেন ও ব্যবসা-বাণিজ্যের সমস্ত হিসাবনিকাশ রেখে গেছে।

খৃষ্ট-জন্মের দু' হাজার বৎসর আগেও এদের দেশে নিয়ম ছিল যে, ছোটখাট ব্যবসায়-সংক্রান্ত হিসাবনিকাশও হবে লিখে। আর ব্যবসায়ী ও সাক্ষীদের সেই লেখার গায়ে সই করতে হবে। এদিকে লেখার ধার ধারে না কোন লোকেই। কাজেই, প্রত্যেক লোক তার নামসইটি গলায় ঝুলিয়ে বেড়াত। নামসইটি হচ্ছে নিরেট পাথরের ছোট একটি রুলার। তার উপর আবার ধর্ম ও সমাজ-জীবনের দৃশ্যপট খোদাই করা থাকত। লেন-দেনের খসড়া প্রস্তুত হলে প্রত্যেক ব্যবসায়ী ও সাক্ষী ভিজা মাটির উপর দিয়ে তার রুলারটি গড়িয়ে দিত। এর ফলে কাদার উপর এক-একটি ছাপ ফুটে উঠত। এই ছিল তাদের ব্যক্তিগত নামসই।

এ ব্যবস্থায় অবশ্য অসুবিধা ছিল। মহাজন সহজেই ছাপের গায়ে দু'একটা অতিরিক্ত আঁচড় কেটে টাকার অঙ্কটা বদলে দিতে পারত। একালে এরকম দৌরাত্ম্যের আভাস ধরা পড়ে প্রায়ই চেকের গায়ে। যা'হোক, মেসোপটেমিয়ার লোকেরা এ অসুবিধা কাটিয়ে উঠল। লেন-দেনের খসড়াটা নিরাপদে রক্ষা করবার এক রকম অদ্ভুত ধরণের খাম তৈরি হয়ে গেল। খসড়া লেখা ও সইকরা শেষ হলে মুহুরি সেটি পাতলা কাদার আস্তরণের মধ্যে ভাঁজ করে ফেলত। এর উপর সে আর একবার খসড়াটি আগাগোড়া লিখে ফেলত। সকলের শেষে ব্যবসায়ী ও সাক্ষীরা আস্তরণের উপর তাদের রুলার গড়িয়ে যেত।

কাদার খামে রক্ষিত খসড়ার নিরাপত্তা বিষয়ে কারও সন্দেহ থাকত না। ভবিষ্যতে গোলমাল বাধলে সকলে হাজির হ'ত বিচারকের সামনে। বিচারক শুধু খামটি ভেঙ্গে ফেলে মোকদ্দমা মীমাংসা করে দিতেন।

অট্টালিকার মত সুবৃহৎ মন্দির প্রাচীন মেসোপটেমিয়ার শোভাবর্ধন করত। সেখানে পূজো ত হ'তই, তাছাড়া জাতির সমগ্র জীবনের সঙ্গেও এদের যোগসূত্র প্রবল ছিল। মন্দিরের কর্তারা শিল্পকর্মে উৎসাহ দিত। তাঁতশিল্পের প্রচলনই ছিল সমধিক। তাঁতিদের মাস-মাহিনার হিসাব পাওয়া গেছে এই কাদামাটির খামে। এদের মধ্যে প্রায় সবই ছিল স্ত্রীলোক। এরা মন্দির থেকে মজুরি পেত।

একটি করে বড় মন্দির প্রত্যেক প্রখ্যাত নগরের শোভাবর্ধন করত। এই সব মন্দিরকে অনেক বিষয়ে বিশেষ সুবিধা দেওয়া হ'ত। এদের প্রতিষ্ঠা ছিল অসীম,—অনেকটা আজকালকার বিশ্ব-বিদ্যালয়ের মত। কোনরকম করভারে এরা পীড়িত হ'ত না। তাছাড়া এসব মন্দিরে উপহার আসত ভারে ভারে। দেবতাদের অনুগ্রহলাভের আশায় রাজারা অকৃপণ-হস্তে বিবিধ দ্রব্যসম্ভার মন্দিরে মন্দিরে পাঠিয়ে দিত। মন্দিরের ঐশ্বর্য হয়ে দাঁড়াল স্বপ্নের মত। জাতীয় জীবনের উৎস নতুন ধারা খুঁজে পেল মন্দিরগাত্রে। প্রচুর ভূসম্পত্তি হাতে আসায় মন্দিরের কর্তারা মন দিল কৃষিকার্যে। এ কাজে লোক খাটতে লাগল অনেক। অথবা জমি ভাড়া দিয়ে ও বিলি করে অর্থাগমের উপায় হ'ল। ব্যাঙ্কের মত কর্তারা প্রায়ই চড়া সুদে টাকা ধার দিতে লাগল। সুদের হার ছিল সাধারণত শতকরা কুড়ি পার্সেণ্ট।

আমরা প্রাচীন ব্যাবিলোনিয়ার এই রকম একটি বৃহৎ মন্দিরের হিসাব-নিকাশের ঘর কল্পনা করতে পারি। টাইপিস্টদের দেখা সেখানে মিলবে না। শুধু সারি সারি বসে আছে মুহুরির দল, পাশে রয়েছে কাদামাটির ছোট ছোট তাল। কেউ হিসাব মিলিয়ে নিচ্ছে, কেউবা হয়ত লম্বা একটা যোগ নিয়ে পড়েছে।

দেবতার জন্য উপহার আনলে রসিদ দেওয়া হ'ত। আর মন্দিরের মুহুরি সমস্ত ব্যাপারটা নোট করে একটা ঝুড়িতে রেখে দিত। সপ্তাহের শেষে হ'ত ওদের হিসাবনিকাশ। ও-দেশের মাটি খুঁড়ে এই রকম হিসাবের চিহ্ন অনেক পাওয়া গেছে। মাত্র একই স্থানে একবারে যা পাওয়া যায়, তার পরিমাণ এক লক্ষ।

রাজাদের কাণ্ডও ছিল অদ্ভুত। তারা প্রাসাদ রচনা অথবা মন্দির প্রতিষ্ঠা করলে সমস্ত কাহিনীটি লিখে তার সঙ্গে জুড়ে দিত তার আর সব কীর্তিকলাপের ফিরিস্তি। এসব কিন্তু লেখা হ'ত ছোটখাট কাদামাটির পিপেতে।

রাজাদের এই সব লেখায় মুস্কিল হচ্ছে, আমাদের জ্ঞাতব্য বিষয় আমরা এর মধ্যে সব সময় পাই না। অবশ্য এটা খুবই স্বাভাবিক যে, এরা আত্মপ্রশংসায় পঞ্চমুখ হবে। আসিরিয়া দেশের রাজাদের বীরত্বের গর্ব করাই সম্ভব। অথচ আসলে এদের মধ্যে অনেকেরই কাপুরুষ বলে খ্যাতি ছিল।

বর্তমান বৈজ্ঞানিক ভিত্তিগঠনের জন্য ব্যাবিলোনিয়ানদের কার্যকলাপ অনেক-খানি দায়ী। খৃষ্টপূর্ব দু'হাজার বৎসরের প্রারম্ভেই তাদের বৈজ্ঞানিক মনের পরিচয় পাওয়া যায়। তাদের পরিচিত সব জিনিসেরই একটা শ্রেণী-ভাগ ছিল। এই শ্রেণীভাগ আবার

পরবর্তীকালে সংশোধিত ও রূপান্তরিত হয়ে এসেছিল।

সে সময় চিকিৎসকের সংখ্যা মন্দ ছিল না। জনসাধারণের জীবনে ডাক্তারি-বিদ্যার প্রয়োজন এত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল যে, শেষ পর্যন্ত আইন প্রণয়ন করে একে নিয়ন্ত্রিত করতে হল। হাম্মুরাবি রচিত আইনগ্রন্থে অস্ত্র-চিকিৎসা নিয়ন্ত্রণের বহুবিধ ধারা আছে। অপারেশনকারি সার্জনের ফি-এর পরিমাণ পর্যন্ত নির্ধারিত আছে। অপারেশন সফল না হলে চিকিৎসকের দন্ডের বিধান ছিল। অপারেশনের ফলে কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির প্রাণ-বিয়োগ হলে চিকিৎসকের প্রাণনাশের বিধান হাম্মুরাবি দিয়েছিলেন।

কাদামাটির থামের ভিতর থেকে ডাক্তারি শিক্ষার বইও পাওয়া গেছে কয়েকখণ্ড। চিকিৎসার পদ্ধতি ছিল এই-রকম।—প্রথমে আছে রোগের উপসর্গাদি নির্ধারণ, তারপর প্রেসক্রিপশন, সকলের শেষে দেবতাদের স্তুতিপাঠ। রোগের বিবরণ এত স্পষ্টভাবে লেখা আছে যে, এখনও তার থেকে পাঠ উদ্ধার করা যায়।

মাথায় টাকপড়ার ওষুধ ছিল বিচিত্র। জলপাই তেলের সঙ্গে খানিকটা বীয়ার মদ মিশিয়ে মাথায় ঘষা হ'ত। কানের ব্যথায় গরম তেল প্রয়োগ আড়াই হাজার বৎসর আগে আসিরিয়ানদের আবিষ্কার।

খৃষ্টপূর্ব দু'হাজার বৎসরের মধ্যেই ব্যাবিলোনিয়ানরা অঙ্কশাস্ত্রের মূলসূত্র-সমূহ প্রণয়ন করে। তার পনের শ' বৎসর পরে গ্রীকরা এগুলি পুনঃপ্রবর্তন করে। অঙ্কশাস্ত্রে তারা এত উন্নত ছিল যে, বর্তমানে এ বিষয়ে প্রগাঢ় পণ্ডিত ছাড়া তাদের ভাবধারা বিশ্লেষণ করতে আর কারও সামর্থ্য হবে না।

বহু প্রাচীনকাল থেকে দশমিক নিয়মে গণনা পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। প্রায় একই সময়ে ব্যাবিলোনিয়ান পণ্ডিতেরা ষাট একক ধরে গণনাপদ্ধতি আবিষ্কার করেছিলেন। এই নতুন নিয়মের সাফল্য সুপ্রমাণিত হল তাদের জটিল অঙ্কশাস্ত্রে। কয়েকটি ব্যাপারে এ-নিয়ম এখনও চলে এসেছে পৃথিবীতে। আমরা এখনও সার্কলকে ৩৬০ ভাগে ভাগ করি। ৬০ মিনিটে ও ৬০ সেকেন্ডে যথাক্রমে এক ঘণ্টা ও এক মিনিট ধরি।

কাদামাটীর উপর লিখন প্রণালী অবশ্য খুব সহজ ব্যাপার ছিল না। এর জন্য অনেকদিন কষ্টসাধ্য শিক্ষার দরকার হত। আসিরিয়ান নগরসমূহের ধ্বংসাবশেষ থেকে এ বিষয়ে পাঠ্যপুস্তক আবিষ্কৃত হয়েছে। পাঠ্যপুস্তক অর্থে আর কিছু নয়,—শুধু মৃত্তিকাফলক। ছাত্রদের একবার লেখা হয়ে গেলে শিক্ষকের কাজ ছিল মৃত্তিকাফলকগুলি সংশোধন করা ও সেগুলি মসৃণ করে দেওয়া। মৃত্তিকাফলক এইভাবে আবার ব্যবহারের উপযুক্ত হত। সময় সময় এগুলি অকেজো জিনিসের গাদায় নিক্ষেপ করা হত। প্রত্নতত্ত্ববিদরা এ-রকম অনেক মৃত্তিকাফলক উদ্ধার করেছেন।

মন্দিরস্থিত বিদ্যালয়ের শিক্ষকের কাজ ছিল ভিন্ন রকমের। সহজ পাঠ শিক্ষা দেওয়ার জন্য শিক্ষক প্রথমত ছাত্রদের কয়েকটি চিহ্ন লিখতে দিত। অনেকটা আমাদের বর্ণপরিচয় শিক্ষার মত। তারপর ছাত্রদের ডিক্সনারী থেকে খানিকটা অংশ নকল করতে হত। এতে সকল প্রকার পাথর, জীবজন্তু, নগর ও দেবতাদের সম্পূর্ণ তালিকা থাকত। এর পর ছাত্রদের সাহিত্য বিষয়ক পুস্তক পাঠের অধিকার জন্মাত।

ধনী জমিদারেরা যে উপায়ে গরীব কৃষকদের সম্পত্তি আত্মসাৎ করত, তার বিবরণও বিচিত্র। আইন ছিল যে, কৃষকেরা তাদের জমি বিক্রী করতে পারবে না। জমিদারেরা অদ্ভুত উপায়ে এই আইনকে ফাঁকি দিত। ব্যাবিলোনিয়া ও আসিরিয়াতে নিয়ম ছিল যে, বৃদ্ধ বয়সে সেবার জন্য কোন ব্যক্তিকে দত্তক গ্রহণ করা যেতে পারে। ধনী জমিদারেরা এই নিয়মের খুব ভক্ত হয়ে উঠল। তারা যেচে গিয়ে গরীব কৃষকদের পোষ্যপুত্র হতে লাগল। ফলে কৃষকদের সম্পত্তির সমস্তটা না হোক, কিছুটা অংশে তাদের অধিকার জন্মাল। এই প্রথার এ রকম বহুল প্রচলন ছিল যে, এক ব্যক্তি চারশ কৃষকের পোষ্যপুত্র ছিল, এই প্রমাণ পাওয়া গেছে।

পুস্তক পরিচয়

অতঃ কিম্—বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত (বিনয়কৃষ্ণ বসু চিত্রিত)। রমেশ ঘোষাল—৩৫নং বাদুড়বাগান রো, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য আড়াই টাকা।

কথা-সাহিত্যে সুপ্রতিষ্ঠ বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের এই ছোট গল্পের বইখানি পড়িয়া আমরা আনন্দলাভ করিয়াছি। আলোচ্য বইখানিতে এগারটি গল্প আছে। প্রত্যেকটি গল্প রসসম্ভারে সার্থকতালাভ করিয়াছে। বিভূতিবাবু এ দেশের মানুষের মনের গহনে প্রবেশ করিয়া পুষ্পচয়ন করিতে জানেন, তাই তাঁহার হাস্যরস প্রাণপূর্ণ, পানসে নয়। গল্প-গুলির বর্ণনাভঙ্গী সহজ সরল এবং সাবলীল, টেকনিক্যালিটির বাড়াবাড়িতে সেগুলি কোথায়ও আড়ষ্ট নহে; প্রত্যেকটি গল্পে পরিপূর্ণ চিত্রের সাহায্যে রসস্ফূর্তি পাঠকের মনে প্রগাঢ় হইয়া উঠে। বিভূতিভূষণের মত প্রাণ খুলিয়া হাসাইবার এমন ক্ষমতা এদেশের সাহিত্যিকদের মধ্যে অল্প লেখকেরই আছে। বাঙলা দেশের ঘরে ঘরে এ বইয়ের সমাদর হইবে।

বিদুষী ভার্য্যা

- শ্রীউপেন্দ্র নাথ গঙ্গোপাধ্যায় -

২৮

ক্ষীরোদবাসিনীর দুঃখ দুর্দশার কাহিনী শুনিতে শুনিতে দিবাকর মনে মনে এই কথাই কেবল ভাবিতেছিল যে, মানুষের যেমন দুঃখ কষ্ট পাইবার পরিমাণের কোনো সীমা নাই, সেই দুঃখ কষ্ট সহ্য করিবার শক্তির পরিমাণও তেমনি তাহার অসীম। পুত্রের মৃত্যু হইতে আরম্ভ করিয়া কয়েক বৎসর ধরিয়া ক্ষীরোদবাসিনীর মাথার উপর দিয়া বিপদের যে প্রচণ্ড ঝটিকা বহিয়া গিয়াছে, তাহাতে জীবন ধারণ করিয়া এতদিন সে বাঁচিয়া আছে, ইহাই আশ্চর্য। কিন্তু শুধু বাঁচিয়া থাকিয়াই সে ক্ষান্ত হয় নাই— সে হাসে, গল্প করে, এমন কি সুযোগ উপস্থিত হইলে রসিকতা করিতেও ছাড়ে না।

সমবেদনার স্নিগ্ধকণ্ঠে দিবাকর বলিল, "রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'তোমার পতাকা যারে দাও তারে বহিবারে দাও শকতি।' জীবন-যুদ্ধে দুঃখের পতাকা বইবার যে পরিমাণ ভার তুমি পেয়েছ, সেই পরিমাণ শক্তিও তুমি পাও, এই প্রার্থনা করি ক্ষীরোদ ঠাকমা।"

ক্ষীরোদবাসিনী বলিল, "এ ত' তুই মহৎ লোকের বড় কথা বললি ভাই;—সহজ কথায় লোকে বলে, অল্প শোকে কাতর, অধিক শোকে পাথর,—আমার হয়েছে তাই। তবু আমার কালোমাণিক আছে বলে একেবারে জড় হ'য়ে যাইনি,—একটু নড়ি-চড়ি উঠি বসি। সতের বছর বয়েস হয়ে গেল, বিয়ে দিতে পাচ্ছিনে, এ দুশ্চিন্তার অন্ত নেই দিবাকর। আবার বিয়ে হয়ে গেলে কি নিয়ে জীবনধারণ করব, সে দুশ্চিন্তারও শেষ নেই।"

উৎসুক কণ্ঠে দিবাকর জিজ্ঞাসা করিল, "এ পর্যন্ত বিয়ের চেষ্টা চরিত্র কিছু করেছ কি?"

দিবাকরের প্রশ্ন শুনিয়া দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া ক্ষীরোদবাসিনী বলিল, "সে দুঃখের কথা আর বলব কি দিবাকর, সেই চেষ্টাতেই জলপাইগুড়িতে তিন চার বছর প'ড়ে ছিলাম। যোগ্য অযোগ্য কত পাত্রের দোরে দোরে ধরণা দিলাম, কিন্তু কেউ দয়া করলে না, কেউ পর্শ করলে না আমার কালো মাণিককে।"

"কেন?"

"কালো মেয়ে, ইংরেজি লেখাপড়া জানে না,—এই অপরাধ। তার ওপর, অপরাধের উপযুক্ত জরিমানা দেবার ক্ষমতাও নেই।"

শিবানী ইংরেজি লেখাপড়া জানে না, এই কথাটাই দিবাকরের কানে বিশেষ করিয়া বাজিল; কিন্তু সে বিষয়ে প্রথমে কোনো উল্লেখ না করিয়া সে বলিল, "শিবানীকে তারা শুধু কালো মেয়েই বলে?"

"বলে বই-কি দিবাকর, কালোকে তাদের কালো বলতে একটুও বাধে না; কিন্তু কালোর ভালো যা-কিছু, সে বিষয়ে তারা একেবারে চুপ ক'রে থাকে, পাছে সে কথা স্বীকার করলে জরিমানার টাকা কিছু কমে।"

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া দিবাকর বলিল, "সত্যি! বাঙলাদেশের বিয়ের বাজারটা একেবারে কসাইখানা হ'য়ে দাঁড়িয়েছে! ইংরেজি না-জানার আপত্তিও করে না-কি তারা?"

ক্ষীরোদবাসিনী বলিল, "অন্তত গোটা দুই জায়গায় ঐ ছুতো ক'রেই ত অপছন্দ করেছে।"

"কতটা ইংরেজি জানে শিবানী?"

"সে অবিশ্যি তেমন কিছু নয়। ঐ যে তোরা ফাস্ট বই, না কি বলিস, তা ও বোধ হয় সবটা শেষ করতে পারেনি। রোগ-শোক অভাব কষ্টের মধ্যে ইংরেজি ইস্কুলে তেমন কিছু পড়াশুনো ত' হয় নি, দেখতে দেখতে বড় হয়ে গেল, ছোট মেয়েদের সঙ্গে আর পড়তে চাইলে না। তবে বাঙলা জানে দিবাকর। রামায়ণ, মহাভারত, কবিকঙ্কন চণ্ডী, মেঘনাদ-বধ,—এ সব বই শিবানী পড়েছে।"

ঈষৎ গভীর সুরে দিবাকর বলিল "ভুল করেছ ক্ষীরোদ ঠাকমা, ইংরেজি ভাল ক'রে না শিখিয়ে ভাল করনি। আমাদের এই বাঙলা ভাষার দেশে বাঙলা না জানা বাঙালী মেয়ের পক্ষে তত বড় অপরাধ নয়, যত বড় অপরাধ ইংরেজি না-জানা; শিবানীকে ইংরেজি না শিখিয়ে সত্যি সত্যিই তুমি ভাল কর নি।"

সহাস্য মুখে ক্ষীরোদবাসিনী বলিল, "তুই এম-এ পাশ করা মেয়ে বিয়ে করে-ছিস দিবাকর, একথা তুই বললে আমি কি উত্তর দিই বল?"

এ কথার কেনো উত্তর না দিয়া দিবা-কর বলিল, "আমরা মনসাগাছায় মেয়ে-দের জন্যে স্কুল খুলেছি, সে কথা শুনেছ।"

"শুধু সে কথাই নয়, এ তিন-চার দিনে কোনো কথা শুনতে বাকি নেই। কিন্তু সব কথার মধ্যে কোন্ কথা শুনে সব চেয়ে খুশি হয়েছি জানিস?"

"কোন্ কথা শুনে?"

"আমাদের নাতবউয়ের সুখ্যাতি শুনে। সকলের মুখেই এক কথা,—রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী,—অমন বউ হয় না।"

এ কথারও কোনো উত্তর না দিয়া পূর্ব কথার অনুবৃত্তি করিয়া দিবাকর বলিল, "আমাদের সেই স্কুলে শিবানীকে ভর্তি ক'রে দোবো।"

ধীরে ধীরে মাথা নাড়িয়া ক্ষীরোদ-বাসিনী বলিল, "সে হবে না দিবাকর। ও কথা গ্রামে পা দিয়েই শিবানীকে আমি বলেছি। কিন্তু কিছুতেই রাজি নয় সে, সেই এক আপত্তি—ছোট মেয়েদের সঙ্গে কিছুতেই পড়বে না।"

এক হাতে চায়ের পেয়ালা এবং অপর হস্তে খাবারের রেকাব লইয়া শিবানী উপস্থিত হইল।

বিস্ময় মিশ্রিত সুরে দিবাকর বলিল, "পেয়ালায় চা এনেছ তা ত বুঝছি

শিবানী, কিন্তু রেকাবে কি পদার্থ আনলে?"

স্মিতমুখে শিবানী বলিল, "সামান্য একটু খাবার।"

মাথা নাড়িয়া দিবাকর বলিল, "না, না তা হবে না; ও তুমি ফিরিয়ে নিয়ে যাও। খাবারের বিষয়ে নিষেধ ছিল, সে কথা তোমার জানা আছে।"

ইত্যবসরে ক্ষীরোদবাসিনী দিবাকরের সম্মুখে একটা ছোট কাঠের বাক্স স্থাপন করিয়াছিল। নিঃশব্দ মৃদু হাস্যের দ্বারা দিবাকরের কথা অতিক্রম করিয়া শিবানী সেই বাক্সের উপর চা এবং খাবার সমর্পিত করিল।

খাবারের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দিবাকর বলিল, "পয়লা নম্বর ত দেখছি, কড়াইসুটি সহযোগে তেলমাখা মুড়ি;— কিন্তু দোসরা নম্বর বড় বড় গোলাগুলি কি বস্তু, তা ত ঠিক বুঝতে পারছিনে।"

ক্ষীরোদবাসিনী বলিল, "খইচুর,— শিবুর নিজের হাতের তৈরি।"

এক মুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া দিবাকর বলিল, "লোভে পড়লাম দেখছি! দুটি খাবারই আমার অতিশয় প্রিয় জিনিস। আচ্ছা, আজ তোমাকে ক্ষমা করলাম শিবানী, কিন্তু আর কোনো দিন এমন করে নিষেধ অমান্য কোরো না।"

দিবাকরের কথা শুনিয়া প্রসন্নমুখে ক্ষীরোদবাসিনী বলিল, "ক্ষমা আদায় করবার কৌশল যে জানে, তার পক্ষে অন্য দিন নিষেধ অমান্য করা শক্ত হবে না দিবাকর।"

স্মিতমুখে দিবাকর বলিল, "আচ্ছা, কেমন কৌশল জানে তা পরে দেখা যাবে।"

বারান্দার ধারে ঘটি এবং জল ছিল, ক্ষীরোদবাসিনীর নির্দেশে দিবাকর উঠিয়া গিয়া হাত ধুইয়া আসিল। ক্ষুধার্ত জঠর মুখরোচক খাদ্যের সান্নিধ্যে উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল, সাগ্রহ সহকারে দিবাকর আহারে প্রবৃত্ত হইল।

খাবার দিয়া শিবানী চলিয়া গিয়াছিল, একটা টি-পটে দিবাকরের জন্য আরও পেয়ালা দুই চা লইয়া সে ফিরিয়া আসিল।

দিবাকর বলিল, "চা ত' আনলে শিবানী, কিন্তু পেয়ালা ডিশ কই?"

মৃদুকণ্ঠে শিবানী বলিল, "আপনার ও পেয়ালায় ঢেলে দিলে হবে না?"

"আমার জন্যে বলছিনে, তোমাদের জন্যে বলছি।"

ব্যস্ত হইয়া ক্ষীরোদবাসিনী বলিল, "না, না, আমরা চা খাবো না দিবাকর, বিকেলে আমরা চা খেয়েছি। ও চা তোর জন্যে।"

চায়ের পেয়ালায় একটা চুমুক দিয়া দিবাকর বলিল, "চা-টা যে-রকম উপাদেয় হয়েছে, তাতে আরও খানিকটা পেলে নিশ্চয় আপত্তি করব না।"

কথায় কথায় এক সময়ে ক্ষীরোদবাসিনী বলিল, "আমার কালোমাণিকের গায়ের রঙ কেউ যদি কোকিলের মতো কালো বলে দিবাকর, তা হ'লে তার গলার স্বরকেও কোকিলের মতো মিষ্টি বলতে হবে। ভারি চমৎকার গান গায় শিবু।"

পিতামহীর কথায় ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া শিবানী সে স্থান পরিত্যাগ করিবার উপক্রম করিতেছিল। বাধা দিয়া তাহাকে দিবাকর বলিল, "অমন ক'রে সরে পড়বার মতলব করলে চলবে না শিবানী। তোমার গায়ের রঙ কোকিলের মতো কালো বললে আমি প্রবলভাবে আপত্তি করব; কিন্তু তোমার গলার স্বর কোকিলের মতো মিষ্টি প্রমাণ হলে আমি অতিশয় খুশি হব। সুতরাং একটা গান শোনাও আমাকে।"

প্রথমে শিবানী নানাপ্রকার ওজর-আপত্তি করিল, কিন্তু দিবাকর এবং ক্ষীরোদবাসিনীর অনিবার উপরোধে অগত্যা তাহাকে হার মানিতে হইল।

ক্ষীরোদবাসিনী বলিল, "সেই গানটা গা শিবানী, 'প্রভু তোমার পথের'।"

দিবাকর জিজ্ঞাসা করিল, হারমোনিয়ম্ নেই ক্ষীরোদ ঠাকমা?"

ক্ষীরোদবাসিনী বলিল, "আছে একটা ভাঙ্গা-মতো,—কিন্তু শুধু গলাতেও শিবু ভাল গাইবে।"

ক্ষণকাল ধীরে ধীরে গুণ্ গুণ্ করিয়া অল্প একটু সুর ভাঁজিয়া লইয়া সহসা মুক্ত সুমিষ্টকণ্ঠে শিবানী গান ধরিল,—

প্রভু, তোমার পথের পথিক
  করিবে কবে?
কবে সুগভীর রাত হইবে প্রভাত
  তব ভৈরব রবে!
যবে ক্লান্ত হইবে আশা,
আর, শেষ হবে ভালোবাসা,
আর, এক হ'য়ে যাবে আলো আর ছায়া
  সুখ-দুখ, কাঁদা-হাসা;
তখন গভীর উদাস সুরে—
  বাজিবে না-কি হে দূরে
কল-কল্লোলময় সংগীত
  মহাসাগরের কলরবে!
যবে অন্ধ হইবে আঁখি,
আর, বধির হইবে কান,
আর, প্রাণের মাঝারে থাকিয়া থাকিয়া
  কাঁপিয়া উঠিবে প্রাণ;
তখন বন্ধ হইবে চলা,
  শেষ হবে কথা বলা,
তখন বাজিবে পথের-শেষ-হওয়া গান
  অন্তিম উৎসবে!

শিবানীর তরল সুরেলা কণ্ঠের সুমধুর গান শুনিয়া দিবাকর মুগ্ধ হইল। উচ্ছ্বসিত বাক্যে প্রশংসা করিয়া ক্ষীরোদবাসিনীর দিকে চাহিয়া সে বলিল, "তোমার কথায় অবশ্য অনেকখানি প্রত্যাশা হয়েছিল ক্ষীরোদ ঠাকমা, কিন্তু তাই ব'লে সত্যি সত্যিই এত ভাল গায় শিবানী, তা মনে করিনি।"

দিবাকরের প্রশংসায় মনে মনে অতিশয় প্রসন্ন হইয়া ক্ষীরোদবাসিনী বলিল, "সব গানই শিবু ভাল গায়, কিন্তু এই গানটা আমার বিশেষ ক'রে ভাল লাগে দিবাকর,—এই অন্তিম উৎসবের গান। এ গান আমার প্রাণের সুরের সঙ্গে বাঁধা।"

দিবাকর হাসিয়া বলিল, "এ গান শুধু তোমার প্রাণের সঙ্গেই বাঁধা নয় ক্ষীরোদ ঠাকমা, যারা জানে তাদের জীবনে অন্তিম দিন একদিন নিশ্চয় আসবে, তাদের সকলের প্রাণের সঙ্গেই এ গান বাঁধা।"

দিবাকরের রিক্ত চায়ের পেয়ালা লক্ষ্য করিয়া ক্ষীরোদবাসিনী বলিল, "দিবাকরের পেয়ালায় চা ঢেলে দে শিবু। আমি চট ক'রে জপটা সেরে আসি, তুই ততক্ষণ দিবাকরের কাছে বোস্।"

ক্ষীরোদবাসিনী প্রস্থান করিলে দিবাকরের পেয়ালায় চা ঢালিতে ঢালিতে শিবানী বলিল, "এ চা বোধ হয় ঠাণ্ডা হয়ে গেছে দাদা। একটু নতুন চা ক'রে আনি।"

ক্রমশ

তিলাঞ্জলি

সুবোধ ঘোষ

(১০)

জাগৃতি সঙ্ঘের সাধারণ অধিবেশন।

এটা একটা রহস্য, ইন্দ্রনাথ কেন এখনো সঙ্ঘের সঙ্গ ছাড়তে পারলো না। বুঝতে আর কী বাকী আছে তার? সঙ্ঘের জন্য কোন দরদ নেই ইন্দ্রনাথের। একটা ধোঁয়াটে সাম্যবাদের ঘেরাটোপ দিয়ে সঙ্ঘের অন্তঃস্বরূপটা এতদিন ঢাকা পড়েছিল। তাই বুঝতে ও চিনতে একটু দেরী হয়েছে। ইন্দ্রনাথ জানে, সে একা নয়, আরও বহু উৎসাহী কর্মীর মনের দশা তারই মতন। কেউ তার চেয়ে আগেই বুঝে ফেলেছে, কেউ বুঝতে আরম্ভ করেছে। দুর্ভাগ্য ও পণ্ডশ্রমের অভিশাপ নিয়ে আবার নতুন নিরীহ ছেলেমেয়ে এসে সঙ্ঘের ভেতর ঢুকছে। নবাগতদের উৎসাহের সীমা নেই। ওদের হাবভাব দেখে হাসি চেপে রাখা দুষ্কর হয়ে পড়ে। কিন্তু ওদেরই জন্য সমবেদনা হয় সব চেয়ে বেশী। ওদেরই জীবনের চরম ক্ষতি, ভ্রান্তি ও অপচয়ের ওপর সঙ্ঘনায়কদের ভবিষ্যতে মোটা চাকুরী মন্ত্রীত্ব ও মোড়লী নির্ভর করছে।

কিন্তু স্বয়ং প্রকাশবাবু এখনো ইন্দ্রনাথের কাছে একটি রহস্য। কারাগার নির্যাতন অজ্ঞাতবাস—রাজনীতির জন্য, দেশের কাজের জন্য প্রকাশবাবু জীবনে কোন্ দুঃখ না বরণ করে নিয়েছিলেন? আদর্শের জন্য সর্বস্ব খুইয়ে যাঁরা পথে নেমে পড়েন, পথের ধুলোকে যাঁদের জীবনের শোণিতবিন্দু গৌরবে মহনীয় করে তোলে, প্রকাশবাবু সেই বিরল পথিকার মানুষের মধ্যে একজন। ইন্দ্রনাথের কাছে সে-ইতিহাসের কিছুই অজ্ঞাত নেই। এক মুহূর্তের সংশয়ে সেই শ্রদ্ধার বন্ধন ছিঁড়ে যেতে পারে না। আজ প্রকাশবাবু প্রৌঢ় হয়ে পড়েছেন কিন্তু এই একটি পরিবর্তন ছাড়া আর এমন কী ঘটতে পারে, যার জন্য সেই চিরকালের প্রদীপ্ত প্রকাশবাবু একেবারে নিভে যেতে পারেন? সংসারে এমন কোন্ মায়ের ছলনা আছে, যা প্রকাশবাবুর মত কঠিন ব্যক্তিত্বকে পথ ভুল করে দিতে পারে?

প্রকাশবাবুকে চেনবার জন্যই যেন ইন্দ্রনাথ এখনো সঙ্ঘের আনাচে-কানাচে এক-রাশ সংশয় ও কৌতূহল নিয়ে ঘুরছে।

জাগৃতি সঙ্ঘের সাধারণ অধিবেশনের আয়োজনটা চমক্ লাগিয়ে দেবার মতই। সভ্য, কর্মী, দরদী, দর্শক ও নিমন্ত্রিতদের ভীড়ে টাউন হলের জঠর মুণ্ডাকীর্ণ। নানা প্রদেশের প্রতিনিধির দল এসেছেন। দেশী ও বিদেশী কয়েকটি প্রেসের সংবাদ-দাতা ও প্রতিনিধিরা আছেন। কয়েক মাসের মধ্যেই জাগৃতি সঙ্ঘের কী প্রচণ্ড উন্নতি হয়েছে, আজকের অধিবেশনের উৎসাহ ও ভীড়টাই তার প্রমাণ। একে অস্বীকার করা যায় না। এত দেখেও যারা অস্বীকার করতে চায়, তারা নিছক নিন্দুক ছাড়া আর কিছু নয়। তারা এখানে আসবেই বা কেন?

কিন্তু হলের পেছনে কতকগুলি ছেলেকে দেখা যাচ্ছে—একটু বিমর্ষ, নিরুৎসাহ ও বোকা বোকা দৃষ্টি। জাগৃতি সঙ্ঘের কয়েকজন কর্মী বার বার ঘুরে এসে সন্দিগ্ধভাবে তাকিয়ে এই নিরুৎসাহ ছেলেগুলির আপাদমস্তক পরীক্ষা করে চলে যাচ্ছিল। কিছুক্ষণ পরেই একটি কর্মী সেখানে একটা টুল নিয়ে এসে রাখলো। একটি পুলিশ সার্জেন্ট বেল্ট-নিবদ্ধ রিভলভারটির ওপর একবার হাত বুলিয়ে, হেলমেটটা কোলের ওপর নামিয়ে, টুলের ওপর শক্ত হয়ে বসলো। জাগৃতি সঙ্ঘের কর্মীরা খানিকটা নিশ্চিন্ত হয়ে অন্য কাজে চলে গেল।

দেয়ালভরা পোস্টার সাজানো। সব চেয়ে বড় পোস্টারটা দেখবার মত,—কয়েকটি গাঁয়ের মেয়ে বঁটি হাতে উত্তেজিত-ভাবে দাঁড়িয়ে আছে। পোস্টারের ছবির মর্ম নীচেই লেখা আছে—'চট্টগ্রামের চাষী মেয়েরা জাপানীদের রুখিবে।'

একদল শ্বেতাঙ্গ দর্শক বিস্ময়ে চোখ কুঁচকে পোস্টারগুলির দিকে তাকিয়েছিল।—Are those knives sharp enough? What a hoax! Pooh! কতক-গুলি অস্পষ্ট মন্তব্য, বিদ্রূপ ও রসিকতা হঠাৎ উচ্চ হাসির হর্‌রা জাগিয়ে তুললো। নিকটেই কয়েকটি কর্মী ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়েছিল। মন্তব্যগুলি শুনে নিয়ে, ঢোক গিলে, আবার শান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল তারা।

পেছনের বিমর্ষ ভীড়টার ভেতর একটি ছেলে পাশের বন্ধুটিকেই বোধ হয় বলছিল—যাই বল, এরাই কিন্তু বেশ জমিয়ে তুলেছে। নিন্দে করলে আর কি হবে?

উত্তর এল এক অপরিচিত ভদ্রলোকের মুখ থেকে।—বাদ্‌লার দিনে বাদ্‌লা পোকারাই বেশ জমিয়ে তোলে। ওদেরই তখন বেশী করে দেখতে পাওয়া যায়। তাই বলে বাদ্‌লা পোকারাই সত্য নয়। ঝড় আসুক ভায়া, তখন দেখবে কারা থাকে আর কারা উড়ে যায়।

আবার একটা হাসির হর্‌রা উঠলো। পুলিশ সার্জেন্ট ঘাড় ফেরালেন।—ইউ, হল্লা মৎ করো!

হল্লা সত্যিই বন্ধ হয়ে গেল। সভার কাজ আরম্ভ হয়ে গেছে।

সভাপতি কার্যতালিকাটি হাতে তুলে ঘোষণা করলেন,—প্রথমে, ফাসিস্ত-বিরোধী কবিতা।

কবি রণজিৎ দে আবির্ভূত হলেন। মেঘারাবের মত গভীর সুরে আবৃত্তি করলেন,—

অভিশপ্ত বুসিডো
নিষ্পনী সূর্যের তেজ ঢুঢু,
য়ামাতো দামাশি
শেষ কাশি কাশে।

কবি রণজিৎ হঠাৎ দুর্ধর্ষ আবেগে কাঁপতে লাগলেন,—

চূর্ণ কর, চূর্ণ কর
গেঞ্জীর স্বপন,
মিকাডোর ব্যাদিত রসনা
ভোঁতা ভোঁতা ভুরুর ছলনা।
তোল হাত, হাতিয়ার ধর
য়ামাতো গোকোরো
কাঁপে থর থর।

হাততালির শব্দ না থামতেই সভাপতি ঘোষণা করলেন।—দ্বিতীয়, ফ্যাসিস্ত-বিরোধী গান।

উর্মিলা কাঞ্জিলালের ইঙ্গিত মত চারটি মেয়ে উঠে এসে সুর ধরলো।—

অশথ কেটে বসত করি
জাপানী কেটে আলতা পরি......

মঞ্চের ওপরেই উপবিষ্টদের মধ্যে একটা [illegible] মাথা দিয়ে উঠলো—objection-able।

ডাক্তার মুখার্জি সভাপতির দিকে তাকিয়ে কথাটা বললেন। পাশে বসে সিতা বসু আস্তে আস্তে বললো।—থাক্ কাকাবাবু, আপনি কেন আর......।

গানটা শেষ হলে সভাপতি তবু ডাক্তার মুখার্জিকে তাঁর আপত্তি ব্যক্ত করবার সুযোগ দিলেন না। ডাক্তার মুখার্জি সভাপতিকে বলিলেন,—কবি রণজিতের কবিতার অর্থ আমি বুঝিনি, কাজেই সে-সম্বন্ধে বলবার কিছু নেই। কিন্তু এই গান? জাপানীদের কেটে আলতা পরার সখ কেন? এটা কোন ধরণের কম্যুনিজম? আমাদের বিবাদ জাপানের পররাজ্য লোভী শাসকদলের কারসাজীর সঙ্গে। লক্ষ লক্ষ গরীব দুঃখী নিরীহ জাপানীদের সঙ্গে আমাদের কোন বিবাদ নেই। আমার দেশের ছেলেমেয়েদের মনে যারা এই ধরণের জাতিগত ঘৃণা ছড়াচ্ছে, তাদের বুদ্ধিকে আমি নিন্দা করি।

হলের শ্রোতার দল শুধু বুঝতে পারলো, ডায়াসের ওপর একটি ছোট-খাট বচসা বেধেছে। স্পষ্ট করে কিছু বোঝবার আগেই সবাই দেখলো—ডাক্তার মুখার্জি আসন ছেড়ে উঠে চলে গেলেন।

সভাপতি ঘোষণা করলেন।—তারপর, সোভিয়েট-সৌহার্দ্যের মিউজিক্।

জন-সাঙ্গীতিক নামে সম্প্রতি পরিচিত কমরেড গণেশ চট্টোপাধ্যায় চাষাদের ঢঙে মাথায় গামছা বেঁধে, গলায় একটা মৃদঙ্গ ঝুলিয়ে আসরে নামলেন। মৃদঙ্গের বাজনার সঙ্গে বোল আরম্ভ হলো।—

কিট্ কিট্ কিট্ ধাং ঝেঁকু
টিমোশেঙ্কু।
ধেক্ ধেক্ ধো ধো,
কিরিটি কিরিটি
প্রলিটারিয়াটি
দিমিদ্রাং দ্রিমি দুনিয়াং।
থো থো থো থোক্ থোরে
রুশ্যা রে! রুশ্যা রে!

শ্রোতাদের সুরুচিবোধের সকল সংযম ও মাত্রার ওপর কমরেড গণেশ যেন বে-পরোয়া চাঁটি মেরে চলেছিল। হলভর্তি জনতার গাম্ভীর্যের বাঁধ আর অটুট থাকা সম্ভব ছিল না। হাসি হল্লা আর টিট্-কারীর সহস্র ফোয়ারা যেন হঠাৎ মুখর হয়ে কিছুক্ষণের জন্য সভার কাজ পণ্ড করে দিল।

হাসাহাসির ঝড়ের মধ্যে দর্শকদের এক একটা মন্তব্য যেন জ্বালাভরা বিদ্যুতের মত ঝল্সে উঠছিল।—'মলোটোভকে একটা তার করে দাও হে, এসে দেখে যাক্ রুশপ্রীতির ছিরি।' 'ডোবালে, সব ডোবালে, গেনু তোর মনে এতও ছিল!' 'ও কালামুখে আবার রুশিয়ার নাম কেন? তোরাও কম্যুনিস্ট? গড়ের গুগুলি বলে আমি হব শঙ্খ। ছোঃ!'

জাগৃতি সঙ্ঘের কর্মীরা বিচলিত হয়ে পড়ছিল। জয়ন্ত মজুমদারের মাথায় কশাক টুপি হেলে পড়ছিল। প্রকাশবাবু পার্থসারথির মত কর্মীদের কানে কানে অভয়ডিণ্ডিম বাজিয়ে গেলেন।—Steady! বিদ্রূপ আর কুৎসা শুনে ঘাবড়ে যেও না। এর চেয়ে আরও অনেক বড় বড় সঙ্কটের সামনে আমাদের দাঁড়াতে হবে। প্রতিক্রিয়াপন্থীদের উপদ্রব তোমরা গ্রাহ্যের মধ্যে এন না। এখন বৃথা শক্তি ক্ষয় করে লাভ নেই। তৈরী হয়ে থাক, সিভিল ওয়ারের দিন ঘনিয়ে আসছে।

দর্শকদের গ্যালারির একটা দিক খালি হয়ে গেছে। সভা শান্ত হয়েছে। প্রস্তাব উত্থাপনের পালা আরম্ভ হলো।

কমরেড হাবুল দত্তের প্রস্তাবঃ জনৈক ব্রিটিশ সৈনিক কোন্ এক ভারতীয় স্ত্রী-লোকের মর্যাদা হানি করিয়াছে, এই সংবাদে যে সকল লোক উষ্মা প্রকাশ করিতেছে, এই সভা তাহাদিগকে পঞ্চম বাহিনী বলিয়া গণ্য করে। তাহারা পরোক্ষ-ভাবে যুদ্ধোদ্যোগ ক্ষুণ্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছে।

'স্বরূপ রাম এন্ড কোম্পানীর ইস্ক্রুপের কারখানায় মাগ্‌গি ভাতা দাবী করিয়া স্ট্রাইক ঘটাইবার জন্য যেসকল ভুঁইফোড় মজদুরবন্ধু শ্রমিকদিগকে উস্কানি দিয়াছে, এই সভা তাহাদের নিন্দা করিতেছে।

'সভা এই বলিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতেছে যে, জাগৃতি সঙ্ঘের কর্মীদের চেষ্টায় স্ট্রাইক ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। মজুরেরা কাজে যোগদান করিয়াছে। স্বরূপরাম কোম্পানী ভরসা দিয়াছেন যে, মজুরদিগের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে তাঁহারা লক্ষ্য রাখিবেন।'

হাবুল দত্তের প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পর দর্শকদের মধ্যে আরও একদল সভা ছেড়ে চলে গেল।

হাবুল দত্তের প্রস্তাবের মধ্যে নেহাৎ বেফাঁস যেন একটা ঠুঁটো নিষ্কর্মবাদের ইঙ্গিত ধরা পড়ে গিয়েছিল। সেটা চাপা দেবার জন্যই বোধ হয় জয়ন্ত মজুমদারের প্রস্তাব একটা জঙ্গী পাঁয়তাড়ার মত সহর্ষে দেখা দিল,—

"এই সভা সর্ববিধ শান্তিবাদ, অর্থাৎ প্যাসিফিজমের নিন্দা করিতেছে। জাতীয়তা-বাদী কংগ্রেস এতদিন 'সংগ্রামের' ছুতা করিয়া শুধু নিষ্ক্রিয়তার চর্চা করিয়াছে। তাই আমরা 'ওয়ার' করিতেছি। এই যুদ্ধ আমাদের জীবনে বিরাট পরিবর্তন আনিতেছে, পরিবার বন্ধন ভাঙিয়া যাইতেছে, সতীত্ব-পতিত্ব মাতৃত্ব ভদ্রতা ইত্যাদি সব সনাতনী সংস্কার অন্নাভাবের গুঁতায় গুঁড়া হইয়া যাইতেছে। কী বিরাট পরিবর্তন! কী আনন্দ! এই পরিবর্তনের উপর আমাদের নতুন সমাজ গড়িয়া উঠিবে। এই যুদ্ধের রুদ্র রূপ আমাদের জীবনে একটি পরম সার্থকতার সন্দেশ আনিয়াছে।"

—প্রতিবাদ করা উচিত ইন্দ্রবাবু। কথাটা যারা বললো তারাও জাগৃতি-সঙ্ঘের সভ্য। তারা জাগৃতি সঙ্ঘের পাঁকের মধ্যে থেকেও যেন নেই। ইন্দ্রনাথের সঙ্গে তারা বক্তৃতা মঞ্চের পেছনে এক কোণে বসেছিল। ইন্দ্র-নাথের মতই তারাও সঙ্ঘের হৃদয় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে। সব চুকিয়ে দিয়ে খসে পড়ার আগে তারা যেন শুধু সঙ্ঘের গায়ে ভাঙা ডালের মত ঝুলছে।

জয়ন্ত মজুমদারের বিচিত্র সমাজতত্ত্বের ব্যাখ্যা শুনে ইন্দ্রনাথের পাশে দাঁড়িয়ে স্কুল-মাস্টার আশুবাবু হঠাৎ চেঁচিয়ে আপত্তি করে উঠলেন।—'দুর্ভোগ ভোগা অর্থ পরি-বর্তন নয় মশাই।'

মঞ্চের নীচে প্রথম সারির চেয়ার থেকে এক ভদ্রলোক পাল্টা প্রতিবাদ করে উঠে দাঁড়ালেন। ইন্দ্রনাথ চিনতে পারলো—ইনিই অধ্যাপক সুকুমার মুস্তফী। মাথার টাক আর মার্ক্সবাদ, এই দুটো জিনিসকেই অধ্যাপক সুকুমার একই সঙ্গে তাঁর নিজস্ব সম্পত্তি বলে মনে করেন।

অধ্যাপক সুকুমার আশুবাবুকে একটি ধমকে যেন দমিয়ে দিলেন।—কে বললে এটা পরিবর্তন নয়? লিথুয়ানিয়ার কমিউনিস্ট কনফেডারেশন অব্ লেবারের গ্র্যান্ড কাউন্সিলের জেনারেল সেক্রেটারী আদ্রিয়েভ মিলিমিয়োরস্কির মত মার্ক্সবাদী স্কলার তাঁর আত্মজীবনীর একশো ছাপান্ন পৃষ্ঠায়

কী লিখেছেন, প্রতিবাদ করার আগে মশাই সেটা একবার পড়ে এলেই ভাল করতেন।"

এরপর, বিনা বিসম্বাদেই জয়ন্ত মজুমদারের প্রস্তাব গৃহীত হলো।

কমরেড দিনেশ পুরকায়স্থের প্রস্তাব ঃ "যুদ্ধজনিত এই পরিবর্তন ও ভাঙনের সুযোগে দেশের শাসনযন্ত্রটি যেন কংগ্রেসের মত কোন সঙ্ঘবদ্ধ ফাসিস্ত প্রতিষ্ঠানের হাতে গিয়া না পড়ে, তাহার জন্য এখনই প্রস্তুত থাকিতে হইবে। জাগৃতি সঙ্ঘের সাম্যবাদী পন্থায় বিশ্বাসী সভ্যদিগকে একে একে যত নতুন চাকুরীর পদগুলি অধিকার করিতে হইবে। বিশেষ করিয়া যত এমার্জেন্সী হাসপাতালের কম্পাউণ্ডারের পোস্টগুলি ক্যাপচার করিয়া লইতে হইবে।"

প্রস্তাব সমর্থিত ও গৃহীত।

কমরেড পরিতোষ সরকারের প্রস্তাব ঃ "কণ্ট্রোলের লাইনের ভিড়ে মুসলমান ভাইদিগের চাউল পাইতে বড়ই কষ্ট ও বিলম্ব হয়। এমন অভিযোগও শুনা যায় যে, দোকানের হিন্দু কর্মচারীরা বাছিয়া বাছিয়া মুসলমানদিগকেই মোটা চাউল দেয়, হিন্দুরা সরু চাউল পায়। পাকিস্থানী গণতন্ত্রের একনিষ্ঠ প্রচারক আবু মোর্তাজা মুসলমানদিগের জন্য ভিন্ন কণ্ট্রোলের দোকান ব্যবস্থা করিবার উদ্দেশ্যে যেআন্দোলন করিতে মনস্থ করিয়াছেন, জাগৃতি সঙ্ঘ সর্বান্তঃকরণে তাহা সমর্থন করিতেছে।"

প্রস্তাব সানন্দে গৃহীত।

কমরেড তড়িৎ চট্টরাজের প্রস্তাব ঃ "এই সভা প্রস্তাব করে যে, অবিলম্বে দেশের সর্বত্র লঙ্গরখানাগুলি বন্ধ করিয়া দেওয়া হউক। আমাদের জাগৃতি সঙ্ঘও চাঁদা পাইলে বন্যার্ত এবং ক্ষুধার্তকে খাওয়াইবার চেষ্টা করিতে পারে। অবশ্য উহা ফাসিস্ত-বিরোধী প্রথায় পরিচালনা করা হইবে। কিন্তু লগরখানাগুলির মারফৎ কতকগুলি পঞ্চম বাহিনী কর্মী সাজিয়া জনসাধারণের কানে জাতীয়তার মন্ত্র পড়িয়া দিতেছে। পঞ্চম বাহিনীকে জনতার সংস্পর্শে আসিতে এইরূপ সুযোগ দেওয়া উচিত নহে।"

প্রবল উত্তেজনার মধ্যে প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত।

সভাপতি হাঁক দিলেন,—এইবার কমরেড ইন্দ্রনাথের প্রস্তাব। প্রকাশবাবু একটু উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন।

ইন্দ্রনাথ আরম্ভ করলো,—"আমরা বিশ্বাস করি, এই যুদ্ধে হিটলারী জার্মানীর আক্রমণে সোভিয়েট রুশিয়া পরাজিত হলে সভ্যতার ক্ষতি হবে। মানুষের স্বাধীনতার আদর্শ ক্ষুণ্ণ হবে। আমরা বিশ্বাস করি, সোভিয়েট রুশিয়ার পাল্টা আক্রমণে হিটলারী জার্মানী পরাজিত হলে পৃথিবীতে মুক্তির আদর্শ নতুন ভরসায় উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। আমাদের কাছে সেই ভরসা যেন ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠছে। সেই ধ্বংসের অন্ধ দম্ভ চূর্ণ হয়ে গেছে। নাৎসীযূথ আজ পলায়নপর। মানুষ হিসাবে আমরা কোটী রুশিয়াবাসীর এই সফলসাধনার আনন্দের ও গৌরবের অংশীদার।

"ঘটনাক্রমে ব্রিটিশ ও আমেরিকা আজ সোভিয়েট রুশের মিত্ররূপে নিজেকে ঘোষণা করেছে—চুক্তিবদ্ধ হয়েছে। ব্রিটিশ ও আমেরিকার রাষ্ট্রশক্তিকে ধন্যবাদ জানাই। আমরা ব্রিটেন ও আমেরিকাকে কর্তব্য হিসাবে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে—ফাসিস্তির বিনাশের এই সংগ্রামে সোভিয়েট রুশিয়া বারবার তাদের সহযোদ্ধারূপে পেতে চাইছে। সোভিয়েট রুশিয়ার একমাত্র দাবী—দ্বিতীয় ফ্রন্ট। আমাদের জাগৃতি সঙ্ঘের আজ গর্ব করার সব চেয়ে বড় বিষয় এই যে, কম্যুনিস্ট চিন্তায় দীক্ষিত জাগৃতি সঙ্ঘই আমাদের দেশের একমাত্র সঙ্ঘ যে, সোভিয়েট রুশিয়ার যোদ্ধৃত্বের গভীরতর ইঙ্গিতটি ধরতে পেরেছে। তাই আমাদের বলতে দ্বিধা নেই, সোভিয়েট রুশিয়ার জয় আমাদেরই জয়।

"সুতরাং সভা প্রস্তাব করে যে, য়ুরোপে দ্বিতীয় ফ্রণ্টের দাবী নিয়ে দেশব্যাপী আন্দোলন আরম্ভ করা হোক্। জাগৃতি সঙ্ঘের কর্মীরা দেশের সর্বত্র 'দ্বিতীয় ফ্রন্ট দাবী'র মিছিল মিটিং ও প্রচার আরম্ভ করুক্। আমরা ডেমোক্রেসীর সদিচ্ছা যাচাই করে দেখতে চাই। সোভিয়েট রুশের শুভাশুভের ওপর আমাদের সর্বস্ব যখন নির্ভর করছে, তখন আমাদের আর চুপ করে থাকলে চল্‌বে না। আজ থেকে দ্বিতীয় ফ্রণ্ট আন্দোলন আমাদের সঙ্ঘের কর্মজীবনে নতুন অধ্যায় সৃষ্টি করুক্।"

একটা অগ্নিগর্ভ দৃষ্টি তুলে প্রকাশবাবু ইন্দ্রনাথকে দেখছিলেন। জয়ন্ত মজুমদারের মত আরও কয়েকজন সঙ্ঘ-সারথী ব্যতিব্যস্ত হয়ে সভ্যদের সঙ্গে আলোচনা করে ফিরছিল। ঊর্মিলা কাঞ্জিলাল প্রকাশবাবুর চাউনি থেকেই ইঙ্গিত পেয়ে সভ্যদের মধ্যে একটা গোপন উৎসাহ ছড়িয়ে বেড়ালেন কিছুক্ষণ।

ইন্দ্রনাথের প্রস্তাব ভোটে দেওয়া হলো। সভাপতি হেসে হেসে রায় দিলেন—প্রস্তাব অগ্রাহ্য।

ইন্দ্রনাথ ততক্ষণে সঙ্গীদের মধ্যে ফিরে এসে হাসছিল। সঙ্গীরা ধিক্কার দিল।—এবার হলো তো ইন্দ্রবাবু! সঙ্ঘের রুশপ্রীতি পরীক্ষা করতে চাইছিলেন, দেখুন এইবার। প্রীতির পাল্লা কোন্ দিকে ঝুঁকে রয়েছে, এখনো বুঝতে বাকী আছে নাকি আপনার? এ পলিটিকস্ আমাদের বুদ্ধির অগম্য। না, কোথাও একটা গলদ আছে ইন্দ্রবাবু। কোন্ বঁধুর যেন মান রক্ষা করে চলেছে আপনার জাগৃতি সঙ্ঘ। হাত তুলে একটা প্রতিবাদও করতে চায় না, যদি তার গায়ে আঁচড় লাগে। নইলে মানুষ কখনো এত যুক্তিভ্রষ্ট কথা বলতে পারে? থাকুন আপনি, আমাদের কিন্তু আজ থেকেই ইতি; এই পলিটিক্যাল বানপ্রস্থ আমাদের ধাতে সইবে না। শুধু এই সত্য জেনে গেলাম যে, আপনার জাগৃতি সঙ্ঘ আর পার্টি একটি প্রপঞ্চ বাহিনী।

সত্যি সত্যি তারা চলে গেল। ইন্দ্রনাথের মনের ভেতর একটা বেদনায় মোচড় দিয়ে উঠলো। এই সঙ্গীদের ভাল করেই চেনে ইন্দ্রনাথ। ইন্দ্রনাথ জানে তারা কী আশা করে এসেছিল, যাবার সময় কী হুতাশ্বাস আর গঞ্জনা নিয়ে চলে গেল। যাক্, এরা চলে গেলে জাগৃতি সঙ্ঘের স্বাচ্ছন্দ্য বাড়বে বই কমবে না।

সভাপতি তখন জাগৃতি সঙ্ঘের এই ক'মাসের ফাসিস্তবিরোধী ও জনরক্ষা কীর্তির একটা ফিরিস্তি পড়ে সভা শেষ করে আনছিলেন—এই ক'মাসেই জাগৃতি সঙ্ঘ তাদের কংগ্রেস-লীগ ঐক্যের প্রচারপত্রে সাতশো সই যোগাড় করেছে, ডাক্তার খোপ্‌ড়িওয়ালার চব্বিশটা ফটো বিক্রী করেছে, দক্ষিণ কলকাতায় পঁচিশটা স্লিট-ট্রেঞ্চের ঘাস ছিঁড়ে পরিষ্কার করেছে।

(ক্রমশ)

বর্দ্ধমান অঞ্চলে দামোদর বন্যা-বিধ্বস্ত অঞ্চলের অবস্থা

ফটো : জিতেন সেন

রঙ্গজগৎ
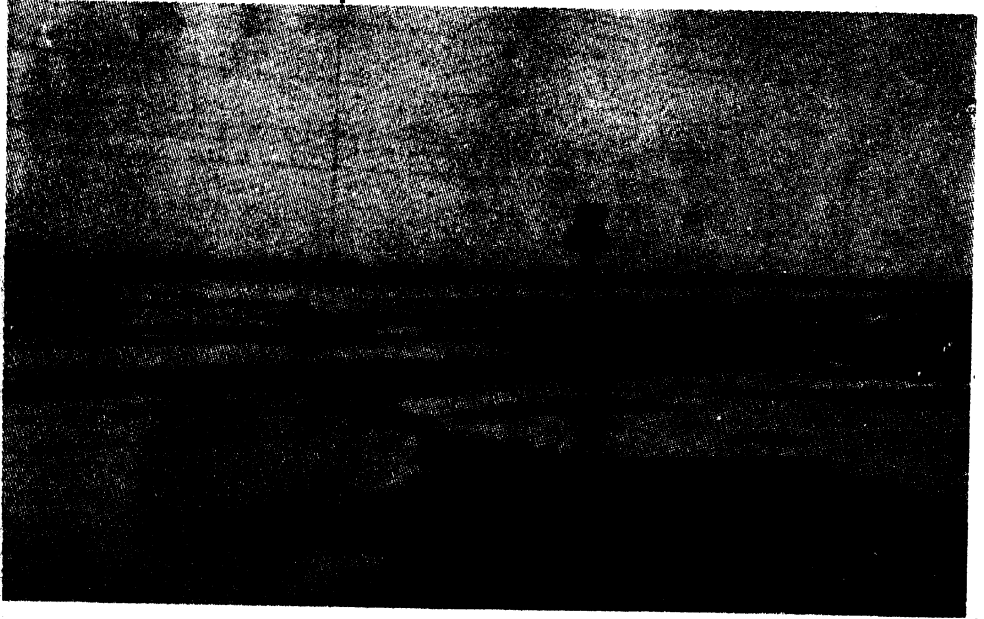
"তাসের দেশ"

আগামী শুক্রবার, শনিবার এবং রবিবার (যথাক্রমে ১৪ই, ১৫ই ও ১৬ই জানুয়ারী) এলিট রঙ্গমঞ্চে রবীন্দ্রনাথের 'তাসের দেশ' অভিনীত হবে। কলকাতার কলা-রসিকদের পক্ষে এটা যে শুভ-সংবাদ, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। কেন না, রবীন্দ্রনাথের নাটক-নাটিকা অভিনয় সাধারণত দীর্ঘদিন পরে পরেই হয়ে থাকে। তার কারণ আমাদের সাধারণ রঙ্গমঞ্চগুলো এ রকম বৈশ্য-মনোবৃত্তিসম্পন্ন এবং বাঁধাধরা ছকের পূজারী যে, তারা রবীন্দ্রনাথের অনবদ্য সুন্দর নাটক-নাটিকাগুলোকে নতুনত্ব আমদানির ভয়ে মঞ্চস্থ করার সাহস পায় না। 'তাসের দেশে'র আলোচ্য অভিনয়ের সঙ্গে যাঁরা সংশ্লিষ্ট আছেন, তাঁদের অনেকেই কোন না কোন প্রকারে রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতীর সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন কিংবা আছেন। কাজেই, মঞ্চে রবীন্দ্রনাথের একটি বিখ্যাত নাটিকার যথাযথ রূপায়ণ আমরা দেখতে পাব—এ আশা সহজেই করা যায়। এই নাটিকাটির প্রযোজনা করছেন শ্রীমতী পার্বতী দেবী এবং পরিচালনা করছেন বিশ্বভারতীর গুণী সংগীত শিল্পী শ্রীযুক্ত শান্তিদেব ঘোষ। 'তাসের দেশ নাটিকাভিনয়ে নৃত্য একটি অপরিহার্য অঙ্গ। নৃত্যাংশের পরিকল্পনা করেছেন প্রসিদ্ধ কথাকলি নৃত্য-শিল্পী শ্রীযুক্ত কেলু নায়ার। শ্রীযুক্ত নায়ার বহুদিন শান্তিনিকেতনের নৃত্যশিক্ষক ছিলেন। নাটিকাটির যন্ত্র-সংগীত পরিচালনা করছেন সুপ্রসিদ্ধ সুরশিল্পী দক্ষিণামোহন ঠাকুর ও তাঁর যন্ত্রী-সম্প্রদায়। অভিনয়ে যাঁরা অংশ গ্রহণ করেছেন, তাঁরাও নৃত্যগীত এবং অভিনয়ে কৃতী শিল্পী।

বাঙলা কৌতুক-নাটিকা হিসাবে রবীন্দ্র রচনাবলীর মধ্যে তাসের দেশের একটা বিশিষ্ট স্থান আছে। নৃত্য গীত এবং কৌতুক রসের যে অপূর্ব সমন্বয় এই নাটিকাটির মধ্যে দেখা যায়, একমাত্র রবীন্দ্রনাথের লেখনীতেই সেটা সম্ভব ছিল। 'তাসের দেশে'র অন্তর্নিহিত মূলভাব দিয়ে কবি বহুকাল পূর্বে একটি ছোট গল্প লিখেছিলেন। পরে ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে তিনি এই গল্পটির মূল বক্তব্য অবলম্বন করে একটি কৌতুক-নাটিকা রচনা করেন এবং তার নাম দেন 'তাসের দেশ'। কবির জীবিতকালে এই নাটিকাটি বার কয়েক সাফল্যের সহিত অভিনীত হয়ে তাঁর তৃপ্তি বিধান করেছিল। 'তাসের দেশ' একাধারে গীতিনাট্য এবং কৌতুক নাট্য। নৃত্য-গীত এবং সরস কৌতুক এই নাটিকাটির প্রধান প্রাণ-সম্পদ। আপাত-দৃষ্টিতে এই নাটিকাটির মধ্যে প্রচুর নির্দোষ কৌতুক এবং ব্যঙ্গের সমাবেশ থাকলেও একে পুরোপুরি কৌতুকনাট্য বললে ভুল হবে। কেন না নাটিকাটির মূল বাণী গভীর অর্থব্যঞ্জক। এই নাটিকাটির সাহায্যে কবি আমাদের সংস্কার-বদ্ধ মৃতকল্প জীবনে মুক্তির বাণী শুনিয়েছেন। 'তাসের দেশে'র মূল বক্তব্য এই যে অন্ধের মত নিয়ম এবং সংস্কারকে মেনে চলার মধ্যে আনন্দের সংস্পর্শ নেই। রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় কৃষ্টি এবং ঐতিহ্যের বড় সমর্থক ছিলেন; কিন্তু তাই বলে কৃষ্টি এবং ঐতিহ্যের নামে আমরা যে সংস্কার এবং নিয়মের পর্বত-প্রমাণ প্রাচীর তুলে জীবনের সহজ গতিকে রুদ্ধ করে দেই, জীবন থেকে সকল আনন্দ নিঃশেষে বিলুপ্ত করে দেই—সেটা তিনি সহ্য করতে পারতেন না। "তাসের দেশের" রূপকের সাহায্যে তিনি ভারতীয় সমাজ-জীবনের এই পঙ্গু অচলায়তনকে আঘাত দিয়েছেন। অথচ তাঁর আঘাত দেবার কৌশল এমন মনোরম যে, সে আঘাতে আমরা যতটা আহত না হই—উপভোগ করি ততটা। "তাসের দেশের" নিয়মবদ্ধ চরিত্রগুলোর মধ্যে আমরা নিজেদের প্রতিফলিত দেখে নিঃশব্দ কৌতুক অনুভব করি।

"তাসের দেশের" কাহিনী অনেকটা আমাদের পরিচিত রূপকথার ছাঁচে রচিত। দুঃসাহসী এক রাজপুত্র এবং সদাগর-পুত্র বাণিজ্য করতে বেরিয়ে নৌকাডুবি হয়ে ভেসে উঠলেন তাস-দ্বীপে। দ্বীপের মানুষগুলো যেমন ছাঁচে-ঢালা, তাদের গতিও তেমনি ছন্দোবদ্ধ—নিয়মের সুকঠিন শৃঙ্খলে বাঁধা। কি পুরুষ, কি নারী—তারা সবাই নিয়মের অন্ধ পূজারী। তাদের জীবনের মূলমন্ত্র ঃ—

"চলো নিয়মমতে।
দূরে তাকিয়ো নাকো,
ঘাড় বাঁকিয়ো নাকো,
চলো সমান পথে।"

এই নিয়মের শৃঙ্খলা ভেঙে বিদেশী রাজপুত্র এবং সদাগর-পুত্র তাঁদের কানে নতুন মন্ত্র দিলেন অনিয়মের। নতুন এবং পুরাতনের মধ্যে চলল সংঘর্ষ—রক্ষণশীল সংস্কার বাধা দিতে চাইল নতুনকে। সে বাধা শেষ পর্যন্ত হল না সফল—নতুনের হল জয়। 'তাসের দেশে'র মৃতপ্রায় নর-নারীরা সংসারের খোলস ত্যাগ করে পেল নতুনের সন্ধান—মুক্তির বাণী তাদের জন্যে নিয়ে এল আনন্দের বার্তা। এই হ'ল "তাসের দেশে"র মূল কাহিনী। অভিনয়ে নৃত্য-গীত, দৃশ্যসজ্জা এবং রূপ-সজ্জার অপূর্ব অবকাশ রয়ে গেছে। এর সঙ্গে "বধূ-বরণ" নামে ছোট একটি নৃত্য-নাট্যও অভিনীত হবে। "বধূ-বরণ" প্রসিদ্ধ ফরাসী রূপকথা সিণ্ডারেলার ছায়া অবলম্বনে রচিত। গুণী শিল্পীদের সমাবেশে এই উভয় নাটিকাই বর্ণাঢ্য অভিনয় দর্শক সমাজকে আনন্দ দিতে পারবে।

"ভাইচারা"

আমরা ইউনিটি প্রোডাকসন্স নির্মিত এই নতুন হিন্দী বাণী-চিত্রটি দেখে সুখী হয়েছি। হিন্দু-মুসলিম মিলনের উদ্দেশ্যে নির্মিত এই জাতীয় চিত্রের প্রশংসা না করে পারা যায় না। ইতিপূর্বে এই একই উদ্দেশ্যে 'ভাইচারা'র কর্তৃপক্ষ "ভক্ত কবীর" নামে প্রসিদ্ধ হিন্দী চিত্র নির্মাণ করেছিলেন। হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক সমস্যা আমাদের রাজনৈতিক অগ্রগতির পথ রুদ্ধ করে দাঁড়িয়ে আছে, একথা বললে অত্যুক্তি হয় না। অথচ ভারতীয় সমাজ-জীবনের দিকে তাকালে এ সমস্যা কত তুচ্ছ বলে মনে হয়। শত শত বৎসর ধরে হিন্দু-মুসলমান একই সমাজ-জীবনে প্রতিবেশী হিসাবে বাস করে আসছে। এরা পরস্পর সুখ-দুঃখের অংশ গ্রহণ করতে কুণ্ঠিত হয় না—এমন কি প্রয়োজন হলে একজন অপরজনের জন্যে প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিতে পারে। 'ভাইচারা'র কাহিনীতে এই জাতীয় হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতির চিত্রই অঙ্কিত হয়েছে। আধুনিক সমাজ-জীবনের ভিত্তিতে রচিত এই চিত্রখানি সাধারণ দর্শককে শুধু যে তৃপ্তি দেবে—তাই নয়—তাদের শিক্ষা-বিধানও করবে। শান্তারামের 'পড়শী'র পরে এই জাতীয় আর কোন চিত্র নির্মিত হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। আমাদের জাতীয় জীবনে এই উদ্দেশ্যমূলক চিত্রের প্রয়োজন প্রতিদিনই বেড়ে চলেছে। তবে 'ভাইচারা'র মূল উদ্দেশ্য সাধু হলেও, কাহিনীতে মাঝে মাঝে অবাস্তবতার সংস্পর্শ আছে। ছবিখানির চিত্রগ্রহণ ও শব্দগ্রহণ উচ্চাংগের হয়েছে। 'ভাইচারা'র প্রযোজক মিঃ পরাশর এবং পরিচালক মিঃ জি কে মেহতাকে আমরা আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

খেলাধুলা

বাঙলার ক্রিকেট দলের সাফল্য

বাঙলার ক্রিকেট দল রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার পূর্বাঞ্চলের প্রথম খেলায় কোনরূপে বিহার দলকে পরাজিত করায় অনেকেই পূর্বাঞ্চলের ফাইনাল খেলায় বাঙলা দল হোলকার দলের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরাজিত হইবে বলিয়াই আশংকা করেন। কিন্তু সেই আশংকা যে সম্পূর্ণ ভ্রান্তিমূলক ছিল তাহা সম্প্রতি অনুষ্ঠিত ফাইনাল খেলার ফলাফল হইতেই সকলে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। বাঙলা দল ফাইনাল খেলায় হোলকার দলকে শোচনীয়ভাবে ১০ উইকেটে পরাজিত করিয়াছে। কর্নেল সি কে নাইডু, মুস্তাক আলী, জে এন ভায়া, নিম্বলকার প্রভৃতি ভারতের খ্যাতনামা খেলোয়াড়গণ হোলকার দলের পক্ষ সমর্থন করিয়াও বাঙলা দলকে জয়লাভে বঞ্চিত করিতে পারেন নাই। গত বৎসর হোলকার দল ইন্দোরে বাঙলা দলের বিরুদ্ধে ছয় শতের অধিক রাণ সংগ্রহ করিয়া বাঙলা দলকে পরাজিত করে। প্রথম ইনিংসের ফলাফলে এই খেলার নিষ্পত্তি হয়। কিন্তু এই বৎসর বাঙলা দল সেই পরাজয়ের যেভাবে প্রত্যুত্তর দিয়াছে তাহা হোলকার দলের খেলোয়াড়গণ বহুদিন স্মরণ রাখিবেন বলিয়া মনে হয়। বাঙলা দল খেলায় হোলকার দলকে যে অবস্থার মধ্যে আনিয়া ফেলিয়াছিল, তাহাতে সকলেই ইনিংস পরাজয়ের কল্পনা করিতে বাধ্য হয়। কেবল অধিনায়কের বোলিং পরিবর্তনের ত্রুটির জন্য হোলকার দল ঐ অবস্থার পরিবর্তন করে ও ইনিংস পরাজয় হইতে অব্যাহতি পায়।

তরুণ খেলোয়াড় পি সেনের কৃতিত্ব

বাঙলা দলের এই সাফল্য একরূপ তরুণ খেলোয়াড় পি সেনের ব্যাটিং ও কে ভট্টাচার্যের বোলিংয়ের জনাই সম্ভব হইয়াছে। শ্রীমান পি সেন বাঙলা দলের প্রথম ইনিংসের খেলায় যেরূপ স্বচ্ছন্দতা ও নির্ভুলভাবে খেলিয়া একাই ১৪২ রাণ সংগ্রহ করিয়াছেন, ইতিপূর্বে রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার কোন খেলায় কোন বাঙালী ক্রিকেট খেলোয়াড়কে করিতে দেখা যায় নাই। শ্রীমানের বয়স মাত্র ১৮ বৎসর এবং এই বৎসরই প্রথম বাঙলার পক্ষ সমর্থন করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন। বিহার দলের বিরুদ্ধে খেলিয়া ইনি উইকেট রক্ষকতায় বিশেষ দক্ষতা প্রদর্শন করেন। হোলকার দলের বিরুদ্ধে ব্যাটিংয়ে কৃতিত্ব অর্জন করিলেন। ইহার পরবর্তী খেলায় হয়তো এইরূপ ব্যাটিং ও উইকেট রক্ষকতার কার্যে ইনি নিপুণতা প্রদর্শন করিতে নাও পারেন, কিন্তু তাহা হইলেও ইহা দৃঢ়তার সহিত আমরা বলিতে পারি যে, শ্রীমান সেন শীঘ্রই বাঙলার একজন প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট খেলোয়াড় বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিবেন। এমন কি ভারতের শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়দের মধ্যে যদি অদূর ভবিষ্যতে ইনি স্থান পান তাহা হইলেও আশ্চর্যান্বিত হইবার কোনই কারণ থাকিবে না। ভারতীয় ক্রিকেট মাঠে বাঙালী ক্রিকেট খেলোয়াড়দের একরূপ স্থান নাই বলিলেই হয়। একমাত্র সুঁটে ব্যানার্জি বোলিংয়ের জোরে ভারতীয় একাদশের মধ্যে স্থান করিয়া লইয়াছেন। শ্রীমান সেন উইকেট রক্ষকতায় ও ব্যাটিংয়ের নৈপুণ্যের জোরে যদি স্থান করিয়া লইতে পারেন, তবে বাঙলার ক্রিকেট খেলোয়াড়দের সম্মান অনেকখানি বৃদ্ধি পাইবে। শ্রীমান সেন সেইরূপ উন্নততর নৈপুণ্যের অধিকারী হউন, ইহাই আমাদের আন্তরিক কামনা।

খেলার বিবরণ

বাঙলা দল টসে জয়ী হইয়া প্রথম ব্যাটিং গ্রহণ করে। ৪১ রাণের সময় প্রথম উইকেটের

কালীঘাট ক্লাবের সভ্য তরুণ ক্রিকেট খেলোয়াড় পি সেন। ইনিই হোলকার দলের বিরুদ্ধে ১৪২ রাণ করিয়াছেন।

পতন হয়। পি সেন এই সময় যোগদান করেন। পি সেন অর্ধ ঘণ্টা খেলিবার পরই আহত হন। তাঁহার নাকে ভীষণ আঘাত লাগে ও দরদর ধারে রক্ত পড়িতে থাকে। প্রাথমিক চিকিৎসার পর পুনরায় তিনি খেলিতে আরম্ভ করেন। মধ্যাহ্ন ভোজের সময় বাঙলা দলের এক উইকেটে ১০৮ রাণ হয়। পি সেন ৩৪ রাণ ও অসিত চ্যাটার্জি ৩৭ রাণ করিয়া নট আউট থাকেন। মধ্যাহ্ন ভোজের পর ১৩৭ রাণের সময় এ চ্যাটার্জি আউট হন। নির্মল চ্যাটার্জি খেলায় যোগদান করেন। রাণ দ্রুত উঠিতে আরম্ভ করে। হোলকার দলের অধিনায়ক কর্নেল নাইডু ঘন ঘন বোলার পরিবর্তন করেন, কোন ফল হয় না। ১৯৫ মিনিটে ২০০ রাণ পূর্ণ হয়। কর্নেল নাইডু নূতন বল গ্রহণ করেন। সেন নির্ভিকভাবে সমানে পিটাইয়া খেলি[তে] থাকেন। পি সেন ১৫০ মিনিটে নিজস্ব শত র[াণ] পূর্ণ করেন। চা পানের সময় বাঙলা দ[লের] ২ উইকেটে ২৮২ রাণ হয়। পি সেন ১৩৭ রা[ণ] ও নির্মল চ্যাটার্জি ৫১ রাণ করিয়া নট আউ[ট] থাকেন। চা পানের পরই বাঙলা দলের দ্রু[ত] উইকেট পতন আরম্ভ হয়। প্রথম দিনের শে[ষে] বাঙলা দল ৭ উইকেটে ৩৭৭ রাণ করে। পি সে[ন] এ চ্যাটার্জির সহযোগিতায় ৯৭ রাণ ও এ চ্যাটার্জির সহযোগিতায় ১৬২ রাণ সংগ্রহ করেন

দ্বিতীয় দিনের খেলা আরম্ভ করিয়া মা[ত্র] ১০ রাণে বাঙলা দলের অপর সকলে আউট হন। হোলকার দল খেলা আরম্ভ করেন কিন্তু সুবিধা করিতে পারেন না। কে ভট্টাচার্যের মারাত্মক বোলিংয়ের জন্য হোলকার দলের প্রথম ইনিংস ১৩৮ রাণে শেষ হয়। একমাত্র মুস্তাক আলী উক্ত রাণের মধ্যে ৩৩ রাণ করিতে সক্ষম হন। ফলে হোলকার দলকে "ফলো অন্" করিতে হয়। দ্বিতীয় দিনের শেষে ৪ উইকেটে ১৪০ রাণ করেন। তৃতীয় দিনে হোলকার দলের খেলোয়াড়গণ প্রত্যেকে অপূর্ব দৃঢ়তা প্রদর্শন করেন। বাঙলা দলের বোলারদের শত চেষ্টা সত্ত্বেও তাঁহারা ইনিংস পরাজয় হইতে অব্যাহতি পান। নিম্বলকার, তরুণ খেলোয়াড় রামেশ্বর প্রতাপ সিংহের জন্য ইহা সম্ভব হয়। হোলকার দল দ্বিতীয় ইনিংস ২৬৬ রাণে শেষ করিলে বাঙলা দল মাত্র ১৭ রাণে পশ্চাতে পড়িয়া যায়। তখন বাঙলা দলকে দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করিতে হয় ও কেহ আউট না হইয়া উক্ত প্রয়োজনীয় রাণ সংগ্রহ করে। বাঙলা দল ১০ উইকেটে বিজয়ী হয়। বাঙলা দলকে রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার সেমি-ফাইনালে হায়দরাবাদ ও মাদ্রাজ দলের বিজয়ীর সহিত ইহার পরে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে হইবে।

খেলার ফলাফল :—

বাঙলা দলের প্রথম ইনিংস :—৩৮৭ (পি সেন ১৪২, এ জব্বর ৩৬, অসিত চ্যাটার্জি ৪৭, নির্মল চ্যাটার্জি ৭৯, কে ভট্টাচার্য ২৫, কুচবিহারের মহারাজা ২৬ ; এইচ গাইকোয়ার ৮৪ রাণে ১টি, সি কে নাইডু ১১৭ রাণে ২টি, টাটারাও ৪৬ রাণে ৪টি, সুব্রামানিয়াম ২৭ রাণে ১টি উইকেট পান)।

হোলকার দলের প্রথম ইনিংস :—১৩৮ রাণ (সি হোলকার ২৯, মুস্তাক আলী ৩৩, জে এন ভায়া ১৯ ; বিমল মিত্র ২৪ রাণে ২টি, কে ভট্টাচার্য ২৪ রাণে ৬টি, এস দত্ত ১৩ রাণে ১টি উইকেট পান)।

হোলকার দলের দ্বিতীয় ইনিংস :—২৬৬ রাণ—(মুস্তাক আলী ৭০, নিম্বলকার ৫৭, রামেশ্বর প্রতাপ সিং ৩৬, ইস্তাক আলী ২১, জে এন ভায়া ২০, সি কে নাইডু ১৮ ; বিমল মিত্র ৪৭ রাণে ২টি, এস ব্যানার্জি ৪২ রাণে ২টি, কে ভট্টাচার্য ৫৩ রাণে ২টি, এস দত্ত ৫২ রাণে ২টি ও অসিত চ্যাটার্জি ৪ রাণে ১টি উইকেট পান)।

বাঙলা দলের দ্বিতীয় ইনিংস :—কেহ আউট না হইয়া ২১ রাণ। মন্টু সেন নট আউট ৩, অসিত চ্যাটার্জি নট আউট ১৫)।

সাপ্তাহিক সংবাদ

৪ঠা জানুয়ারী

মস্কোর সংবাদে প্রকাশ, অগ্রগামী কসাক টহলদার সৈন্যদল কয়েক স্থানে প্রাক্তন রুশ-পোলিশ সীমান্ত অতিক্রম করিয়াছে। ওলেভস্ক দখল করা হইয়াছে বলিয়া সরকারীভাবে ঘোষিত হইয়াছে। ওলেভস্ক পোলিশ সীমান্ত হইতে মাত্র আট মাইল দূরে অবস্থিত।

ভারবানের এক সংবাদে বলা হইয়াছে যে, শ্রীযুক্ত মণিলাল গান্ধীর নিকট তাঁহার ভ্রাতা দেবদাসের যে তার আসিয়াছে তাহাতে প্রকাশ, শ্রীযুক্তা গান্ধী সম্প্রতি কয়েকবার হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন; তাঁহার অবস্থা এখন সংকটাপন্ন এবং চিকিৎসার সুযোগও সীমাবদ্ধ।

অদ্য কলিকাতার হাসপাতালসমূহে ১৭ জন পীড়িত নিরন্নের মৃত্যু হয়।

ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুলে যে ছাত্রছাত্রী ধর্ম্মঘট চলিতেছে, তৎসম্পর্কে উক্ত স্কুলের ৬ জন ছাত্র এবং একজন ছাত্রী—মোট ৭ জনকে ঐ প্রতিষ্ঠান হইতে বহিষ্কার করা হইয়াছে।

৫ই জানুয়ারী

মস্কোর সংবাদে প্রকাশ, সোভিয়েট বাহিনী পোলিশ ইউক্রেনের অভ্যন্তরে ৪ মাইল পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছে।

অগ্রগামী লালফৌজ কর্ত্তৃক পোল্যাণ্ড সীমান্ত অতিক্রমের ফলে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে, তৎসম্পর্কে লণ্ডনস্থ পোলিশ গভর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে প্রচারিত এক বিবৃতিতে বলা হয় যে, পোল গভর্ণমেণ্ট আশা করেন যে, সোভিয়েট ইউনিয়ন পোল সাধারণতন্ত্রের স্বার্থ ও অধিকারের সম্যক্ মর্যাদা রক্ষা করিতে ভুলিবেন না।

অদ্য মার্কিন প্রচার বিভাগের এক রিপোর্টে বলা হয় যে, জার্মানী ও জাপানের দীর্ঘকাল যুদ্ধ চালাইবার মত অস্ত্রশস্ত্র বা মনোবলের অভাব ঘটিয়াছে, এমন কোন লক্ষণ নাই। এক বৎসর পূর্ব্বে যে ভূভাগ জার্মানীর পদানত ছিল, তাহার মাত্র এক-পঞ্চমাংশ সে হারাইয়াছে। তাহার শক্তিশালী বিমান বাহিনী, বিশেষত বহু জঙ্গী বিমান রহিয়াছে। জার্মান জনসাধারণ যথেষ্ট আহার পাইতেছে এবং ১৯৩৯ সালের পর এ বৎসরের ফসলই সব চেয়ে ভাল হইয়াছে। এক বৎসর পূর্ব্বে যে ভূভাগ জাপান করতলগত করিয়াছিল, তাহার মাত্র ২০ ভাগের এক ভাগ সে হারাইয়াছে।

ঔষধপত্রাদির মূল্য ও বণ্টন নিয়ন্ত্রণের জন্য ভারত গভর্ণমেণ্ট ভারতরক্ষা বিধানানুসারে "১৯৪৩ সালের ঔষধাদি নিয়ন্ত্রণ আদেশ" নামে এক আদেশ জারী করিয়াছেন।

অদ্য কলিকাতার হাসপাতালসমূহে ১৯ জন পীড়িত নিরন্নের মৃত্যু হয়।

৬ই জানুয়ারী

আজ প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট কংগ্রেসের নিকট ঋণ ও ইজারা সম্পর্কে ত্রয়োদশ রিপোর্ট পেশ করিয়া বলেন, "১৯৪৪ সালেই বর্ত্তমান যুদ্ধের চূড়ান্ত ফলাফল নির্দ্ধারণকারী কার্য্য-ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে। ঋণ ও ইজারা ব্যবস্থায় মিত্রপক্ষের আক্রমণ ক্ষমতা বর্দ্ধিত হইয়াছে এবং সমুদ্রপথে সমরাস্ত্র প্রেরণের পরিমাণও অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন।

মস্কোর সংবাদে প্রকাশ, সোভিয়েট বাহিনী বার্দিশেভ পুনরধিকার করিয়াছে।

বোম্বাই গভর্ণমেণ্ট আমেদাবাদ শহরের অধিবাসীদের উপর দাঙ্গার জন্য ১৮ লক্ষ টাকা পিটুনি ট্যাক্স ধার্য্য করিয়াছেন।

১৯৪১ সালের বঙ্গীয় বিক্রয় ফাইনান্স (বিক্রয়-কর) আইন সংশোধনের জন্য একটি বিল বর্ত্তমান সপ্তাহের কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে। বিলের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, ১৯৪১ সালের বঙ্গীয় ফাইনান্স (বিক্রয়-কর) আইন অনুযায়ী প্রতি টাকায় যে এক পয়সা হারে বিক্রয়-কর ধার্য্য করিবার বিধান আছে, প্রদেশের রাজস্ব বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে এই বিলে সেই হার বাড়াইয়া অর্দ্ধ আনা করার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

অদ্য কলিকাতার হাসপাতালসমূহে ৮ জন পীড়িত নিরন্নের মৃত্যু হয়।

৭ই জানুয়ারী

জার্মান নিয়ন্ত্রিত স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান টেলিগ্রাম ব্যুরোর এক সংবাদে প্রকাশ যে, রুশ রণাঙ্গনে জার্মান কর্ত্তৃপক্ষ এবার একটা বিরাট আক্রমণের আশঙ্কা করিতেছেন। এই সংবাদে বার্লিনের জনৈক সামরিক মুখপাত্রের উক্তি উল্লেখ করা হইয়াছে। উক্ত মুখপাত্র বলেন, "জার্মান হাই-কম্যাণ্ড মর্যাদারক্ষার খাতিরে রুশিয়ার কোন অধিকৃত এলাকা দখলে রাখিবার অভিপ্রায় পোষণ করেন না; এমনকি, জার্মানী যদি সমস্ত রুশিয়া হইতে পশ্চাদপসরণে বাধ্য হয়, তথাপি তাহা সমগ্র রণাঙ্গনে অখণ্ডতা রক্ষার সমস্যা অপেক্ষা গুরুতর হইবে না।"

"স্টকহলম্ টিডনিনজেন" পত্রিকার এক সংবাদে প্রকাশ, মিত্রপক্ষের বিশেষভাবে শিক্ষিত সৈন্যদলের কয়েকটি ডিভিসন আদ্রিয়াতিক উপকূলে যুগোস্লাভিয়ার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে অবতরণ করিয়াছে।

অদ্য কলিকাতার হাসপাতালসমূহে ১৮ জন পীড়িত নিরন্নের মৃত্যু হয়।

৮ই জানুয়ারী

মস্কোর সংবাদে প্রকাশ, সরকারীভাবে ঘোষিত হইয়াছে যে, লালফৌজ কিরভগ্রাদ পুনরধিকার করিয়াছে। কিরভগ্রাদ শহরটি চেরকাসির ৭০ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে ক্রেমেনচুগ হইতে ওডেসাগামী রেলপথের উপর অবস্থিত।

ইতালীতে সুরক্ষিত জার্মান ঘাঁটি সানভিতো মার্কিন ৫ম আর্মি কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছে। মার্কিন ৫ম আর্মি সানভিতোর গ্রাম অধিকার করার পর ক্যাসিনো উপত্যকার মধ্য দিয়া ক্যাসিনোর দিকে আগাইয়া চলিয়াছে এবং প্রধান জার্মান ঘাঁটি ক্যাসিনোর প্রবেশপথ হইতে দুই মাইল দূরবর্ত্তী সারভেরোর নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। সানভিতোর পতনের পর রোমের পথে একমাত্র ক্যাসিনোই শেষ জার্মান ঘাঁটি অবশিষ্ট রহিল। ইহা ৬ হাজার ফুট উচ্চ এবং ক্যাসিনো গিরিবর্ত্মের ৬ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত।

মার্কিন নৌবিভাগ হইতে ঘোষিত হইয়াছে যে, প্রশান্ত মহাসাগর ও সুদূর প্রাচ্যের দরিয়ায় মার্কিন সাবমেরিনের আক্রমণে প্রতিপক্ষের আরও দশখানি জাহাজ জলমগ্ন হইয়াছে।

বোম্বাইয়ের পাঁচমহাল জেলার দোহাদ হইতে প্রাপ্ত এক সংবাদে জানা যায় যে, এক উত্তেজিত জনতা একটি সরকারী শস্যের দোকানে হানা দিলে, পুলিস তাহাদিগকে বাধা দিতে যাইয়া গুলী চালায়। ফলে ৪ জন মারা যায়, অপর সকলে সরিয়া পড়ে।

অদ্য কলিকাতার হাসপাতালসমূহে ১২ জন পীড়িত নিরন্নের মৃত্যু হয়।

৯ই জানুয়ারী

ভারতসচিব মিঃ আমেরী ইয়র্কে এক বক্তৃতা-প্রসঙ্গে বলেন যে, স্যার স্টাফোর্ড ক্রীপসের মারফৎ ব্রিটেন ভারতের নিকট যে উদার প্রস্তাব করিয়াছিল, পৃথিবীর অন্য কোন দেশ কখনও তাহা করিতে সক্ষম হয় নাই। মিঃ আমেরী বলেন,—"আমরা যে শঙ্কিত হইয়া অথবা আমাদের অতীত কীর্ত্তির গৌরবমণ্ডিত অধিকার বর্জনের সম্ভাবনায় চিন্তিত হইয়া ইহা করিয়াছি তাহা নহে, পরন্তু আমরা মনে করি যে, স্বাধীনতা একটি সঞ্জীবনী নীতি ও ব্রিটিশ কমনওয়েলথ ইহারই উপর প্রতিষ্ঠিত এবং সাম্রাজ্যের প্রত্যেক স্থানের গভর্ণমেণ্টের ইহা স্বাভাবিক এবং ন্যায়সঙ্গত পরিণতি।"

সোভিয়েট ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, ৮ই জানুয়ারী তারিখে প্রথম ইউক্রেনীয় ফ্রণ্টের সোভিয়েট সৈন্যদল ভিনিৎসার জিলা কেন্দ্র ইলিনৎসি অধিকার করে। 'রেড স্টার' বলিতেছেন,—রভোনা প্রদেশের উত্তর দিকবর্ত্তী অরণ্যানী ও জলাভূমি হইতে আরম্ভ করিয়া কিয়েভের দক্ষিণে নীপারের দক্ষিণ তীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত এক বিরাট অঞ্চল যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। পোলেসাইতে (সার্নিমুখী অভিযানে) জার্মানরা সোভিয়েট বাহিনীর চাপে কাবু হইয়া পড়িয়াছে। রাশিয়ানরা সার্নির ৭ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে উপস্থিত হইয়াছে এবং প্রাক্তন পোলিশ সীমান্তের ৩৫ মাইল অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছে।

অদ্য কলিকাতার হাসপাতালসমূহে ১৮ জন পীড়িত নিরন্নের মৃত্যু হয়।

১০ই জানুয়ারী

লক্ষ্ণৌয়ের জেলা ও দায়রা জজ মিঃ এফ লোভেল স্মিথ বিলাসিয়া হত্যা মামলার রায় দিয়াছেন। যুক্তপ্রদেশের স্বায়ত্তশাসন বিভাগের প্রাক্তন সেক্রেটারী মিঃ বি বি সিং আই সি এস'কে অনিচ্ছাকৃত নরহত্যার দায়ে দোষী সাব্যস্ত করিয়া ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০৪ ধারা অনুসারে জজ তাঁহার প্রতি ছয় বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দিয়াছেন। এই মামলায় মিঃ বি বি সিং তাঁহার আত্মীয় ঠাকুর ভাল্লোয়ার সিং এবং শেষোক্ত ব্যক্তির তিনজন ভৃত্য অনন্তু, ফকিরী ও গুরুবক্সের বিরুদ্ধে প্রমাণ লোপ করার জন্য ভারতীয় দণ্ডবিধির ২০১ ধারানুসারে আনীত অভিযোগ সম্পর্কে জজ সিদ্ধান্তের জন্য ফৌজদারী কার্য্যবিধির ৩০৭ ধারানুসারে মামলাটি চীফ কোর্টে প্রেরণ করিয়াছেন। অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ, গত ২৮শে মে রাত্রিতে মিঃ বি বি সিং তাঁহার অষ্টাদশবর্ষীয়া পরিচারিকা বিলাসিয়াকে সাংঘাতিকভাবে মারধর করেন। ফলে তাহার মৃত্যু হয়। পরে অপর আসামীদের সাহায্যে আসামী মিঃ সিং উক্ত পরিচারিকার শবটি সীতাপুর জেলার কাস্রাইল সেতুর নিকট সরাইয়া ফেলেন।

সম্পাদকঃ শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন

সহকারী সম্পাদকঃ শ্রীসাগরময় ঘোষ

১১ বর্ষ] শনিবার, ৮ই মাঘ, ১৩৫০ সাল। Saturday, 22nd January 1944 [১১শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

আমন শস্য সংগ্রহ

আমন শস্য সংগ্রহ সম্বন্ধে বাঙলা গভর্নমেন্ট ও ভারত গভর্নমেন্টের মধ্যে মতভেদ চলিতেছিল। ভারত গভর্নমেন্টের খাদ্যসচিব স্যার জওলাপ্রসাদ শ্রীবাস্তব সম্প্রতি যে বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে দেখা যাইতেছে যে, উভয় গভর্নমেন্টের ভিতরকার সে মতবিরোধের মীমাংসা হইয়াছে। আমন শস্য সংগ্রহ সম্পর্কে বাঙলা গভর্নমেন্ট চারজন চীফ এজেন্ট নিযুক্ত করিবেন এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন; ভারত গভর্নমেন্টের সঙ্গে আলোচনার ফলে সেই সিদ্ধান্ত কিছু পরিবর্তিত হইয়াছে বলিয়া শুনা যায়। নূতন ব্যবস্থানুযায়ী এই চারজন এজেন্টের মধ্যে দুইজন ভারত গভর্নমেন্ট নিযুক্ত করিবেন; এইরূপ স্থির হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। ইহাতে ইহাই বুঝা যাইতেছে যে, ভারত গভর্নমেন্ট তাঁহাদের নিযুক্ত এজেন্টদের মারফতে এ বিষয়ে নিজেদের হাতে কিছু কর্তৃত্ব রাখিতে চাহিয়াছিলেন। নূতন চুক্তির দ্বারা সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে। স্যার জওলাপ্রসাদ তাঁহার বিবৃতিতে বলিয়াছেন যে, বাঙলা গভর্নমেন্টকে এই কার্যে সাহায্য করিবার জন্য ভারত গভর্নমেন্ট বাঙলা গভর্নমেন্টের সম্মতিক্রমে বাঙলা দেশে একজন অভিজ্ঞ কর্মচারীকে প্রেরণ করিয়াছেন। বাঙলা গভর্নমেন্টের আমন শস্য সংগ্রহের পরিকল্পনায় ভারত গভর্নমেন্ট হস্তক্ষেপ করিতে উদ্যত হইয়াছেন এবং তাহার ফলে বাঙলা দেশে পুনরায় খাদ্য সংকট জটিল আকার ধারণ করিতে পারে, মুসলিম লীগের করাচী অধিবেশনে বাঙলার প্রধান মন্ত্রী স্যার নাজিমুদ্দিন এইরূপ আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছিলেন, নূতন মীমাংসায় সেই আশঙ্কার কারণ অন্তত বাঙলার মন্ত্রীদের দিক হইতে দূর হইল বলিতে হয়; কিন্তু দেশের যে অবস্থা আমরা দেখিতেছি, তাহাতে আমরা এ সম্বন্ধে নিরুদ্বিগ্ন হইতে পারিতেছি না। ম্যালেরিয়া কলেরা বসন্ত এই সব মহামারীতে বাঙলা দেশ উৎসন্ন হইতে বসিয়াছে; এমন ক্ষেত্রে দেশের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরাইয়া আনা সহজ নয় এবং নীতি নির্দিষ্ট হওয়াই এ সম্পর্কে সব কথা নয়। দেশের প্রকৃত সমস্যা সমাধানে সেই নীতির প্রয়োগের কার্যকারিতাই এ ক্ষেত্রে প্রধান বিবেচ্য। গভর্নমেন্টের আমন ধান্য সংগ্রহের নীতি বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগের পথে এখনও বিশেষ অন্তরায় রহিয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি। ধান চাউলের মূল্য নূতন শস্য আমদানীর মুখে যতটা নামা স্বাভাবিক ছিল ততটা নামে নাই। বাঙলার অসামরিক বিভাগের সরবরাহসচিব সম্প্রতি স্বয়ং একথা স্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, চাউলের দর যে স্তরে নামিলে নিঃশঙ্ক হওয়া যায়, দর এখনও ততটা হ্রাস পায় নাই। পক্ষান্তরে বাঙলা দেশের অনেক স্থানে চাউলের দর ইতিমধ্যেই চড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। বর্তমানে বাঙলার সর্বত্র চাউলের দর সরকারী নির্দিষ্ট দরেও আসিয়া দাঁড়ায় নাই, বাজারের ভাব তেজীই রহিয়াছে। এমন অবস্থায় গভর্নমেন্ট যদি বাজারে চাউল ক্রয় করিতে প্রবৃত্ত হন, তবে দর দেখিতে দেখিতে অনেক চড়িবে, এমন আশঙ্কার কারণ আছে। মিঃ সুরাবর্দিও সে আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি

বলিয়াছেন, এমন অবস্থায় সামান্য পরিমাণে চাউল ক্রয় করিবার প্রশ্নও তোলা যায় না। কিন্তু ঘাটতি অঞ্চলের অভাব পূরণের জন্য গভর্নমেন্টের কিছু চাউল ক্রয় করা প্রয়োজন; ইহা ছাড়া বাঙলা দেশের কয়েকটি শহরে তাঁহারা রেশনিং ব্যবস্থা প্রবর্তনের পরিকল্পনা করিয়াছেন, ইহা কার্যে পরিণত করিবার নিমিত্তও তাঁহাদের চাউল সংগ্রহ করা আবশ্যক। কতকগুলি মজুতদার এবং লাভখোরদের হাতে দেশের লোককে ছাড়িয়া দেওয়াও এমন সংকটে সরকারের পক্ষে সমীচীন হইতে পারে না। সুতরাং তাঁহাদের চাউল সংগ্রহের পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করিবার প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে; কিন্তু সে জন্য চাউলের দর কমান প্রথমে দরকার। বাজারের বর্তমান অবস্থা কৃত্রিম এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। স্বাভাবিক অবস্থায় আমন ফসলের অব্যবহিত পরে মাঘ মাসেই চাউলের দর এতটা চড়া থাকিতে পারে না। বাজারের এই অস্বাভাবিক অবস্থার প্রতিকারের জন্য বাঙলা গভর্নমেন্ট কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন, আমাদের মনে প্রথমত এই প্রশ্নই উঠিতেছে। তারপর চাউল সংগ্রহের ব্যাপার। এ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, গভর্নমেন্টের সংগ্রহ ব্যবস্থা যদি কার্যকরী করিতে হয়, তাহা হইলে এজেন্ট নির্বাচন বিষয়ে তাঁহাদের বিশেষ বিবেচনার প্রয়োজন। আসল কথা হইতেছে, গভর্নমেন্টের সংগ্রহ-ব্যবস্থায় লোকের মধ্যে যাহাতে কোনও আশংকা বা উদ্বেগ দেখা না দেয়, তজ্জন্য বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার। জনসাধারণের কাছে আস্থা-সম্পন্ন অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের উপরই এ বিষয়ে ভার দেওয়া কর্তব্য।

শহরে রেশনিং

আগামী ৩১শে জানুয়ারী হইতে কলিকাতা শহর এবং উপকণ্ঠবর্তী বাণিজ্য-প্রধান অঞ্চলে রেশনিং ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইবে এবং এই ব্যবস্থা এখন পাকা বলা যায়। কোন্ কোন্ দোকানে রেশনিং কার্ডে রেজেস্ট্রী করিতে হইবে, সে সম্বন্ধে বিজ্ঞাপন প্রদত্ত হইয়াছে এবং কার্ডও রেজেস্ট্রী করা হইতেছে। রেশনিংয়ের ব্যবস্থা আমরা পুরাপুরি রকমেই সমর্থন করি; কিন্তু এই সম্পর্কে যেসব বিধি-ব্যবস্থা হইতেছে, তাহার মধ্যে কোন কোন বিষয়ে আমরা গুরুতর ত্রুটি রহিয়াছে দেখিতে পাইতেছি। প্রথমত, অধিবাসী-দিগকে শহরের যে কোন অঞ্চলে নিজেদের ইচ্ছামত কার্ড রেজেস্ট্রী করিবার অধিকার দেওয়া হইয়াছে; এ ব্যবস্থা ভাল; কিন্তু একবার কোন দোকানে কার্ড রেজেস্ট্রী করিবার পর যদি সে দোকানের সম্পর্কে কাহারও অভিযোগের কারণ ঘটে, তবে ব্যবস্থা বদলাইয়া লইবার অধিকার তাহার থাকিবে কি? কর্তৃপক্ষ রেশন সম্পর্কে সম্প্রতি যে পুস্তিকা প্রচার করিয়াছেন, তাহাতে আমরা ইহা দেখিতেছি না। যদি সে সুবিধা না থাকে, তাহা হইলে লোকের দৈনন্দিন জীবনে ইহা লইয়া সংকট সৃষ্টি হওয়া অসম্ভব নয়; দ্বিতীয়ত, কলিকাতায় নবাগত বা যাহারা দুই-একদিনের জন্য আগন্তুক, তাহাদের প্রয়োজনীয় বস্তু সরবরাহের কোন সুব্যবস্থাই করা হয় নাই। এই শ্রেণীর লোকদিগকে যাহারা বাধা-বরাদ্দ হিসাবে সাহায্য পাইবে, তাহাদের অন্নেই ভাগ বসাইতে হইবে, নতুবা সরকারী নির্দেশমত হোটেলে আশ্রয় লইতে হইবে; কিন্তু কলিকাতা শহরে এই শ্রেণীর দুই-একদিনের জন্য আগন্তুক, অতিথি-অভ্যাগতের সংখ্যা সামান্য নয়। বাঙালীর পারিবারিক ব্যবস্থা ইংলণ্ডের মত নহে; এদেশে পারিবারিক ঘনিষ্ঠতা সমধিক ব্যাপক। অতিথি অভ্যাগতকে হোটেলে খাওয়াইবার রীতি এদেশে নাই; অথচ সরকারী ব্যবস্থার ত্রুটিতে পারিবারিক বাঁধা রেশনিংয়ের বরাদ্দের অংশ যদি ইহাদিগকে গ্রহণ করিতে হয়, তবে বাসিন্দা পরিবারকেই নিজেদের অন্ন হইতে বঞ্চিত হইবে; পক্ষান্তরে হোটেলেও যে এই শ্রেণীর বিপুল জন-সংখ্যার অন্ন-সমস্যার সমাধান হইবে, তাহা মনে হয় না। সুতরাং অবস্থার চাপে পড়িয়া অন্নের জন্য এই শ্রেণীর লোকদিগকে শহরের এক প্রান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া অপর প্রান্ত পর্যন্ত ছুটাছুটি করিতে হইবে, ইহা একটুও বিচিত্র নয়। রেশনিং সম্পর্কে আর একটি অসুবিধার কথা, কলিকাতা কর্পোরেশনের কয়েকজন কাউন্সিলার উপস্থিত করিয়াছেন এবং আমরাও তাঁহাদের যুক্তির সারবত্তা উপলব্ধি করিয়া থাকি। তাঁহারা বলেন, রেশনিং বণ্টনকারী দোকানে এক সপ্তাহের খাদ্যবস্তু একসঙ্গে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছে; কিন্তু এমন অনেক লোক আছে, যাহারা সপ্তাহের খাদ্যবস্তু একসঙ্গে ক্রয় করিতে পারে না। ইহাদের জন্য দৈনিক প্রয়োজনীয় বস্তু সরবরাহের ব্যবস্থা করা আবশ্যক। আমরা আশা করি, রেশনিং ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইবার পূর্বে এই সব অভিযোগের প্রতিকারের প্রতি কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবে। ধনী, দরিদ্র সকলের সুবিধা-অসুবিধা লইয়া যেখানে কারবার, সেখানে অবলম্বিত ব্যবস্থা যাহাতে সকলের পক্ষে উপযোগী হয়, এ সম্বন্ধে বিবেচনা করা সর্বাগ্রে প্রয়োজন।

ভারতরক্ষা বিধানের সংশোধন

ভারতরক্ষা বিধানের সংশোধন একটি নূতন অর্ডিন্যান্স জারি হইয়াছে। এই অর্ডিন্যান্সের সম্বন্ধে এই কথা বলা হইয়াছে যে, ব্রিটেনে আটক বন্দীরা যে সমস্ত ভোগ করিয়া থাকেন, এই অর্ডি এদেশের আটক বন্দীদিগকে তদ সুবিধা দান করা হইবে। কথাটা শু উপরে উপরে খুবই ভাল বলিয়া মনে কিন্তু নূতন অর্ডিন্যান্সের বিধান বিবেচনা করিলে বোঝা যাইবে, গ্রেট-ব্রি এতদুদ্দেশ্যে প্রবর্তিত বিধানের ভারতীয় বিধানের বিশেষ রহিয়াছে। গ্রেট-ব্রিটেনে অনুরূপ প্রয়োগের ক্ষমতা প্রত্যক্ষভাবে ইং স্বরাষ্ট্রসচিবের উপর রহিয়াছে। স্ব সচিব পার্লামেন্টের নিকট দায়িত্ব ব্যক্তি এবং সেই পথে জনমতের তাঁহাকে নিয়ন্ত্রিত হইয়া চলিতে কিন্তু ভারতরক্ষা বিধানের প্রয়োগ জনসাধারণের নিকট দায়িত্বসম্পন্ন বা রাজপুরুষের উপর অর্পিত ভারতে যাঁহারা এই বিধান প্রয়োগের ব্যা সংশ্লিষ্ট, জনমতের কিছুমাত্র ধার ত ধারেন না এবং তাহা প্রয়োজনও হয় তবে নূতন অর্ডিন্যান্সে একটি বাঁচোয়া দেখা যাইতেছে যে, কোন অবস্থাতেই আদেশ ছয় মাসের বেশী বলবৎ থা না; কিন্তু সেক্ষেত্রেও কর্তৃপক্ষ প্রয়ো বুঝিলে ছয় মাস অন্তর এরূপ আট আদেশ নূতন করিয়া দিতে পারি এদেশের অবস্থা বিবেচনা ক অতীতের অভিজ্ঞতা হইতে এ বাঁচোয়ারও আমরা প্রকৃত কোন মূ আছে, মনে করি না। কারণ যাঁহারা অ করিবেন, তাঁহাদের স্বেচ্ছাপূর্ণ বিবেচ উপরই ভবিষ্যতে বিধানের পুনঃপ্রয়ো একান্তভাবে নির্ভর করিবে; তবে সম্পর্কে বন্দীদের একটি অধিকারের উঠিতে পারে, নূতন অর্ডিন্যান্সে বিধান রহিয়াছে যে, বন্দীদিগ কেন আটক করা হইয়াছে ত জানানো হইবে এবং তাঁহারা কর্তৃপক্ষে নিকট তাঁহাদের বক্তব্য অর্থাৎ মুক্তিলাভে পক্ষে যুক্তি উপস্থিত করিতে পারিবে এতদ্দ্বারা বন্দীদের প্রকৃত পক্ষে নূ কোন অধিকার বর্তাইয়াছে বলি আমরা মনে করি না। প্রকা আদালতে নিজেদের বক্তব্য উপস্থি করিবার অধিকার বন্দীদিগকে দেও হয় নাই; আটক রাখিবার প যাঁহারা যুক্তি উপস্থিত করিবেন, সে যু খণ্ডন করিবার পক্ষে বন্দীর যুক্তির বিচ করিবার অধিকারও তাঁহাদের উপর

রহিয়াছে। সুতরাং নূতন অর্ডিন্যান্স জারীর দ্বারা 'ভারতরক্ষা বিধান' সম্পর্কে বন্দীদের অভিযোগের কারণ দূর হইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি না। ব্যক্তি-স্বাধীনতা হইতে বিনাবিচারে বঞ্চিত হইবার যে দুর্ভাগ্য বন্দীরা ভোগ করিতেছে, নূতন অর্ডিন্যান্স জারী সত্ত্বেও সে দুর্ভাগ্যের বিড়ম্বনা সমভাবেই বিনা বিচারে তাহাদিগকে সহ্য করিতে হইবে।

নিরাশ্রয় নারীরক্ষা—

দুর্ভিক্ষের ফলে বাঙলার বহু নারী সর্বস্ব হারা হইয়াছে। স্বাভাবিক গার্হস্থ্য এবং সমাজ-জীবন বিপর্যস্ত হইয়া পড়ায় অনেক নারী ও শিশু সম্পূর্ণ অনাথ এবং নিরাশ্রয় হইয়াছে। ইহাদিগকে আশ্রয় দান ও সমাজ-জীবনে ইহাদের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিবার দায়িত্ব অতি গুরুতর। বাঙলা দেশের 'মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি' এই কর্তব্যের প্রতি বাঙলা সরকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়াছেন। তাঁহারা কর্তৃপক্ষকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন যে, দুর্ভিক্ষের ফলে অসহায় তরুণী নারীদিগকে লইয়া পাপ ব্যবসায় চলিয়াছে। এক দল দুর্বৃত্ত এই পাপ ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইয়াছে। আমরা দেখিতেছি, সরকারও অবস্থার এই গুরুত্ব অস্বীকার করিতেছেন না। এতৎসম্পর্কিত একটি সরকারী বিবৃতিতে 'মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি'র প্রস্তাবের সমালোচনা করিয়া বলা হইয়াছে যে, গভর্নমেণ্ট এ পর্যন্ত এ সম্বন্ধে কোনও মনোযোগ দেন নাই—ইহা সত্য নহে; কিছু দিন যাবৎ গভর্নমেণ্ট এই সমস্যা সম্বন্ধে গুরুতরভাবে বিবেচনা করিতেছিলেন। বাঙলার বিভিন্ন স্থানে নিরাশ্রয় তরুণীগণ যাহাতে দুর্বৃত্তদের কবলে না পড়ে, সে বিষয়ে বিশেষরূপে যত্নবান হইবার নিমিত্ত গভর্নমেণ্ট গত ৬ই জানুয়ারী সমস্ত সরকারী কর্মচারী ও বিশেষভাবে পুলিশ এবং সাহায্য কার্যে রত ব্যক্তিদের প্রতি নির্দেশ দিয়াছেন। সরকার এ সম্বন্ধে তাঁহাদের তৎপরতা জ্ঞাপন করিবার জন্য এই বিবৃতিতে যে যুক্তি দেখাইয়াছেন; তাহাতে আমরা সন্তুষ্ট হইতে পারি নাই। অবস্থা যে এমন গুরুতর আকার ধারণ করিতে পারে, অনেক পূর্বে তাঁহাদের ইহা উপলব্ধি করা উচিত ছিল। সংবাদপত্রে এই সমস্যার প্রতি বারংবার তাঁহাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করা হইয়াছে। শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত প্রভৃতি মহিলা কর্মিগণও বাঙলার দুর্ভিক্ষ-পীড়িত অঞ্চল পরিদর্শন করিয়া আসিয়া অবস্থার এমন গুরুত্বের কথা প্রকাশ করিয়াছেন; তত্রাচ যথাসময়ে এ দিকে তাঁহাদের নজর যায় নাই; এই কথাই বলিতে হয়; কারণ ৬ই জানুয়ারী যে নির্দেশ তাঁহারা দিয়াছেন, তাহাকে কিছু দিনের গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনার ফল বলিলে, সরকারের এ সম্পর্কে গুরুত্বের নিরিখকে লঘু করিয়াই দেখিতে হয়। এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করিবার মত অবস্থা দেশে সৃষ্টি হইতে পারে, তাঁহারা যখন ইহা উপলব্ধি করিয়া ছিলেন, তখন বহু পূর্বেই প্রতীকার ব্যবস্থা অবলম্বন করা তাঁহাদের পক্ষে কর্তব্য ছিল।

স্বামী বিবেকানন্দ

গত ১৭ই জানুয়ারী স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথি উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। মহামানবের আবির্ভাব জগতে অতি বিরল; পরাধীন বাঙলার বুকে বিবেকানন্দের বীর্যময় জীবনের বিকাশ এক যুগ-বিপর্যয়কর ব্যাপার বলা চলে। বিশাল অন্তঃকরণের উদার মহিমায় বাঙলার এই বীর সন্ন্যাসী সমগ্র জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন, স্বদেশপ্রেমের বহ্নিগর্ভ জ্বালাময়ী বাণী বিকীরণ করিয়া যুগাগত জীর্ণতা এবং দাস মনোবৃত্তির ঘৃণিত দৈন্যের গ্লানি তিনি দূর করিয়াছেন। এক কথায় বাঙলা দেশে তিনিই জাগরণের যুগ উদ্বোধন করিয়াছেন। বাঙালী জাতির নবযুগের মন্ত্রদাতা এই গুরুর চরণে আমাদের নতি নিত্য এবং সত্য হউক; ইহাই প্রার্থনা করিতেছি। এমন অগ্নিময় জীবনাদর্শের স্পর্শ বাঙলার বর্তমান জীবনে একান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে, স্বামীজীর বজ্রগম্ভীর বাণী বাঙলার আকাশে মন্দ্রিত হইয়া বাঙালীকে অকুতোভয় ত্যাগের পথে প্রণোদিত করুক।

পরলোকে আর এস পণ্ডিত

শ্রীযুত রণজিৎ সীতারাম পণ্ডিত গত ১৪ই জানুয়ারী পরলোকগমন করিয়াছেন। সাধারণের নিকট তিনি আর এস পণ্ডিত নামে পরিচিত ছিলেন। ১৯৪২ সালে কংগ্রেসের আগস্ট প্রস্তাব গৃহীত হইবার পর তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হয়। ১৯৪৩ সালের অক্টোবর মাসে তাঁহার স্বাস্থ্যের অবস্থা বিবেচনা করিয়া তাঁহাকে মুক্তিদান করা হয়। মুক্তির পর তিন মাসকাল মাত্র তিনি জীবিত ছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁহার সহধর্মিণী এবং কনিষ্ঠা কন্যাদ্বয়ও তাঁহার শয্যাপার্শ্বে ছিলেন। তাঁহার অপর দুই কন্যা চন্দ্রলেখা ও নয়নতারা বিদ্যা-শিক্ষার্থ সম্প্রতি আমেরিকায় আছেন। শ্রীযুত পণ্ডিতের জীবন দেশসেবার ত্যাগ-মহিমায় উদ্দীপ্ত। গত মহাযুদ্ধের সময় তিনি প্রথম কারাদণ্ড ভোগ করেন। তাহার পর হইতে মৃত্যুর তিন মাস পূর্ব পর্যন্ত তাঁহাকে একাধিকবার কারাবরণ করিতে হইয়াছে। তিনি সুপণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। 'রাজ-তরঙ্গিনীর' তৎকৃত ইংরেজী অনুবাদ এদেশের বাহিরেও খ্যাতিলাভ করিয়াছে। তীক্ষ্মবুদ্ধি রাজনীতিক বলিয়াও তাঁহার প্রতিষ্ঠা ছিল। নেহরু পরিবারের তীব্র দীপ্ত স্বদেশপ্রীতি ঐ পরিবারের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকাতে রণজিৎজীর সাধনায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল। পণ্ডিত জওহর-লালের অন্যতম সহকারীস্বরূপে তিনি কংগ্রেসের সেবায় একান্তভাবে আত্মনিবেদন করিয়াছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স কিঞ্চিদধিক পঞ্চাশ বৎসর হইয়াছিল। তাঁহার এই শোচনীয় অকালমৃত্যুতে দেশের সর্বত্র গভীর বেদনার সঞ্চার হইয়াছে। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্তা সহধর্মিনী, কন্যাগণ, কারারুদ্ধ জওহরলাল ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজনকে গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

ক্যাম্বেল স্কুলের ধর্মঘট

ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুলের ধর্মঘটের এখনও মীমাংসা হয় নাই। জনস্বাস্থ্য বিভাগের মন্ত্রী এই সম্পর্কে সার্জেণ্ট জেনারেলের রিপোর্ট চাহিয়া পাঠাইয়াছেন এবং বহিস্কারের আদেশ স্থগিত রাখিতে নির্দেশ দিয়াছেন। ইহা আশার কথা। এই ব্যাপার সম্পর্কে সাতজন ছাত্র-ছাত্রীকে বহিস্কার করা হয় এবং তাহার প্রতিবাদে সতেরো জন ছাত্রী অনশন ব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন। ইঁহারা অনশন ব্রত ভঙ্গ করিয়াছেন ইহাও সুখের বিষয়; কিন্তু আমরা অবিলম্বে এই ব্যাপারের মীমাংসা হওয়া দরকার, মনে করি। অন্য সব দেশেই এমন সব ক্ষেত্রে ছাত্র-ছাত্রীদের সম্বন্ধে কর্তৃপক্ষ উদার মনোভাব অবলম্বন করিয়া থাকেন; ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুলের ব্যাপারে যদি অনুরূপ মনোভাব অবলম্বিত হইত, তবে ব্যাপার এত দূর গড়াইত না বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। এক্ষেত্রে স্কুলের কর্তৃপক্ষ যে মতিগতি অবলম্বন করিয়া চলিয়াছেন, তাহাতে মনে হয় ছাত্র-ছাত্রীরা যাহাতে তাহাদের কৃতকার্যের জন্য অনুশোচনা করে, তাঁহারা তাহাদিগকে এমন শিক্ষা দিতে চাহেন; কিন্তু ছাত্র-ছাত্রীদের সম্পর্কে তাঁহাদের অভিভাবক স্থানীয় কর্তৃপক্ষের এমন মনোভাব সমীচীন নহে; ইহার ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষার পথে ব্যাঘাতই ঘটিতেছে। আমরা আশা করি, কর্তৃপক্ষ ইহা উপলব্ধি করিবেন। আমরা মনে করিয়াছিলাম জনস্বাস্থ্য বিভাগের মন্ত্রী এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবার পর দুই এক দিনের মধ্যেই এ গোলযোগের অবসান হইবে, তাহা হয় নাই, ইহা দুঃখের বিষয়। আমরা অবিলম্বে এই ধর্মঘটের পরিসমাপ্তি কামনা করি এবং ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকদের মধ্যে স্বাভাবিক স্নেহ ও প্রীতির সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত দেখিতে চাই।

বিদুষী ভার্য্যা

- শ্রীউপেন্দ্র নাথ গঙ্গোপাধ্যায় -

এক চুমুক চা পান করিয়া দিবাকর বলিল, "না, না আর নতুন চা আনতে হবে না, এ চা বেশ গরম আছে। তার চেয়ে তোমার ইংরেজি বইটা নিয়ে এস, একটু দেখি।"

ইংরেজি বই আনিবার প্রস্তাবে শিবানী একেবারে আরক্ত হইয়া উঠিল; কুণ্ঠা-জড়িত স্বরে সে বলিল, "না, না, দাদা সে আপনি কি দেখবেন,—ইংরেজি লেখা-পড়া আমি জানিনে।"

দিবাকর বলিল, "তুমি ইংরেজির ফার্স্ট বুক পড়, সে কথা ক্ষীরোদ-ঠাকমার কাছে আমি শুনেছি। কিন্তু সেজন্যে তোমার লজ্জার কোনও কারণ নেই শিবানী। ইংরেজি না জানা একজন বাঙালী মেয়ের পক্ষে অপরাধ, এ আমি একেবারেই মনে করিনে। নিয়ে এস তোমার বই, দেখি কোন্ বই তুমি পড়।"

এক মুহূর্ত ইতস্তত করিয়া অবশেষে অতিশয় সঙ্কোচের সহিত শিবানী তাহার ইংরেজি পড়িবার বই লইয়া আসিয়া দিবাকরের হস্তে দিল।

বই দেখিয়া দিবাকর প্রসন্ন মুখে বলিল, প্যারিচরণ সরকারের ফার্স্ট বুক অফ রীডিং। খুব ভাল বই,—এই বই আমরাও পড়েছিলাম।" বইয়ের পাতা উল্টাইয়া দেখিতে দেখিতে পেন্সিলের দাগ লক্ষ্য করিয়া দিবাকর বলিল, "এই পর্যন্ত পড়েছ বুঝি?"

মৃদুকণ্ঠে শিবানী বলিল, "হ্যাঁ।"

"জলপাইগুড়িতে কার কাছে ইংরেজি তুমি শিখতে?"

"কারো কাছে নয়,—মানের বই দেখে নিজে নিজেই শিখতাম।"

পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে এক জায়গায় থামিয়া দিবাকর বলিল, "আচ্ছা, 'রাম হয় পীড়িত'র ইংরেজি কি হবে বল ত শিবানী।"

একটু চিন্তা করিয়া শিবানী বলিল, রাম ইজ্ ইল্।"

"বেশ। তা হ'লে, 'রাম এবং যদু হয় পীড়ি'তর ইংরেজি কি হবে?"

'এবং'-এর ইংরেজি শিবানীর মনে পড়িল; বলিল, "রাম অ্যান্ড যদু ইজ্ ইল্।"

দিবাকরের মুখে প্রসন্নতার শান্ত হাস্য দেখা দিল। স্নিগ্ধ কণ্ঠে সে বলিল, একটু ভুল হয়েছে। ইংরেজিতে ক্রিয়া-পদেরও বচন আছে। এখানে রাম এবং যদু দুজন লোক ব'লে "ইজ্" না হয়ে বহুবচন আর্ হবে।

শিবানীর জ্ঞান ভাণ্ডারের চতুঃসীমার বহির্ভূত একথা; সুতরাং সে চুপ করিয়া রহিল।

বইয়ের অপর এক স্থান হইতে দিবাকর বলিল, "আচ্ছা, বলতে পার শিবানী, পি এস্ এ এল্ এম্—এই পাঁচটা অক্ষরের ইংরেজি কথার উচ্চারণ কি হবে? যদিও এটা তোমার পড়া অংশের বাইরে থেকে জিজ্ঞাসা করছি।"

ইংরেজি কথা উচ্চারণ করিবার যেটুকু কৌশল শিবানী এ পর্যন্ত আয়ত্ত করিয়াছে, তাহার সাহায্যে কিছুতেই সে একথা উচ্চারণ করিবার বাগ পাইল না। বার দুই তিন প.স্ প্.স. করিয়া চেষ্টা করিয়া অবশেষে অপ্রতিভ হইয়া হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, "বুঝতে পারছিনে কি হবে।"

প্রচুর আনন্দ এবং কৌতুক অনুভব করিয়া দিবাকর বলিল, "পি এস এ এল এম সাম্; সাম মানে ধর্মসংগীত।"

সকৌতূহলে শিবানী বলিল, "সাম?" পি-র উচ্চারণ হবে না?"

"শুধু পি কেন, এল-এর উচ্চারণও হবে না। দুটি অক্ষরই এ কথায় সাইলেন্ট, অর্থাৎ মূক।"

"এ রকমও হয়?" বলিয়া বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে শিবানী দিবাকরের দিকে চাহিয়া রহিল।

প্রগাঢ় সন্তোষের সহিত দিবাকর বলিল, "হয়।"

একজন সতের বৎসরের প[illegible] বয়সের সুশ্রী সুন্দরী মেয়ে ত[illegible] ইংরেজি জ্ঞানের স্বল্পতা লইয়া বি[illegible] নেত্রে তাহার দিকে চাহিয়া আছে,—[illegible] সে তাহার উন্নততর জ্ঞানের সুযো[illegible] দ্বারা সেই মেয়েটির উপর প্রভাব বিক[illegible] করিতে সমর্থ হইতেছে,—এই অব[illegible] এমন একটা অনাস্বাদিতপূর্ব মিষ্ট [illegible] উৎপাদিত করিল, যাহা পরিস্রুত হই[illegible] দিবাকরের শুষ্ক ক্ষুব্ধ হৃদয়ের [illegible]স্তর পর্যন্ত সিক্ত করিয়া দিল।

ইহার মিনিট দশেক পরে জপ সারি[illegible] ক্ষীরোদবাসিনী উপস্থিত হইলে হাসি মুখে দিবাকর বলিল, "তোমার কালো মাণিকের ইংরেজি বিদ্যে পরীক্ষা কর[illegible] ছিলাম ক্ষীরোদ ঠাকমা।"

স্মিতমুখে ক্ষীরোদবাসিনী বলিল, "তাই না-কি। কেমন দেখলি? ষোল আনা ফেল ত?"

দিবাকর বলিল, "না, না বারো আনা পাশ। একটু কারো সাহায্য পেলে ষোল আনা পাশ করতে খুব বেশি দেরি হবে না।"

"কে আর সে সাহায্য করবে দিবা-কর?"

দিবাকর বলিল, "আচ্ছা, কে করে না করে তা পরে দেখা যাবে।"

মিনিট পাঁচ সাত গল্প করিয়া দিবাকর উঠিয়া পড়িল। বারান্দার কোণ হইতে বন্দুকটা তুলিয়া লইয়া বলিল, "রাত হয়েছে, আজ চললাম ক্ষীরোদ ঠাকমা; আবার একদিন আসব।"

ক্ষীরোদবাসিনী বলিল, "একদিন কেন দিবাকর,—যেদিন সুবিধে হবে, যখনই ইচ্ছে যাবে, আসবি। তোর জন্যে দোর খোলা রইল, দিবারাত্র অষ্টপ্রহর।"

শিবানীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দিবাকর বলিল, "শুনলে ত শিবানী? এবার এসে কড়া নাড়লে বিভূতি কাকার কড়া নয় ব'লে দার খুলতে যেন আপত্তি কোরো না।"

দিবাকরের কথা শুনিয়া শিবানী নীরবে হাসিতে লাগিল।

পথে বাহির হইয়া চলিতে চলিতে সহসা এক সময়ে দিবাকরের মনে পড়িল ক্ষীরোদবাসিনীর কথা, 'বিলম্বে এসেছ দস্যু!' পর মুহূর্তেই দিবাকরের অন্তরের কোনো গুপ্ত প্রদেশ হইতে কে যেন উত্তর দিয়া বলিল, 'তুমিই বিলম্বে এসেছ ক্ষীরোদ ঠাক্‌মা।'

সজোরে একবার মাথা ঝাড়া দিয়া মনকে অন্যমনস্ক করিবার চেষ্টা করিতে করিতে হন্ হন্ করিয়া দিবাকর পথ অতিক্রম করিয়া চলিল।

গৃহে পৌঁছিয়া বাহির খণ্ডে পদার্পণ করিতেই সদর নায়েব মধুসূদন ঘোষাল আসিয়া নত হইয়া অভিবাদন করিয়া দিবাকরের হাতে একটা বড় খাম দিয়া বলিল, "এই চিঠি নিয়ে রাজসাহী থেকে একটি ভদ্রলোক এসেছেন বড়বাবু।"

মধুসূদন ঘোষালের হস্তে একটা লণ্ঠন ছিল। খামখানা ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে দিবাকর জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় আছেন তিনি?"

"আজ্ঞে, বিরাম মন্দিরে বিশ্রাম করছেন।"

দিবাকরদের অতিথিশালার নাম বিরামমন্দির।

খাম ছিঁড়িয়া বাহির হইল সবশুদ্ধ পাঁচখানা কাগজ,—দিবাকর এবং যূথিকার স্বতন্ত্র নামে সারদাশঙ্কর গার্লস্ হাইস্কুলের পুরস্কার বিতরণের দুইখানা নিমন্ত্রণ কার্ড, যূথিকার নামে উক্ত স্কুলের প্রেসিডেণ্ট শিবনাথ চৌধুরীর দীর্ঘ আমন্ত্রণ পত্র, দিবাকরের নামে শিবনাথ চৌধুরীর একটা সংক্ষিপ্ত চিঠি এবং দিবাকরের নামে ভবতোষ মিত্রের একটা চিঠি।

নিমন্ত্রণ কার্ডে প্রকাশ, উক্ত পুরস্কার বিতরণ সভার সভাপতি হইবে ডিস্ট্রিক্ট্ ম্যাজিস্ট্রেট্ সি ফরেস্টার এবং পুরস্কার বিতরণ করিবে মিসেস্ যূথিকা ব্যানার্জি এম-এ। ভবতোষ মিত্র তাহার চিঠিতে রাজসাহীতে তাহার গৃহে অবস্থান করিবার জন্য দিবাকর এবং যূথিকাকে সাদর নিমন্ত্রণ করিয়াছে এবং শিবনাথ চৌধরীর সংক্ষিপ্ত পত্রের প্রধান বক্তব্য, রাজসাহীতে যূথিকাকে উপস্থাপিত করিবার একান্ত ভার দিবাকরের উপর।

ক্ষীরোদবাসিনীর গৃহ হইতে দিবাকর যে আনন্দময় তরল মন লইয়া আসিয়াছিল, সহসা তাহা ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল।

২৯

বহির্বাটির একটা ঘরে শিকারের সাজ-সরঞ্জাম এবং পোষাক-পরিচ্ছদ থাকে। সেই ঘরে বন্দুক এবং অপর দ্রব্যাদি রাখিয়া এবং বহির্বাটিরই একটা গোসলখানায় স্নানাদি সমাপন করিয়া দিবাকর যখন অন্দরে প্রবেশ করিল, তখন রাত আটটা বাজিয়া গিয়াছে। ইহাই দিবাকরের চিরন্তন রীতি। শিকার হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া বাহিরের ধূলি-কর্দম হইতে মুক্ত না হইয়া এবং শিকারীর অশোভন বেশ পরিবর্তিত না করিয়া সে কখনো অন্দরে প্রবেশ করে না।

ক্ষীরোদবাসিনীর গৃহে দিবাকরের বিলম্বের জন্য তাহার বেশ কিছু পূর্বেই তাহার দলের লোক-লস্কর এবং গাড়ি প্রভৃতি আসিয়া পৌঁছানোতে যূথিকা একটু চিন্তিত হইয়া ছিল। দিবাকরের সহিত সাক্ষাৎ হইতে সে জিজ্ঞাসা করিল, "এত দেরি হ'ল যে তোমার?"

শিবনাথ চৌধুরীর লিখিত দুইখানা পত্র পাঠ করিয়া, উভয় পত্রের বক্তব্যের তুলনার মধ্যে নিজের সামান্যতার নির্দেশ পাইয়া ক্ষণকাল পূর্বে দিবাকরের মনে যে ক্ষোভ জাগ্রত হইয়াছিল, এখন তাহা অনেকটা প্রশমিত হইয়াছে। শান্ত কণ্ঠে যূথিকার প্রশ্নের উত্তর দিয়া সে বলিল, "পথে আসতে দেখলাম, জলপাইগুড়ি থেকে ক্ষীরোদ-ঠাকমারা অনেকদিন পরে এসেছেন। তাই খবর নিতে গিয়ে তাঁদের বাড়িতে একটু দেরি হয়ে গেল।"

"ক্ষীরোদ-ঠাকমারা কারা? আমাদের আত্মীয় কেউ হন?"

দিবাকর বলিল, "আত্মীয় বটে, কিন্তু সে আত্মীয়তার মূল খুঁজে বার করতে হলে বেশ একটু বেগ পেতে হবে। অন্য কোন সময়ে সে চেষ্টা না হয় দেখা যাবে, আপাতত এই চিঠিপত্রগুলো পড়,—রাজসাহী থেকে এসেছে।"

"রাজসাহীর সেই মেয়ে-স্কুলের প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশনের নিমন্ত্রণ বুঝি?" বলিয়া যূথিকা দিবাকরের হস্ত হইতে কাগজগুলো গ্রহণ করিল।

কার্ড এবং চিঠি তিনখানা পড়িয়া দেখিয়া যূথিকা বলিল, "কি উত্তর দেবে?"

"তথাস্তু ছাড়া আর কি উত্তর দিতে পারি বল? —মনে আছে ত, কথা দেওয়া আছে?"

মনে মনে এক মুহূর্ত চিন্তা করিয়া কোন কথা না বলিয়া যূথিকা কার্ড ও চিঠিগুলা দিবাকরকে ফিরাইয়া দিল।

যূথিকার চিঠিখানা তাহাকে প্রত্যর্পণ করিয়া দিবাকর বলিল, "শিবনাথবাবুর এ চিঠিখানা তোমার চিঠি, এর একটা উত্তর লিখে রেখো।"

রূপার একটা ছোট ট্রে-তে দুই পেয়ালা চা লইয়া ভোলা প্রবেশ করিল এবং একটা ছোট টিপয়ের উপর রাখিয়া দিবাকর ও যূথিকার পার্শ্বে তাহা স্থাপিত করিল।

সবিস্ময়ে যূথিকা বলিল, "এখানে চা আনলি যে ভোলা? আর, খাবার কই?"

"হুজুর খাবার দিতে নিষেধ করেছেন বউরাণীমা।" বলিয়া একমুহূর্ত অপেক্ষা করিয়া ভোলা প্রস্থান করিল।

যূথিকা বলিল, "কেন, খাবার দিতে নিষেধ ক'রেছ কেন?"

স্মিতমুখে দিবাকর বলিল, "ও-কার্যটা ক্ষীরোদ-ঠাকমার বাড়িতে প্রচুর পরিমাণে সেরে এসেছি। চা-ও অবশ্য বড় বড় তিন পেয়ালা খেয়েছি সেখানে, তবে ভোলা একান্ত চায়ের কথা বললে বলে নির্বাসনের ভয়ে আপত্তি করিনি।"

সকৌতূহলে যূথিকা জিজ্ঞাসা করিল, "নির্বাসনের ভয়ে কি রকম?"

দিবাকর বলিল, "তা বুঝি জান না?"

'চা খাইতে বলিলে যে
চা খাইতে চায় না।
নির্বাসনে দাও তারে
জাপান কি চায় না॥

চা খেতে আপত্তি করা অপরাধের এই হচ্ছে দণ্ডবিধি।" ট্রে-র উপর হইতে এক পেয়ালা চা তুলিয়া যূথিকার দিকে আগাইয়া ধরিয়া বলিল, "নাও চা খাও। আপত্তি যদি কর, তাহলে ঐ সূত্র

অনুসারে তোমাকে জাপান কি চায়নায় নির্বাসন দেওয়া হবে।"

স্মিতমুখে যূথিকা বলিল, "অপরের ভাগের চা না খেলে নির্বাসন হয় না। ও তোমার ভাগের চা।"

দিবাকর বলিল, "তিন পেয়ালার ওপর দু-পেয়ালা চা সুখের চা নয়। এর ভাগ নিতে তুমি যদি রাজি না হও, তাহলে তোমাকে অদুঃখভাগিনী স্ত্রী বলব।"

"এক পেয়ালা চায়ের জন্যে এত বড় অপরাধ সইতে আমি রাজি নই।" বলিয়া দিবাকরের হাত হইতে চায়ের পেয়ালা লইয়া যূথিকা বলিল, "শুনছ, তর্কতীর্থ মশায়কে আজ বলেছিলাম। তিনি আমাকে সংস্কৃত পড়াতে রাজি হয়েছেন। কাল থেকে পড়াবেন বলেছেন।"

দিবাকর বলিল, "শুভ-সংবাদ। প্রথমে কি ভাবে পড়া আরম্ভ করবে, তার কিছু স্থির হয়েছে?"

যূথিকা বলিল, "তর্কতীর্থ মশায়ের ইচ্ছে, প্রথমে মাস ছয়েক শুধু ব্যাকরণ পড়াবেন; তারপর ক্রমশ কাব্য আর ন্যায় আরম্ভ করবেন।"

বিস্ফারিত নেত্রে দিবাকর বলিল, "সর্বনাশ! তাহলে ত তোমার কাছে যা কিছু অন্যায় দাবী-দাওয়া করবার আছে, এই ছ মাসের মধ্যেই সমস্ত সেরে রাখতে হবে।"

বিস্মিত কণ্ঠে যূথিকা বলিল, "কেন?"

"তার পরে করলে তোমার ন্যায়শাস্ত্র আপত্তি করবে।"

যূথিকা বলিল, "ও!" তাহার পর একমুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "ভালবাসা যদি থাকে, তাহলে কোন কারণেই ন্যায়শাস্ত্র স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পা বাড়ায় না,—অন্যায় দাবী-দাওয়া করলেও না।"

যূথিকার কথা শুনিয়া দিবাকর হাসিতে হাসিতে বলিল, "আচ্ছা, দেখা যাবে, কেমন না পা বাড়ায়। তখন কথায় কথায় বলবে, ন্যায়শাস্ত্রের মতে এটা তোমার নিতান্ত অন্যায় আব্দার হচ্ছে। কিন্তু সে কথা যাক, তোমার পড়বার সময় কখন করলে যূথিকা?"

যূথিকা বলিল, "আরতির পর ঘণ্টা-খানেক ঘণ্টা দেড়েক ছাড়া অন্য কোন সময় তর্কতীর্থ মশায়ের সুবিধে হ'ল না। আমার কিন্তু ও সময়টা খুব ইচ্ছে ছিল না।"

"কেন?"

"ও সময়টা তোমার কাছে থাকি,—ও সময় আমার মূল্যবান সময়।"

"ব্যাকরণের চেয়েও মূল্যবান?"

অল্প একটু হাসিয়া যূথিকা বলিল, "কাব্যের চেয়েও মূল্যবান।"

কথাটা অবশ্য মিথ্যা নহে। প্রায় প্রত্যহ সন্ধ্যার পর দিবাকর এবং যূথিকা সাহিত্য, সংগীত অথবা অন্য কোন প্রসঙ্গের আলোচনায় ঐ সময়টা একত্রে অতিবাহিত করে। সুতরাং বাণীকণ্ঠ তর্কতীর্থ ঐ সময়ে ভাগ বসানোয় হিসাবমত যূথিকার ন্যায় তাহারও দুঃখিত হইবারই কথা, কিন্তু সহসা কোথা হইতে কোন সূত্র অবলম্বন করিয়া মনে পড়িয়া গেল শিবানীর অশুদ্ধ ইংরেজি,—'রাম অ্যান্ড যদু ইজ ইল'; —সহজ মনে দিবাকর বলিল, "কিন্তু উপায় কি বলো? ও সময় তোমার যত মূল্যবান সময়ই হোক, তর্কতীর্থ মশায়ের সুবিধেই আগে দেখতে হবে।"

ক্ষণকাল কথোপকথনের পর দিবাকর বলিল, "রাজসাহী থেকে যে লোক এসেছেন, তাঁর সঙ্গে একবার দেখা করি গে। নায়েব মশায় বলছিলেন, কাল সকালেই তাঁর রাজসাহী ফিরে যাবার ইচ্ছে। তুমি না-হয় আজ রাত্রেই শিবনাথ চৌধুরীর চিঠির উত্তরটা লিখে রাখ।"

"কবে আমরা রাজসাহী পৌঁছব লিখব? শনিবার প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশনের দিনেই ত?"

এক মুহূর্ত চিন্তা করিয়া দিবাকর বলিল, "প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশনের দিনেই নিশ্চয়। তবে 'আমরা' না লিখে 'আমি' লিখো।"

সবিস্ময়ে যূথিকা জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?"

"আমি রাজসাহী যাব না স্থির করেছি। অবশ্য সে জন্যে তোমার যাওয়ার কোনো অসুবিধে হবে না; তোমার সঙ্গে নায়েব মশায় যাবেন, আনন্দ যাবে, ভোলা যাবে।"

যূথিকা বলিল, "তা হ'লে আমিও যাব না স্থির করলাম। শুধু ভোলা, আনন্দ, আর নায়েব মশায় যাবেন।"

"কিন্তু রাজসাহীতে পুরস্কার বিতরণ কে করবে যূথিকা?"

কথা শুনিয়া যূথিকার রাগ হইল; একবার মনে করিল বলে, আনন্দ; কিন্তু সে কথা না বলিয়া বলিল, "যাদের কাজ, সে মীমাংসা তারা করবে।"

"কিন্তু শিবনাথ চৌধুরীকে আমি তোমার বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দিয়ে রেখেছি।"

"তোমার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ হবে না; আমার যাওয়া হ'ল না সে কথা আমি তাঁকে নিজে লিখে দিচ্ছি।"

"কি কারণ দেখাবে?"

"যাওয়ার সুবিধে হ'ল না, এ ছাড়া আর অন্য কোন কারণই দেখাব না।"

"কিন্তু তা হ'লে শেষ চোট ত' পড়ল আমারই ওপর। আমি যে কথা দিয়েছি তোমাকে হাজির করিয়ে দোবোই, সে কথা ত' আর রইল না।"

এক মুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া যূথিকা বলিল, "যে-কোনো অবস্থাতেই তোমার স্ত্রীকে সেখানে হাজির করাতে না পারলে তোমার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হবে, এই যদি তুমি মনে কর, তা হ'লে না-হয় আমাকে নায়েব মশায়ের সঙ্গেই পাঠিয়ে দিয়ো।"

যূথিকার কথা শুনিয়া দিবাকরের মুখে মৃদু হাস্য দেখা দিল; আর্তকণ্ঠে সে বলিল, "এ কথার পর তোমার সঙ্গে আমাকে যেতেই হয় যূথিকা। কিন্তু একেই বলে সত্যাগ্রহ। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সত্যাগ্রহ নীতি খুব ভাল জিনিস নয়।" **ক্রমশ**

তুষার তীর্থ

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ

এক বছরের বেশী হ'ল, আমি বেলুচিস্থান, সিন্ধু, গুজরাট, কাথিয়াওয়াড়, মহারাষ্ট্র, রাজপুতনা, পাঞ্জাব এবং কাশ্মীরের পবিত্র স্থানগুলিতে পর্যটনরত আছি। এই মাসের মাঝামাঝি কাশ্মীরে অমরনাথে পৌঁছে সেই সুদূরপ্রসারী তীর্থযাত্রার পরিপূর্তি হয়েছে। রাওয়ালপিণ্ডি হতে মোটরবাসে ২রা আগস্ট আমরা শ্রীনগরে পৌঁছুই। প্রকৃতপক্ষে এই শ্রীনগর থেকেই অমরনাথ যাত্রা শুরু হয়। নর্থ ওয়েস্টার্ন রেলওয়ের রাওয়ালপিণ্ডি, জম্মু ও হ্যাভেলিয়ান স্টেশনগুলি হতে কাশ্মীর যাবার তিনটি বিভিন্ন মোটরবাহী রাস্তা আছে। তিনটি পথই প্রায় সমদূরবর্তী এবং সব পথেই প্রায় বার ঘণ্টাই মোটরবাস চলাচল করে। জম্মুর রাস্তাটি ৮৯৮৫ ফিট উপরিস্থিত ৬৪০ ফিট লম্বা সুড়ঙ্গের মধ্যস্থিত বানিহাল পাস অতিক্রম করেছে। পিণ্ডির রাস্তাটি ৬৫০০ ফিট উঁচু মারি নগরী অতিক্রম করে ডোমেল নামক স্থানের যেখানে কাশ্মীর গভর্নমেন্টের কাস্টমস হাউস আছে সেইখানে হ্যাভেলিয়ান রোডের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। হ্যাভেলিয়ান রাস্তাটি ৪০১০ ফিট উঁচু এ্যাবটবাদ নগরী অতিক্রম করে গেছে এবং ইহা সর্বাপেক্ষা কম উচ্চাবচ। প্রকৃতির মনমোহিনী দৃশ্যাবলীর মধ্য দিয়ে ঝিলাম-ভ্যালি-রোডের উপরে আমাদের বাস পিণ্ডি থেকে ঘণ্টায় ১৫ হতে ২০ মাইল বেগে ছুটল। বারামুল্লা হতে শ্রীনগর পর্যন্ত এই রাস্তাটি সমতল এবং উভয় পার্শ্বের ঊর্ধ্বমুখী ঝাউগাছগুলি যেন প্রহরীর মত সারি সারি দণ্ডায়মান।

শ্রীনগর বদ্রিআশ্রম ধর্মশালায় আমি ডেরা পতেছিলাম এবং প্রায় সপ্তাহখানেক সেখানে দর্শনাদিতে ব্যয়িত হল। এই ঋতুতে শ্রীনগর দর্শক, বায়ুপরিবর্তনকারী এবং তীর্থযাত্রীর ভীড়ে ভরে যায় আর তখন এর লোকসংখ্যা হাজারে হাজারে বেড়ে চলে। এই নগরটি কাশ্মীর রাজ্যের গ্রীষ্মকালীন রাজধানী—রেলস্টেশন ও সমুদ্র বন্দর হতে অনেক দূরে। আকারেও বেশ বড় এবং প্রায় ২৫০০ স্কোয়ার মাইল পরিধিব্যাপী এক উপত্যকার মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। শ্রীনগর শহরটি সমুদ্রতলা হতে ৫২০০ ফিট উচ্চে। পরিধি ১ স্কোয়ার মাইল। ১৯৪১ সালের আদমসুমারী অনুযায়ী লোকসংখ্যা ২০৭, ৪৭। ঝিলাম নদীটি বক্ষে বহু হাউসবোট বহন করে নীরবে নগরীর মধ্য দিয়ে ছুটে চলেছে। ঝিলামের উপরে সাতটি সেতু এবং শেষভাগে জলপ্রবাহকে উচ্চ রাখার জন্য একটি 'এনিক্যাট' আছে। বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, কলের জল ও আধুনিক শহরের কৃত্রিম আসবাবপত্র থাকা সত্ত্বেও দীর্ঘাবয়ব ঝাউ ও চীনার বৃক্ষগুলি শ্রীনগরকে যেন এক কল্পনাময় রাজ্যের শোভায় শোভিত করেছে। ইংলিশ কবি 'মুরে' যথার্থই এই উপত্যকার বিষয়ে নিম্নলিখিত গৌরবগাথা গেয়েছেনঃ—

শংকরাচার্য পাহাড়—শ্রীনগর

"স্বাগতঃ ওগো মানব এ উপত্যকায়
শেষ সীমা টানি' রয়েছে জগত যথা
স্তব্ধ; মনোহর ঐ ভূমে স্বর্গের শুরু।
কে শোনেনি ধরার সেরা গোলাপভরা
কাশ্মীরের কাহিনী? এর মন্দির আর
গুহা-গহ্বর, নির্ঝর-ঝরণার বারি
স্বচ্ছ যেন সে প্রেমিকের দৃষ্টির মতো।"

দর্শকদের জন্য অনেক কিছু দেখবার জিনিস এখানে আছে। সাধারণত তাঁরা শ্রীপ্রতাপ কলেজ, রাজপ্রাসাদ, অমর সিং কলেজ, শ্রীপ্রতাম মিউজিয়াম, পাব্লিক লাইব্রেরী, বাগান, নারাণ মঠ, শংকরাচার্য পাহাড়, ধল হ্রদ, চশ্‌মাসাহি, হারওয়ানের জলাধার, সিল্ক ফ্যাক্টরী, সালমারা উদ্যান প্রভৃতি দেখেন। শংকরাচার্য পাহাড়টি শহরের এক প্রান্তে, মাথায় শিবমন্দির নিয়ে দুর্গের মত দণ্ডায়মান। ধরাপৃষ্ঠ হতে ১০০০ ফিট উচ্চে এই পর্বতটিই সর্বাগ্রে শ্রীনগরের দর্শকবৃন্দের নিকট চিত্তাকর্ষক অতি দৃশ্যমান স্মৃতিস্তম্ভ। শংকরাচার্য একদা প্রবাস যাত্রাকালে কিছুদিনের জন্য কাশ্মীরের এই পর্বতে অবস্থান করায় তাঁর নামেই এর নামকরণ হয়েছে। পর্বতশীর্ষ হতে নয়নরঞ্জন নগরীর একদিকে ধল হ্রদ অপরদিকে রাজ প্রাসাদ এবং আরও অন্য দিকে আসল শহরের এক শূন্যমার্গে দর্শন হয়। পর্বতোপরি মন্দিরটি প্রাচীন কালের তৈরী। কাশ্মীরের বিখ্যাত ঐতিহাসিক কলহানের 'রাজতরঙ্গিনী' অনুযায়ী রাজা গোপাদিত্য (ইনি খৃঃ জন্মের পূর্বে ৩৬৮-৩৩৯ অব্দে রাজত্ব করতেন) ইহার নির্মাতা এবং রাজা ললিতাদিত্য (৭০১—৭৩৭ খৃঃ অব্দ) ইহার জীর্ণ সংস্কার করেন। স্যার অরেল স্টীন এই মত পোষণ করেন যে, কলহানের ক্রমিক বিবরণ হতে চমকপ্রদ অংশ উদ্ধার করায় ইহা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে যে, এই পর্বতের প্রাচীন নাম ছিল গোপাদ্রি।

৯ই আগস্ট, সোমবার, অমরনাথ যাত্রা উদ্দেশ্যে আমরা শ্রীনগর ত্যাগ করলাম এবং মোটরবাসে পহেলগাঁও পৌঁছিলাম। পহেলগাঁও শ্রীনগর হতে ষাট মাইল দূরে এবং মধ্যবর্তী এই স্থবধান গ্রীষ্মকালে মোটর এবং লরী যাতায়াতের সম্পূর্ণ উপযুক্ত। ইহা একটি বিখ্যাত স্বাস্থ্যাবাস এবং

সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে ৭০০০ ফিট উচ্চে। এখানে একটি ছোট বাজার, হোটেল, ডাকঘর, গুরুদ্বোয়ার শিবমন্দির প্রভৃতি আছে। জুলাই আগস্ট মাসে বহু স্বাস্থ্যান্বেষী বায়ু পরিবর্তনের জন্য এখানে সমবেত হয়। অমরনাথের মহাযাত্রায় এই পথ অতি

চন্দনবাড়ী

প্রয়োজনীয় স্থান এবং মোটর ও বাস এই জায়গা ছেড়ে আর বেশি যায় না। এখান হতে পদব্রজে, টাট্টুতে বা ডাণ্ডির সাহায্যে যাত্রা শুরু হয়। পহেলগাঁওএ অর্থাৎ রাখালদের বাসভূমিতে বিশ্বকবী রবীন্দ্রনাথের নামাংকিত একটি ঠাকুর মেমোরিয়াল লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় ইহা গর্বিত। দ্রুতগতি লম্বোদরীর নিকটে আমাদের তাঁবু পড়ল। বিপরীত দিকে ছিল দেবদারু বনাচ্ছাদিত পর্বতশ্রেণী এবং অতি উচ্চে এক ফাটলের পাশ হতে স্পষ্ট প্রবহমান চিরনীহাররাশি দৃষ্ট হচ্ছিল। কাশ্মীর সরকারের ধর্মার্থ বিভাগ দশনামী সাধুরা, উদাসী সাধুর দল ইত্যাদি সকলেই একদিন পরে পেঁৗছে তাঁবু ফেললেন। পহেলগাঁও তীর্থযাত্রীর ভিড়ে ভরে গেল ও মানুষের স্বরে মুখর হয়ে উঠল। শহর ও তৎসংলগ্ন সমভূমিতে প্রায় হাজারখানেক শ্বেত ক্যাম্বিসের ঘর অসংখ্য বিন্দুর মত শোভা পেতে লাগল। ভগিনী নিবেদিতা (১) ১৮৯৮ খৃঃ অব্দে তাঁর বিখ্যাত গুরু স্বামী বিবেকানন্দের সংগে অমরনাথ যাত্রার পথে এখানে এসে পহেলগাঁওএর শান্ত ও মধুময় সৌন্দর্যের সংগে সুইজারল্যান্ড ও নরওয়ের সৌন্দর্যের তুলনা করেছেন। পহেলগাঁও "সুন্দর, ক্ষুদ্র, গিরিসংকটবিশিষ্ট —অধিকাংশই বালুময় দ্বীপের মধ্যবর্তী এক পার্বত্য নদীর গোলাকার প্রস্তরখণ্ড ক্ষয়িত গর্তের মধ্যে। ইহার অবাগ্রদেশ দেবদারু বৃক্ষ দ্বারা তমসাচ্ছন্ন এবং শিরোভাগে পর্বতোপরি অস্তগামী সূর্য—চাঁদ তখনও পূর্ণ হয়নি।" গভীর রাত্রে মানুষের কোলাহল যখন নিদ্রায় স্তব্ধ তখন দ্রুত সঞ্চারী লম্বোদরীর মধুর গর্জন আমাদের শ্রবণে গ্রহগণের গতিজনিত শব্দ-সামঞ্জস্যের মত ধ্বনিত হল। তীর্থযাত্রীরা এখানে দুদিন অবস্থান করে একাদশী অতিবাহিত করলেন। আমাদের তাঁবু ও বিছানাপত্র বহন কার্যে আমরা দুটি অশ্ব ভাড়া করলাম। যুদ্ধপূর্ব সময়ের তুলনায় ঘোড়ার ভাড়া এখন দ্বিগুণ বা তিন গুণ বর্ধিত। প্রত্যেক ঘোড়ার জন্য আমাদের ৯ টাকা দিতে হল। ১২ই আগস্ট, বৃহস্পতিবার শুক্লপক্ষের দ্বাদশীতে আমরা চন্দনবাড়ি রওনা হলাম। শ্রাবণী পূর্ণিমার দিনে সাধারণত অমরনাথ শিবলিংগের দর্শন হয়। এবার ১৫ই আগস্ট ঐ দিন ছিল। অনেকে আবার আষাঢ়ী পূর্ণিমায় ওরফে গুরু পূর্ণিমা বা ব্যাসপূর্ণিমায় অমরনাথ দর্শন করেন। জুলাইয়ের মাঝামাঝি এই পূর্ণিমা পড়ে।

চন্দনবাড়ি হতে পহেলগাঁওএর ব্যবধান মাত্র আট মাইলের। আমাদের এই পথটুকু পায়ে হেঁটে যেতে মাত্র চার ঘণ্টা লাগল। পথটি দ্রুতগতি লম্বোদরীর তীর বেষ্টন করে ধীরে ধীরে প্রায় ৯০০০ ফিট উচ্চে আরোহণ করেছে। ক্লান্তপদে প্রকৃতির আনন্দপ্লুত সৌন্দর্যসুধা পান করতে করতে ঊর্ধ্বে আরোহণ আমাদের অত্যন্ত সুখপ্রদ হয়েছিল। এক মাইলের বেশি লম্বা হিন্দুস্থানের বিভিন্ন স্থান হইতে সমাগত ছয় বা সাত হাজার তীর্থযাত্রী ও তাহাদের মোটঘাট বহনকারী শত শত অশ্বসমন্বিত শোভাযাত্রা হতে যখন "জয় অমরনাথজীকি" ঃ উচ্চারিত হল, তখনকার সে দৃশ্য স স্বর্গীয়। মনের অনুসরণকারী প্রায় স জাগতিক চিন্তাই দূরীভূত হয়ে অ স্বতঃই উচ্চ চিন্তায় পূর্ণ হল। এম নিতান্ত মন্দ স্বভাবরাও তীর্থযাত্রার প ও উন্নতকারী স্বভাবের স্পষ্ট অনু লাভ করবে। চতুর্দিকের প্রকৃতির সৌন্দর্য অন্তরে সম্ভ্রম জাগিয়ে তুল দুপুরের আগেই আমরা চন্দনবাড়ি পেঁ তাঁবু ফেললাম। এখানে তাঁবু ফেল সুন্দর জায়গা আছে। এখানেও লম্বোদরী আর অত্যধিক শৈত্যবশত নদীর প্রায় ২২০ গজ হিমে জমাট বে গেছে। এই জমাট অংশের উপরে বাল বালিকারা খেলতে শুরু করে—এমন অশ্বসমূহও দুপাশের ঘাসযুক্ত ঢা

বিতস্তানদী

জায়গায় ঘাস খেতে শুরু করে। এক ঘণ্টায় মধ্যে শত শত তাঁবু পড়ল, দোকান খোলা হল, পুলিশ, ডাক্তারখানা, চা-দোকান, শাকসব্জির দোকান প্রভৃতিতে নিরালা চন্দনবাড়ি ছোটখাট এক সুন্দর শহরে পরিণত হল। দশনামী, উদাসী, বৈরাগী প্রভৃতি সাধুরা, তন্দণ্ডেই চাপাটী, ভাত, ডাল এবং তরকারী তৈরী করেই সাধুদের মধ্যে বিতরণ শুরু করলেন। এখানে তীর্থযাত্রীদের জন্য, গভর্নমেণ্টের বনবিভাগের জন্য এবং ডাকবাংলো বা ধর্মশালার জন্য সরকার

কর্তৃক স্থায়ী টিন-চালা নির্মিত আছে। রাত্রে দেবদারু বন তাঁবুর আগুনে আলোকিত হল এবং নগ্ন সাধুরা আগুনের চারপাশে বসে নিজেদের উত্তপ্ত করতে লাগলেন। সন্ধ্যায় গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি শুরু

পাহেল গাঁও

হল। এই যাত্রার সরকারী অফিসার ঢোল-শহরতে ঘোষণা করলেন যে, পরবর্তী যাত্রার পক্ষে কম খাড়াই বিশিষ্ট যে পথ তা হঠাৎ মৃত্তিকাস্তূপ অবতরণের ফলে বন্ধ হওয়ায় ত্যাগ করতে হবে এবং আরও বেশি খাড়া ও পিচ্ছিল পুরানো পথেই যাত্রা শুরু করতে হবে। বৃদ্ধ ও দুর্বলেরা এ সংবাদে কিছু নিস্তেজ হল। স্রোতের খাতের নিকটে তাঁবুতে রাত কাটানো আমার কাছে এক নতুন অভিজ্ঞতা।

পরদিন খুব ভোরেই আমরা তাঁবু গুটিয়ে বিছানাপত্র বেঁধে ফেললাম এবং অপর সকলের অপেক্ষা অতিশয় কঠিনতর পরবর্তী পথে আমাদের যাত্রা শুরু হলো। তিন হাজার ফুটেরও বেশী হস্ত-পদাদির সাহায্যে সে এক ভয়ংকর আরোহণ। মনে হয় যেন এর শেষ নেই। তারপর পর্বতের পর পর্বত বেষ্টন-করা সরু পথ ধরে এক লম্বা পাড়ি এবং অবশেষে আর একবার সোজা চড়াই। প্রথম পর্বতের শীর্ষদেশের মাটি কেবল 'এ্যাডেলভিস' নামীয় সুন্দর শ্বেতপুষ্প বিশিষ্ট ঘাসাচ্ছিত। পায়ে হেঁটে প্রথম ৪৪০ গজ লম্বা বরফের নদী পার হয়ে চন্দনবাড়ি হতে আট মাইলের পথ শেষ হলো এবং সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে প্রায় ১২ হাজার ফিট উচ্চে শেষনাগে পেঁৗছিলাম। এখানে পাহাড় ও সমতল স্থানগুলি নানা রঙে রঙীন পুষ্পাবৃত। বরফনদী ও অনতিদূরবর্তী গম্ভীর ও ঈষন্নীল জল-বিশিষ্ট বৃহৎ হ্রদের তীরে স্থায়ী চালা-সমূহের চারিদিকে তাঁবুর চলমান শহর বসল। শীতে এই হ্রদ হিমে জমাট বেঁধে যায়। চন্দনবাড়ি ও পহেলগাঁও-এর নিকটস্থ বহমান লম্বোদরী এই হ্রদ হতে উৎপন্ন। যাত্রীরা বরফ-শীতল জলে স্নান সারলেন।

১৪০০০ ফিট উচ্চ শৃঙ্গের মধ্যবর্তী এক শীতল ও স্যাঁৎসেঁতে জায়গায় আমরা তাঁবু পাতলাম। দেবদারু গাছ ছিল অনেক নীচে এবং সারা বিকাল ও সন্ধ্যা পর্যন্ত সকল দিকেই কুলিদের ঝাউগাছ খোঁজবার জন্য চলাফেরা করতে হলো। তাঁবুর সামনেই আগুন জ্বালান হলো। রাতে ভয়ানক ঠাণ্ডা। দুটি কম্বল, সোয়েটার, মোজা, দস্তানা—এসব কিছুই রাত্রে শরীরকে গরম রাখার পক্ষে যথেষ্ট হলো না। পরদিন খুব ভোরেই শয্যাত্যাগ করলাম এবং প্রস্থানের জন্য তৈরি হ'লাম। দলের যাতায়াত শান্ত ও সুসামঞ্জস্য এবং প্রায় স্বাভাবিক। কতক হাজার লোক মাঠে রাত্রি যাপন করলেন আর ভোর না হ'তেই যাত্রা শুরু হলো এবং গত রাত্রের রান্না বা উত্তাপের জন্য কতক পোড়া

পঞ্চ-তরণী

ছাই ভস্ম ব্যতীত যাত্রীদের নিজস্ব বলতে আর কিছুই পড়ে থাকলো না! তাঁরা যাবার সময় সঙ্গে একটি বাজার নিয়ে যান এবং প্রত্যেক বিশ্রামস্থানেই তাঁবু খাটানো দোকান খোলা অসম্ভব দ্রুততার সঙ্গে সমাধা হয়।

শেষনাগ হতে আট মাইল দূরবর্তী তৃতীয় বা শেষ বিশ্রামস্থানে পেঁৗছুতে আমাদের প্রায় চার ঘণ্টা লাগল। এই যাত্রা-পথে সব চেয়ে উঁচু ১৪০০০ ফিট মহানাগ-পাশ আমাদের চড়াই করতে হলো। বাতাস সেখানে এত অল্প যে, সকলে সামান্য পথ গিয়েই হাঁপিয়ে ও ঘেমে উঠতে লাগলেন। বৃদ্ধ ও দুর্বলেরা মহাশ্বাসকষ্ট অনুভব করতে লাগলেন। কেউ কেউ আবার হোমিও-প্যাথিক ওষুধ কোকো ৩০ ব্যবহার করে এই কষ্ট দূর করবার চেষ্টা করলেন। এখানের ভৈরোঘাতির মধ্যবর্তী সহজ পথটি খাড়া ও কাঁকরময়। এই পথে যিনিই যাবেন, তাঁকে অবশ্যই ঝড়বৃষ্টি ভোগ করতে হবেই। প্রবাদ আছে যে, এখানে কেবল হাততালি বা কোন শব্দ করলেই বৃষ্টি হয়। ১৯২৮ সালে খুব বড় এক দল যাত্রী এই পথ অতিক্রম করার সময় প্রকাণ্ড এক তুষারস্তূপ পতনে নিহত হয়েছেন। এই সব কারণে আজকাল প্রায় সকলেই এই পথ ত্যাগ করেন। আমরা নিরাপদে চিরতুষার রেখাটি পার হয়ে পাঁচটি স্রোতস্বতীপূর্ণ পঞ্চতরণীতে এসে এক বরফে জমাটবাঁধা নদীতীরে তাঁবু ফেললাম। এই স্থানটি শেষনাগের কিছু নিম্নে আর এখানের ঠাণ্ডা চিড়চিড়ে ও আনন্দদায়ক। আমাদের তাঁবুর সামনেই কাঁকর-পাথরে পূর্ণ এক শুষ্ক নদীপথের মধ্য দিয়া পাঁচটি স্রোত প্রবাহিত হচ্ছিল। ভিজে কাপড়ে এই পাঁচটির সকলটিতে পর পর এক এক করে পায়ে হেঁটে স্নান করাই প্রত্যেক যাত্রীর কর্তব্য। তুষার-শৈল তখন হাতের নাগালের মধ্যে। এই স্থানকে প্রকৃতি মনোহর ফুলে সাজিয়েছেন। ভগিনী নিবেদিতার ভাষায় বলতে গেলে এই উচ্চতায় আমরা স্বতঃই নিজেকে তুষার-শৈলের মহা আবর্তের মাঝে খুঁজে পাই—আর এই মূক-দৈত্যদলই হিন্দুর মনে ভস্মাচ্ছাদিত ভগবানের কল্পনা জাগিয়ে তোলে। এখানে যাত্রীদের জন্য সরকার নির্মিত কতকগুলি চালা আছে।

পরের দিনই অমরনাথের পক্ষে মহা দিন। আজ শ্রাবণী পূর্ণিমা—রবিবার, ১৯৪৩ সালের ১৫ই আগস্ট। এখান হতে ১২৭২৯ ফিট উচ্চ পবিত্র অমরনাথ গুহা মাত্র পাঁচ মাইল। বৈকাল তিনটায় প্রথম একদল যাত্রী যাত্রা শুরু করলেন। সংকীর্ণ উপত্যকা-পথের নিম্নগমনের মত সূর্য উদিত হলেন। পথে ভোরবেলা দর্শন সমাধা করে প্রত্যাগত স্ত্রী, পুরুষ ও বালকবালিকা সমন্বিত 'জয় প্রভু অমরনাথ' ধ্বনি উচ্চারণকারী এক যাত্রীদলের দেখা পেলাম। শেষ চড়াই শুরু করবার সঙ্গে সঙ্গেই গলা শুকিয়ে গেল। কেহ কেহ গলা ভিজানোর জন্য শুষ্ক ফল ও মিছরির টুকরো মুখে দিলেন এবং বহু-দূরে অবধি চিরনীহাররাশির কষ্টসাধ্য পথ অতিক্রম করে দু'ঘণ্টা পরে অমরগঙ্গায় এলেন। অমরগঙ্গার হিমশীতল জলে আমরা স্নান সারলাম, গুহার পশ্চাদ্ভাগ হতে উত্থিত হয়ে সোজা ঢালু পথসমূহের সামনা-সামনি পার্বত্য অংশসমূহকে লম্বভাবী রেখে এই গঙ্গা উচ্চারোহণ করেছে। আমরা জল-বিতাড়িত বৃহৎ উপলখণ্ডবিকীর্ণ সরু পার্বত্যপথে পেঁৗছিলাম। এস্থানেই অমর-নাথ গুহা অবস্থিত। "আমাদের চড়াই করবার সঙ্গে সঙ্গেই সম্মুখে সদ্য-পতিত শ্বেত আবরণাচ্ছাদিত তুষার শৈল দর্শন হতে লাগল এবং এই গুহারই সূর্যালোক-স্পর্শবিহীন এক

কুলুঙ্গিতে ঐ পবিত্র বরফ লিঙ্গ শোভা বিকীরণ করছিলেন। প্রথম আবিষ্কারকারী বিস্ময়হত রাখালদের ইহা অবশ্যই ভগবানের অপেক্ষমান অস্তিত্বের মতই মনে হয়েছিল।" যাত্রিগণের আরোহণ-কারী কোলাহল ও মৃদু ধ্বনির মধ্যে আমরা নতজানু এবং সাষ্টাঙ্গে নত হয়ে বরফ-দেবতাকে ফুল-ফল এবং সুগন্ধি দ্রব্যে পূজা সমাধা করলাম। ভক্তেরা মালা জপলেন, মন্ত্র আবৃত্তি করলেন, স্তব-স্তুতি করলেন এবং এমনকি ধ্যানমগ্নও হলেন। স্থান-মাহাত্ম্যে সকলের হৃদয় পূর্ণ হলো। এখানে এই ব্যাপারেই, ভারতীয় মনের প্রকৃত স্পন্দনের অনুভূতি লাভ হয়। বৈদেশিক মতবাদ ও দৃষ্টিভঙ্গিমুগ্ধ যুবক-যুবতীরা বৃথাই ভারতকে বিদেশীর ও পশ্চিমাদের পথে চালনা করতে চেষ্টা করেন। খোলা মনে যদি তাঁরা এই সব তীর্থ-ভ্রমণে আসেন, তাহলে তাঁরা নিশ্চয়ই ভারত-অন্তরের সাড়া পাবেন। যাত্রীদের মন স্বর্গাভিমুখী হলো এবং ঈশ্বর-চিন্তায় ভরে গেল। সারল্য এবং প্রকৃতির সহিত ঘনিষ্ঠতার জন্য অমর-নাথ উল্লেখযোগ্য। আমরা সকলেই পৎপৎ শব্দে পক্ষসঞ্চালনকারী পারাবতকুলের দর্শন পেলাম। ইহা অতি শুভলক্ষণ বলিয়া গণ্য হয়। ভগিনী নিবেদিতা (২) ১৮৯৮ অব্দে তাঁর গুরু স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে অমরনাথ আসার কালে লিখেছেন যে, এই-স্থানে উক্ত মহান স্বামীর দুর্লভ ধর্মানুভূতি লাভ হয়েছিল। তিনি বলেন, স্বামীজি শ্বেত লিঙ্গাকারে ভগবান শিবের বিহ্বল-কারী দর্শনলাভে ধন্য হন। তিনি আরও বলেন যে, সেই পবিত্র মুহূর্তে স্বর্গদ্বার তাঁর কাছে উন্মুক্ত হয়েছিল এবং তিনি শিবের নিকট অমর হওয়ার—ইচ্ছামৃত্যু-লাভের বরলাভ করেন। রাখীবন্ধনের দিন আমাদের যাত্রা চরমে পৌঁছায় এবং মণিবন্ধে ঐ পর্বের লোহিত ও হরিদ্রাবর্ণের সুতো বাঁধা হয়। ভোর হতে বৈকাল ৪টা পর্যন্ত দর্শন চলতে থাকে। সেই ৬ ফিট উচ্চ ও তিন ফিট চওড়া বরফমূর্তির পবিত্রতা ও শুভ্রতা যাত্রীদের এত প্রেরণা দিয়েছিল যে, তাঁরা সকলেই জাগতিক দুঃখকষ্ট বিস্মৃত হয়ে নতুন জীবন যাপনে ব্রতী হলেন।

অমরনাথের পবিত্র গুহা সুবিশাল—একটি গির্জা বসবার পক্ষে সম্পূর্ণ উপযুক্ত এবং দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতায় ১৫০ ফিট। কাশ্মীরের বর্তমান মহারাজা স্যার হরি সিং ইহাকে মার্বেল বেষ্টিত করে মধ্যভাগে পাথরের সোপান ও রেলিং করে দিয়েছেন। পার্বতী ও গণেশ মূর্তিও এখানে বরফ-নির্মিত। এই গুহার প্রথম আবিষ্কর্তা মুসলমানের বংশধরগণের এখনও ইহার আয়ের উপর অংশ আছে। বৎসরে মাত্র আষাঢ়ী ও শ্রাবণী পূর্ণিমায়, এই দুদিন গুহাদর্শন হয় এবং অবশিষ্ট সময় পরিত্যক্ত হয়ে থাকে। কাশ্মীরে যে অমর-পুরাণ পাওয়া যায়, তাতে অমরনাথের মাহিমার কথা আছে। কিন্তু এই তীর্থ যে খুব প্রাচীন তা নয়, আবুল ফজলের 'আইন-ঈ-আকবর' বই-এ অমরনাথ সম্বন্ধে প্রাসঙ্গিক উল্লেখ আছে। এই লিঙ্গের সমস্ত অংশই অদ্রব বরফনির্মিত এবং এমনকি এরূপ সর্বাপেক্ষা গ্রীষ্মের সময়েও ইহা স্পষ্ট দৃশ্যমান। মনে হয়, ইনি স্বভূমিতেই অধিষ্ঠিত এবং ঐশ্বরিক আনন্দদানের শক্তিসম্পন্ন। হিন্দু-জগতের ইহাই একমাত্র বরফ-শিব এবং সেই জন্যই ভক্ত হিন্দুরা অমরনাথ দর্শনকে জীবন-স্বপ্নরূপে গ্রহণ করেন। এই বৎসর একটি খঞ্জ সাধু একমাত্র যষ্ঠির সাহায্যে

অমরনাথ গুহা

মহাকষ্ট সহ্য করে তীর্থদর্শনে আসেন! স্বামী বিবেকানন্দ এই গুহা দেখে বলেন যে, "এত সুন্দর কোন জিনিসে আমি কখনও আসিনি। শিব নিজেই এই বরফলিঙ্গ হয়েছেন। এখানে কোন চোর-স্বভাব ব্রাহ্মণ ছিল না, কোন ব্যবসাও চলতো না, কু বলে কিছুই ছিল না। এখানে সবই পূজা। কোন ধর্মস্থানে গিয়ে এত আনন্দ আমি উপভোগ করিনি। কিরূপে প্রথম এই গুহা আবিষ্কৃত হয়েছিল, তা আমি বেশ সুন্দর অনুধাবন করতে পারছি। একদা এক গ্রীষ্ম দিবসে একদল রাখাল নিশ্চয়ই তাদের মেষপাল হারিয়ে এই পথে সন্ধানরত ছিল। সেই সময় তারা উপত্যকাভূমিতে তাদের স্বগৃহে ফিরে হঠাৎ কিভাবে খুঁজতে খুঁজতে মহাদেব আবিষ্কার হলো তার উপাখ্যান বর্ণনা করেছিল।"

দু'ঘণ্টারও বেশী সময় গুহায় অতি-বাহিত করে সম্পূর্ণ সতেজ ও যেন পু
জীবন লাভান্তে আমরা পশ্চাদপসরণ ক
তাঁবুতে ফিরলাম। এরূপ তীর্থযা
তপস্যা। আহারাদি সমাপন করে সূর্যা
পর্যন্ত বিশ্রাম নিলাম। সারা বিকাল ধ
বৃষ্টি হলো। রাত্রি নেমে এল। চন্দ্রগ্রহ
সমন্বিত পূর্ণিমার রাত্রি। ধর্মপ্রবণেরা আব
গ্রহণকালে স্নান সারলেন এবং পবিত্র আলা
ও চিন্তায় রাত্রি অতিবাহিত করলে
অনেকে ঐ দিন বিকালেই বেশীর ভা
ঘোড়ায় চেপে পহেলগাঁও আসার জ
পঞ্চতরণী ত্যাগ করলেন। পরদিন প্রা
অমরনাথের অনপনেয় প্রতিচ্ছায়া সঙ্গে নি
আমরা ফিরতি-পথের যাত্রা শুরু করে শেষ
নাগে চা ও বিশ্রাম-মানসে কিছুক্ষণ অপেক্ষ
করলাম। পরে চন্দনবাড়িতে আহারাদি ব্যাপারে অপেক্ষা ক'রেছিলাম। এখানে বৃষ্টি শুরু হয়, আর এখান হতে পহেলগাঁও পর্যন্ত রাস্তা এত কর্দমাক্ত ও পিচ্ছিল যে কতকলোক পড়ে আহত হলেন এবং সন্ধ্যার পরে পহেলগাঁও পৌঁছিলেন। শ্রীনগরের শ্রীপ্রতাপ কলেজের স্কাউট দল অন্য স্থানের মত এই রাস্তায়ও যাত্রীদের প্রভূত সাহায্য দান করেন। অক্ষম লোকদের গভীর রাত পর্যন্ত হাত ধরে ধরে নিয়ে গেলেন। বেশ কতক যাত্রী সেই রাত্রের জন্য চন্দনবাড়িতে অপেক্ষা করে পরদিন পহেলগাঁও এলেন। পহেলগাঁও আবার জনাকীর্ণ শহরে পরিণত হলো। এখান হতে শ্রীনগর বা অন্যান্য স্থানাভিমুখী মোটরবাসের সাহায্যে অনেক ভিড় অপসৃত হলো। আমরা পহেলগাঁও-এতে এক দিনের জন্য বিশ্রাম নিলাম। সন্ধ্যায় আমাদের তাঁবুর সন্নিকটে বয়স্কাউট দল নিজেদের এক উৎসব করেন। তাঁরা প্রকাণ্ড অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করে গোলাকারে তার চারপাশে দাঁড়ালেন। স্থানীয় নিমন্ত্রিত গ্রাম্য লোকের দ্বারা স্থানীয় নৃত্য ও গান গীত হলো। শ্রীনগর স্কাউটরা স্টেট পতাকা ব্যবহার, কাশ্মিরী পাগড়ি পরিধান, উর্দুতে জাতীয় স্তবগান এবং "ভগবান রাজাকে রক্ষা করুন" এর পরিবর্তে "হর হর মহাদেব" ধ্বনি করে।

কাশ্মীরের আশ্চর্য—প্রাচীন মার্তণ্ড মন্দিরের নামানুযায়ী মার্তণ্ড শহর হয়ে আমরা শ্রীনগরে প্রত্যাবর্তন করি। প্রতিমা-ভঞ্জক সুলতান সিকান্দার লোদী চতুর্দশ শতাব্দীর শেষভাগে এই মার্তণ্ড মন্দিরকে ধ্বংস করেন। প্রবাদ যে, ইহার স্থাপত্য পার্থেনন বা তাজ বা সেন্টপিটার বা এ্যাস-কুইরাল অপেক্ষা স্পষ্টতর। এই চমৎকার মন্দিরের সচিত্র বিবরণ মল্লিখিত অন্য এক প্রবন্ধে বিবৃত হয়েছে। আমরা নিরাপদে শ্রীনগরে এসে এখান হতে ১৪ মাইল দূর-স্থিত ক্ষীরভবানী মন্দির দর্শনে যাত্রা করি।

(শেষাংশ ৩১২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

স্বপ্ন

শ্রীরমা বন্দ্যোপাধ্যায়

বেলা প্রায় নটা বেজেছে। অথচ এখন **পর্যন্ত** আমার চা খাওয়া হয়নি। আরও এক ঘণ্টার ভেতরেও যে হবে, সে আশা আমার নেই। সুনন্দাকে আর যে চিনুক আর না চিনুক, পাঁচ বছর ঘর করে আমি **যে** অসম্ভব রকম ভাল করে চিনি, তা বলাই বাহুল্য। এ কথা না বললেও চলে যে, আমি অতিরিক্ত চা খেতে ভালবাসি। সেই চা-ই আজ এই বেলা ন'টা অবধি খাওয়া হয়নি। এমন কি একবারও তামাক পাইনি হাতের কাছে। সুনন্দাই সর্বদা হাজির থাকে হুঁকো নিয়ে। সে বোঝে, কখন প্রয়োজন আমার তামাকের। পাঁচ বছর ঘর করবার পর সে আমার আর কিছুই জানতে বাকি রাখেনি।

যা ভেবেছিলাম ঠিক তাই। বেলা দশটার পরে পুজোর নির্মাল্য আর প্রসাদ রেকাবির ওপর নিয়ে ঘরে ঢুকল সুনন্দা। শরীরের ক্লান্তির ছায়া মুখে একটা সুস্পষ্ট ছাপ মেরে দিয়েছে। মনে পাহাড়প্রমাণ যে রাগ জমে উঠেছিল, তা এক মুহূর্তে কোথায় উড়ে গেল ওর মুখের দিকে তাকিয়ে। ভুলে গেলাম আমি এখনও চা খাইনি। সুনন্দা এই বেলা দশটার ভেতর একবারও এগিয়ে দেয়নি আমার হাতে হুঁকোটা। অন্য দিন বেলা দশটার ভেতর ছ'বার আমার তামাক খাওয়া নিয়ম। চা আমি বেশী খাইনে। মাত্র দু' পেয়ালা। অনেক কাকুতি-মিনতি করলে পাই এক পেয়োলা দুধ—চায়ের বদলে।

নির্মাল্য মাথায় ছুঁইয়ে প্রসাদ হাতে দিলো সুনন্দা। আমি মুখে দেবার উপক্রম করতেই সে বলুল,—একেবারে বয়ে গেছ কিন্তু যা-ই বলো।

বল্লাম,—কেন? কি অপরাধ হলো আবার? বেলা দশটা অবধি উপোস করে আছি, ক্ষিদে পায় না?

ক্ষিদে পায় তা তো খুব বুঝি। প্রসাদ মাথায় ঠেকিয়ে খেতে হয় না। চা করে আনছি। বস চুপ করে পাঁচ মিনিট।

কাজে খুব চটপটে সুনন্দা। একথা স্বীকার না করে আমার উপায় নেই। দু মাইল হেঁটে স্কুল করতে যেতে হয়। ন'টার ভেতর প্রত্যেক দিন ভাত পাই। আমার প্রিয় খাদ্যগুলিও সঙ্গে থাকে। একটি ঠিকে ঝি তো মোটে সম্বল। পাঁচ মিনিট ঠিক নয়, দশ মিনিটের গোড়ায় ধূমায়িত চায়ের পেয়ালা ও ঘরে তৈরী ক্ষীরের ছাঁচ সাজান একখানা রেকাব হাতে নিয়ে সামনে দাঁড়াল সুনন্দা।

আমি ছাঁচ ভেঙ্গে মুখে দিয়ে বললাম—তোমারটাও নিয়ে এস না—।

সুনন্দা বল্ল—না গো বসবার সময় নেই এখন। রান্না চড়াইগে। মানত করে এলুম কিন্তু আজ।

—কি মানত করলে?

—করলাম, এবার যদি আমার সন্তান আমার কোলে থাকে তবে মাকে আমি নথ গড়িয়ে দেব সোনার।

—বেশ করেছ। দেখ যদি মা রাখেন দয়া করে।

মুখ ভার করে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে সুনন্দা বল্ল—ইয়ারকি ভাল লাগে না বাপু। তোমার তো কিছু নয়। আমার গিয়েছে—আমি বুঝি। সাধে কি ছেলে-পুলে থাকে না এ বাড়ি, তুমি পারলে গলা কাট, আর এমন কাটা কাটা বুলি শুনলে মা ষষ্ঠী সে-বাড়ির সীমানাও মাড়ান না।

সুনন্দার সব চাইতে বড় অভিযোগ, আমার নাকি ভক্তি নেই দেবতার ওপোরে! আমি প্রার্থনা করি না, কাটা কাটা বুলি আমার মুখে, এমনকি যে ছ'মাস এক-বছর দেড়-বছরের শিশুদের দেখলে সুনন্দার দু' হাত ওদের বুকে জড়িয়ে ধরে আদর করবার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে তাদের দিকে আমি ফিরেও তাকাই না। একটা আনন্দ-সূচক তুড়ি তো দূরের কথা, একবার চোখ তাকাতেও দ্বিধা বোধ করি। মনের দুঃখে প্রায় সময়ই সুনন্দা এক চোট ঝাল ঝাড়ে আমার ওপোর। বলা বাহুল্য তার উত্তর আমি দেই না।

সুনন্দাই শেষ পর্যন্ত বলে—যে লোক কথা বললে উত্তর দেয় না—তার কাছে ঝগড়াই-বা কি আর ভাল কথাই-বা কি।

সত্যি সুনন্দার কথার উত্তর অনেক সময় দিতে ভয় করে। যদি সহানুভূতি জানাই তবে তো কথাই নেই, যদি বলি ছেলে-পুলে না থাকাতেই-বা আমরা কি দুঃখে আছি তবেও মহাভারত শোনবার আগে রেহাই পাই না।

আমি যে ঘরে শুই তার দেওয়ালে টাঙ্গান নানা রকমের ছবি। বেশীর ভাগই ছোট ছোট ছেলে-পুলেদের। একটা দেয়াল-পঞ্জীর ছবি সুনন্দার খুব প্রিয়। হলদে রঙের নীল পাড় শাড়ী পরণে একটি মেয়ে খোঁপায় জড়ান ফুলের মালা। কোলে তার মাস কয়েকের একটি শিশু। যদিও শিশুটির পিঠটাই শুধু দেখা যায় তবু নিঃসন্দেহে আমি বলতে পারি—ও রকম শিশু পৃথিবীতে অতি অল্পই আছে। সুনন্দাই বলেছে ওকথা আমাকে। নিজের মত সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত সুনন্দা। তার মত পছন্দ যে খুব কম লোকের আছে, একথা আমাকে দিনের ভেতর অন্তত পঁচিশ বার শুনতে হয়।

আজ যদি নতুন কারু সঙ্গে পরিচয় হয় সুনন্দার তবে আমি বলতে পারি সে প্রথমেই জিজ্ঞাসা করবে—আপনার ক'টি ছেলে-মেয়ে ভাই। বলুন না কেমন দুষ্টুমী করে? খুব হাসে? কাঁদুনে নয়ত ভাই আপনার খোকা।

একথা বলবে অবশ্যি নতুন পরিচিতা যদি তার প্রায় সমবয়সী হয়—পাঁচ বছরের বড় হলেও ক্ষতি নেই।

পাঁচ বছর আগেকার সুনন্দাকে ভাবি। তখন ও কি ছিল! নিজেকে নিয়েই নিজে ছিল মশগুল্। বলতে লজ্জা করে' লাভ নেই, বিয়ের দুবছর আগে থাকতেই আমরা ছিলাম পরিচিত। ছুটি থাকলেই বেড়াতে যেতাম আমার বোনের বাড়ি। সুনন্দার বাবাও তখন ছিলেন ওখানেই। তিনি পদস্থ রাজকর্মচারী। বোনের বাড়িতে একদিন বেড়াতে এসেছিল সুনন্দা, সেখানেই আমার সঙ্গে পরিচয়। সে পরিচয়ের পর ছ' বছর কেটেছে। কিন্তু সুনন্দার সে রূপ ভুলতে পারিনি। চকচকে, সোনালী ঢেউ খেলান পাড়ের সুন্দর হাল্কা নীল রঙের একখানা শাড়ী পরণে।—শিথিল খোঁপাটা ঘাড়ের ওপোর ভেঙে পড়েচে। আয়ত চোখের কোণে ঘন কাজল! হাতে মোটা দুগাছি বালা। টান করে চুল বাঁধবার ধরণ অপূর্ব। খোঁপার পাশে গোঁজা এক গুচ্ছ ফুল। কি ফুল তা আজও মনে আছে। —ওদেরি বাগানে ফোটা টাটকা রজনীগন্ধা।

একটা কথা বলতে ভুলে গিয়েচি, আমি স্কুল-মাস্টার বটে কিন্তু কবিতার বই লিখেছি খানকয়েক। অনেকে জানে আমার নাম। একদল লোক আছে আমার ভক্ত, আর একদল দেয় আমার উদ্দেশ্যে গালা-গালি। স্কুল-মাস্টারী ও কবিতার বইয়ের দরুণ যদি কিছু পাই তাতেই দিন কাটে একরকম। বিষয়-সম্পত্তি কিছু আছে, কিন্তু আমার কোন উপকারই হয় না। আদায়পত্র করতে জানিনা। তবে আছে যে, সে কথাটা টের পাই প্রতি বছর খাজনা দেবার সময়। তখন মনে মনে সান্ত্বনা পাই। জমান টাকা না থাকুক সম্পত্তি কিছু আছে, কাজে আসুক আর নাই আসুক।

দিন দুই কেটেছে তারপর। শ্বশুর মশাইয়ের একখানা পত্র পেলাম—"সুনন্দাকে রেখে যাও এখানে। আমার তো জানই লোকাভাব, টাকা পাঠালাম। ১৯শে দিন ভাল। তোমারও ছুটি আছে সেদিন কিসের যেন একটা ক্যালেণ্ডারে দেখলাম।"

পরের দিন টাকা এলো আমি বল্লাম—আর দুদিন মাত্র হাতে আছে। গুছিয়ে নাও। আর তোমাকে আমি এখানে রাখি? বাবা—যে ঝঞ্ঝাট্। চেয়ে দেখি সুনন্দার মুখ ম্লান। বল্লাম—বাপের বাড়ি যাবার কথায় মুখে কালি মেরে দিলে যে? কালে কালে কতই যে দেখব। আমাদের ছোট-বেলায় এ গাঁয়ের বউদের দেখেছি বাপের বাড়ি যাবার নামে সব কত খুসী। মেয়েদের দেখেছি শ্বশুর বাড়ি যাবার নামে সাতদিন আগে থাকতে কান্না জুড়েছে।—কত কান্ড। আর তোমরা যে কি হলে তা জানিনে। আর যে কত দেখব কে জানে।

ওর দীর্ঘশ্বাসের শব্দে চমকে উঠলাম। তাকিয়ে দেখি সুনন্দার চোখে জল বড় বড় ফোটায় ঝরছে। ভয় পেয়ে যাই, বলি—কি হল। কাঁদবার কি হল আবার।

কান্নাভরা কাঁপা কাঁপা গলায় সে বল্ল—মেয়েমানুষ তো নও, কি বুঝবে একা ব্যাটা-ছেলে রেখে যাওয়ায় কত সুখ।. তাও তোমার মত লোককে।

আমি জানতাম—আমার সাংসারিক কাজ করবার শক্তির ওপোর সম্পূর্ণরূপে আস্থা-হীন সুনন্দা। আমি যদি এক গ্লাস জল গড়িয়ে খাই তবে সে ব্যথা পায়। বলে, তোমার কষ্ট করবার প্রয়োজন কি? আমি মরলে অনেক করতে হবে গো। সবই বুঝি, সুনন্দা গেলে যে অসুবিধা হবে খুব তা জানি। তবু রাখতে সাহস করি না আমি একদম। দুবছর আগে কি বিপদেই না পড়েছিলাম ওকে নিয়ে। তবু ভাগ্য ছিল ভাল, আমার মা-মরা ভাগ্নীটি তখন ছিল অবিবাহিতা। দুবেলা অতিরিক্ত উৎসাহের সংগে সুনন্দা যেত নদীতে গাধুতে, নাইতে। গাঁয়ের ছেলে-বুড়ো, বউ-ঝি সবাই যায়। কিন্তু ও বাধিয়ে বসল টাইফয়েড। তারপর—নীলার অক্লান্ত ও আপ্রাণ চেষ্টায় ও যমের দোর থেকে ফিরল। সেই অসম্ভব অসুখের ভেতরই হল ওর একটি খুকী। কিন্তু তাকে বাঁচান গেল না শত চেষ্টায়ও। তিন দিন ছিল খুকী। কিন্তু সেই তিন দিনেই এত বড় ছাপ যে ঐ কচি মেয়েটা রেখে যাবে ভাবিনি। সত্যি আশ্চর্য হয়ে যাই—মায়ের জাতটা কি অদ্ভুত ধরণের ভাল। সুনন্দা ওর তিনদিনের মেয়েটার জন্য আজও রোজ রাত্তিরে শুয়ে চোখের জল ফেলে। অবশ্য লুকিয়ে। কিন্তু ও কাঁদলে আমি টের পাই যদি ওকে না ছুঁয়েও থাকি, যদি ও পেছন ফিরে থাকে আমার দিকে তবুও।

খুকীকে ভাল করে দেখেছিলাম কি না মনে পড়ে না তবুও জানি, খুকুর চোখ হয়েছিল সুনন্দারই মত আয়ত, হাতের আঙ্গুলও সে চুরী করেছিল সুনন্দার। তবে একথা জানাতেও সে বাকী রাখেনি—খুকী কালো হত না আমাদের মত।

সেই রোগশয্যায় শুয়ে সুনন্দা আকুল হয়ে নিজেকে হারিয়ে যখন কাঁদত, তখন কত করে বোঝাতে হত তাকে ঘন্টার পর ঘন্টা বসে। খুব বুঝতাম—তার মেয়ে যদি থাকত বড় হলে সে সুন্দরী হত খুব,—কেন মরে গেল—এই সব। কোথায় খুকীকে রাখা হয়েছে সেই জায়গাটা দেখিয়ে আনতে হবে তাকে ইত্যাদি। সুনন্দার দিকে অবাক হয়ে অনেক সময় তাকিয়ে ভাবি—ওর অনেকগুলি রূপ আমি দেখতে পেলাম এই কবছরের ভেতরে। ওর বিছানার পাশে বসে খোলা জানালার ভেতর দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে যখন কবিতা মেলাবার চেষ্টা করতাম, নীলা থাকত রান্নাঘরে কাজে ব্যস্ত তখন কতদিন শুধু ওর খুকীর কথাই আলোচনা করেছি। খুকীর কথা বললে ও খুশী হত খুব;—আজও হয়। আমি কিন্তু ওকথা নিয়ে আলোচনা করতে পারি না। বরং ও প্রসঙ্গ তুললে এড়িয়ে যেতে চাই প্রাণপণে। ও বোঝে যে তা টের পাই ওর মুখের ব্যথার সুনিবিড় ছায়া দেখে।

একদিনের কথা খুব মনে পড়ে। সেই-দিনই ভোরবেলায় খুকী মারা গিয়েছে। কান্নাকাটিতে সমস্ত দিন ভোর করে সে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল। রাত্তিরে শুতে এসে ওকে একটু সরে শুতে বলতেই ঘুম-চোখে বলেছিল—কোথায় সরব?

বলেছিলাম—কেন বাঁদিকে, অনেক জায়গা খালি পড়ে রয়েছে।

ঘুমের ঘোর তখনো কাটেনি, বলেছিল—বাঁপাশে খুকী রয়েছে যে। ওর গায়ে গিয়ে পড়ব নাকি? কিন্তু আমি বুঝতে পারিনি মাতৃজাতির সন্তানের জন্য কত ব্যথা, তা একদিনেরই হোক আর পাঁচ বছরেরই হোক। তাকে ঠেলে বলেছিলাম—কোথায় তোমার খুকী? তোমার খুকী মরে গিয়েছে না সুনন্দা? ও সুনন্দা চোখ তাকাও।

তার পরের কথা ভাবলে বুকটা একটু দমে যায়। একটা তিনদিনের মেয়ের জন্য পর্যন্ত এত জল ভগবান ওদের চোখে জমিয়ে রাখেন? ওকে ঠান্ডা করতে ঝাড়া দুটি ঘন্টা সেদিন বেগ পেতে হয়েছিল।

রাত্তিরে যখন খেতে বসলাম তখন আবার টেনে আনলাম ওর বাবার কথা। বল্লাম—কি ঠিক করলে সুনন্দা? দিন নেই মোটে আর।

ম্লান মুখে সুনন্দা বল্ল—কি যে করি তাই ভাবছি।

—এখানে থাকলে যদি আবার কিছু হয়।

—তাই? ত ভাবনা। কিন্তু তোমাকে একলা রেখে যে একটুও শান্তি পাব না মনে। কিন্তু এবার যদি আবার না বাঁচে তবে আমিও মরে যাবো।

কি আর করি,—আমাকেই তিনকালের বুড়ি ঠানদির মত সান্ত্বনা দিতে হয়—না-না ওসব বলতে নেই, স্বামীর মনকষ্ট দিতে নেই ওকথা বলে। বাঁচবে না কি? বাঁচবে বইকি। তোমার ছেলে কিংবা মেয়ে যাই হোক—যদি মরে তবে সংগে সংগে তুমিও যে মরবে। তা হলে—আমার কথা ভেবে? তা হ'লে আমিও আর বাঁচব না সুনন্দা। যাক্ সংসার একেবারে লোপাট।

সুনন্দা মুখ তুলে বল্ল—আবার ঠাট্টা জুড়লে তো?

—এমন কঠিন কথাটা ঠাট্টা মনে হয় তোমার কাছে?

ও কথার উত্তর না দিয়ে চুপ করে যায় সুনন্দা। আমিই আবার বল্লাম—তাহলে কি করবে?

অতি আগ্রহের সংগে সুনন্দা বল্ল—বল না গো তুমিই—কি করি?

ঘন দুধ ভর্তি মর্তমান কলা ও চিনি আর ভাত মাখা মস্ত বড় বাটিটা দিয়ে মুখের খানিকটা ঢেকে বল্লাম—চলেই যাও সুনন্দা, তোমারি জন্য বলছি। তোমারি ভাল হবে।

সুনন্দা আমার কথা বিশ্বাস করে। অতএব যাওয়াই ঠিক হল।

বাক্স গোছাতে গোছাতে যে অনেক বার সে চোখ মুছেছে তা আমি টের পেয়েছি—বই পড়ায় নিমগ্ন থাকলেও।

আমার কাপড় কোন্গুলো বাড়িতে পরব কোন্গুলো তোলা, তা বার তিনেক আমাকে জানিয়ে রাখল সুনন্দা। যদিও স্নো, পাউডার মাখি না তবু আমার দাড়ি কামাবার সরঞ্জামের সংগে তাও রইল গোছান। অতিরিক্ত লেপ—মাদুর তুলে রেখে আমার বিছানা আলাদা করে দিল।

রওনা হতে হবে ভোরে। রাত্তিরে শুয়ে চোখে পড়ল পরিপাটি করে কোচানা আমার দুখানা ধুতির পাশে সুনন্দার শাড়ি ব্লাউজ পেটিকোট ঝুলছে। ভোর বেলা ওগুলো পরে রওনা হবে সুনন্দা। আমার ওসবের বালাই নেই। পরণের খানাই যথেষ্ট। কিন্তু মনে হল পরশুর থেকে একলা আমার কাপড় থাকবে ঐ আলনায়।

রাত্তিরে শুয়ে সুনন্দার উপদেশ শুনতে আরম্ভ করলাম।

—বেশী ময়লা ধ্বতি পরো না ব্বঝলে। অনেকগ্বলো ধ্বতি রেখে গেলাম। কুট্বনোর চুবড়িতে একটা ঝ্বড়ি চাপা দিয়ে রেখো, সর্বদা। আর খাবার জিনিস সব সময় ঢেকে রেখ। মশারী ভাল করে না গ্বঁজে শ্বলে কিন্তু আমার মাথার দিব্যি রইল। পায়ে পড়ি তোমার মশারী ভাল করে গ্বঁজো। আর দেখ, তুমি তো যে দৃশ্য পাগ্বলা, দৃশ্য দেখতে গিয়ে রাত কর না যেন। পায়ের দিকে তাকিয়ে হাঁটবে, সাপখোপের দেশ। আঢাকা জিনিস খেওনা খবরদার। খ্বব সাবধানে থেক কিন্তু।

পরে ক্লান্ত গলায় সে বল্ল—আরও কত কি বাকী রয়ে গেল। সব কি ছাই মনে পড়ে একবারে। আমার কপালই ঐ রকম। তুমি কি আর কিচ্ছ্বটি করবে। ধোপার হিসেব ভাল করে রেখ—জানলে? এসে হয়ত দেখ্বব—একখানাও ধ্বতি নেই, লব্ঙী পরে বসে আছ। ধ্বতি ছিঁড়লে যে কিনতে হয় সে ব্বদ্ধি কি আর তোমার আছে। আমার সঙ্গে সব জিনিসই নিয়ে যাচ্ছি কিছ্ব কিছ্ব। দরকার পড়লে নিয়ে এসো গিয়ে। কয়েক ঘণ্টার মোটে পথ।

স্বনন্দার কথার উত্তর দিয়ে লাভ নেই ও তো পাঁচ বছর মাত্র। তার আগে কি ছিলাম-না নাকি আমি এ পৃথিবীতে! তখন কে দেখত আমাকে? কে রাখত ধ্বতির হিসেব। কে জানত আমি কি খেতে ভালবাসি। সে কথা অনেক বার স্বনন্দাকে বলেছি। ও কাণে তোলে না।

খানিকটা চুপ করে থেকে একট্ব অন্ব-নয়ের স্বরে বল্ল—একটা কথা বলবে সত্যি। আমার জন্য মন কেমন করবে তোমার? ছেলে পিলে না হলেই ছিল ভাল। তোমাকে ছেড়ে গিয়ে থাকতে পারব নাকি আমি? যত সব বিচ্ছিরী।

আমি গম্ভীর স্বরে বলি—একথা বলতে নেই স্বনন্দা।

মৃদ্ব হেসে উত্তর দেয় স্বনন্দা—কেন গো, কেন বলতে নেই?

আমি বল্লাম—তুমিই ত আমাকে বক ওকথা বল্লে, মনে নেই? তুমি বলতে না, আমি যাতা বলি বলে মা ষষ্ঠী রাগ করে-ছেন আমাদের ওপোর?

অন্যমনস্ক ছিল স্বনন্দা। আমার কথার ওপোরে বল্ল—আমি নিজেই চটে যাচ্ছি এবার সন্তানের ওপোর। তোমার সঙ্গে আমার বিরহ ঘটিয়ে দিচ্ছে তো ও-ই। দ্বটো দোলায় আমার টানাটানি হচ্ছে যেন। তোমাকে ছেড়ে যেতে কত দ্বঃখ তা কি করে জানব। আবার—এতদিন হল এই তো একইভাবে চলছে সংসার। কোথাও একটা চাঞ্চল্যের সাড়া লাগল না, এ আর ভাল লাগে না। চুলের কাঁটা ফিতে থাকে এক জায়গায় রোজ। আজ চার বছর কুঁজোর ম্বখে ঐ কাঁচের গ্লাসটা বসান। ঘর দোর দ্বার ম্বছবার প্রয়োজন কোন দিন হয় না। এত গোছান ভাল লাগে? যদি থাকত একটা শিশ্ব তবে থাকত এ রকম এ বাড়ি? থাকত ঐ কাঁচের গ্লাস স্থির হয়ে? মেঝে থাকত এমনি টকটকে লাল? বিছানার চাদরে থাকত না কাদা মাখা কচি পায়ের ছাপ? তুমি কবিতার দ্ব ছত্র মেলাতে পারতে এক জায়গায় বসে? ভাতের হাঁড়িতে হাতা চালাতে পারতাম নিশ্চিন্ত মনে? ঝাঁপিয়ে পড়ত না কেউ পিঠের ওপোর। হাসত না খিল খিল করে।

বল্লাম—এতও মনে হয় তোমার। আমি তো ব্বঝতে পারি না কিছ্ব।

—ব্বঝবে কি? তোমার শ্বধ্ব কবিতা মেলান আর বই পড়া, ঝোপঝাড় বেড়ান কাজ। আমার ত' আর তা নয়। আমি অনেক ভাবি। জান, এক বছরের হলেই আমার খোকা কিংবা খ্বকী যা-ই হোক তাকে নদীতে নিয়ে যাব গা-ধ্বতে—নাইতে।

আমি বল্লাম—এবার চুপ করত। চোখ বুঁজিয়ে থাক একট্ব। সেই রাত থাকতে ট্রেন।

—স্বনন্দা ঝাঁঝের সঙ্গে বল্ল—না, আবার তো কতদিন দেখা হবে না। তখন ঘ্বম্বতে পারবে গো খ্বব। আমার সঙ্গে আজ গল্প কর একট্ব। কে বলতে পারে মরে যাব কিনা। মরে যেতেও তো পারি।

—ওকথা বলতে নেই; আমার কত দ্বঃখ হয় জান স্বনন্দা।

ও ব্যস্ত হয়ে ওঠে—তোমার মনে ব্যথা দেবার জন্য ওকথা বলিনি গো। অমনিই বেরিয়ে গেল। জান, শিউলী গাছটার তলায় যখন ফ্বল কুড়বে আমার ছেলে তখন রকে দাঁড়িয়ে, আমি দেখব। এত ভাল লাগবে আমার। খোকা যখন পাঁচ বছরের হবে, তখন বোশেখ জৈষ্ঠি দ্বপ্বরে বাড়ি থাকবে নাকি সে তুমি মনে করেছ? হো, সে তোমার তেমনি ছেলেই হবে কিনা। দেখবে কেমন বাবা বলে ডাকে, কেমন মিষ্টি ডাক। কাণ জ্বড়িয়ে যাবে না একেবারে। আমারই ত সব। তোমার তোয়াক্কা আমি করি কিনা। বই পড়তে, আর কবিতা লিখতে বসলে তোমার ছাই জ্ঞান থাকে? চোখের সামনের ঐ এঁদো ডোবা বিলবিলেতে ডুবলেও তুমি টের পাচ্ছ আর কি। তোমাকে দিয়ে আমার কোন আশাই নেই। দেখ কত নতুন নতুন জামা তৈরী করি। তুমি কিন্তু আমার ছেলেমেয়ে যা-ই হোক—কাঁকন দিয়ে ম্বখ দেখবে। আর 'ভাতে' দেবে হার কেমন?

টাকা কোথায়? অত কি পারব?

আমার একখানা গয়না বিক্রি করে দিও না হয়।

কি আর করি। অগত্যা বলতে চেষ্টা করব।

কিন্তু স্বনন্দা চুপ করতে রাজী নয়, বলে—ছেলেকে খ্বব পড়াব আমি। মেয়ে যদি হয়—তাকেও। কেমন?

বলি—তোমার ইচ্ছেয় আমার ইচ্ছে। এবার চুপ করত।

স্বনন্দা বলে—আর একটা কথা—ছেলেকে তোমার মত নামজাদা কবি করব আমি। তোমাকে যেমন সবাই চেনে, আমার ছেলেকেও চিনবে সবাই। তোমারি মতন হবে যে।

—বেশ তো, ওতে কি আপত্তি থাকতে পারে আমার। কিন্তু এবার চুপ কর স্বনন্দা।

—ছেলেকে আমি শিক্ষিত করবই। দেখে নিও তুমি। দেখ, ছোট ছেলেপ্বলে আমি খ্বব ভালবাসি। কেমন কচি কচি হাত পা। এত নরম! কেমন তাকায়—টানা টানা চোখ! তোমারি মত ঘন চুল তার হবে মাথা ভর্তি। আমি এত ভালবাসব তাকে।

বলি—তুমি খাঁটি মেয়েমান্বষ স্বনন্দা। এতদিনে ব্বঝলাম।

স্বনন্দা বল্ল—আজ ব্বঝি আমার মোটা গোঁফ জোড়া ঝরে পড়ল তাহলে?

—ওকথা বলচ যে?

—আমি খাঁটি মেয়েমান্বষ না তো কি বল ত?—ওকথা বলবার মানে?

বলছিলাম কেন জান? সেই যে একদিন স্কুলে যাবার সময় গর্ব হেঁচেছিল। কথা-ছিল স্কুল করে একেবারে কলকাতায় যাব কয়েকটা কাজ সারতে। তুমি দৌড়িয়েছিল আমার পেছনে পাগলের মতন।

স্বনন্দা বল্ল—বারে, খনার বচনে আছে না—গোধনের হাঁচি হয় মৃত্যুর কারণ, তাই তো মনে ভয় হল। খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে ভাবলাম ডাকব কি না ডাকব। হয়ত আমার কথা শ্বনবেই না তাই ভাবতে ভাবতে দেরী হয়ে গেল। শেষে ভাবলাম—যা থাকে কপালে ডাকবই। মনের খ্বঁৎখ্বঁতানি রাখব না শেষে আক্ষেপ থাকবে একটা মনে? তাই তো ডাকলাম ভাগ্যিস তুমি ফিরেছিলে!

এবার স্বনন্দার ম্বখে হাত চাপা দিয়ে বলি চুপ একদম। চোখ বোঁজ একট্ব। শরীর খারাপ করবে না হলে।

রওনা হবার সময় যদিও রাত ছিল তব্ব পাড়ার অনেকেই এলো দেখা করতে। নাঁদি পিসিমাকে প্রণাম করে বল্ল—আপনাদের নাতী, আর ছেলেকে দেখবেন পিসিমা; আমি যাচ্ছি নাঁদি।

তাঁরা সান্ত্বনা দিতে ত্রুটি করলেন না।

আমি ব্বঝলাম অশ্রু সজল চোখে ভাঙা মনে স্বনন্দা গাড়িতে উঠল। যদিও

অন্ধকারে দেখা যাচ্ছিল না কিছু, তবু আমি বুঝেছিলাম।

সুনন্দাকে বাপের বাড়ি রেখে এসে বুঝলাম সত্যি কতটা জায়গা জুড়ে ও বাস করত। বাড়ি ত' খালিই—এমন কি আমার মনের ভেতর পর্যন্ত খালি—প্রথম দিন বাড়ি এসে তালা খুলে কাপড় ছাড়তে গিয়ে ওর হাতের কুঁচনো কাপড়খানা পরবার আগে খানিকটা থমকে দাঁড়াতে হয়েছিল। দোর জানালা খুলবার সময় ভাবলাম এই খিলগুলো বন্ধ করেছিল সুনন্দা। রান্নাঘরে ছোট্ট জলচৌকিটার ওপোর এখনও সুনন্দারই স্পর্শ। তরকারীর চুবড়ির ওপোর ঢাকা ওটা তুলতেও কষ্ট পেলাম। সুনন্দাই ঢেকে রেখে গিয়েছে।

বিভ্রান্ত মন নিয়ে রকে এসে বসলাম। এমনি মনের অবস্থা যদি হয়, তবে কি করে আমি এ বাড়িতে থাকব? মনটা আরও খারাপ হয়ে গেল যখন দেখলাম চিরুণীতে সরু সরু কয়েক গাছা লম্বা চুল জড়ান, আর ওর আলতার শিশিটা নিয়ে যায় নি।

বকুল গাছের ছায়া এসে পড়েছে রকে। আমার মন ব্যাকুল হয়ে উঠতে লাগল ক্রমশ।

চারদিন পাঁচ দিন অন্তর চিঠি পাই সুনন্দার। স্নান করে ফিরবার সময় ঝোপঝাড় থেকে দুটো-চারটে সুগন্ধি ফুলের গুচ্ছ এনে চিঠির ওপোর দেই। বার বার পড়ে' মুখস্থ হয়ে গেছে চিঠিগুলো তবুও পড়ি। আবার নতুন ফুল এনে সাজাই পুরোনো ফুল ফেলে দিয়ে।

ভাবি, ওকে না পাঠালেই ছিল ভাল। এখানে থাকলেও তো পারত। খুকীর মৃত্যুর দৃশ্যটা ভেসে ওঠে চোখের ওপোর। যাক্—ওতো ছেলে ছেলে করে ক্ষেপেছে। ভগবান ওর কোল জোড়া করে সুসন্তান দিন।

কিন্তু রাতদিন কাটান অসম্ভব হয়ে উঠেছে যে। কি করি ভেবে পাই না। ওকে দেখবার জন্য মন কেমন করে। সুনন্দারও করে—প্রতি ছত্রেই লেখে সে-কথা চিঠিতে। কত মিনতি জানায় একবার ওর সঙ্গে দেখা করবার জন্য। সময় সময় মনে হয়—যাই। আবার লজ্জা এসে সমস্ত সাহস গ্রাস করে।

এমনি করেই কাটিয়ে দেই দুটি মাস। আয়নায় মুখ দেখি। সুনন্দার যত্নে যে চাকচিক্য উথলে উঠেছিল দেহে, অনেকটা হারিয়ে ফেলেছি তার। মনে শান্তি পাই না। রীতিমত ওর চিঠির থাকটা ফুল দিয়ে সাজাই। নদীর পাড়ে বসে রক্ত-সন্ধ্যা দেখে উন্মনা হয়ে যাই। কাশের বনে দোল দিয়ে যায় হাওয়া। চক্ চক্ দোল লাগা কাশফুলের বনে অস্ত সূর্যের আভা ঠিকরে পড়ে।

এই ঘাটে কতদিন সুনন্দাকে সঙ্গে করে পা ধুতে এসেছি। কত কথা বলেছি দুজনে। ঐ ওপাড়ের সাঁই বাবলা গাছটার কেমন রূপ বদলে যায়,—দিগন্তলীন সূর্যের ছটায় তারই আলোচনা করেছি। নদীর জলটার রংই কম খোলে নাকি সন্ধ্যায়।

সব কিছুতে নিবিড়ভাবে জড়ান সুনন্দার স্মৃতি। ওতো গিয়েছে কয়েক দিনের জন্য মাত্র। এতেই আমার এমন অবস্থা। সময় সময় অভিমান হয় ওর ওপোর। বিচার করে দেখি—তা ভিত্তিহীন।

প্রতিদিন ধূপ, ধুনো, দীপ জ্বালাত সুনন্দা; আজকাল আর তা হয় না। রাতদিন সুনন্দার কথা ভাবি। কবিতা মেলাবার বৃথা চেষ্টা করি মাত্র।

ভোর বেলা সবেমাত্র চায়ের পেয়ালা মুখে তুলেছি এমন সময় পিওন এসে ডাকল—বাবু। এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াই। কাল সমস্ত রাত ঘুমুতে পারিনি মাথা ঝিম্ ঝিম্ করছে। সই করে টেলিগ্রাম খুললাম। চোখ বুলোতেই বুঝলাম সুনন্দার খোকা হয়েছে কিন্তু সে অসুস্থ ভীষণ, চলে এস অবিলম্বে।

গাড়ি ছিল একটা দু ঘণ্টা পরে। ছোট্ট সুটকেশটায় পুরে নিলাম আমার সামান্য জিনিস। দৌড়লাম স্টেশনের দিকে।

......সুনন্দাদের বাড়ির কাছে এসে দাঁড়াতেই বুকটা দুলে উঠল। খানিকক্ষণ চুপ করে দাঁড়ালাম। কিছু লক্ষ্য করবার সময় তখন আমার ছিল না। বুকের ভেতর সাহস সঞ্চয় করে বাড়ির ভেতরে ঢুকলাম।

আমাকে দেখতে পেয়ে আজ আর সুনন্দার ভাই বোনেরা ছুটে এলনা অন্যদিনের মতন। ভাবলাম হয়ত অসুখের জন্যই সব চুপ করে আছে।

আমি ঢুকলাম সুনন্দার মা'র ঘরে। সুনন্দার মা শুয়েছিলেন, আগাগোড়া চাদর মুড়ি দিয়ে। পাশে বসে ছিল সুনন্দার বছর দশেকের একটি বোন। সে বল্ল—জামাইবাবু এসেছেন মা। দুচারবার ডাকবার পরে তিনি কেঁদে উঠলেন ভীষণভাবে। সঙ্গে সঙ্গে সুনন্দার সব কয়টি ভাই-বোন এসে জড়ো হল এঘরে। সবাই কাঁদছে নিঃশব্দে কেবল সুনন্দার মা-ই কাঁদছেন চীৎকার করে।

বুঝতে বাকী রইল না কিছু। আমি বসে পড়লাম সুনন্দার মায়েরই খাটের এক পাশে।

কি করে সে দিনটা কেটে গেল জানি না। পর দিন ভোর বেলা সুনন্দার পরের বোনটি এসে দাঁড়াল কাছে। আমি তখন ঘুম ভেঙে উঠে জানালা দিয়ে বাইরের বাগানটার দিকে তাকিয়ে বসে ছিলাম। চোখ তুলে তাকিয়ে বল্লাম—বেণু?

জলভরা চোখ নত করে সে বল্ল—এই দেখুন দাদা, দিদির খোকা।

তাকালাম। সুনন্দার খোকা। সুনন্দার কল্পনার সঙ্গে মিল রেখেই যেন ভগবান ওকে গড়েছেন। সুনন্দার চোখ, সুনন্দার গড়ন। থোকা থোকা ঘন চুল মাথায়। কপালের ওপোরে একগোছা চুল এসে পড়েছে। সব ঠিক। অথচ সুনন্দাই খোকাকে ছেড়ে চলে গেছে।

সুটকেশ খুলে ছোট্ট কাঁকন জোড়া বের করলাম। যা কিনে এনেছিলাম কলকাতা থেকে। একান্ত প্রিয় ছিল এই গহনাটা সুনন্দার। প্রায়ই সে বলত—"আমার খোকা-খুকী যাই হোক, তাকে কাঁকন দিয়ে তুমি মুখ দেখ।"

খোকার নরম, সুন্দর লম্বা লম্বা আঙুলগুলো ধরে কাঁকন পরিয়ে দিলাম।

তুষার তীর্থ

(৩০৮ পৃষ্ঠার পর)

যাঁরা অমরনাথ দর্শনে যাবেন, তাঁদের উচিত দলবল নিয়ে যাওয়া। একাকী কখনও যাবেন না। একটি তাঁবু, যথেষ্ট শীতবস্ত্র, একটি স্টোভ, তৈল, ছাতা বা বর্ষাতি, বিছানার নিম্নে ব্যবহার উদ্দেশ্যে একটি অয়েলক্লথ, শ্রীনগরের তৈরি দুটি 'ভগ' মাদুর, বরারের এক জোড়া পাদুকা, গুহার মধ্যে ব্যবহারের জন্য ঘাসের তৈরি এক জোড়া জুতো (চামড়ার জুতো ব্যবহার তথায় নিষিদ্ধ) শুষ্ক ফলমূল, রুটি, বিস্কুট এবং যাত্রার উপযোগী প্রচুর খাদ্যদ্রব্য, একটি লণ্ঠন, পাহাড়ে ব্যবহারের জন্য একটি ছড়ি, একটি গরম চা বা জল বহনাধার প্রভৃতি যাত্রীদের অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যসমূহের অন্যতম। অনভিজ্ঞ উৎসাহীদের কতকগুলি সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে: খালিপেটে কখনও চড়াই করবেন না। কারণ, এতে গা বমি-বমি করে জমাটবাঁধা বরফ হতে কখনও বরফ খাবেন না; কারণ এতে পার্বত্য-উদরাময় হতে পারে এবং কখনও ঠাণ্ডায় গা খুলে থাকবেন না। অনেক চেষ্টা সত্ত্বে এই তীর্থে যাত্রা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য হলেও ইহা জীবনে এমন অভিজ্ঞতার সন্ধান দেয় যে, মানুষ তা কখনও ভুলতে পারে না।

(১) নোটস অন সাম ওয়ান্ডারিংস—সিস্টার নিবেদিতা।

(২) দি মাস্টার এ্যাজ আই সি হিম।

'প্রবাসী'-সম্পাদক রামানন্দ

শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

[রামানন্দ স্বর্গগত—দেশবাসীর পূজনীয়—মনে বাক্যে কর্মে অকপট—দেশের অধঃপতনে মর্মপীড়িত—দেশমাতৃকার সর্বাঙ্গীণ উন্নতিকল্পে সতত উদ্যমশীল—বক্তৃতায় ও প্রবন্ধে দেশের মর্মবাণীর প্রচারক—জাতিধর্মবর্ণনির্বিশেষে সকলেরই পরম সুহৃদ্—পত্রিকা পরিচালনায় সাংবাদিকের পাণ্ডিত্যে সুপ্রবীণ —মৃদুপরিমিতভাষী —প্রফুল্লগম্ভীর-মূর্তি —স্নিগ্ধহৃদয় রামানন্দ স্বর্গগত! 'প্রবাসী'র 'বিবিধ'-বিভাগে রাজনীতি-প্রভৃতির বিবিধবিষয়ক প্রবন্ধে স্নিগ্ধ নির্ভীক সত্যকঠোর পাঠকের প্রীতিকর রামানন্দের ভাষা আর প্রকাশিত হইবে না! স্বদেশের সেবক হইয়া রামানন্দ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সুদীর্ঘকাল কায়মনোবাক্যে সেই দেশমাতৃকার সেবা করিতে করিতে সেই দেশভক্ত সুকৃতী সন্তানের জীবিতকাল পর্যবসিত হইয়াছে! বঙ্গের সুসন্তান সকলই ক্রমে ক্রমে নিদারুণ কালের কবলে পতিত ও অন্তর্হিত হইয়াছেন! বঙ্গের উজ্জ্বল রবি রবীন্দ্রনাথ অস্তমিত! বঙ্গবাসী, কেবল বঙ্গবাসী কেন, স্বদেশ-বিদেশের মনীষিগণও সে মর্মঘাতী আঘাত সংবরণ করিতে-না-করিতেই ভারতের—বিশেষতঃ বঙ্গের আনন্দ রামানন্দ চিরনিদ্রায় নিদ্রিত! বঙ্গের তথা ভারতের বিষম দুর্ভাগ্যের—চরম দুর্দশার দিন আসিয়াছে! এ দুর্দিন কি দূর হইবে? সুদিন কি প্রভাত হইবে!]

আমার পরিচয়—আমার জীবনের যে সুদীর্ঘকাল শান্তিনিকেতনে অতিবাহিত হইয়াছে, তাহার প্রথম ভাগে আমি এই সম্পাদক মহাশয়কে এখানে দেখি নাই। ১৯৩৯ সালে আমার অভিধান 'বঙ্গীয়-শব্দ-কোষে'র প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়। তাহার কয়েক বৎসর পূর্বে তাঁহার সহিত আমার কিছু পরিচয় হইয়াছিল; সেই পরিচয়-সূত্রে 'প্রবাসী'তে সমালোচনার্থ অভিধানের প্রথম খণ্ড তাঁহাকে দিয়া আসিয়াছিলাম। 'প্রবাসী'র 'বিবিধ'-বিভাগে তিনি ইহার অবশ্যজ্ঞাতব্য বিষয়ের যে সংক্ষিপ্ত সমালোচনা করিয়াছিলেন, তাহাই স্বল্প সময়েই অভিধানের বিষয় ভারতের দূর-দূরান্তে বঙ্গভাষার সাহিত্যিকগণের গোচরীভূত করিয়াছিল। ইহার ফলে, সেই সময়ে গ্রাহকগণের অনুগ্রহে যাহা কিছু অর্থাগম হইয়াছিল, তাহা দরিদ্র গ্রন্থকারকে সুকঠোর সুদীর্ঘ কর্মপথে উৎসাহিত করিয়া সাধ্যসিদ্ধির লক্ষ্যে অগ্রসর হওয়ার বিশেষ শক্তি দিয়াছিল।

অভীষ্টে নিষ্ঠা—সাংবাদিকের নৈপুণ্য—অভীপ্সিত কর্তব্য কর্মের অনুষ্ঠানে একান্ত নিষ্ঠা রামানন্দের একটি স্বভাবসিদ্ধ অসামান্য গুণ ছিল। কি রাজ-

নীতিক, কি সামাজিক, কি আর্থিক, কি শিক্ষাবিষয়ক, কি কৃষিসম্বন্ধী—যে কোন বিষয়ে তিনি দেশের উন্নতির পথ উন্মুক্ত হইবে বুঝিতেন, তাহাতেই উৎসাহিত উদ্যোগী হইয়া সিদ্ধির নিমিত্ত সনির্বন্ধ প্রাণপণ চেষ্টা করিতেন—অণুমাত্র উদাসীন থাকিতে পারিতেন না।

সংবাদপত্র-পরিচালনায় তাঁহার অনন্যসাধারণ নৈপুণ্যে কেহই অস্বীকার করিবেন না। তাঁহার সম্পাদিত মাসিকপত্রগুলি সুখ্যাতি ও প্রসিদ্ধির সহিত দেশ-দেশান্তরে সমাদরপ্রাপ্ত হইয়া দীর্ঘকাল প্রচলিত আছে। প্রবাসীতে প্রকাশিত তাঁহার লিখিত ক্ষুদ্র প্রবন্ধসমূহ এমন সমীচীন সপ্রমাণ ও সুবিচারপূত যে, কেহই তাহার প্রতিবাদ করিবার ছিদ্র পাইতেন না। তিনি যেমন বয়োবৃদ্ধ, তেমনই জ্ঞানবৃদ্ধ ছিলেন; তাই তিনি সাংবাদিকগণের পূজ্যতম সাংবাদিক-শিরোমণি—তাই তাঁহার শেষ-শয়ন গুণমুগ্ধ সাংবাদিক, সাহিত্যিক ও পণ্ডিতের সমাগমে অন্তিম পূজার্ঘ্য দিবার নিমিত্তই পরিবেষ্টিত ও পরিশোভিত হইয়াছিল।

তাঁহার পত্রিকা-সম্পাদনার একটি বিশেষত্ব ছিল যে, প্রত্যেক মাসের প্রথমেই তাঁহার সম্পাদিত মাসিকপত্রগুলি যথানিয়মে গ্রাহকগণের হস্তগত হইত; আমরণ তিনি এই পত্রিকা-প্রকাশের সময়নিষ্ঠতা পরিপালন করিয়া গিয়াছেন—কোন বাধাবিঘ্নে ইহার কখনও ব্যভিচার হয় নাই। রবীন্দ্রনাথ এই সময়নিষ্ঠার বিশেষ প্রশংসা করিয়া তাঁহার মাসিকপত্রপরিচালনার একটা বিশেষত্ব সকলের লক্ষ্যীভূত করিয়াছিলেন। মাসিকপত্র মাসের প্রথমে প্রকাশিত হইলেই সার্থকনামা হয়—রামানন্দ ইহার নির্দেশক অগ্রদূত।

'প্রবাসী'র উপকারিতা—দৈনিকাদি কোন সংবাদপত্র পড়ায় পূর্বে আমার বিশেষ আসক্তি বা নেশা ছিল না; তবে মধ্যে মধ্যে সুবিধামত দুই-একটি পত্রিকার কোন কোন অভিমত বিষয়ের প্রবন্ধ অনাসক্তভাবেই পড়িতাম। প্রবাসীর গ্রাহক হইলে, প্রবাসী পড়িতে পড়িতে আমার সেই অনাসক্তভাবে সাময়িক পাঠ ক্রমে নিয়মিত পাঠের আসক্তিতে পরিণত হয়। প্রবাসী হস্তগত হইলেই প্রথমেই সম্পাদকীয় 'বিবিধ'-বিভাগের প্রবন্ধগুলি পড়িবার প্রলোভন কিছুতেই প্রশমিত করিতে পারি নাই এবং এখনও পারি না; সুতরাং বলিতে হয়, প্রবাসীই সংবাদপত্র-পাঠে আমার অনুরাগ জন্মাইয়াছে। প্রবাসীর কোন পাঠকের মুখে শুনিয়াছিলাম, সম্পাদক মহাশয়ের লিখিত বিবিধবিষয়ক প্রবন্ধমালা প্রবাসীর বিশেষ প্রলোভনের বিষয়—প্রবাসীর হৃদয়। তাঁহার এই মন্তব্য অত্যুক্তি বলিয়া মনে হয় না।

রাজনীতি নানাবিষয়িণী। রাজনীতিক বিভাগের নানা বিষয় প্রবাসীর প্রবন্ধমালায় সাবধানে সুবিচারপূর্বক আলোচিত ও বিবৃত হইত; সম্পাদক মহাশয় ইহার লেখক ছিলেন। রাজনীতি তৎতত্ত্বজ্ঞের পক্ষেই দুরূহ বিষয়, অজ্ঞের ত কথাই নাই। রাজনীতিক প্রবন্ধ পড়িয়া বিশেষ কিছু বুঝি না সত্যই, তথাপি ইহা অবশ্য স্বীকার্য যে, তদ্বিষয়ে যাহা

কিছু বুঝিয়াছি, তাহার শিক্ষক প্রবাসীই। আমার বোধ হয়, প্রবাসীর এই প্রবন্ধসমূহে অনেক পাঠককেই রাষ্ট্র-নীতির চক্ষুদান করিয়াছে।

ধর্মমতে মৌনিতা—লোকপ্রিয়তা—রামানন্দ ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী ছিলেন। তাঁহার সান্নিধ্য কখনও দীর্ঘকাল আমার ভাগ্যে ঘটে নাই, তবে যখন কিয়ৎকাল তাঁহার নিকটে বসিবার সুযোগ হইয়াছে, তখন তিনি কথাপ্রসঙ্গেও কোন ধর্মবিষয়ের অবতারণা করিতেন না—বিশেষ সাবধানে কথোপকথন করিতেন। কোন ধর্ম-সম্প্রদায়ে আঘাত করা তাঁহার প্রকৃতি-বিরোধী ছিল। প্রবন্ধে প্রমাদবশত কোন ধর্মবিরুদ্ধ রেখাপাত হইলেই তিনি পরবর্তী মাসিক সংখ্যায় ত্রুটি স্বীকার করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতেন। ধর্মে উদারনীতির মাধুর্য তাঁহার প্রকৃতি মধুরতাময় করিয়া রাখিয়াছিল। তাই অবসরমত তাঁহার সঙ্গলাভের লোভ সংবরণ করিতে পারিতাম না। তাঁহার নিকটে বসিলেই কথায় কথায় তিনি নানা বিষয়ের অবতারণা করিতেন—সাংবাদিক-প্রবরের ভাণ্ডারে সংবাদ-বিষয়ের অভাব ছিল না। চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা মহাশয়ের কথাও কখন-কখন বলিতেন। তাঁহার সময়ের মূল্যবত্তা জানিয়া কোন বিষয়ের প্রশ্ন করিতাম না; তিনি ইচ্ছামত বলিয়া যাইতেন, শুনিয়াই যাইতাম। দুঃখ, সেই মৃদু-গম্ভীর পরিস্ফুট মিষ্ট কথা আর শুনিতে পাইব না!

শিষ্টাচার—সামাজিকতা— উৎসবানুষ্ঠানে ও কার্যোপলক্ষ্যে তিনি সময়ে সময়ে শান্তিনিকেতনে আসিতেন। প্রত্যেকবারই আমাদের সাক্ষাৎকারের অপেক্ষা না করিয়াই পরদিনই প্রাতঃকালে বিশ্বভারতীর বিদ্যাভবনে তিনি আমাদিগকে দেখিতে আসিতেন। তাঁহার মহত্ত্বের তুলনায় আমাদের যোগ্যতা নগণ্য হইলেও তাঁহার মনে স্নিগ্ধজনে সে বিচারণার স্থান ছিল না—স্নিগ্ধতা চক্ষুতে মৈত্রীর অঞ্জন পরাইয়া দেয়। বার্ধক্যে দুর্বলতা হেতু ধীরে ধীরে নিঃশব্দ সঞ্চারে তিনি নিকটে আসিতেন এবং আসন গ্রহণ করিয়াই আমার অভিধানের কথা পাড়িতেন; —কত গ্রাহক হ'ল? নূতন গ্রাহক হল কি? আয়ে ব্যয়সংকুলান হয় কি?—ইত্যাদি বিষয় তাঁহার জিজ্ঞাস্য ছিল। অভিধান যাহাতে নিখুঁত হয়, তাহার নিমিত্ত তিনি পত্রেও উপদেশ দিয়াছেন। একদিন তিনি বলিয়াছিলেন, অভিধান সমাপ্ত হইলে আমি কিছু লিখিব। তাঁহার সে ইচ্ছা শূন্যই রহিয়া গেল। এক কবি ভিন্ন আমার এমন অকারণ দরদী আর কেহই ছিলেন না! উভয়ই এখন পরলোকে!—আমার পরম দুরদৃষ্ট!

আমার বাসায় দুইবার তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলাম। আমার বাসা নিকটে হইলেও বার্ধক্য হেতু যাতায়াতে কষ্ট-বোধ হইবে ভাবিয়া আমার কিছু সঙ্কোচবোধ হইয়াছিল, বুঝিতে পারিয়া তিনি স্পষ্টই বলিয়াছিলেন—'কুণ্ঠিত হওয়ার কারণ নেই, এটুকু আমি অনায়াসেই যেতে পার্বো।' তিনি নিরামিষাশী ছিলেন, বিশেষ কিছু আয়োজনের প্রয়োজন ছিল না, অল্পস্বল্প নিরামিষ ভোজ্যেই তাঁহার বেশ তৃপ্তি হইত। বার্ধক্যে মিতাহার ও নিরামিষ ভোজন তাঁহার দীর্ঘায়ুর একটি কারণ মনে হয়।

১৩৩৯ সালে চৈত্র মাসে অভিধানের জন্য অতিরিক্ত পরিশ্রমে সাংঘাতিক পীড়ায় আক্রান্ত হইয়াছিলাম—জীবনের আশা ছিল না। সেই সময়ে রামানন্দ শান্তিনিকেতনে ছিলেন। পীড়ার সংবাদ পাইয়াই তিনি আমার বাসায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। পূর্বে প্রচুর রক্তবমনে সংজ্ঞাহীন হইয়াছিলাম, তখনও আমি অপ্রকৃতিস্থ, শয্যায় শায়িত, দুর্বলতায় ক্ষীণকণ্ঠ; দেখিলাম সম্মুখে দরদী সুহৃদ্ দণ্ডায়মান, ভাবী অমঙ্গল-শঙ্কায় বিষণ্ণ নীরব। কিছুক্ষণ পরে তিনি বলিলেন,—'ভয় নাই, সুস্থ হবেন, অভিধান শেষ কর্তে পার্বেন।' তিনি এ সময়ে প্রত্যহই একবার আমায় দেখিতে আসিতেন। তাঁহার সেই সহৃদয়তা আমার আমরণ স্মরণীয় বিষয়।

এই প্রবন্ধে সাংবাদিক-প্রবরের চরিতাবলীর যাহা-কিছু লিখিত হইল, আশা করি কেহই তাহা অতিরঞ্জনদূষিত মনে করিবেন না; তাঁহার প্রকৃতি যেরূপ বুঝিয়াছি, তাহাই সহজভাবে বর্ণন করিয়াছি, ভক্তিপ্রবণতা-জন্য পক্ষপাতিত্বের ও অতিরঞ্জিত উক্তির লেশমাত্র ইহাতে নাই।

দীর্ঘকাল দুশ্চিকিৎস্য রোগে গুরুতর কষ্ট ভোগ করিয়া রামানন্দ স্বর্গগত হইয়াছেন। প্রথমে পীড়ার বিষয়ে আমি তাঁহাকে যে পত্র লিখিয়াছিলাম তাহার উত্তরে তিনি লিখিয়াছিলেন,—"আমার যে কয়েকটি রোগ জুটিয়াছে সবগুলিই দুরারোগ্য; কেহই যাইতে চায় না। শরীর যখন দগ্ধ হইবে, তখন অবশ্য তাঁহারাও দগ্ধ হইবেন।" ইহার পরে লিখিত পত্রের উত্তরে সহকারী সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছিলেন,—"সম্পাদক মহাশয় পীড়িত!" পরে পত্র লিখিয়াও কিছুই জানিতে পারি নাই। তাঁহার স্বর্গারোহণের পরদিন আমার এক অধ্যাপক বন্ধু বলিলেন—"রামানন্দবাবু ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন।" এই দুঃসংবাদ যেমন আকস্মিক, তেমনই সাংঘাতিক; বিষাদের কঠোর আঘাতে সমস্ত দিন বিশেষ অশান্তিতেই কাটিয়াছিল!

ভগবানের নিকটে তাঁহার স্বর্গীয় আত্মার চিরশান্তির প্রার্থনা করি। বিচ্ছেদকাতর শোকখিন্ন তাঁহার পরিজনবর্গের শোকশান্তির কামনায় কবির বাক্যে প্রার্থনা করি—

"শান্তি কর বরিষণ নীরব ধারে,
নাথ, চিত্তমাঝে,
সুখে দুঃখে সব কাজে,
নির্জনে জনসমাজে।"

সংঘাত

রবীন্দ্রবিনোদ সিংহ

ছোট বড় অগণ্তি টিলায় ঘেরা ধূমেল **শহর** ডিগবয়ের একপ্রান্তে ক্ষীণস্রোতা পাহাড়ী ঝর্ণা। নাম তার যাই হোক, লোকে বলে লুংগিজলা। অতি দূর-প্রান্তর বন্ধুর পথের ভুরভুরে মেঠো গন্ধ নিয়ে লুংগিজলা উত্তরে চলছে শ্লথগতি নির্জীব সাপের মতো। অলস বঙ্কিম। বুজে-যাওয়া দুইধারে স্তবকে স্তবকে চড়াই-উত্‌রাই পাথরের মিছিল।

লুংগিজলার গা ঘেঁসে প্রস্তরীভূত পাহাড় শীর্ষে সমান্তরাল নিশান-শ্রেণী রেলের সিগন্যালের মতো ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। তেলের পাহাড়—তপ্তগুহা পাহাড়ের নিচে, পাষাণ-বনের ফাটল ঘিরে ঘুমিয়ে স্বপন দেখছে সভ্যতার আলো জ্বালবার রসদ। রূপকথার হীরের কাঠির মতো ধনিকের সোনার স্পর্শে ঘুমন্ত তেল আলস্য ভেঙে জেগে ওঠে। প্রসারিত-পাখা নিশানগুলির ঝিক্‌ঝিকে লৌহফলকে শুধু তেলের লোভানি, আগুনের ইঙ্গিত।

তেলের পাহাড়ের মাঝখানে যেখানটায় ধানী জমি সমতল হয়ে কোণের টিলায় এসে লেগেছে সেই টিলার উপর মায়ার বাংলো-বাড়ি। তেলের কারখানা থেকে রাশি রাশি কুণ্ডলীত ধোঁয়া এসে সারা-দিনমান বাংলোর চালায় চলন্ত দুনিয়ার স্পর্শ বুলিয়ে যায়। গুরুগর্জন, মৃদু ঠুং-ঠাং, আরো নানা বিচিত্র ছন্দে কারখানার জীবনপ্রবাহ চলতে থাকে। চারদিকে কত মানুষের আনাগোনা, কত রকমারি আয়োজন-সম্ভার। কিন্তু মায়ার জীবনে কর্মের এ ঝড়ো হাওয়া কোন প্রতিক্রিয়া আনতে পারে না। শহরতলীর নির্জন পাহাড় চূড়োয় নির্মম মায়াকাননে মায়া যেনো নিতান্তই একা। চলন্ত পৃথিবীটা যেনো মায়াকাননের দ্বার-প্রান্তে এসে হঠাৎ থমকে গেছে। নিস্পন্দ নিথর। সূর্যের প্রখর তেজে লুংগিজলার মরা স্রোতটা পর্যন্ত জীবন্ত ঝক্‌ঝকে হয়ে ওঠে। ধূসর পাথর-বোঝাই পাহাড়গুলো হাল্‌কা উল্লাসে হাসছে যেনো। কিন্তু মায়ার পৃথিবী মায়ার কাছে নিয়ে এসেছে নির্জীব নিঃসীম এক বিদ্‌ঘুটে অন্ধকার। জীবন সেখানে চলছে বটে কিন্তু এগিয়ে যাবার থেই হারিয়ে ফেলেছে সে। নির্বাত-স্তব্ধ সে এক-কেন্দ্রিক ঘোলাটে অন্ধকারে মায়া হারিয়ে গেছে, হারিয়ে গেছে জীবনের সব উন্মত্ত চঞ্চলতা, বুঝি বা ফুরিয়ে গেছে প্রদীপ্ত মুখর সে ভরা যৌবন। সবই আজ উবে গেছে ধূপের মতো।

তবু মায়ার ভালো লাগে এ নির্জীব নির্বিরোধ অবসাদ। ধীর প্রলম্বিত ঋজু সরলরেখার মতো এগিয়ে চলেছে তার জীবনের সীমা। অলি-গলির বাঁকা পথে তাকে আর প্রলুব্ধ করে না। ঘূর্ণি-হাওয়ার মত্ততায় তার উদ্ধত কামনারা আর ক্ষুধিত হয়ে ওঠে না। রণক্লান্ত দেহের কাছে আরো বেশি আশা করা মিছে। স্তব্ধ নাড়ীর শিথিল রক্তে নারীর নিভৃত ক্ষুধা হয়ত বা মরে গেছে। রূপ? রূপের পসরা আজো তার নিঃশেষ হয়ে যায়নি। শত পুরুষের পাশবিকতার ইন্ধনে আগুন দেবার মত বারুদ এখনো মজুত। মায়া-কাননের সন্ধ্যার অন্ধকারে কারখানার কর্ম-ক্লান্ত কাপুরুষগুলির সামনে আজো যখন মায়া তার রূপের ফণা তুলে দাঁড়ায় তখন কামাচারীদের নির্লজ্জ ঠোঁটে আদিম নেশার লালা ঘামতে থাকে। কিন্তু এ শুধুই খেলা। মত্ততার সে অভিনয়ে মায়া নিজেকে খুঁজে পায় না। নিত্যকার নিয়মে এ শুধু লোভানির কসরত। পতঙ্গকে আগুন দেখানো। নিজের দিক থেকে কোন তাগিদ নেই মায়ার—নেই তার মনের স্বাক্ষর।

পাহাড়ের সুদূর সীমান্তে পড়ন্ত রোদের সিঁদুর-রেখা। লুংগিজলার স্ফটিকজলে রঙের নৃত্য শুরু হয়ে গেছে। বিস্মৃতির মতো গাঢ় অন্ধকার এবার নেমে আসবে, আসবে নেমে দিনান্তের আকাশ ছেপে। রঙের হোরি খেলা—রাত্রির অভিসারে পূর্বরাগের রক্তিম ইসারা।

স্নাত-শুচি দেহের পটে রঙ-বেরঙের প্রলেপ দিয়ে মায়া তৈরী হয়ে বসে আছে। বস্‌রাই গোলাপ-গন্ধে ঘরের আকাশ ভর-পুর। দেহ-বেসাতিনীর ভূমিকায় একটু পরেই পাদ-প্রদীপের সামনে এসে মায়াকে দাঁড়াতে হবে। যবনিকার অন্তরালে তাই রূপসজ্জার আয়োজন শেষ। পিয়ানোর ঢাক্‌না তুলে মায়া—

বাংলোর সামনেকার ঝক্‌ঝকে পিচের রাস্তাটা একটা প্রসারিত লোল-জিহ্বার মতো মায়া-কাননের দিকে প্রলম্বিত। আর তারই বুকের উপর দিয়ে চলেছে সন্ধ্যার অভিসার। মায়ার দুই চোখে ক্রমে ঝিলিক দিয়ে ওঠে পরিচিত পুরুষগুলির ছায়া-ছবি। কা'র মৃদু পদধ্বনি বিলাস-কক্ষের মসৃণ কার্পেটের উপর বুঝি বা স্পষ্ট শোনা যায়।

পিয়ানোর সুর ভেদ করে কলিংবেল বেজে উঠলো।

শাণিত প্রখরদৃষ্টি বিস্ফারিত করে বিলাস-কক্ষের সামনে এসে দাঁড়ালো মায়া। কিন্তু এ কী! এ গৃহ-প্রাঙ্গণে নিত্য যাদের আনাগোনা এ তাদের কেউ তো নয়! বিলিতী পোষাকধারী কে এ যুবক সলজ্জ ভংগীতে কুশানে স্থির হয়ে বসে আছে। আনত আঢ়ুল চোখে একটা নম্র সেলাম ঠুকে যুবক বললেঃ নমস্কার! আমি মিসেস্ সান্যালকে চাই। তিনি বাড়ি আছেন কি?

—আপনি? আপনি—

—আমি বারীন রায়। ইদানীং তেলের কলের ইন্‌স্পেক্‌টার হয়ে ডিগবয়ে এসেছি। দয়া করে মিসেস সান্যালকে একবারটি ডেকে দিন্ না।

—কী দরকার আপনার?

—একটু বিজ্‌নেস টক্ আছে। ইন্‌-ভ্যালি টী গার্ডেনের ম্যানেজার মিঃ বক্‌চী আমাকে পাঠিয়েছেন। ইনস্যুরেন্স—মানে ইনস্যুরেন্স টক্।

—সেকি! তেলের কলের ইন্সপেক্টার আপনি, পাঠিয়েছেন আপনাকে টী-গার্ডেনের ম্যানেজার—ইনস্যুরেন্স টক আছে, মানে? দালালিও করেন নাকি আপনি?

—করি বৈকি। দালালি কে আর করে না, বলুন। অফিসের বড় সাহেব থেকে আরম্ভ করে উর্দি-পরা বেয়ারা পর্যন্ত সবাইতো বস্তুত দালাল। কেউ নামে দালাল, কেউ বা কাজে দালাল। সে যাক্। শুনেছি মিসেস সান্যাল নাকি অনেক আইডল্ মানি নিয়ে বসে আছেন। তাই ভাবলুম—

—কি করে টাকাগুলো কাজে লাগানো যায়, এই তো?

—আজ্ঞে হাঁ।

—আপনার সদিচ্ছার জন্যে মিসেস সান্যাল নিশ্চয়ই আপনাকে ধন্যবাদ দেবেন। বেশ তো, আপনি বসুন।

বেয়ারা টিপয়ে চায়ের বাটি রেখে পাশের কাঁচের আলমারীর ডালাটা খুলতেই মায়া চোখে নিষেধের ইংগিত করলে। বেয়ারা খাবারের ডিস রেখে চলে গেল। সে অবাক! নূতন মানুষের আবির্ভাব—একটু আমোদ-ফুর্তি হবে না? মায়ার চোখে আবার এ নূতন ইংগিত কেন? বেয়ারাটা মনে মনে হাসলো একটু।

মায়া অভিনয় রেখে একটা কুশনে গা এলিয়ে দিলে। বারীন লজ্জার অভিনয় করে বললে : গৃহকর্ত্রীর সন্ধান নেই, অথচ আগন্তুকের সম্বর্ধনা হয়ে গেলো। মন্দ নয়।

—অতিথশালায় গৃহকর্ত্রীর সাক্ষাতের প্রয়োজন হয় না। সেবাইতের দর্শন পেলেই কাজ চলে যায়। সে যাক্, লক্ষণ যখন ভালো, বিজনেসটাও মোটা হবে বলে মনে হয়, না?

—ভগবান জানেন। কপালে থাকলে হতে পারে।

—কপালে যখন বিশ্বেস আছে, আর ভগবানকেও যখন সংগে রেখেছেন, তখন বাজার মন্দা হতেই পারে না। ভগবানে আপনার আস্থা খুব, না বারীনবাবু?

বারীন সংকুচিত হলো। বিজ্ঞানের কারখানায় গোলামী করে ভগবানের নাম কেন? ফার্নেসের আগুনে ভগবানের নাকি হাত নেই। বারীনের চোখে-মুখে কে যেন রক্তের ছোপ দিয়ে দিলো।

বারীন : হাঁ তা—কিন্তু কই মিসেস সান্যালকে ডেকে দিলেন না তো?

দেয়ালের গ্রীক হিরোর সংগে মায়া বারীনের মুখের আদলটা মিলিয়ে নিচ্ছে। মনের তুলিতে মায়া শিল্পীর স্বপ্ন বুলিয়ে নিতে চায়।

বাইরে বারান্দার এদিকে সেদিকে আরো কারা এসেছে যেন। মায়া দ্রুতগতি টর্পেডোর মতো মুহূর্তে লোণা সমুদ্রের স্বপ্ন দেখলো। সে সমুদ্রে নীল তরংগ-ভংগ নেই। রক্ত-রঙীন সোমরসের সফেন সায়রে ডুবছে-ভাসছে ডিগবয়ের ট্রাকাতে অমানুষগুলি। মায়ার দেহের মেদ-গন্ধে মত্তোয়ারা সে এক বীভৎস তরংগ-ভংগ।

মায়া অন্দরে গিয়ে আবার ফিরে এলো।

বারীন : মিসেস সান্যালকে—

—তিনি বিশেষ দুঃখিত। তাঁর সংগে বিজনেস টকটা আজ আর হতে পারলো না। আপনি কাল বিকেলে এলে তিনি খুশি হবেন। আসবেন তো, বারীনবাবু?

মায়ার চোখে আবার উদ্ধত আবেশ। স্মিত-তীব্র দৃষ্টির শাসানিতে বারীনের কণ্ঠ স্তব্ধ হলো। আনত চোখ দুটি তুলে বারীন সহজ করে বললে : নিশ্চয়ই আসবো। আমাকে যে আসতেই হবে। কিন্তু আপনি—

—আপনি কি, বলুন!

—না মানে, আপনি—

—আমি? আমার পরিচয়ও কালই পাবেন, কেমন?

বারীন নির্বাক বেরিয়ে গেলো। গুটিকতক ঈর্ষান্বিত চোখ বারীনকে গ্রাস করতে পারলে তবে তাদের আঁতের ঝাল মেটে। সে যাক্। মাংগলিকের পর এবার নাটক শুরু হবে। দেহ-বেসাতিনীর অভিনয়দীপ্ত রাত্রির অভিসার।

লুংগিজলার দুই ধারে পাথরের মিছিল ভেঙে কুচি করছে পাহাড়ী মেয়ের দল। পুরুষগুলি ঠনাঠন্ শব্দে শাবল মেরে পাথর আলগা করে দিচ্ছে, আর মেয়েগুলি ছেনির মাথায় হাতুড়ি ঠুকে কুচি করে পাথরের ডেলা ভাঙছে। জোয়ারিয়া কৃষ্ণাংগী বুনো পরীদের পালিশ-করা দেহের কালো রক্ত যেন টসটস করে চোয়াল বেয়ে ঝরে পড়ছে। তাড়ির নেশায় চোয়াড়ে পুরুষগুলি আবোল তাবোল বকছে।

করোগেটেড সেডের নীচে বসে ইন্সপেক্টার বারীন রায়ের চোখেও বুঝিবা এ দৃশ্যে নেশা ধরে। অযুত সংখ্যা পিপীলিকা চোখের তারায় যুগপৎ কিলবিল করতে থাকে। আতপ্ত আকাশের পানে চেয়ে বারীন নীরবে নিঃশ্বাস ছাড়ে শুধু। তার বিশ্ববিদ্যালয়ের অংক-কষা মন গতানুগতিক পরিবেশ থেকে নির্বিবাদে পালিয়ে আসতে চায়। বাঁধা-ধরা সোজা পথে বিচরণ করেছে সে এতদিন। ডিগ্রির ছাপ কপালে এঁকে সরকারী গোলামখানার দ্বারে দ্বারে ভিখ্ মাঙবার মোহ ছিল তার অফুরন্ত। বিদ্যার পুঁজির সংগে পুঁজিপতি বাপের যোগাযোগ, তায় এসে ভর করে দাঁড়িয়েছিলো তার অংক-কষা, ছক্-কাটা গম্ভীর জীবন। সরকারী রাজপথে লালফিতের বাইরেও একটা বিরাট পৃথিবী তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকতে পারে, একথা সে কল্পনায় আটতে পারে নি। কিন্তু সে আভিজাত্যের চোরাবালিতে আজ যখন তার পরাজয়ের বীজ গজিয়ে উঠেছে, তখন আর সে-জীবনের স্বপ্ন সে দেখতে পায় না। সে-জীবন ধুয়ে মুছে গেছে, কিন্তু মুছে যায়নি ছক-কাটা জ্যামিতিক পথে হাঁটবার সে আংকিক মন। বাস্তবের ধূলিকণায় আংকিক বারীনের বারে বারে হোঁচট খেতে হয়। জীবন বুঝি সরল রেখায় আঁকা মসৃণ গতিপথ নয় শুধু।

কুলীর মেয়ের জোয়ারী রক্তের শিরায় মুক্তির আস্বাদ।

কপালের রাজ-শিরাটা অসহ্য যন্ত্রণায় টনটন করে ওঠে, আর কড়া টান-করা বেতের কসরৎ দেখিয়ে তীব্র কটাক্ষ করে এগিয়ে যায় বারীন কুলীদের দিকে। রগচটা কুলীর দল ভীত সন্ত্রস্ত। কিন্তু মুস্কিল বাধে ঝিনারীকে নিয়ে। বারীনের নিরর্থক দাপট দেখে সে তার পুরু ঠোঁট বাঁকিয়ে খিলখিল করে হাসে, আর তির্যক চোখে তাকিয়ে থাকে। বারীনের দাপট ঢিলে হয়ে আসে।

ঝিনারী বললে সেদিন : নিস্‌পেট্টরবাবু, তুমি সাধী করো। তোমার দিমাগ্ চটে গিয়েছে। বুঝেছো?

—ভাগ! বাজে বকুনি ছাড়বি তো কাম থেকে তোর নাম কাটিয়ে দেবো।

—কেন রে বাবুয়ান? তোমার ঘরে বিবি তো নেই আছে। সাধী করো, জল্দি জল্দি করো, কুছু গুনহা নেই হোবে।

বারীন গলায় ঝাঁজ দিয়ে বলে : ঝিনারী

—বলো, মেরে বাবুয়ান! বলে ঝিনারী বংকিম ঠামে দাঁড়িয়ে থাকে।

বারীন নিজেরই অজানিতে মুচকি হেসে চলে গেলো। ঝিনারীর বুকের পাটা দুলতে দুলতে ফুলে উঠলো।

লুংগিজলার পাহাড় ঘিরে দুপুরের শাণিত রোদ ক্রমে স্তিমিত হয়ে এলো। পাথর তেতে এখনো আগুন। গুঁড়ো পাথর-বোঝাই একটা ঝাঁকা মাথায় করে থরথর করে কাঁপছে ঝিনারী। সর্বাংগে কালি-মাখা কুচি পাথরের কণা। মুখে তৃষ্ণার ছাপ। ঢলঢলে দুটি চোখ ভস্মাচ্ছন্ন আগুনের মতো থেকে থেকে জ্বলে ওঠে। বারীন সেডের নীচে বসে নীল কাগজে কালির হরপে কলম ঠুকছে। মাণিং-সিপটের কাজের হিসেব।

সেডের কাছ ঘেঁষে তেলের গাদবাহী নোংড়া একটা নালা। রিফাইনারী থেকে গাদ-আবর্জনা বেরিয়ে আসে নালায় নালায়। তৈলাক্ত একটা পাংশুটে গন্ধে বারীন নাকের ডগাটা একবার কুঁচকে নিলে। পঞ্চাশ টাকার বিনিময়ে বিকিয়ে দিচ্ছে সে তার বনেদী জীবন। যাক্, জীবনটা এমনি করেই ক্লেদাক্ত পূতি গন্ধে ভরে যাক্।

—মেরে বাবুয়ান!

বারীন ভ্রূ উঁচিয়ে দেখলো ঝিনারী রোদের চোটে ধুকছে। কলমটা টেবিলে রেখে বারীন বললে : কি হলো, ঝিনারী? ঝিনারী—

ঝিনারীর গণ্ড বেয়ে আলকাতরার নির্ঝর। ঝাঁকা-বোঝাই পাথরগুলো ধ্বস্ করে মাটিতে ফেলে দিয়ে ঝিনারী একটা ঘূর্ণি খেয়ে নেতিয়ে পড়লো।

—ঝিনারী, ঝিনারী—আঃ, কি হলো?

বারীনের মনের গরাদে কে যেন হাতুড়ি পিটছে।

ঝিনারীর হাতের কব্জীতে হাত চালিয়ে বারীন নাড়ী দেখছে।

—মেরে বাবুয়ান।

—কি ঝিনারী, বল্!

মুহূর্তের মধ্যে ঝিনারী যেন শত-পুরুষের শক্তি নিয়ে বারীনের সামনে এসে বারীনের দুই হাতে প্রচণ্ড একটা ঝাঁকি দিয়ে বললে : মেরে জান্, করো, এক বাত্ কবুল করো। মেরে দিল্‌মে তুম্‌কে লিয়ে দেরা কঞ্জুরি আ—

বারীনের সমস্ত শরীর লজ্জায় অপমানে

আর ভয়ে শিউরে উঠলো। এত প্রতারণা জানে ঐ পাহাড়ী মেয়েটা? মূর্ছিতা ঝিনারীর একী যৌন আস্ফালন?

সজোরে দুই হাতে ঠেলে ঝিনারীকে দূরে ছুঁড়ে মারলো বারীন। মূর্ছার ভান করে চোখের জলে মৃত্যুর পথ দেখালো ঝিনারী। না, কিছুতেই বরদাস্ত করবে না বারীন। হুমড়ি খেয়ে গড়িয়ে পড়লো ঝিনারী। আবলুসের মতো কালো জমাট দেহে অজগরের মতো ফুঁপিয়ে উঠলো ঝিনারীর বুকটা। কুটিল কটাক্ষে ছোবল মেরে বারীনকে গিলে ফেলবে যেনো।

পলেক পরেই ঝাঁকাটা মাথায় নিয়ে নির্বাকে হেলতে দুলতে চলে গেলো ঝিনারী। পাহাড়ের চূড়ায় দিনান্ত। কারখানার ফটকে বলদেও সিং এক্ষুণি পাঁচটার গং বাজাবে। ডাবল্-ডেকার সাইকেলে পা ঘুরিয়ে উড়ে চলে বারীন। বিকেল। ইনসুরেন্সের দালাল বারীন রায় ইন্‌স্পেক্‌টার বারীনকে রাত্রির জন্যে নির্বাসনে পাঠাবে এবার।

রাত্রির ঝড়ের পর দিনটা কাটে মায়ার নিঃসঙ্গ নির্জীব। বেলা দশটা থেকে একটানা ঘুম, শুধু ঘুম। নেতিয়ে-পড়া স্নায়ুর রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঘুমের জোয়ার ভাটা। আলো-ঝলমল এই তমিস্রার দেশে মায়া মুক্তির আস্বাদ পায়। রাত্রির বর্বরতা থেকে নিজেকে ছিনিয়ে এনে একান্ত নিরালায় নিজে বোম হয়ে পড়ে থাকে। রাত্রিটা যেন প্রাগৈতিহাসিক। আদি বুনো রাইনোসেরাসের কটু নিঃশ্বাসে ভরপুর। দিনের সতেজ শিখায় সে রাত্রি মুছে যায় তার নৃশংস ক্ষুধা নিয়ে।

সাহাতলী মসজিদের মোল্লা সাহেব মিনারে উঠেছেন। সায়াহ্নের কাছাকাছি। দিগ্‌বলয়ের ঊর্ধ্বে মিনারের উদ্ধত নিশানের দিকে উদাস দৃষ্টি মেলে মায়া দিনান্ত দেখছে। আবার রাত্রি, আবার অভিনয়। বৃত্তাকারে অক্ষরেখায় পৃথিবীর চঙ্ক্রমণ।

কলিংবেল।......কলিংবেল।

—আসুন, মিঃ রায়। নমস্কার। বসুন।

—নমস্কার। আমার একটু দেরি হয়ে গেলো আসতে। মিসেস্ সান্যাল—

বাড়িতেই আছেন। হাঁ, আপনাকে কে পাঠিয়েছেন বলছিলেন কাল?

—ইনভ্যালি টি গার্ডেনের ম্যানেজার মিঃ বাক্‌চী।

—কি বলছিলেন তিনি আমার সম্বন্ধে?

—আপনার সম্বন্ধে তো কিছু বলেন নি তিনি? তিনি মিসেস্ সান্যালের বন্ধু—

—হাঁ, তিনি আমার বন্ধু। আমি মায়া সান্যাল। বসুন।

চমকে গেলো বারীন। ঘেমে উঠলো বারীন।

—কি লজ্জার কথা! আপনি মিসেস্ সান্যাল?

—লজ্জার কথা নয়, কাজের কথাটাই বলুন।

—কথাটা আর কিছুই নয়, আপনার তো আর টাকার হিসেব নিকেশ নেই, কয়েক হাজার টাকা যদি আমাদের কম্পেনিতে ইনসুরে করেন তো টাকাটা আর আইডল পড়ে থাকে না।

—আপনার সদিচ্ছা আছে, ধন্যবাদ। বলুন তারপর।

—তা নয়, তাহলে আমাদের মতো দালালেরাও বেঁচে যায়, এই শুধু।

—শুধু এই নয়, দেশের তাতে অনেক লাভ। দেশের লোক যত বেশী টাকা ইনসুর করবে, জাতীয় ধন-দৌলত তত বেড়ে যাবে—না, বারীন বাবু?

—নিশ্চয়ই। ওসব তো আপনি সবই জানেন।

—জানি বৈকি।

মায়ার ঠোঁটে বাঁকা হাসি। বারীন আর পেরে উঠছে না। হাতের এটাচিকেসটা সামনের টিপাইয়ের উপর রেখে সে কপালে রুমাল ঘুরিয়ে নিলো দুবার।

মায়া ফ্যানের রেগুলেটারটা আরেকটু নামিয়ে দিলে।

কফির বাটিতে চুমুক দিয়ে বারীন খানিকটা স্বস্তি পেলো। মায়ার গৃহের পারিপার্শ্বিকটা বারীনের চোখে পড়লো এবার। ঝকঝকে মসৃণ মেজে থেকে সিলিঙের বীমগুলো পর্যন্ত আধুনিক ছাঁদে তৈরী। বসবার ঘরটি কোলকাতার হালের আমদানী এ্যারিস্টোক্র্যাটদের ড্রয়িং রুমকেও হার মানিয়ে দেয়। মার্জিত রুচির ছাপ বাড়ির চাতাল থেকে ফটক ডিঙিয়ে সামনের সড়ক পর্যন্ত। কিন্তু এই টিলে বাড়িতে, এই ঐশ্বর্যের সম্ভার ঘিরে আরো আরো মানুষের গুঞ্জন শোনা যায় না কেন? কাল পরিচয়হীনা মায়াকে দেখে বারীনের মনে যে প্রশ্ন জেগেছিলো আজ তার পরিচয় পেয়েও সে প্রশ্ন বারে বারে মনকে বিব্রত করতে লাগলো। শহরতলীর নির্জন এই বাংলো-বাড়িতে আর মানুষ কোথায়?

একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞেস করবো ভাবছি, মিসেস্ সান্যাল।

—বলুন।

—এত বড় বাড়ি আপনার, কিন্তু মানুষ কি শুধু আপনার ঐ বেয়ারা আর আপনি নিজে—না আরো সব লোকজন কেউ আছে?

—এ প্রশ্নের মানে?

—মানে আর কিছু নয়, বাড়িটা বড় ফাঁকা ফাঁকা লাগছে।

—আরেকটু বসুন, যাদের নিয়ে এই বাড়ি, তারা সবাই একে একে আসবে। তাদের দেখে তখন আবার বলবেন না তো আপনার বাড়িতে এত লোক কেন?

—না না, তা নয়। তারা সবাই তেলের কলে কাজ করে বুঝি?

—তেলের কলে, আয়রণ ওয়ার্কসে, কটন-জেনিতে, টি-গার্ডেনে—সর্বত্র। মায় আপনার ইনভ্যালি টিগার্ডেনের ম্যানেজার মিঃ বাক্‌চীও আসবেন। বসুন।

—কী সৌভাগ্য, মিঃ বাক্‌চীও এখানে—এখানে আসেন?

—আসেন বৈকি, থাকেন বৈকি!

বারীনের সাদা মনে কেমন একটু খটকা লাগে। কেন এসে থাকেন মিঃ বাক্‌চী? হয়তো বন্ধুতা ছাড়া মায়ার সংগে আত্মীয়তাও আছে। থাক্‌না আত্মীয়তা। কিন্তু সে কথাটাই বা মিঃ বাগচী বারীনের কাছে গোপন করবেন কেন?

—মিঃ বাক্‌চী আপনাদের আত্মীয় বুঝি?

—হাঁ, মিঃ বাক্‌চী আমার পরম আত্মীয়। সে আত্মীয়তার সম্বল নিয়েই তো ডিগবয়ে বেঁচে আছি।

—আপনার স্বামী কখন আসবেন?

—আমার স্বামী আসবেন না।

—কেন? বাইরে গেছেন বুঝি?

মায়ার চোখে সরল সস্মিতশ্রী একটা ঝিলিক্ খেলে গেলো। বিংশ শতাব্দীর কুটিল চক্রে নিজেকে বিকিয়ে দেয়নি—কে এই তরুণ? বয়সকে ডিঙিয়ে বারীনের কৈশোর যেনো উঁকি মারছে এখনও। গ্রীক-হীরোর আদল্ তার সর্বাংগে, কিন্তু বীরভোগ্যা বসুন্ধরার কোন মাধুর্যই তার কাছে মহার্ঘ হয়ে ওঠে নি যেনো। ঋজুদেহের পেশী ভেদ করে কোন আকাঙ্খাই বুঝি বারীনের অন্তরে প্রবেশ করতে পারে নি।

—ইনসুর করতে এসে অনেক কথাই তো জমিয়ে তুলেছেন। কিন্তু কই নিজের পরিচয়টুকু তো দিলেন না এখনও?

—পরিচয় দেবার মতো কিছু নেই যে আমার। দালালী নিয়ে বাড়ি বাড়ি ফিরছি যখন, তখনই লোকে আমার পরিচয় জেনে ফেলছে। এম এ ডিগ্রির বোঝা বয়ে দালালী করে বেড়ানোর লজ্জা যে কী তা আপনাদের মতো সুখী লোকে বুঝতে পারবে না। তবু পঞ্চাশ টাকার পাথর-ভাঙা ইন্‌স্পেক্‌টার বারীন রায়কে আপনাদের কাছে পেটের দায়ে এটাচি নিয়ে ঘুরতেই হবে।

—কেন ঘুরতে হবে?

—দালালীর টাকা চাই যে। আগে ভাবতুম পেটে যখন বিদ্যে আছে ধর্ণা দিয়ে পড়ে থাক্‌লে মোটা টাকার সরকারী চাক্‌রী

মিলবেই একটা। পাবলিক সার্ভিসের পরীক্ষাগুলো তো আমার হাতের তেলোয়। কিন্তু সে-গুড়ে বালি। পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে যখন সে পথের বাইরে এসে দাঁড়ালাম তখন দেখলুম টাকাতে বাপ থেকে আরম্ভ করে আত্মীয় বন্ধু সবাই আমার পর হয়ে গেছে। টাকা চাই। বণিক-সভার মেড়ো-পায়ে তেল দিয়েছি ছটি মাস বিনে পয়সায়। কিন্তু হলো না। তাই আজ তেলের কলের গোলাম হয়ে পাথর ভাঙছি। আমাদের মতো দুর্ভাগাদের কথা আর বলেন কেন, মিসেস সান্যাল! সে যাক্—আসল কাজের কি হলো, বলুন তো?

মায়ার নাসারন্ধ্রে একটা ধীর দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো। ছক-কাটা জীবনের চোরা-বালিতে বারীন সর্বনাশের বীজ দেখতে পেয়েছে। কিন্তু সে ছকের বাইরেকার পৃথিবীতে চড়ে খাবার মতো চোখ বারীনের আছে কি?

—আচ্ছা বারীনবাবু, সোজা কথায় সব কিছু বুঝিয়ে না দিলে আপনি বোঝেন না কেন, বলুন তো?

—মানে?

—মানে, কই, আর যারা আমার কাছে আসে তারা কোন প্রশ্ন না করেও তো আমাকে চিনে নেয়। আমাকে বুঝতে তাদের এক মুহূর্তও সময় লাগে না। এত প্রশ্ন করেও আপান আমাকে একটুও বুঝেছেন কি?

বারীন মৌনী হলো। সত্যি বটে।

বেয়ারাটা দুবার এসে জানিয়ে দিয়ে গেছে পাশের ঘরে মায়ার বন্ধুরা এসে গেছে। মায়ার যেনো উঠ্‌বার কোন তাড়া নেই। কুশান থেকে উঠে দাঁড়ালো মায়া।

বললেঃ দুনিয়ায় পরাজিত শুধু আপনি একাই হননি। আরও অনেক লোক আছে যারা পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে কোথায় তলিয়ে গেছে সেটা দেখ্‌বার শক্তি আপনার নেই। নেই বলেই আমাকে বুঝতে আপনার এত সময় লাগছে।

—একথার মানে কি, মিসেস সান্যাল?

—মানে? আসুন, আমার সংগে আসুন। আমার চিরকালের পরম আত্মীয়-বন্ধুরা যারা ওঘরে বসে আছে আমার জন্যে, তাদের দেখলেই আমাকে বুঝতে পারবেন—আসুন।

সূর্য তখন পাটে।

লুংগিজলার দুই তীর বেয়ে তিন হাজার কুলি পিঁপড়ের মতো হেঁটে চলেছে। চারদিকের আকাশ চিমনীর ধোঁয়ায় ধোঁয়া-করে। বারীন সাইকেলের পেছনে পা রেখে পাথরের স্তূপে হেলান দিয়ে আছে।

ছোট্ট কালো একটা শিশুকে বুকের গরখাইয়ে চেপে ঝিনারীও চলেছে এগিয়ে। ঘরকে যাবে। অপেক্ষামান বারীনকে দেখে ঝিনারী বললেঃ মেরী লেড়কী, বাবু—দেখো।

—ক্যা? কার লেড়কী বললি?

—মেরী গো বাবু, মেরী লখিয়া!

—তোর আদ্‌মী কোথায়? কলে কাজ করে না?

—আদ্‌মীকো বাত নেহি, নিস্‌পেট্টর-বাবু। ই মেরী লেড়কী, মেরী লখিয়া, মেরে লুলো! বলে ঝিনারী বাচ্চাটার নাভির ভেতর নাক ঘষে খানিকটা আদর করে নিলো। কালো মুখটার ভেতর থেকে ঝিনারীর দাঁতগুলো যেনো আহ্লাদে বেরিয়ে আসতে চায়। বারীনের অবাক লাগে। ঝিনারীর ছেনির চোটে পাথর-ভাঙা দেখেছে সে, দেখেছে তার বাঁকা চোখের বুনো লীলা-খেলা। কিন্তু এ আবার কী? মেরী লেড়কী বলতে ওর চোখে মুখে মাতৃত্ব উপ্‌চে পড়ছে যে!

ঝিনারীর সংগে সংগে সাইকলটা হাতে রেখে হাঁটিতে শুরু করলো বারীন।

—ঝিনারী?

—ক্যা বাবুয়ান?

—তোর আদমীকে দেখিনে তো? কলে কাজ করে না বুঝি?

শুনে ঝিনারী যেন পাঁচমুখে খিলখিলিয়ে হেসে উঠলো। হাসতে হাসতে ধনুকের মতো বেঁকে গেলো সে। বললেঃ আদমী-ওদমী কুছ নেহি আছে বাবুজী। ই মেরি লেড়কিকে লিয়ে হামারে নকরি—নেহি তো হামকো কই ঝমেলা নেহি। মেরে বাবুয়ান!

—কি?

—মেরি লেড়কিকো তুমহারে গাড়ীমে চড়হাইয়ে না, বাবুজী!

—ধ্যেত্‌! সাহস দেখ না হতভাগীর! ভাগ্‌—

হতভাগী যেন বারীনকে পেয়ে বসেছে। সেদিনের কথাও বারীনের মনে থেকে থেকে খোঁচা দেয়। ঝিনারীর প্রগল্‌ভ স্বচ্ছন্দ ঠুনকো কথাগুলো ইন্সপেক্টার বারীনের ভালোই লাগে হয়তো। কিন্তু অভিজাত বারীনের সংস্কৃত রুচি ঝিনারীর দেহগন্ধী মাদকতাটা কোনমতেই যেন মেনে নিতে পারে না।

কিন্তু হলে কি হয়, লুংগিজলার বস্তিতে আর ছোটখাটো বাবুদের চুটকি মহলে বারীন আর ঝিনারীকে নিয়ে ইতিমধ্যেই গবেষণা শুরু হয়ে গেছে। উর্ধ্বতন মহলে এই সব অতি সাধারণ ঘেন্নার কথাগুলো গিয়ে পেঁছয় না এই যা বাঁচোয়া। নইলে কি যে হতো, তা ভাবতেও সুবোধ-মতি বারীনের সর্বাংগ শিউরে ওঠে।

বারীনের ধমকানীতে ঝিনারী কিন্তু একটুও ঘাবড়ে যায় নি। ডেলা-ডেলা চোখ দুটো তুলে ধরে বারীনের গা ঘেঁষে বললে সেঃ আপকো ঘরমে হামকো লে' যাইয়ে না, বাবুজী!

—কেন?

—বস্তিমে হামকো বহুত্‌ বদনামী হোতা। ও-লোক বলতা কী তুমকো আদমীকো কুঠ্‌ঠীমে ভাগ যাও। নেহি তো তুমকো জান্‌ দেনে পড়ে গা।

—বেশ তো তুই তোর আদমির কাছে চলে যা না।

—এহিতো আম আপকো পাছ, নেহি নেহি ঘাবড়াইয়ে মাত্‌—

—থাম থাম! দেবো এক চাবুকে পিঠের চামড়া তুলে। লক্কা-মার্কা মেয়ে কোথাকার! বদ্‌মায়েসির আর যায়গা পাওনি, না?

—মেরে জানু, নুরুন করো, মেরে বাবুয়ান—

বারীন আর এক মুহূর্তও বিলম্ব না করে সাইকেল চালাতে শুরু করলো। সন্ধ্যার অন্ধকার ততক্ষণে লুংগিজলার চারিদিক ঘিরে নেমে এসেছে। ছেঁড়া আঁচলটা দিয়ে লেড়কীকে জড়িয়ে বুকের তলে চেপে ধরলো ঝিনারী। অন্ধকারে ঢাকা কালো দুনিয়াটা যেন ঝিনারীর সব লজ্জা, সব বদ্‌নামী ঢেকে দিলো এবার।

বারীন ততক্ষণে লুংগিজলার বাঁক ছাড়িয়ে পীচের রাস্তায় এসে পড়েছে।

রাত্রির অন্ধকার ফুঁড়ে বর্ষার প্রকোপ।

বারীনের চোখে ঘুম নেই, মগজে প্রখর উষ্ণতা। থেকে থেকে শুধু অতীতের অদূর স্মৃতি মনের আকাশে উঁকি-ঝুঁকি মারে। ডিগবয়ের ঘোলাটে আকাশের মতোই বারীনের মন খেই-হারা উতরোল। ঢিলে বনাতের চিন্তার সোনালী তন্তু সবই যেন তালগোল পাকিয়ে গেছে। কোলকাতার স্বপ্নিল ছাত্রজীবন থেকে ডিগবয়ের পাথর-ভাঙা রূঢ় বাস্তবতা, ছকে আঁকা ঋজু পথ থেকে গোলামীর পাকচক্র—এ আজ কোথায় এসে দাঁড়ালো বারীন?

শয্যায় কণ্টকের জ্বালা। নেই, বারীনের চোখে ঘুম নেই।

মায়াকাননের চাতাল ডিঙিয়ে বারীনের উড়ন্ত মন থেকে থেকে ছোবল দিয়ে আসে। মায়া যেনো তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকে। হোক না মায়া দেহ-বেসাতিনী, নাই-বা পেলো সে মায়ার অতীতের ইতিহাস। মায়ার বর্তমান নিয়েই মায়া নবীনকে ডাকছে। আগুন নিয়ে খেলছে বটে মায়া, কিন্তু মায়ার তো তাতে কোন দুঃখ নেই? তবে?

ঝিনারীর তেল-তেলে মুখটা আবার বারীনের চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

ঝিনারী যেনো প্রচণ্ড একটা দম্‌কা হাওয়া। স্থির-গম্ভীর বারীনের নিষ্কলুষ জীবনে তার আবির্ভাব বারীনকে যেন এক ধাক্কায় চাংগা করে তুলেছে। বুকের গরথাইয়ে ঢাকা সন্তানকে বুকে চেপে ঝিনারী বারীনের নিদ্রাহীন চোখে ছোট্ট হয়ে ভাসছে। কী করবে বারীন? মায়ার মূর্তিটা তার মন থেকে বিদায় নিতে না নিতেই ঝিনারী এসে তার কৃষ্ণ দুটি বাহু তুলে বারীনকে টেনে নিতে চায়। রাত্রির অন্ধকার আরো যেনো মারমুখী হয়ে চেপে আসে। তেলের কলের ইন্সপেক্টার বারীন মায়া-কাননের ইন্স্যুরেন্সের দালাল বারীনকে কিছুতেই আর বরদাস্ত করতে পারে না। কেন এ সংঘাত?

স্তিমিত রাত্রির কুয়াশা ভেদ করে লংগি-জলার আকাশে সূর্যের রশ্মি ক্রমে ঝিকমিক করে ওঠে। ধরমরিয়ে উঠলো বারীন। মর্নি-সিম্পটের গং পড়লো।

তেলের কলে তেলটাই মুখ্য, কিন্তু বারীনের কাছে নয়। সশব্দ পাথর-ভাঙা ছাড়া বারীনের আর কিছু জানবার কথা নয়। শুধু নিরেট পাথর নিয়েই তার কারবার। সকাল থেকে পেনসিল ঠুকতে ঠুকতে তার কপালের রাজ-শিরাটা আবার টনটন করছে। ঘন ঘন স্বেদবিন্দু। বারীন তাই সার্টের পকেট থেকে রুমালটা বের করে চোখে মুখে একটিবার বুলিয়ে নিলে। এমন সময় ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে এলো ধনঞ্জয় ওভারম্যান। বারীন ধনঞ্জয়ের ঊর্ধ্বশ্বাস থেকে কিছু অনুমান করতে চেষ্টা করলো। বললে: কি হলো ধনঞ্জয়?

ধনঞ্জয় চীৎকার করে উঠলো: সর্বনাশ হয়ে গেছে। দু নম্বর সেডের কাছে পাথরের ঢিবিটা ধ্বসে গিয়ে কুলিদের উপর পড়েছে। অনেক কুলি চাপা পড়েছে।

—কী সর্বনাশ! চার্জম্যানকে পাঠিয়ে শীগ্‌গির ডাক্তারকে খবর দাও—আঃ!

—পাঠিয়ে দিয়েছি। কিন্তু কি হবে, ইন্সপেক্টারবাবু?

ভগবানকে ডাকো, ধনো।

সাইকেল চেপে ছুটে চললো বারীন। কত লোকের প্রাণ গেছে না জানি। বারীন সারা দেহে কেঁপে উঠলো। ইন্সপেক্টারী তো চুলোয় যাক্‌, জেলের ঘানি টানতে হবে এবার।

পাথর-চাপা কুলিগুলোকে টেনে এনে ফেলে রাখা হয়েছে খোলা মাঠের উপর। কারো মাথার খুলি ফেটে গেছে, কারো নাক-মুখ ছিঁড়ে গেছে, কারো বা হাত-পা থেবড়ে গেছে। কালো দেহের বাঁধন ফুঁড়ে রক্ত ঝরে জমাট বেঁধে গেছে এতক্ষণে। বিকট মর্মভেদী কাতরানিতে বারীনের কর্ণমূল পর্যন্ত থরথর করে কেঁপে উঠছে। ডাক্তার আসতে অনেক দেরি, হয়তো-বা আসবেও না। হাসপাতালে চালান দেবার কথা ভাবছে বারীন।

কিন্তু লছমন সর্দারের কোলে রক্তমাখা মাথা নেতিয়ে পড়ে আছে কে—কে ঐ মেয়েটি?

ঝিনারীর সম্বিত নেই। অবুঝ শিশুর মতো ঠোঁট কাঁপছে ঝিনারীর। আধখোলা চোখের কোল বেয়ে রক্তের ধারা গণ্ড ছুঁয়ে নেমে আসছে। লছমনকে জাপটে লোপাট হয়ে আছে সে। মুহূর্তের মধ্যে বারীনের চোখের সামনে সেদিন সন্ধ্যার ঝিনারীকে যেন দেখতে পেলো বারীন। বুকের গরু-খাইয়ে চাপা লেড়কীটা পর্যন্ত বারীনের মনে ভেসে উঠলো। "আদমী-ওদমী কুছ্‌ নেহি বাবুজী"—সে যাক্‌।

লছমন কেঁদে উঠলো: বাবুসাব!

—কিছু ভেবো না, লছমন। এক্ষুণি ডাক্তার এসে পড়বে।

কথাটা বলে বারীন নিজের রুমালটা দিয়ে ঝিনারীর মাথা ও মুখের রক্তধারাটা মুছে নিলে। দুর্ঘটনার নামে বারীন শিউরে ওঠে চিরদিন। গতানুগতিক পথের বাইরে আসাকে সে কোনদিনই সহজভাবে গ্রহণ করতে পারেনি। কিন্তু সে পথেই আজ তার বারে বারে আনাগোনা। তার কণ্ঠনালী বেয়ে বেদনার শত ক্রন্দন আজ মুখর হয়ে উঠতে চায়।

কিছুক্ষণ পরে ডাক্তার সদলবলে এলেন। মুমূর্ষদের সব হাসপাতালে পাঠানো হলো। যে ক'টা মারা গেছে, তাদের নানা-কৌশলে সরিয়ে ফেলা হলো। আহতদের মধ্যে কতকগুলোকে সেখানে রেখেই প্রাথমিক চিকিৎসা করানো হলো। দু ঘণ্টার মামলা।

ব্যাণ্ডেজ বাঁধা মাথায় ঝিনারীর যখন জ্ঞান হলো, তখন সে দেখতে পেলো তার নিজের খুপড়িতে বারীনের কোলে মাথা রেখে সে শুয়ে আছে। তার চারদিক বস্তির কুলিদের ভীড়। শতচক্ষুর করুণদৃষ্টিতে বন্দী ঝিনারীর অন্তরাত্মা শিউরে উঠলো।

আহত ঝিনারীর নির্জীব চোখে চোখ রেখে বারীন ডাকলে: কেমন আছিস্‌, ঝিনারী। ঝিনারীর শিথিল চোখ দুটো এবার প্রখর হয়ে উঠলো। মিয়ানো দৃষ্টি বিস্ফারিত করে ঝিনারী চেঁচিয়ে উঠলো: ছোড়্‌ দিজিয়ে হামকো হাত। ছোড়্‌ দিজিয়ে ইনিস্‌পেট্টরবাবু।

বারীন বিস্মিত।

এবার ঝিনারী গা ঝাড়া দিয়ে উঠলো। লছমনের গায়ে হেলান দিয়ে ক্রুদ্ধ দৃষ্টি আরো শাণিত করে বললে সেঃ হাম্‌ রাণ্ডি নেহি। রাণ্ডিকো কুঠঠিমে যানেবালা বেইমানছে ঝিনারী কভি নেই দরদ মাঙতা। যাইয়ে বাবুজি, আপকে লিয়ে কাননকা রাণ্ডি একদম ফটকমে খাড়া হুয়া হায়। যাইয়ে—যাইয়ে—

বস্তির স্যাঁতসেতে মাটির সোঁদা গন্ধে এমনিই বারীনের দম বন্ধ হয়ে আসছিলো। ঝিনারীর কথায় এবার বাণবিদ্ধ হলো বারীন।

বারীন নির্বাকে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো।

তারপর একদিন সন্ধ্যায়।

অনিচ্ছিত পদক্ষেপে বারীন মায়ার ঘরে প্রবেশ করলো। মায়া ওয়াল-ক্লকটার দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে টিকটিক শব্দের সংগে যেনো কার পদধ্বনির প্রতীক্ষা করছে। হয়তো বা বারীনের।

বারীনের দিকে একঝলক হাসি বর্ষণ করে মায়া বললেঃ এলে!

—হাঁ, এলুম মিসেস সান্যাল।

—তারপর কি ঠিক করলে শেষ পর্যন্ত? স্কুল-মাস্টারী নিয়ে দেশে ফিরে যাবে, এই তো?

—তাই যাবো। তেলের কলের ইন্সপেক্টারী আমাকে দিয়ে আর হলো না। জঘন্য আবহাওয়ায় মন আমার হাঁপিয়ে উঠেছে।

—হুঁ, তা আমি আগেই জানতাম, বারীন-বাবু। জীবনের বৈচিত্র্যকে যারা ভয় করে তাদের জন্যেই স্কুল-মাস্টারী। কিন্তু একথাটাই আমি বুঝতে পারলাম না, বারীন, এতো ভীরু তুমি কেমন করে হয়ে উঠলে? শিক্ষার এত বড় দাম্ভিকতা নিয়ে তুমি এত বড় একটা কাপুরুষ হয়ে উঠলে কেমন করে?

—মিসেস সান্যাল!

—মিসেস সান্যালকে তুমি আজো চিনতে পারোনি, বারীন। তার ইতিহাস জানবার প্রয়োজনও তোমার নেই। কিন্তু কেন তুমি আমার এ সর্বনাশ করলে?

—সর্বনাশ করেছি?

—করেছো বারীন। যাদের নিয়ে আমার এ সৌধ-নির্মাণ, যাদের পরিচয় পেয়ে তুমি ভেবেছো আমার পরিচয়ও বুঝি তুমি পেয়ে গেছো, কই, তারা তো আর আমার কাছে আসে না? বেশ তো ছিলুম ওদের নিয়ে নির্জীব বিলাসে মেতে? কেন তুমি এসে মরাগাঙে আবার বান ডাকালে? কেন, কেন?

মায়ার চোখে সত্যি বান ডাকছে।

—মিসেস সান্যাল!

—জানি, বারীন, তুমি আমার [illegible] বয়সেও ছোট। ঐশ্বর্য পেয়েছি কিন্তু নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিলুম, বারীন। ফিরে পাওয়ার সময় যদিবা এলো, তুমি এমনি করে আমাকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিও না, আমি নতুন করে বাঁচতে চাই!

বারীন মৌনবিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে বসে

রইলো কতক্ষণ। বিভীষিকা, ডিগবয়ের আকাশ বাতাস পর্যন্ত যেনো আজ বারীনকে বিভীষিকা দেখিয়ে পথ রুদ্ধ করতে চায়। বিস্মিত বিভীষিকার ঘোরটা কথঞ্চিত কাটিয়ে বারীন ধীরকণ্ঠে বললে : আমাকে ক্ষমা করুন, মিসেস সান্যাল।

—কেন ক্ষমা করবো? আমাকে জাগিয়ে দিয়ে নিজে পালিয়ে যাবে, এত সাহস তোমার সত্যি কি আছে, বারীন? যে দেহের বিনিময়ে অগাধ সোনা আমার পায়ে এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ে সে দেহ কি তোমার কাছে এতই তুচ্ছ?

মায়ার চোখে আবার সেই দেহ-বেসাতিনীর উদ্ধত আবেশ। বিলোল কটাক্ষ।

বারীন ধাঁধাঁ দেখছে যেনো। মায়া স্পর্ধিত কণ্ঠে ডাকলে এবার : বারীন!

বারীনের সম্বিত তখন না থাকারই নামান্তর। মায়ার দিকে একপলক ভীতদৃষ্টি নিক্ষেপ করে বারীন উর্ধশ্বাসে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। মায়া রুগ্ন-ক্ষুব্ধ সর্পিণীর মতো কোচের গায়ে এলিয়ে পড়লো।

পরদিন সূর্যোদয়ের পরে বারীনকে লুংগিজলার রাস্তায় আর দেখা যায়নি।

সাহিত্য-সংবাদ

শরৎস্মৃতি প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা

কানপুরে 'ভ্রাতৃসংঘ' শরৎস্মৃতি বার্ষিকী উপলক্ষ্যে প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার আহ্বান করিতেছেন। প্রবন্ধ ৩০শে জানুয়ারীর ভিতর নিম্নলিখিত ঠিকানায় প্রেরিতব্য। প্রবন্ধটি ফুলস্কেপ্ কাগজের আট পৃষ্ঠার অধিক না হওয়াই বাঞ্ছনীয় অথবা দু' হাজার শব্দের অধিক না হয়।

বিষয় :—১। শরৎ সাহিত্যে বিশেষত্ব (বাঙলা)। ২। শরৎ সাহিত্যে নারীর স্থান (হিন্দি)। দ্বিতীয় বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিতে হইলে কেবলমাত্র হিন্দি ভাষায় লিখিতে হইবে।

পুরস্কার :—দশ টাকা মূল্যের ভিতর শরৎ-চন্দ্রের রচনাবলী পৃথক্‌ভাবে বাঙলা ও হিন্দির জন্য। প্রবন্ধ পাঠাইবার ঠিকানা :—শ্রীঅনন্ত-কুমার ওহদেদার, বিভাগীয় সম্পাদক, 'ভ্রাতৃসংঘ', সেন এণ্ড কোং, দি মল; কাণপুর।

দুর্বোধ্য

শ্রীরণজিৎকুমার সেন

সৃষ্টির রহস্য বুঝি না যে।
এ প্রাণ কখনো সুরে কখনো বেসুরে বাজে।
একদিকে শুধু ভাঙা......ভাঙনের গান,
মৃত্যু......ব্যথা......দুর্দশার বিজয় আহ্বান।
অন্যদিকে পরিপূর্ণ সোনালী ধানের......
কৃষাণ মনের
প্রমূর্ত মাতাল নেশা......শান্তি মুখরতা।
—এই নিয়ে নিত্য জানি ভাগ্য-বিধাতা
ভালোমন্দে আছে মিশে স্নায়ুতে মোদের
প্রাত্যহিক অপযশ—নিন্দা—বিরোধের
অতি উর্ধ্বে।
আমরা পার্থিব শিশু শনি আর বুধে......
মিল আর অ-মিলে শুধু ধাঁধাঁ খেয়ে মরি।
দিবস শর্বরী
অবুঝ আত্মারে নিয়ে নিত্য জুঝে জুঝে
পথ খুঁজে খুঁজে
তবু এ সজাগ সৃষ্টির পাই না তো শেষ;
কঠিন দুর্বোধ্য এ যে—সেই তো অশেষ।
ক্ষণে শুনি নিশি-জাগা পেচকের ডাক,
দিনের প্রান্তে বসে' কাঁদে দাঁড়কাক
অনাগত বিপদের চিহ্ন নিয়া বুকে।
প্রাণ মরে ধুঁকে
কর্কশ কাংসমন্দ্র সে কঠিন স্বরে।
আবার চৈতিকুঞ্জে দেখি থরে থরে
ফুটেছে অসংখ্য লাল......গোলাপী আপেল,......
গেয়ে যায় বসন্তের বিমুগ্ধ কোয়েল
চুমিত বাসর-গীতি।
লাজনম্রা প্রকৃতির বুঝি না এ রীতি,
বুঝি না অন্তরে এই সৃষ্টির ধারা......
সুখ......দুঃখ......প্রণয়ের ঘোলাটে ইসারা।
কখনো কি স্বর্গে থাকি, কখনো নরকে!
এ কঠিন দুর্বোধ্যতা ভেঙে দেবে কে?

সাধনার পথ

বিষয়টি জটিল, ভগবানের সাধনার পথ বহু। কথাটা ব্যবহারিক দৃষ্টিতে আমাদের কাছে খুব উদার বলে মনে হয়। এজন্যে আমরা ঐ কথাটি লুফে নেই; কিন্তু সে কথার গভীরতা আমাদের কয় জনের কাছে কতটা উপলব্ধি হয়, এ বিষয়ে সম্পূর্ণ সন্দেহ আছে। কারণ ভগবানকে জানলে, চিনলে, বুঝলেই বিভিন্ন পথের এই ব্যবহারিক পার্থক্যের মধ্যে ঐক্যের ভাবটি আমাদের অন্তরে সত্য হয় এবং তার ফলে আমাদের চোখ বদলে যায়। দৃষ্টির উদারতা তখন সম্পূর্ণ সার্থক হয়। নাহলে পথের এই পার্থক্য খুঁটিনাটি বিচারবুদ্ধির ভার বাড়িয়ে আমাদের দৃষ্টিকে সংকীর্ণ করেই রাখে; কথার বেলা উদারতা জাহির করলেও কাজের বেলা অন্তর সাড়া দেয় না। যুক্তি বুদ্ধি আন্তরিক প্রীতির সত্যকার ভিত্তি নয়, সত্যকার সে ভিত্তি হল সমত্বের অনুভূতি। এ অনুভূতির রাজ্যে যাওয়া সকল পথে সোজা নয়। অনুভূতির রাজ্যে গেলে সে সব পথই অবশ্য এক। মানুষ সকল পথেই আমারই নীতি অনুসরণ করিতেছে,—গীতার এই উক্তির তো অন্যথা হ'তে পারে না; কিন্তু তেমনই দেবতাদের যাজনাকারীরা দেবতাদিগকে পায়, পিতৃগণের পূজকেরা পিতৃলোক লাভ করেন, ভূতযাজিগণ অনুরূপ ফল পান, এ উক্তিও তো রয়েছে ভগবান সকলের আশ্রয়, আমরা যে পথে যেমন ভাবেই চলি না কেন, একদিন না একদিন তাঁকে আমরা পাবই, একথা সত্য; কিন্তু সাধনার ক্ষেত্রে সে বিচার উঠে না; ভগবানের জন্য সাধনার প্রয়োজনে ভগবান পরোক্ষ নন, তিনি প্রত্যক্ষ। কোন রকমে গড়াতে গড়াতে তাঁর কাছে গিয়ে শেষটা পৌঁছবোই, এ যুক্তি সাধকের চিত্তকে তৃপ্ত করতে পারে না, তাঁকে এখনই চাই—ইহৈব কিল। এমন আগ্রহ যদি অন্তরে না জাগে, তবে ভগবানের জন্য সাধনার কোন প্রশ্নই উঠে না। শুধু মৌখিক উদারতা বা বাচালতাই প্রকাশ করা হয় মাত্র। এরূপ ক্ষেত্রে অনেকের মুখেই একটা মামুলী কথা শোনা যায়। এঁরা বলেন, শ্রদ্ধা করে ধর্ম কাজ করে যান, তবেই ভগবানকে পাবেন; প্রকৃতপক্ষে ভগবানকে পাওয়ার চেয়ে ধার্মিক হওয়াই এদের বিশেষ লক্ষ্য; এঁরা সোজা এইটুকু স্বীকার করতে চান না যে, ভগবানের জন্য যে কাজ করা হয়, তাই শুধু ধর্মের কাজ, ভগবানকে ছেড়ে আমার অহংকারের উপর চাপ দিয়ে যে কাজ, সেগুলো তাঁরা ধর্ম কাজ বলতে চান বলুন, তাতে ভগবানকে পাওয়া যায় না। আসল কথাটা এই যে, শ্রদ্ধা কথাটার গুরুত্বই এঁরা বুঝেন না, নিষ্ঠা কথাটা এঁরা মুখে খুব আওড়ান; কিন্তু নিষ্ঠার প্রকৃত অর্থও এঁরা জানেন না। সত্যের সঙ্গে মনের যাতে সংযোগ ঘটে এমন ভাবকেই শ্রদ্ধা বলা যেতে পারে, আর অসংশয়িতভাবে এক আশ্রয়কে ধরে থাকবার মত মনের বলকে বলা চলে নিষ্ঠা। কাজেই শ্রদ্ধা বা নিষ্ঠা এর কোন জায়গাতেই বহুর স্থান নেই। একের উদার সুরেই যখন মনকে ঘিরে রেখেছে তখনই বলা চলে আমি শ্রদ্ধা বা নিষ্ঠার বল পেয়েছি। গীতার সপ্তদশ অধ্যায়ের প্রথম দিকেই ভগবান একথা বলেছেন। আচার্য শ্রীধরের ভাষ্যও আপনারা অনেকে দেখেছেন। তিনি স্পষ্টই বলেছেন,—"ঈশ্বরপূজা বিষয়া একৈব ভবতি শ্রদ্ধা।" আমাদের শ্রদ্ধার অন্ত নেই; লৌকিক স্বার্থের জন্যে সকলের কাছে কাংলা হয়ে পড়ে আছি, যদি কিছু জুটে। ভয়ে ভয়ে সকলকেই সেলাম ঠুকে চলছি, আর একেই বলছি শ্রদ্ধা এবং ভগবানের সাধনার বেলাতেও এই জিনিষকেই সত্যনিষ্ঠ শ্রদ্ধা বলে নিজেরা দাঁড় করাচ্ছি। সাধকের শ্রদ্ধা বা সাধন পথের শ্রদ্ধা এমন ক্ষুদ্র স্বার্থের দায়ে বিকল হওয়া নয়, ভয়ে ভয়ে সকলের জয় গাওয়া নয়। সে শ্রদ্ধা হচ্ছে একের বলে বলী হয়ে সকলকে পাওয়া, বহু ভাবের মধ্যে একের ভাবময় প্রভাব দেখে ভয় কাটিয়ে যাওয়া। এই সত্যটি স্বীকার না করে বহু মত এবং বহু পথের মৌখিক প্রশস্তির পাকে পড়লে বিপদ কাটে না, সত্যকার সাধনা সম্পদের অধিকারী হওয়া যায় না এবং জীবনে সুখও জুটে না। লৌকিক শ্রদ্ধা বা তথাকথিত নিষ্ঠার বাড়াবাড়িতো কতই দেখতে পাচ্ছি; কিন্তু সত্য দৃষ্টি, একত্ববোধ, এ কতটা আমাদের মধ্যে জাগছে? যদি একটু সে বোধ জাগতো, তবে জাতির এমন দুর্গতি থাকতো না। বাইরে নিষ্ঠা এবং শ্রদ্ধার মুখোস পরে পরের রক্ত চুষে খাবার মত প্রবৃত্তির রাক্ষসী রীতি জাতির এমন দুর্দিনেও সমাজ-জীবনে দেখা যেত না। বেদনা জাগত; মানবতার একটা উচ্ছ্বাস বুকে উপচে উঠতো; খুঁটিনাটি পরিপাটি করবার ঘুঁটি আঁকড়ে পড়ে থাকা চলতো না। প্রেমের দেবতার সাড়া আমাকে নাড়াচাড়া দিতই। সুতরাং সকল পথেই হচ্ছে, আমিও ভগবানেরই সাধনা করছি, এমন ভড়ং করা আত্মপ্রবঞ্চনা করা ছাড়া আর কিছুই নয়। এমন আত্মপ্রবঞ্চনায়, দুদিনের একান্ত অনিত্য কিছু সুসার হলেও হতে পারে; কিন্তু আখেরে জয়ী হওয়া যায় না। পচা গলা এই স্বার্থের ভারই ঘাড়ে করে চলতে হয়; আর মৃত্যুকালে তা ছাড়বার মহা ভয়ই অহংকৃত খুঁটিনাটি পরিপাটির বিচারের সকল জোর নির্মূল করে আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। সত্যের আলো সোজাসুজি মনের উপর যখন এসে পড়লো, সাধক-জীবন তখন থেকে আরম্ভ হল। আমার অহংকার এই দেহকে আশ্রয় করে; দেহ যখন অনিত্য তখন, অহংকারের আশ্রয়ে আমি যত কাজ করি না কেন, তার নাম যতই ভাল দেওয়া যাক্, সবই তার অনিত্য হবে সন্দেহ নেই; সুতরাং অহংকারের পথ, দেহাভিমানীর শ্রদ্ধা, ভগবানকে পাবার পথ হতে পারে না। এই যুক্তি একটু অনুভূতিতে সত্য হ'লে বহুর সম্বন্ধে ভ্রান্তিও কেটে যায়; তখন বুঝা যায়, ভগবানের সাধনার পথ হল—এক পথ এবং সেপথ হচ্ছে যজ্ঞের পথ, অন্য কথায় আত্মনিবেদনের পথ।

আমার সব কথাই একটু জোরের সঙ্গে আসে কিন্তু কি করা যাবে, নিজের মধ্যে যে পশু-প্রবৃত্তি রয়েছে, তাতো ছাড়তে পারি না, আর তা গোপন করবার মত জোর ও প্রাণের আবেগে পড়লে এলিয়ে যায়। সেই জোরের সঙ্গেই আমাকে এক্ষেত্রে এই কথাই বলতে হয় যে, যে পথের মধ্যে ভগবানের পায়ে আত্ম-নিবেদনের ছন্দ আমার মনে স্পন্দিত হয়, সেই পথই ভগবানের সাধনার পথ। এবং ভগবানকে মানলে—জীবনে ভগবানের প্রয়োজন বোধ হলে সে প্রয়োজন সার্থক করবার অন্য কোন পথ নেই। অনেকে বলবেন, আপনার ওসব হেঁয়ালীর কথা বুঝতে পারছিনে। ভগবানের জন্যে আত্মনিবেদনের ছন্দ, আবার মনে তার স্পন্দন, এসব আবার কি? প্রথমত প্রশ্ন এই যে, ভগবানের কাছে আত্মনিবেদন করতে যাব কেন? আমি নিজে চলব, আমি এগিয়ে যাব; কারো কাছে মাথা নোয়াবো না। এর উত্তর এই যে, খুবই ভাল কথা; কিন্তু আমাকে তো আত্ম-নিবেদন করতেই হচ্ছে। না করে তো পারছি না। তবে সে আত্মনিবেদন ধনীর কাছে, মানীর কাছে প্রাণের দায়ে করছি। না করে উপায় নেই—যজ্ঞ আমি করছি। যজ্ঞ আমার ধর্ম, অগ্নি যেমন তার ধর্ম দাহিকা শক্তি ছাড়তে পারে না, তেমন আমিও আমার ধর্ম যজ্ঞের প্রবৃত্তি নিয়েই জন্মেছি তা ছাড়তে পারি না। প্রাণের দায়ে সুখের প্রয়োজনে যজ্ঞ করছি, নিজেকে বিকিয়ে দিচ্ছি প্রতি মুহূর্তে, কিন্তু প্রাণও পাচ্ছি না; সুখও বরাতে দুদিনের জন্যেও জুটছে না—'ফলরূপে পেঁচকনা ডাল ভাঙ্গি পড়ে কালরূপে সংসারেতে পক্ষ বাসা করে'—আমার ঘরের অবস্থা এই দাঁড়াচ্ছে। কাজেই যজ্ঞের চাহিদা ভিতর থেকে আসছেই, আমার যাচাই ঠিক হচ্ছে না; অন্য কথায় যজ্ঞ করতে আমার আপত্তি নেই; কিন্তু যাদের জন্য করছি তারা আমার অভাব মিটাতে পাচ্ছে না, কাজ করে চলছি, কিন্তু কাজের সার্থকতা কিছু বর্তাচ্ছে না। এখানেই মনে প্রশ্ন জাগছে—'কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম।' কোন দেবতার উদ্দেশে যজ্ঞ করলে আমার যজ্ঞ সার্থক হবে। যজ্ঞেশ্বর কে? এই যজ্ঞ-পুরুষের সন্ধান পেলেই আমার সকল প্রয়োজন মিটে, সকল যজ্ঞ সার্থক হয়। প্রাণের হবি দিয়ে এখন মরণের বাতি জ্বালছি, তখন প্রাণের সেই আকুতিতে হয় দেবতার আরতি; জীবনের আর কোন ব্যর্থতা থাকে না, পরম পুরুষার্থ লাভে প্রত্যেকটি মুহূর্ত সার্থক হয়ে উঠে; আর এমন সার্থকতা যেখানে সেখানে পরাপেক্ষারও প্রশ্ন নাই। এখানেই সব, সকল জুড়ে সেই উদার সুরই বাজছে—এমন জীবন তখন পরিপূর্ণতা পেয়েছে। যজ্ঞেতেই প্রাণ, যজ্ঞের পথেই জীবন; সাংসারিক আমাদের এই তুচ্ছ সুখের মূলেও রয়েছে সত্যরূপে সেই তত্ত্ব—তবে পুরাপুরি প্রকাশ পাচ্ছে না; সন্দেহ সংশয়ের আবরণে ঢাকা রয়েছে এই জন্যেই বিচার চলে আসছে, আর ইতর বিশেষ ঘটছে। তত্ত্ব প্রকাশ পেয়ে ইতর-বিশেষ কেটে যায়, অনুমানের ক্ষেত্রে, আভাসের ক্ষেত্রে বহু এসে পড়েছে, তত্ত্বের প্রকাশে বহুত্ববোধ থাকে না—সর্বত্র এক সত্য পরম মহিমায় প্রদীপ্ত হয়ে

উঠে এবং অসংশয়িত আত্মনিবেদনে সাধক নিত্য জীবনে প্রতিষ্ঠিত হন। সাধন তখন সফল হোল। সাক্ষাৎ সেই যজ্ঞপুরুষের সঙ্গে মনের সংযোগের পথই বাঙলার বৈষ্ণব সাধককেরা নির্দেশ করেছেন। বেদের নির্দেশিত এই যজ্ঞধর্মই মহাপ্রভুর প্রবর্তিত প্রেম ধর্মের পথে যজ্ঞপুরুষের মর্মলীলায় ছন্দিত হয়ে উঠেছে। মহাপ্রভুর অনুগামীগণ যে পথ নির্দেশ করেছেন তাতে যজ্ঞ-পুরুষের স্পর্শ মনের উপর এসে স্পন্দন তোলে, আর কীর্তন জেগে উঠে অর্থাৎ মন বুদ্ধি অহংকার সব তাঁর চরণে লুটিয়ে দিয়ে তাঁর জয়কে বরণ করে নেওয়া হয়। সব পথই তার পথ বলা এক কথা, আর সত্যকে বুকে ধরে দৈন্য বা কার্পণ্য দূর করে সকল পথের মধ্যে সেই লীলাময়ের কৃপার ইঙ্গিত প্রত্যক্ষ করা অন্য কথা। অন্য সব পরোক্ষ থেকে যায়; কিন্তু এপথে সোজাসুজি মন তাজা হয়ে উঠে, ভয় কেটে যায়। জীবনে প্রেমের প্রতিষ্ঠা হয়। এই হল আর্য ধর্ম এবং মানুষের জীবনের সার্থকতা এই পথে সহজে হতে পারে। এ পথ কাউকে বাদ দেওয়া নয়, কাউকে নিন্দা করা নয়, এ পথ সকলকে আপনার করে পাওয়ার পথ এবং সকলকে বন্দনা করার পথ। এই পথ ধরে চললে ধর্মশাস্ত্রের সার্থকতা ষোল আনা উপলব্ধি করা যায়। যিনি মধুর, সুন্দর, যিনি প্রেমময় তাঁর সঙ্গে সকল পথে যোগ ঘটে, সকল সুরে তাঁরই বাণী শোনা যায়। যেখানে সেখানে দেখতে পাই শাস্ত্র মানামানি নিয়ে হানাহানি চলছে। আমার কিছু পড়া শোনা নেই, অশাস্ত্রীয়ের সোজা আনাড়ী বুদ্ধিতে আমার কিন্তু এই মনে হয় যে, শাস্ত্র মানামানির এই হানাহানির সঙ্গে প্রকৃত শাস্ত্রজ্ঞানের কোন সম্পর্ক নেই। এ হানাহানি, এ সব বিচার, আমাদের অহঙ্কারের গ্লানি ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রকৃত শাস্ত্র মানার মানে হল শাস্ত্রের অন্তর্নিহিত তত্ত্বের অনুধ্যান। কথাটা একটু পারিভাষিক হল; এ জন্য কেউ কেউ আমার কথা ভুল বুঝতে পারেন। সুতরাং কথাটা একটু ভেঙ্গে বলার চেষ্টা করবো। কথাটা হল এই যে, মানার বিচার পরে হবে, আগে মানবার সামর্থ্য আমার কতখানি রয়েছে এটুকু বিচার করে দেখতে হয়। বিনয়ী শ্রোতারা বলবেন, ও কথা ছেড়ে দিন। শাস্ত্র ষোল আনা কে মানতে পারে? অসিত দেবল যাজ্ঞবল্ক মৈথিল পারেন নাই, আমরা তো কলির জীব; তবে যেটুকু পারি। এদের কথার উত্তরে বলবো, না ও কথা আপনাদের ঠিক হলো না; অন্তত আমার মত মূর্খের কাছে নয়। একটু মানা, আধটু মানা নয়, আমরা কিছুই মানতে পারি না। শাস্ত্র মানার পথ অন্য রকম, একটা কৌশল আছে; সে কৌশল ধরলে যাঁর কৃপায় শাস্ত্রের প্রকাশ হয়েছে, তাঁর আশ্বাসে শাস্ত্র মানা হয়ে যায়। প্রধান কথা হচ্ছে, আমরা শাস্ত্র শুনি কি না; অর্থাৎ শাস্ত্রের ভিতরে শুধু কতকগুলো কাজের বোঝাই পাই। মাষ্টারদের বেত উঁচু করাই দেখতে পাই, না সমস্ত শাস্ত্রের ভেতর দিয়ে আশ্বাসই শুনি, আর সেই আশ্বাসের সূত্রে একখানা প্রেম মাখা মুখ চিত্তে জেগে উঠে। শাস্ত্রের স্বর লহরী ডুবিয়ে ভেসে উঠে সে মুখের মাধুরী, আমার অঙ্গে অঙ্গে জাগে আনন্দ। আমি যখন গীতা পড়ি, তখন কি দেখি—যিনি অর্জুনকে অভয় দিচ্ছেন। তাঁর মুখে, তাঁর আত্মীয়তাভরা বাণীর সুরে নিজেকে ডুবিয়ে দিয়ে আমি কি তার রূপের স্পর্শ প্রতি অঙ্গে পাই? আমি যখন চণ্ডী পাঠ করি, তখন কি দেখি জগজ্জননী আর্তিনাশিনী মায়ের অমল ধবল উজ্জ্বল মুখখানা যদি এমন হয়, তবে শাস্ত্রের উপদেশ আমার অন্তরে প্রচুর হবে, আমার কর্মগত গ্লানির গণ্ডী ঘুচে যাবে। তখন আর শাস্ত্র মানার সামর্থ্যের ওজন করতে হবে না। এই ভগবৎ-বোধ জাগানাতেই শাস্ত্রার্থের প্রতিপত্তি—অন্তর্নিহিত সুরে নিজেকে জুড়ে দেওয়া। বৈষ্ণব সাধনার পথে মহাপ্রভু-প্রবর্তিত প্রেমধর্ম অনুসরণ করলে সকল শাস্ত্রের ভিতর দিয়ে অর্থের এমন প্রত্যক্ষ প্রতিপত্তি ঘটে; শাস্ত্র আর ভাষা থাকে না, দাঁড়ায় ভাবে, আর এই ভাব জমে দাঁড়ায় প্রভাবে, অন্য কথায় নামের মহিমায়, স্মরণে, তখন নিজের অভাব কেটে যায়, তিনি আমার ভার নিজের উপর নেন। এইভাবে যজ্ঞপুরুষকে পাওয়া যায় এবং অপৌরুষেয় বেদের অন্তর্নিহিত তত্ত্ব অধিগত হওয়া সম্ভব হয়। এই সত্য উপলব্ধি করেই বারাণসীধামে প্রকাশানন্দপাদের শিষ্যগণ মহাপ্রভুর চরণ বন্দনা করে বলেছেন,—'সাক্ষাৎ বেদমূর্তি তুমি সাক্ষাৎ নারায়ণ।' আর বাঙলার জগাই মাধাই গেয়েছিলেন,—'আজি সে হৈল বেদ মহাবলবন্ত'। ভদ্রমহোদয়গণ! সকল শাস্ত্রের ভিতর দিয়ে এই কথাই রয়েছে। সে কথা এই যে, আধুনিক এই যুগে ভগবানের নামের পথ ছাড়া, অন্য কোন পথেই যজ্ঞের ভাব জীবনে পাকা রকমে প্রতিষ্ঠা করা যায় না; সমাজ-জীবনে অন্য নিত্য কৃত্যের ভিতর দিয়ে যজ্ঞের সেই সুর আমরা হারিয়ে ফেলেছি। নিদারুণ স্বার্থ এবং দুরন্ত অর্থ পিপাসা, সমাজ-জীবনে সত্য হয়ে উঠেছে। এগুলো আঁকড়ে ধরে আমরা জীবনে যজ্ঞের ছন্দ স্পন্দিত করে তুলতে পারিনে। যুগের গতিকে স্বীকার করতে হবে, সে ক্ষেত্রে নিজেদের গোঁড়ামী বা জিদ্ অন্ধতা মাত্র। আমাদের বর্তমান জীবন, দেখতে দেখতে একান্ত ব্যক্তি-প্রধান হয়ে উঠছে এবং তার ফলে বিরাটরূপী সমাজের সেবার সহজ ধারা থেকে আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছি। অর্থের চাপে আত্মীয়তার গণ্ডী ক্রমে ক্রমে সংকীর্ণ হয়ে চলেছে এবং যজ্ঞ, ধর্ম, নিত্যকর্ম—এ সবই বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি-স্বার্থগত ব্যাপারে দাঁড়িয়েছে। এ যুগে এ যে হবে ঋষিরা বলেই গিয়েছেন, এবং তাঁরাই বলেছেন যে, ভগবানের নাম ছাড়া অন্য কোন সাধন-পথ এ যুগে থাকবে না। মহাপ্রভুর কৃপায় এ যুগে নাম জাগ্রত, অর্থাৎ নামের ভিতর দিয়ে ভগবানের নিজের ধাম প্রদ্যোতিত; বৈদিক প্রভৃতি যুগে মন্ত্রলিঙ্গের দ্বারা নামের এই মহিমা প্রচ্ছন্ন ছিল। সোজা-সুজি ভগবানের প্রেমের সঙ্গে মনের যোগ পাওয়া তাতে কঠিন ছিল, ভূত প্রকৃতির মধ্যে তাঁর যে শক্তি আমার প্রাণের দেহ-সম্পর্ক নিয়ে স্থূলভাবে কাজ করছে সেইটুকু পর্যন্তই যেন ধরা পড়ত, দেহের অভিমানকে ডুবিয়ে দিয়ে প্রাণের বুত্থান স্বাভাবিক ছিল না। এ পথ ও পরোক্ষ পথ—ঘোরালো পথ। যজ্ঞপুরুষের প্রেমময় বিভঙ্গীর সঙ্গে অঙ্গের যোগ নয়। এই জন্যেই ভাগবতে দেখতে পাই ঋষিরা বলেছেন, আমরা ধর্মের নামে যে সব কর্ম করছি, তাতে সোজাসুজি অসংশয়িত আশ্বাস পাচ্ছি না। কালের ভরসায় আমাদের থাকতে হচ্ছে, ফলে হ'তেও পারে নাও পারে। আমরা সোজা-সুজি জীবনে সত্যের সঙ্গে যোগ চাই; এখানেই অমৃতের আস্বাদ লাভ করব এইটি আমাদের দরকার। মহাপ্রভুর প্রেমের লীলার মহাত্ম্যে নামের ভিতর দিয়ে প্রত্যক্ষরূপে প্রেম—ভগবানের সঙ্গে আমাদের নিত্য সম্পর্ক এই বিশ্ব জীবনে প্রদ্যোতিত হ'য়ে উঠেছে; এইভাবে সকল শাস্ত্র আর সকল মন্ত্র সার্থক হয়ে উঠেছে এক নামে। এ যুগে এই পথই সহজ এবং সরল পথ আর একমাত্র পথ। অনেকেই বলেন শুনতে পাই, আপনি নামে রুচি, নামে রুচি, কেবল ঐ এক কথা বলেন, নামে রুচি কি সহজে হয়? সৎ কাজ করতে করতে, বর্ণ, আচার, ধর্ম এগুলো মানতে মানতে তবে নামে রুচি হতে পারে। আপনাদের মধ্যে যিনি এমন বুঝেছেন, তাঁর সঙ্গে আমার বিরোধ নেই, তবে আমার কথা এই যে, এ যুগে রুচি যদি কোন সাধন-পথে পেতে হয়—নামের পথেই পাওয়া সম্ভব, অন্য পথে অরুচি সত্য হয়ে উঠবে; কারণ অন্য সব পথই যজ্ঞ-বিরোধী পথ, কোন পথ ধরে চললেই আত্মনিবেদনের রস, তেমন আশ্বাস, তেমন স্পর্শ আমার পক্ষে পাওয়া সম্ভব নয়; কেবল প্রেমময় মহাপ্রভুর সাধন আত্যন্তিকভাবে হৃদয়তার পন্থায় সেই রস অযাচিতভাবে উন্মুক্ত করেছে, আর সে রস বিলিয়েছেন বাঙলার বৈষ্ণব মহাজনগণ। অন্য সব পথে নিজেকে খেটেখুটে তবে এগোতে হয়, আর সে পথ কর্কশ এবং বন্ধুর; এ পথ একেবারে তৈরী পথ, এ অর্হণ, পূজা বা যজ্ঞ ভাগবতের ভাষায় সুপ্রণীত। সুতরাং পথ এইটিই সহজ; পথ কঠিন বলে যুগবিরোধী অহঙ্কৃত অন্ধতাকে আঁকড়ে ধরে থাকলে আমাদের নিজেদেরই ঠক্‌তে হবে। তাতে শাস্ত্রের মর্যাদা বাড়ানো হবে না, সনাতন ধর্মও রক্ষা করা হবে না, পক্ষান্তরে শাস্ত্রকে লঙ্ঘনই করা হবে এবং সনাতন ধর্মের মহদাদর্শকে খাটো করা হবে। সুতরাং আসুন, যা সত্য, তাকে সহজভাবে বরণ করে নেই, সরলতার সঙ্গে এগিয়ে চলি, 'ভগবান আমাদের দরকার এবং আগে দরকার, আশু দরকার আর সে প্রয়োজন ইহ, অর্থাৎ এইখানে, এই দেহে এবং এই ঘোর কলি যুগেই। আজ ধীরে সুস্থে কাজ-কর্ম বাগিয়ে চলি, ভগবানকে পরে পাওয়া যাবে, আর এ দেহ ত্যাগ করবার পরে ভাল জন্ম ধারণ করে তাঁকে পাব, প্রকৃত-পক্ষে এ সব কোন যুক্তিই ভগবানকে চাওয়া বা পাওয়ার পথ নয়; যজ্ঞের উপায় নয়,—ঋষি নির্দেশিত সত্য নয়। ভগবানকে যে পরে পাবার ভরসায় ফেলে রাখে, ভগবানের কোন ধারই সে ধারে না এবং তার মুখে ভগবানের কথা কেবল নিজের স্বার্থ সিদ্ধ করবারই ফন্দী, আমরা সব সময়ে সোজাসুজি এত বড় অপ্রিয় সত্য অন্তর দিয়ে স্বীকার করতে পারি না, এবং এতখানি বলার জোরকে পাষণ্ডাচার বলে, অশাস্ত্রীয় উক্তি বলে নিজেদের আশ্বস্ত রাখতে চেষ্টা করি; কিন্তু অপ্রিয় হলেও এ সত্য। ভগবানকে যে চায়, সে পুরা অর্থাৎ সকলের আগে তাঁকে চায়, আশু অর্থাৎ তাড়াতাড়ি করে তাঁকে চায়, আর ইহ অর্থাৎ এখানেই তাঁকে চায়। মহাপ্রভুর প্রবর্তিত পথ ধরলে এই চাওয়া সত্য হতে পারে; এইজন্যে সেই পথই যুগোচিত সাধনার পথ।*

*'দেশ' সম্পাদকের বক্তৃতা হইতে অনুলিখিত।

তিলাঞ্জলি

সুবোধ ঘোষ

(১১)

বিপিন বললো। —ঐ দেখুন বাবু, ঐ সেই কেউটেনী।

অবনী দেখছিল—একটি বর্ষীয়সী স্ত্রীলোক ট্রাম স্টপের কাছে কপট কান্নার সুরে চীৎকার করে ভিক্ষে করছে। মাঝে মাঝে শুকনো কাঁকড়ার মত বিকৃত একটা শিশুর শরীরকে এক হাতে তুলে ধরে যেন পথিকদের উদাস দয়াবৃত্তিকে খুঁচিয়ে জাগাবার চেষ্টা করছে।

বিপিন বললো। —ওরই নাম পুনি কেওটানী।

অবনী। —আর ঐ ছেলেটিই বুঝি......

বিপিন বাবু। —হ্যাঁ, ঐ আমার টুনা।

পুনি কেওটানী ভিক্ষে করছিল। টুনার এই জীর্ণ মানবীয় আকৃতিটাই পুনির উপজীবিকা। মাঝে মাঝে মনে হয়, টুনার শরীরটা পুনির একটা ভিক্ষাপাত্র মাত্র—পথিকের হাতের কাছে তুলে ধরছে, চোখের সামনে দুলিয়ে দিচ্ছে, কখনো বা পায়ের কাছে মাটিতে পেতে দিচ্ছে। মহাজন পুনি টুনার গর্ভধারিণীকে টাকা ধার দিয়েছে—তার সুদ চাই। সুদ তুলে নিতে একটুও ত্রুটি করছে না পুনি—কারবারের নিয়মে ক্ষমা বলে কোন জিনিস নেই।

টুনার দৌলতে সুদ মন্দ আদায় হয় না। টুনার চোপ্‌সানো মাথাটা কাঁপতে থাকে, কখনো ধুঁকতে থাকে, কখনো হেঁচাকি তালে—মাঝে মাঝে গলনালী ভেদ করে একটা ক্ষীণ কান্নার শব্দ ছাড়ে। হঠাৎ কোন বিবেকবান পথিক দয়ার ঝোঁকে একটা ডবল পয়সা ছুঁড়ে ফেলে দেয়। সকাল-সন্ধ্যা পথে পথে আয়ুর এক-একটি মুহূর্ত উৎসর্গ করে টুনা যেন মাতৃঋণের সুদ শোধ করে। পুনি কৃতার্থ হয়।

অবনী বিপিনকে জিজ্ঞেসা করলো। —টুনার মা কই?

বিপিন। —সেই খবরটাই তো পাচ্ছি না বাবু। আমি শুধু ওর গর্দানটা একবার বাগে পেতে চাই। পুনিকে দুষে আর কী হবে? পুনির মত কেউটানী ডাইনীর হাতে পেটের ছেলেকে যে রাক্ষুসী ছেড়ে দিয়ে গেছে, আমি তাকে একবার দেখে নেব বাবু। একবার পেইছি কি ওর মাথাটা ছেঁচে ছেঁচে......।

বিপিন কঠোর হয়ে উঠছিল। অবনী ধমক দিল। —চুপ কর।

কিন্তু অবনী কোন কর্তব্য খুঁজে পাচ্ছিল না। কিছুক্ষণের জন্য স্তম্ভিত হয়ে পুনি কেওটানীর কীর্তি দেখছিল অবনী। বোধ হয় ঠিক এই চাক্ষুষ কীর্তিটা নয়, তার আড়ালে এক অমানুষিক অপমানের ইতিবৃত্তটা স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। একটু মনস্ক হয়ে নিয়ে অবনী আবার জিজ্ঞেসা করলো। —বিপিন?

বিপিন। —আজ্ঞে।

অবনী। —ছেলেকে চাও?

বিপিন। —হ্যাঁ বাবু।

অবনী। তাহলে পুনিকে ডাকি?

বিপিন। —হ্যাঁ বাবু।

অবনী। —তুমি ছেলেকে নিয়ে চলে যেও, আমি পুনিকে টাকা দিয়ে দেব। কেমন?

বিপিন। —না বাবু।

অবনী আশ্চর্য হয়ে তাকালো। —তার মানে? ছেলেকে নেবে না?

অপরাধীর মত বিবর্ণ মুখে বিপিন উত্তর দিল। —না।

অবনী রাগ করে বললো। —আমাকে ভুগিয়ো না বিপিন। স্পষ্ট করে বল, তুমি কি চাও।

বিপিন। —পুনিকে বলে টুনার মাকে একবার ডাকিয়ে দেন বাবু।

অবনী অপ্রস্তুতের মত প্রশ্ন-ভরা দৃষ্টি নিয়ে বিপিনের মুখের দিকে তাকিয়েছিল। ভীরু লম্পটের মত একটা নির্বাসিত লজ্জার রক্তাভ ছায়া বিপিনের মুখের ওপর যেন ক্ষণে ক্ষণে চমকে উঠছিল। কী চায় বিপিন? তার কথাবার্তার সমস্ত অর্থহীনতার আড়ালে কী যেন একটা আবেদন ছটফট করছে। অবনী হঠাৎ নিজেই লজ্জিত হয়ে পড়লো।

হাত তুলে ইসারা করে পুনি কেওটানীকে ডাকলো অবনী। পুনি কিছুক্ষণ চুপ করে, দূরে দাঁড়িয়ে শুধু তাকিয়ে রইল। তারপর আস্তে আস্তে এগিয়ে অবনীর সামনে এসে দাঁড়ালো। সশ্রদ্ধ ভয়ে মাথাটা ঝুঁকিয়ে একটা দণ্ডবৎও জানালো।

পুনি বললো। —আপনি ডাকলেন বলেই এলাম। ঐ মুখপোড়া ডাকলে আসতাম না।

পুনি বিপিনের দিকে মুখ ভেংচিয়ে একটা ধিক্কার দিল। অবনী বললো। —তুমি আমাকে চেন?

উৎসাহিতভাবে শ্রদ্ধাপ্লুত স্বরে পুনি উত্তর দিল। —আপনাকে চিনবো না বাবু? আপনার ছেলেদিগের সাথে আমাদের রোজই দেখা হয়।

বুঝতে দেরি হলো না অবনীর। কথাটা অন্য দিকে ঘুরিয়ে নেবার জন্য অবনী বললো। —এটা কিন্তু তুমি খুবই খারাপ কাজ করেছ, ছেলেটাকে এভাবে......।

পুনি কেওটানীর কানে কথাগুলি বোধ হয় পৌঁছয়নি। তার মনের ভেতর যে-প্রসঙ্গটা সাড়া দিয়ে উঠেছে, তারই প্রতিধ্বনি করে পুনি বলে উঠলো। —কংগ্রেসের ছেলেরা বলছে—ভিক্ষে করো না। আমরাও বলেছি, না করবো না। কিন্তু খেতে তো হবে।

অবনী। —ভিক্ষে করেই বা ক'দিন খাওয়া জুটবে?

পুনি। —তা জানি বাবু। ভিক্ষে করতে কি সাধ যায়? তাছাড়া আমার আবার কেউটেনীর মত রাগ। ভিক্ষে করা কি আমার মত লোকের মেজাজে সয় বাবু? ইচ্ছে করে ট্রেনের বাবুগুলোর নাকের ওপর থাবা মেরে চশমাগুলো নামিয়ে দিই। তাই হবে একদিন। তারপর গঙ্গায় ডুবে মরবো—ভবযন্ত্রণা চুকে যাবে।

পুনি অন্যমনস্ক হয়ে নিঃশব্দে কিছুক্ষণ কী ভাবলো। অস্থিসার রুক্ষ মূর্তিটা ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে এল। পুনি বললো। —তাই করবো বাবু, কংগ্রেসের ছেলেরা যা বলেছে। বড়লোকের দোরে দোরে ভিক্ষে করে লাভ নেই। ভিক্ষে দেবে না। মরণ লেখা আছে আমাদের কপালে। ওদের চালের ভাঁড়ারের দরজায় গিয়ে পড়ে থাকবো, যতক্ষণ না মরি। তাই ভাল।

পুনি কেওটানীর কোলে বসে টুনা চিঁ চিঁ করে কেঁদে উঠলো। পুনি বললো। —মর্ মর্, শীগগির মর্। রাক্ষুসে বাপের ঘরে জন্মেছিস্, মরলেই তোর শান্তি। আমারও হাড় জুড়োয়।

বিপিন অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিল। অবনী পুনিকে বাধা দিয়ে বললো। —থাক্ ওসব কথা। তুমি টুনার মাকে একবার ডেকে দাও। ওদের ছেলে ওদের হাতে দিয়ে দাও, তোমারও হাড় জুড়োক্।

—আসুন বাবু। পুনির আহ্বানে অবনী ও বিপিন পুনিকে অনুসরণ করে গরচা লেন পার হয়ে একটা গলির ভেতর গিয়ে ঢুকলো। মজুরদের একটা চা-তেলেভাজার দোকানের সামনে রাস্তার ওপর জলের কলের কাছে তিনটি তরুণ বয়সের মেয়ে হাসাহাসি করছিল। প্রত্যেকের হাতে একটি কলাই-করা থালা। প্রত্যেকেরই পরণের সাড়িগুলির পরিচ্ছন্নতা ও বাহারের কোন অভাব নেই। ঠোঙায় ভরে তেলে-ভাজা হাতে নিয়ে একটি লোক কাছেই দাঁড়িয়েছিল। লোকটার চেহারায় রসিকতার কোন চিহ্ন নেই। কিন্তু বেশ রসস্থ ভাব —গোঁপ চুমড়ে ফিক ফিক করে হাসছে। একটা মেয়ে কল থেকে এক আঁজলা জল নিয়ে লোকটার গায়ে ছিটিয়ে দিল।

হাসির রোর না থামতেই পুনি কেওটানী হাঁক দিল। —ও টুনার মা।

ওদের মধ্যে সেই মেয়েটি মুখ ফিরিয়ে তাকালো, যার মুখ এতক্ষণ দেখা যাচ্ছিল না।

পুনি একটু কঠোরভাবে আবার ডাকলো। —এস এইখানে।

এগিয়ে আসছিল টুনার মা। কপালে একটা বড় টিপ, গালভরা পান—একটি পরিপাটি রঙ্গিনী মূর্তি। এই কি টুনার মা? অবনী একটু বিস্মিত হয়ে দেখছিল। নিতান্ত ছেলেমানুষের মত চেহারা, চটুল সুন্দর এই মেয়েটিই কি বিপিনের বর্ণনার নির্দয় রাক্ষুসী? মেয়েটা এগিয়ে আসছে, যেন ঘাতকের আহ্বানে সাড়া দিয়ে। লক্ষ্য-হীন দৃষ্টি, সমস্ত চৈতন্য যেন সম্মোহিত হয়ে গেছে।

বিপিন অবশ হয়ে মাটিতে বসে পড়তে যাচ্ছিল। অবনী বাধা দিতে গিয়েই দেখলো, বিপিন দুহাতে মুখ ঢেকে ফোঁপাচ্ছে।

—সব গেল, আমার সব গেল বাবু।

অবনী,—কী গেল?

বিপিন,—দেখছেন না বাবু, ও যে বেশ্যে হয়ে গেছে। ও মরে গেছে।

অবনীর প্রথমে আশঙ্কা হয়েছিল, বিপিনের মত গোঁয়ার গেঁয়ো হঠাৎ গৃহ-ত্যাগিনী পত্নীকে মুখোমুখি পেলে একটা খুনোখুনি কাণ্ড করে না বসে। বিপিনের মেজাজ দেখে তাই মনে হতো। একটা হিংস্র বিক্ষোভকে যেন অতিকষ্টে প্রতীক্ষিত একটি মুহূর্তের জন্য এতদিন মনের মধ্যে পুষে রেখেছিল। সেই সন্ধিক্ষণ উপস্থিত। কিন্তু বিপিনের সব পৌরুষ সেই দৃশ্যের নিষ্ঠুরতায় বলির পশুর মত যেন রক্তাক্ত হয়ে লুটিয়ে পড়েছে। সহ্য করার শক্তি ফুরিয়ে গেছে।

পুনি কেওটানী একাগ্র দৃষ্টি তুলে তাকিয়েছিল বিপিনের দিকে। বিপিনের ফুঁপিয়ে-কান্নার শব্দটা পুনিকে ধীরে ধীরে বিচলিত করে তুলছিল। পর মুহূর্তে টুনার মাকে লক্ষ্য করে পুনি কেওটানী খেঁকিয়ে উঠলো। —তোমার বুদ্ধিসুদ্ধি আজও হলো না বৌ। ঐ সব নষ্ট ছুঁড়িদের রঙ্গ দেখতে নেই। যার জন্য কেঁদে কেঁদে মাথা কুটতে, সে এসেছে। ছেলে নিয়ে, সোয়ামিকে নিয়ে এইবার সুখে কর। কেওটানীকে আর গালমন্দ করো না।

বিপিনের দিকে তাকিয়ে পুনি কি বলতে গিয়ে কিছুক্ষণের জন্য থেমে রইল। বোঝা যায়, একটা ফাঁপরে পড়ে পুনি যেন সহজে কোন পথ করে নিতে পারছে না। একটু এগিয়ে এসে বিপিনের কাঁধে হাত দিয়ে কতকটা সান্ত্বনাচ্ছলে যেন পুনি বলতে লাগলো। —ও কী? পুরুষ হয়ে এ আবার কোন্ ঢঙ তোমার। ওঠ, নিজের জিনিষ নিজে বুঝে নিয়ে ঘরে যাও। পুনি কেওটানীকে আর গালমন্দ করো না।

টুনার মায়ের প্রথম হতভম্বতা দূর হয়ে গিয়ে এখন বেশ সপ্রতিভ দেখাচ্ছে। নির্বিকারভাবে দৃশ্যটা উপভোগ করছিল টুনার মা। কপালের টিপটা চিকচিক করছিল। দু'বার পানের পিক ফেললো। সহুরে ঢঙে পরা সাড়ীর আঁচলটাকে নিয়ে বার বার একটা অনভ্যস্ত অস্বস্তিতে টানা-টানি করছিল। তারই দীক্ষাদাত্রী ভ্রষ্টজীবনের অভিভাবিকা পুনি কেওটানীর কথাগুলি হঠাৎ একটা অতি গূঢ় ইঙ্গিত নিয়ে টুনার মায়ের চোখে শুধু একটা প্রখর কৌতূহল জাগিয়ে তুলেছিল। অবুঝের মত দাঁড়িয়ে থাকলেও, প্রাণপনে বুঝতে চেষ্টা করছিল টুনার মা।

বোধ হয় ভুল করে একবার মুচকে হেসে ফেলেছিল টুনার মা। পুনি কেওটানী একটু আড়াল করে ভুরু কুঁচকে ইসারায়

নেই, বেহায়ার মত আঁচলা নিয়ে লোফালুফি করছে, পানের পিক ফেলছে। পুনি কেওটানী হাত নেড়ে আবার আরও স্পষ্ট ভাবে ইসারা করলো—ঘোমটা দাও।

টুনার মা যেন জেদ করেই বিদ্রোহিনীর মত দাঁড়িয়ে রইল। পুনি কেওটানী এইবার মুখ খুলে স্পষ্ট ভাষায় অনুযোগ জানালো। —কি গো বৌ, ভিক্ষে করলেই কি ছোটলোক হয়ে যেতে হয়? দেখছো না, কে কে এসেছে। চোখের মাথা খেয়েছ না কি? বিপিনকে চিনতে পারছো না? আর এই স্বদেশী বাবুটি রয়েছেন, তবু তোমার...।

টুনার মার ঠেঁটা চেহারাটা আড়ষ্ট হয়ে এল। সবই বুঝতে পারছে সে। পুনি কেওটানী নিজেই তার ষড়যন্ত্রের জালের গিঁটগুলি একে একে খুলে আল্গা করে দিচ্ছে। আড়ালের একটা কাহিনীকে আড়ালেই শেষ করে দিয়ে, ঘরের বৌয়ের সম্ভ্রমে সাজিয়ে পুনি কেওটানী আজ টুনার মাকে মুক্ত করে দিতে চায়।

পুনি অবনীর দিকে তাকিয়ে গলার স্বর চড়িয়ে, বিনিয়ে বিনিয়ে সোৎসাহে বলছিল। —এতদিন মেয়েটা কি কান্নাটাই কেঁদেছে বাবু। খেতে চায় না, ভিক্ষে করতে চায় না। ভিক্ষে করবে কি? লোক দেখলেই ঠকঠক করে কাঁপে।

ঘটনাটা সহ্য হচ্ছিল না অবনীর। ক্ষুধা-হত একটা সংসারের প্রাণ সব বীভৎসতা ও নিষ্ঠুরতার মধ্যেও কেমন ছলেবলে আবার সুস্থ হবার চেষ্টা করছে। পুনি কেওটানীর কথার চিকিৎসাগুণে বিপিন একটু প্রকৃতিস্থ হয়েছে। টুনার মাথাটা পুনি কেওটানীর কাঁধের ওপর হেলে পড়েছে—বোধ হয় ঘুমোচ্ছে। টুনার মা মাথায় ঘোমটা তুলে দিয়েছে—সঙ্গে সঙ্গে তার রঙ্গিনী মূর্তিটার সব চটুলতা মুছে গিয়ে একটা গভীর বিষন্নতায় করুণ হয়ে উঠেছে।

টুনার মার মূর্তিটা ঘোমটা আর একটু টেনে দিয়ে একেবারে গেঁয়ো হয়ে গেল। অবনী দেখলো, টুনার মা কাঁদছে—দীর্ঘ অদর্শনের পর স্বামীকে দেখে সব গেঁয়ো মেয়ে যেভাবে আনন্দে ও অভিমানে কাঁদে।

অবনী বললো। —আমি চললাম বিপিন। এখানে পথে দাঁড়িয়ে হৈচৈ করো না। আমার বাসায় এস তোমরা।

শোনা গেল, পুনি কেওটানী বলছে—হাঁ তাই ভাল। চল বৌ, ওঠ বিপিন......।

অবনী একটু বিরক্তভাবেই অরুণাকে বলছিল। —এসব ব্যাপার নিয়ে আমার মাথা ঘামাবার সময় নেই অরুণা। চিঠিতে শিশির বাবু অনুরোধ করেছে, তাই একটু খোঁজ খবর নিতে গিয়েছিলাম। কিন্তু বিপিন-

মোটেই তা নয়। অন্ততঃ আমার বুদ্ধি কোন সমাধানের পথ খুঁজে পাচ্ছে না।

অরুণা।—সমস্যাটা কিসের?

অরুণার প্রশ্নের উত্তরে সমস্যাটা ততক্ষণে বাইরের বারান্দায় এসে উঠে দাঁড়িয়েছে। পুনি কেওটানী ডাকছিল।—বাবু, আমরা এসেছি।

সমস্যাটাকে দেখবার জন্য উৎসুক হয়েছিল সবাই—অরুণা জোছু পিসিমা। পুনির আহবান শুনতে পেয়ে সবাই এসে বারান্দায় দাঁড়ালো। পুনি উত্তেজিতভাবে চীৎকার করছিল। —আপনি মীমাংসা করে দিন বাবু। এদের দুজনারই মাথা খারাপ হয়েছে।

অরুণা জিজ্ঞাসা করলো।—কি হয়েছে?

পুনি। —ছেলেকে নিতে চাইছে না মা। না ছেলের বাপ, না ছেলের মা।

অরুণা টুনার মায়ের দিকে সন্দিগ্ধভাবে তাকিয়ে প্রশ্ন করলো। —কি গো, তুমি এরকম করছো কেন? এইবার ছেলেকে নিজের কাছে নিয়ে নাও, বুড়ি আর কত-দিন পুষবে?

অরুণার কথায় টুনার মা অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে বসে রইল।

পুনি টুনাকে কোল থেকে নামিয়ে বারান্দায় মেজের ওপর শুইয়ে দিল। পিসিমা ও জোছু একটা আর্তনাদ করে সরে এল। ইস্, এ ছেলে কি বাঁচবে?

অবনী ধৈর্য হারিয়ে বিপিনকে ধমক দিল। —তুমি স্টুপিড এতক্ষণ ছেলের জন্য হাঁউমাউ করছিলে, এখন ছেলে নিতে চাইছ না কেন?

বিপিন ঘাড় ফিরিয়ে অন্য দিকে তাকিয়ে রইল।

পুনি কেওটানী বললো। —আপনি সাক্ষী থাকুন মা, এদের ছেলেকে আমি ফিরিয়ে দিয়েছি। আমি চল্লাম।

পুনি কেওটানী চলে যাচ্ছিল। অবনী ব্যস্ত হয়ে ডাকতে যাচ্ছিল। অরুণা বাধা দিয়ে বললো। —ওকে আবার কেন?

অবনী। —ওর টাকা পাওনা আছে। তের টাকা ধার দিয়ে টুনাকে বন্ধক নিয়েছিল।

অরুণা। —যদি টাকা চাইতে আসে, তবে দিয়ে দেওয়া যাবে। ও-বুড়িকে দেখলে কেমন ভয় করে—ওকে চলে যেতে দাও।

পুনি কেওটানী ততক্ষণ অনেক দূরে চলে গিয়েছিল। অবনী সেই দিকে তাকিয়ে বড় বিড় করে বললো। —যেন পালিয়ে যাচ্ছে মনে হচ্ছে। অদ্ভুত!

সবচেয়ে আগে আর্তনাদ করলেন পিসিমা, তাঁরই চোখে দৃশ্যটা আগে ধরা পড়েছে। টুনার শরীরটা শুধু পড়েছিল মেজের ওপর। কিন্তু টুনা আর ছিল না। নিষ্প্রাণ টুনার শব মাত্র এক হাত জায়গার পবিত্রতাকে আবর্জনার মত লাঞ্ছিত করে স্থির হয়ে পড়েছিল।

সন্ধ্যে হয়ে আসছে। পিসিমা স্নান করতে চলে গেলেন। অরুণা, অবনী আর জোছু—তিনটি যন্ত্রণাক্লিষ্ট মূর্তি চুপ করে ঘরের ভেতর বসেছিল।

আলো জ্বালবার পর অরুণা প্রথম কথা বললো। —ওরা চলে গেল নাকি?

অবনী। —আমাকে আর ওসব প্রশ্ন করো না।

অরুণা। —কিন্তু শিশিরবাবু যে লিখলেন ....।

অবনী। —চেষ্টা করে দেখ, আমাকে আর এর মধ্যে ডেক না।

অরুণা যেন একটু ঠাট্টা করলো। —তুমিও হাঁপিয়ে পড়ছো দেখছি।

অবনী। —তুমি তো তাজা আছ। আমার হাঁপানি একটু লাঘব করার চেষ্টা করতে পার কি?

অরুণা উঠে গিয়ে একবার বারান্দার দিকে উঁকি দিয়ে এল।—না, ওরা যায়নি। দুজনে দুদিকে মুখ ঘুরিয়ে দুকোণে বসে আছে।

অবনী। —থাক্, ওদের ব্যাপার নিয়ে আর......।

অরুণা আশ্চর্য হলো। অবনী যেন এই ক্লিষ্ট আবহাওয়া থেকে নিজেকে মুক্ত করে একটা পরিচ্ছন্ন নিশ্বাস খুঁজছে, দূরে সরে থাকতে চাইছে। সত্যিই কি হাঁপিয়ে পড়লো অবনী?

অরুণা। —তুমি এরকম উপেক্ষা দেখাচ্ছ কেন?

অবনী। —উপেক্ষা নয়, তোমাদের ওপর রাগ হচ্ছে।

অরুণা। —কেন?

অবনী হাসলো। —তুমি জান, কত রকম কাজের দাবীতে আমি এমনিতেই পাগল হয়ে আছি। তার ওপর, দাম্পত্য প্রেমতত্ত্ব বিরহতত্ত্ব—এই সব হোম পলিটিক্সের মধ্যে মাথা ঘামাবার সুযোগ কই আমার? তুমি ইচ্ছে করলে আমাকে একটু হাল্কা করে দিতে পার অরুণা। তোমার উচিত ছিল...।

অরুণা। —হোম পলিটিক্সের ভার নেওয়া।

অবনী। —হ্যাঁ।

অরুণা। —তবে শিশিরবাবুকে চিঠি লিখে দাও, চলে আসুক্।

অবনী বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলো। —শিশিরবাবুকে? কেন?

অরুণা গুছিয়ে কোন উত্তর দিতে পারলো না।

—কেন? দ্বিতীয়বার অবনীর প্রশ্নে সচকিত হয়ে অরুণা উত্তর দিল। —ইন্দ্র কি আর এদিকে আসবে না?

অবনী। —তুমি আরও গোলমাল করে দিচ্ছ অরুণা। কথা এড়িয়ে যাচ্ছ।

অরুণা। —বিপিন আবার চলে না যায়।

অরুণা। —যাক্ চলে। তুমি বারবার ফাঁকি দিচ্ছ অরুণা।

অরুণা। —চলে গেলে কি করে হবে?

অবনী। —সৎকার সমিতিকে খবর দিয়ে দেব সকাল বেলা, মড়া তুলে নিয়ে যাবে।

অরুণা। —এর বেশী কি আর কিছু করবার নেই?

অবনী। —আর কী করবার আছে?

অরুণা। —যাক্, এসব কথা।

অবনী কাগজপত্র টেনে নিয়ে বসলো। অরুণা হেঁসেলে ঢুকবার আগে পিসিমার ঘরে উঁকি দিয়ে গেল—পিসিমা মালা জপছেন। পড়ার ঘরে উঁকি দিল—জোছু একটা খোলা বইয়ের ওপর মাথা ঠেকিয়ে ঘুমোচ্ছে। কোন সাড়া-শব্দ না করে অরুণা রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকলো।

কিকারণে যেন খুব খুশি দেখাচ্ছিল অরুণাকে। তার কল্পনার সীমানা ঘিরে কতগুলি কর্তব্য ভীড় করে আসছে। এই দায় তাকে তুলে নিতে হবে। অবনী অবনীর মত কাজে থাকুক—সেখানে এগিয়ে যাবার মত সামর্থ্য নেই তার। কিন্তু অবনীর কাজ, এযুগের কাজ। অরুণা সেখানে অরুণার মত নিশ্চয় অনেক কিছু করতে পারে। এই প্রেরণা তার অনুভব ছাপিয়ে নেমে আসছে। শিশিরবাবু লিখেছেন—বিপিন তার বউ ফিরে পেলে সে খুশি হবে। কেন খুশি হবে শিশির? যাক্, এ প্রশ্ন তুলে লাভ নেই। বিপিনের ভাঙা ঘর জোড়া দিয়ে দিতে হবে। শিশিরের অনুরোধ।

কতক্ষণ এভাবে আবিষ্টের মত বসেছিল, রাত কত গভীর হয়েছে, কিছুই বুঝতে পারেনি অরুণা। হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে অবনীর কাছে এসে বললো। —ওরা চলে গেল কি না, একবার দেখ তো?

অনিচ্ছা থাকলেও অরুণার সঙ্গেই আলো হাতে বাইরের দরজা খুলে অবনী এসে দাঁড়ালো। অবনী বললো। —ওরা চলে গেছে।

অরুণা বলে উঠলো। —না, ওরা যায়নি। বিপিন!

অরুণার ডাক শুনে বারান্দার এক কোণ থেকে ধড়ফড় করে একটা শায়িত মূর্তি উঠে বসলো। আলোটা তুলে ধরলো অবনী। টুনার মা লজ্জায় বিব্রত হয়ে ঘোম্‌টা টেনে দিল। তারই পাশে অঘোরে নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছিল বিপিন। আর এক পাশে টুনার মায়ের আঁচলটা মাটিতে বেছানো—তার ওপর টুনার শবটা যেন একটা সযত্ন আশ্রয়ে কুঁকড়ে রয়েছে।

বীভৎস! মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে অবনী ঘরে এসে ঢুকলো।

অরুণার মুখের ওপর একটা সুগভীর আনন্দের চাঞ্চল্য সুস্মিত হয়ে উঠেছিল। অরুণার ব্যস্ততা আরও বেড়ে গেল। —নাও, আর পড়তে হবে না। তাড়াতাড়ি খেয়ে শুয়ে পড়।

ক্রমশ

রঙ্গজগৎ

এলিটে রবীন্দ্রনাথের 'তাসের দেশ'

গত ১৪ই ১৫ই ও ১৬ই জানুয়ারী এবং পরে ১৮ই, ১৯শে ও ২০শে জানুয়ারী কলিকাতার এলিট প্রেক্ষাগৃহে রবীন্দ্রনাথের 'তাসের দেশে'র যে অভিনয় হয়ে গেল, নানা কারণে সে অভিনয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্রনাথের নাটক সাধারণ্যে অভিনীত হয় খুব কম; কিন্তু ঠিক মত অভিনীত হলে সে নাটক যে প্রচুর রসসৃষ্টি করতে পারে এবং জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারে, যাঁরা আলোচ্য অভিনয় দেখেছেন, তাঁরাই সে কথা স্বীকার করবেন। 'তাসের দেশ' রবীন্দ্রনাথের অন্যতম প্রসিদ্ধ কৌতুক নাটিকা। কবির জীবিতকালে তাঁর নিজের প্রযোজনায় একাধিকবার এই নাটিকাটি অভিনীত হয়ে জনসাধারণের তৃপ্তি-বিধান করেছিল। আপাত দৃষ্টিতে কৌতুক-নাটিকা হলেও "তাসের দেশে" গভীর ভাবের একটা অন্তর্নিহিত ফল্গুধারা পরিব্যাপ্ত রয়েছে। কুসংস্কারাবদ্ধ নিয়মের পূজারী মানব সমাজের উদ্দেশ্যে কবি যে লঘু ব্যঙ্গের তীরগুলো ছুঁড়েছেন, সেগুলো কঠিন আঘাত না হলেও লোককে ভাবতে শেখায়। "তাসের দেশে"র বিচিত্র অদ্ভুত সাজপোষাকের আড়ালে আলোচ্য অভিনয়ের অভিনেতা অভিনেত্রীরা নাটিকার এই গভীর অর্থকে হারিয়ে ফেলেননি দেখে আমরা সুখী হয়েছিলাম।

এলিটের অভিনয়ের যাঁরা উদ্যোক্তা ছিলেন এবং যাঁরা অভিনয়ে প্রধান অংশ গ্রহণ করেছিলেন, তাঁরা প্রায় প্রত্যেকেই কোন না কোন প্রকারে শান্তিনিকেতনের সঙ্গে বিজড়িত। তাঁদের কাছ থেকে রবীন্দ্রনাথের নাটিকার প্রকৃত রস-সমৃদ্ধ অভিনয়ই আমরা আশা করেছিলাম। নিঃসঙ্কোচে বলতে পারি যে, তাঁরা আমাদের সে আশা পূর্ণ করেছেন। এই অভিনয়টির জন্যে প্রযোজিকা শ্রীযুক্তা পার্বতী দেবী আমাদের ধন্যবাদার্হা। রবীন্দ্র সংগীতের স্বনামধন্য সুরশিল্পী বিশ্বভারতীর শ্রীযুক্ত শান্তিদেব ঘোষ নাটিকার পরিচালনায় এবং সংগীতাংশের সুর সংযোজনায় অপূর্ব কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছিলেন। সার্থক অভিনয়ের জন্য অনেকখানি কৃতিত্বই যে তাঁর প্রাপ্য সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। নাটিকাটির নৃত্যাংশের পরিকল্পনা করেছিলেন প্রসিদ্ধ কথাকলি নৃত্যশিল্পী এবং বিশ্বভারতীর ভূতপূর্ব নৃত্য-শিক্ষক শ্রীযুক্ত কেলু নায়ার। তাঁর নৃত্য পরিকল্পনা মৌলিকত্ব এবং মাধুর্যের দাবী করতে পারে। প্রসিদ্ধ যন্ত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত দক্ষিণামোহন ঠাকুরের নেতৃত্বে যন্ত্রসংগীত অভিনয়ের সংগে অপূর্ব সহযোগিতা করে মনোরম পরিবেশ সৃষ্টিতে সহায়তা করেছিল। পেশাদার অভিনেতা অভিনেত্রী না হয়েও ভদ্রঘরের ছেলেমেয়েরা সুযোগ সুবিধা পেলে যে অনেক সময় নৃত্য গীত এবং অভিনয়ে যথেষ্ট পারদর্শিতা অর্জন করতে পারে, 'তাসের দেশে'র অভিনয়ে আমরা তারও পরিচয় পেলাম। অভিনেতা অভিনেত্রীদের সঙ্ঘবদ্ধ অভিনয় প্রচেষ্টা "তাসের দেশে"র সাফল্যের মূল কারণ হলেও, কয়েকজন অভিনেতা অভিনেত্রী বিশেষ কৃতিত্বের দাবী করতে পারেন। এই প্রসঙ্গে নীচের নামগুলো বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য : শ্যাম লাহা, সুজন ঠাকুর, সরোজরঞ্জন চৌধুরী, ইন্দু রায়, প্রশান্ত রায় উত্তরা দেবী এবং সংযুক্তা সেন। নৃত্যাংশে মঞ্জুলো দত্ত এবং মঞ্জু সেন নামে দুটি ছোট বালিকা দর্শকদের যথেষ্ট আনন্দ দিয়েছিল। অলক্ষ্যে থেকে যে শিল্পীরা "তাসের দেশে"র অদ্ভুত বিচিত্র সাজপোষাকের পরিকল্পনা করেছিলেন, তাঁদের কৃতিত্বের কথা উল্লেখ না করলে বর্তমান সমালোচনা পূর্ণাঙ্গ হবে না। নৃত্য, গীত এবং অভিনয়ের মত, সাজপোষাকের বৈচিত্র্য এবং বর্ণাঢ্যও "তাসের দেশে"র সর্বাঙ্গীন সাফল্যের জন্যে অনেকাংশে দায়ী। "তাসের দেশে"র সঙ্গে প্রসিদ্ধ ফরাসী রূপকথা সিণ্ডারেলার ছায়া অবলম্বনে শ্রীক্ষিতীশ রায় রচিত 'বধূবরণ' নামক একটি নৃত্যনাট্যও অভিনীত হয়েছিল। নৃত্য গীত এবং অভিনয়ের দিক থেকে এই নৃত্য-নাট্যটির আকর্ষণও কম ছিল না। "বধূবরণে"র সংগীতাংশেরও সুর সংযোজনা করেছিলেন শ্রীযুক্ত শান্তিদেব ঘোষ। "বধূবরণে"র নৃত্যাংশে কুমারী সরস্বতী শাস্ত্রী, রাণী রায়, রাণী বসু এবং কেলু নায়ার সর্বাপেক্ষা বেশী কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছিলেন। বর্তমান অভিনয়ের উদ্যোক্তারা মাঝে মাঝে রবীন্দ্রনাথের নাটকের এইরূপে অভিনয়ের ব্যবস্থা করলে রবীন্দ্রনাথের নাট্যরসপিপাসুদের ধন্যবাদ ভাজন হবেন।

প্যারাডাইজে "শকুন্তলা"

প্রসিদ্ধ চিত্র-পরিচালক ভি, শান্তারামের পরিচালনায় তোলা বোম্বাইর নব প্রতিষ্ঠিত চিত্র-নির্মাণ প্রতিষ্ঠান রাজকমল কলা মন্দিরের প্রথম হিন্দী বাণী চিত্র শকুন্তলা কলিকাতার প্যারাডাইজ চিত্রগৃহে প্রদর্শিত হচ্ছে। অমর কবি কালিদাসের অভিজ্ঞান শকুন্তলার কাহিনীর সঙ্গে ভারতবাসী মাত্রেরই ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে। কালিদাসের এই অমর কাহিনীকেই শান্তারাম চলচ্চিত্রে রূপ দেবার চেষ্টা করেছেন। এই রূপদানে তিনি যে বহুলাংশে সাফল্য অর্জন করেছেন, সেকথা স্বীকার না করে উপায় নেই। শকুন্তলার যথাযথ প্রতিরূপ ফুটিয়ে তোলার জন্যে শান্তারামকে বহু মূল্যে দৃশ্যপটাদি নির্মাণের জন্যে প্রচুর অর্থব্যয় করতে হয়েছে। তবে সুখের বিষয় এই যে, জাঁকজমকপূর্ণ দৃশ্যপটাদি দেখিয়েই তিনি দর্শক সমাজকে বিমুগ্ধ করার চেষ্টা করেন নি; কালিদাসের নাটকের অন্তর্নিহিত ভাবকেও তিনি প্রাণরসে সঞ্জীবিত করে তোলার প্রয়াস পেয়েছেন। শকুন্তলার ভূমিকা অভিনয়ের জন্যে শান্তারাম নিজের স্ত্রী জয়শ্রী দেবীকে মনোনীত করে সুবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন। এই নবাগতা অভিনেত্রী সুদর্শনা এবং অভিনয়-পারদর্শিনী। কালিদাসের মানস-কন্যার চরিত্রটি তিনি ভালভাবে অভিনয় করতে পেরেছেন। জয়শ্রী দেবীর সামনে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ পড়ে আছে বলে মনে হয়। রাজা দুষ্মন্তের ভূমিকায় চন্দ্রমোহন আমাদের তৃপ্তি দিতে পারেন নি। তাঁর চেহারার দরুণ তাঁকে দুষ্মন্তের ভূমিকায় বেমানান বলে মনে হচ্ছিল। অন্যান্য পার্শ্বচরিত্রের অভিনয় মন্দ হয়নি। 'শকুন্তলা'র আলোক-চিত্রণ ও শব্দ গ্রহণ বেশ উচ্চাঙ্গের হয়েছে। পরিচালক শান্তারাম পরিচালনায় মাঝে মাঝে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। আমাদের বিশ্বাস শকুন্তলা বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারবে। ছবিখানির সংগীতাংশ সুপরিচালিত এবং সুগীত।

হেমলতা সম্বর্দ্ধনা

বঙ্গলক্ষ্মী পত্রিকার সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা হেমলতা ঠাকুরের ৭০ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে গত ১৪ই জানুয়ারী তাঁহাকে সম্বর্ধিত করা হইয়াছে। শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবী স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের পুত্রবধূ। তিনি সুলেখিকা এবং বহু দেশও ভ্রমণ করিয়া বিশেষ অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছেন। বাঙলার মাতৃজাতির সেবায় তাঁহার সুদীর্ঘ সাধনা দীর্ঘকাল স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। শ্রীযুক্তা হেমলতা সম্বর্ধনার উত্তরে বাঙালী জাতির সেবার আদর্শের প্রতিই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, বাঙলায় আজ বড়ই দুর্দিন সমাগত হইয়াছে। বাঙলাকে কি করিয়া পুনর্গঠন করিতে পারি, তাহাই হইবে আমাদের একমাত্র ভাবনা। যাহারা না খাইতে পাইয়া গৃহহারা হইয়াছে, তাহাদিগকে পুনরায় ঘরে ফিরাইতে হইবে। বাঙলার ধন, মান ও প্রাণরক্ষা করিতে আমাদিগকে সম্মিলিত ভাবে দাঁড়াইতে হইবে। বাঙলা দেশ মরিতে বসিয়াছে; কিন্তু বাঙালী বাঙলাকে মরিতে দিতে পারে না। দেশের সেবাই বাঙালীর এখন প্রধান ও প্রথম কর্তব্য হওয়া উচিত। আমরা তাঁহার এমন উক্তির গুরুত্ব উপলব্ধি করিতেছি এবং এই উপলক্ষে তাঁহার প্রতি আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি।

খেলাধূলা

বোম্বাই ক্রিকেট দল পরাজিত

রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার পশ্চিমাঞ্চলের ফাইনাল খেলায় বোম্বাই দল পরাজিত হইয়াছে। এই প্রতিযোগিতার সূচনা হইতে বোম্বাই দল যেভাবে একের এক দলকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করিয়াছিল, তাহাতে সকলেরই একরূপ ধারণা হয়, বোম্বাই দলই রণজি কাপ বিজয়ী হইবে। কিন্তু সেই ধারণা সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হইল। এখন অনেকেই বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন, "ক্রিকেট খেলা ভাগ্যের খেলা, ফলাফল সম্বন্ধে পূর্ব হইতে কিছুই বলা যায় না।" এই উক্তি বোম্বাই ক্রিকেট দলের ন্যায় একটি শক্তিশালী দলের পক্ষে সম্পূর্ণভাবে প্রয়োগ করা চলে না। কারণ বোম্বাই দলের এই পরাজয়ের মূলে আছে "ম্যাটিং উইকেটে খেলিবার অনভিজ্ঞতা ও দল গঠনে অদূরদর্শিতা।" রাজকোটে ক্রিকেট খেলা ম্যাটিং উইকেটে হইয়া থাকে, ইহা সকলেই জানে। সুতরাং বোম্বাই ক্রিকেট দলের প্রত্যেক খেলোয়াড়কে এইজন্য প্রস্তুত করিয়া লওয়া উচিত ছিল। সর্বাপেক্ষা আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ম্যাটিং উইকেটে "ফাস্ট বোলার" বিশেষ কার্যকরী হয়, ইহা কি বোম্বাই ক্রিকেট দল নির্বাচকমণ্ডলী জানিতেন না? হাকিমকে তাঁহারা অনায়াসে দলভুক্ত করিতে পারিতেন। ইহা না করায় অধিকাংশ স্পিন বোলারের উপর নির্ভর করিয়া দল গঠন করায় প্রতিদ্বন্দ্বী দলকে অধিক রান তুলিতে সাহায্য করিয়াছেন। দল গঠন করিতে হইলে উইকেট বিষয় চিন্তা করিতে হয়, আশা করি, বোম্বাই দলের পরিচালকগণ ইহা ভাল করিয়াই উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

পশ্চিমাঞ্চলের ফাইনাল খেলা রাজকোটে অনুষ্ঠিত হয়। বোম্বাই দলের সহিত পশ্চিম-ভারত দল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। টসে বোম্বাই দল বিজয়ী হইয়া প্রথম ব্যাটিং গ্রহণ করেন। ম্যাটিং উইকেটে খেলিতে অনভ্যস্থ বোম্বাই দলের খেলোয়াড়গণ সূচনায় মাত্র ১৩ রানে তনটি উইকেট হারান। ইহার পর মার্চেণ্ট ও আর এস মডী একত্রে খেলিয়া অবস্থার পরিবর্তন করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু তাহা শেষ পর্যন্ত সাফল্যলাভ করে না। বোম্বাই দলের প্রথম ইনিংস ২৫৫ রানে শেষ হয়। মার্চেণ্ট ৫৩ রান করিয়া আউট হন। কেবল মডী ১২৮ রান করিয়া ব্যাটিংয়ে কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। পশ্চিম-ভারত দলের জয়ন্তীলাল ও সৈয়দ আমেদের বোলিংই বিশেষ কার্যকারী হয়। ইহার পর পশ্চিম-ভারত রাজ্য দল খেলিতে আরম্ভ করে। প্রথম দুইটি উইকেট ২৮ রানে পড়িয়া যায়। কিন্তু ইহার পর পৃথিরাজ ও ওমর খাঁ একত্র হইয়া দলকে বিজয়ী করেন। কারণ ইঁহারা দুইজনে একত্রে ৩১৩ রান সংগ্রহ করেন। পৃথিরাজ ১৭৪ ও ওমর খাঁ ১৩৬ রান করেন। বোম্বাই দলের সকল বোলার প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া ইঁহাদের আউট করিতে পারেন না। পশ্চিম-ভারত দলের ৪ উইকেটে ৩৬৩ রান হইলে খেলা বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। পশ্চিম-ভারত রাজ্য দল প্রথম ইনিংসে অগ্রগামী হওয়ায় বিজয়ী হয়। খেলার ফলাফল:—

বোম্বাই দল:—২৫৫ রান (আর এস মডী ১২৮, বিজয় মার্চেণ্ট ৫৩; জয়ন্তীলাল ৭৪ রানে ৫টি ও সৈয়দ আমেদ ৭৭ রানে ৪টি উইকেট পান)।

পশ্চিম-ভারত রাজ্য দল:—৪ উইঃ ৩৬৩ রান (পৃথিরাজ ১৭৪, ওমর খাঁ ১৩৬; বিজয় মার্চেণ্ট ৫২ রানে ২টি, সারভাতে ৯৭ রানে ১টি উইকেট পান)।

বাঙালী মুষ্টিযোদ্ধাগণের সাফল্য

বেঙলী বক্সিং এসোসিয়েশন বাঙলার ক্রীড়া-জগতে মুষ্টিযুদ্ধের যুগান্তর সৃষ্টি করিতে চলিয়াছে। ইহাদের বিভিন্ন কেন্দ্রের শিক্ষিত তরুণ মুষ্টিযোদ্ধাগণ যেভাবে একের পর এক প্রতিযোগিতায় সাফল্যলাভ করিতেছেন তাহাতে ইহা বিনা দ্বিধায় বলা যায়। সুযোগ সুবিধা দিলে ব্যায়ামের সকল বিভাগেই বাঙালী ব্যায়ামবীরগণ যে অতি অল্প সময়ের মধ্যে কল্পনাতীত সাফল্য লাভ করিতে পারেন তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণও ইঁহারা দিয়াছেন। কোন একটি বিশেষ শক্তিশালী ব্যায়ামবীরকে মুষ্টিযুদ্ধ কৌশল শিক্ষা দিয়া সারা বাঙলা দেশে মুষ্টিযুদ্ধের জাগরণ আনিবার উদ্দেশ্য লইয়া ইহারা কার্যক্ষেত্রে অগ্রসর হন নাই। এসোসিয়েশন গঠনের পর হইতেই ইঁহারা দলগত বা টীম প্রতিযোগিতায় মুষ্টি-যোদ্ধাগণকে যোগদান করিতে বাধ্য করিতেছেন। কারণ ইঁহারা জানেন, ব্যক্তিবিশেষ অপেক্ষা দলের সাফল্যই অভাবনীয় প্রেরণা সঞ্চার করে। এই ধারণা যে সম্পূর্ণ ভ্রান্তিমূলক নহে, ইহা যাঁহারা ব্যায়ামের বিভিন্ন বিভাগ পরিচালনা করিয়া থাকেন তাঁহারাই ভাল করিয়া জানেন। বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় বেঙলী বক্সিং এসোসিয়েশনের মুষ্টিযোদ্ধাগণ সাফল্য লাভ করায় উৎসাহী ব্যায়ামবীরদের মধ্যে এই বিষয় বিশেষ উৎসাহ জাগিয়াছে—ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। বেঙলী বক্সিং এসোসিয়েশনের পরিচালকগণ বাঙালী মুষ্টি-যোদ্ধাদের ভারতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থানে প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য যে আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছেন ইহা ইঁহাদের কার্যাবলী হইতেই উপলব্ধি করিতে পারা যায়। ইঁহাদের উদ্দেশ্য সাফল্যমণ্ডিত হউক ইহাই আমাদের আন্তরিক কামনা।

গত ৮ই জানুয়ারী যশোহর আর এ এফ ক্লাবের সভাগণ বেঙলী বক্সিং এসোসিয়েশনকে উইংগেট কাপ মুষ্টিযুদ্ধ প্রতিযোগিতায় একটি দল প্রেরণ করিবার জন্য অনুরোধ করেন। বেঙলী বক্সিং এসোসিয়েশন সেই অনুরোধ অনুযায়ী একটি বাঙালী মুষ্টিযোদ্ধা দল প্রেরণ করেন। এই বাঙালী দলের সহিত বাঙলার বিভিন্ন স্থান হইতে আনিত আর এ এফ সৈনিক দল প্রতিযোগিতা করেন। প্রতিযোগিতার সূচনায় পর পর তিনটি লড়াইতে বাঙালী মুষ্টিযোদ্ধাগণ পরাজিত হইলে অনেকেই বাঙালী দল পরাজিত হইবে বলিয়াই কল্পনা করিতে থাকেন। কিন্তু চতুর্থ লড়াইতে তরুণ মুষ্টিযোদ্ধা ভবানী দাস উচ্চাঙ্গ নৈপুণ্যের বলে বিজয়ী হইয়া যে অবস্থার সৃষ্টি করিলেন তাহাতে পরবর্তী সকল লড়াইতেই বাঙালী মুষ্টিযোদ্ধাগণ অনায়াসে জয়লাভ করিলেন। এমন কি বিশ্বনাথ ঘোষ ফেদার ওয়েটে প্রতিদ্বন্দ্বীকে মুষ্টাঘাতে এমন জর্জরিত করিলেন যে, রেফারী দ্বিতীয় রাউণ্ডেই প্রতিযোগিতা বন্ধ করিয়া বিশ্বনাথ ঘোষকে "বিজয়ী" ঘোষণা করিতে বাধ্য হইলেন। ঠিক ইহার পরেই ওয়েল্টার ওয়েটে হিমাংশু পাল দ্বিতীয় রাউণ্ডে প্রতিদ্বন্দ্বীকে ভূতলশায়ী করিলেন। প্রতিদ্বন্দ্বী মুষ্টিযোদ্ধা প্রথম রাউণ্ডে তিনবার পড়িয়া গিয়া উঠিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, কিন্তু দ্বিতীয় রাউণ্ডের প্রথমেই হিমাংশু পালের প্রচণ্ড ঘুসি তাঁহাকে সম্পূর্ণভাবে জ্ঞানশূন্য করে। পাল "বিজয়ী" ঘোষিত হইবার পরও তিনি জ্ঞান লাভ করেন না। তাঁহাকে ধরাধরি করিয়া রিংয়ের বাহিরে লইয়া যাইতে হয়। বাঙালী মুষ্টিযোদ্ধাগণ শেষ পর্যন্ত ১৫-১১ পয়েণ্টে জয়লাভ করেন ও উইংগেট কাপ বিজয়ী হন। বাঙলার মুষ্টিজগত ইতিহাসে এই প্রথমবার বাঙালী দল প্রতিযোগিতায় দলগত হিসাবে সাফল্য লাভ করিয়া কাপ বিজয়ী হইলেন। নিম্নে প্রতিযোগিতার ফলাফল প্রদত্ত হইল:—

ফ্লাই ওয়েট:—সন্তোষ চ্যাটার্জি (বেঙলী বক্সিং এসোসিয়েশন) প্রতিদ্বন্দ্বী অনুপস্থিত হওয়ায় ওয়াক ওভার পান।

ব্যাণ্টম ওয়েট:—ভবানী দাস (বেঙলী বক্সিং এসোসিয়েশন) পয়েণ্টে এ সি হাডসনকে (আর এ এফ) পরাজিত করেন।

ফেদার ওয়েট:—বিশ্বনাথ ঘোষ (বেঙলী বক্সিং এসোসিয়েশন) টেকনিক্যাল নক আউটে এ সি ম্যাককলকে (আর এ এফ) পরাজিত করেন। রেফারী দ্বিতীয় রাউণ্ডেই প্রতি-যোগিতা বন্ধ করিয়া দেন। এল এ সি কাম্বারল্যাণ্ড (আর এ এফ) পয়েণ্টে পি বসুকে (বেঙলী বক্সিং এসোসিয়েশন) পরাজিত করেন।

লাইট ওয়েট:—ধীরেশ চৌধুরী (বেঙলী বক্সিং এসোসিয়েশন) পয়েণ্টে কর্পোরাল ব্রাডীকে (আর এ এফ) পরাজিত করেন। এ সি ওয়াটকিন্স (আর এ এফ) পয়েণ্টে ফণী সুরকে (বেঙলী বক্সিং এসোসিয়েশন) পরাজিত করেন।

ওয়েল্টার ওয়েট:—হিমাংশু পাল (বেঙলী বক্সিং এসোসিয়েশন) নক আউটে উই-লিয়ামসকে (আর এ এফ) পরাজিত করেন। পাল দ্বিতীয় রাউণ্ডেই প্রতিদ্বন্দ্বীকে ভূতল-শায়ী করেন। এল এ সি ক্রমওয়েল (আর এ এফ) পয়েণ্টে কে বারোরীকে (বেঙ্গলী বক্সিং এসোসিয়েশন) পরাজিত করেন।

লাইট হেভী ওয়েট:—শচীন বসু (বেঙ্গলী বক্সিং এসোসিয়েশন) পয়েণ্টে এল এ সি শলামনকে (আর এ এফ) পরাজিত করেন।

প্রাপ্তি স্বীকার

সুপ্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান জি, এস, এম্পোরিয়াম লিমিটেড ৪৭, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ কলিকাতা এবং স্বনামধন্য ফাউণ্টেন-পেনের কালী প্রস্তুতকারক কেমিকেল এসোসিয়েশন (কলিঃ) লিঃএর 'কাজলকালী'র সুদৃশ্য দেয়াল পঞ্জী আমরা উপহার পাইয়াছি।

সাপ্তাহিক সংবাদ

১১ই জানুয়ারী

নয়াদিল্লীর সংবাদে বলা হইয়াছে যে, মায়ু পর্বতের পশ্চিমে অগ্রগামী মিত্রবাহিনী প্রতিপক্ষের প্রবল প্রতিরোধের মুখে কতিপয় শত্রু ঘাঁটি অধিকার করিয়াছে এবং মংদ এক্ষণে মিত্রবাহিনীর অধিকারে আসিয়াছে।

জার্মান নিউজ এজেন্সীর সংবাদে বলা হইয়াছে যে, গতকল্য রাশিয়ানরা কার্চ উপদ্বীপের উত্তর অংশে সৈন্য অবতরণ করাইতে সমর্থ হয়।

জার্মান নিউজ এজেন্সী ভেরোনা হইতে জানাইয়াছে যে, আজ প্রাতে কাউণ্ট সিয়ানোকে গুলী করিয়া হত্যা করা হইয়াছে। তাঁহাকে মৃত্যু দণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছিল।

ইতালি রণাঙ্গনে ক্যাসিনোর পূর্বে শেষ জার্মান ঘাঁটি সারভারোর পতন হইয়াছে। সারভারো ক্যাসিনোর ৬ মাইল পূর্বে অবস্থিত। ক্যাসিনো রোমের ৭৫ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত।

অদ্য কলিকাতার হাসপাতালসমূহে ১৭ জন পীড়িত নিরন্নের মৃত্যু হয়।

১২ই জানুয়ারী

কলিকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ গতকল্য বালীগঞ্জের একটি গৃহ তল্লাস করিয়া মোট প্রায় ২ লক্ষ ৫৬ হাজার টাকা মূল্যের হরলিক্স ও ঔষধপত্র উদ্ধার করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। তল্লাসীর পর দুইজন স্ত্রীলোক ও একজন পুরুষকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

মস্কোতে সরকারীভাবে ঘোষিত হইয়াছে যে, লালফৌজ সার্নি অধিকার করিয়াছে।

জেনারেল ম্যাক আর্থারের হেডকোয়ার্টার্স হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, জাপানীরা ক্লম্টার অন্তরীপে অবতরণের চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু মার্কিন নৌ-সৈন্যরা তাহাদিগকে প্রতিহত করিয়াছে।

অদ্য কলিকাতার হাসপাতালসমূহে ৯ জন পীড়িত নিরন্নের মৃত্যু হয়।

১৩ই জানুয়ারী

সোভিয়েট ইস্তাহারে বলা হয় যে, শ্বেত রুশিয়া রণাঙ্গনে মোজিরের দিকে জেনারেল রকোসোভ্‌স্কির সৈন্যেরা অগ্রসর হইয়া ৪০টির অধিক জনপদ দখল করে। ভিসি রেডিওর ঘোষণায় বলা হইয়াছে যে, সোভিয়েট বাহিনী বুগ নদীর উত্তর তীরে পৌঁছিয়াছে।

আমেদাবাদের সংবাদে প্রকাশ, এই বৎসর আমেদাবাদের মিল মালিকদিগকে দশ কোটি টাকা অতিরিক্ত লাভকর হিসাবে দিতে হইবে এবং বস্ত্র ব্যবসায়ীদিগকে দিতে হইবে দুই কোটি টাকা।

অদ্য কলিকাতার হাসপাতাল সমূহে ১১ জন পীড়িত নিরন্নের মৃত্যু হয়।

১৪ই জানুয়ারী

শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতের স্বামী শ্রীযুক্ত আর এস পণ্ডিত পরলোক গমন করিয়াছেন। গত তিনমাস যাবৎ তিনি প্লুরিসিতে কষ্ট পাইতেছিলেন। গত ৯ই জুলাইর তারিখে তাঁহাকে স্বাস্থ্য ভঙ্গের দরুণ লক্ষ্ণৌ সেণ্ট্রাল জেল হইতে মুক্তি দেওয়া হয়।

বাঙলা সরকার ভারতরক্ষা আইন অনুসারে "নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য মজুদ বিরোধী আদেশ, ১৯৪৪" জারী করিয়াছেন। এই আদেশের মর্ম এই যে, পরিবারের প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তির জন্য চাউল আটা ময়দা ইত্যাদি মিলাইয়া মোট এক মণ ১৬ সের, দুই হইতে বারো বৎসর বয়স্ক প্রত্যেকের জন্য উক্ত প্রকারের খাদ্যবস্তু মোট ২৮ সের এবং বয়স নির্বিশেষে প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য চিনি এক সের মজুদ করা যাইতে পারিবে।

নয়াদিল্লীর এক সরকারী ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, গত ১৩ই জানুয়ারী রাত্রে একখানি শত্রু বিমান ভিজাগাপট্টমে আসিয়া কয়েকটি বোমা ফেলে। কোন ক্ষতি হয় নাই বা কেহ হতাহত হয় নাই।

নয়াদিল্লীর এক সংবাদে প্রকাশ, ১৯৩৯-৪০ হইতে ১৯৪৩-৪৪ পর্যন্ত ৫ বৎসরে ভারতবর্ষ দেশরক্ষা ও সরবরাহ বাবদ ১৬৪১ কোটি টাকা ব্যয় করিয়াছে।

ভারতরক্ষা আইনের ২৬ ধারা অনুসারে যাঁহাদিগকে আটক রাখা হইবে, এখন হইতে তাঁহারা বৃটেনে প্রচলিত অধিকারের অনুরূপ নূতন কতকগুলি অধিকার ভোগ করিতে পারিবেন—অদ্য 'রেস্ট্রিকসান এ্যাণ্ড ডিটেনসন অর্ডিন্যান্স' নামক ভারত সরকারের যে নূতন অর্ডিন্যান্স জারী করা হইয়াছে, তাহাতে এই কথার উল্লেখ করা হইয়াছে। এই অর্ডিন্যান্সের প্রধান কথা এই যে, ২৬ ধারার প্রয়োগ এখন হইতে স্থগিত থাকিবে। তবে ইতিপূর্বে এই ধারায় যে সব আটকের আদেশ দেওয়া হইয়াছে, তাহা বৈধ এবং অর্ডিন্যান্স জারীর তারিখে প্রদত্ত আদেশ বলিয়া গণ্য হইবে। কোন অবস্থায়ই এই আদেশ ছয় মাসের বেশী বলবৎ থাকিবে না। তবে কর্তৃপক্ষ প্রয়োজন বিবেচনা করিলে ছয়মাস অন্তর এরূপ আটকের আদেশ নূতন করিয়া দিতে পারিবেন।

অদ্য কলিকাতার হাসপাতালসমূহে ১৫ জন পীড়িত নিরন্নের মৃত্যু হয়।

নয়াদিল্লীর এক সংবাদে বলা হইয়াছে যে, আরাকান রণাঙ্গনে সমুদ্র তীরবর্তী অপেক্ষাকৃত সমতল ক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া জাপানীরা মায়ু পর্বতের বন্ধুর পাদদেশে আত্মরক্ষার অধিকতর দৃঢ় ঘাঁটির সন্ধানে সরিয়া যাইবার পর আরাকানের বৃটিশ ও ভারতীয় সৈন্যেরা মংদর অনুমান ৪ মাইল দক্ষিণে ও ভারতীয় রাস্তার দুই মাইল দক্ষিণে হিলপাড়া গ্রামে যাইয়া পৌঁছিয়াছে।

প্রিপেট জলাভূমির প্রবেশ-ঘাঁটি মোজির সোভিয়েট বাহিনী কর্তৃক অধিকৃত হইয়াছে।

১৫ই জানুয়ারী

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এয়ার কম্যাণ্ডের এক ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, বৃটিশ বিমান বাহিনী অদ্য প্রাতে মায়ু উপদ্বীপের আকাশে সাফল্যের সহিত একটি বিরাট জাপ জঙ্গী বিমান বহরের গতিরোধ করে। প্রাথমিক সংবাদে প্রতীয়মান হয় যে, আকাশ-যুদ্ধে ১৫খানি শত্রু বিমান ধ্বংস ও ছয়খানি সম্ভবত ধ্বংস হয় এবং আরও বহু বিমান ঘায়েল হয়।

অদ্য কলিকাতার হাসপাতালসমূহে ১২ জন নিরন্নের মৃত্যু হয়।

অদ্য হইতে কলিকাতায় খাদ্য রেশনিং সংক্রান্ত কার্ডগুলি বিভিন্ন রেশন দোকানে রেজিস্ট্রী করা শুরু হইয়াছে। এক সপ্তাহ ধরিয়া এই রেজিস্ট্রী কার্য চলিবে এবং আগামী ২২শে জানুয়ারী উহা সমাপ্ত হইবে। বর্তমানে ৩০ লক্ষ নরনারী রেশনিং প্রথার আমলে আসিবে; ইহার মধ্যে [illegible] হইয়াছে; আরও বিলি করা হইতেছে।

ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুলের লেডী ইলিয়ট হোস্টেলের যে-সব ছাত্রী উক্ত স্কুলের ৭ জন ছাত্র-ছাত্রীকে বহিষ্কারের আদেশের প্রতিবাদে বিগত পাঁচদিন ধরিয়া যে প্রায়োপবেশন করিতেছিলেন, অদ্য তাহা স্থগিত রাখিয়াছেন।

১৬ই জানুয়ারী

মস্কোতে সরকারীভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, ২৪শে ডিসেম্বর হইতে ১৩ই জানুয়ারী পর্যন্ত প্রথম ইউক্রেনিয়ান রণাঙ্গনে ১ লক্ষ জার্মান নিহত হইয়াছে। নভোসকোলিস্কির উত্তরে রুশরা এক নূতন অভিযান আরম্ভ করিয়াছে।

উত্তর আফ্রিকাস্থ মিত্রপক্ষীয় হেড কোয়ার্টার্স হইতে রয়টারের বিশেষ সংবাদদাতা জানাইয়াছেন যে, বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ চার্চিল গত বুধবার ফরাসী মরক্কোর মারাকাশে জেনারেল দ্য গলের সহিত সাক্ষাৎ করেন। মিঃ চার্চিল মারাকাশে থাকিয়া সম্প্রতি রোগমুক্ত হইয়াছেন।

কার্চ উপদ্বীপস্থ জার্মান ব্যূহের পশ্চাদ্ভাগে লালফৌজ নূতন সৈন্যদল নামাইয়া দিয়াছে।

অদ্য কলিকাতার হাসপাতালসমূহে ২২ জন পীড়িত নিরন্নের মৃত্যু হয়।

১৭ই জানুয়ারী

'নিউজ ক্রনিকল' পত্রিকার নয়াদিল্লীস্থিত বিশেষ সংবাদদাতা তারযোগে জানাইয়াছেন যে, পূর্ব পূর্ব বৎসরের তুলনায় এবার প্রচুর পরিমাণে ধান্য উৎপন্ন হওয়া সত্ত্বেও বাঙলার লক্ষ লক্ষ অর্ধাশনক্লিষ্ট এবং রোগ জর্জরিত জনসাধারণের নিকট অধিকতর দুর্দশা লইয়া পুনরায় দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা দেখা দিয়াছে।

দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরে মিত্রপক্ষের ইস্তাহারে প্রকাশ, মিত্রপক্ষের সৈন্যরা নিউগিনিতে সিও দখল করিয়া ভিনোর ঘাঁটির দিকে তিন মাইল অগ্রসর হইয়া গিয়াছে।

মিত্রপক্ষের দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া কম্যাণ্ডের ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, মায়ু পাহাড়ের পশ্চিমে মিত্রপক্ষের সৈন্যরা আরও কিছু অগ্রসর হইয়া মংদর তিন মাইল দক্ষিণ-পূর্বে বাগানো ও নাউংগং নামক দুইটি গ্রাম অধিকার করিয়াছে।

ম্পাদকঃ শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন সহকারী সম্পাদকঃ শ্রীসাগরময় ঘোষ

১ বর্ষ] শনিবার, ৬ই ফাল্গুন, ১৩৫০ সাল। Saturday, 19th February, 1944 [১৫শ সংখ্যা

সাময়িকপ্রসঙ্গ

ন-চাউলের দর

সম্প্রতি বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে ধান-উলের সর্বনিম্ন দর বাঁধিয়া দিবার জন্য কটি প্রস্তাব উপস্থিত করা হইয়াছিল। ই প্রস্তাবের আলোচনা প্রসঙ্গে কোন ান সদস্য এইকথা বলিয়াছিলেন যে, ধান উলের মূল্য অত্যধিক রকমে হ্রাস ইতেছে, এজন্য ঐগুলির সর্বনিম্ন দর াধিয়া দেওয়া প্রয়োজন। বাঙলার অসামরিক বিরাহ বিভাগের মন্ত্রী মিঃ সুরাবর্দী স্তাবের অন্তর্নিহিত নীতির যৌক্তিকতা ীকার করেন; তবে তিনি এই কথা বলেন , ঐরূপভাবে সর্বনিম্ন মূল্য বাঁধিয়া বার সময় এখনও আসে নাই। এই দশে সাধারণভাবে ধান চাউলের মূল্য চটা নামা উচিত বলিয়া গভর্নমেণ্ট মনে রন, বর্তমানে দর ততটা নামে নাই। তিনি হেন যে, দর আরও কিছু নামুক। প্রকৃত-ক্ষ আমরা বাঙলার বিভিন্ন অঞ্চল হইতে রূপ সংবাদ পাইতেছি, তাহাতে আমাদেরও শ্বাস এইরূপ যে, ধান চাউলের মূল্য দুই টি জেলায় কিছু নামিলেও অধিকাংশ নেই এখনও তাহা সরকারী নির্ধারিত ল্যেরও অনেক বেশী আছে। দুই একটি নে সম্প্রতি যে মূল্য হ্রাস দেখা তেছে, তাহাতে চাষীদের স্বার্থহানি টবার মত আতঙ্কের বিশেষ কোন কারণ য়াছে বলিয়া আমরা মনে করি না। আমাদের মতে ঐ মূল্য হ্রাস সাময়িক। ফাল্গুন চৈত্র মাস হইতে ধান চাউলের দর স্বভাবতই বৃদ্ধি পাইয়া থাকে; এ বৎসর উহা বৃদ্ধির আরও কারণ রহিয়াছে; আপাতত মালপত্রের গতিবিধির অন্তরায় ঘটার জন্য সাময়িকভাবে কোন কোন অঞ্চলে মূল্য হ্রাস পাইতে পারে। ঘাটতি অঞ্চলের অভাব পূরণের জন্য টান পড়িলে কিছুদিনের মধ্যেই দর আপনা হইতে বৃদ্ধি পাইবে। বস্তুত ধান চাউলের দর অত্যধিক হ্রাসের আশঙ্কার চেয়ে বৃদ্ধি পাইবার আশঙ্কাই এখনও রহিয়াছে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। বাঙলা দেশের অধিকাংশ অঞ্চলে এখন যে দর রহিয়াছে তাহা বেশই চড়া বলিতে হয়। দেশব্যাপী এত বড় একটা বিপর্যয় এবং তজ্জনিত অর্থসংকট বিপন্ন বাঙলার অধিকাংশ লোকের পক্ষেই সে দর দিয়া খাদ্যশস্য সংগ্রহ করা এখনও কঠিন রহিয়াছে। সঙ্কটকাল সম্মুখে আরও রহিয়াছে; এরূপক্ষেত্রে খাদ্যশস্য নিয়ন্ত্রণ এবং বণ্টন সম্পর্কে সরকারের বিশেষ সর্তকতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। তাহা-দিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, দেশের দুর্গতি এখনও কাটিয়া যায় নাই।

ব্যাধি ও শুশ্রূষা

বাঙলার খাদ্যাভাবের সমস্যা সাধারণভাবে কতকটা হ্রাস পাইয়াছে ইহা সত্য; কিন্তু খাদ্যাভাব বা দুর্ভিক্ষজনিত ব্যাধি পীড়ার সমস্যা এখনও জটিল আকারেই বিদ্যমান আছে। কয়েক সপ্তাহ হইল কলেরার প্রকোপ মফঃস্বলের বিভিন্ন অঞ্চলে হ্রাস পাইয়াছে বলিয়া আমরা খবর পাইতেছি; কিন্তু ম্যালেরিয়ার প্রকোপ সমানভাবেই আছে। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত প্রফুল্লরঞ্জন দাশ মহাশয় এ সম্বন্ধে একটি বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন। তিনি বলেন, কিছু দিন ছাত্রদের একটি প্রতিনিধিদল নদীয়া জেলার বিভিন্ন অঞ্চল পরিদর্শন করিয়াছেন। তাঁহারা দেখিয়াছেন যে, ঐ জেলার অধিকাংশ গ্রামের শতকরা ৯০ জন লোক ম্যালেরিয়া জ্বরে পীড়িত; ইহাদের অর্ধেক শয্যাশায়ী অবস্থায় কাল কাটাইতেছে। বর্তমানে বাঙলা দেশের অর্ধেক লোকই কোন না কোন ব্যাধিতে পীড়িত রহিয়াছে বলা চলে। এক্ষেত্রে দাশ মহাশয় নদীয়া জেলার কথাই বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়া-ছেন; কিন্তু আমাদের মনে হয়, ঢাকা, ময়মন-সিংহ, ফরিদপুর এবং রংপুরের নীলফামারী মহকুমার অবস্থাও অত্যন্তই গুরুতর। কিছু দিন হইল, সরকারী ব্যবস্থা মতে চিকিৎসার ক্ষেত্রে কুইনাইনের অভাব মিটাইবার জন্য চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে; কিন্তু প্রয়োজনের অনুপাতে তাহা মোটেই যথেষ্ট নয় এবং সাধারণের পক্ষে তাহা সর্বত্র সংগ্রহ করাও

ম্পাদকঃ শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন — সহকারী সম্পাদকঃ শ্রীসাগরময় ঘোষ

১ বর্ষ] শনিবার, ৬ই ফাল্গুন, ১৩৫০ সাল। Saturday, 19th February, 1944 [১৫শ সংখ্যা

সাময়িকপ্রসঙ্গ

ন-চাউলের দর

সম্প্রতি বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে ধান- উলের সর্বনিম্ন দর বাঁধিয়া দিবার জন্য কটি প্রস্তাব উপস্থিত করা হইয়াছিল। ই প্রস্তাবের আলোচনা প্রসঙ্গে কোন ান সদস্য এইকথা বলিয়াছিলেন যে, ধান উলের মূল্য অত্যধিক রকমে হ্রাস ইতেছে, এজন্য ঐগুলির সর্বনিম্ন দর ধিয়া দেওয়া প্রয়োজন। বাঙলার অসামরিক বরাহ বিভাগের মন্ত্রী মিঃ সুরাবর্দী স্তাবের অন্তর্নিহিত নীতির যৌক্তিকতা ীকার করেন; তবে তিনি এই কথা বলেন , ঐরূপভাবে সর্বনিম্ন মূল্য বাঁধিয়া বার সময় এখনও আসে নাই। এই দশে সাধারণভাবে ধান চাউলের মূল্য চটা নামা উচিত বলিয়া গভর্নমেণ্ট মনে রন, বর্তমানে দর ততটা নামে নাই। তিনি হেন যে, দর আরও কিছু নামুক। প্রকৃত- ক্ষ আমরা বাঙলার বিভিন্ন অঞ্চল হইতে রূপ সংবাদ পাইতেছি, তাহাতে আমাদেরও শ্বাস এইরূপ যে, ধান চাউলের মূল্য দুই কটি জেলায় কিছু নামিলেও অধিকাংশ নেই এখনও তাহা সরকারী নির্ধারিত ল্যরও অনেক বেশী আছে। দুই একটি নে সম্প্রতি যে মূল্য হ্রাস দেখা ইতেছে, তাহাতে চাষীদের স্বার্থহানি ইবার মত আতঙ্কের বিশেষ কোন কারণ য়াছে বলিয়া আমরা মনে করি না। আমাদের মতে ঐ মূল্য হ্রাস সাময়িক। ফাল্গুনে চৈত্র মাস হইতে ধান চাউলের দর স্বভাবতই বৃদ্ধি পাইয়া থাকে; এ বৎসর উহা বৃদ্ধির আরও কারণ রহিয়াছে; আপাতত মালপত্রের গতিবিধির অন্তরায় ঘটার জন্য সাময়িকভাবে কোন কোন অঞ্চলে মূল্য হ্রাস পাইতে পারে। ঘাটতি অঞ্চলের অভাব পূরণের জন্য টান পড়িলে কিছুদিনের মধ্যেই দর আপনা হইতে বৃদ্ধি পাইবে। বস্তুত ধান চাউলের দর অত্যধিক হ্রাসের আশঙ্কার চেয়ে বৃদ্ধি পাইবার আশঙ্কাই এখনও রহিয়াছে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। বাঙলা দেশের অধিকাংশ অঞ্চলে এখন যে দর রহিয়াছে তাহা বেশই চড়া বলিতে হয়। দেশব্যাপী এত বড় একটা বিপর্যয় এবং তজ্জনিত অর্থসঙ্কট বিপন্ন বাঙলার অধিকাংশ লোকের পক্ষেই সে দর দিয়া খাদ্যশস্য সংগ্রহ করা এখনও কঠিন রহিয়াছে। সঙ্কটকাল সম্মুখে আরও রহিয়াছে; এরূপক্ষেত্রে খাদ্যশস্য নিয়ন্ত্রণ এবং বণ্টন সম্পর্কে সরকারের বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। তাহা- দিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, দেশের দুর্গতি এখনও কাটিয়া যায় নাই।

ব্যাধি ও শুশ্রূষা

বাঙলার খাদ্যাভাবের সমস্যা সাধারণভাবে কতকটা হ্রাস পাইয়াছে ইহা সত্য; কিন্তু খাদ্যাভাব বা দুর্ভিক্ষজনিত ব্যাধি পীড়ার সমস্যা এখনও জটিল আকারেই বিদ্যমান আছে। কয়েক সপ্তাহ হইল কলেরার প্রকোপ মফঃস্বলের বিভিন্ন অঞ্চলে হ্রাস পাইয়াছে বলিয়া আমরা খবর পাইতেছি; কিন্তু ম্যালেরিয়ার প্রকোপ সমানভাবেই আছে। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত প্রফুল্লরঞ্জন দাশ মহাশয় এ সম্বন্ধে একটি বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন। তিনি বলেন, কিছু দিন ছাত্রদের একটি প্রতিনিধিদল নদীয়া জেলার বিভিন্ন অঞ্চল পরিদর্শন করিয়াছেন। তাঁহারা দেখিয়াছেন যে, ঐ জেলার অধিকাংশ গ্রামের শতকরা ৯০ জন লোক ম্যালেরিয়া জ্বরে পীড়িত; ইহাদের অর্ধেক শয্যাশায়ী অবস্থায় কাল কাটাইতেছে। বর্তমানে বাঙলা দেশের অর্ধেক লোকই কোন না কোন ব্যাধিতে পীড়িত রহিয়াছে বলা চলে। এক্ষেত্রে দাশ মহাশয় নদীয়া জেলার কথাই বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়া- ছেন; কিন্তু আমাদের মনে হয়, ঢাকা, ময়মন- সিংহ, ফরিদপুর এবং রংপুরের নীলফামারী মহকুমার অবস্থাও অত্যন্তই গুরুতর। কিছু দিন হইল, সরকারী ব্যবস্থা মতে চিকিৎসার ক্ষেত্রে কুইনাইনের অভাব মিটাইবার জন্য চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে; কিন্তু প্রয়োজনের অনুপাতে তাহা মোটেই যথেষ্ট নয় এবং সাধারণের পক্ষে তাহা সর্বত্র সংগ্রহ করাও

সহজ হইতেছে না। এ সমস্যার সমাধান করা খুব সহজ নয়; বাঙলা দেশের ম্যালেরিয়াপীড়িতের স্বাভাবিক হারও কম নয় এবং বর্তমান বৎসরে সে হার প্রায় দশগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। অবিলম্বে এই অবস্থার প্রতীকারের জন্য ব্যবস্থা অবলম্বিত না হইলে দুর্ভিক্ষজনিত সমস্যা সমাধানে সরকারী আমন শস্য সংগ্রহ প্রভৃতি যত নীতি আছে, কোনটিই ভবিষ্যতের বিপর্যয়জনিত আতঙ্ক প্রতিহত করিতে সমর্থ হইবে বলিয়া আমাদের মনে হয় না। এ সমস্যার প্রতিকার করিতে হইলে সামরিক ক্ষিপ্রতা এবং তৎপরতা অবলম্বন করা প্রয়োজন; কারণ যুদ্ধের সমস্যার চেয়ে এ সমস্যা কম গুরুতর নয়। এজন্য গ্রামে গ্রামে শুশ্রূষা-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত করা দরকার; কিন্তু তেমন কতকগুলি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করিলেই কর্তব্য শেষ হইবে না; সেগুলি পরিচালনা করিবার জন্য উপযুক্ত চিকিৎসক এবং সততাসম্পন্ন কর্মচারী ও সেবাব্রতী কর্মীদের প্রয়োজন। বাঙলার মন্ত্রী শ্রীযুত পুলিনবিহারী মল্লিক পল্লীর এইসব দুঃস্থদের সেবার দিকে চিকিৎসকদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়া সম্প্রতি একটি বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। আমরা সংবাদপত্রে তাঁহার বক্তৃতার রিপোর্ট দেখিতে পাইলাম। এ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, বাঙলা দেশে সেবাব্রতী কর্মীর অভাব নাই; কিন্তু আমলাতান্ত্রিক আবহাওয়ার মধ্যে তাঁহাদের পক্ষে কাজ করা কঠিন। এই দিক হইতে বঙ্গীয় মেডিক্যাল কো-অর্ডিনেশন কমিটি সম্প্রতি যে উদ্যমে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাহা সমধিক আশাপ্রদ; কিন্তু বিভিন্ন সেবাসমিতিগুলিকে সংহত করিয়া দুর্গতের রক্ষা কার্য সার্থক করিতে হইলে সরকারী সহযোগিতারও প্রয়োজন এবং পরাধীন এদেশের সমস্যা এইখানেই। যাঁহারা এই শ্রেণীর সেবাব্রতী কর্মী, তাঁহারা অনেকেই স্বদেশপ্রেমিক এবং সেই দিক হইতে রাজনীতিকবোধ সম্পন্ন। দেশের বর্তমান এই সংকটে তাঁহারা প্রয়োজন হইলে দলগত রাজনীতি দূরে রাখিয়াও দেশের সেবাকার্যের জন্য আত্মনিয়োগ করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না, ইহা আমরা বিশেষভাবেই জানি; কিন্তু সরকার ইঁহাদের সম্বন্ধে নিজেদের মনকে রাজনীতিক বন্ধসংস্কার হইতে মুক্ত করিতে পারিবেন কি এবং উদারতার দৃষ্টি অবলম্বন করিয়া ইঁহাদের সহযোগিতা লাভ করিতে অগ্রসর হইবেন কি? বাঙলার যেসব স্বদেশসেবক কর্মী কারাগারে অবরুদ্ধ আছেন, তাঁহাদিগকে মুক্তিদান করিয়া সরকার যদি এ কাজে অগ্রসর হন, তবে তাঁহাদের কর্মপ্রণালীর বাস্তব প্রয়োগের ক্ষেত্রে সততা সুনিশ্চিত হইতে পারে এবং জনসাধারণের প্রতি হৃদ্যতা ও সহানুভূতির পথে বর্তমানের এই ব্যাপক সমস্যার সমাধানও সহজ হয়। আমরা দেখিলাম, আলীপুর প্রেসিডেন্সী জেলের ৩০ জন বিনা বিচারে আটক রাজনীতিক বন্দী মুক্তিলাভ করিলে দেশের সেবাকার্যে সরকারের সহযোগিতা করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন; কিন্তু বাঙলার প্রধান মন্ত্রী তাঁহাদিগকে সেক্ষেত্রেও মুক্তি দিতে অসামর্থ্য জ্ঞাপন করিয়াছেন। প্রধান মন্ত্রীর এক্ষেত্রে ক্ষমতা কতটা সীমাবদ্ধ আমরা তাহা বুঝি; তথাপি এ অবস্থা আমাদের মনে নৈরাশ্যেরই সঞ্চার করিয়াছে।

রেশনিং ব্যবস্থা

কলিকাতা শহরে রেশনিং ব্যবস্থা ভালভাবেই চলিতেছে বলা যায়। চাউলের সম্বন্ধে অভিযোগই এখন প্রধান রহিয়াছে; আমরা আশা করি, অবস্থা গোছাইয়া লইবার সঙ্গে সঙ্গে কর্তৃপক্ষ কলিকাতাতেও এ সম্বন্ধে বোম্বাইয়ের অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন। বোম্বাইতে তিন রকম চাউল বরাদ্দ প্রধানুযায়ী সরবরাহ করা হইয়া থাকে; মূল্যের কিছু তারতম্য আছে; ক্রেতারা মূল্য দিয়া নিজেদের পছন্দমত চাউল লইতে পারে। বোম্বাইতে যদি এরূপ ব্যবস্থা প্রবর্তন করা সম্ভব হইতে পারে, তবে খাস ভারত সরকারের কর্তৃত্বাধীনে কলিকাতাতেও সে ব্যবস্থা কেন প্রবর্তন করা সম্ভব হইবে না, আমরা বুঝি না। যে অঞ্চলের জন্য রেশনিং ব্যবস্থা বরাদ্দ খাদ্যশস্য যাহাতে সে অঞ্চলের উপযোগী হয়, সরবরাহ ব্যাপারে প্রথমে সেই দিকে দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। আমরা দেখিলাম, সেদিন কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে বাঙলার রেশনিংয়ের জন্য সরবরাহ করা এই চাউলের সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করা হইয়াছিল। প্রসঙ্গক্রমে ভারত গভর্নমেন্টের খাদ্য সচিব স্যার জওলাপ্রসাদ বলেন, লাল চাউল অখাদ্য নহে, তবে ঢাকাবাসীরা তাহা খাইতে অভ্যস্ত নয়। এক্ষেত্রে প্রশ্ন দাঁড়ায় এই যে, ঢাকায় চাউল সরবরাহ করিবার পূর্বে ঢাকাবাসী যে চাউল খাইতে অভ্যস্ত তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন ছিল; কলিকাতার সম্বন্ধেও ঐ একই কথা প্রযোজ্য। ইহা ছাড়া, চাউল দোকানে পাঠাইবার পূর্বে তাহা স্বাস্থ্যকর কিনা, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত। ভেজাল খাদ্য বিক্রয় করা দণ্ডনীয় অপরাধ বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে; এ ক্ষেত্রে সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীন রেশনিং ব্যবস্থায় যাহাতে লোকের কাছে ভেজাল চাউল গিয়া না পেঁৗছে, সেজন্য বিশেষ দৃষ্টি রাখা প্রথমে প্রয়োজন। সরকারী ব্যবস্থায় তেমন ত্রুটি থাকিয়া গেলে চোরাবাজার বন্ধ করিবার চেষ্টা ব্যর্থ হইবে এবং সেজন্য কোন যুক্তিও থাকিবে না। শুধু চাউল নহে—ডাউল এবং আটা ময়দার সম্বন্ধেও আমরা এই শ্রেণীর অভিযোগ পাইতেছি। সম্প্রতি চট্টগ্রাম, ফরিদপুর কয়েকটি স্থানে রেশনিং ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়াছে এবং ক্রমে উহা সম্প্রসারিত করা হইতেছে। ঐসব স্থান হইতেও আমরা বরাদ্দ দ্রব্যের নিকৃষ্টতার কথাই শুনিতেছি। আমরা আশা করি, কর্তৃপক্ষ এই অভিযোগের প্রতীকারে তৎপর হইবেন। শহরে কিছুদিন হইল কয়লার সমস্যা পুনরায় যেরূপ গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছে, মফঃস্বলে কেরোসিন তেল এবং কোন কোন স্থানে লবণের সমস্যাও সেইরূপ গুরুতর হইয়া উঠিতেছে। মফঃস্বলে কয়েকটি জায়গায় ইতিমধ্যেই কেরোসিন তেল বরাদ্দ ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে; আমরা আশা করি, অন্যান্য স্থানেও জনসাধারণের এই অভাব মোচনের জন্য কর্তৃপক্ষ সমধিক তৎপরতাপূর্ণ ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন।

কাঁথির দুর্দশা

মেদিনীপুরের উপর দিয়া ক্রমাগত দুর্দৈবের ঝড় বহিয়া চলিয়াছে। তন্মধ্যে কাঁথি মহকুমার অবস্থা বিশেষভাবে শোচনীয়। বাঙলা দেশের অন্যান্য অঞ্চলে আমন ধান উৎপন্ন হওয়ায় লোকের দুঃখকষ্ট কিছু লাঘব হইয়াছে; কিন্তু কাঁথির সংকট সমধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই মহকুমায় যথেষ্ট ধান্য উৎপন্ন হয় এবং এ অঞ্চল বাড়তি অঞ্চল অর্থাৎ এ অঞ্চলে যত ধান্য উৎপন্ন হয়, তাহাতে লোকের অভাব মিটিয়াও প্রচুর ধান্য বাহিরে রপ্তানী করা চলে। অনেক বড় বড় চাষীরই গোলা ভরা ধান থাকে; কিন্তু এ বৎসর কাঁথি মহকুমার ৮২টি ইউনিয়নের মধ্যে ৪০টি ইউনিয়নে সম্পূর্ণ অজন্মা গিয়াছে। বৃষ্টির অভাবে ধান মোটেই হয় নাই। এই সংকটে পতিত হইয়া স্থানীয় অধিবাসিগণ সরকারের শরণাপন্ন হইয়াছেন। তাঁহারা এই প্রার্থনা করিয়াছেন যে, (১) আপাতত তাঁহাদিগকে বাকী খাজনা আদায় হইতে রেহাই দেওয়া হউক, (২) আগামী হৈমন্তিক ধানের ফসল না উঠা পর্যন্ত খাজনা আদায় স্থগিত রাখা হউক; (৩) বাহির হইতে মহকুমার অভাব মিটাইবার উপযুক্ত খাদ্যশস্য আমদানী করা হউক, (৪) অভাবগ্রস্ত অঞ্চল হইতে খাদ্যশস্য রপ্তানি বন্ধ করা হউক। আমরা

আশা করি কাঁথির দুর্গত জনসাধারণের এই আবেদনের প্রতি বাঙলা সরকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবে এবং তাঁহারা এ সম্বন্ধে সুবিবেচনা করিবেন।

মহেশ ভট্টাচার্য

কৃতী বাঙালী ব্যবসায়ী ও পরদুঃখকাতর দাতা মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয় ৮৬ বৎসর বয়সে বারাণসী ধামে পরলোকগমন করিয়াছেন। হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবসায়ীস্বরূপে তিনি বাঙলায় সর্বজনপরিচিত; কিন্তু শুধু ব্যবসায়ী বলিয়াই তিনি গৌরব অর্জন করেন নাই, এমন অনাড়ম্বর নিরভিমানী পরার্থব্রতী পুরুষ সত্যই বাঙলা দেশে বিরল। দরিদ্র অবস্থা হইতে তিনি নিজের সাধনার বলে জীবনে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন; প্রভূত বিত্তের অধিকারী হইয়াও সে কথা তিনি বিস্মৃত হন নাই। নিতান্ত সাদাসিধা সাধারণ ভদ্রলোকের মত তিনি জীবনযাপন করিতেন; পরোপকারই তাঁহার জীবনের প্রধান ব্রত ছিল। নাম এবং যশকে তিনি অনেকটা অস্বাভাবিকভাবেই উপেক্ষা করিয়া চলিতেন; এজন্য তাঁহার দানের পরিমাণ অনেকেই জানেন না। কুমিল্লার মহেশ-অঙ্গন, রামমালা ছাত্রাবাস, লাইব্রেরী, বিশ্বনাথ পাঠশালা প্রভৃতি তাঁহার কীর্তি স্থায়ী রাখিবে। বারাণসী ধামে তিনি হরসুন্দরী ধর্মশালা প্রতিষ্ঠা করিয়া দরিদ্র যাত্রীদের অভাব মোচন করিয়া গিয়াছেন। মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্ব পর্যন্ত তিনি স্থায়ীভাবে বিন্ধ্যাচলে বাস করিতেন; এখানে তাঁহার নাম সকলেরই সুপরিচিত; বিন্ধ্যাচলের অনেক সংস্কারমূলক কার্যই তাঁহার অর্থে সংসাধিত হইয়াছে। এখানে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত একটি বিদ্যালয়, শিবমন্দির এবং চিকিৎসালয় আছে। সততা এবং অধ্যবসায় তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র ছিল; সকল দিক হইতেই তিনি একজন অনন্যসাধারণ পুরুষ ছিলেন। তাঁহার নিরভিমান, অনাড়ম্বর এবং অনপেক্ষ জীবনের একটা স্বাতন্ত্র্য-গরিমা সকলকেই মুগ্ধ করিত। তিনি দরিদ্র দেশের যে উপকার করিয়া গিয়াছেন, তাহা সহজে বিস্মৃত হইবার নহে। আমরা তাঁহার পরলোকগত আত্মার উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি এবং তাঁহার শোকসন্তপ্ত আত্মীয়স্বজনগণকে আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

পুনশ্চ

দিল্লী শহরে পুনরায় একটি সর্বদল সম্মেলনের অধিবেশন হইতেছে। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য এই সম্মেলনে উদ্যোক্তার স্থান গ্রহণ করিয়াছেন। অশীতিপর বৃদ্ধ পণ্ডিতজী রোগশয্যা হইতে উঠিয়া দেশের রাজনীতিক অচল অবস্থার সমাধান করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছেন। স্বদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে পণ্ডিতজীর সুদীর্ঘ প্রচেষ্টার ইতিহাস যাঁহারা জানেন, তাঁহারা তাঁহার এই ব্যগ্রতার জন্য বিস্ময় বোধ করিবেন না। পণ্ডিতজীর পরিকল্পনা অনুযায়ী আগামী মার্চ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে এই সম্মেলনের অধিবেশন হইবে এবং ভারতের বিভিন্ন পঞ্চাশজন নেতা এই সম্মেলনে যোগদান করিয়া ইতিকর্তব্যতা নির্ধারণ করিবেন। পণ্ডিত মদনমোহন অনলস কর্মী পুরুষ; দেশের বর্তমান অবস্থার দিকে তাকাইয়া তিনি নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারিতেছেন না; কিন্তু তাঁহার এই উদ্যম কতটা সাফল্যলাভ করিবে, এ বিষয়ে আমাদের সম্পূর্ণই সন্দেহ আছে। বন্দীভূত কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের মুক্তিবিধান করিয়া ভারতের বর্তমান রাজনীতিক অচল অবস্থার যাহাতে সমাধান হয়, এজন্য অনেক চেষ্টাই হইয়াছে; কিন্তু কাহারও কোন চেষ্টাই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীমন টলাইতে পারে নাই। স্যার তেজবাহাদুর সপ্রু যে চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হইয়াছেন, জয়াকরের যে চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে, মাননীয় শ্রীনিবাস শাস্ত্রী মহাশয়ের বিজ্ঞতা যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের কাছে হার মানিয়াছে, সেক্ষেত্রে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের চেষ্টা সার্থক হইবে কি— বিশেষত তিনি যে কংগ্রেসের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন বলিয়াই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের নিকট সমধিক পরিচিত!

কংগ্রেসের প্রথম প্রেসিডেন্ট

কংগ্রেসের ইতিহাস ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস; ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সুদীর্ঘ সংগ্রাম পরিচালনা করিয়া কংগ্রেস বর্তমানে আপনার অপ্রতিদ্বন্দ্বী মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; আজ কূটনীতি চক্রে কংগ্রেসের সে মহিমাকে ক্ষুণ্ণ করিবার উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীর দল নানা চেষ্টা চালাইতেছেন; কিন্তু তাহাতে প্রকৃতপক্ষে জগতের দৃষ্টিতে কংগ্রেসের গৌরবই বৃদ্ধি পাইতেছে; কংগ্রেসের বাণী রুদ্ধ করিবার জন্য তাঁহারা যত নীতি প্রয়োগ করিতেছেন, তদ্দ্বারা কংগ্রেসের বাণীই বাহিরে বিঘোষিত হইতেছে। স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ভারতের এই সর্বপ্রধান জাতীয় প্রতিষ্ঠানের প্রথম সভাপতির পদে বৃত হন। সম্প্রতি কলিকাতায় তাঁহার জন্ম-শতবার্ষিকী সমারোহের সহিত উদ্‌যাপিত হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে উমেশচন্দ্রকে কংগ্রেসের জন্মদাতা পিতা বলা যাইতে পারে। বাঙলা দেশে নব জাতীয়তাবাদের আগুন যাঁহারা উদ্দীপ্ত করিয়াছিলেন, স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ছিলেন, তাঁহাদের অন্যতম অগ্রণী। উমেশচন্দ্র ব্যারিস্টার ছিলেন; পাশ্চাত্য শিক্ষায় তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন এবং পাশ্চাত্য রীতিনীতিতেই তিনি অভ্যস্ত ছিলেন; কিন্তু তাঁহার অন্তরে তীব্র জাতীয়তাবাদের আগুন জ্বলিত এবং সেদিক দিয়া তিনি খাঁটি স্বদেশীভাবে অনুপ্রাণিত ছিলেন। স্বর্গীয় লালমোহন ঘোষ প্রভৃতি তৎকালীন স্বদেশ প্রেমিক বঙ্গ সন্তানের সঙ্গে যোগ দিয়া ইলবার্ট বিলের বিরুদ্ধে তিনি তীব্র আন্দোলন পরিচালনা করেন। ভারতের জাতীয়তাবাদের ইতিহাসে সে আন্দোলন স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। উমেশচন্দ্র শেষ-জীবনে ইংলণ্ডে প্রবাসী ছিলেন; কিন্তু ভারতবর্ষের জন্য সাধনা সেখানেও তাঁহার মুখ্য ব্রত ছিল; স্বর্গীয় দাদাভাই নৌরজীর সঙ্গে যোগ দিয়া তিনি ভারতের জাতীয় মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য সর্ববিধ চেষ্টা করিয়াছেন। এই উপলক্ষে আমরা বঙ্গজননীর এই মনীষী সন্তানের প্রতি আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি।

বন্দীমুক্তির প্রশ্ন

বাঙলার সিকিউরিটি বন্দী অর্থাৎ ভারতরক্ষা বিধান অনুসারে বিনা বিচারে আটক বন্দীদের সম্বন্ধে বিবেচনার জন্য সংশোধিত নূতন অর্ডিন্যান্স অনুসারে ট্রাইবিউনাল গঠিত হইতেছে। এ সম্বন্ধে আমাদের অভিমত আমরা পূর্বেই প্রকাশ করিয়াছি; বস্তুত ইহার সুফল সম্বন্ধে আমরা একটুও আশাশীল নহি; সম্প্রতি ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে বন্দীমুক্তির প্রশ্ন সম্পর্কে ভারত গভর্নমেণ্টের স্বরাষ্ট্রসচিবের যেরূপ মতিগতির পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে এ সম্বন্ধে কিছুমাত্র সংশয়ের অবকাশ নাই যে, সরকার বন্দীমুক্তি সম্পর্কিত প্রশ্নে জনমতকে কোনরূপ মূল্য দান করিতে প্রস্তুত নহেন। স্বরাষ্ট্রসচিব ম্যাক্সওয়েল সাহেব ভারতের রাজনীতিক অচল অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে—ইহা স্বীকার করেন না। ভারতবর্ষের প্রতি ইংরেজ জাতির প্রীতির ভাব সম্প্রতি অতি মাত্রায় বৃদ্ধি পাইতেছে, স্বরাষ্ট্র সচিবের উক্তিতে আমরা ইহা শুনিতে পাইয়াছি; কিন্তু সে সদ্ভাবের আন্তরিকতা ভারতের স্বরাষ্ট্র সচিবকে বিন্দুমাত্রও স্পর্শ করে নাই।

তিলাঞ্জলি

সুবোধ ঘোষ

(১৫)

বোমা অনশন আর একশো অর্ডিন্যান্সের শাসন—পাঁচ হাজার বছরের সভ্য মানবতার আধার ভারতের সত্যাগ্রহী সত্তা অপমানের আঘাতে রক্তক্লিন্ন হয়ে উঠেছে। যেন মৃত্যুর হিক্কা উঠছে চারদিকে। শুনলে ভয় পেতে হয়, দেখলে শেষ ভরসার নিশ্বাসটুকু বন্ধ হয়ে আসে, ভাবলে ভাবনা ফুরিয়ে যায়। ভারতের অক্ষয় বটের শিকড়ে যেন আগুন লাগলো এতদিনে। রাজ্যলিপ্সার এই কালদাহে পৃথিবীর স্নিগ্ধতম ছায়াটি যেন পুড়ে অঙ্গার হয়ে যাবে।

শুধু অবনী নয়, অবনীর মত লক্ষ লক্ষ ভারতবাসীর মনে মাঝে মাঝে এই দুর্দৈবের শোক সকল আশাবাদের শেষ চিহ্নটুকু মুছে ফেলে দেয়।

এই শ্মশানসন্ধ্যার অবসাদের বাতাসে .পরমাণুর সংগীতের মত তবু যেন একটি অশোক মন্ত্র সকল হতাশা ছাপিয়ে জেগে ওঠে। বিংশ শতাব্দীর উদভ্রান্ত মনুষ্যত্বকে প্রেমে মৈত্রীতে শান্তিতে ও সুস্থশৌর্যে সুন্দর করার আয়োজনে নূতন সংঘারামের প্রার্থনার মত ভারতের কংগ্রেসের বাণী।

শুধু অবনী নয়, অবনীর মত লক্ষ লক্ষ নিঝুম আত্মা সে-বাণীর ছোঁয়ায় বিজয়বন্ত মশালের মত দ্যুতিমান হয়ে ওঠে।

তা'রা ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে। . পথের দিশা দেখায় তা'রা। তা'রা কানে কানে মন্ত্র ড়ে যায়। অন্ন চাই, বস্ত্র চাই, মনুষ্যত্ব াই—চাই স্বাধীনতা। মৃত্যুর বিভীষিকা থকে উদ্ধার চাই। অন্যায়ের প্রতিরোধ াই, জুলুমের প্রতিকার চাই। নির্ভীক ও, প্রতিজ্ঞা কর, দাবী কর, লড়তে শেখ। নরমদের আড্ডায় প্রতি সন্ধ্যায় দৈবীমূর্তির মত কারা যেন আসে, একেবারে আপন হয়ে গা-ঘেঁসে বসে। ক্ষণিকের জন্য এক দুর্মদ জীবনের নেশা তাদের শীর্ণ পরমায়ুর বৃন্তে ঝড়ের মাতন জাগিয়ে চলে যায়। নিরন্নেরা বলে—যখন ডাক দিবেন, তখনই আমরা তৈরী আছি বাবু। আর কিসের ডর? চালচোরাদিগের ভাঁড়ারগুলি একবার দেখিয়ে দেবেন।

আর একজন উৎসাহে সমর্থন জানায়—একেবারে ঘিরে লিয়ে পড়ে থাকবো।

তৃতীয় আর একজন বলে—এখানে মিছা মরতে পড়ে আছি, না হয় ওখানেই মরবো। যা আছে অদেষ্টে!

একটি বৃদ্ধ আশীর্বাণী উচ্চারণ করে। —বেঁচে থাক কংগ্রেস। এই ধাক্কাটা একবার সামলে উঠি বাবু, বাকী যেকটা দিন বাঁচি কংগ্রেসের কথা মেনে চলবো। বেঁচে থাক কংগ্রেস।

লঙ্গরখানায় অন্নার্থীদের পংক্তিতে বসে খিচুড়ি খেতে খেতে কয়েকটি গ্রাম্য গৃহস্থ যুবক করুণভাবে পরিবেষক ছেলেদের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। কর্মী ছেলেরা কৌতুহলী হয়ে প্রশ্ন করে।—কি? আর চাই?

একটি গৃহস্থ যুবক ম্লানভাবে হেসে জবাব দেয়।—আমাদের অদৃষ্টের কথা ভাবছিলাম বাবু, মশাই। একদিন কত স্বদেশী বাবুদের নিজে হাতে পাত পেড়ে মাছ ভাত খাইয়েছি বাবু। আর আজ দেখুন, ভিখিরী হয়ে পাত পেতে বসেছি।

কর্মী ছেলেরা বলে।—কে বললে আপনারা ভিখিরী? আমাদের শহরে দুদিনের জন্য অতিথি হয়েছেন আপনারা। গাঁয়ে ফিরে যান, বাঁচতে চেষ্টা করুন। কংগ্রেসের অনুরোধ মনে রাখবেন।

পার্কে বসে একটি ছাত্রদের জটলা রাজনীতি নিয়ে তর্ক করে। এক অপরিচিত ভদ্রলোক এসে সবিনয়ে বলে।—একটা কথা ছিল।

সন্দিগ্ধ ছাত্রেরা বলে।—বলুন।

ভদ্রলোক,—আপনারা ফাসিস্তবাদকে ঘৃণা করেন নিশ্চয়?

ছাত্রেরা।—নিশ্চয়।

ভদ্রলোক।—পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ফাসিস্ত-বিরোধী প্রতিষ্ঠান ভারতের কংগ্রেসের কথা কি আপনারা ভুলে গেলেন?

ছাত্রেরা আগন্তুক ভদ্রলোকের কথায় কৌতুহলী হয়ে উঠছিল। ভদ্রলোকের গলার স্বরটা যেন হঠাৎ আবেগে গভীর হয়ে উঠলো। —আজ নয়, সাত বছর আগের ইতিহাসটা একবার স্মরণ করুন। ফাসিস্তির আক্রমণে স্পেনের জনতন্ত্রের সেই দুঃখময় মুহূর্তের কথা মনে করুন। বার্সিলোনার পথে চল্লিশ কোটি ভারতবাসীর সেবার নৈবেদ্য নিয়ে কংগ্রেসের অ্যাম্বুলেন্স গাড়ি ছুটে চলেছে। পথের দুপাশে স্পেনের নরনারী ভারতের জাতীয় পতাকাকে নমস্কার জানাচ্ছে। পুষ্পবৃষ্টি করছে। মনে করুন মুক্তিকাম চীনের উত্তর চুংকিংয়ের প্রতি গিরিবর্ত্মে অষ্টম রুট আর্মির দেশ-ভক্ত সন্তানেরা শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করছে। তাদেরই পাশে দাঁড়িয়ে কাজ করছে ভারতের কংগ্রেসের মেডিক্যাল মিশন। আমাদের কংগ্রেস পৃথিবীর প্রত্যেক পীড়িতের সান্ত্বনা, আমাদের কংগ্রেস পৃথিবীর প্রত্যেক মুক্তিযোদ্ধার সুহৃদ।

ভদ্রলোক একটু চুপ করে নিয়ে আবার বলতে আরম্ভ করলেন।—তবু আমাদের কংগ্রেসকে অপমান করার জন্য চারদিকে একটা ষড়যন্ত্র চলেছে ভাই। তাই আপনারা-

দের কাছে অনুরোধ, কংগ্রেসের মর্যাদা রাখবেন আপনারা। কংগ্রেসকে ভুলবেন না, ভুল বুঝবেন না। আপনারা মহৎ হলে কংগ্রেস মহৎ হবে। কংগ্রেস মহৎ হলে আপনারা মহৎ হবেন। আপনারাই কংগ্রেস। কংগ্রেস কোন পার্টি নয়, দল নয়, আশ্রম নয়। কংগ্রেস মানুষের ইতিহাসের ইংগিত পথ ও পরিণাম।

কথা শেষ করে ভদ্রলোক চলে যান। ছাত্রেরা কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকে। চটুল তর্কের নেশা বিস্বাদ মনে হয়। নতুন একটি গর্ব গৌরব ও বিশ্বাসের বাণী তাদের মন জুড়ে সুরে সুরে সরব হয়ে উঠতে থাকে।

অধ্যাপকদের ক্লাবে যুদ্ধতত্ত্বের অর্থভেদ করতে বিতণ্ডার ঝড় ওঠে। গণতন্ত্রের যুদ্ধ না সাম্যের যুদ্ধ? কে বেশী ভয়ংকর? সাম্রাজ্যবাদ না ফাসিস্তবাদ? সাম্রাজ্যবাদীরা ফাসিস্ত হতে চায়, না ফাসিস্তরা সাম্রাজ্যবাদী হতে চায়?

নিতান্ত অপরিচিত ও অনাহূত একটি অতিথিবেশী মূর্তি সকলকে বিস্মিত করে উত্তর দেয়—এই দুটিই সত্য, দুই-ই সমান। এই যুদ্ধের সকল অনর্থের মূলে ঐ পুরাতন ও নতুন লিপ্সার দ্বন্দ্ব।

প্রশ্ন ওঠে এই যুদ্ধের বীভৎস ভ্রূকুটির সম্মুখে দাঁড়িয়ে কোন্ দেশ মানুষের সত্তাকে বাঁচিয়ে রাখতে প্রাণপণ করেছে? সত্যি করে আদর্শের জন্য লড়ছে কে? কাঁদের শৌর্যে ও ত্যাগে অস্ত্রসর্বস্বতার দম্ভ খর্ব হতে চলেছে? রুশ? চীন? আর কে?

অনাহূত অতিথি করযোড়ে আবেদন করেন—আর আমাদের ভারতের কংগ্রেস। সারা পৃথিবীর বিবেকের প্রতীকের মত আমাদের কংগ্রেস। সর্বমানবের সুখ শান্তি ও মুক্তির একমাত্র নিষ্কলুষ আদর্শের প্রতিশ্রুতি নিয়ে কত দুঃখের পরীক্ষায় কত মহৎ হয়ে উঠেছে আমাদের কংগ্রেস! কংগ্রেসকে ভুলবেন না আপনারা।

বিয়ে বাড়িতে মেয়েদের আসরে কথায় কথায় রাজনীতি এসে পড়ে। কোন সুবেশিনী খদ্দরের নিন্দে করেন। কোন অতিশিক্ষিতা আন্তরিকভাবেই জাতীয়তা জিনিসটা বরদাস্ত করতে পারেন না—জাতীয়তাবাদ একটা সংকীর্ণ মনোভাব। একটা গোঁড়ামি। এর থেকেই শেষে ফাসিস্তবাদ পেয়ে বসে।

খদ্দরপরা একটি মেয়ে শান্তভাবে জবাব দেয়।—ঠিক কথা। কিন্তু এর পর আর একটু আপনার ভেবে দেখা উচিত। পরাধীনের জাতীয়তা আর স্বাধীনের জাতীয়তা কি গুণেধর্মে একই ব্যাপার হলো? পরাধীনের জাতীয়তা শত গোঁড়ামি সত্ত্বেও একটা ঐতিহাসিক কল্যাণের দিকে এগিয়ে যায়। স্বাধীন শক্তিমানের জাতীয়তার গোঁড়ামিকেই শুধু আশঙ্কা—সেইখানেই ফাসিস্তবাদের হাওয়া।

সকলে মিলে সাগ্রহে মেয়েটিকে প্রশ্ন করতে থাকে—আপনার নাম? কি করেন আপনি? কোথায় থাকেন?

মেয়েটি হেসে জবাব দেয়—আমি কংগ্রেসের কাজ করি। আজ উঠি, আবার দেখা হবে। আপনাদের কাছে অনুরোধ, কংগ্রেসকে ভুলবেন না কখনো। বিশ্বের সভ্যতায় আধুনিক ভারতের সব চেয়ে গৌরবের দান আমাদের কংগ্রেস। এই সত্য আমি দু'চোখে দেখতে পাই, আমি তাই বিশ্বাস করি। সেই আনন্দে সবার কাছে কংগ্রেসের কথা বলি। যতটুকু সাধ্য তাই করি।

সারা ভারতের অদৃষ্টের আকাশে প্রতিদিন নিয়মিত সূর্য উঠে ডুবে যায়। পরাধীন জীবনের অভিশাপ প্রতিদিনের দাহনে বীভৎসতর হতে থাকে। লক্ষ নিরুপায় নরনারী ও শিশুর পরিত্রাহি আর্তনাদের সম্মুখে অন্ন বস্ত্র ওষধি নির্মম অবজ্ঞায় দূরে সরে যেতে থাকে। সরকারকে খাজনা দিতে কোন ভুল করেনি তারা। তবু তারা রইল না। মারী আর মৃত্যু পালা করে তাদের নিশ্বাস লুটে নিয়ে যায়; নিরীহ নাগরিকতার শেষ স্বাক্ষর শুধু অস্থি হয়ে ছড়িয়ে থাকে বাঙলাদেশের ক্ষেতে মাঠে আর রাজপথে।

এই অসহায় ধ্বংসের অভিনয়ে আর এক দফা পরিহাসের মত হিরোহিতোর দূতেরা পাখা ঝাপটে আকাশপথে উড়ে আসে। দাসত্বে জীর্ণ কয়েক শত দুর্ভাগার জীবনকে অবাধে ছিন্ন ভিন্ন করে চলে যায়।

শুধু অবনী নয়, অবনীর মত দেশের হাজার হাজার সংগ্রামী সত্যাগ্রহীর বিবেক এই যাতনাময় পরীক্ষায় শুদ্ধ হয় তিমির রাত্রির তারার মত ফুটে ওঠে। সকল কলুষের আক্রমণ থেকে কংগ্রেসের বাণীকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। শহরে গাঁয়ে গঞ্জে হাটে, প্রতি জনতার একেবারে হৃদয়ের কানের কাছে গিয়ে তারা কংগ্রেসের ধর্মযুদ্ধের দাবীর বাণী শুনিয়ে বেড়ায়। যে শোনে সেই নিঃশঙ্ক হয়ে ওঠে। ভারতের মুক্তি না হলে মানুষের মুক্তি হবে না, সবার উপরে এই সত্যকে তারা মনে প্রাণে অনুভব করে। আটলাণ্টিক সনদের কপট শব্দতুর্যের আশ্বাস নিজের মিথ্যায় চূর্ণ হয়ে যায়।

কাজের নেশায় পেয়েছে অবনীকে। ভাঁড়ার ঘরে ঢুকতে ভয় পায় অরুণা। একটা দৈন্যের ছায়া যেন নিঃশব্দে মুখ গুঁজে বসে আছে। জোছু গম্ভীর হয়ে গেছে। পিসিমা অস্বস্তিতে ছটফট্ করেন। শিশিরের চিঠি আর আসে না। ইন্দ্র কোন উত্তর দেয়নি।

প্রতি বছরের মত ছাব্বিশে জানুয়ারীর প্রভাত রৌদ্র কোটী কোটী ভারতবাসীর মুক্তিসংকল্পের পুণ্যে ভাস্বর হয়ে ওঠে। ভোরে উঠেই অবনী বের হয়ে যায়। ফিরে আসে অনেক বেলা করে।

অবনীর মুখের দিকে তাকিয়ে অরুণার বুক দুরুদুরু করতে থাকে। দুঃসহ একটা প্রদাহে যেন অবনীর মুখটা পুড়ে গেছে। কোন বছরের এই শুভ দিনটিতে অবনীকে এতটা অস্বাভাবিক দেখেনি অরুণা।

একটু সহজ হবার জন্যই অরুণা শান্তস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করে।—স্বাধীনতা দিবসের উৎসব কেমন হলো এ বছর?

অবনী—ভালই হয়েছে।

একটু চুপ করে থেকে, অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে অবনী আবার বললো,—কিন্তু আমাদের মিছিল ফিরে এসেছে, পার্কে ঢুকতে পারেনি।

অরুণা—কেন?

অবনী—পার্কের গেট বন্ধ ছিল। ভেতরে পুলিশ আর কম্যুনিস্টরা বসেছিল।

কথাগুলি শেষ করেই উচ্ছল একটা হাসির আবেগে অবনীর মুখ থেকে কঠোর গাম্ভীর্যের ছায়া উড়ে সরে গেল।

অরুণা ম্লানমুখে বললো—তা হ'লে কি এ বছর সংকল্প পড়লে না তোমরা?

অবনী—পড়েছি। আশু মাস্টারের বাড়িতে আমাদের অনুষ্ঠান সেরেছি।

অরুণা বিস্মিত হয়ে বললো—আশু মাস্টার? তিনি তো শুনেছি......।

অবনী—না, তিনি তা' নন। তিনি নিজে থেকে এসে আমাদের মিছিলকে ডেকে নিয়ে গেলেন।

আশুবাবুর প্রসংগে অবনীর মুখের চেহারাটা উৎসাহে দীপ্ত হয়ে উঠছিল। খুসীর আবেগে যেন আপন মনে বলে চলেছিল অবনী।—আশুবাবু একবারে নতুন মানুষ হয়ে গেছেন। আশ্চর্য!

অরুণা বলতে যাচ্ছিল—ইন্দ্রকে দেখতে পেলে না?

তবু মুখ ফুটে বলতে পারলো না অরুণা। উৎফুল্ল অবনীর মুখের হাসিটুকু আজকের দিনে যেন সযত্ন আয়াসে বাঁচিয়ে রাখতে চায় অরুণা।

কিন্তু পরক্ষণেই অবনীর দিকে তাকিয়ে আবার বিষণ্ণ হয়ে পড়ে অরুণা। অবনীর চোখ দুটো যেন বহু দূরের একটা নির্লজ্জ অপকীর্তির ছবির দিকে তাকিয়ে ঘৃণায় কুণ্ঠিত হয়ে উঠছিল। যেমানুষ ঘৃণা করতে জানে না, কখনও কাউকে ঘৃণা করেনি, তার দৃষ্টিতে এই আবিলতার ছোঁয়া লাগে কেন? কী সেই লাঞ্ছনা?

অরুণা বললো—কাদের কথা ভাবছো?

—না, কিছু নয়।

অবনী আবার স্বচ্ছন্দে উত্তর দেয়। খোঁজ করে—জোছু কোথায়? পিসিমা কি করছেন?

(ক্রমশ)

পুস্তক পরিচয়

নতুন আঁচড়—কিরণশংকর সেনগুপ্ত। প্রতিরোধ পাবলিশার্স, ঢাকা। দাম ছয় আনা।

বাঙলার তরুণ কবিদের মধ্যে 'স্বপ্ন কামনা'র কবি কিরণশংকর সেনগুপ্তের প্রতিষ্ঠা আছে। তাঁর কাব্য সৃষ্টির প্রসার এবং প্রয়াস দুটোই প্রশংসনীয়। 'স্বপ্ন কামনা' প্রকাশিত হবার পর প্রায় পাঁচ বছর অতীত হয়েছে। ইতিমধ্যে কিরণবাবু অনেক কবিতা লিখেছেন এবং তাঁর রোমান্টিক কবি মন ও দৃষ্টিভঙ্গীর অনেক পরিবর্তন হয়েছে। পাঠক সাধারণকে তাঁর এই কাব্যিক বিবর্তনের আঁচ দেবার উপযোগী কোন নতুন কাব্য গ্রন্থ এ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়নি। এদিক থেকে কিরণবাবুর আলোচ্য কাব্যপুস্তিকা নতুন আঁচড় উল্লেখযোগ্য। 'নতুন আঁচড়ে'র পরিধি সংকীর্ণ এবং কবিতা সংকলনের দৃষ্টি-ভঙ্গীও এক পেশে। তবু এই ষোল পৃষ্ঠার সংকীর্ণ পরিধির মধ্যে 'স্বপ্ন কামনা'র কবির ছন্দোবোধ এবং চয়ন নৈপুণ্য মাঝে মাঝে হৃদয়কে দুলিয়ে দিয়ে যায়। কবির মনে বলিষ্ঠ সমাজ সচেতনতা থাকলেও সংগৃহীত কবিতাগুলোর একঘেয়ে ফ্যাসিস্ট বিরোধী স্লোগান্ মাঝে মাঝে রস-বোধকে পীড়িত করে। পুস্তিকাখানির মুদ্রণও অঙ্গ-সজ্জা প্রশংসনীয়।

কয়েকটি পাতা—অমৃতকুমার দত্ত। প্রতিরোধ পাবলিশার্স, ঢাকা। ছয় আনা।

'কয়েকটি পাতা' অমৃতকুমার দত্তের প্রথম প্রকাশিত কাব্য-পুস্তিকা। ইতিপূর্বে মাঝে মাঝে সাময়িক পত্রিকায় তাঁর কবিতার সাক্ষাৎ পেলেও, তাঁর কবিতায় কোন বিশেষ অভিনবত্বের সন্ধান মেলে নি। কাব্যের সুর মূর্চ্ছনা এবং ছন্দের ঝঙ্কারের চেয়ে তাঁর কবিতায় প্রচার-স্পৃহাই অধিকতর পরিস্ফুট। ফলে অনেক ক্ষেত্রে তিনি উৎকৃষ্ট ফ্যাসিস্ট বিরোধী স্লোগান্ সৃষ্টি করেছেন বটে, কিন্তু কাব্যের অপমৃত্যু ঘটেছে। নিছক প্রচারস্পৃহায় অধীর হয়ে কবিযশঃপ্রার্থী তরুণ লেখকেরা কেন যে কাব্যের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য সৃষ্টিকে ভুলে যান—সে কথা বোঝা যায় না। তবে অমৃতকুমার দত্তের হতাশ হবার মত কোন কারণ নেই। আলোচ্য পুস্তিকা তাঁর প্রথম প্রকাশিত কাব্য পুস্তিকা। এদিক থেকে বিচার করলে তাঁর কোন কবিতায় যে সম্ভাবনার ইঙ্গিত না পাওয়া গেছে তা' নয়। উদাহরণ স্বরূপ 'ডাক' কবিতাটির উল্লেখ করা যেতে পারে। অত্যুগ্র প্রচার-স্পৃহাকে দমন করতে পারলে ভবিষ্যতে তাঁর হাত থেকে ভাল কবিতা পাবার আশা করা যেতে পারে।

লজ্জাবতীর দেশ—দিলীপ দাশগুপ্ত। দিপালী গ্রন্থশালা, ১২৩।১, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা। দাম ছয় আনা।

কবি হিসাবে দিলীপ দাশগুপ্ত বাঙালী পাঠক-পাঠিকা সমাজে একেবারে অপরিচিত নন্। 'লজ্জাবতীর দেশ' পরিকল্পনার দিক থেকে রূপক নাটিকা হলেও গীতিপ্রবণতায় চঞ্চল। ভাষাকে কাব্য-প্রবণতা দান এবং কল্পনা বিলাসের দিকে লেখক যতটা ঝুঁকেছেন, ততটা চরিত্র সৃষ্টির প্রয়াস পাননি। ফলে সমগ্রতার দিক থেকে 'লজ্জাবতীর দেশ' অনেকটা ভাসা ভাসা, এবং অস্পষ্ট। নাটিকাটি অভিনয়ে হয়ত সাফল্য লাভ করতে পারে—কিন্তু নিছক সাহিত্য-সৃষ্টি হিসাবে এর বিশেষ মূল্য আছে বলে মনে হয় না। নাটিকাটির পরিকল্পনায় এবং বিভিন্ন চরিত্রের কথোপ-কথনে রবীন্দ্রনাথের গীতিনাটিকাগুলোর সুস্পষ্ট প্রভাব বিদ্যমান। রবীন্দ্রোত্তর যুগের সাহিত্যে এই জাতীয় নিছক ভাব-বিলাসের প্রয়াস আমরা বহু পিছনে ফেলে এসেছি বলে মনে হয়। নাটিকাখানির মুদ্রণকার্য এবং অঙ্গসজ্জা প্রশংসনীয়।

তুমি আর আমি

অনিলকুমার ভট্টাচার্য

ট্রেন চলে এঁকে বেঁকে সরিসৃপ রেখা
আসন্ন সন্ধ্যার মাঝে ধূসর আকাশ;
দূরে দেবদারু বন—অশ্বত্থ-ছায়ায়,
নীড়াগত পাখীদের কিচিমিচি ধ্বনি;
সন্ধ্যা-সূর্য অস্ত যায়।
তুমি আর আমি—
সৃষ্টির প্রথম প্রাতে মানব মানবী,
আরণ্যক জীবনের মধুর সঞ্চার :
ভেসে আসা প্রদোষের হিল্লোলিত বায়
বন বকুলের মৃদু সৌরভ নিঃশ্বাস;
ঘন অর্কিড বনে যে রোমাঞ্চ জাগে
তোমার কেশের স্পর্শ তারই অনুরাগে
আমারে মাতায় তোলে।
ক্ষণিকের ঘন নীরবতা—
মুদে আসা আঁখি-তটে যে কামনা-শিখা
ধিকি ধিকি ওঠে জ্বলি' প্রদীপ শিখায়
তার মাঝে ডুবে যাই তুমি আর আমি।
সংকীর্ণ জীবন-স্রোত কোথা বাধা পায়?
ঘনতন্দ্রা যায় ভেঙে:—

উচ্ছল তটিনী-ঢেউ রুদ্ধগতি তার।
আচম্বিতে দেখা যায় জংশন-আলো,
হরিৎ ধানের ক্ষেত দূরে সরে গেছে—
ঘন শ্যাম অরণ্যানী যন্ত্রের সংঘাতে
মসৃণ পীচ ঢালা রাজপথ ভূমি।

সুদূর দিগন্ত শোভা কাঁটা তারে ঘেরা
জংশন-ইঞ্জিনের হুইসিল বাজে;
চিমনির কালো ধোঁওয়া চাঁদ ঢেকে দেয়
হাতুড়ির শব্দ মাঝে ফার্নেশ আলো—
দেখায় জীবন পথ—নূতন বিস্ময়!

প্রখর দুর্জয়!!
ট্রেন থামে—জংশন-স্টেশনের কল-কোলাহলে
তুমি আমি বসে আছি—কলের মানুষ।

মাঝখানে কাঁটাতার প্রভেদ প্রাচীর;
কেহ কারে চিনি নাকো, শুধু পাশাপাশি
চলিয়াছি জীবনের বাঁধা পথ বাহি'
অজস্র নিষেধ আর গম্ভীর সীমায়
ক্ষণিকের সহযাত্রী শুধু।

সিক্ত মৃত্তিকা

শ্রীনলিনীকান্ত মুখোপাধ্যায়

মতিলাল তখনো কাঁদছে—।

অপরাহ্নে আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নেমেছে। ধারার পর ধারা চলেছে অবিরাম। প্রসব-পাণ্ডুর কালো মেঘ কতবার বিবর্ণ হোলো। প্রহরের পর প্রহর শেষ হোলো, কৃষ্ণপক্ষের এ রাত্রে চাঁদ আর উঠলো না। পরিতৃপ্ত পৃথিবীর লজ্জা অন্ধকারে ঢাকা রইছে না বিদ্যুতের ঝলকানিতে।

মতিলাল তখনো কাঁদছে। তার চোখ দিয়ে অবিশ্রান্ত ধারা বইছে।

গান্ধারী নিজের কুঁড়েঘরে শুয়ে শুয়ে ভাবছে, বেত্রবতীতে বোধ হয় উজান এলো।

দুবছর আগে ভজন বিশ্বাসের মেয়ে সাত-আনি জমিদারদের পোড়ো ভিটের আমগাছে গলায় দড়ি দিয়ে মরেছিল। তার মৃত্যুর সংগে মতিলালের নাম জড়ানো ছিলো। পুরুষেরা কানাঘুষো করতো অতটা অধর্ম্ম করা উচিত হয়নি মতিলালের। মেয়েরা প্রকাশ্যেই বলতো, বিধবার অতো বাড়াবাড়ি ভগবান সইলেন না।

মতিলাল কিন্তু সেজন্য কাঁদছে না। পয়সা খরচ করে জমানো নেশা কেটে গেলে, সেই নেশার স্মৃতি নিয়ে কেউ কাঁদতে বসে না। বরঞ্চ আবার গোড়া থেকে শুরু করবার জন্যে অর্থসংগ্রহে মন দেয়। মতিলালের বিগত জীবন যাই-ই থাক, তা নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার গান্ধারীর নেই।

মতিলাল তাকে নির্জ্জনে ডেকে বলে-ছিলো অনেক কথা। উপসংহারে জিজ্ঞেস করেছিলো—রাজী থাকিস তো বল, তার বন্দোবস্ত করি!

গান্ধারী কোনো কারণ না দেখিয়ে সাজাসুজি বলেছিলো—'না'।

এই না বলার বিরুদ্ধে যুক্তি খুঁজে পেতে মতিলালের দেরী হচ্ছিলো, ততক্ষণে গান্ধারী অনেক দূরে চলে গেছে।

গান্ধারীর এই না বলবার স্বপক্ষে-বিপক্ষে অনেক যুক্তি আছে। হ'তে পারে মতিলালের বয়স প্রায় চল্লিশ বছর, কিন্তু তার মত জোয়ান গ্রামে আর ক'জন আছে। আর মাতব্বরী সে তা বলে গায়ের জোরেই করে না, ঘরে তার পয়সাও কম নেই!

তার পরদিন ঘাটের পথে মতিলালের সংগে গান্ধারীর আবার দেখা। মতিলালের কথা বানানোই ছিলো—দেখ গান্ধারী, তার বাপ তো কোনোদিন বিছানা ছেড়ে উঠবে বলে মনে হয় না। ঘরে তোর মা নেই। ছোট ছোট ভাইবোনগুলোরে নিয়ে এই ভরা বয়সে থাকবি কেমন করে!

বলতে বলতে মতিলালের কথা ফুরিয়ে গেল, অথচ কোনো জবাব পেলো না। ঘাটের পথ যেখানটায় বড্ড সরু, সেই-খানটায় সে গান্ধারীর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তার পরিধি দিয়ে পথ আটকালো।

"কথার জবাব দিসনে কেন, গান্ধারী!"

গান্ধারী মতিলালের অসহিষ্ণু প্রশ্নে তার দিকে ফিরে তাকালো। ঘন আগাছার জঙ্গলে রাস্তার দু'পাশ ঢাকা—চোখ বাধা পায় মতিলালের দেহে, তার ও-পাশে আর কিছু দেখা যায় না।

"পথ ছাড়ো মোড়ল, বাড়ি যাই।"

"কথার জবাব দিয়ে যা তবে!"

মতিলালের এই কথায় গান্ধারী বললে—"কতবার জবাব দেবো? কালই তো বললাম, তা হয় না।"

"কেন হয় না! কি অনেয্য কথাটা বলিছি আমি!"

গান্ধারী আর উত্তর না দিয়ে পাশ কাটিয়ে বাড়ির দিকে চললো। বাঁ-কাঁধে কলসী নিয়ে অপরিসর পথে ডানদিকের লোককে এড়াতে গেলে ভারসাম্য রক্ষা করা কঠিন হয়। গান্ধারী মতিলালের গা ছুঁয়ে গেলেও মতিলালের তাতে উৎসাহিত হবার কারণ ছিলো না। তবুও কেন যে সে তার পিছনে পিছনে চলছিল, তা সেই-ই জানে!

—"আমার দিক একবার ফিরে চা! মার পেটের ভাই শুকলালরে মানুষ করলাম খাওয়ায়ে পরায়ে, তা সেও ভেন্ন হয়ে গেল। এত ক্ষেত-খামার, পঞ্চাশ জোড়া জাল, তিনটে বাঁধের মাছ ধরার বন্দোবস্ত, একা একা কেমন করে সামাল দিই বলতো! মনে শান্তি না থাকলে কি কাজ করা যায়!

মতিলালের অনুনয়ের ছোঁয়াচ লেগে অগ্রবর্তিনীর কলসের জল ছলকিয়ে পড়ছিলো। সে আর জবাব না দিয়ে পারলো না।

"—যে তোমার মেজাজ মোড়ল, তাতে আর শুকলাল দাদার দোষ কি! দিবে-রাত্তির লোকের পিছনে লেগে থাকলে কি মানুষ মানিষের ঘর করতে পারে!—"

কথা শুনে মতিলালের মাথায় যেন আগুন ধরে গেল।

"শুকলাল বলেছে একথা! দাঁড়াও, অজ তারে সড়কির আগায় না গাঁথি তো আমি শীতল পাড়ুইয়ের ছেলেই নই!"

গান্ধারী ততক্ষণে ফিরে দাঁড়িয়েছে। মতিলালের মেজাজ সে কেন, সবাই জানে। শ্যামবর্ণার মুখের রক্তশূন্যতা লক্ষ্য করা কঠিন হলেও, অষ্ঠাদশ বসন্তের তুলিতে আঁকা নিষ্পলক চোখের ভাষা বুঝতে মতিলালের দেরী হোলো না। পরকে ভয় দেখিয়ে নিজে ভয় মতিলাল এই প্রথম পেলো।

মতিলাল কিন্তু সেজন্যে কাঁদছে না। একমাত্র বিনয়ে, স্নেহে যাকে বশ করা সম্ভব, তার সামনে হঠাৎ মেজাজ দেখিয়ে যে ভুল করে ফেলেছে, সেই আক্ষেপে তার চোখে জল ঝরছে না।

বাইরে তখনও ধারার পর ধারা চলেছে অবিরাম।

তার পরদিন মতিলালের মনে সাময়িক বৈরাগ্য এসেছিলো। সামান্য একটা মেয়ে, তার জন্যে এত আকুলতা তার শোভা পায় না। দৈত্যের মত চেহারা তার। রাতের পর রাত বৃষ্টিতে ভিজে মাছ ধরেছে। দিবারাত্র জাল বুনেছে। অবিরাম বর্ষণে স্তিমিত-স্রোতা বেত্রবতীতে উজান উঠলে সে একাই বাঁশ কেটে বাঁধ দিয়েছে। বহু বৎসরের পরিশ্রম সে অল্প সময়ের মধ্যে করে, বহু বৎসরের উপার্জ্জন সে অল্প দিনের মধ্যেই পেয়েছে। জমি, জমা, মাছের কারবারে তার লাভের অন্ত নেই। বিয়ে করেছিলো অনেক টাকা খরচ করে, রাজবংশীয় ঘরের সেরা সুন্দরীকে। তা সেও একদিন মরে গেল। ছোট ভাই শুকলালের বিয়ে দিয়ে তাদেরই নিয়ে ঘর করছিলো; তা সেও একদিন আলাদা হয়ে গেল। তারপর কি ভেবে ভজন বিশ্বাসের মেয়ে কুন্তিকে মাইনে করে রেখেছিলো ঘর-সংসার দেখবার জন্যে। দুজন সুস্থ মানব-মানবী ভবিষ্যৎ চিন্তা করেনি, তাই একদিন কুন্তিকে বাধ্য হয়ে মতিলালকে জিজ্ঞাসা করতে হয়েছিলো যে, সে কি করবে। মতিলাল রেগে জবাব দিয়েছিলো—'গলায় দড়ি দিগে যা'।

তার পরদিনই সে সাত-আনীর ভিটের আমগাছে গলায় দড়ি দিয়ে মরেছিলো। বড় ভালো মেয়ে ছিলো কুন্তী। লোকের সামনে তার সংগে সমানে ঝগড়া করতো। নির্জ্জনে মতিলাল তার দিকে এগিয়ে গেলে সজোরে চোখ বন্ধ করে থাকতো। পরমেশ্বর বড় নিষ্ঠুর। পুরুষের সংগে সামর্থ্যে না পেরে, নারীর মন ভাঙিয়ে, তার মন ভাঙান।

মতিলাল কিন্তু কুন্তীর সংগে রমণীয় যৌবন-বিলাসের দিনগুলিকে স্মরণ করে কাঁদছে না। কুন্তী আত্মহত্যা করবার পর সে তাকে কোনোদিনই স্বপ্ন দেখেনি।

সাময়িক বৈরাগ্যের মর্যাদা রক্ষা করতে মতিলাল মন টেনে নিয়ে কাজে বসালো। জাল-ঘরে সারি সারি জাল টাঙানো রয়েছে। চার-পাঁচজন লোক সেইগুলোকে মেরামত করছে। মতিলাল তার মধ্যেকার একজনকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলো—যজ্ঞেশ্বর কি আজ যাবে নাকি মানিকদায়? তোমার মেয়ের জ্বর কেমন? মানিকদহে বেড়াজাল ফেলা হবে। যজ্ঞেশ্বর গেলে অবশ্য তার উপার্জন হবে।

"না যেয়ে আর কি করি! মেয়েডার জ্বর, তার ওপোর ঘরে নেই একটা পয়সা!"

এই কথা শুনে মতিলাল যে উত্তর দিতে দিতে জাল-ঘরের অন্যদিকে চলে গেল, তা শুনে ঘরশুদ্ধ লোকের হাতের কাজ বন্ধ হয়ে গেল।

—"তোমার তাহলে যেয়ে কাজ নেই যজ্ঞেশ্বর। বাড়ি থাকগে। যাবার সময় এক খুঁচি ধান আর দুটো টাকা নিয়ে যেও।" পাওনা পয়সা মতিলাল দেয়, কিন্তু খয়রাত করা তার ইতিহাসে নেই।

জাল-ঘরের বাইরের উঠোনে সারি সারি ধানের গোলা। পিছন ফিরে মতিলাল একবার বাঁশের আলনায় টাঙানো জাল-গুলোর দিকে ফিরে চাইলো। মতিলালের দীর্ঘনিশ্বাস পড়লো। কেন, এ সমস্ত! কিই-বা হবে!

"আমার কথা শোন্ গান্ধারী, আমার দিক্ ফিরে চা?"

"না, তা হয় না মোড়ল।"

না, না, আর না। মতিলাল ধানের গোলার পাশ দিয়ে চলেছে। কয়েকজন লোক ধান পাড়ছিলো। বোধ হয় ধার দেওয়া হবে। মতিলালকে দেখে তাদের গোলমাল থেমে গেল। খানিকক্ষণ সেদিকে চেয়ে দেখে মতিলাল বললে—একটু সাবধানে ধান নামাও দ্বিজবর, অর্ধেক তো ছড়িয়েই পড়লো।

এতগুলো ধানের গোলা। এ বছরে ধার দিলে সামনের বছর দেড়গুণ হয়ে ফিরে আসবে, এ বাদে ক্ষেতের ধান তো আছেই! কিন্তু কেন এসব! এতটুকু একটা মেয়ে দুবেলা ভাত করে খেতে পায় না—একখানা কাপড় গায়ে শুকোয়! তবুও না, না আর না!

ধানের গোলা শেষ হতে গোয়াল আরম্ভ হোলো। কুড়ি জোড়া লাঙল চলে, আধমণ থেকে দুমণ পর্যন্ত দুধ হয়। গান্ধারী সকালে উঠে মাটির কড়াইতে করে ফেন-ভাত রেঁধে শুধু নুন দিয়ে ভাইবোনদের খাওয়ায়। তবুও সেই একই কথা না, না, আর না।

মতিলালের বাড়ির দক্ষিণে তার ভাই শ্যামলালের বাড়ি। পশ্চিমের পোড়ো জমিটার ওপোর কোন রকমে একখানা চালাঘর বেঁধে রুগ্ন বাপকে নিয়ে গান্ধারী মাথা গুঁজে আছে। বৃষ্টি পড়লে ঘরের ভেতরে জল পড়ে—জোরে বাতাস দিলে গান্ধারী ঈশ্বরকে স্মরণ করে। যাই হোক, তবু সে কোনো রকমে বেঁচে আছে ছোট ছোট মা-মরা ভাইবোনদের নিয়ে। আগে যে গ্রামে থাকতো, সেখানে তার স্বজাতিরা রোগের মহামারীতে গ্রাম ছেড়ে পালায়—তারপর একদিন বদমাইসের দল গান্ধারীকে চুরি করে নিয়ে যায়। সে কোনো রকমে পালিয়ে আসবার পরই তার বাবা মতিলাল-দের গ্রামে চলে এসে তারই বাড়ির কাছে ঘর বাঁধে। মতিলাল এই নিরাশ্রয় পরিবারকে বাঁশ দিয়েছে, খড় দিয়েছে, তিন মাসের খোরাকী ধান দিয়েছে। গান্ধারীর বাপ তারপরই যে বিছানা নিয়েছে আর ওঠেনি। গান্ধারীর দিকে গ্রামের লোকেরা চেয়ে দেখতো, আর বলাবলি করতো—মতি মোড়লের কপাল ভালো। জাল ছিঁড়ে রুই পালালো তো কাৎলা এলো!

মতিলাল কি ভাবতে ভাবতে পায়ে পায়ে গান্ধারীদের বাড়ির উঠোনে গিয়ে উঠলো। উঠোনের ওপোরের উনুনে নারকোল পাতার জ্বাল দিয়ে মাটির কড়ায়ে করে ফেনভাত রেঁধে ভাইবোনদের খেতে দিয়েছে। সবচেয়ে ছোটটাকে কোলের ওপোর বসিয়ে খাইয়ে দিচ্ছিলো। মতিলালকে আসতে দেখে এই সুখী পরিবারের উদরপূর্তির তৃপ্তির উচ্ছ্বাস বন্ধ হোলো। গান্ধারীর মুখ মুখোসের, তার কোনো পরিবর্তন হয় না।

"আমার বাড়ি তো কত দুধ ফেলা যায়; ছেলেপিলেগুলোরে ভাতের সাথে একটু দুধ এনে খাওয়াতে তো পারিস!"

যেমন দেরিতে উত্তর দেয় গান্ধারী, তেমনি দিল,—গেরামে কি আর ছেলেপিলে নেই, না আর কেউ নুন-ভাত খায় না!

"দুধ না আনিস চালগুলো তো বদলিয়ে আনতে পারিস! অত মোটা আউশের চাল কি ছেলেপিলের সহ্য হয়।

মাটির দিকে চোখ রেখে গান্ধারী জবাব দিলে—এরা তো তবু খাচ্ছে, তা মোটাই হোক, আর যাই-ই হোক। অনেকের ঘরে আজ তাও নেই।

নিরুত্তর মতিলাল ফিরে যাচ্ছিলো খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে। কি ভেবে ফিরে এসে বললে—আমার একটা কথা রাখ গান্ধারী, একখান কাপড় এনে দিই, পর। বয়সের মেয়ে—ছেঁড়া কাপড় পরে থাকলে অপদেবতার দিষ্টি লাগে। —একটু রসিকতার চেষ্টা হয়তো মতিলাল করছিলো, কিন্তু গান্ধারীর মুখের দিকে চেয়ে চুপ করলো। আর কোনো কথা বলবার সুযোগ নেই দেখে আস্তে আস্তে উঠোন পার হয়ে দুই বাড়ির মধ্যবর্তী একটা কামিনী ফুলের ঝাড়ের কাছে পৌঁছেছে, এমন সময় গান্ধারী ডাকছে শুনতে পেলো।

সামান্য একটু দূর থেকে সে তাকে উদ্দেশ করে বললে—তুমি কি আমাদের গেরাম ছাড়া করতে চাও মোড়ল? মনের ইচ্ছে খুলে বলো, মানে মানে নিজের ভিটেয় ফিরে যাই, তা কপালে যা আছে তাই হোক। আর না হোক বেতনার জল তো আছে! ছেলেপিলেগুলোরে জলে ডুবিয়ে দিয়ে, আমি গলায় দড়ি দেবো, এ আমি তোমারে বলে রাখলাম। গান্ধারী বলে গেল।

মতিলাল নিশ্বাস ফেলে বাড়ি ফিরে এলো। গোলা থেকে তখনো ধান নামানো হচ্ছিলো। সকালের রোদ তখনো সামনের আমের বাগিচা ছাড়িয়ে উঠতে পারে নি। দাওয়ার ওপোর বাঁশের খুঁটি ঠেস্যন দিয়ে মতিলাল চুপ করে বসে রইলো।

"ছোট শলার একশলা ধান না দিলে আমার আর চলবে না বড়দা। আওশ ধান উঠলি শোধ করে দেবো।"

মতিলাল মুখ ফিরিয়ে দেখলো তার মামাতো বোন জানকী, বিয়ে হয়েছে দক্ষিণপাড়ার অভিলাষের সঙ্গে। অনেক-গুলো ছেলেমেয়ে নিয়ে জড়িয়ে পড়েছে। মতিলাল কখনো সাহায্য করে, কখনো করে না। আজ মতিলাল বললো—'একশলা নিলে তো আর ধান ওঠা পর্যন্ত চলবে না, আবার তো আসতে হবে। তার চেয়ে একসাথে দু শলা নিয়ে যা।'

হতভম্ব জানকী গোলার দিকে চলে গেল।

একটু পরে দ্বিজবর পাড়ুই, অর্থাৎ যে ধানের হিসেব রাখে, সে এসে জিজ্ঞেস করলে—জানকীরে দু-শলা ধান দিতি বলিছো?

মতিলাল ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালো।

মতিলাল চেয়ে রইলো আমগাছগুলোর সবচেয়ে উঁচু চূড়ার দিকে। এই কিছুদিন আগেও আমতলায় হাজার হাজার আম ঝরে পড়তো। লোকের কোলাহলে কান পাতা যেতো না। আমগাছগুলো নিরর্থক দাঁড়িয়ে আছে নির্লজ্জের মত। আবার কবে সেই মাঘ মাসে মুকুল ফুটবে! একজনের ডাকে চমক ভেঙে মতিলাল দেখলো কানাই বাজনদারের ছেলে শিবচরণ।

মতিলাল জিজ্ঞাসা করলো—"কিরে, কি চাই?"

ছেলেটি বললে—জেঠামশাই, বাবা পাঠিয়ে দিলো, চার খুঁচি বীজ ধানের জন্যে—

মতিলাল নিস্পৃহভাবে জিজ্ঞাসা করলো—বীজ ধান তো বুঝলাম, খাবার ধান আছে?

লেটির অর্থপূর্ণ নীরবতার পরে মতিলাল
র কোনো কথা জিজ্ঞাসা না করে
জবরকে ডেকে ছেলেটিকে বীজ ধান এবং
ার ধান দিতে বলে দিলো।
হ মানুষকে মতিলাল কৃতজ্ঞ করতে
র। একজন শুধু বললে—'না।'
তিলালের এই আকস্মিক পরিবর্তনের
র বেশীক্ষণ চাপা রইলো না। অনেকে
দহ করলো মতিলালের এই সততায়,
তু নিতে কেউ ছাড়লো না। বেলা
ড়িয়ে এলো, ধানের ধুলোয় চারদিক
কার। মতিলাল স্নান করেনি, খায়নি,
সেই এক জায়গাতেই বসে আছে। বসে
দেখছে ধানের লুণ্ঠন আর অনাহার
ার হাত থেকে রক্ষা পাবার সম্ভাবনায়
ুষের কৃতজ্ঞ দৃষ্টি। এরকম লুণ্ঠন
ক্ষণ চলতো বলা যায় না, এমন সময়ে
াশে মেঘ ঘনিয়ে এলো। মেঘ গর্জনের
া অল্প সংবধান বাণীর পর নেমে এলো
টি। প্রার্থীদের ভিড় ভেঙে গেল।
ার দরজা বন্ধ করে ছিদ্রবর চাবি
লালকে দিয়ে চলে গেল।
তারপর ধারার পর ধারা চললো অবিরাম।
ব-পাণ্ডুর কালো মেঘ কতবার বিবর্ণ
লা, বর্ষণ তবু থামলো না। মতিলাল
সময় ঘরে গিয়ে শুয়েছে। তারপর
ন যে তার চোখ দিয়ে জল ঝরতে
ম্ভ করেছে, তা সে নিজেই জানে না।
পক্ষের রাত—প্রহরের পর প্রহর শেষ
চললো। মতিলাল তখনো কাঁদছে।
শ্রু আর বর্ষণের প্রতিযোগিতায় কার
হবে কে জানে!
মী মতিলালের মনকে বিষাদ বায়ু
চ্ছন্ন করেছে। সঞ্চয়ী মতিলাল মনের
জ খুইয়ে কাঁদছে—তার পরিশ্রমের ফল
টে গোলার ধান বিলোনোর সমারোহের
অবসাদের অশ্রু এ নয়।
াত প্রায় তৃতীয় প্রহরের শেষ। হঠাৎ
রের দাওয়ায় কিসের শব্দ হোলো।
লাল জিজ্ঞাসা করলে—কে?
ান্তস্বরে আগন্তুক জবাব দিলো—
ম ছিরিবিলাস।
তিলাল বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করলো
লে এলে কেন মানিকদার থেকে?
ছে কি?
হরিবিলাস জবাব দিলে—বলরামপুরের
ধরা আর গাজীপুরের ঘোষেরা
লের সব মাছ ধরে নিয়ে যাচ্ছে। আর
লেরে আটকিয়ে রেখেছে, আমি কোনো
পালিয়ে এলাম।
াসল মতিলালের চমক এবার ভাঙলো
াওয়ায় বেরিয়ে হাঁক দিলে—শুকলাল,
ও শুকলাল? একটু পরেই শুকলাল
া দিলো 'যাই' বলে। মতিলাল
জিত স্বরে বললে—তোর সড়কি নিয়ে
আসিস। আজ সব কডারে খুন করবো।
ছিরে, তুই গেরামের পরে সকলেরে খবর
দে; অমনি একবার বাজনদার পাড়ায় হাঁক
দিয়ে আসিস। পয়সা খরচ করে জমা
নেবার মুরোদ নেই, পরের বাঁধালে মাছ
ধরার সখ আছে খুব। চোরের ঝাড়গুষ্টি
আজ নির্বংশ করবো।

বৃষ্টি আরো জেঁকে এলো। দেখতে
দেখতে লম্বা লম্বা মশাল জ্বালিয়ে,
তালপাতার টোকা মাথায় দিয়ে আশি-নব্বই
জন লোক জড়ো হোলো। সেই আলো
মতিলালের উঠোন ছাপিয়ে গিয়ে পড়লো
গান্ধারীর কুঁড়ে ঘরে। মতিলালের চোখ
সেদিকে একবার পড়তেই তা ফিরিয়ে
নিলে।

টোকার নীচে মশালগুলো কাঁপছে।
উত্তেজনায় মতিলালের ঘাড় এবং রগের
শিরাগুলো ফুলে উঠেছে—যদি রাজ-
বংশীর ঘরে জন্ম নিয়ে থাকিস তো একটা
খলসে মাছও ওরা যেন নিয়ে যেতে না
পারে। আজ ওরা যদি তোর হকের জিনিস
নিয়ে যায়, তো কাল তোর ঘর সামাল দিতে
পারবি নে।

যোদ্ধাগণ একে একে ডেঙাগুলিতে
গিয়ে উঠলো। শুকলাল বললে—দোহাই
দাদা, তুমি এখনই যেয়ো না। থানায়
একটা এজেহার দিয়ে এসো তার পর
যেয়ো।

আবার যে অন্ধকার সেই অন্ধকার।
ওদের বিদায় দিয়ে নদীর ঘাট থেকে
বাড়িতে ফেরবার পথে মতিলাল দেখলো
গান্ধারীর ঘরে আলো জ্বলছে। কৌতূহলের
বশে সে বেড়ার ফাঁকের কাছে পা টিপে
টিপে গিয়ে দাঁড়ালো। গান্ধারী বলছে—
লক্ষ্মী আমার, সোনা আমার এইদিক ফিরে
শোও? ছিঃ, দাদার সাথে ঝগড়া করে না।
যাকে উদ্দেশ করে কথাগুলো বলা হল
সে বললে "আর কোথায় সরবো দিদি?
দেখ্ তুই! এদিকও জল পড়ে। "গান্ধারী
জবাব দিচ্ছে—তা পড়ুক, চোখ বুজে
শুয়ে ঘুমিয়ে পড়—এখনি রাত পোয়ায়ে
যাবে। আবার একজন জিজ্ঞাসা কোরলো
—মতিদাদা ওদের নিয়ে কেন গেলো দিদি?
গান্ধারী বললে—কোথায় আবার দাঙ্গা
করতে। মতিদাদার আর কি কাজ!
ভগবানের দেওয়া নদীর মাছ, গরীব লোক
দুটো ধরে খাচ্ছে, তাও ওনার সহ্যি হয়
না! এই ছিষ্টি দুনিয়ায় যা আছে সব
ওনার। যাদের শোনানো হচ্ছিল কথা,
তাদের কাছ থেকে সাড়া এলো না। মতিলাল
নিঃশব্দে সরে গেল নিজের ঘরের দিকে।
এমন সময় শুনতে পেলো শুকলালের
বৌএর গলা। সে গান্ধারীকে ডেকে
বলছে—ওরে ও গান্ধারী! তোর পরাণে
কি ভয় নেই! আয় ছেলেমেয়েগুলোরে
নিয়ে এই বাড়ি! রাত পোয়াতে অনেক
দেরী। গান্ধারী বললে—ভয় কিসের
বৌদি! তুমি ঘুমোও। শুকলালের বৌ
বললে—ওমা, ভয় নেই! বটঠাকুর গেলেন
গেরাম শুদ্ধু লোক নিয়ে দাঙ্গা করতে,
গেরামে তো মনিষ্যি বলতে নেই! ওরে
ও গান্ধারী! শুনলি আজকের ব্যাপারখান!
আজ কোন দিক সূয্যি উঠেছে, বটঠাকুর
আজ ছোট ভাইরে ডেকে কথা বলেছেন!
বাক্যি আলাপ তো আজ এক বছর বন্ধ।
ও গান্ধারী আয়!

গান্ধারী বললে—সব কটারে টানাটানি
করি কেমন করে। তুমি ঘুমোও বৌদি,
ভয় নেই।

শুকলালের বৌ তখন গান্ধারীর আশা
ছেড়ে দিয়ে বললে—হে মা বুনোর কাল!
হে বাবা মান্দার ভাঙ্গার পীর। তোমাদের
পুজো দেবো, আমার ঘরের মানুষ ভালোয়
ভালোয় ফিরে আসুক। বটঠাকুরের আর
কি! ঘরের মানুষ তো আর নেই, তাই
দাঙ্গা বাধলি আর গেয়ানগম্যি থাকে না।
কে যায়! কে যাচ্ছো পথ দিয়ে? দু'
একবার ডেকে সে পথিকের সাড়া না পেয়ে
ছোটবৌ আপন মনে বলে উঠলো—গেরামে
একটা জোয়ান মানুষ নেই আর যতো
সব উড়ো আপদ এসে জুটলো এখন।

প্রদীপের সলতেটা উসকিয়ে দিয়ে
গান্ধারী একটু ঢাকচুকি দিয়ে বসবার
চেষ্টা করতে লাগলো। কাপড়ের আঁচলটার
একদিক ভিজে গেছে বাইরের জোলো
হাওয়া বেড়ার ফাঁক দিয়ে আসা যাওয়া
করায়; কেমন যেন শীত শীত করছে।
ছেঁড়া কাঁথা যা ছিলো, সবগুলোই রুগ্ন
বাবা আর ভাইবোনদের গায়ে চাপা দিয়েছে।
ঘরের চারদিকে তাকিয়ে আর কিছু ছেঁড়া
কাপড় চোপড় খোঁজবার চেষ্টা করলো।
না, এমন করে আর চলে না। এই এদের
নিয়ে গান্ধারী কার ওপোর ভর করবে!
বিয়ে যে তাকে কেউ করবে না, একথা
গান্ধারী জানে। তবে মতি মোড়োলের মত
লোক জুটতে পারে অনেক। গান্ধারী
অবশ্য শুকলালের বৌএর মুখে কুন্তির
গলায় দড়ি দেওয়া দুশোর বর্ণনা শুনেছে।
আর যাইই করুক, যে কাজের পরিণামে
গলায় দড়ি দেওয়া ছাড়া উপায় থাকে না,
সে কাজ গন্ধারী কখনই করবে না।

কিন্তু মতিলালকে সে কেমন করে
এড়াবে! তার সহায় নেই সম্বল নেই,
এমন সুনামও নেই যে কারো ঘরের বধূ
হয়ে জীবন কাটিয়ে দেবে। একদিক দিয়ে
মতিলালের প্রস্তাব অত্যন্ত অন্যায় হলেও
এর চেয়ে মহত্তর কিছু তার আগামী
জীবনে সম্ভব হবে না। কিন্তু তার আগেই
গান্ধারী গলায় দড়ি দেবে।

কিন্তু এও আর সহ্য হয় না। ভালো

করে খাওয়া জোটে না তাদের কারোরই, ছেলেপিলেগুলোর পরবার দরকার হয় না তেমন তাই রক্ষে! তার নিজের যা কাপড় চোপড় তা পরে মানুষের সামনে বের হওয়া যায় না। যা যোটে তাই দিয়ে খাওয়া দাওয়া চুকিয়ে সন্ধে বেলাতেই ঘরে ঢোকে। আগে এই ছোট ঘরে ভাইবোন-দের নিয়ে নিরাপদে রাত কাটিয়েছে। কিন্তু এ বর্ষায় খড়ের চাল ফুটো হয়ে জল পড়ছে।

অবশেষে নিরুপায়ের উপায় শুকেলালের বৌএর কাছে একখানা কাপড় চেয়ে পরা। চালের বাতা থেকে তালপাতার টোকাখানা মাথায় দিয়ে শুকেলালের ঘরের কাছে গিয়ে ডাকলো—বৌদি, ও বৌদি! ঘুমিয়ে পড়েছো নাকি! আরো কয়েকবার ডেকে সাড়া না পেয়ে নিরাশ হয়ে ফিরে আসছিলো; হঠাৎ তার চোখ পড়লো মতি-লালের দাওয়ার ওপোর। অন্ধকারে কিছু চোখ পড়ে না, কিন্তু কোন জন্তু জানোয়ার কি যেন কড়মড় করে খাচ্ছে সেটা আওয়াজ থেকে বোঝা যায়। গান্ধারী দু একবার তাড়া দিতেও সেটা সেখান থেকে নড়লো না দেখে হাতে একটা বাঁশের লাঠি নিয়ে সেই দিকে এগিয়ে গেলো। একটা কুকুর ছিলো বসে, খুব কাছাকাছি গিয়ে তাড়া দিতেই সেটা পালিয়ে গেল। গান্ধারী চলে আসছিলো, হঠাৎ ফিকে অন্ধকারের মধ্যে দেখলো মতিলালের ঘরের দরজা খোলা। এমন তো কখন হয় না। মতি মোড়োলের হোলো কি! সকাল বেলা গোলার ধান নিয়ে দানছত্তর খুললো আর এখন ঘরের টাকা পয়সা সোনাদানা চোরের হাতে দেবার জন্যে দরজা খুলে রেখে দাঙ্গা করতে গেলো! নাঃ, মতিমোড়ল এবার সন্ন্যাসী হবে। এরকম বেহিসেবী কাজ গান্ধারী অনুমোদন করলো না। তবে মতিলাল তাদের অসময়ে উপকার করেছে, তার ওপোর প্রতিবেশী, অন্তত দরজার শিকলটা তুলে দেওয়া গান্ধারী উচিৎ মনে কোরলো। দাওয়ার ওপোরে উঠে দরজার শিকলটা তুলতে গিয়েছে এমন সময় হঠাৎ গান্ধারীর বুকের রক্ত যেন হিম হয়ে গেল। ঘরের ভেতরে কে যেন কাঁদছে!

কিন্তু অতীতে এই মেয়েটিই মনের জোরে অনেক লোকের দ্বারা নিজের দেহের কদর্য পরিণাম সম্ভব হতে দেয়নি। কত রাতে সর্বনাশের সামনাসামনি দাঁড়িয়ে ভয় পায়নি, আজও পেলো না।

"ঘরের ভিতর কাঁদে কে! শুনতে পাও না!" ঘরের মধ্যে এইমাত্র কান্না থামিয়ে যে জবাব দিলো তার গলা চিনতে পারলেও নিঃসংশয় হবার জন্যে আবার জিজ্ঞাসা যে শোনলাম তুমি গেছো দাঙ্গা করতে।

মতিলাল জবাব দিলো—যাচ্ছিলাম হঠাৎ শরীর কেমন করলো। আলোটা জেবলে দিবি গান্ধারী। দেশলাই শিয়রে রয়েছে নিয়ে যা। আমি আর উঠতে পারি নে।

অনিচ্ছুক গান্ধারী ঠাহর করতে না পেরে মতিলালের বুকে মাথায় হাতড়াতে হাতড়াতে দেশলাই বের করে প্রদীপ জবাললো। ঘরে আলো হতে গান্ধারী জিজ্ঞাসা করলো—তোমার কি হয়েছে, মোড়োল! মতিলাল আর্তনাদের মত করে বলে উঠলো—আমি আর বাঁচবো নারে গান্ধারী, তুই দেখিস আমি ঠিক মরে যাবো।

বাইরের দমকা হাওয়ায় ঘরের আলনায় টাঙানো কাপড়গুলো দুলছে—বাঁশের দোলায় টাঙানো লেপ তোষকগুলোর দিকে চেয়ে গান্ধারী জিজ্ঞাসা করলো—মরবা কেন। বালাই ষাট! তোমার মতো ভাগ্যি-মান যদি মরবে তো আমরা রইছি কি কত্তে।

হাহাকার করে মতিলাল বললো—আমার মত পোড়াকপাল যার তার বাঁচায় সুখ কি! মরবো আমি নিশ্চয়ই, কিন্তু মনে রাখিস গান্ধারী, আমার মত তোর জন্যে কারুর মন পুড়বে না।

গান্ধারী ঝঙ্কার দিয়ে বলে উঠলো—আমি কারুকে মন পোড়াতে বলিনি। গান্ধারীর গায়ের ভিজে কাপড় যেন অসহ্য লাগছে। আলনায় টাঙানো শুকনো ধুতিগুলোর দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে বললে—তা ঘরে শুয়ে গোঙিয়ে গোঙিয়ে কাঁদছিলে কেন। কি অসুখ করেছে। মতিলাল জবাব দলে যে অসুখ তার করেনি। গান্ধারী যেন জবলে উঠলো—তবে ঘরে শুয়ে শুয়ে কাঁদছিলে কেন? গায়ের জোরে সুবিধে হল না তাই বুঝি মেয়ে মানুষের মত কাঁদো? লজ্জা করে না তোমার!

মতিলাল নিজের মেজাজ সামলালো—বেয়ান রাতে তুই কি আমার সাথে ঝগড়া করতে এলি। আমার ঘরে আমি যা খুশি করি না, তোর তাতে কি?

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে গান্ধারী জবাব দিলে—মরে যাই রে! আমার তাতে কি? দিবেরাত্তির আমার পিছনে—ঘাটের পথে আঁচল টেনে ধরো, বাড়ির পরে যেয়ে জুলুম করো ধান-পান যথাসর্বস্যি খয়রাত করে সন্নিসী হ'তে চাও, ভাবো গেরামের লোকের চোখ নেই! দুখীর ভাত সুখ করে খেয়ে এক কোণায় পড়ে আছি, তা এমন শত্তুরও তুমি হয়েছিলে মোড়োল!

মতিলালও ছেড়ে কথা কইলো না—কেন্ আমি তোর করেছি কি! শুধু শুধু ভালমানসের দুষিস্‌নে গান্ধারী, ভগবান আছেন মাথার পরে!

গান্ধারী আজ শেষ করে ছাড়বে—শাপমান্যি কোরোনা মোড়োল, ভালো হবে না! আজ যদি আমার জোয়ান বাপ ভাই থাকতো তো পথেঘাটে যখন তখন আমারে অপমানির কথা বলতে পারতে, না সাহস হোতো!

মতিলাল একেবারে মরিয়া হয়ে উঠলো—ভালো আপদে পড়া গেল তোরে নিয়ে! ওরে, আমি তোরে বলেছি কি! দোষের মধ্যে বলেছি, দেখ গান্ধারী, আমার ঘরে কেউ নেই, আমারে বিয়ে কর। তোরও ভালো হক, আমারও ভাল হোক! তোর যদি বিয়ে বসার মন না থাকে তোর মনে যা চায় তাই কর, আমার মন যা চায় তাই করি! এর মধ্যে ঝগড়া করিস্ কেন্!

গান্ধারী খানিকক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। অবশেষে একেবারে পরি-বর্তিত গলায় বললে—ওকথা তুমি কখন বললে আমারে, ধর্ম্ম রেখে কথা বোলো মোড়োল!

মতিলাল বিস্মিত হয়ে বললে—কোন কথা? কোন কথা বলিনি তোরে?

গান্ধারী কোনো জবাব না দিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো।

কথার জবাব দে, ঐ দেখ পুব দিক ফরসা হয়ে আসে, রাত পোয়াতে দেরী নেই। চুপ করে থাকিস কেন! এতো বড়ো মেয়ে, সময় অসময় বুঝিস্‌নে! গান্ধারী তবুও চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। মতিলাল একেবারে গান্ধারীর কাছে সরে এলো—জোরে না বলিস্ আস্তে বল? আস্তে বললেই আমি শুনতে পাবো, বল?

গান্ধারী অত্যন্ত মৃদু স্বরে বললে—বিয়ে করার কথা তুমি কবে বললে!

মতিলাল বিস্ময়ে কথা হারিয়ে ফেললো আঃ আমার পোড়াকপাল! সে তোরে দিবে-রাত্তিরই বলি! তুই বুঝি মনে করে-ছিলি...! তা মনে হবারই কথা। যা ঘটে, মানুষে রটায় তার চারগুণ। যত নিমক-হারাম জুটেছে আমাদের গেরামে! ও কিরে! অমন করে কাঁপিস কেন্ গান্ধারী। মতিলালের হঠাৎ খেয়াল হতে গান্ধারীর কাপড়খানার একপাশ ছুঁয়েই বলে উঠলো—কী সব্বনেশে মেয়ে রে তুই, এতক্ষণ ভিজে কাপড়ে দাঁড়িয়ে আছিস! তারপর আলনা থেকে একখানা ধুতি কাপড় টেনে নিয়ে বললে—আজ এইখান পর, ছেরবান মাসে যে দিন পাই, সেই দিনই তোরে হাটের শাড়ি পরায়ে ঘরে আনবো।

আলমারীটার আড়াল থেকে বেশ পরি-বর্তন করে গান্ধারী ফিরে এসে প্রদীপের সামনে দাঁড়ালো। শাদা কাপড় পরা, নিরা-ভরণ শ্যামবর্ণা মেয়ের দিকে তাকিয়ে

(শেষাংশ ৭৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বঙ্গের জাতীয় কবিতা ও সংগীত

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

(পূর্বানুবৃত্তি)

রবীন্দ্রনাথ ১৩১১ সাল ৪র্থ বর্ষ, জৈষ্ঠ, দ্বিতীয় সংখ্যায় সাময়িক প্রসঙ্গে বঙ্গ-বিভাগ সম্বন্ধে যে আলোচনা করিয়াছিলেন তাহা একান্তভাবে লক্ষ্য করিবার আছে। এবং সে সময়কার অনেক গানের সুরেও তাহা ফুটিয়া উঠিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ বলেন: "বঙ্গ-বিভাগ এবং শিক্ষাবিধি লইয়া আমাদের দেশে সম্প্রতি যে আন্দোলন হইয়া গেছে, তাহার মধ্যে একটি অপূর্বত্ব বিদেশী লোকেরাও লক্ষ্য করিয়াছে। সকলেই বলিতেছে, এবারকার বক্তৃতাদিতে রাজভক্তির ভরং নাই, সামলাইয়া কথা কহিবার প্রয়াস নাই, মনের কথা স্পষ্ট বলিবার একটা চেষ্টা দেখা গিয়াছে। তাছাড়া, একথাও কোনো কোনো ইংরাজি কাগজে দেখিয়াছি যে, রাজার কাছে দরবার করিয়া কোনো ফল নাই,— এমনতর নৈরাশ্যের ভাবও এই প্রথম প্রকাশ পাইয়াছে।"

সে সময়ে কবি বাঙালী জাতিকে যে কঠোর সত্য কথা শুনাইয়াছেন তাহা আজ প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পরেও সত্যরূপে প্রতিভাত হইতেছে। কবি বলিয়াছেন:

"পরের কাছে সুস্পষ্ট আঘাত পাইলে পরতন্ত্রতা শিথিল হইয়া নিজেদের মধ্যে ঐক্য সুদৃঢ় হয়। সংঘাত ব্যতীত বড় কোন জিনিষ গড়িয়া উঠে না। ইতিহাসে তাহার অনেক প্রমাণ আছে।

"কিন্তু আমরা আঘাত পাইয়া নিরাশ্বাস হইয়া কি করিলাম? বাহিরে তাড়া খাইয়া ঘরে কই আসিলাম? অবিরত সেই রাজ দরবারেই ছুটিতেছি। এ সম্বন্ধে আমাদের কি কর্তব্য, তাহার মীমাংসার জন্য নিজেদের চন্ডীমন্ডপে আসিয়া জুটিলাম না?

"দেশের প্রতি আমাদের কথা এই—আমরা আক্ষেপ করিব না, পরের কাছে বিলাপ করিয়া আমরা দুর্বল হইব না! কেন এই রুদ্ধদ্বারে মাথা খোঁড়াখুঁড়ি, কেন এই নৈরাশ্যের ক্রন্দন? মেঘ যদি জল বর্ষণ না করিয়া বিদ্যুৎ কশাঘাত করে, তবে সেই লইয়াই কি হাহাকার করিতে হইবে! আমাদের দ্বারের কাছে নদী বহিয়া যাইতেছে না? সে নদী শুষ্কপ্রায় হইলেও তাহা খুঁড়িয়া কিছু জল পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু চোখের জল খরচ করিয়া মেঘের জল আদায় করা যায় না।" কবির এই বাণীর গীতিরূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে নিম্নলিখিত সংগীতে। কবি গাহিয়াছেন:

মা কি তুই পরের দ্বারে পাঠাবি তোর
ঘরের ছেলে।
তা'রা যে করে হেলা, মারে ঢেলা,
ভিক্ষাঝুলি দেখতে পেলে।
করেছি মাথা নিচু, চলেছি যাহার পিছু
যদি বা দেয় সে কিছু অবহেলে—
তবু কি এমনি ক'রে, ফিরব ও'রে,
আপন মায়ের প্রসাদ ফেলে।

*   *   *   *

আমাদের আপন শক্তি, আপন ভক্তি,
চরণে তোর দেব মেলে।

আমরা যদি আপনার শক্তিতে বিশ্বাস করিয়া কর্মপথ স্থির করি এবং দৃঢ়-বিশ্বাসে দাঁড়াইতে পারি তবে নৈরাশ্য কিরূপে আসিবে? ক্রন্দন নারীর পক্ষে শোভন—পুরুষের পক্ষে নয়। মানুষ যেখানে আপনাকে দুর্বল মনে করে, যেখানে চোখের জলই তার সম্বল হয়, যে শুধু কাঁদিতেই জানে—তাহার প্রতিকার করিতে পারে না, তাহার আশ্রয় কোথায়?

রবীন্দ্রনাথ তাই দৃঢ় কন্ঠে দেশবাসীকে বলিলেন:

ছি ছি চোখের জলে ভেজাসনে আর মাটি।
এবার কঠিন হয়ে থাক্‌না ও'রে
বক্ষ-দুয়ার আঁটি—
জোরে বক্ষ-দুয়ার আঁটি॥

*   *   *   *

দেখলে ও তোর জলের ধারা
বারে বারে হাসবে যারা,
তা'রা চারিদিকে—
তাদের দ্বারেই গিয়ে কান্না জুড়িস,
যায় না কি বুক ফাটি'—
লাজে যায় না কি বুক ফাটি॥
দিনের বেলায় জগৎ-মাঝে সবাই যখন
চলছে কাজে,
আপন গরবে—
তোরা পথের ধারে কথা নিয়ে
কেবল করিস ঘাঁটাঘাটি—
করিস ঘাঁটাঘাটি॥

কবি স্বদেশী যুগে সারা বাঙলা দেশের প্রাণে বাঙালীর হৃদয়ে এক মহা আশ্বাসের বাণী প্রচার করিয়াছিলেন। তিনি বাঙালীকে সংকল্পে দৃঢ় এবং নিরানন্দ ও নিরাশ্বাসের হাত হইতে দূরে থাকিতে বলিয়াছেন। সাহসে বুক বাঁধিতে আহবান করিয়াছেন।

বুক বেঁধে তুই দাঁড়া দেখি,
বারে বারে হেলিসনে ভাই।
শুধু তুই ভেবে ভেবেই
হাতের লক্ষ্মী ঠেলিসনে, ভাই॥

রবীন্দ্রনাথ নির্ভীকভাবে স্বদেশীযুগে বলিয়াছিলেন:—"বৃটিশ গভর্নমেন্ট নানাবিধ অনুগ্রহের দ্বারা লাঞ্ছিত করিয়া কোনো মতেই আমাদিগকে মানুষ করিতে পারিবেন না, ইহা নিঃসন্দেহ—অনুগ্রহভিক্ষুদিগকে যখন পদে পদে হতাশ করিয়া তাঁহাদের দ্বার হইতে দূর করিয়া দিবেন, তখনই আমাদের নিজের ভান্ডারে কি আছে, তাহা আবিষ্কার করিবার অবসর হইবে, আমাদের নিজের শক্তি ।বারা কি সাধ্য তাহা জানিবার সময় হইবে, আমাদের নিজের পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত, তাহা বিশ্বগুরু বুঝাইয়া দিবেন। যাচিয়া মান, কাঁদিয়া সোহাগ যখন কিছুতেই জুটিবে না, বাহির হইতে সুবিধা এবং সম্মান যখন ভিক্ষা করিয়া দরখাস্ত করিয়া অতি অনায়াসে মিলিবে না—তখন ঘরের মধ্যে যে চিরসহিষ্ণু প্রেম লক্ষ্মীছাড়াদের গৃহ প্রত্যাবর্তনের জন্য গোধূলির অন্ধকারে পথ তাকাইয়া আছে, তাহার মূল্য বুঝিব—তখন মাতৃভাষায় ভ্রাতৃগণের সহিত সুখ-দুঃখ-লাভ-ক্ষতি আলোচনার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিতে পারিব, প্রোভিনশাল কনফারেন্সে দেশের লোকের কাছে বিদেশের ভাষায় দুর্বোধ বক্তৃতা করিয়া আপনাদিগকে কৃতকৃত্য জ্ঞান করিব না—এবং সেই শুভদিন যখন আসিবে, ইংরাজ যখন ঘাড়ে ধরিয়া আমাদিগকে আমাদের নিজের ঘরের দিকে, নিজের চেষ্টার দিকে জোর করিয়া ফিরাইয়া দিতে পারিবে, তখন ব্রিটিশ গভর্নমেন্টকে বলিব ধন্য—তখনি অনুভব করিব, বিদেশীর এই রাজত্ব বিধাতারই মঙ্গল বিধান! হে রাজন, আমাদিগকে যাহা যাচিত ও অযাচিত দান করিয়াছ, তাহা একে একে ফিরাইয়া লও, আমাদিগকে অর্জন করিতে দাও! আমরা প্রশ্রয় চাহি না, প্রতিকূলতার দ্বারাই আমাদের শক্তির উদ্বোধন হইবে! আমাদের নিদ্রার সহায়তা করিও না, আরাম আমাদের জন্য নহে, পরবশতার অহিফেনের মাত্রা প্রতিদিন আর বাড়িতে দিয়ো না—তোমাদের রুদ্রমূর্তিই আমাদের পরিত্রাণ! জগতে জড়কে সচেতন করিয়া তুলিবার এই মাত্র উপায় আছে;—আঘাত, অপমান ও একান্ত অভাব, সমাদর নহে, সহায়তা নহে, সুভিক্ষ নহে!"

রবীন্দ্রনাথ স্বদেশীযুগে বঙ্গবিভাগকালে বাঙালীকে যে মন্ত্র দিয়াছিলেন—যে

অমোঘবাণী, আশা ও মন্ত্র উদ্দীপিত করিয়াছিলেন তাহা হইতেছে এইঃ—

চলো যাই চলো যাই চলো যাই
চলো পদে পদে সত্যের ছন্দে,
চলো দুর্জয় প্রাণের আনন্দে॥
চলো মুক্তি পথে
চলো বিঘ্নবিপদজয়ী মনোরথে
করো ছিন্ন, করো ছিন্ন,
স্বপ্ন কুহক করো ছিন্ন।
থেকো না জড়িত অবরুদ্ধ
জড়তার জর্জর বন্ধে।
বলো জয়, বলো জয়, বলো জয়
মুক্তির জয় বলো ভাই॥

* * * *

দূর কর সংশয় শঙ্কার ভার
যাও চলি' তিমির দিগন্তের পার,
কেন যায় দিন হায় দুশ্চিন্তার দ্বন্দ্বে
চলো দুর্জয় প্রাণের আনন্দে।

* * * *

হও মৃত্যু তোরণ উত্তীর্ণ,
যাক্ যাক্ ভেঙে যাক যাহা জীর্ণ
চলো অভয় অমৃতময় লোকে
অজর অশোকে,
বলো জয়, বলো জয়, বলো জয়
অমৃতের জয় বলো ভাই।

রবীন্দ্রনাথ দেশবাসীকে বহুবারই কর্মের পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার সেই আহ্বান বাণী বারবারই ব্যর্থ হইয়াছে। দেশ তাহা গ্রহণ করে নাই। কোন কাজ কোন উচ্চ আকাঙ্ক্ষাকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়িয়া ধরিয়া রাখিবার ক্ষমতা বাঙালীর নাই।

বঙ্গ-বিভাগ যেমন অনুরূপে বিভিন্ন বিভাগের মধ্য দিয়া সম্মিলিত হইল, পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গ আবার যুক্ত-বঙ্গরূপে মিলিত হইল—তখন ধীরে ধীরে আবার সমুদয় থামিয়া গেল। তখন কবি বড় মর্ম দুঃখে গাহিলেনঃ—

যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক,
আমি তোমায় ছাড়ব না, মা।
আমি তোমার চরণ করব শরণ,
আর কারো ধার ধারব না, মা।

তিনি জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সেই পণ রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। কবি জাতীয় সংগীত বা স্বদেশের সেবায় শুধু বাঙলা দেশ নয়, সমগ্র ভারতবাসীর প্রাণে যে প্রেরণা, যে কল্যাণ-মন্ত্র, যে সত্য ও অমৃতের পথ দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহা চিরন্তন সত্যরূপে ঋষির মহদ্বাণী ও মন্ত্ররূপে দেশবাসীকে যুগে যুগে শতাব্দীর পর শতাব্দী পুণ্য পথ প্রদর্শন করিবে। কে ভুলিতে পারিবে তাঁহার সুমধুর সংগীত—'সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে!' কে বিস্মৃত হইবে—

আমরা পথে পথে যাব সারে সারে,
তোমার নাম গেয়ে ফিরিব দ্বারে দ্বারে।
বলব, 'জননীকে কে দিবি দান,
কে দিবি ধন তোরা, কে দিবি প্রাণ'—
তোদের মা ডেকেছে, কব বারে বারে॥

কেবল বিদেশী পণ্য বর্জন প্রতিজ্ঞা করিলেই সুফল ফলে না; রবীন্দ্রনাথ স্বদেশী দ্রব্য যথেষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন করিবার জন্য দেশবাসীকে আহ্বান করিয়াছেন। চাষের উন্নতি, পল্লীর উন্নতি শিল্প ও কৃষির প্রচার ও বৈজ্ঞানিকভাবে উন্নতির জন্য আকাঙ্ক্ষিত ছিলেন এবং সেদিকে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন এবং কবিরূপে শুধু নয়, কর্মীরূপেও অগ্রসর হইয়াছিলেন। তিনি শুধু কবি ছিলেন না—কর্মী ছিলেন এবং গঠনমূলক কার্যেও ছিল তাঁহার অসাধারণ শ্রম, যত্ন, দূরদৃষ্টি ও অধ্যবসায়। এই প্রেরণা ছিল বলিয়াই শ্রীনিকেতন ও বিশ্বভারতী আজ পৃথিবীর আদর্শ প্রতিষ্ঠানরূপে প্রখ্যাত হইয়াছে। তিনি অলস, অবশ ও দুর্বল প্রকৃতির লোককে দেশসেবায় চাহেন নাই। তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া গাহিয়াছিলেন ঃ

যদি তোর ভাবনা থাকে, ফিরে যা না।
তবে তুই ফিরে যা না।
যদি তোর ভয় থাকে ত করি মানা!

যাঁহারা সেই যুগে একবার হুজুগে মাতিয়া আবার ফিরিয়া গিয়াছেন, কবি তাঁহাদিগকে বলিয়াছেন ঃ —

বারেক এদিক বারেক ওদিক
এখেলা আর খেলিস নে ভাই।
মেলে কি না মেলে রতন,
করতে হবে তবু যতন,
না হয় যদি মনের মতন,
চোখের জলটা ফেলিসনে, ভাই॥

দেশবাসীকে উদ্দেশ করিয়া রুদ্রবীণার তারে ঝংকার দিয়া গাহিয়াছিলেন ঃ

শুভ কর্মপথে ধর নির্ভয় গান
সব দুর্বল সংশয় হোক অবসান।
চির শক্তির নির্ঝর নিত্য ঝরে
লও সেই অভিষেক ললাট পরে।

* * * *

জড়তা তামস হও উত্তীর্ণ,
ক্লান্তি জাল কর বিদীর্ণ,
দিন অন্তে অপরাজিত চিত্তে
মৃত্যু-তরণ তীর্থে কর স্নান।

হুগলী শহরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতির সভাপতি স্বর্গত বৈকুণ্ঠনাথ সেন মহাশয় তাঁহার অভিভাষণে "বয়কট" কথাটি পরিহার করিবার প্রস্তাব করেন। তিনি বিদেশী দ্রব্য বর্জন করিতে বলেন নাই। বৈকুণ্ঠবাবুর মতে, "ইংরেজ যখন উহাতে বিদ্বেষের কারণ দেখিতে পায়, তখন উহা পরিহার করিলে দোষ কি ?" কবি ঐ সময়ের কিছু পূর্বে গাহিয়াছিলেন ঃ

ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে
ততই বাঁধন টুটবে
মোদের ততই বাঁধন টুটবে।
ওদের যতই আঁখি রক্ত হবে
মোদের আঁখি ফুটবে,
ততই মোদের আঁখি ফুটবে।

আবার শুনিতে পাইলাম ঃ

বিধির বাঁধন কাটবে
তুমি এমন শক্তিমান্
তুমি কি এমনি শক্তিমান্।
আমাদের ভাঙাগড়া তোমার হাতে
এমন অভিমান,
তোমাদের এমনি অভিমান।

হুগলীর প্রাদেশিক সম্মেলনে স্বদেশীর স্বপক্ষে একটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল। কিন্তু সে সময়ে স্বদেশী প্রচেষ্টার অনুকূলে কলিকাতা শহরে নূতন করিয়া কোনও ধীরপন্থী বা চরমপন্থী নেতা আন্দোলনে প্রবৃত্ত হন নাই। এক সময়ে সরকার লিখিতে বাধ্য হইয়াছিলেন ঃ

* * * the Swadeshi and boycott movements were vigorously hushed

তাহা ঐ সময়ে ১৩১৬ বঙ্গাব্দ এবং ইংরেজী ১৯০৯ খৃষ্টাব্দেই হ্রাস পাইতে আরম্ভ হয়। লর্ড মর্লি সে সময় বলিয়াছিলেন, বঙ্গচ্ছেদের আন্দোলন এখন নির্বাণোন্মুখ অগ্নিশিখার মত।

বয়কট শব্দটির ইতিহাস এখানে প্রসঙ্গক্রমে বলিতেছি—বয়কট শব্দ অর্থে বর্জন। (ইংরেজীতে যাহার অর্থ হইতেছে to shun or isolate). ক্যাপ্টেন চার্লস বয়কট (Captain Charles Boycott) নামে একজন কৃষকের নাম হইতে বয়কট শব্দের প্রচলন হইয়াছে। চার্লস বয়কট ছিলেন লাউ মাস্ক (Lough Mask) নামক স্থানে লর্ড আর্নের (Lord Erne) স্টেট বা জমিদারীর এজেন্ট বা কর্মকর্তা। ইহার অন্যায় উৎপীড়নে সেখানকার মজুরেরা ক্ষেপিয়া উঠে এবং বয়কটের বাড়িঘর ভাঙিয়া ফেলে, তাহার গরু-বাছুর সব তাড়াইয়া দেয় এবং বয়কটের অবস্থা এমন শোচনীয় হইয়া পড়ে যে, সেখানকার কোন দোকানদার তাহার নিকট কোনও খাদ্যদ্রব্যাদি পর্যন্ত বেচিত না।

দেশের একদল মজুরকে দিয়া শেষবার ক্যাপ্টেন বয়কটের চাষ-বাসের ব্যবস্থা করিতে হইয়াছিল, সেও বড় সহজে হয় নাই। সৈন্যদের সাহায্য লইয়া এবং কামান দাগিবার ভয় দেখাইয়া কাজ করাইতে হইয়াছিল—ঐসব মজুরদের বলিত Emergency Men. বয়কট যখন সপরিবারে ডাবলিনে আসিলেন, তখন কোন হোটেলওয়ালা তাঁহাকে যায়গা দেয় নাই। শেষটায় ক্যাপ্টেন বয়কট লণ্ডন ও আমেরিকায় যাতায়াত করেন। এদিকে কয়েক বৎসর পরে তাঁহার [illegible]

যে একটা বিদ্রোহ ভাব ছিল, তাহা হ্রাস পায়। তখন লণ্ডন নগরী তাঁহার কর্মক্ষেত্র হইলেও বয়কট প্রতি বৎসর অবকাশ কালটা আয়র্লাণ্ডে কাটাইয়া আসিতেন। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে বয়কট শব্দটা সাধারণের মধ্যে ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হয়। (The word boycott came into general use in 1880.)

বয়কট শব্দের ব্যবহার খুব বেশী দিনের না হইলেও বয়কট শব্দ যে অর্থে প্রযুক্ত হয়, অর্থাৎ বর্জন অর্থে—ইহার প্রচলন অনেক প্রাচীন কাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে। বাইবেলেও আমরা ইহার নিদর্শন পাই।

(Revelation XIII, 16—17, Revised Version) of a powerful dictator who 'causeth ..... that no man shall be able to buy or to sell, save he that hath the mark, even the name of the beast or the number of his name"

জার্মানিতে ইহুদীদের বিরুদ্ধে Boycotting অত্যন্ত তীব্রভাবে চলিয়াছিল, সে কথা সকলেই জানেন। Captain Charles Boycott-এর নাম হইতে উৎপন্ন বয়কট শব্দ বর্জন অর্থে এখন পৃথিবীর নানা দেশেই ব্যবহৃত হইতেছে। [Every Bodies Enquire within, Vol. II, Page 1029.]

বয়কট শব্দ বাঙলা দেশেও স্বদেশী যুগ হইতে চলিয়া আসিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ যখন সহসা স্বদেশী যুগের সর্ববিধ কর্মক্ষেত্র হইতে সরিয়া যাইয়া তপোবনের নিভৃত নিকেতন—শান্তিনিকেতনেই আপনার কর্মক্ষেত্র করিলেন, তখন তাঁহার ধ্যানী চিত্ত সন্ধান পাইল—হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, ব্রাহ্মণ সকলেরই অধ্যুষিত বিরাট ভারতবর্ষ। যে মহামানবের পুণ্যতীর্থ ভারতে—যে দেবতার মন্দিরের দ্বার "কোন জাতির কাছে, কোন ব্যক্তির কাছে কোনদিন অবরুদ্ধ হয় না—যিনি কেবলই হিন্দুর দেবতা নন, যিনি ভারতবর্ষের দেবতা।"

তখন কবির কণ্ঠে শুনিলাম অভয়বাণী—

পতন অভ্যুদয় বন্ধুর পন্থা,
যুগ যুগ ধাবিতযাত্রী,
তুমি চির সারথি তব রথচক্রে
মুখরিত পথ দিন রাত্রি।
দারুণ বিপ্লব মাঝে তব শঙ্খধ্বনি বাজে
সংকট দুঃখ-ত্রাতা।
জনগণ-পথ পরিচায়ক জয় হে
ভারত-ভাগ্য বিধাতা।
জয় হে, জয় হে, জয় হে,
জয়, জয়, জয়, জয় হে!

তখনই আবার শুনিতে পাইলাম:

দশ দেশ নন্দিত করি মন্দ্রিত তব ভেরী,
আসিল যত বীরবৃন্দ আসন তব ঘেরি।
দিন আগত ঐ
ভারত তবু কই
সে কি রহিল লুপ্ত আজি সব জন পশ্চাতে
লউক বিশ্বকর্মভার মিলি সবার সাথে।

এই আশ্বাস বাক্যে কবি দেশবাসীকে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বিশ্বজগতে ভারতের গৌরবময় প্রতিষ্ঠার জন্য দেশবাসীকে আহ্বান করিয়া গিয়াছেন। একদিন কবির বাণী — ঋষির বাণী, তাঁহার ধ্যানকে সাফল্যমণ্ডিত করিবে, আমরা সেই আশা অন্তরে পোষণ করি। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'স্বদেশ' নামক গ্রন্থে এবং 'স্বদেশ' শীর্ষক গীত-সংগ্রহে তাঁহার বিরচিত অমূল্য সংগীতগুলি সংকলন করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন; সেই সব সংগীত আলোচনা করিলে কবির বিভিন্ন সময়ে স্বদেশের প্রতি যে মনোভাব ছিল, তাহা পূর্ণভাবে বুঝিতে পারা যায়। এক কথায়—বিভেদ ভুলিয়া এক বিরাট হিয়া সর্বত্র ভারতবাসীর একই মন একই ভাষা, একই ভাব ও ধর্ম দ্বারা ঐক্যের সাধনাই ছিল তাঁহার জীবন-পণ-পল্লীর শিক্ষা, পল্লীর সংস্কার সাধনই ছিল তাঁহার জীবনের অন্যতম সাধনা—মানুষের মর্মন্তুদ বেদনা তাঁহাকে বিচলিত বিক্ষুব্ধ এবং মর্মপীড়িত করিয়াছিল। তাই গাহিয়া গিয়াছেন:

দেখিতে পাওনা তুমি
মৃত্যুদূত দাঁড়ায়েছে দ্বারে,
অভিশাপ আঁকি দিল
তোমার জাতির অহংকারে।
সবারে না যদি ডাকো
এখনো সরিয়া থাক,
আপনারে বেঁধে রাখ
চৌদিকে জড়ায়ে অভিমান,
মৃত্যু মাঝে হবে তবে
চিতাভস্মে সবার সমান।

রবীন্দ্রনাথ সমসাময়িক কবি ও স্বদেশী যুগ দ্বিজেন্দ্রলাল

রবীন্দ্রনাথের সমকালে যাঁহাদের কবি-প্রতিভার দ্বারা বাঙলার সাহিত্য সমুজ্জ্বল হইয়াছিল, দেশবাসী স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল, তাঁহাদের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় বা সেকালে সর্বজন পরিচিত ডি এল রায় ছিলেন সুপ্রসিদ্ধ। দ্বিজেন্দ্রলাল ১২৭০ বঙ্গাব্দে এবং ইংরেজি ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণনগরে জন্মগ্রহণ করেন। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের পিতা কার্তিকেয়চন্দ্র রায় কৃষ্ণনগরের রাজা সতীশচন্দ্র রায়ের দেওয়ান ছিলেন। ইঁহারা বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ। দ্বিজেন্দ্রলালেরা ছিলেন সাত ভাই আর দ্বিজেন্দ্র ছিলেন মাতাপিতার কনিষ্ঠ পুত্র। দ্বিজেন্দ্রলালের জননী প্রসন্নময়ী দেবী ছিলেন নবদ্বীপের অদ্বৈত মহাপ্রভুর বংশের কন্যা। দ্বিজেন্দ্রলালের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারা সকলেই খ্যাতিমান ও বিদ্বান ছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলাল চরিত্রবান ও জিতেন্দ্রিয় মহাপুরুষ ও কর্তব্যনিষ্ঠা-পরায়ণা তেজস্বিনী জননীর সন্তান। পিতা ও মাতার বিবিধ গুণরাশি তাঁহার চরিত্রে বিকশিত হইয়াছিল।

স্বদেশী আন্দোলনের সময় দ্বিজেন্দ্রলালের স্বাভাবিক দেশভক্তি সহস্র গুণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। সাময়িক উত্তেজনার প্রভাববশত যে আন্তরিকতা প্রথমত প্রকাশ পাইয়াছিল, ক্রমে তাহার মধ্যে দেখা দিল অনেক অনর্থক বাক্‌বিতণ্ডা, অর্থের অপব্যয়, সময় ও পরিশ্রমণের অনাবশ্যক-রূপে অপব্যবহার এবং স্বার্থপরায়ণতা। দ্বিজেন্দ্রলাল সেই শ্রেণীর স্বদেশপ্রেমিক কবি ছিলেন না। স্বদেশীর মূলমন্ত্র কি, তিনি তাহা দেশবাসীকে বুঝাইবার জন্য তাহাদের অন্তর মধ্যে স্বদেশী আন্দোলন দৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল রাখিবার জন্য কি নাটক, কি কবিতা সকলের মধ্যেই তিনি দৃঢ়কণ্ঠে আহ্বান করিয়াছিলেন — 'আবার তোরা মানুষ হ।'

দ্বিজেন্দ্রলালের সাহিত্য সাধনার মূলমন্ত্র দেশ-জননীর সেবা। দ্বিজেন্দ্রলাল তরুণ বয়সে 'আর্যগাথা' নামক সংগীত-পুস্তিকা প্রকাশ করেন। তাহার ভূমিকায় লিখিয়াছিলেন—"যাহারা একমাত্র মনুষ্য-প্রেমগীতকেই গীত মনে করেন, "আর্য-গাথা" তাঁহাদিগের জন্য রচিত হয় নাই এবং তাঁহাদের আদর প্রত্যাশা করে না ** যদি কাহারও অধঃপতিতা হতভাগিনী দুঃখিনী মাতৃভূমির জন্য নেত্রপ্রান্ত কখনও সিক্ত হইয়া থাকে, 'আর্যগাথা' তাঁহাদেরই আদর চাহে।" দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁহার ১২ বৎসর হইতে ১৭ বৎসর পর্যন্ত গীত-গুলিই 'আর্যগাথা' নামে প্রকাশিত করেন।

বিলাতে অবস্থানকালে দ্বিজেন্দ্রলালের "Lyrics of Ind" প্রকাশিত হয়। এ বিষয়ে বন্ধুবর অধ্যাপক কৃষ্ণবিহারী গুপ্ত লিখিয়াছেন—"সুদূর প্রবাসেও মাতৃভূমির জন্য যে তাঁহার হৃদয় দুঃখ ও বেদনায় আকুল হইত, তাহা এই পুস্তকের প্রথম কবিতা "The Land of the Sun" হইতে আমরা দেখিতে পাই। কবি ভারত-মাতার এক অতি গৌরবোজ্জ্বল বর্ণনা দিয়া শেষে যাহা বলিতেছেন, আমরা তাহার অনুবাদ দিলাম—

O my land! can I cease to
adore thee,
Though to gloom and misery
hurled?
O dear Bharat! my beautiful
maiden
O sweet Ind; Once the Queen
of the world.

যদিও আঁধার দুঃখের মাঝে
নিপতিতা আজি তুমি,

তথাপি কি অবহেলিতে তোমারে
পারি গো জনমভূমি ?
তুমি যে একদা, হে মোর ভারত,
আছিলে জগতরাণী,
ওগো সুন্দরী ভারত আমার
প্রিয় নিকেতনখানি।

And though wrecked is thy
pride and thy glory,
Of it nothing remains but the
name :
Yet a beauty and sunshine
still lingers,
And yet gleams through the
mid of thy shame.

যদিও সে তব গৌরব যশ
সকলি পেয়েছে লয়,
কিছু নাই আর এখন তাহার
নামটুকু শুধু রয়,
তবুও সে তব লাজ কুহেলিকা
ভেদিয়া দেখি যে আসে,
কি-এক সুষমা—রবির কিরণ,
এখনও নয়নে ভাসে।*

দ্বিজেন্দ্রলালের দেশাত্মবোধের মধ্যে ছিল অকপটতা। দ্বিজেন্দ্রলালের দেশভক্তি সম্পর্কে তাঁহার জীবনচরিতকার স্বর্গত সুহৃদ্‌বর দেবকুমার রায় চৌধুরী লিখিয়াছেন—"দ্বিজেন্দ্রলালের দেশভক্তি বা দেশাত্মবোধের ভিত্তি ছিল—সর্বজনীন দয়া, মৈত্রী ও মঙ্গলেচ্ছায়। এ দেশভক্তির পরম পরিণতি কেবল স্বদেশ ও স্বজাতির নহে,—দেশ-কাল-পাত্র নির্বিচারে এই সমগ্র বিশ্বেরই চিরন্তন ও নিরবচ্ছিন্ন শুভেচ্ছায়! এই কারণে সে দেশাত্মবোধ কখনও কোন জাতি বা দেশের প্রতি তিলার্ধও বিদ্বেষ বা ঘৃণার উদ্রেক করে না। তাহা অতি নিবিড়রূপে বিশ্ব-প্রেমের সঙ্গে সর্বথাই সমসূত্রে গ্রথিত এবং তাহার চরম উদ্দেশ্য বা মুখ্য লক্ষ্য শুধু ভারতোদ্ধার নহে—এ বিশ্বরাজ্যে সেই বিশ্বেশ্বরের, মঙ্গলময় পরমেশ্বর, 'সত্য-শিব-সুন্দরের' ধ্রুব ও চিরন্তন, অনির্বাণ প্রতিষ্ঠা।"

" × × দেশের হিতানুষ্ঠানে তিনি প্রাণপাত করিয়াছেন মানি; কিন্তু দেশকে ভালবাসিলেই যে ইংরেজ জাতির প্রতি বীতরাগ ও অন্ধভাবে বিদ্বিষ্ট হইতে হইবে, তদীয় বাক্যে, কর্মে বা চিন্তায়—এরূপ মতের তিনি তিলার্ধও পোষকতা করিয়া যান নাই। × × দেশবাসী যাহাতে পরানুগ্রহের জন্য লালায়িত না রহিয়া ক্রমে এখন 'আপন পায়ে' আপনারা ভর করিয়া দাঁড়াইতে শেখে, স্বজাতি ও মাতৃভূমির সর্ববিধ শুভসাধনে আত্মোন্নতি বিধানে তাহার, যাহাতে একান্ত মনে অবহিত হয়, এজন্য তিনি নিত্য নিয়ত স্বতঃপরত নিতান্তই চিন্তান্বিত ও যত্নবান ছিলেন এবং সত্য বলিতে কি, ঠিক সেইজন্য যতদিন আমরা স্বরাজ্য লাভে যোগ্য ও সমর্থ না হই, ততদিনের জন্য তিনি এই ব্রিটিশ রাজত্বের উন্নতি ও স্থায়িত্ব সর্বান্তঃকরণে কামনা করিতেন। ইংরেজের আগমন যে এ-দেশে আমাদের এই বহুবিধ উন্নতির মূল, আর এই উদারনৈতিক রাজত্বের উপরে যে আপাতত আমাদের যা কিছু মঙ্গল, যত কিছু উন্নতি, এমন কি প্রত্যুত আমাদের জাতীয় জীবন-মরণও একরূপ নির্ভর করিতেছে, ইহাই তাঁহার অকপট ধারণা বা বদ্ধমূল বিশ্বাস ছিল। এই বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়া সেই স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে অত উদ্দাম উত্তেজনার মধ্যেও আমরা দেখিয়াছি — তিনি ঐ বৈরবুদ্ধিসঞ্জাত বিদেশী বহিষ্কারে বা 'বয়কটের' বিপক্ষে অমন তীব্র অভিমত প্রচার করিয়া তাঁহার একান্ত অনুরাগী ও পরম গুণগ্রাহীদের কাছেও তৎকালে যথেষ্ট লাঞ্ছিত ও অপদস্থ হইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কোন কোন দুর্মতি ও কূটনৈতিক রাজকর্মচারীর অন্যায় আচরণ, অন্যায় উৎপীড়ন বা 'খামখেয়ালি' অত্যাচারের দরুণ সময়ে সময়ে তিনি গভর্নমেন্টের প্রতি খুবই বিরাগ ও অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন জানি; কিন্তু তজ্জন্য তিনি সেই সব শাসকদিগকেই শুধু দোষী সাব্যস্ত করিয়া ব্যক্তিগতভাবে তাঁহাদের উপর রুষ্ট হইয়াছেন। আসলে ব্রিটিশ রাজত্বকে তজ্জন্য তিনি দায়ী করেন নাই, তাহার প্রতি বিরক্ত বা বীতশ্রদ্ধও হন নাই। স্বদেশীর সময়ে একবার এক পত্রে তিনি আমাকে অন্যান্য অনেক কথার পর লিখিয়াছিলেন, "আজ যদি ধর, ইংরেজ-রাজ এ-দেশ ছাড়িয়া চলিয়াই যায়, তা' হলে আমাদের যে কী ভয়াবহ ও শোচনীয় অবস্থা দাঁড়াইবে, আমি তা' কল্পনা করতেও শিউরে উঠি। শ্যাল-কুকুরের অবস্থাও সেদিন আমাদের দুর্দশার কাছে বোধ হয় হার মানবে।"

তাঁহার এ ধারণা সত্য হউক আর ভ্রান্তই হউক যাহা আমি জানি, যথাযথভাবে সে সকল সত্যকথা আমাকে ব্যক্ত করিতেই হইবে। × × তিনি চাহিতেন—ইংরেজই এখন আরও কিছুকাল আমাদের উপরে রাজত্ব করুক, প্রভুত্ব করুক, শাসনকর্তা থাকুক, তবে সে রাজা যেন আমাদের অভিপ্রায় ও সুবিধানুসারে সর্বতোভাবে আমাদের নিরবচ্ছিন্ন কল্যাণকল্পেই নিয়োজিত হয়; উদ্বেগ, অসন্তোষ ও ভয়ের পরিবর্তে এ রাজ্যে অচল-অটুট ভিত্তি যেন আমাদের শান্তি শুভেচ্ছা ও প্রীতির উপরেই দৃঢ়প্রতিষ্ঠ রহিয়া আমাদিগকে পরিণামে যোগ্য ও সম্পূর্ণ স্বাধীন করিয়া তুলিতে সমর্থ হয়। বলা বাহুল্য, অবিমিশ্র, অবাধ স্বাধীনতাই অবশ্য তাঁহার দেশাত্মবোধ বা জাতীয়তার চরম কাম্য ছিল এবং স্বাধীনতা যে মানব মাত্রেরই জন্মস্বত্ব, তিনি বিশেষভাবেই তাহা বারংবার বুঝিতেন ও বলিতেন।"*

দ্বিজেন্দ্রলালের দেশাত্মবোধ কিরূপ ছিল, কি তাঁহার আদর্শ ছিল, তাহা আমরা দেবকুমার বাবুর লিখিত জীবনী হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছি। আমাদের দেশে বঙ্গ-বিভাগ হইলে কলিকাতা টাউন হলে যে এক মহাসভার অধিবেশন হইয়াছিল, তাহাতে সুরেন্দ্রনাথ বঙ্গচ্ছেদ আইন প্রশমিত না হওয়া পর্যন্ত 'বয়কট' বা বিদেশী পণ্য বর্জন প্রস্তাবটি পরিগ্রহ করিবার জন্য দেশবাসীকে প্রবুদ্ধ করেন। বিপিনচন্দ্র পাল প্রভৃতি ঐরূপ প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, "সাময়িক বিদ্বেষবুদ্ধি পরিচালিত হইয়া 'বয়কটের' ভিত্তির উপর যদি স্বদেশী আন্দোলনকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়, তবে দেখা যাইবে যে, কালে এ সুসংকল্প কিছুতেই চিরস্থায়িত্ব লাভ করিতে সমর্থ হইবে না।" বিপিনচন্দ্রের এ প্রতিবাদ গৃহীত হইল না। সুরেন্দ্রনাথের প্রস্তাব সকলে পরিগ্রহ করিলেন।

দ্বিজেন্দ্রলাল এই বয়কট প্রস্তাবের বিরোধী ছিলেন। তাঁহার ঐ বিষয়ের মন্তব্য দেবকুমার বাবুকে একখানি পত্রে লিখিয়াছিলেন—"এখানে এখন প্রত্যেক দিন দুটি বেলাই আমার সঙ্গে বন্ধুদের ভীষণ তর্কযুদ্ধ হয় যে, যেভাবে 'এই স্বদেশী আরম্ভ হইল, তা বাস্তবিক আমাদের দেশে স্থায়ী ও মঙ্গলজনক হবে কি না। সকলেই আমার বিপক্ষে, আমি একা। কিন্তু 'একা লব সমকক্ষ শত সেনানীর।' আমি বলি, এই বিদ্বেষমূলক বয়কটের দ্বারা আমাদের পরিণামে সর্বনাশ হবে, ইহাতে আমাদের স্থায়ী কল্যাণ কোনমতেই সম্ভব নয়। এ-দেশ যদি আজ পর-প্রসঙ্গ ও বিজাতির বিদ্বেষ ভুলিয়া প্রকৃত আত্মোন্নতি—নিজেদের কল্যাণসাধনে তৎপর হয়, তবে এমন কোন শক্তি নাই যে, তাহার সে বলদৃপ্ত গতি রোধ করিতে পারে। কিন্তু অযথা এ আস্ফালন ও যাহারা আমাদের শিক্ষা-গুরু, যাহাদের কৃপায় ও ইচ্ছায় আমাদের এই যা কিছু উন্নতি সম্ভবপর হইয়াছে তাহাদের প্রতি আমাদের একরকম বিদ্বেষ যতদিন সম্যক তিরোহিত না হইবে, ততদিন আমাদের প্রকৃত উদ্ধারের সহজ কোন উপায় আমি দেখি না।" [দ্বিজেন্দ্রলাল ৩৯২—৯৩ পৃষ্ঠা]

দ্বিজেন্দ্রলালের চরিত্রে এমন একটা দৃঢ়তা ছিল—যে দৃঢ়তার দ্বারা তিনি আপনার সুচিন্তিত মত হইতে বিচলিত

(শেষাংশ ৪৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

* দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের স্মৃতিতর্পণ শ্রীকৃষ্ণ-গুপ্ত এম এ. প্রবাসী জ্যৈষ্ঠ—১৩১৯।

* দ্বিজেন্দ্রলাল—দেবকুমার রায় চৌধুরী [illegible]

পৃথিবীর বৃহত্তম দূরবীক্ষণ যন্ত্র

কৃত্তিকা

ার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রশান্ত মহাসাগর স্থ ক্যালিফোর্ণিয়া প্রদেশের মাউন্ট ামার (Mt. Palomar) মানমন্দিরে ৃহত্তম দূরবীক্ষণ যন্ত্রের (telescope) ণ কার্য্য চলছে তা একদিন 'বিশ্ব-ন্ডের রহস্য উদ্ঘাটনে মানুষকে ক্তর সহযোগিতা করবে বলে ানিকগণ অভিমত প্রকাশ করছেন। ট পালোমার (Mt. Palomar) ায় ৫,৫৯৮ ফুট। এখানের শান্ত াওয়া গবেষণা কার্যে বিশেষ বাধার ি করবে না। মানমন্দিরটির উচ্চতাই । ফুট। মানমন্দিরের উপরিভাগে গালাকৃতি গম্বুজ আছে। উপরি-র এই গম্বুজটিকে ঘোরান যায়। গম্বুজস্থিত উন্মুক্ত স্থানটি ইচ্ছামত ত্ত আনা যায়। গম্বুজের উন্মুক্ত নটির বিস্তৃতি হচ্ছে ৩৭ ফুট। এই ুক্ত স্থানটিকে বন্ধ করবারও আয়োজন হ। দূরবীক্ষণ যন্ত্রটির ওজন ৫০০ ওজনে ভারী হলেও যন্ত্রটিকে এমন ি এবং সুন্দরভাবে নাড় চাড়া করা হবে কাথাও এতটুকু শব্দ বা কম্পন অনুভূত না।

মাউন্ট পালোমার দূরবীক্ষণ যন্ত্রের গীয়ার (Gear)

দূরবীক্ষণ যন্ত্রের নলটির দৈর্ঘ্য ৫০ ফুট। এই নলটিকেও অনায়াসে ঘুরিয়ে মহাশূন্যের যে কোন স্থানে নির্দিষ্ট করা যায়। দূরবীক্ষণ যন্ত্রের বৃহদাকার দর্পনটি ছাড়া বাকি সব কাজ শেষ হয়েছে। যুদ্ধ শেষ হবার কিছু পরেই এই মানমন্দিরে একটি ২০০ ইঞ্চি ব্যাস বিশিষ্ট 'ঘসা-কাচ' (ground glass) নির্মিত দর্পন দূরবীক্ষণ যন্ত্র নির্মাণে ব্যবহার করা হবে।

দূরত্ব অনুমানে বোধ হয় পৃথিবী থেকে ৬, ০০০, ০০০, ০০০, ০০০, ০০০, ০০০, ০০০ মাইল। এই নব আবিষ্কৃত দূরবীক্ষণ যন্ত্র এমন সমস্ত নক্ষত্রের আলোক চিত্র গ্রহণ করবে যারা ১০০ শত কোটি আলোক বৎসর পূর্ব্ব থেকে পৃথিবীর দিকে আলোক বিকিরণ করতে আরম্ভ করেছে—পৃথিবীর অগ্নিময় গোলক পিন্ড অবস্থার থেকে বলা চলে।

৫০০ শত টন ওজনের দূরবীক্ষণ যন্ত্রের নক্সা (ছবি—Usowi)

মানমন্দিরের প্রধান ঘরের control desk থেকে জ্যোতির্ব্বিদগণ দূরবীক্ষণ যন্ত্রটিকে মহাশূন্যের একটি বিন্দুর দিকে নির্দিষ্ট করতে পারবেন এবং এই বিন্দুটির স্থান প্রায় নির্ভুলই হবে। ভুল হবে মহাশূন্যের পরিধির ২৫৯০০০ ভাগের একভাগ মাত্র। এ ঘটনা জ্যোতিষ বিজ্ঞানের এক বিস্ময় বলা যেতে পারে। যে বিন্দুটির দিকে দূরবীক্ষণ যন্ত্রটী নির্দিষ্ট হবে, তার

সাধারণের ধারণা যে, সব দূরবীক্ষণ যন্ত্রই লেন্সের সাহায্যে নির্মিত। কিন্তু তাঁরা শুনে অবাক হবেন, মাউন্ট উইলসন মান-মন্দিরে অবস্থিত ১০০ শত ইঞ্চি ব্যাস বিশিষ্ট অন্যতম শক্তিশালী দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মতই মাউন্ট পালোমার মানমন্দিরের ২০০ শত ইঞ্চি ব্যাস বিশিষ্ট দূরবীক্ষণ যন্ত্রের কোন লেন্স নেই। বাস্তবে এই

যন্ত্র দুটী দর্পন সংযুক্ত প্রতিফলক বিশেষ। বক্র কাচের (concave glass) উপর রৌপ্য বা এলুমিনিয়মের কলইয়ে দর্পণ নির্মিত। দর্পনটি আলোক-রশ্মিসমূহকে যন্ত্রটির উপরিভাগের শেষ অংশে অবস্থিত কেন্দ্র স্থলে (focus) প্রতিফলন করে। সেখান থেকে প্রতিফলিত রশ্মিসমূহ অবলোকন যন্ত্র (Eye-Piece) অথবা ফটোগ্রাফিক প্লেটের উপর পতিত হয়।
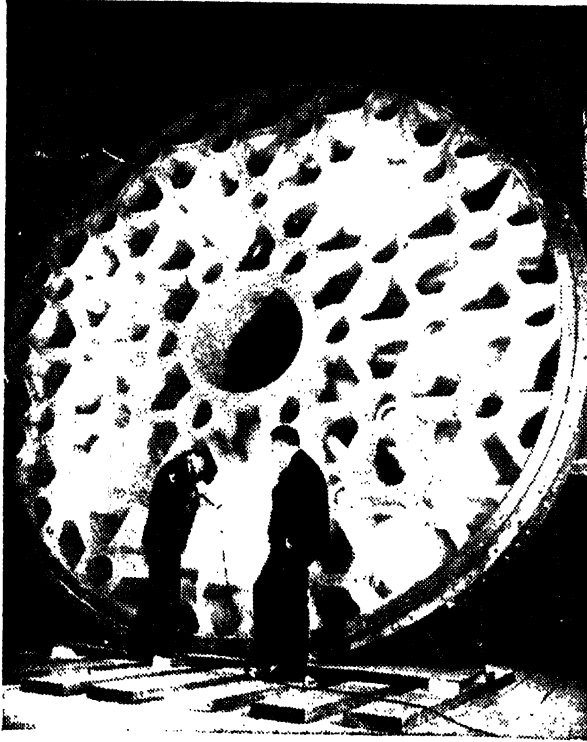
বক্রীকৃত কাচ দর্পণের (Concave Glass mirror) পশ্চাদভাগ

মানমন্দিরের পরিকল্পনার প্রারম্ভে মনে করা হয়েছিল, বক্র দর্পনটির (concave mirror) জন্য যে খসা কাচের চক্র (ground glass disc) প্রয়োজন তা অতি সহজেই নির্মিত হবে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে বহু অসুবিধা উপস্থিত হওয়ায় ১৯৩৪ সালের মার্চ মাসে দর্পণ নির্মাণের প্রথম প্রচেষ্টা বিফল হ'ল। শেষে ঐ বৎসরেরই ডিসেম্বর মাসে চক্র নির্মাণের কাজ আরম্ভ হ'ল এবং সাফল্যের সংগেই কাজ চলতে লাগল যুদ্ধ আরম্ভের পূর্ব পর্যন্ত। গত সাত বছরের কাজের পরও চক্র নির্মাণের কাজ এখনও সম্পূর্ণ শেষ হয়নি। বর্তমানে যুদ্ধের জন্যই নির্মাণকার্য স্থগিত রাখা হয়েছে।

আলোচ্য দূরবীক্ষণ যন্ত্রটি নানা-দিক থেকে বৈজ্ঞানিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। সাধারণত দূরবীক্ষণ যন্ত্রের দর্পনের ২০০ ইঞ্চি ব্যাস বিশিষ্ট ডিস্কের স্থূলতা প্রায় ৩৩ ইঞ্চি (ব্যাসের ৬ ভাগের ১ ভাগ) এবং ওজন প্রায় ৪০ টন ভারী হ'বার কথা। এই বিরাট ওজনের ফলে দূরবীনের নলের নিম্নাংশ একদিকে ঝুলে যাবার কথা। সেই কারণে ডিস্কটিকে একটি কঠিন শিরাল আকৃতিতে গঠন (Ribbed Structure) করা হয়েছিল। ফলে তার স্থূলতা দাঁড়ায় ২৫ ইঞ্চিতে এবং ওজনও ৪০ টনের পরিবর্তে ২০ টন হয়।

যে ছাঁচ এবং ১১৪টি ছিদ্রযুক্ত প্রকোষ্ঠ দূরবীক্ষণ যন্ত্রের ডিস্কটির পশ্চাৎভাগ শিরাল করেছে তারা প্রচণ্ড তাপরোধকারী ইটের তৈরী। এই ডিস্কটিকে ঠাণ্ডা করে কঠিন করতে এক বিশেষ চুল্লী ব্যবহার করা হয়েছিল। বৃহৎ চুল্লীটিকে রাখা হয়েছিল কয়েকটি দণ্ডের উপর। ছাঁচের মধ্যে কাচ গলিয়ে ঢালবার সময় ছাঁচের ভিতরের তাপের পরিমাণ ছিল ২৪৬০ ডিগ্রি ফরেনহাইট (১,৩৫০c)। ১৫ মাসেরও অধিককাল এক বৈদ্যুতিক যন্ত্রের সাহায্যে এই বৃহৎ কাচটিকে ঠাণ্ডা করা হয়েছিল দৈনিক মাত্র ০·৮°c সেণ্টিগ্রেড হারে।

কালিফোর্ণিয়ায় পালোমার পর্ব্বতের মানমন্দির ও ২০০ ইঞ্চি ব্যাস বিশিষ্ট শক্তিশালী দুরবীক্ষণ যন্ত্র

১৯৩৬ সালের এপ্রিল মাসে সংবাদ-পত্র এবং চলচ্চিত্র মারফৎ আমেরিকার জনসাধারণকে জানান হল, পৃথিবীর সর্ববৃহৎ কাচ খণ্ডটি আমেরিকার পূর্বাঞ্চল নিউইয়র্কস্থ কোর্ণিংয়ের থেকে একেবারে পশ্চিমে পাসাডেনায় জাহাজযোগে পাঠান হয়েছে। ঐ সময় থেকেই কাচটির মাজা ঘষা কাজ সুরু হয় এবং ১৯৩৮ সালের এপ্রিল মাসে কাচটিকে নির্দিষ্ট আকারে এনে পালিশের উপযোগী করা হল। ঘসার ফলে সওয়া পাঁচ টনের উপর অপ্রয়োজনীয় কাঁচ অপসারিত হয় এবং এই সংস্কারের জন্য কাচ ঘসার মসলা খরচ হয় ১০ টন!

পর্যায়ক্রমে 'গ্রাইণ্ডিং' এবং 'পালিশ-এর কাজ চালিয়ে ১৯৪১ সালের আগষ্ট মাসে এই 'কাঁচ খণ্ডটির গঠনের' রূপ দেবার কাজ আরম্ভ হ'ল। পূর্ণ গঠনের কাজ আরম্ভ হ'ল একমাস পর। কিন্তু বর্ত্তমান যুদ্ধের জন্য কাজ বন্ধ হয়ে গেল। যুদ্ধের পর বাকি কাজটুকু শেষ হ'লে কাঁচের উপরিভাগ এলুমিনিয়ামের পাতলা আবরণ দিয়ে ঢাকা হবে। 'একাজ শেষ হতে এখনও প্রায় এক বছর লাগবে। দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সমস্ত অংশেরই নির্মাণকার্য শেষ হয়েছে বাকী আছে কেবল দর্পণ। টেলিস্কোপ যন্ত্রের গঠনের 'ব্যালেন্স' ঠিকভাবে রাখবার জন্যে দর্পণের পরিবর্তে উপস্থিত ঐ মাপের এবং ওজনের একটি কংক্রিটের চক্র যন্ত্রের মধ্যে রাখা হয়েছে।

সব বড় বড় দূরবীক্ষণ যন্ত্রগুলি হচ্ছে 'ফটোগ্রাফিক ক্যামেরা'। মাউণ্ট পালোমার

থে আমরা আকাশের কতখানি স্থানের
রই বা নির্ভুলভাবে জানতে পারি? কিন্তু
বৃহত্তম যন্ত্রটি নভোমণ্ডলের বহু দূরত্ব
নের আলোক চিত্র সংগ্রহ করে প্রকৃতির
স্য উদ্ঘাটন করবে। যে সমস্ত বস্তু
স্চক্রের অন্তরালে অবস্থান করছে,
া দীর্ঘ সময়ের exposure-এ
লোকচিত্রে ধরা পড়বে।
থিবীর আবর্তনের ফলে আকাশে
ত্রগুলিকে সচল বলে প্রতিয়মান হয়।
ত্রকালে একটি নক্ষত্রের দীর্ঘ সময় 'ফটো-
ফক এক্সপোজার নিয়ে সেই নক্ষত্রটির
চপথ নির্ণয় করতে হবে। সুতরাং
ত্রের দিকে যন্ত্রটি নিবন্ধ হলে পর
'ormgear' নামক যন্ত্রের সহযোগিতায়
াবীক্ষণ যন্ত্রটি পশ্চিম দিকে তার
'পোলার এক্সিসের' দিকে আপনা থেকেই
সমান গতিতে ঘুরবে পৃথিবীর পূর্ব দিকের
ঘূর্ণনের গতি বিফল করতে। 'ফটোগ্রাফিক
প্লেট হোল্ডার এবং দর্শক বহন করার জন্য
দূরবীক্ষণ যন্ত্রের নলের উপরিভাগে একটি
প্রকোষ্ঠ আছে—বিশেষত্ব এই যে ইতিপূর্বে
এরূপ কোন আয়োজন দূরবীক্ষণ যন্ত্রে
করা হয়নি। পৃথিবীর পৃষ্ঠ থেকে
চন্দ্রের দূরত্ব ২,৩৯,০০০ মাইল। কিন্তু
আলোচ্য দূরবীক্ষণ যন্ত্রটি এই দূরত্ব
কমিয়ে তার ২৫ মাইলের মধ্যে চন্দ্রকে
পরীক্ষা করতে পারবে।

জ্যোতির্বিদগণ আকাশের যতখানি স্থান
পূর্বে জরিপ করতেন নিকট ভবিষ্যতে এই
দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সহযোগিতায়
তদপেক্ষা চতুর্গুণ স্থান আয়ত্বে আনতে
পারবেন। বর্তমান সময়ের শক্তিশালী
দূরবীক্ষণ যন্ত্রেও যে সব কোটি কোটি নক্ষত্র
এবং জ্যোতিষ্ক ধরা পড়েনি তারা এভাবে
আর আমাদের কাছ থেকে আত্মগোপন করে
থাকতে পারবে না। পৃথিবীর সৌর
জগতের গ্রহগণ ১০,০০০ গুণ বর্ধিত
আকারে আমাদের সামনে আবির্ভূত হবে।
মাউণ্ট পালামোর দূরবীক্ষণ যন্ত্র প্রকৃতির
রহস্যজাল উদ্ঘাটনে এভাবে মানুষকে
সাহায্য করলে মানুষের জ্ঞান রাজ্যের
সীমানা বর্তমানের থেকে অনেকখানি
বিস্তৃত হবে। বিস্ময়াবিষ্ট নেত্রে মানুষ
অধীরভাবে নিকট ভবিষ্যতের সেই গৌরব-
ময় দিনগুলির অপেক্ষায় রয়েছে। *

* প্রবন্ধের ছবি—USOWI

সিক্ত মৃত্তিকা

(৩৮ পৃষ্ঠার পর)

তলালের আজ আর কাউকেই মনে
ল না। গান্ধারী নিশ্চিন্তে দাঁড়িয়ে
ছে। ঘরে তার ভাইবোনেরা নির্ভাবনায়
ুচ্ছে। একটু দাঁড়িয়ে থেকে সে প্রস্তাব
লে—এইবার আমি যাই?
মতিলাল সে কথা যেন শুনতে পায়নি।
চোখের ইসারায় তাকে কাছে ডাকলো।
উত্তরে গান্ধারী মাথা নেড়ে অসম্মতি
জানিয়ে চোখ নীচু করে একই যায়গায়
দাঁড়িয়ে রইলো।
মতিলাল এগিয়ে এসে একখানা হাত
ধরতেই গান্ধারী ঝরঝর করে কেঁদে
ফেললো। একটুখানি সামলে নিয়ে বললে
—রাত আর নেই। ঐ দেখো ফরসা হয়ে
আসে। তারপর আরও একটু মিনতি করে
বললো—এখন যাই? কেমন?
মতিলাল তার হাত ছেড়ে দিলে। সে
স্ত্রীলোক নয়, তার পর লোক আছে।

বঙ্গের জাতীয় কবিতা ও সঙ্গীত

(৪২ পৃষ্ঠার পর)

তেন না। দ্বিজেন্দ্রলাল কোনরূপে বিদ্বেষ-
র হৃদয়ে পোষণ না করিয়াও স্বদেশী
ন্দোলনকালে দেশাত্মবোধের যে অগ্নি-
ী প্রেরণা বাণী বাঙালীর প্রাণে উদ্দীপিত
রিয়া দিয়া গিয়াছেন, এইবার সেই কথা
বে।
স্বদেশী আন্দোলন সম্পর্কে তাঁহার
র্শ ও চিন্তার ধারা যে সে সময়কার
দশী নেতাদের সহিত স্বতন্ত্র ছিল,
া আমরা এখানে উল্লেখ করিয়াছি।
ন্তু সেই সময়ে আমরা তাঁহাকে ভাব-
বিভোর চিত্তে যে ভাবে বন্দেমাতরম ও
স্বরচিত সংগীত গাহিতে দেখিয়াছি—সে
স্বর্গীয় দৃশ্য আজিও চোখের সম্মুখে
ফুটিয়া উঠিতেছে।
সে সময়ে দ্বিজেন্দ্রলালের রাণাপ্রতাপ,
মেবারপতন, দুর্গাদাস প্রভৃতি নাটক বাঙলা
সাহিত্যে যেমন এক অভিনব গদ্যের ধারা
ও ভাবসম্পদ ও নাটকীয় চরিত্র সৃষ্টির
নূতনত্ব আনিয়া দিয়াছিল, তেমনি তাঁহার
সংগীতে এক নব উদ্দীপনার সৃষ্টি
করিয়াছিল। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সেই
রাজপুত শৌর্যের গরিমাময় বর্ণনা—সেই

"মেবার পাহাড় শিখরে যাহার
রক্ত পতাকা উচ্চ শির।"

কোন বাঙালীর ভুলিবার নহে। তারপর
এক শুভমুহূর্তে বাঙালীজাতি অপূর্ব
আনন্দ ও উদ্দীপনাপূর্ণ হৃদয়ে শুনিল:

"বঙ্গ আমার, জননী আমার,
ধাত্রী আমার, আমার দেশ।"

আমরা সে যুগের কথা ও দ্বিজেন্দ্রলালের
সংগীতের আলোচনা পরবর্তী সংখ্যায়
করিব। (ক্রমশ)

কাক

শ্রীরাধিকারঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়

মহকুমা শহর। দুইটি মাত্র সদর রাস্তা লইয়া শহর। এই দুইটি রাস্তার উপরেই কোর্ট কাছারি, ডাকঘর, মিউনিসিপ্যালিটি অপিস, কোতোয়ালি, হাসপাতাল, স্কুল, স্কুল বোর্ডিং, টাউন ক্লাবের হল ও সিনেমা গৃহ একটি........কোন কিছুরই ত্রুটি নাই, ঠাস বুনন শহর। দোকান-বাজার তো আছেই। সদর রাস্তা দুইটি ছাড়াইলেই পল্লী—সেখানে আর শহরের কোন চিহ্ন নাই।

এই শহরেই একটি সদর রাস্তার এক-প্রান্তে মনোহর কবিরাজের পিতৃপুরুষের বহুকালের ভিটা। মনোহর কবিরাজও এখন বৃদ্ধ, কিন্তু তাহার বাড়িটিতে বহু-কালের জীর্ণতার ছাপ একেবারেই নাই, বরং নূতন বাড়ি বলিয়াই মনে হয়। সেদিকে মনোহর কবিরাজের দৃষ্টি খুব প্রখর। বাড়িটির সামনের দিকেই তিন চারখানি ঘর—তাহার মধ্যে একখানি ঘর সকলের সামনে ও রাস্তার উপর—এইখানাই মনোহর কবিরাজের কবিরাজখানা। সকালে এক ঘণ্টা ও সন্ধ্যাকালে এক ঘণ্টা রোগীদের জন্য এই ঘরে সে বসে এবং উঠিয়া পড়িলে আর কোন রোগীর সাধ্য নাই যে তাহাকে আবার ডাকিয়া আনিয়া এ-ঘরে বসায়। ঘরের দরজায় তালা পড়িয়া যায়, সে তালা আর যথাসময়ে ভিন্ন খোলা হয় না। মনোহর কবিরাজের এ নিয়মের ব্যতিক্রম এ যাবৎকাল কখনও হয় নাই। অবশ্য রোগী বাড়িতে 'কল্' দিলে সর্বদাই সে প্রস্তুত—তাহার আর সময় অসময় নাই।

মনোহর কবিরাজের ঘরের মেঝেগুলি সিমেন্ট বাঁধানো, চাল টিনের ও কাঠের ফ্রেমের উপর চাঁচার বেড়া লাগানো। বাড়িটি বেশ ঝরঝরে। বাড়ির পিছনের দিকে মস্ত উঠান—বাঁশের বেড়া ঘেরা। উঠানের একপাশে একটি পাতকুয়া—অপরপাশে শাক-সব্জির বাগান। বাড়ির সবকিছুই পরিষ্কার, ঝকঝকে ও তকতকে।

বাড়িতে কিন্তু লোকজন নাই। মনোহর কবিরাজ নিজে ও তাহার স্বজাতি একটি স্ত্রীলোক নৃত্যকালি। এই নৃত্যকালির তিনকুলে কেহ নাই, মনোহর কবিরাজেরও অবশ্য কেহ নাই। নৃত্যকালি আজ গত দশ-বারো বৎসর ধরিয়া মনোহর কবিরাজের দেখা-শুনো তত্ত্ব-তল্লাস সমস্তই করিয়া আসিতেছে। নৃত্যকালির বয়স হইয়াছে অনেক—মনোহর কবিরাজের এক-আধ বছরের ছোট হইলে হইতে পারে। শরীরে সামর্থ্য এখনও বেশ আছে—খাটুনিতে বিরক্তি নাই। নৃত্যকালির স্বভাবটি সুন্দর।

মনোহর কবিরাজের স্বভাব কিন্তু একটু তিরিক্ষি ধরণের, নহিলে লোক সেও ভাল। মনোহর কবিরাজের পসারও ভাল, কবিরাজ হিসাবে শহরে সুনামও তাহার যথেষ্ট। অধুনা টাকা রোজগারের দিকে মনোহর কবিরাজের আর তেমন স্পৃহা নাই, অনেক সময় শরীরের অজুহাতে নূতন রোগী হইলে ফিরাইয়া দেয় এবং অন্য কাহাকেও ডাকিয়া নিয়া দেখাইতে উপদেশ দিয়া দেয়। আবার কখনও হয়তো কিছুই বলে না, শরীর অসুস্থ বলিয়া বিদায় করিয়া দেয়।

কিন্তু বাড়ির ভিতরে অবসর সময়ে মনোহর কবিরাজের কাজের আর অন্ত নাই। আগে বড়ি পাকানো, এটা সেটা জ্বাল দেওয়া, ঔষধ প্রস্তুত করাই ছিল কাজ, কিন্তু এখন নিতান্ত কালেভদ্রে ওদিকে দৃষ্টি পড়ে। এখন কাজ হইয়াছে তাহার নানারকম অস্ত্র-শস্ত্র প্রস্তুত করা, জাল-জালতি তৈয়ারি করা, আর খাবারের মধ্যে কি বিষ পুরিয়া দিলে আশু ফল ফলিবে তাহারই চিন্তা করা। মনোহর কবিরাজ ঠিক করিয়াছে, কাকের বংশ সে ধ্বংস করিবে, বাড়ির ত্রিসীমানায় আর কাক সে প্রবেশ করিতে দিবে না, কানে কা-কা রব যেন তার কিছুতেই প্রবেশ করিতে না পারে তাহার ব্যবস্থা সে করিয়া ছাড়িয়া দিবে।

ফলে, মনোহর কবিরাজের ভিতর বাড়ির উঠানটার বিচিত্র চেহারা হইয়াছে, এখানে একটা বাঁশের মাথায় হয়তো একগুচ্ছ কাকের পালক ঝুলিতেছে, আর একটা বাঁশে হয়তো বাঁকারির তীর-ধনুক ঝুলাইয়া রাখা হইয়াছে। কুয়োতলার আশে-পাশে জাল-জালতি দিয়া ঘিরিয়া রাখা হইয়াছে, কারণ এঁটো বাসনকোসন কুয়োতলায় জমা করা থাকে বলিয়া কাকের দৌরাত্ম্যটা সেখানে একটু বেশীই। বাড়ির ভিতরের বারান্দাটারও রূপ পাল্টাইয়াছে অনেক, কোথাও কাকের পালক ঝুলানো, কোথাও তীর-ধনুক, কোথাও বাঁটুল, কোথাও আবার একফালি জাল।

মনোহর কবিরাজ এসব ছাড়াও কাক মারিবার জন্য একপ্রকার বিষ প্রস্তুত করিয়াছে এবং তাহা সে নানাপ্রকার খাদ্য-দ্রব্যের মধ্যে পুরিয়া দিয়া উঠানের কয়েকটি বিশিষ্ট স্থানে এবং লাউ মাচাটির উপর সন্তর্পণে বিছাইয়া রাখিয়া দেয়। এই বিষাক্ত খাদ্য খাইয়া দুই একটা কাক সত্যই মরিয়া উঠানে ইতিপূর্বে পড়িয়া থাকিতে দেখা গিয়াছে। কাক একটা মরিলে মনোহর কবিরাজের সে কি উল্লাস! একটি মহা-শত্রু যেন নিপাত হইল। সেদিন সারাদিনই সে খুশি—নৃত্যকালির সেদিন দুই এক টাকা বক্‌শিষও মিলিয়া যায়।

সময় পাইলেই মনোহর কবিরাজ বারান্দায় একটা মোড়া পাতিয়া হয় বাঁটুল, নয় তীর-ধনুক লইয়া বসিয়া থাকে। তীরের ফলাগুলি ধারালো লোহার পাত দিয়া কামারবাড়ি হইতে তৈয়ারি করিয়া আনা। আর বাঁটুলের গুলী নিজেই মাটি ছাঁকিয়া আগুনে পোড়াইয়া প্রস্তুত করিয়া লয়। এ ব্যাপারে তাহার কিছুমাত্র আলস্য নাই। বড়ি না পাকাইয়া বাঁটুলের গুলী পাকানোয় এখন উল্লাস তাহার বেশী।

এই কাক ধ্বংস ব্রত তাহার নূতন শুরু হয় নাই, আজ পাঁচ বৎসর ধরিয়াই চলিতেছে, তবে ক্রমেই বিরাট রূপ পরিগ্রহ করিতেছে ও আগ্রহ উন্মাদনা তাহার বাড়িতেছে।

কা.........কা.........কা.........

ভোরবেলাই এই অলক্ষণে ডাক। মনোহর কবিরাজ লাফাইয়া শয্যা হইতে উঠিল। দুর্গা নাম আর স্মরণে আসিল না। বারান্দায় আসিয়া বেড়ার গা হইতে একটা তীর-ধনুক বাছিয়া লইয়া উঠানে সন্তর্পণে নামিল। তিনটি কাক লাউ-মাচাটির উপর বসিয়া কলরব করিতেছিল। মনোহর কবিরাজকে তাহারা যেন চেনে। দর্শন-মাত্রেই তাহারা কা কা কা কলরব আরও তীক্ষ্ণতর করিয়া ধ্বনিয়া তুলিয়া উড়িয়া পলাইল। মনোহর কবিরাজের বাড়ির পিছনে মস্ত একটা জঙ্গল—সে জঙ্গলে বড় বড় গাছও আছে। সেই গাছেরই একটি গাছে উড়িয়া গিয়া তাহারা বসিল। তখনও কা কা ধ্বনির তাহাদের আর বিরাম নাই।

মনোহর কবিরাজ উঠানটার মধ্যে তীর-ধনুক হাতে মহা আক্রোশে পায়চারি করিতে লাগিল।

কুয়াতলার কাছে বেড়ার উপর একটি কাক কোথা হইতে কা কা করিয়া আসিয়া বসিল। মনোহর অমনি সেদিকে ফিরিল—

ফিরিয়াই তীর ছুঁড়িল। কাক উড়িয়া গেল, তীর গিয়া বেড়ার গায়ে গিঁথিয়া গেল।

মনোহর কবিরাজ আবার বারান্দায় ফিরিয়া আসিল। ধনুকটা রাখিয়া একটা বাঁটুল তুলিয়া লইয়া একটা ডালা হইতে পাকানো কতকগুলি গুলী বাছিয়া লইয়া আবার উঠানে নামিল। জঙ্গলের বড় গাছে সেই কাক তিনটি তখনও থাকিয়া থাকিয়া কা কা করিতেছে। কি কর্কশ ধ্বনি! মনোহর কবিরাজের ভিতরটা জ্বলিয়া যাইতেছিল। উঠানের একপাশে একটা লেবু গাছ বেশ ঝাপড়া হইয়া উঠিয়াছিল, তাহারই আড়ালে দাঁড়াইয়া মনোহর কবিরাজ জঙ্গলে গাছের কাকগুলিকে লক্ষ্য করিয়া বাঁটুলের গুলী ছুঁড়িতে লাগিল। এক দুই তিন চার পাঁচ—পাঁচটি গুলী ছোঁড়ার পরে কাক তিনটিই উড়িয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। এতক্ষণে মনোহর কবিরাজ সহজ অবস্থায় ফিরিয়া আসিল।

নৃত্যকালি কুয়াতলায় বাসন মাজিতেছিল এবং সকলই লক্ষ্য করিতেছিল। কিন্তু এ বিষয়ে কিছু বলিবার অধিকার তাহার নাই—সে জানে। কাজেই নির্বাক ছিল।

মনোহর কবিরাজ বারান্দায় আসিয়া বাঁটুল যথাস্থানে রাখিয়া দিয়া ডাকিল, ও নেত্য, আমার গাড়ুতে জল দিতে হবে যে। বেলা হয়ে গেল—ওদিকে আবার কবরেজখানায় বসতে হবে তো।

নৃত্যকালি কুয়াতলা হইতেই বলিল, জল ধরে দেওয়াই আছে।

মনোহর কবিরাজ একটা গামছা হাতে ঘরের ভিতর হইতে বাহিরে আসিয়া কাহাকেও উদ্দেশ না করিয়াই জোরে জোরে বলিতে লাগিল, এই শালা কাকগুলোই দেখে আমার দেরী করিয়ে। তীর-ধনুক আর বাঁটুলে কি কাক মারা যায়—ও শালা অতি ধূর্তের জাত—চোখ ফেরাতেই পগার পার। বন্দুকের দরখাস্ত করলাম—দিলে না, বলে, ওয়ার ফণ্ডে দাও এত টাকা, রিলিফ কমিটিতে এত। না, ঘুষ দিতে যাব' কেন? নাই বা পেলাম বন্দুক। প্রলোভন—খাদ্যে বিষ মিশিয়েই শেষ করবো আমি কাকের গোষ্ঠী। বন্দুক পেলে অবশ্য কাজে লাগতো।

নৃতনকালি কুয়াতলা হইতে সমস্তই শুনিল। সে কথা না কহিয়া আর থাকিতে পারিল না। বলিল, আবার বন্দুক কি হবে?

মনোহর কবিরাজ নৃত্যকালির সাড়া পাইয়া বাঁচিয়া গেল। বলিল, বলিস কি নেত্য, বন্দুক কি হবে? পেলে সাত দিনে আমি কাকের বংশ নিধন করে ছাড়তাম। ওর সময়-অসময়ে কা কা করাটা আমি একবার দেখে নিতাম। আমার হাড় জ্বালিয়ে দিলে শালারা কা কা করে। আজকাল সব কাজে ঘুষরে নেত্য—ঘুষ ছাড়া কথা নেই। নইলে মনোহর কবিরাজ বন্দুক পায় না, বন্দুক পায় চিন্তাহরণ মুদী। কেন, তার কি লাখ টাকার সম্পত্তিটা আছে শুনি? কিন্তু ঘুষ মনোহর কবিরাজ দেবে না—বন্দুক তার দরকার নেই।

নৃত্যকালি বলিল, কি দরকার বন্দুকে, ও আপদ ঘরে না থাকাই ভাল।

মনোহর কবিরাজ কি ভাবিল জানি না, বলিল, তা যা বলেছিস নেত্য। বন্দুক ঘরে থাকা অনেক ভজকোট। না পাওয়া গেচে, ভালই হয়েচে।

নৃত্যকালি আর উত্তর করিল না, মনে মনে বলিল, ভাল বলে ভাল, এর পরে আবার বন্দুক এলেতো আর রোগী দেখাই হবে না।

ব্যবসার প্রতি মনোহর কবিরাজের নজর ক্রমেই কমিয়া আসিতেছে। এখন লোকে 'কল' দিলে কেমন যেন গড়িমসি করে—নিতান্ত নাছোরবান্দা হইলেই তবে যাইতে হয়। এড়াইতে কোনরকমে পারিলে আর কথা নাই। এদিকে যেমন ব্যবসার প্রতি উৎসাহ উদ্যম কমিয়া আসিতেছে তেমন আবার ওদিকে কাক-বধ বা কাক-তাড়ানো ব্যাপারে উৎসাহ উদ্যম ততোধিক পরিমাণে বাড়িয়া যাইতেছে। দিবারাত্র কেবল তীরে ফলায় শাণ দেওয়া হইতেছে, আর নয়তো মাটি ছাঁকিয়া বাঁটুলের গুলী পাকানো হইতেছে; বড়ি পাকানো এখন একপ্রকার বন্ধই। ঔষধ জ্বাল না দিয়া বিষ জ্বাল দেওয়া চলিতেছে।

নৃত্যকালি এইসব দেখিয়া শুনিয়া মাঝে মাঝে বলে, কবরেজ কাকা, আজকাল তোমার কিন্তু ব্যবসার দিকে মন একেবারে নেই।

মনোহর কবিরাজ হাসিয়া বলে, আর থেকে লাভ কি বলনা নেত্য? টাকা পয়সা তো অনেক রোজগার করলাম......এই তাড়া তাড়া আগে কাকটাকে নেত্য, ঘরের চালে এসে বসেচে বুঝি হারামজাদা...... আচ্ছা, থাক তোর যেতে হবে না, আমিই যাচ্ছি।

বলিয়া বাঁটুল ও গুলী লইয়া উঠানে নামিয়া গেল।

অল্প পরেই ফিরিয়া আসিয়া বলিল, কি ধূর্ত এই কাকের জাতটা, বেরুতে না বেরুতেই উড়ে পালালো। কিন্তু ঠান্ডা ওদের আমি করে এনেচি অনেকটা। এ-বাড়ির কোথাও পা ফেলে ওদের স্বস্তি নেই। বন্দুকটা পেলে আমি ওদের গোষ্ঠীর শ্রাদ্ধ করে ছেড়ে দিতাম।

নৃত্যকালি বলিল, কাক তো বাড়িতে এখন বসেই না কোথাও, কচিৎ একটা আধটা যদি বা ভুল করে এসে বসে।

মনোহর কবিরাজ খুশি হইয়া বলিল, আমি এমন করে ছেড়ে দেব' নেত্য যে, ভুলেও কোনদিন আর বসবে না, আর যদি বা বসে তো অমনি ভিমরি খেয়ে ঘুরে পড়ে সেইখানেই মরে থাকবে। আমি এবার এমন একটা বিষ তৈরী করবো নেত্য যে কাকের পায়ে-গায়ে যে কোন জায়গায় লাগলে অমনি সেখানেই মরে পড়ে থাকবে। ব্যস্, এইটে বের করতে পারলেই নিশ্চিন্ত একেবারে।

হ্যাঁ, ভাল কথা, তুই কিনা ব্যবসার কথা তুলেছিলি নেত্য? ব্যবসায় আমার আর মন নেই। কেন থাকবে বল? টাকাতো অনেক রোজগার করলাম, কিন্তু টাকা আমার কে ভোগ করবে বল? আর কার জন্যেই বা এই বুড়ো বয়সে পরিশ্রম করে টাকা রোজগার করবো বল? টাকা যা আমার আছে তাতে বাকী দিন কটা স্বচ্ছন্দেই কেটে যাবে। তাই আর ভাবিও না, চেষ্টাও করি না। রোজগারের আর সুখ নেই নেত্য, বরং কাক তাড়িয়ে আর কাক মেরে একটা অদ্ভুত আনন্দ পাই। যদি কাক মারবার জন্যে কোন সঙ্ঘ বা দল তৈরী হ'তো, তাহলে আমি তাদের আড়াই হাজার টাকা দান করে দিতাম। কিন্তু তারতো সম্ভাবনা নেই, কাজেই টাকা আমার যা থাকবে তা তোকেই দিয়ে যাব নেত্য, আমি ম'রে গেলে তোর যেন কোন কষ্ট না হয়।

নৃত্যকালির চোখে জল আসিয়া পড়িল।

মনোহর কবিরাজ তাহা লক্ষ্য করিয়াই কথা ঘুরাইবার জন্য বলিল, ভাল কথা নেত্য। আমার ছাই মনেও থাকে না। আজ দিন-দশেক হ'লো ভগবান কামারকে একশো তীরের ফলা গড়তে দিয়ে এসেছিলাম, তৈরী হ'য়ে গোচ খবর পাঠিয়েচে, আজ বিকেলবেলা দামটা নিয়ে ওগুলো নিয়ে আসিস তো।

নৃত্যকালি চোখের জল মুছিয়া বলিল, আচ্ছা, তা এনে দেব'খন।

নৃত্যকালি ফলা আনিয়া দিল। ফলা দেখিয়া মনোহর কবিরাজের চক্ষু জুড়াইয়া গেল। আহা! কি সুচালো তীক্ষ্নতা, আর কি রকম ঝক্মক্ করিয়া জ্বলিতেছে। মনোহর কবিরাজ নানাভাবে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া সেগুলিকে দেখিল—এখানে সেখানে মাটিতে বেড়ায় খোঁচা দিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিল দুই একটার ধার। মন তাহার খুশিতে ভরিয়া উঠিল। এমন ধারালো ফলা এযাবৎ ভগবান কামার কখনও গড়িয়া দেয় নাই।

নানারকম বাঁকারি তীরের জন্যে চাঁচাই ছিল। মনোহর কবিরাজ একটা ছুরি লইয়া সেগুলিকে আর একটু চাঁচিয়া ফলাগুলি তাহাদের মাথায় পরাইতে লাগিল। সন্ধ্যা হইয়া আসিল। তবু কাজে মনোহর কবি-

রাজের নিবৃত্তি নাই। নৃত্যকালি শেষে একটা লণ্ঠন আনিয়া তাহার সামনে ধরিয়া দিয়া বলিয়া গেল, কবরেজখানায় গিয়ে বসবার সময় হলো যে।

এই যাই।—বলিয়া মনোহর কবিরাজ আবার কাজে মন দিল।

তিরিশটি মোক্ষম তীর তৈয়ারি হইলে মনোহর কবিরাজ উঠিয়া দাঁড়াইল। শিরদাঁড়া রীতিমত তখন তাহার টন্ টন্ করিতেছে, কিন্তু মুখে অপরিসীম উল্লাস।

মনোহর কবিরাজ তীরগুলিকে যথাস্থানে সাজাইয়া রাখিয়া এবং অবশিষ্ট ফলাগুলিকে ঘরের ভিতর তুলিয়া রাখিয়া দিয়া কবিরাজখানার দিকে চলিয়া গেল।

সকালবেলা ঘুম হইতে উঠিয়াই মনোহর কবিরাজ বারান্দায় গিয়া মোড়া পাতিয়া একটা কাপড়ের আড়ালে একটু লুকাইয়া তীর-ধনুক লইয়া বসিল। হাতে তাহার নূতন সূক্ষ্ম ফলাযুক্ত তীর—মৃত্যু যেন তাহার সূঁচালো শুভ্র মুখে বিরাজমান। কোনরকমে একবার ছুঁইলে আর রক্ষা নাই। মনোহর কবিরাজের দুই চক্ষে সেকি পাশবিক উল্লাস। কিন্তু কই, কাকেরতো সাড়া মেলে না। তাহাদের খবর মিলিয়াছে নাকি?

এমন সময় ধ্বনিত হইল,—কা...কা... কা...

কুয়াতলার দিকের বেড়ার অপর পার্শ্বে এই ধ্বনি। মনোহর কবিরাজ উচ্চকিত ও উৎকর্ণ হইল। ভিতরে তাহার উগ্র উত্তেজনা ও উৎকণ্ঠা। ব্যাধের চাইতেও সন্ত্রস্ত তাহার ভাব।

ঘরের ভিতর হইতে নৃত্যকালি কাল রাত্রের এ'টো বাসন-কোসন পাঁজা করিয়া লইয়া কুয়াতলার দিকে চলিল। নৃত্যকালির বয়স হইয়াছে, চলা তাই ধীর মন্থর।

মাঝ পথেই কোথা হইতে একটা কাক ছুট্ করিয়া তাহার বাসনের উপর একটা ছোঁ মারিয়া আবার একটু সরিয়া গেল শূন্যে কয়েক হাত। নৃত্যকালি থমকিয়া দাঁড়াইয়া গেল। কাকটা এবার আসিয়া তাহার হাতের তোলা বাসনের উপর বসিল।

তীর ছুঁড়িল মনোহর কবিরাজ। উত্তেজনায় তখন তাহার দিক-বিদিক জ্ঞান নাই। তীর উপরে উঠিয়া একটা গোৎ খাইয়া নিচে নামিল।

নৃত্যকালির হাতের বাসনগুলি ঝন্‌ঝন্ করিয়া কুয়াতলার কাছেই মাটিতে চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িল। তীরের ফলা গিয়া বিঁধিয়াছে নৃত্যকালির ডান পায়ের হাঁটুর ঠিক নিচে।

নৃত্যকালি সেইখানেই—কবরেজ কাকাগো, একি করলে তুমি!—বলিয়া বসিয়া পড়িল।

তীরের ছুটিয়া যাওয়ার আওয়াজটাও যেমন মনোহর কবিরাজের কানে বাজিয়া রহিয়াছে তেমন আবার নৃত্যকালির কাতর কণ্ঠও তাহার কানে বাজিতেছে। মনোহর কবিরাজের মাথাটা ক্ষণিকের জন্য কেমন যেন ঝিমঝিম করিয়া উঠিল। ধনুক রাখিয়া সে উঠিয়া পড়িল।

উঠিয়া দাঁড়াইতেই তাহার মনে হইল—সে ব্যাধ নয়, সে কবিরাজ।

চীৎকার করিয়া বলিল, নেত্য, তীরটা খুলিস না, ধরে থাক্। আমি ওষুধ নিয়ে আসচি।

ছুটিয়া ঘরের ভিতর হইতে একটা মলম লইয়া নৃত্যকালির কাছে গিয়া মাটিতে হাঁটু মুড়িয়া বসিয়া তীরটা একটা টানে খুলিয়া ফেলিয়া অনেকখানি মলম দিয়া ক্ষতস্থান একেবারে চাপিয়া দিল।

বলিল, কিছু ভাবিসনে নেত্য, দু'একদিনেই ঘা শুকিয়ে যাবে। ঘরে চল্, ন্যাকড়া দিয়ে বেঁধে দিতে হবে। আমার হাত ধরেই চল। ও যা মলম দিলাম—রক্ত আর পড়বে না এক ফোঁটাও।

নৃত্যকালি ঘরে আসিয়া প্রথম কথা কহিল, বলিল, কবরেজ কাকা, কবরেজই হলো তোমার কাজ। ব্যথাটা আমার এরই মধ্যে গড়িয়ে গেচে, কালই ঠিক হয়ে যাবে বোধ হয়। ঐ কাক মারা ব্যাপারটা তুমি ছেড়ে দাও।

নৃত্যকালিকে তাহার তক্তপোষের উপর শোয়াইয়া দিয়া খানিকটা ফালি ন্যাকড়া দিয়া ক্ষত স্থানটা বাঁধিয়া দিয়া মনোহর কবিরাজ বলিল, ওকথা বলিসনে নেত্য, কাক দেখলে আমি পাগল হয়ে যাই। যে-কটা দিন বাঁচবো কাক ধ্বংসই আমার কাজ। পারি না পারি চেষ্টা আমাকে করতেই হবে। কা......কা...... কা......আমার বুকের ভেতরটা ওরা যেন খুবলে খায়। ভীষণ শত্রুতা আমার ওদের সঙ্গে—জীবনপণ! ও-কথা আমাকে বলিসনে আর নেত্য। আমি তা হলে পাগল হয়ে যাব।

নৃত্যকালি মনোহর কবিরাজের চোখমুখের চেহারা দেখিয়া আর কোন কথাই কহিল না।

কিছুক্ষণ পরে মনোহর কবিরাজ একটা খলে করিয়া কি যেন ঔষধ বাঁটিয়া আনিয়া নৃত্যকালিকে দিয়া বলিল, এই ওষুধটা খেয়ে ফেল নেত্য, তা'হলে আর জ্বরজ্বারির ভয় থাকবে না। নইলে লোহার একটা বিষ আছে তো।

নৃত্যকালি ঔষধটা গিলিয়া ফেলিল।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই নৃত্যকালি উঠিয়া দাঁড়াইল। একটু একটু করিয়া ঘরের কাজও শুরু করিল।

মনোহর কবিরাজ যেন কেমন হইয়া গেল। তীরের ফলাগুলি দেখে, তাহাদের ধার পরীক্ষা করে, কেমন একটু হাসে তারপরে আবার সব রাখিয়া দিয়া ঘরের মধ্যে গিয়া এটা-সেটা অন্যমনস্কের মত নাড়া-চাড়া করিতে থাকে।

লোকে তাহাকে বলে, কাক তাড়ানে কবরেজ। নিজের কানেও সে একথা শুনিয়াছে। কিন্তু আজ দুই দিন ধরিয়া—অর্থাৎ নৃত্যকালির জখমের পর হইতে কাক তাড়ানো ব্যাপারে বা তাহাদের বধের চেষ্টায় আর তাহার উল্লাস নাই। কেমন একটা মনমরা ভাব। কে যেন তাহার সমস্ত শক্তি হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে।

শুধু বুকের মাঝটা খাঁ খাঁ করিয়া জ্বলে—জিহ্বা ঘন ঘন শুকাইয়া ওঠে—কেবল জল পিপাসা পায়। মাথাটা কেমন ঘুরিতে থাকে। কাকের ডাক শুনিলে ভিতরে আগুন জ্বলিতে থাকে। থাকিয়া থাকিয়া কেমন যেন ভিমরির মত লাগে—পাকাইয়া ফেলিয়া দেয়।

নৃত্যকালি মলমের গুণে দুই দিনেই ভাল হইয়া উঠিল। সমস্ত কাজকর্ম আবার পূর্বের মতই করিতে লাগিল।

মনোহর কবিরাজ বারান্দায় তীরের ফলা দেখিতে আসিয়া দেখিল, লাউমাচার উপরে একটা কাক ছটফট করিতেছে, পাক খাইয়া খাইয়া ঘুরিয়া পড়িতেছে—তাহার বিষাক্ত খাদ্যের কাজ চলিতেছে। আনন্দে মনোহর কবিরাজ বারান্দার মধ্যেই ঘুরিয়া পড়িল। আজ দুই দিন ধরিয়াই শরীর তাহার খারাপ। নৃত্যকালি দূর হইতে দেখিয়াই ছুটিয়া আসিল। মনোহর কবিরাজকে ধরাধরি করিয়া অতি কষ্টে তাহার শয্যায় নিয়া শোয়াইয়া দিল। মনোহর কবিরাজ শয্যায় আশ্রয় নিয়া বলিয়া উঠিল, আমার বিষের কাজ চলচে, লাউমাচার ওপরে একটা কাক জ্বলেপুড়ে মরচে। আর একটু পরেই মরে পড়ে থাকবে। নেত্য, ওটাকে জঙ্গলে ফেলে দিয়ে আসিস অনেক দূরে। আমাকে এক গেলাস জল দে' নেত্য।

নৃত্যকালি ছুটিয়া জল আনিয়া দিল। মনোহর কবিরাজ ঢক্ ঢক্ করিয়া জলটা পান করিয়া ফেলিয়া বলিল, আমাকে একটা কাঁথা দিতে পারিস্ নেত্য, শরীরটা কেমন যেন কাঁপিয়ে নিচ্ছে।

নৃত্যকালি কাঁথা পাড়িয়া দিল।

হু-হু করিয়া জ্বর আসিয়া গেল মনোহর কবিরাজের। নৃত্যকালি পায়ে হাত দিয়া দেখিল, পা পুড়িয়া যাইতেছে।

বিকালের দিকে নৃত্যকালি একজন ডাক্তার ডাকিয়া আনিল। ডাক্তার রোগ ধরিতে না পারিয়া নৃত্যকালিকে আড়ালে

কিয়া নিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কবরেজ
াই কি নেশা-ভাং কিছু করতেন?
নৃত্যকালি অমনি জিব্ কাটিয়া বলিল,
-মো বলো! ওসবের ধার তিনি ধারেন
।
ডাক্তার বলিল, বৃদ্ধ মানুষ—তা একটু
ফিং-ঠাফিং?
—না গো না, কিছু নাই। ওর নেশার
ধ্য ছিল শুধু এক কাক-তাড়ানো আর
ক-মারা। এইতো আমার জানা আছে।
ডাক্তার বলিল, তাহলে এ-রোগ বড়
ংঘাতিক। আমি একটা ওষুধ লিখে
য়ে যাচ্ছি, কিন্তু যদুবাবুকে একবার
কে এ রোগী দেখানো উচিত।
ডাক্তার চলিয়া গেলে মনোহর কবিরাজ
ত্যকালিকে ডাকিয়া বলিল, ছোকরা
ক্তার কি বলে গেল শুনি?
নৃত্যকালি আমতা আমতা করিতে
গিল। মনোহর কবিরাজ বলিল, ওসব
লে-ছোকরা হাল ফ্যাশানের ডাক্তার এ
গে বুঝবে কি শুনি? বাঁচবো না আর
মি, তবু একবার যদুবাবুকেই তুই ডাক
ত্য—ও লোকটা বোঝে শোঝে।

যদুবাবু আসিয়া দেখিয়া গেলেন।
ধও দিলেন, কিন্তু নৃত্যকালিকে ভরসা
নি কিছু দিতে পারিলেন না।
তারপরের দিন রাত্রে জ্বর একেবারে
হু করিয়া বাড়িয়া গেল। যদুবাবুর
ধ বা নৃত্যকালির মাথায় বাতাস অগ্রাহ্য
রিয়াই জ্বর বাড়িয়া চলিল। মনোহর
বরাজ প্রলাপ বকিতে শুরু করিল,—

আবার শালা কাক আমার ভিটেয়। কা কা করবে—দেব' বিঁধে ধারালো ফলা, মরবে ছটফট্ করে। দেখে আয়তো নেত্য, লাউ-মাচায় কাকটা অত ছটফট করচে কেন—ও বিষের কাজ চলেচে—চলুক। আমাকে জ্বালিয়েচো—জ্বলবে না—খুব জ্বলবে। এই নেত্য, একটা কাক বড় জ্বালাতন করচে —বেড়ায় বসেচে বোধ হয়—তাড়িয়ে দিয়ে আয়তো। ঐ দেখ, আবার ঘরের চালে এসে বসলো বোধ হয়।......দেতো বাঁটুলটা, না, না, তীর ধনুক দে'। বন্দুকটা পেলাম না, নইলে কাকের বংশ লোপ করে দিয়ে যেতাম। উঃ, শালারা আমাকে জ্বালিয়ে মেরেচে। এই নেত্য, দেখ, দেখ, বিছানায় বুঝি একটা কাক এসে বসলো। ওরে, তাড়া তাড়া শীগগির তাড়া—কি চীৎকার রে বাবা—কি অলুক্ষণে ডাক। আমাকে বাঁচা, বাঁচা নেত্য—ওরা যে আমাকে ছেয়ে ধরলো কা কা করে। কান আমার গেল। হুস..... হুস......হুস! তবু যে নড়ে না ওরা নেত্য।

নৃত্যকালি একটু জোরেই বলিল, সব তাড়িয়ে দিয়েচি কবরেজ কাকা, আপনি এখন একটু চুপ করে ঘুমোতে চেষ্টা করুন।

—আঃ, বাঁচালি নেত্য। তুই আমার শেষ সম্বল নেত্য। তুই না থাকলে যে আমার কি দশা হতো তা কে জানে। তোকে বলি তবে শোন্, এই কাক কাক করে মরি কেন জানিস্? আমার খোকাকে তো দেখেচিস? তার মা মারা যেতে পাঁচ বছর বয়স থেকে তাকে আমি বারো বছরেরটি করে তুলি। একদিন স্কুল গেল। চলে যাওয়ার পর লক্ষ্য করলাম, লাউ মাচার ওপরে বসে একটা কাক ডাকচে। কাকটা আর নড়লো না সারাদিন। খোকা দুটোর সময় ছুটি করে চলে এলো—এসেই পেছনের দরজা দিয়ে বাড়ি ঢুকে উঠানের ঐ লাউমাচাটার কাছেই ভিমরি খেয়ে পড়লো, আর উঠলো না। লাউমাচার ওপর ঠায় তখনও সেই কাকটা বসে কা কা করচে। খোকা আর কথাও কইলো না, উঠলোও না। রোগ যে কি কিছুই ধরা পড়লো না আমার মত একটা কবরেজ হিমসিম খেয়ে গেল রোগ ঠিক করতে। গেল, আমার সর্বস্ব গেল! কিন্তু কাকটা বসেই রইলো সন্ধ্যে পর্যন্ত। সেই থেকে কাক আমার পরম শত্রু নেত্য—কাক মারাই আমার কাজ। কিন্তু পারলাম কই—বন্দুকটা দিলে না ওরা।.........ওরে কাকটা যে আবার লাউমাচায় বসে ডাকচে, একটু তাড়িয়ে দিয়ে আয়। আমায় জল দে নেত্য, গলা আমার শুকিয়ে গেল।

ভোরের দিকে প্রলাপ আরও বাড়িয়া চলিল। তারপরে এক সময় একটা ঝাঁকানি দিয়া সব নীরব। নৃত্যকালি সব বুঝিল। চোখ দিয়া তাহার ঝরঝর করিয়া জল ঝরিয়া পড়িল।

কাঁদিতে কাঁদিতেই নৃত্যকালি বাহিরে আসিল। উঠানে আসিয়া দেখিল—একপাশে ঘাসের জমির উপর একটা কাক মরিয়া পড়িয়া আছে।

নৃত্যকালি বুঝিল, মনোহর কবিরাজের বিষের কাজ হইয়াছে।

শাশ্বতী

তারাকুমার ঘোষ

তোমার যাহা সত্য তাহা ত্রিকাল নেবে মেনে।
সেই মাধুর্য জেনে,
ত্রিভুবনের দীপ্তি পুলক তৃপ্তি সুধা এনে,
ক্ষণের করে দিয়ে যাবে নিত্য রূপায়ন,
পাশের কাঁটা ঢাকতে নারে পুষ্প-আভরণ।
সৌরভে তার মাতাল চারিদিক
ঊষা হাসে নির্নিমিখ,

লুকায় রাত্রির গভীর আঁধার সহজতম আবেশে।
তেমনি তোমার মহনীয় কমনীয়তা উঠবে নিজে
হেসে।

সংসারে কি সবাই হবে বিশ্বজনের প্রিয়,
বিশ্ব যদি না হয় গো তোমার বরণীয়?
ব্যর্থ তবু নয়কো কভু তোমার ইতিহাস।
রঙীন হবেই সোনার রঙে দীপ্ত এ আকাশ।

সোভিয়েট শাসনতান্ত্রিক পরিবর্ত্তন

বসুবন্ধু শর্মা

১৯৪৪ খৃষ্টাব্দের ১লা ফেব্রুয়ারী সোভিয়েট রাশিয়ার শাসন-তান্ত্রিক ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন বলে পরিগণিত হবে। ঐদিন অপরাহ্নে সুপ্রীম সোভিয়েট মঁসিয়ে মলোটভ্ সোভিয়েট ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন গণতন্ত্রকে স্বাধীনভাবে নিজেদের পররাষ্ট্রীয় সম্পর্ক নির্ধারণের পূর্ণ অধিকার দেবার প্রস্তাব উত্থাপন করেন। দেশরক্ষার জন্যে বিভিন্ন গণতন্ত্রের স্বাধীন-ভাবে সৈন্যদল রাখার অধিকার দানেরও একটি প্রস্তাব মলোটভ্ সুপ্রীম সোভিয়েটে উপস্থাপিত করেন। যথাযোগ্য আলোচনার পরে সুপ্রীম সোভিয়েটের উভয় পরিষদেই প্রস্তাব দুটি গৃহীত হয়েছে। এর অর্থ এই যে এখন থেকে সোভিয়েট ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন ১৬টি গণতন্ত্র ভিন্ন রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারবে এবং দেশরক্ষার জন্যে ভিন্ন ভিন্ন সৈন্যদলও রাখতে পারবে। আপাত দৃষ্টিতে এই পরিবর্তন যত সহজ বলে মনে হয়—কার্যত কিন্তু তা নয়। এদুটি বিভাগ যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বলে এতদিন পর্যন্ত এদের উপর কেন্দ্রীয় গভর্নমেন্টেরই মূল কর্তৃত্ব ছিল। বিপ্লবোত্তর সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ার শাসনতন্ত্রের ইতিহাসে—এ একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন বললেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। যাঁরা মনে করেন যে বর্তমান রাশিয়ায় সমাজতন্ত্র নেহাৎই জোরের উপর প্রতিষ্ঠিত—তাঁরা এই নতুন ব্যবস্থার প্রবর্তনে তাঁদের যোগ্য প্রত্যুত্তর পাবেন। এ পর্যন্ত সোভিয়েট ইউনিয়নে যে ১৬টি বিভিন্ন গণতান্ত্রিক ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তাদের প্রত্যেকটিই স্বেচ্ছা-গঠিত। তারা নিজেদের সুবিধার জন্যেই এসে সোভিয়েট ইউনিয়নে প্রবেশ করেছে—আবার নিজেদের ইচ্ছানুসারেই তাদের বেরিয়ে যাবার অধিকার আছে। অথচ সুদীর্ঘ বাইশ বছরের মধ্যে সোভিয়েট রাশিয়ার ছোট বড় কোন গণতন্ত্রই সমাজ-তান্ত্রিক সোভিয়েট ইউনিয়নের বাইরে চলে যেতে চায়নি। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার মূলে যে মানবকল্যাণব্রত রয়েছে—এর দ্বারা সেই কথাই কি প্রমাণিত হয় না? বর্তমান যুদ্ধ শুরু হবার পর স্টালিন যখন কোমিন্টার্ন বা তৃতীয় আন্তর্জাতিকের সাময়িক বিলুপ্তি ঘোষণা করেছিলেন তখনও সারা পৃথিবী আজকের মত বিস্মিত হয়ে গেছিল। নানা দেশ থেকে স্টালিনের এই নতুন নীতি ঘোষণার নানারূপ বিরুদ্ধ-সমালোচনা দেখা গিয়েছিল। কেউ বলে-ছিলেন যে কোমিন্টার্নের বিলুপ্তি মানে রাশিয়ায় কম্যুনিজমের সাময়িক মৃত্যু; আবার কেউ বলেছিলেন যে কোমিন্টার্ন উঠিয়ে দিয়ে সমাজতান্ত্রিক রাশিয়া ধন-তান্ত্রিক ব্রিটেন ও আমেরিকার কাছে আত্ম-সমর্পণ করেছে—স্টালিনের কূটনৈতিক পরাজয় হয়েছে। কিন্তু পরবর্তী ঘটনার আলোকে বিচার করলে দেখা যায় যে দৃশ্যত স্টালিনের এই পরাজয় শেষ-পর্যন্ত কূট-নৈতিক বিজয়ে পর্যবসিত হয়েছে। মস্কো এবং তেহ্‌রান সম্মিলনের ফলে আজ রাশিয়া, ব্রিটেন এবং আমেরিকার হিটলার-বিরোধী মৈত্রী আরও দৃঢ়তর হ'য়ে উঠছে। কম্যুনিজমের আসল উদ্দেশ্য এর দ্বারা সাময়িকভাবে ব্যাহত হলেও, স্টালিন তাঁর স্বদেশ সোভিয়েট ইউনিয়নকে নিশ্চিত ধ্বংসের হাত থেকেই শুধু বাঁচিয়ে তোলেন নি—তার আন্তর্জাতিক পদ-মর্যাদা লাভের পথও প্রশস্ত করে দিয়ে-ছেন। আর কিছু না হোক, বর্তমান জার্মান-বিরোধী যুদ্ধ নিঃসংশয়ে প্রমাণিত করেছে যে রুশরাষ্ট্রনায়ক স্টালিন একজন বড় স্বদেশপ্রেমিক। তাঁর এই স্বদেশ-প্রেমের মধ্যে প্রচলিত ধনতান্ত্রিক স্বদেশপ্রেমের উগ্রতা বা পররাজ্যলিপ্সা নেই—আছে স্বদেশের পরম কল্যাণ-সাধন-ব্রত। বর্তমান ফ্যাসিস্ট-বিরোধী যুদ্ধের পরিসমাপ্তি হবার আগেই স্টালিন সোভিয়েটের বিভিন্ন গণ-তন্ত্রগুলোকে নতুন অধিকার দানের যে বৈপ্লবিক নির্দেশ দিয়েছেন, কিছুদিন না গেলে তার পূর্ণ অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা সহজ হবে না। তবে অনেক দিক ভেবেই যে স্টালিন যুদ্ধকালে এই বৈপ্লবিক নির্দেশ দিয়েছেন সে কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে। ইংল্যান্ড ও আমেরিকার প্রচারিত যুদ্ধাদর্শ এবং অনুসৃত কার্যক্রমের মধ্যে এ পর্যন্ত অনেক বৈষম্য দেখা গেছে। কিন্তু সোভিয়েট রাশিয়ার যুদ্ধাদর্শ ও কার্যক্রম একই নীতির দ্বারা অনুপ্রাণিত। স্টালিনের মতে রুশ-জার্মান যুদ্ধের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছেঃ

"Abolition of racial exclusiveness, equality of nations and integrity of their territories, liberation of enslaved nations and restoration of their sovereign rights, the right of every nation to arrange its affairs as it wishes, economic aid to nations that have suffered and assistance to them in attaining their material welfare restoration of democratic liberties the destruction of the Hitlerite regime."

এ পর্যন্ত সোভিয়েট রাষ্ট্র এই ঘোষিত নীতি থেকে বিচ্যুত হয়নি। বিভিন্ন সোভিয়েট গণতন্ত্রকে তাদের পররাষ্ট্রীয় সম্পর্ক নির্ধারণের স্বাধীন অধিকার দান কি এই ঘোষিত নীতিরই পরিপোষক নয়?

সোভিয়েট রাষ্ট্র ব্যবস্থা যেমন নানাদিক থেকে অভিনব—সোভিয়েট শাসনতান্ত্রিক গঠনও তেমনি অভিনব এবং জটিল। রুশ বিপ্লবের ফলে রাশিয়ায় সর্বপ্রথম একটি মাত্র সোভিয়েট সোস্যালিস্ট রিপাব্লিক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। রুশদের এই প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রটিই বর্তমান সোভিয়েট ইউনিয়নের বৃহত্তম রাষ্ট্র এবং রাশিয়ার প্রায় অর্ধেক লোকই এই রাষ্ট্রের অধিবাসী। পরে ট্রান্সককেসিয়ান ফেডারেশন, ইউক্রেন সোভিয়েট রিপাব্লিক এবং হোয়াইট রাশিয়ান রিপাব্লিক সৃষ্টি হয়। তারও পরে তুর্কিস্থান থেকে উজবেক্, তুর্কমেন এবং তাজিদিক রিপাব্লিক গঠিত হয়। সুদূর পূর্ব সাইবেরিয়া থেকে জাপানীরা বিতাড়িত হবার পর ১৯২২ খৃষ্টাব্দে সর্বপ্রথম সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র সংস্থাপিত হয়। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে সোভিয়েট ইউনিয়নের আইনসংগত নতুন শাসনতন্ত্র বিরচিত হয়। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে স্টালিন শাসনতন্ত্র ঘোষিত হবার সময় রিপাব্লিকগুলোর সংখ্যা দাঁড়ায় এগারোতে। বর্তমানে ইউনিয়ন রিপাব্লিক-গুলোর সংখ্যা হয়েছে ১৬। এই ষোলটি পৃথক গণতন্ত্র ছাড়াও, ২২টি ক্ষুদ্রতর স্বায়ত্ত শাসিত গণতন্ত্র এবং ২০টি সংখ্যা-লঘিষ্ঠদের জন্যে পৃথকীকৃত অঞ্চল আছে। সমগ্র সোভিয়েট ইউনিয়নে যত ভিন্ন ভিন্ন ভাষা, জাতি এবং ধর্ম আছে—পৃথিবীর আর কোন দেশে বা সাম্রাজ্যে সেরূপ দেখা যায় না। ইউনাইটেড সোস্যালিস্ট্ সোভিয়েট রিপাব্লিকের মধ্যে অন্তত ১৮০টি ভাষা, বহু জাতি ও ধর্ম আছে। জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও সংখ্যা নির্বিশেষে সোভিয়েট শাসন পদ্ধতি সকলকে সমান অধিকার প্রদানের যে অভিনব উপায় উদ্ভাবন করেছে, পৃথিবীর আর কোন দেশে সেরূপ সম্ভব হয়নি। সোভিয়েট রাশিয়াই সর্বপ্রথম জগতের সামনে প্রতিপন্ন করেছে যে, একমাত্র সাম্যবাদের ভিত্তিতে ছাড়া পৃথিবীতে প্রকৃত গণতন্ত্র স্থাপন আকাশ-

কুসুমের মতই অলীক। ভিন্ন গণতন্ত্রগুলো স্বেচ্ছায় সোভিয়েট ইউনিয়নে যোগ দিয়েছে এবং তাদের প্রত্যেকেরই স্বেচ্ছায় এই ব্যবস্থার বাইরে চলে যাবার অধিকার আছে। এই অধিকার থাকা সত্ত্বেও কোন গণতন্ত্র সোভিয়েট ইউনিয়নের বাইরে ত চলে যায়ই নি বরং উত্তরোত্তর সোভিয়েট ইউনিয়ন বিস্তৃতি লাভ করে চলেছে। সমগ্র সোভিয়েট ইউনিয়নের মূলনীতি অক্ষুন্ন রেখে বিভিন্ন গণতন্ত্রগুলোর অর্থনৈতিক পরিবর্তন, পরিবর্ধন এবং শিক্ষা ও স্বাস্থ্য-বিষয়ক আইন প্রণয়নের পূর্ণ অধিকার ছিল। কিন্তু যুদ্ধ, শান্তি, আত্মরক্ষা, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক নির্ধারণ প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ অধিকারগুলো ছিল কেন্দ্রীয় সোভিয়েট ইউনিয়নের রাষ্ট্রবিভাগের হাতে। এটা খুবই স্বাভাবিক; কোন গণতন্ত্র যখন স্বেচ্ছায় সোভিয়েট ইউনিয়নে যোগ দেয়, তখন সোভিয়েট শাসনতন্ত্র অনুসারে নিজেদের রাষ্ট্রের উন্নতি বিধানের জন্যেই সে যোগ দেয়। সোভিয়েট ইউনিয়ন তার শাসনতান্ত্রিক মূলনীতিকে বিপন্ন করে ত আর এইসব গণতন্ত্রের স্বাতন্ত্র্যবোধকে মেনে নিতে পারে না। তা ছাড়া ইচ্ছামত বেরিয়ে যাবার পথ ত খোলাই রয়েছে। কিন্তু এই সোভিয়েট শাসন পদ্ধতি মানব সমাজের পক্ষে কতটা কল্যাণপ্রসূ হতে পারে, তার প্রমাণ মেলে যখন আমরা জারের আমলের অত্যাচার নিষ্পেষণ ও দারিদ্র্যের সংগে আজকের রাশিয়ার সাম্য মৈত্রী সবলতা এবং আর্থিক উন্নতির তুলনা করি। সাইবেরিয়ার যেসব দুর্গম অঞ্চল একদিন নির্বাসিত রুশদের জন্যে নির্দিষ্ট ছিল, সেইসব অঞ্চল আজ জ্ঞান বিজ্ঞান শিক্ষা সভ্যতায় এত বেশী উন্নতি করেছে যে, মিঃ ওয়েণ্ডেল উইল্কির মত ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রনেতাও তাঁর "One World" নামক সম্প্রতি প্রকাশিত রাজনৈতিক পুস্তকে সোভিয়েট শাসন পদ্ধতির প্রশংসা না করে পারেননি। সমগ্র সোভিয়েট ইউনিয়নের এই অভূতপূর্ব উন্নতির মূলে আছে মানব সমাজকে উন্নত করার প্রয়াস। সমাজতান্ত্রিক শাসনে আর কিছু থাক না থাক্, ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মত অর্থনৈতিক শোষণ-প্রচেষ্টা নেই।

সোভিয়েট শাসনের এই মূলগত বিভিন্নতা স্বীকার করেও অনেকে বুঝে উঠতে পারছেন না স্টালিন যুদ্ধকালে রাশিয়ায় এই নতুন শাসন-সংস্কার করলেন কেন। যুদ্ধের অজুহাতে ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলো তাদের অধীন দেশে শাসনতান্ত্রিক অগ্রগতি ঠেকিয়ে রাখতেই চায়। প্রমাণ, ভারতের শাসনতান্ত্রিক অগ্রগতির প্রতি ব্রিটেনের ক্রমিক ঔদাসীন্য। এ যুদ্ধে মিত্রপক্ষে রাশিয়ার মত আর কোন দেশই ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। অথচ সেই দেশেই স্টালিন এই নতুন নির্দেশ দিয়ে দেখিয়ে দিলেন যে, যুদ্ধকালে কোনরূপ শাসনতান্ত্রিক অগ্রগতি সম্ভব নয় বলে, সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলো যে যুক্তি দেখায়, সেটা রাজনৈতিক ধাপ্পাবাজী মাত্র। সোভিয়েট রাশিয়ার এই নতুন শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তনকে একদল ব্রিটিশ রাষ্ট্রনৈতিক সমালোচক ব্রিটিশ কমনওয়েলথ্-এর সংগে তুলনা করে বলেছেন যে, এর মধ্যে কোন নতুনত্ব নেই। কিন্তু এই জাতীয় তুলনা দান সমালোচকদের শাসনতান্ত্রিক অজ্ঞতারই সূচনা করে। যাঁরা এই জাতীয় তুলনা দেন তাঁরা সোভিয়েট ইউনিয়নকে ইংল্যাণ্ডের মতই সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র বলে মনে করেন। তাঁদের মতে সোভিয়েট সাম্রাজ্যবাদ কিছুটা অভিনব ধরণের—এই যা বিভিন্নতা। কিন্তু এ ধারণা যে কত ভ্রান্ত তার প্রমাণ সোভিয়েট ইউনিয়নে সাম্রাজ্যবাদসুলভ অর্থনৈতিক শোষণের অনুপস্থিতি। তা ছাড়া ব্রিটিশ কমনওয়েলথ্ শুধু শ্বেতাঙ্গদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু রুশ শাসনতান্ত্রিক অগ্রগতি জাতিধর্মনির্বিশেষে সব গণতন্ত্র সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। সাম্রাজ্যবাদী পদ্ধতিতে মানব-সংহতি এবং ঐক্য স্থাপন যে অসম্ভব, সেকথা ভালভাবে প্রমাণিত হয় যখন দেখি যে ব্রিটিশ কমনওয়েলথ্-এর মধ্যেও সোভিয়েট ইউনিয়নের মত দৃঢ় সংঘবদ্ধ ঐক্য নাই। ব্রিটিশ দ্বীপের পাশবর্তী আয়ারের নিরপেক্ষতা এবং ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত লর্ড হ্যালিফাক্সের টরেণ্টো বক্তৃতায় ক্যানাডার অসন্তোষ জ্ঞাপন তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। কিন্তু সোভিয়েট রাষ্ট্রের উপর দিয়ে যে বিরাট ফ্যাসিস্ট-বিরোধী যুদ্ধের ঝড় বয়ে যাচ্ছে, তাতে একদিনের জন্যও বিভিন্ন জাতিধর্ম নিয়ে সংগঠিত সোভিয়েট ইউনিয়নে কোন অসংহতির প্রকাশ দেখা যায়নি। জনযুদ্ধ বলতে যদি যুদ্ধে জনগণের অংশ গ্রহণ করা বোঝায়, তবে একমাত্র সোভিয়েট রাষ্ট্রকেই বলা চলে প্রকৃত জনযুদ্ধে লিপ্ত। স্টালিন সোভিয়েট ইউনিয়নের এই দৃঢ়-সংবদ্ধ ঐক্য এবং অচ্ছেদ্য মানব সংহতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সজাগ বলেই তিনি যুদ্ধকালে বিভিন্ন সোভিয়েট গণতন্ত্রকে পররাষ্ট্রীয় সম্পর্ক স্থাপনের অধিকারদানে কুণ্ঠিত হননি। সোভিয়েট শাসনতন্ত্রের এই পরিবর্তন যে মংগলপ্রসূ হ'তে বাধ্য, লণ্ডনের 'Economist' নামক পত্রিকাও সেকথা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন। এই শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তনের বিভিন্ন দিক আলোচনা করে উক্ত পত্রিকা মন্তব্য করেছেন :

"Marshal Stalin and M. Molotov have their eye on realities. Their 16 republics will hang to-gether for reasons invisible to the constitutional lawyer. It would be the height of foolishness to deny our selves what the Russians will certainly enjoy. Where association is truly free and good neighbourly and where the members are champions of a world order, it can surely do nothing but good."

মুস্কিল হচ্ছে এইখানেই। আজ যে ইংল্যাণ্ড ভারতকে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দানে নারাজ, তার কারণ ইংল্যাণ্ড জানে স্বায়ত্তশাসিত ভারতে ইংল্যাণ্ডের যথেচ্ছ অর্থনৈতিক শোষণ চলবে না। তা ছাড়া, স্বাধীন হয়ে ভারত ইংল্যাণ্ডের ধনতান্ত্রিক আদর্শের ফাঁকি ধরে ফেলে তার সংগে মৈত্রীর সম্পর্ক না-ও রাখতে পারে—এরকম একটা সম্ভাবনাও ইংল্যাণ্ডের মনে উঁকি দেয় না কি? সম্প্রসারিত অধিকার প্রদানে সোভিয়েটের কিন্তু সে ভয় নেই। সোভিয়েট জানে যে তার শাসন পদ্ধতি এমন একটা রাষ্ট্র-ব্যবস্থার উপর সংস্থাপিত যার মূল কথা হচ্ছে সাম্য ন্যায় এবং মৈত্রী। সে আদর্শের মধ্যে ফাঁকি নেই।

সোভিয়েটের নতুন শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তনের পিছনে অপর একটি উদ্দেশ্যও থাকতে পারে। এই পরিবর্তন ঘোষণার মাত্র দু'দিন পূর্বে হিটলার তাঁর শক্তি লাভের একাদশ বার্ষিকী উপলক্ষে বক্তৃতা দিতে গিয়ে চিরাচরিত বলশেভিক বিদ্বেষ প্রচার করেছেন। বলশেভিক আতঙ্কের জুজু দেখিয়েই একদিন তিনি জার্মানীর সর্বাধিনায়ক হয়েছিলেন এবং বলশেভিক আতঙ্কের ধুয়ো তুলেই তিনি পরাজয়ের পূর্বে শেষবারের মত সমগ্র ইউরোপকে সোভিয়েট রাশিয়ার বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ করার প্রয়াস পেয়েছেন। রুশ সৈন্য আজ সোভিয়েট ভূমি ছেড়ে যুদ্ধপূর্ব পোল্যাণ্ডের মধ্যে বহু দূর অগ্রসর হয়েছে। এ অবস্থায় বলশেভিক আতঙ্কের ফলে বাল্টিক রাষ্ট্র এবং মধ্য ইউরোপের অন্যান্য রাষ্ট্রের মনে যাতে বিরূপ ভাবের সঞ্চার না হয়, সেদিকে দৃষ্টি রেখেও স্টালিন এই শাসনতান্ত্রিক সংস্কার সাধন করে থাকতে পারেন। সোভিয়েট রাষ্ট্রের অধীন গণতন্ত্রগুলোকে সম্পূর্ণ পররাষ্ট্রীয় অধিকার এবং স্বতন্ত্র সৈন্যদল রাখবার অধিকার দিয়ে তিনি ইউরোপবাসীদের বোঝাতে চেয়েছেন যে, সোভিয়েট গণতন্ত্রগুলো নামে পরাধীন হলেও কার্যত তারা স্বাধীন। স্বাধীন ইচ্ছা অনুসারে সোভিয়েট ইউনিয়ন থেকে বিচ্যুত হবার অধিকার ত তাদের আছেই—তা ছাড়া এই নতুন অধিকার দুটোও তারা পেল। স্টালিন প্রবর্তিত এই নতুন শাসন-সংস্কারের ফলে হিটলার অধ্যুষিত ইউরোপে কি প্রতিক্রিয়া হবে, তা শীঘ্রই বোঝা যাবে। ইউরোপের পূর্বাঞ্চলের

(শেষাংশ ৬৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বিদুষী ভার্যা

শ্রীউপেন্দ্র নাথ গঙ্গোপাধ্যায়

৩২

দক্ষিণ হস্তের স্পর্শের দ্বারা যূথিকার চিবুক চুম্বন করিয়া ক্ষীরোদবাসিনী আশীর্বাদ করিলে যূথিকা ক্ষীরোদবাসিনীকে হাত ধরিয়া সযত্নে লইয়া গিয়া একটা চেয়ারে উপবেশন করাইল। তাহার পর সে এবং দিবাকর অপর দুইখানা চেয়ার অধিকার করিয়া বসিল।

প্রসন্নমুখে ক্ষীরোদবাসিনী বলিল, "চুরি করে যা দেখতে এসেছিলাম, সেই যুগল-মিলন দেখে সত্যিই চোখ জুড়োলো। কিন্তু এমন চমৎকার রাধিকা কি করে পেলি দিবাকর?"

স্মিতমুখে দিবাকর বলিল, "পাঞ্জাবে লাহোর নামে এক বৃন্দাবন আছে, সেখানে বেড়াতে গিয়ে। —হঠাৎ।"

ধীরে ধীরে মাথা নাড়িয়া ক্ষীরোদবাসিনী বলিল, "হঠাৎ এ জিনিস পাওয়া যায় না; অনেক দিনের তপস্যার ফলে পেয়েছিস।"

দিবাকর বলিল, "সে কথা যদি বল, তাহলে মাত্র দিন-চারেকের তপস্যার ফলেই পেয়েছি।"

মৃদু হাসিয়া ক্ষীরোদবাসিনী বলিল, "ভুল করছিস দিবাকর। দিন-চারেক তপস্যা করেছিলি লাহোরে গিয়ে; তার আগে মনে মনে অনেক দিন করেছিলি।"

ক্ষীরোদবাসিনীর কথা শুনিয়া বিস্ময়চকিত কৌতুকে দিবাকরের এবং যূথিকার দৃষ্টি মুহূর্তের জন্য পরস্পরের সহিত মিলিত হইল। পর-মুহূর্তে ক্ষীরোদবাসিনীর দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া লইয়া দিবাকর বলিল, "মনে মনে তপস্যা কার জন্যে করেছিলাম, সে কথা জানতে যদি কৌতূহল হয়, তাহলে তোমার নাতবউকে জিজ্ঞাসা করে দেখতে পারো। ডেলিভারি দেবার সময় নিয়তি তপস্যার বর অদলবদল করে ফেলেছে। তার ফলে আর কারো তপস্যার ধন গোলেমালে আমার ভাগ্যে এসে উঠেছে। ছিলাম নীলকান্ত মণির প্রত্যাশী, পেয়ে গেছি কমল হীরে।" বলিয়া দিবাকর হাসিতে লাগিল।

কমল হীরে না-হয় কতকটা বোঝা গেল; কিন্তু নীলকান্ত মণির দ্বারা দিবাকর ঠিক কি বুঝাইতে চাহে তাহা ভাবিতে গিয়া ক্ষীরোদবাসিনীর মনে একটা খট্‌কা উপস্থিত হইল। বিশেষত, প্রথম দিনের সাক্ষাৎকালে হীরার আংটি এবং নীলার আংটির প্রসঙ্গে দিবাকর যে সকল কথা বলিয়াছিল, তাহার সহিত জড়িত হইয়া এই খট্‌কাটা আরও বেশি জটিল হইয়া উঠিল। শুধু তাহাই নহে, এই জটিলতার মেঘাবরিত আকাশে কালো মাণিকের কথাটাও কোন্ দিক দিয়া কেমন করিয়া অকস্মাৎ একবার ঝিলিক মারিয়া মিলাইয়া গেল। কিন্তু কোন দিক দিয়া কোন প্রকার যোগসূত্র ধরিতে না পারিয়া ক্ষীরোদবাসিনী সাধারণভাবে দিবাকরের কথার উত্তর দিয়া বলিল, "এ অদলবদলের কথা নয় দিবাকর, এ ভাগ্যের কথা। ভাগ্য যখন প্রবল হয়, তখন ধুলো-মুঠো ধরলে সোনা-মুঠো হয়, সেকথা শুনেছিস ত —এ সেই প্রবল ভাগ্যের কথা। তোর কপালে যখন কমল হীরে রয়েছে, নীলকান্ত মণি চাইলে কি হবে?"

এ কথার কোন বাচনিক উত্তর না দিয়া দিবাকর শুধু একটু হাসিল। মনে মনে বলিল, "ভাগ্য প্রবলই শুধু নয় ক্ষীরোদ ঠাকমা, প্রবলতর। মনে-প্রাণে যে জিনিস পরিহার করতে চেয়েছিলাম, কপালে সেই জিনিসই এসে জুটেছে।"

যূথিকার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সহাস্যমুখে ক্ষীরোদবাসিনী বলিল, "কিন্তু তপস্যা শুধু দিবাকরকেই করতে হয়নি ভাই নাতবউ, তোমাকেও করতে হয়েছিল। তুমি যা পেয়েছ, তাও তপস্যা করেই পেতে হয়। স্বীকার কর কি না?"

স্মিতমুখে মৃদুস্বরে যূথিকা বলিল, "নিশ্চয় করি ঠাকমা।"

হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া দিবাকর বলিল, "তাহলেই হয়েছে! আমার মত বর্বর বর যদি তপস্যা করে পেতে হয়, তাহলে সে তপস্যার ষোল আনাই ফাঁকি।"

চক্ষে তীক্ষ্ণ ভ্রূকুটি হানিয়া ক্ষীরোদবাসিনী বলিল, "কিসে তুই বর্বর হলি, শুনি?"

সে কথার উত্তর না দিয়া মাথা নাড়িয়া বারান্দার প্রান্তভাগে ইঙ্গিত করিয়া দিবাকর বলিল, "ঐ দেখ, কে আসছে।"

বারান্দা পর্যন্ত শিবানীকে পৌঁছাইয়া দিয়া আনন্দ তখন ফিরিয়া যাইতেছিল। পিছন ফিরিয়া চাহিয়া দেখিয়া সহাস্যমুখে ক্ষীরোদবাসিনী বলিল, "এই যে আমার কালো মাণিক এসে পড়েছেন! মিনিট পনেরো দেরি করে আসতে বলেছিলাম, কিন্তু সে সবুরও সয়নি।"

স্মিতমুখে সকুণ্ঠপদে শিবানী ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছিল। পরিধানে তাহার বেগুনফুল রঙের হাল্কা ঢাকাই শাড়ি। সেই সমগোত্রীয় বর্ণের আবেষ্টনের মধ্যে তাহার দেহের শ্যামল শ্রী নীলকান্ত মণির মতই দেখাইতেছিল। যূথিকার নিকট উপস্থিত হইয়া শিবানী মৃদুস্বরে বলিল, "আপনার সঙ্গে দেখা করতে এলাম বউদিদি।" তাহার পর নত হইয়া যূথিকার পদধূলি গ্রহণ করিল।

তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইয়া দুই হাত দিয়া শিবানীকে জড়াইয়া ধরিয়া যূথিকা তাহাকে পার্শ্ববর্তী চেয়ারে বসাইয়া স্মিতমুখে বলিল, "কতদিন এসেছ, আর এত দেরি করে বউদিদির সঙ্গে দেখা করতে আসতে হয় ভাই?"

এ কথার উত্তর দিল ক্ষীরোদবাসিনী; বলিল, "তাই কি আজই সহজে আসতে চায়। কত ওজর-আপত্তি করে, কত ভয়ে ভয়ে, তবে এসেছে।"

বিস্মিত কণ্ঠে যূথিকা বলিল, "কেন, ভয় কিসের ঠাকুরমা?"

ক্ষীরোদবাসিনী বলিল, "এম-এ পাশ বউদিদিকে লেখাপড়া না-জানা ননদের যা ভয়। একেবারে লেখাপড়া জানে না, সে কথা বললে অবিশ্যি অন্যায় হয়। বাঙলা লেখাপড়া নিতান্ত মন্দ জানে না। কিন্তু রোগেশোকে, অভাবে-কষ্টে ইংরেজি ইস্কুলে ত' তেমন পড়তে পারলে না, সেই জন্যে ইংরেজি তেমন কিছু শেখে নি।"

কৌতূহলের বশবর্তিনী হইয়া যূথিকা জিজ্ঞাসা করিল, "তবু কতটা শিখেছে?"

শিবানীর দুই চক্ষে ভ্রূকুটির ভর্ৎসনা লক্ষ্য করিয়া ক্ষীরোদবাসিনী সহাস্য-মুখে বলিল, "ঐ দেখ, চোখ রাঙিয়ে শিবু আমাকে বলতে মানা করছে। তোর বউদিদি ত' দিবাকরের চেয়েও কত বেশি লেখাপড়া জানে, তবে তোরই বা এত লজ্জা কিসের?" তাহার পর যূথিকার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "অবিশ্যি বলতে যে ও মানা করছে, তা অন্যায়ও নয়; বলবার মতো এমন কিছুই নেই। ইংরেজির ফার্স্ট বই পড়ছে শিবু; তাও সবটা এখনো শেষ করতে পারেনি।"

শিবানীর দিকে চাহিয়া সহাস্য মুখে যূথিকা বলিল, "এতে লজ্জা করবার ত' কিছু নেই শিবানী। তুমি ত' ইংরেজের মেয়ে নও যে, ইংরেজি না জানা তোমার পক্ষে লজ্জার কথা। কি হবে মিছিমিছি কতকগুলো ইংরেজি পড়াশুনো করে?"

বিস্মিত কণ্ঠে ক্ষীরোদবাসিনী বলিল, মিছিমিছি ইংরেজি পড়াশুনো করে! কিন্তু এতটা লেখাপড়া ক'রে এ কথা তোমার মুখে ত' সাজে না ভাই নাতবউ!"

কিন্তু এ কথা যে যূথিকার অন্তরের কথা নহে, মুখেরই কথা সুতরাং মুখেই সাজে, সে কথা সে কেমন করিয়া বলে। সাজাইয়া একটা কোনো কথা বলিতে গেলে পাছে তাহার সূত্র ধরিয়া অপর কোনো কঠিনতর কথা আসিয়া পড়ে সেই আশঙ্কায় মৃদু হাস্যের দ্বারা সে এ প্রসঙ্গ শেষ করিবার চেষ্টা করিল।

কিন্তু যূথিকার এই নিরুত্তরতার ছেদই ক্ষীরোদবাসিনীর মনে কৌতূহল জাগাইয়া তুলিল। মনে হইল এই ছেদই যথার্থ ছেদ নহে; ইহার পরও এমন কিছু আছে যাহা সহজে বলা যায় না বলিয়াই হাসি দিয়া ঢাকিবার যোগ্য। দিবাকরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সে বলিল, "কি ব্যাপার বল্ দেখি দিবাকর?"

মৃদু হাসিয়া দিবাকর বলিল, "কিসের কি ব্যাপার?"

ক্ষীরোদবাসিনী বলিল, "নাত-বউয়ের মুখে ইংরেজি লেখাপড়ার বিষয়ে এই সব কথা; নাতবউয়ের এই ভাব, এই মূর্তি? আমি ত' একটা উগ্রচণ্ড মেমসাহেবি ভাব দেখব বলে কতকটা ভয়ে ভয়েই এসেছিলাম। কিন্তু এসে দেখছি একেবারে উল্টো মূর্তি। মুখে খৈ-ফোটা কথা নেই, কথায় কথায় ইংরেজি বুলির বুকনি নেই, হাল ফ্যাশানের যখন-তখন হাসি নেই। দেখতে আমার ত' কিছু বাকি নেই দিবাকর। উনি বেঁচে থাকতে মাঝে মাঝে দার্জিলিঙে মামার বাড়ি গিয়ে কাটিয়ে আসতাম। আর তুই ত' জানিস দার্জিলিঙ হচ্ছে ফ্যাশানওয়ালা বাঙালী মেয়েদের টেক্কা দেবার জায়গা। আমি মনে ক'রে এসেছিলাম নাত-বউকে সেই গোত্রেরই একটি নাকে-মুখে-চোখে কথা কওয়া মেয়ে দেখব। কিন্তু এ যে একেবারে বিপরীত দেখছি!"

সহাস্যমুখে দিবাকর বলিল, "গ্রহণ দেখেছ ক্ষীরোদ ঠাকমা?"

চক্ষু কুঞ্চিত করিয়া ক্ষীরোদবাসিনী বলিল, "এতখানি বয়স হ'ল, 'গ্রহণ দেখেছ' কি রকম?"

"তোমাদের নাত-বউয়ে সেই গ্রহণ লেগেছে। রাহুগ্রস্ত হয়েছেন তোমাদের নাতবউ।"

"রাহু কে? তুই?"

"আমি ত' খানিকটা নিশ্চয়ই; তা ছাড়া আমাদের বাড়ির আবহাওয়া, আমাদের বাড়ির সংস্কার, ইতিহাস।"

এক মুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া ক্ষীরোদবাসিনী বলিল, "সব কথা তোর বুঝতে পারিনে, কিন্তু এমন চকচকে চাঁদে গ্রহণ লাগিয়ে জ্যোৎস্না থেকে নিজেকে বঞ্চিত করিসনে দিবাকর।"

ক্ষীরোদবাসিনীর কথা শুনিয়া দিবাকর হাসিয়া উঠিয়া বলিল, "তোমার মুখ দিয়ে যে রীতিমত কাব্য বের হতে আরম্ভ করল ক্ষীরোদ ঠাকমা!"

এ কথার উত্তর দিবাকরকে না দিয়া যূথিকার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ক্ষীরোদবাসিনী বলিল, "আচ্ছা, তুমিই বিচার কর ভাই যূথিকা, যে কথা আমি বলছি তা কাব্য, না খাঁটি সত্যি কথা?"

ক্ষীরোদবাসিনী এবং দিবাকরের মধ্যে যে প্রবাহে কথোপকথন চলিয়াছিল, শুরু হইতেই যূথিকা মনে মনে তাহা অপছন্দ করিতেছিল। নিজেকে কোনো প্রকারে তাহার মধ্যে লিপ্ত না করিবার আগ্রহে সে বলিল, "আপনারা নাতি-ঠাকুমায় কাব্য করছেন, আমি তার মধ্যে কি বলব বলুন? আপনারা দুজনে কথাবার্তা বলুন, শিবানীকে আমি একটু বেড়িয়ে নিয়ে আসি।" বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

শিবানীও এ প্রস্তাবে অতিশয় খুশি হইয়া চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল।

বিস্মিত কণ্ঠে দিবাকর বলিল, "কোথায় বেড়িয়ে নিয়ে আসবে?"

মৃদু হাসিয়া যূথিকা বলিল, "বেশী দূরে কোথাও নয়; এ ঘর ও ঘর। বড় জোর, পিছন দিকের ফুল বাগানে একটু।"

প্রসন্ন মুখে ক্ষীরোদবাসিনী বলিল, "আমার কালোমাণিককে তোমার ভাল লেগেছে ভাই।"

"খুব ভাল লেগেছে। আপনার কালোমাণিক অনেক সাদামাণিকের চেয়েও ভাল।" বলিয়া শিবানীকে লইয়া যূথিকা প্রস্থান করিল।

সেইদিন রাত্রে শয়ন কক্ষে দিবাকরের সহিত যূথিকা মিলিত হইলে কথায় কথায় সে জিজ্ঞাসা করিল, "শিবানীকে তোমার কেমন লাগে?"

এক মুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া দিবাকর বলিল, "ভালই লাগে।"

"আচ্ছা, শিবানী তোমার নীলকান্তমণি দলের মেয়ে, না? যে দলের মেয়ের জন্যে বিয়ের আগে তুমি প্রত্যাশী ছিলে?"

পুনরায় এক মুহূর্ত মনে মনে কি চিন্তা করিয়া দিবাকর বলিল, "তা হয়ত' বলতে পারো।"

"শিবানীর সংগে তোমার বিয়ে হ'লে বেশ হোত,—না?"

অল্প একটু হাসিয়া দিবাকর বলিল, "এর উত্তরে আমি যদি বলি, 'সুনীথদাদার সংগে তোমার বিয়ে হ'লে বেশ হোত,—না?' তা হলে কি বলবে?"

"তা হ'লে বলব, আমার কথার উত্তর না দিয়ে কথাটা তুমি এড়িয়ে যাচ্ছ।"

"সে কথার উত্তরে আমি বলব, রাত হয়েছে শুয়ে পড়। তর্কটা ক্রমশ এমন জায়গায় প্রবেশ করবার চেষ্টা করছে, যেখানে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একটা কোনো রকম বোঝাপড়া হওয়ার চেয়ে না হওয়াই বোধ হয় অনেক সময়ে ভাল।" বলিয়া দিবাকর শয্যার মধ্যে প্রবেশ করিয়া লেপ টানিয়া শুইয়া পড়িল।

পরদিন সকালে দশটা আন্দাজ যূথিকা তাহার পড়িবার ঘরে বসিয়া চিঠি লিখিতেছিল, এমন সময়ে দিবাকর প্রবেশ করিয়া একটা চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিয়া বলিল, "একটি ছেলের পক্ষ থেকে তোমার কাছে দরবার করতে এলাম যূথিকা।"

কলমটা বন্ধ করিয়া রাখিয়া যূথিকা বলিল, "কি বল?"

"অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় নামে একটি ছেলে তোমার অটোগ্রাফের জন্যে খাতা দিয়ে আমাকে তোমার কাছে পাঠিয়েছে। এমন অবলীলার সংগে সে আমাকে এই কাজে লাগিয়েছে, যাতে মনে হয় যে, মূর্খ স্বামীকে দিয়ে বিদুষী স্ত্রীর অটোগ্রাফ জোগাড় করিয়ে নিলে মূর্খ স্বামীকে আপ্যায়িত করাই হবে, এই তার ধারণা। আমি কিন্তু অরুণের খাতার সংগে আরও একটা খাতা এনেছি।"

"সেটা কার খাতা?"

"সেটা আমার। দেরাজের মধ্যে অনেক দিন থেকে একটা বাঁধানো পকেট-বুক ছিল, সেইটেই আমার অটোগ্রাফের খাতা করেছি। তা'তে প্রথম অটোগ্রাফ সংগ্রহ করব তোমার। তারপর সুনীথদাদা প্রভৃতির। জগতে অনেক রকম জাত আছে, যেমন হিন্দু-অহিন্দু, ধনী-দরিদ্র, সাদা-কালো। তেমনি আরও দুটো জাত আছে; প্রথম জাত, যারা অটোগ্রাফ নেয়; আর দ্বিতীয়, যারা অটোগ্রাফ দেয়। আমি প্রথম জাতের অন্তর্গত, তুমি দ্বিতীয় জাতের। আমার খাতায় তোমার অটোগ্রাফ দাও যূথিকা।"

হাত বাড়াইয়া যূথিকা বলিল, "কই, খাতা দেখি।"

পকেট হইতে দুইখানা খাতা বাহির করিয়া দিবাকর যূথিকার সম্মুখে স্থাপন করিল।

দিবাকরের খাতাখানা বাছিয়া লইয়া কলম খুলিয়া প্রথম পৃষ্ঠায় যূথিকা ধীরে ধীরে স্পষ্টাক্ষরে লিখিল,—"সাধারণ অবস্থায় এবং সাধারণ ধারণায় কোন বস্তু যতই উপকারী এবং মঙ্গলপ্রদ হউক না কেন, কোন বিশেষ অবস্থায় তাহা যদি অশুভকর হইয়া উঠে, তাহা হইলে সেই আপাত-মঙ্গলপ্রদ বস্তুকে বিষবৎ পরিত্যাগ করা উচিত।" তাহার পর নিজের নাম তারিখ লিখিয়া দিবাকরের হস্তে ফিরাইয়া দিল।

পড়িয়া দেখিয়া দিবাকর বলিল, "এ আপাত-মঙ্গলপ্রদ বস্তুটি কে যূথিক আমি না কি?"

যূথিকা বলিল, "এখনো ত তে কথা মনে হয় না। কিন্তু তোমা উদ্দেশ করে যখন লিখেছি, তখন আমি ত হতে পারি।"

"আচ্ছা, সে বিচার পরে করলে হবে, আপাতত তোমাকে শত ধন্যবাদ এবার এ খাতাটায় কিছু লিখে দাও বলিয়া দিবাকর অপর খাতাখান যূথিকার দিকে একটু ঠেলিয়া দিল

খাতাখানা তুলিয়া দিবাকরের সম্মুখে স্থাপিত করিয়া যূথিকা বলিল, "এ খাতায় একটি অক্ষরও লিখব না তোমার খাতাতেই আমি শেষ অটোগ্রাফ লিখলাম।"

"কিন্তু ওকে আমি কথা দিয়েছি।"

"এবার তাহলে কথার খেলাপ হ'ল এর পর আর কাউকে কখনো কথা দিয়ে না।"

দিবাকর পুনরায় কি বলিতে যাইতেছিল, করজোড়ে মিনতিপূর্ণ কণ্ঠে যূথিকা বলিল, "আমাকে ক্ষমা করো, আমার বেশি সময় নেই, এই জরুরী চিঠিটা এখনি আমাকে শেষ করতে হবে।"

সেই দিনই অপরাহ্নকালে সেই জরুরী চিঠিটা দিবাকরের হস্তে আসিয়া পেঁৗছিল।

(ক্রমশ)

সোভিয়েট শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তন

(৫১ পৃষ্ঠার পর)

রাষ্ট্রগুলো নাৎসীদের চাপে পড়ে সোভিয়েট ইউনিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত হলেও, সেখানকার জনগণের সহানুভূতি বোধ হয় সোভিয়েট রাশিয়ারই দিকে। যুগোস্লাভিয়ায় কম্যুনিস্ট নেতা তিতোর গভর্নমেণ্টের দৃঢ় আত্মপ্রতিষ্ঠা তার অন্যতম প্রমাণ। হিটলার অধিকৃত অন্যান্য ইউরোপীয় রাষ্ট্রেও শীঘ্রই এই বিপ্লবাত্মক আলোড়ন দেখা দেবে না—সে সম্বন্ধে কোন নিশ্চিত উক্তি করা যায় কি? এইসব কথা বিবেচনা করলে মনে হয় যে, সোভিয়েটের নতুন শাসনতান্ত্রিক সংস্কারে শুধু যে আভ্যন্তরীণ শাসনব্যবস্থায় পরিবর্তন আসবে তাই নয়—এই পরিবর্তন যুদ্ধোত্তর ইউরোপে সোভিয়েটের প্রভাব ও মর্যাদা বৃদ্ধিতেও যথেষ্ট সাহায্য করবে।

রঙ্গজগৎ

পোষ্যপুত্র

ভ্যারাইটি পিকচার্সের নতুন ছবি। কাহিনী—অনুরূপা দেবী ; পরিচালক সতীশ দাশগুপ্ত ; সুরশিল্পী—দুর্গা সেন; চিত্রশিল্পী—অজয় কর, শব্দধর—গৌর দাস ; বিভিন্ন ভূমিকায়—শিশির ভাদুড়ী, শৈলেন চৌধুরী, প্রমোদ গাঙ্গুলী, বিমান ব্যানার্জি, জহর গাঙ্গুলী, তুলসী চক্রবর্ত্তী, ইন্দু মুখার্জি, রেণুকা রায় সাবিত্রী, প্রভা, দেববালা, রাজলক্ষ্মী, নিভাননী প্রভৃতি।

স্বীকার করতে লজ্জা নেই যে, ছোটবেলায় সুলেখিকা অনুরূপা দেবীর 'পোষ্যপুত্র' নামক বিরাট উপন্যাসখানি পড়ে আমরা বিস্ময়বিমুগ্ধ হতাম। শিশু মনের কাছে অনুরূপা দেবীর ভাবালুতা-প্রধান প্রত্যেকখানি উপন্যাসেরই একটা বিশেষ আবেদন ছিল। তারপর ধীরে ধীরে যতই জ্ঞান বাড়ছে, বুদ্ধি বিকাশের সাথে সাথে ভাব-প্রবণতা যত কমতে শুরু করেছে, বুদ্ধি প্রধান মনের কাছে অনুরূপা দেবীর উপন্যাসের আবেদনও হয়ে এসেছে ততটা ফিকে। তাই 'পোষ্যপুত্রে'র চিত্ররূপ দেখতে গিয়ে মনে ভয় ছিল যে, হয়ত এই বিরূপ মনোভাবের উপর রূপালী পর্দা বিকৃত প্রভাবেরই সৃষ্টি করবে। কার্যত তা ঘটেনি বলেই মনে হচ্ছে যে, পরিচালক বেশ কিছুটা সাফল্যের সঙ্গেই কাহিনীটিকে পর্দায় রূপান্তরিত করতে পেরেছেন। স্থান বিশেষের ভাবালুতা বুদ্ধি-প্রধান মনকে নাড়া দিয়ে অনুকূল ভাবের সৃষ্টি করতে পারে না বটে—তবে চিত্রখানি মোটামুটি মনের উপর বিরূপভাব সৃষ্টি করে না। দর্শক সাধারণকে 'পোষ্যপুত্র' তৃপ্তি দিতে পারবে—এ বিশ্বাস আমাদের আছে।

'পোষ্যপুত্র' সামাজিক কাহিনী হলেও এতে বাঙলা দেশের যে সমাজ-জীবন চিত্রিত হয়েছে, বহুদিন হল বাঙলাদেশ থেকে সে সমাজ প্রায় লুপ্ত হয়ে এসেছে। বাঙলাদেশের সমাজে যে ডাকসাইটে ধনী জমিদারশ্রেণী ছিলেন, এখনও তাঁরা কেউ কেউ আছেন বটে—কিন্তু তাঁদের সে পূর্ব তেজ আর নেই। 'পোষ্যপুত্র' তাঁদেরই একজনের কাহিনী। বইটির নাম 'পোষ্যপুত্র' হলেও এর প্রধান চরিত্র জমিদার শ্যামাকান্ত রায়—যিনি প্রতাপশালী জমিদার স্নেহবান অথচ একগুঁয়ে পিতা। তাঁর চরিত্রের বজ্র সুলভ দৃঢ়তা এবং কুসুম সুলভ কোমলতা সারা কাহিনীকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। সমস্ত চরিত্রগুলোকে নিষ্প্রভ করে তিনি ঘাড় উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। বিপত্নীক শ্যামাকান্ত যখন গ্র্যাজুয়েট পুত্রকে বিয়ে করার আদেশ দিলেন, তখন পুত্র রাজী না হয়ে আরও বেশী পড়াশুনা করার ইচ্ছা প্রকাশ করল। যে জমিদার কোন দিন কারও অবাধ্যতা সহ্য করেন নি—তাঁর মুখের উপর পুত্রের এই অবাধ্য উক্তিতে তিনি ক্রোধান্ধ হয়ে তাকে বলে বসলেন : "তুই আমার ছেলে নেস্।" অভিমানী পুত্র বিনোদও পিতার এই উক্তিতে মর্মাহত হয়ে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল পথে। নানা অবস্থা বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে তার জীবন চলল। সে বিয়ে করল—তার ছেলে হল। এদিকে পুত্রশোকাতুর শ্যামাকান্ত বহু দিন বিনোদের আগমন প্রত্যাশায় বসে রইলেন। সে আর ফিরে এল না দেখে তিনি দূর সম্পর্কের আত্মীয়-পুত্র হেমেন্দ্রকে পোষ্যপুত্র নিলেন—তার সঙ্গে নিজের পুত্রের জন্যে বাগ্‌দত্তা মেয়ের বিয়ে দিলেন। হেমেন্দ্র কিন্তু শীঘ্রই পাড়ার কয়েকজন সমবয়সী ইয়ার-বন্ধুর পাল্লায় পড়ে উচ্ছৃঙ্খলতার পথে চলল। পরে অবশ্য নানা রকম ঘটনার মধ্যে দিয়ে হেমেন্দ্রর সাময়িক মতিচ্ছন্নতা দূর হল—অভিমানী বিনোদও শেষ পর্যন্ত স্ত্রী-পুত্র নিয়ে এসে স্নেহময় পিতার কাছে হাজির হল। মিলনাত্মক উপন্যাস পোষ্যপুত্রের এই হল মূল কাহিনী।

পর্দার গায়ে মূল কাহিনীর বিভিন্ন চরিত্র চিত্রনাট্যকার ও পরিচালক সতীশ দাশগুপ্ত ভালোভাবে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন। জমিদার শ্যামাকান্তের সবল স্নেহপ্রবণ জটিল চরিত্রটির রূপদান করেছেন বাঙলা রঙ্গমঞ্চের অপ্রতিদ্বন্দ্বী শ্রেষ্ঠ অভিনেতা শিশিরকুমার ভাদুড়ী। মঞ্চে এই চরিত্রে তাঁর অভিনয় যে সর্বাঙ্গসুন্দর হত একথা নিঃসংশয়ে বলা চলে। কিন্তু চলচ্চিত্রে তাঁর এই রূপদান সর্বাঙ্গসুন্দর হয়নি। মঞ্চ ও চলচ্চিত্র অভিনয়ের অন্তর্নিহিত বিভিন্নতাই হয়ত এর জন্যে অনেকাংশে দায়ী। তাই স্থানে স্থানে তাঁর অভিনয় নেহাৎ মঞ্চঘেঁষা হয়ে পড়েছে। তবে স্থানবিশেষে তিনি যে অপূর্ব ভাব-ব্যঞ্জনার সাহায্যে শ্যামাকান্তের জটিল চরিত্রটি ফুটিয়ে তুলেছেন বাঙলা চলচ্চিত্রে তার তুলনা মেলা দুরূহ। বিশেষ করে শেষ দৃশ্যে তিনি যে অভিনয় করেছেন সেটা অপূর্ব বললেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। বহুদিন পরে শিশিরকুমারের চিত্রাবতরণে চিত্রামোদীরা খুশিই হবেন। বিনোদের ভূমিকায় প্রমোদ গাঙ্গুলীর অভিনয় মোটামুটি মন্দ নয়। হেমেন্দ্রের ভূমিকায় নবাগত অভিনেতা বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় সুদর্শন বটে; কিন্তু মাইকের দোষে কিনা জানি না, তাঁর বাচন পদ্ধতি সুশ্রাব্য বলে মনে হল না। রজনীনাথের ভূমিকায় শৈলেন চৌধুরী বেশ সুষ্ঠু সংযত অভিনয় করেছেন। মাণিকচাঁদের ভূমিকায় জহর গঙ্গোপাধ্যায় প্রচুর হাসির খোরাক জোগালেও, তাঁর ভূমিকাটি উপযুক্ত হয় নি। নারী চরিত্রগুলোর মধ্যে শিবানীর ভূমিকায় রেণুকা রায় সুঅভিনয় করেছেন। শান্তির ভূমিকায় সাবিত্রীর অভিনয় ভাল না হলেও তাঁর কণ্ঠসংগীত সুগীত হয়েছে। সিদ্ধেশ্বরীর ভূমিকায় শ্রীমতী প্রভার অভিনয় উল্লেখযোগ্য। অন্যান্য পার্শ্ব চরিত্রগুলোও সুঅভিনীত হয়েছে। "পোষ্যপুত্রের" মূল্যবান দৃশ্যপটগুলো ছবির অন্যতম প্রধান আকর্ষণ। চিত্রশিল্পে অজয় কর বেশ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। তবে শব্দ গ্রহণে আরও উন্নতির অবকাশ ছিল। সুরশিল্পী দুর্গা সেনের সংগীত পরিচালনা মন্দ নয়।

ভক্তরাজ

জয়ন্ত দেশাই প্রোডাকসন্সের হিন্দী বাণীচিত্র। প্রযোজক ও পরিচালক জয়ন্ত দেশাই; সংগীত পরিচালক—সি রামচন্দ্র, শিল্প নির্দেশক—এইচ এস গঙ্গনায়ক, আলোকচিত্র—নানুভাই ভাট, বিভিন্ন ভূমিকায়—বিষ্ণুপন্থ পাগ্‌নিস, বাসন্তী, কৌশল্যা, মুবারিক, দীক্ষিত প্রভৃতি।

ভক্তিমূলক চিত্র নির্মাণে জয়ন্ত দেশাই ইতিমধ্যেই বেশ সুনাম অর্জন করেছেন। প্রমাণ "তানসেন" ও "ভক্ত সুরদাস"। ভক্তিমূলক কাহিনীর অবাস্তবতাকে যদি বাদ দিয়ে বিচার করি, তবে "ভক্তরাজ"কেও প্রথম শ্রেণীর চিত্র বলতে দ্বিধা বোধ করার কারণ নেই। অযোধ্যার একজন পরম ভক্ত যুবরাজ অম্বরীশের কাহিনী বর্তমান চিত্রটির প্রধান উপজীব্য। ভক্তের ভগবান ভক্তকে সর্বপ্রকার বিপদের হাত থেকে রক্ষা করেন এবং শেষ পর্যন্ত ভক্তের জয় অবধারিত—বর্তমান চিত্রের সাহায্যে এই কথাটাই সাধারণ্যে প্রচার করার চেষ্টা করা হয়েছে। তবে ভক্তদের সাধারণত যেরূপ অতিমানব এবং অলৌকিক শক্তির আধার রূপে কল্পনা করা হয়, বর্তমান ছবিতেও তার ব্যতিক্রম দেখলাম না। ভারতীয় কোন চিত্রেই সাধারণত ভক্তদের মানুষ হিসাবে বিচার করা হয় না কেন ? অলৌকিকতার আবেদন জনমনের কাছে ব্যাপক হলেও, বুদ্ধিমান দর্শকদের সৌন্দর্যবোধ এর দ্বারা পীড়িত হয়। আমরা যখন চোখের সামনে বিষ্ণুর সুদর্শন চক্র ঘুরতে দেখি, তখন বিস্মিত হয়ে গেলেও, বুদ্ধি দিয়ে তাকে গ্রহণ করতে পারি না। 'ভক্তরাজে' এই জাতীয় অলৌকিক দৃশ্যাবলীর প্রাচুর্য বিশেষভাবে বিদ্যমান। তা নইলে দৃশ্য-সজ্জা, সেটিং প্রভৃতির দিক থেকে বিচার করলে 'ভক্তরাজ'-কে অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিত্র বলে স্বীকার না করে উপায় নেই। নাম ভূমিকায় কিছুদিন পূর্বে মৃত অভিনেতা বিষ্ণুপন্থ পাগ্‌নিস অভিনয়ে এবং সংগীতে আমাদের মুগ্ধ করেছেন। বাসন্তী ও কৌশল্যার অভিনয় এবং কণ্ঠ সংগীতও উল্লেখযোগ্য। অন্য দুইটি চরিত্রে মুবারক এবং দীক্ষিতের অভিনয় ভাল হয়েছে বলা চলে। উচ্চাঙ্গের সংগীত পরিবেশনের জন্যে সুরশিল্পী সি রামচন্দ্র কৃতিত্বের দাবী করতে পারেন। আলোকচিত্র ও শব্দ গ্রহণ বেশ সুন্দর হয়েছে।

খেলাধুলা

নিখিল ভারত অলিম্পিক প্রতিযোগিতা

পাতিয়ালায় নিখিল ভারত অলিম্পিক অনুষ্ঠান শেষ হইয়াছে। পাতিয়ালার এ্যাথলিট-গণ বিভিন্ন বিষয় সাফল্যলাভ করিয়া মোট ১২৯ পয়েণ্ট পাওয়ায় স্যর দোরাবজী টাটা কাপ লাভ করিয়াছেন। বোম্বাই দল ৩৯ পয়েণ্ট পাইয়া দ্বিতীয় ও ৩০ পয়েণ্ট পাইয়া পাঞ্জাব তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়াছেন। বাঙলার এ্যাথলিটগণ একমাত্র ৫০০০ মিটার ভ্রমণ ব্যতীত কোন বিষয়েই প্রথম স্থান অধিকার করিতে পারেন নাই। উক্ত ভ্রমণ বিষয়ে দুইজন বাঙালী এ্যাথলিট ১ম ও ২য় স্থান অধিকার করিয়াছেন। ভারোত্তলন বিষয়ে বাঙলা দল প্রথম হইয়াছে। অন্যান্য খেলা ও কুস্তি বিষয়ে তাঁহারা শোচনীয় ফলাফল প্রদর্শন করিয়াছেন। বাঙলার প্রতিনিধিগণ এইরূপ যে শোচনীয় ফলাফল প্রদর্শন করিবেন ইহা আমরা পূর্ব হইতেই জানিতাম এবং সেই-জনাই প্রতিনিধি প্রেরণে আপত্তি করিয়াছিলাম। যাহা হউক, ভবিষ্যতে প্রতিনিধি প্রেরণের সময় নিজেদের অবস্থার কথা স্মরণ করিয়া কার্য করিবেন বলিয়া মনে হয়। আশা করি, নিয়মিত শিক্ষার যে কি মূল্য তাহা পাতিয়ালার এ্যাথলিটগণের সাফল্য হইতে ভাল করিয়া উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। এই অনুষ্ঠানে ৯টি বিষয় নূতন ভারতীয় রেকর্ড প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং একটি বিষয় ভারতীয় রেকর্ডের সমান হইয়াছে। উক্ত ৯টি বিষয়ের মধ্যে ছয়টি বিষয় পাতিয়ালার এ্যাথলিটগণ ও ৩ বিষয় বোম্বাইর সাইকেল চালকগণ রেকর্ড প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

নিম্নে নূতন ভারতীয় রেকর্ডের তালিকা প্রদত্ত হইল :—

(১) ৩০০০ মিটার দৌড় :—চাঁদ সিং (পাতিয়ালা) সময় :—৮ মিঃ ৪৫.৫ সেকেণ্ড।

(২) হাতুড়ী ছোড়া :—লাকিশা সিং (পাতিয়ালা) দূরত্ব :—১৪৭ ফিট ১০ ইঞ্চি।

(৩) ১০০০ মিটার সাইকেল :—(প্রথম হিটে) কর্ডার (বোম্বাই) সময় ১ মিঃ ২৪.৫ সেকেণ্ড।

(৪) ৪০০ মিটার হার্ডল :—(দ্বিতীয় হিটে) প্রীতম সিং (পাতিয়ালা) সময় :—৫৬.২ সেকেণ্ড।

(৫) ১০০ কিলো মিটার সাইকেল :—কর্ডার (বোম্বাই) সময় :—৩ মিঃ ৪০ সেকেণ্ড।

(৬) ২০০ মিটার হার্ডল :—(দ্বিতীয় হিটে) প্রীতম সিং (পাতিয়ালা) সময় ২২-১ সেকেণ্ড।

(৭) উচ্চ লম্ফণ :—গুরুনাম সিং (পাতিয়ালা) উচ্চতা :—৬ ফিট ২২ ইঞ্চ।

(৮) ১০০০০ মিটার সাইকেল :—(প্রথম হিটে) আমিন (বোম্বাই) সময় :—১৬ মিঃ ১০.২ সেকেণ্ড।

(৯) ১৫০০ মিটার দৌড় :—চাঁদ সিং (পাতিয়ালা) সময় :—৪ মিঃ ৪.২ সেঃ।

(১০) ১১০ মিটার হার্ডল :—ভিকার্স (বোম্বাই) সময় :—১৫.৬ সেকেণ্ড (ভারতীয় রেকর্ডের সমান করিয়াছেন)।

বোম্বাইতে প্রদর্শনী ক্রিকেট খেলা

বোম্বাই ব্রাবোর্ণ ষ্টেডিয়ামে রেড ক্রস ফাণ্ডের সাহায্যের উদ্দেশ্যে একটি চারিদিনব্যাপী ক্রিকেট খেলা হয়। এই খেলায় সার্ভিসেস একাদশের সহিত ভারতীয় একাদশ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। সার্ভিসেস একাদশের পক্ষে ইংলণ্ডের বিখ্যাত ক্রিকেট খেলোয়াড় জার্ডিন ও হার্ডষ্টাফ যোগদান করেন। খেলায় খুব উচ্চাঙ্গের নৈপুণ্য প্রদর্শিত না হইলেও বেশ দর্শনযোগ্য হয়। ভারতীয় দলের পক্ষে পাঞ্জাবের তরুণ খেলোয়াড় গুলমহম্মদ ১৪৪ রাণ করিয়া নট আউট থাকিয়া ব্যাটিংয়ে অপূর্ব কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। সার্ভিসেস দলের পক্ষে হার্ডষ্টাফও দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় ১২৯ রাণ করেন। উইকেটের সর্বদিকে মারিয়া কিভাবে রাণ তুলিতে হয় তাহার নিদর্শন তাঁহার খেলার মধ্যে পাওয়া যায়। জার্ডিন সার্ভিসেস দলের ও মুস্তাক আলী ভারতীয় দলের অধিনায়কতা করেন। খেলায় ভারতীয় দলই শেষ পর্যন্ত ছয় উইকেটে জয়লাভ করিয়াছে। নিম্নে খেলার ফলাফল প্রদত্ত হইল :—

সার্ভিসেস একাদশ প্রথম ইনিংস :—৩০৩ রাণ (মহম্মদ সৈয়দ ৪৭, হার্ডষ্টাফ ৪১, জার্ডিন ৪৩, স্কিনার ৩০ নট আউট, এস ব্যানার্জি ৩৭ রাণে ৪টি, হাজারী ৩৩ রাণে ১টি, আমীর ইলাহি ৭৯ রাণে ২টি, আর এস মুডী ১১ রাণে ১টি ও সি এস নাইডু ৫৫ রাণে ১টি উইকেট পান।)

ভারতীয় একাদশ প্রথম ইনিংস :—৭ উইঃ ৫০২ রাণ ডিক্লেয়ার্ড (গুলমহম্মদ ১৪৪ নট আউট, সোহনী ৭৪, মুস্তাক আলী ৭৭, আর এস মুডী ৭৫, সি এস নাইডু ৩২, হাজারী ৩৯; বাটলার ১৪৪ রাণে ২টি, দোরাবীকেরী ১০৮ রাণে ৩টি, ডডস ৭৩ রাণে ১টি, স্কিনার ৯২ রাণে ১টি উইকেট পান)।

সার্ভিসেস একাদশ দ্বিতীয় ইনিংস :—৩৪১ রাণ (হার্ডষ্টাফ ১২৯, অধিকারী ৮১, মহম্মদ সৈয়দ ৩৭; সি এস নাইডু ৭০ রাণে ৩টি, আমীর ইলাহি ৮৫ রাণে ৪টি ও মুডী ১২ রাণে ১টি উইকেট পান)।

ভারতীয় একাদশ দ্বিতীয় ইনিংস :—৪ উ ১৪৭ রাণ (কিষেণচাঁদ ৪২ রাণ নট আউ আমীর এলাহি ৪৮ রাণ নট আউট, বাটল ৩৮ রাণে ২টি ও দোরাবীকেরী ৪৮ রাণে ২' উইকেট পান)।

বেংগলী বক্সিং এসোসিয়েশন

আগামী মার্চ মাসে বেংগলী বক্সিং এসোসিয়েশন বিভিন্ন ওজনে বেংগল চ্যাম্পিয়া নির্বাচন করিবার জন্য একটি প্রতিযোগিতা আয়োজন করিয়াছেন। এই প্রতিযোগিতায় কেবল মাত্র বাঙালী মুষ্টিযোদ্ধাগণই যোগদান করিতে পারিবেন। বেংগলী বক্সিং এসোসিয়েশনের অন্তর্ভুক্ত ক্লাব বা এসোসিয়েশনের সভ্যগণই এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করিতে পারিবেন। বাঙলা দেশে বাঙালী মুষ্টিযোদ্ধাগণের উৎসাহের জন্য এইরূপ প্রতিযোগিতার বিশেষ প্রয়োজন ছিল। বেংগলী বক্সিং এসোসিয়েশনের পরিচালকগণ এইরূপ ব্যবস্থা করায় আমরা প্রকৃতই আনন্দলাভ করিলাম। বাঙলার সকল উৎসাহী বাঙালী মুষ্টিযোদ্ধা এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করিবেন বলিয়া আমরা আশা করি।

নিখিল ভারত টেনিস প্রতিযোগিতা

এলাহাবাদে নিখিল ভারত টেনিস প্রতিযোগিতা কোনরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। অন্যান্য বৎসর এই প্রতিযোগিতায় যেরূপভাবে উৎসাহ ও উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয় এই বৎসর সেইরূপ হয় নাই। ভারতের অনেক বিশিষ্ট টেনিস খেলোয়াড়ই যোগদান করেন নাই। বিশেষ করিয়া মহিলা বিভাগে সামান্য কয়েকজন মাত্র যোগদান করেন। কেন যে এইরূপ একটি বিশিষ্ট অনুষ্ঠান এইভাবে শেষ হইল বুঝা গেল না। নিম্নে প্রতিযোগিতার ফলাফল প্রদত্ত হইল :—

মহিলাদের সিংগলস

মিস উডব্রিজ ৬-১, ৬-৩ গেমে মিসেস ম্যাগুরীকে পরাজিত করেন।

মিক্সড ডাবলস

ইফতিকার আমেদ ও মিস উডব্রিজ ৬-৪, ৬-২ গেমে ডবলিউ সি চয় ও মিসেস রোম্যান্সকে পরাজিত করেন।

পুরুষদের সিংগলস

হল সার্ফেস ৬-২, ৬-৪, ৬-০ গেমে গউস মহম্মদকে পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডাবলস

গউস মহম্মদ ও ইরসাদ হোসেন ৬-৩, ১১-৯, ৬-৩ গেমে ইফতিকার আমেদ ও প্রেম পান্ধীকে পরাজিত করেন।

সাপ্তাহিক সংবাদ

৮ই ফেব্রুয়ারী

মার্শাল স্ট্যালিন এক বিশেষ ঘোষণায় জানাইয়াছেন যে, নিকোপোল সেতুমুখ হইতে জার্মানদিগকে উচ্ছেদ করা হইয়াছে। লালফৌজ নিকোপোল শহর অধিকার করিয়াছে।

বর্তমান অচল অবস্থার অবসান ঘটাইবার এবং যুদ্ধ প্রচেষ্টার সহায়তা করিবার উদ্দেশ্যে রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দাবী করিয়া শ্রীযুত লালচাঁদ নবলরায় কেন্দ্রীয় পরিষদে যে প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন, অদ্য তাহা বিনা ডিভিসনে অগ্রাহ্য হয়।

কলম্বোর এক সরকারী ঘোষণায় বলা হইয়াছে যে, গতকল্য রাত্রে শত্রুপক্ষীয় বিমান সিংহলের উপকূলের সমীপবর্তী হয়। একটি বোমা পড়ে, কিন্তু কেহ হতাহত হয় নাই এবং ক্ষতির পরিমাণ নগণ্য।

ভারতের প্রথম মহিলা গ্র্যাজুয়েট শ্রীযুক্তা চন্দ্রমুখী বসু গত ২রা ফেব্রুয়ারী দেরাদুনে পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৮৩ বৎসর হইয়াছিল।

৯ই ফেব্রুয়ারী

গত ২৯শে জানুয়ারী বাখরগঞ্জ জেলার ভাণ্ডারিয়ার ৫ মাইল আন্দাজ দূরে কচা নদীতে ভয়ানক ঝড়ে "রুদ্র" নামক ৬০ টনের স্টীমারখানি জলমগ্ন হয়। তাহার ফলে ৪২ জন লোক মারা গিয়াছে। ঐ স্টীমারখানি হুলারহাট বাগেরহাটের মধ্যে যাতায়াত করিত। যে ৪২ জন লোক এই স্টীমার ডুবিতে প্রাণ হারাইয়াছে, তাহার মধ্যে ২৪ জন হইল স্টীমারের যাত্রী এবং অবশিষ্ট ১৮ জন স্টীমারের খালাসী। স্টীমারের ৪৬ জন যাত্রীকে এবং ১০ জন খালাসীকে উদ্ধার করা হইয়াছে।

প্রদেশগুলিতে ভারতরক্ষা বিধানবলী প্রয়োগ সম্পর্কে ভারত গভর্নমেণ্টের কার্যের নিন্দা করিবার উদ্দেশ্যে আনীত মিঃ এম এ কাজমীর মুলতুবী প্রস্তাবটি অদ্য কেন্দ্রীয় পরিষদে ৪৩-৪২ ভোটে গৃহীত হয়। কংগ্রেস, মুসলিম লীগ, জাতীয় দল ও ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট দলের সদস্যগণ একযোগে এই প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দেন।

বিগত ১৯৪০ সালে বাঙ্গলায় মোট যত পরিমাণ জমিতে পাট চাষ হইয়াছিল, বর্তমান বৎসরে তাহার অর্ধেক পরিমাণ জমিতে পাট চাষ করা যাইবে বলিয়া এবং কলিকাতার ইণ্ডিয়ান জাত মিডল পাটের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন মূল্য যথাক্রমে ১৭৲ ও ১৫৲ টাকা হইবে বলিয়া গভর্নমেণ্ট যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, অদ্য বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে বিরোধী পক্ষের সদস্যগণ এক মুলতুবী প্রস্তাবের সাহায্যে তাহার সমালোচনা করেন। আলোচনান্তে উক্ত মুলতুবী প্রস্তাবটি ৭২—১০৯ ভোটে অগ্রাহ্য হইয়া যায়।

১০ই ফেব্রুয়ারী

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে অর্থসচিব শ্রীযুত তুলসীচন্দ্র গোস্বামী সিলেক্ট কমিটি কর্তৃক সংশোধিত বঙ্গীয় কৃষি আয়কর বিলটি আলোচনার্থ উত্থাপন করেন। আলোচ্য বিলের দ্বারা বাঙলা দেশে এই প্রথম কৃষি জমি হইতে প্রাপ্ত কৃষি আয়ের উপর কর ধার্যের প্রস্তাব করা হইয়াছে। সাড়ে তিন হাজার টাকা পর্যন্ত কৃষি আয় যে সব ক্ষেত্রে সেই সব ক্ষেত্রে কৃষি আয়ের উপর কোন কর ধার্য হইবে না বলিয়া ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

এম ভট্টাচার্য এণ্ড কোম্পানী নামক বিশিষ্ট বাঙালী ঔষধালয়ের প্রতিষ্ঠাতা, কৃতী ব্যবসায়ী ও পরদুঃখকাতর দাতা শ্রীযুত মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য বারাণসীতে পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৮৬ বৎসর হইয়াছিল।

আরাকান রণাঙ্গনে জাপানীরা তউং বাজার ত্যাগ করে।

১১ই ফেব্রুয়ারী

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে এক বে-সরকারী প্রস্তাবে ধান, চাউল ও পাটের সর্বনিম্ন মূল্য নির্ধারণের দাবী উত্থাপিত হয়। বঙ্গীয় কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী দলের অন্যতম সদস্য শ্রীযুত অদ্বৈতকুমার মাঝি পরিষদে উক্ত প্রস্তাব উত্থাপন করেন। তিনি ঐ প্রস্তাবে এইরূপ অভিমত প্রকাশ করেন যে, বাঙলা গভর্নমেণ্ট যেন অবিলম্বে এই ব্যাপারে ব্যবস্থা অবলম্বন করেন এবং প্রয়োজন হইলে কেন্দ্রীয় গভর্নমেণ্টকে যথাযথ ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ করেন। আলোচনান্তে প্রস্তাবটি বিনা ডিভিসনে অগ্রাহ্য হইয়া যায়।

অস্ট্রেলিয়ান সৈন্যেরা নিউগিনির সৈদরের নিকটে আমেরিকান সৈন্যদের সহিত মিলিত হইয়াছে। ইয়াগোমিতে এ মিলন ঘটিয়াছে। ১৪ হাজার জাপ সৈন্য ধ্বংস হইয়াছে। রাবাউল ও ওয়েওয়াকে বিমান আক্রমণ চালান হইয়াছে।

ইতালীতে আনজিও অঞ্চলে উভয় পক্ষে ঘোরতর সংগ্রাম চলে। কাসিনো শহরের অভ্যন্তরে বাড়ি দখলের লড়াই চলিতেছে।

১২ই ফেব্রুয়ারী

আরাকান রণাঙ্গনে মায়ু পাহাড়ের পূর্বে ঘোরতর সংগ্রাম চলিতেছে। কয়েক দিনের চেষ্টার ফলে প্রচুর ক্ষতি স্বীকার করিয়া জাপানীরা মিত্রপক্ষীয় বাহিনীর পৃষ্ঠভাগে বামাংশের ব্যূহ ভেদ করিয়া গাকিয়েদক গিরিপথের পূর্বে পৌঁছিয়াছে। এই গিরিপথ দিয়া পাহাড় পার হইয়া বাওলি ও মংদয়ের সংযোগকারী প্রধান পথে পৌঁছান যায়। জাপানী সৈন্যদের এই স্থান হইতে তাড়াইবার জন্য প্রবল চেষ্টা চলিতেছে।

আরাকান রণাঙ্গনে নয় দিন যাবৎ ঘোরতর সংগ্রাম চলিতেছে এবং মিত্রপক্ষের সৈন্যেরা যুগপৎ বহু দিক হইতে আক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও হটিয়া যায় নাই। তাহারা বহু সৈন্য হতাহত করিয়াছে। ফোর্ট হোয়াইট ও টিড্ডিম এলাকায় মিত্রপক্ষের সৈন্যেরা আগাইয়া চলিয়াছে।

ভারত সরকারের নূতন অর্ডিন্যান্সের বিধান অনুযায়ী বাঙলা সরকার শীঘ্রই ভারতরক্ষা আইনের ২৬ ধারা অনুসারে আটক সিকিউরিটি বন্দীদের বিষয় পুনর্বিবেচনা করার জন্য একটি ট্রাইব্যুনাল গঠন করিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

মস্কো রেডিও ঘোষণা করিয়াছে যে, কসাক অশ্বারোহী বাহিনী কর্সুনেভে পরিবেষ্টিত জার্মান ডিভিসনগুলির বিনাশসাধন করিতেছে। একদল কসাক গত কয়েক দিনের মধ্যে শত শত জার্মানকে হত্যা ও প্রভূত সমরোপকরণ হস্তগত করিয়াছে।

১৩ই ফেব্রুয়ারী

মার্শাল স্ট্যালিন এক বিশেষ ঘোষণায় লালফৌজ কর্তৃক লুগা অধিকারের সংবাদ জানাইয়াছেন। লুগা শহরটি লেনিনগ্রাদের ৮০ মাইল দক্ষিণে ও লেনিনগ্রাদ-পককোভ ভিলনা ট্রাঙ্ক লাইন এবং নভোগরোদ হইতে আগত রেল লাইনের সংযোগস্থলে অবস্থিত।

বৃটেনের ভারতীয় সমিতিসমূহের ফেডারেশনের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত লণ্ডনে এক সভায় ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও স্বরাজ ভবনের ভূতপূর্ব সম্পাদক শ্রীযুত সুরেশ বৈদ্যের গ্রেপ্তার ও আটকের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়া একটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

১৪ই ফেব্রুয়ারী

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশনে স্পীকার দুইটি মুলতুবী প্রস্তাব বিধিবহির্ভূত বলিয়া অগ্রাহ্য করেন। তন্মধ্যে একটি হইতেছে কলিকাতার খাদ্য রেশনিং পরিকল্পনার বিধি ব্যবস্থা সম্পর্কে; ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি উহা উত্থাপনের বিজ্ঞপ্তি দিয়াছিলেন। অপরটি হইতেছে, বরিশাল জেলার একটি নদীতে 'রুদ্র' নামক স্টীমার ডুবি সম্পর্কে শ্রীযুত নরেন্দ্রনাথ দাস উহা উত্থাপনের নোটিশ দেন।

কেন্দ্রীয় পরিষদে দেশরক্ষা বিভাগের সেক্রেটারী মিঃ অগিলভী শ্রীযুত লালচাঁদ নবলরায়ের এক প্রশ্নের উত্তরে বলেন যে, ১৯৪৩ সালের ২০শে নবেম্বর হইতে ১৯৪৪ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত বৃটিশ ভারতের এলাকাধীন স্থানসমূহে মোট দশবার এবং ভারতের একটি দেশীয় রাজ্যে একবার বিমান হানা হইয়াছে। বিমানহানার ফলে বৃটিশ ভারতে মোট ৮৮৪ জন অসামরিক অধিবাসী হতাহত হইয়াছে এবং সকল ক্ষেত্রেই ধনসম্পত্তির ক্ষতি খুব সামান্যই হইয়াছে।

আরাকান রণাঙ্গনে ১২ই ফেব্রুয়ারী ফোর্ট হোয়াইট অঞ্চলে মিত্রপক্ষের কামানসমূহ গোলাবর্ষণ করিয়া কয়েক দল জাপ সৈন্যকে ছত্রভঙ্গ করে। আরাকানে যুদ্ধ চলিতেছে। যদিও জাপানীদের অবস্থার অবনতির লক্ষণ দেখা যাইতেছে, তথাপি মোটামুটি অবস্থা অপরিবর্তিত রহিয়াছে।

আমি তোমাদের পূজ্য

"......... ঈশ্বরের অংশ নিয়ে আমি আবির্ভূত হয়েছি, আমাকে দেবতা বলে জানবে।

"তোমরা হলে নিকৃষ্ট জীব — তোমরা শুধু একান্ত অনুগতভাবে আমার মন যুগিয়ে চলবে আর চোখ কান বুজে আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য প্রাণপাত করবে।"

এইরকম কথা অধিকাংশ জাপানীই বলে থাকে. এ কেবল তাদের মুখের কথা নয় সত্যই তারা মনে প্রাণে এটা বিশ্বাস করে। তার মানে একজন সাধারণ জাপসৈনিক পর্য্যন্ত এই ধারণা পোষণ করে যে ভগবান তাকে ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহাপুরুষের চেয়েও উঁচুস্তরের মানুষ করে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। কবি রবীন্দ্রনাথ ও ইকবাল কিম্বা বৈজ্ঞানিক সি. ভি. রমণ, এঁরা তার কাছে কোথায় লাগে! জাপানী সৈনিক, ব্যবসায়ী, দর্জ্জি, মুচি কিম্বা চাষী এরা সকলেই এই বিশ্বাস পোষণ করে!

এমনই একটা জাতকে নিয়ে কি করা যায় ভাবুন তো? দায়ীত্বজ্ঞানহীন, পাগলাটে ছাড়া আমরা ওদের আর কিছু মনে করতে পারি না। কিন্তু ওদের এই পাগলামির জন্য করুণা দেখাতে যাওয়াও বিপজ্জনক, কারণ কাণ্ডজ্ঞানবর্জ্জিত গোঁয়ার্তুমি ওদের মজ্জাগত করে রেখেছে। ওরা সত্যই ভয়ঙ্কর।

ভুল করবেন না

জাপানীরা সাধারণ শত্রু নয়। ওরা নৃশংস, হিংসাপ্রবণ, বিশ্বাসঘাতক এবং শয়তান। আন্তর্জ্জাতিক রীতি-নীতি বিধি-ব্যবস্থা তারা গ্রাহ্য করে না। যুদ্ধ-বন্দীদের প্রতি তারা অমানুষিক ব্যবহার করে — যা কি না জার্ম্মানরা পর্য্যন্ত কোনদিন করে না। এদের জব্দ করার একটি মাত্র উপায় আছে: জল, স্থল ও আকাশে লড়াই করে ওদের হারিয়ে দিয়ে ওদের সমস্ত শক্তি একেবারে নষ্ট করে ফেলা। ওদের একেবারে পঙ্গু করে দিতে হবে। বিনাসর্ত্তে আত্মসমর্পণ না করা পর্য্যন্ত ওদের আমরা ছাড়বো না — এই বর্ব্বর জাতটার হাত থেকে ভারতবর্ষকে মুক্ত রাখতে এছাড়া আর উপায় নেই।

ম্পাদকঃ শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন সহকারী সম্পাদকঃ শ্রীসাগরময় ঘোষ

১ বর্ষ] শনিবার, ৬ই ফাল্গুন, ১৩৫০ সাল। Saturday, 19th February, 1944 [১৫শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

ন-চাউলের দর

সম্প্রতি বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে ধান-উলের সর্বনিম্ন দর বাঁধিয়া দিবার জন্য কটি প্রস্তাব উপস্থিত করা হইয়াছিল। ই প্রস্তাবের আলোচনা প্রসঙ্গে কোন ান সদস্য এইকথা বলিয়াছিলেন যে, ধান উলের মূল্য অত্যধিক রকমে হ্রাস াইতেছে, এজন্য ঐগুলির সর্বনিম্ন দর াধিয়া দেওয়া প্রয়োজন। বাঙলার অসামরিক রবরাহ বিভাগের মন্ত্রী মিঃ সুরাবর্দী স্তাবের অন্তর্নিহিত নীতির যৌক্তিকতা ীকার করেন; তবে তিনি এই কথা বলেন য, ঐরূপভাবে সর্বনিম্ন মূল্য বাঁধিয়া দবার সময় এখনও আসে নাই। এই দেশে সাধারণভাবে ধান চাউলের মূল্য তটা নামা উচিত বলিয়া গভর্নমেণ্ট মনে রেন, বর্তমানে দর ততটা নামে নাই। তিনি াহেন যে, দর আরও কিছু নামুক। প্রকৃত-ক্ষে আমরা বাঙলার বিভিন্ন অঞ্চল হইতে যরূপ সংবাদ পাইতেছি, তাহাতে আমাদেরও বশ্বাস এইরূপ যে, ধান চাউলের মূল্য দুই কটি জেলায় কিছু নামিলেও অধিকাংশ থানেই এখনও তাহা সরকারী নির্ধারিত ূল্যেরও অনেক বেশী আছে। দুই একটি থানে সম্প্রতি যে মূল্য হ্রাস দেখা াইতেছে, তাহাতে চাষীদের স্বার্থহানি টিবার মত আতঙ্কের বিশেষ কোন কারণ টিয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি না। আমাদের মতে ঐ মূল্য হ্রাস সাময়িক। ফাল্গুনে চৈত্র মাস হইতে ধান চাউলের দর স্বভাবতই বৃদ্ধি পাইয়া থাকে; এ বৎসর উহা বৃদ্ধির আরও কারণ রহিয়াছে; আপাতত মালপত্রের গতিবিধির অন্তরায় ঘটার জন্য সাময়িকভাবে কোন কোন অঞ্চলে মূল্য হ্রাস পাইতে পারে। ঘাটতি অঞ্চলের অভাব পূরণের জন্য টান পড়িলে কিছুদিনের মধ্যেই দর আপনা হইতে বৃদ্ধি পাইবে। বস্তুত ধান চাউলের দর অত্যধিক হ্রাসের আশঙ্কার চেয়ে বৃদ্ধি পাইবার আশঙ্কাই এখনও রহিয়াছে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। বাঙলা দেশের অধিকাংশ অঞ্চলে এখন যে দর রহিয়াছে তাহা বেশই চড়া বলিতে হয়। দেশব্যাপী এত বড় একটা বিপর্যয় এবং তজ্জনিত অর্থসঙ্কটে বিপন্ন বাঙলার অধিকাংশ লোকের পক্ষেই সে দর দিয়া খাদ্যশস্য সংগ্রহ করা এখনও কঠিন রহিয়াছে। সঙ্কটকাল সম্মুখে আরও রহিয়াছে; এরূপক্ষেত্রে খাদ্যশস্য নিয়ন্ত্রণ এবং বণ্টন সম্পর্কে সরকারের বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। তাহাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, দেশের দুর্গতি এখনও কাটিয়া যায় নাই।

ব্যাধি ও শুশ্রূষা

বাঙলার খাদ্যাভাবের সমস্যা সাধারণভাবে কতকটা হ্রাস পাইয়াছে ইহা সত্য; কিন্তু খাদ্যাভাব বা দুর্ভিক্ষজনিত ব্যাধি পীড়ার সমস্যা এখনও জটিল আকারেই বিদ্যমান আছে। কয়েক সপ্তাহ হইল কলেরার প্রকোপ মফঃস্বলের বিভিন্ন অঞ্চলে হ্রাস পাইয়াছে বলিয়া আমরা খবর পাইতেছি; কিন্তু ম্যালেরিয়ার প্রকোপ সমানভাবেই আছে। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত প্রফুল্লরঞ্জন দাশ মহাশয় এ সম্বন্ধে একটি বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন। তিনি বলেন, কিছু দিন ছাত্রদের একটি প্রতিনিধিদল নদীয়া জেলার বিভিন্ন অঞ্চল পরিদর্শন করিয়াছেন। তাঁহারা দেখিয়াছেন যে, ঐ জেলার অধিকাংশ গ্রামের শতকরা ৯০ জন লোক ম্যালেরিয়া জ্বরে পীড়িত; ইহাদের অর্ধেক শয্যাশায়ী অবস্থায় কাল কাটাইতেছে। বর্তমানে বাঙলা দেশের অর্ধেক লোকই কোন না কোন ব্যাধিতে পীড়িত রহিয়াছে বলা চলে। এক্ষেত্রে দাশ মহাশয় নদীয়া জেলার কথাই বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছেন; কিন্তু আমাদের মনে হয়, ঢাকা, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর এবং রংপুরের নীলফামারী মহকুমার অবস্থাও অত্যন্তই গুরুতর। কিছু দিন হইল, সরকারী ব্যবস্থা মতে চিকিৎসার ক্ষেত্রে কুইনাইনের অভাব মিটাইবার জন্য চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে; কিন্তু প্রয়োজনের অনুপাতে তাহা মোটেই যথেষ্ট নয় এবং সাধারণের পক্ষে তাহা সর্বত্র সংগ্রহ করাও

সহজ হইতেছে না। এ সমস্যার সমাধান করা খুব সহজ নয়; বাঙলা দেশের ম্যালেরিয়াপীড়িতের স্বাভাবিক হারও কম নয় এবং বর্তমান বৎসরে সে হার প্রায় দশগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। অবিলম্বে এই অবস্থার প্রতীকারের জন্য ব্যবস্থা অবলম্বিত না হইলে দুর্ভিক্ষজনিত সমস্যা সমাধানে সরকারী আমন শস্য সংগ্রহ প্রভৃতি যত নীতি আছে, কোনটিই ভবিষ্যতের বিপর্যয়জনিত আতঙ্ক প্রতিহত করিতে সমর্থ হইবে বলিয়া আমাদের মনে হয় না। এ সমস্যার প্রতিকার করিতে হইলে সামরিক ক্ষিপ্রতা এবং তৎপরতা অবলম্বন করা প্রয়োজন; কারণ যুদ্ধের সমস্যার চেয়ে এ সমস্যা কম গুরুতর নয়। এজন্য গ্রামে গ্রামে শুশ্রূষা-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত করা দরকার; কিন্তু তেমন কতকগুলি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করিলেই কর্তব্য শেষ হইবে না; সেগুলি পরিচালনা করিবার জন্য উপযুক্ত চিকিৎসক এবং সততাসম্পন্ন কর্মচারী ও সেবাব্রতী কর্মীদের প্রয়োজন। বাঙলার মন্ত্রী শ্রীযুত পুলিনবিহারী মল্লিক পল্লীর এইসব দুঃস্থদের সেবার দিকে চিকিৎসকদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়া সম্প্রতি একটি বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। আমরা সংবাদপত্রে তাঁহার বক্তৃতার রিপোর্ট দেখিতে পাইলাম। এ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, বাঙলা দেশে সেবাব্রতী কর্মীর অভাব নাই; কিন্তু আমলাতান্ত্রিক আবহাওয়ার মধ্যে তাঁহাদের পক্ষে কাজ করা কঠিন। এই দিক হইতে বঙ্গীয় মেডিক্যাল কো-অর্ডিনেশন কমিটি সম্প্রতি যে উদ্যমে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাহা সমধিক আশাপ্রদ; কিন্তু বিভিন্ন সেবাসমিতিগুলিকে সংহত করিয়া দুর্গতের রক্ষা কার্য সার্থক করিতে হইলে সরকারী সহযোগিতারও প্রয়োজন এবং পরাধীন এদেশের সমস্যা এইখানেই। যাঁহারা এই শ্রেণীর সেবাব্রতী কর্মী, তাঁহারা অনেকেই স্বদেশপ্রেমিক এবং সেই দিক হইতে রাজনীতিকবোধ সম্পন্ন। দেশের বর্তমান এই সংকটে তাঁহারা প্রয়োজন হইলে দলগত রাজনীতি দূরে রাখিয়াও দেশের সেবাকার্যের জন্য আত্মনিয়োগ করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না, ইহা আমরা বিশেষভাবেই জানি; কিন্তু সরকার ইঁহাদের সম্বন্ধে নিজেদের মনকে রাজনীতিক বদ্ধসংস্কার হইতে মুক্ত করিতে পারিবেন কি এবং উদারতার দৃষ্টি অবলম্বন করিয়া ইঁহাদের সহযোগিতা লাভ করিতে অগ্রসর হইবেন কি? বাঙলার যেসব স্বদেশসেবক কর্মী কারাগারে অবরুদ্ধ আছেন, তাঁহাদিগকে মুক্তিদান করিয়া সরকার যদি এ কাজে অগ্রসর হন, যে তাঁহাদের কর্মপ্রণালীর বাস্তব প্রয়োগের ক্ষেত্রে সততা সুনিশ্চিত হইতে পারে এবং জনসাধারণের প্রতি হৃদ্যতা ও সহানুভূতির পথে বর্তমানের এই ব্যাপক সমস্যার সমাধানও সহজ হয়। আমরা দেখিলাম, আলীপুরে প্রেসিডেন্সী জেলের ৩০ জন বিনা বিচারে আটক রাজনীতিক বন্দী মুক্তিলাভ করিলে দেশের সেবাকার্যে সরকারের সহযোগিতা করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন; কিন্তু বাঙলার প্রধান মন্ত্রী তাঁহাদিগকে সেক্ষেত্রেও মুক্তি দিতে অসামর্থ্য জ্ঞাপন করিয়াছেন। প্রধান মন্ত্রীর এক্ষেত্রে ক্ষমতা কতটা সীমাবদ্ধ আমরা তাহা বুঝি; তথাপি এ অবস্থা আমাদের মনে নৈরাশ্যেরই সঞ্চার করিয়াছে।

রেশনিং ব্যবস্থা

কলিকাতা শহরে রেশনিং ব্যবস্থা ভালভাবেই চলিতেছে বলা যায়। চাউলের সম্বন্ধে অভিযোগই এখন প্রধান রহিয়াছে; আমরা আশা করি, অবস্থা গোছাইয়া লইবার সঙ্গে সঙ্গে কর্তৃপক্ষ কলিকাতাতেও এ সম্বন্ধে বোম্বাইয়ের অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন। বোম্বাইতে তিন রকম চাউল বরাদ্দ প্রথানুযায়ী সরবরাহ করা হইয়া থাকে; মূল্যের কিছু তারতম্য আছে; ক্রেতারা মূল্য দিয়া নিজেদের পছন্দমত চাউল লইতে পারে। বোম্বাইতে যদি এরূপ ব্যবস্থা প্রবর্তন করা সম্ভব হইতে পারে, তবে খাস ভারত সরকারের কর্তৃত্বাধীনে কলিকাতাতেও সে ব্যবস্থা কেন প্রবর্তন করা সম্ভব হইবে না, আমরা বুঝি না। যে অঞ্চলের জন্য রেশনিং ব্যবস্থা বরাদ্দ খাদ্যশস্য যাহাতে সে অঞ্চলের উপযোগী হয়, সরবরাহ ব্যাপারে প্রথমে সেই দিকে দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। আমরা দেখিলাম, সেদিন কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে বাঙলার রেশনিংয়ের জন্য সরবরাহ করা এই চাউলের সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করা হইয়াছিল। প্রসঙ্গক্রমে ভারত গভর্নমেণ্টের খাদ্য সচিব স্যার জওলাপ্রসাদ বলেন, লাল চাউল অখাদ্য নহে, তবে ঢাকাবাসীরা তাহা খাইতে অভ্যস্ত নয়। এক্ষেত্রে প্রশ্ন দাঁড়ায় এই যে, ঢাকায় চাউল সরবরাহ করিবার পূর্বে ঢাকাবাসী যে চাউল খাইতে অভ্যস্ত তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন ছিল; কলিকাতার সম্বন্ধেও ঐ একই কথা প্রযোজ্য। ইহা ছাড়া, চাউল দোকানে পাঠাইবার পূর্বে তাহা স্বাস্থ্যকর কিনা, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত। ভেজাল খাদ্য বিক্রয় করা দণ্ডনীয় অপরাধ বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে; এ ক্ষেত্রে সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীন রেশনিং ব্যবস্থায় যাহাতে লোকের কাছে ভেজাল চাউল গিয়া না পেঁছে, সেজন্য বিশেষ দৃষ্টি রাখা প্রথমে প্রয়োজন। সরকারী ব্যবস্থায় তেমন ত্রুটি থাকিয়া গেলে চোরাবাজার বন্ধ করিবার চেষ্টা ব্যর্থ হইবে এবং সেজন্য কোন যুক্তিও থাকিবে না। শুধু চাউল নহে—ডাউল এবং আটা ময়দার সম্বন্ধেও আমরা এই শ্রেণীর অভিযোগ পাইতেছি। সম্প্রতি চট্টগ্রাম, ফরিদপুর কয়েকটি স্থানে রেশনিং ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়াছে এবং ক্রমে উহা সম্প্রসারিত করা হইতেছে। ঐসব স্থান হইতেও আমরা বরাদ্দ দ্রব্যের নিকৃষ্টতার কথাই শুনিতেছি। আমরা আশা করি, কর্তৃপক্ষ এই অভিযোগের প্রতীকারে তৎপর হইবেন। শহরে কিছুদিন হইল কয়লার সমস্যা, পুনরায় যেরূপ গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছে, মফঃস্বলে কেরোসিন তেল এবং কোন কোন স্থানে লবণের সমস্যাও সেইরূপ গুরুতর হইয়া উঠিতেছে। মফঃস্বলে কয়েকটি জায়গায় ইতিমধ্যেই কেরোসিন তেল বরাদ্দ ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে; আমরা আশা করি, অন্যান্য স্থানেও জনসাধারণের এই অভাব মোচনের জন্য কর্তৃপক্ষ সমধিক তৎপরতাপূর্ণ ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন।

কাঁথির দুর্দশা

মেদিনীপুরের উপর দিয়া ক্রমাগত দুর্দৈবের ঝড় বহিয়া চলিয়াছে। তন্মধ্যে কাঁথি মহকুমার অবস্থা বিশেষভাবে শোচনীয়। বাঙলা দেশের অন্যান্য অঞ্চলে আমন ধান উৎপন্ন হওয়ায় লোকের দুঃখকষ্ট কিছু লাঘব হইয়াছে; কিন্তু কাঁথির সংকট সমধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই মহকুমায় যথেষ্ট ধান্য উৎপন্ন হয় এবং এ অঞ্চল বাড়তি অঞ্চল অর্থাৎ এ অঞ্চলে যত ধান্য উৎপন্ন হয়, তাহাতে লোকের অভাব মিটিয়াও প্রচুর ধান্য বাহিরে রপ্তানী করা চলে। অনেক বড় বড় চাষীরই গোলা ভরা ধান থাকে; কিন্তু এ বৎসর কাঁথি মহকুমার ৮২টি ইউনিয়নের মধ্যে ৪০টি ইউনিয়নে সম্পূর্ণ অজন্মা গিয়াছে। বৃষ্টির অভাবে ধান মোটেই হয় নাই। এই সংকটে পতিত হইয়া স্থানীয় অধিবাসিগণ সরকারের শরণাপন্ন হইয়াছেন। তাঁহারা এই প্রার্থনা করিয়াছেন যে, (১) আপাতত তাঁহাদিগকে বাকী খাজনা আদায় হইতে রেহাই দেওয়া হউক, (২) আগামী হৈমন্তিক ধানের ফসল না উঠা পর্যন্ত খাজনা আদায় স্থগিত রাখা হউক; (৩) বাহির হইতে মহকুমার অভাব মিটাইবার উপযুক্ত খাদ্যশস্য আমদানী করা হউক, (৪) অভাবগ্রস্ত অঞ্চল হইতে খাদ্যশস্য রপ্তানি বন্ধ করা হউক। আমরা

আশা করি কাঁথির দুর্গত জনসাধারণের এই আবেদনের প্রতি বাঙলা সরকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবে এবং তাঁহারা এ সম্বন্ধে সুবিবেচনা করিবেন।

মহেশ ভট্টাচার্য

কৃতী বাঙালী ব্যবসায়ী ও পরদুঃখকাতর দাতা মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয় ৮৬ বৎসর বয়সে বারাণসী ধামে পরলোকগমন করিয়াছেন। হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবসায়ী-স্বরূপে তিনি বাঙলায় সর্বজনপরিচিত; কিন্তু শুধু ব্যবসায়ী বলিয়াই তিনি গৌরব অর্জন করেন নাই, এমন অনাড়ম্বর নিরভিমানী পরার্থব্রতী পুরুষ সত্যই বাঙলা দেশে বিরল। দরিদ্র অবস্থা হইতে তিনি নিজের সাধনার বলে জীবনে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন; প্রভূত বিত্তের অধিকারী হইয়াও সে কথা তিনি বিস্মৃত হন নাই। নিতান্ত সাদাসিধা সাধারণ ভদ্রলোকের মত তিনি জীবনযাপন করিতেন; পরোপকারই তাঁহার জীবনের প্রধান ব্রত ছিল। নাম এবং যশকে তিনি অনেকটা অস্বাভাবিক-ভাবেই উপেক্ষা করিয়া চলিতেন; এজন্য তাঁহার দানের পরিমাণ অনেকেই জানেন না। কুমিল্লার মহেশ-অঙ্গন, রামমালা ছাত্রাবাস, লাইব্রেরী, বিশ্বনাথ পাঠশালা প্রভৃতি তাঁহার কীর্তি স্থায়ী রাখিবে। বারাণসী ধামে তিনি হর-সুন্দরী ধর্মশালা প্রতিষ্ঠা করিয়া দরিদ্র যাত্রীদের অভাব মোচন করিয়া গিয়াছেন। মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্ব পর্যন্ত তিনি স্থায়ীভাবে বিন্ধ্যাচলে বাস করিতেন; এখানে তাঁহার নাম সকলেরই সুপরিচিত; বিন্ধ্যাচলের অনেক সংস্কারমূলক কার্যই তাঁহার অর্থে সংসাধিত হইয়াছে। এখানে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত একটি বিদ্যালয়, শিব-মন্দির এবং চিকিৎসালয় আছে। সততা এবং অধ্যবসায় তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র ছিল; সকল দিক হইতেই তিনি একজন অনন্যসাধারণ পুরুষ ছিলেন। তাঁহার নিরভিমান, অনাড়ম্বর এবং অনপেক্ষ জীবনের একটা স্বাতন্ত্র্য-গরিমা সকলকেই মুগ্ধ করিত। তিনি দরিদ্র দেশের যে উপকার করিয়া গিয়াছেন, তাহা সহজে বিস্মৃত হইবার নহে। আমরা তাঁহার পরলোকগত আত্মার উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি এবং তাঁহার শোকসন্তপ্ত আত্মীয়স্বজনগণকে আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

পুনশ্চ

দিল্লী শহরে পুনরায় একটি সর্বদল সম্মেলনের অধিবেশন হইতেছে। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য এই সম্মেলনে উদ্যোক্তার স্থান গ্রহণ করিয়াছেন। অশীতিপর বৃদ্ধ পণ্ডিতজী রোগশয্যা হইতে উঠিয়া দেশের রাজনীতিক অচল অবস্থার সমাধান করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছেন। স্বদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে পণ্ডিতজীর সুদীর্ঘ প্রচেষ্টার ইতিহাস যাঁহারা জানেন, তাঁহারা তাঁহার এই ব্যগ্রতার জন্য বিস্ময় বোধ করিবেন না। পণ্ডিতজীর পরিকল্পনা অনুযায়ী আগামী মার্চ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে এই সম্মেলনের অধিবেশন হইবে এবং ভারতের বিভিন্ন পঞ্চাশজন নেতা এই সম্মেলনে যোগদান করিয়া ইতিকর্তব্যতা নির্ধারণ করিবেন। পণ্ডিত মদনমোহন অনলস কর্মী পুরুষ; দেশের বর্তমান অবস্থার দিকে তাকাইয়া তিনি নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারিতেছেন না; কিন্তু তাঁহার এই উদ্যম কতটা সাফল্যলাভ করিবে, এ বিষয়ে আমাদের সম্পূর্ণই সন্দেহ আছে। বন্দীভূত কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের মুক্তিবিধান করিয়া ভারতের বর্তমান রাজনীতিক অচল অবস্থার যাহাতে সমাধান হয়, এজন্য অনেক চেষ্টাই হইয়াছে; কিন্তু কাহারও কোন চেষ্টাই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী-মন টলাইতে পারে নাই। স্যার তেজ-বাহাদুর সপ্রু যে চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হইয়াছেন, জয়াকরের যে চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে, মাননীয় শ্রীনিবাস শাস্ত্রী মহাশয়ের বিজ্ঞতা যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের কাছে হার মানিয়াছে, সেক্ষেত্রে পণ্ডিত মদন-মোহন মালব্যের চেষ্টা সার্থক হইবে কি—বিশেষত তিনি যে কংগ্রেসের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন বলিয়াই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের নিকট সমধিক পরিচিত!

কংগ্রেসের প্রথম প্রেসিডেন্ট

কংগ্রেসের ইতিহাস ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস; ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সুদীর্ঘ সংগ্রাম পরিচালনা করিয়া কংগ্রেস বর্তমানে আপনার অপ্রতিদ্বন্দ্বী মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; আজ কূট-নীতি চক্রে কংগ্রেসের সে মহিমাকে ক্ষুণ্ণ করিবার উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীর দল নানা চেষ্টা চালাইতেছেন; কিন্তু তাহাতে প্রকৃতপক্ষে জগতের দৃষ্টিতে কংগ্রেসের গৌরবই বৃদ্ধি পাইতেছে; কংগ্রেসের বাণী রুদ্ধ করিবার জন্য তাঁহারা যত নীতি প্রয়োগ করিতেছেন, তদ্দ্বারা কংগ্রেসের বাণীই বাহিরে বিঘোষিত হইতেছে। স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ভারতের এই সর্বপ্রধান জাতীয় প্রতিষ্ঠানের প্রথম সভাপতির পদে বৃত হন। সম্প্রতি কলিকাতায় তাঁহার জন্ম-শতবার্ষিকী সমারোহের সহিত উদ্যাপিত হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে উমেশচন্দ্রকে কংগ্রেসের জন্মদাতা পিতা বলা যাইতে পারে। বাঙলা দেশে নব জাতীয়তাবাদের আগুন যাঁহারা উদ্দীপ্ত করিয়াছিলেন, স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ছিলেন, তাঁহাদের অন্যতম অগ্রণী। উমেশচন্দ্র ব্যারিস্টার ছিলেন; পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন এবং পাশ্চাত্য রীতিনীতিতেই তিনি অভ্যস্ত ছিলেন; কিন্তু তাঁহার অন্তরে তীব্র জাতীয়তাবাদের আগুন জ্বলিত এবং সেদিক দিয়া তিনি খাঁটি স্বদেশীভাবে অনুপ্রাণিত ছিলেন। স্বর্গীয় লালমোহন ঘোষ প্রভৃতি তৎকালীন স্বদেশ প্রেমিক বঙ্গ সন্তানদের সঙ্গে যোগ দিয়া ইলবার্ট বিলের বিরুদ্ধে তিনি তীব্র আন্দোলন পরিচালনা করেন। ভারতের জাতীয়তাবাদের ইতিহাসে সে আন্দোলন স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। উমেশ-চন্দ্র শেষ-জীবনে ইংলণ্ডে প্রবাসী ছিলেন; কিন্তু ভারতবর্ষের জন্য সাধনা সেখানেও তাঁহার মুখ্য ব্রত ছিল; স্বর্গীয় দাদাভাই নৌরজীর সঙ্গে যোগ দিয়া তিনি ভারতের জাতীয় মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য সর্ববিধ চেষ্টা করিয়াছেন। এই উপলক্ষে আমরা বঙ্গ-জননীর এই মনীষী সন্তানের প্রতি আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি।

বন্দীমুক্তির প্রশ্ন

বাঙলার সিকিউরিটি বন্দী অর্থাৎ ভারতরক্ষা বিধান অনুসারে বিনা বিচারে আটক বন্দীদের সম্বন্ধে বিবেচনার জন্য সংশোধিত নূতন অর্ডিন্যান্স অনুসারে ট্রাইবিউনাল গঠিত হইতেছে। এ সম্বন্ধে আমাদের অভিমত আমরা পূর্বেই প্রকাশ করিয়াছি; বস্তুত ইহার সুফল সম্বন্ধে আমরা একটুও আশাশীল নহি; সম্প্রতি ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে বন্দীমুক্তির প্রশ্ন সম্পর্কে ভারত গভর্নমেণ্টের স্বরাষ্ট্র-সচিবের যেরূপ মতিগতির পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে এ সম্বন্ধে কিছুমাত্র সংশয়ের অবকাশ নাই যে, সরকার বন্দী-মুক্তি সম্পর্কিত প্রশ্নে জনমতকে কোনরূপ মূল্য দান করিতে প্রস্তুত নহেন। স্বরাষ্ট্রসচিব ম্যাক্সওয়েল সাহেব ভারতের রাজনীতিক অচল অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে—ইহা স্বীকার করেন না। ভারতবর্ষের প্রতি ইংরেজ জাতির প্রীতির ভাব সম্প্রতি অতি মাত্রায় বৃদ্ধি পাইতেছে, স্বরাষ্ট্র সচিবের উক্তিতে আমরা ইহা শুনিতে পাইয়াছি; কিন্তু সে সদ্ভাবের আন্তরিকতা ভারতের স্বরাষ্ট্র সচিবকে বিন্দুমাত্রও স্পর্শ করে নাই।

তিলাঞ্জলি

সুবোধ ঘোষ

(১৫)

বোম্বা অনশন আর একশো অর্ডি-ন্যান্সের শাসন—পাঁচ হাজার বছরের সভ্য মানবতার আধার ভারতের সত্যাগ্রহী সত্তা অপমানের আঘাতে রক্তাক্লিষ্ট হয়ে উঠেছে। যেন মৃত্যুর হিক্কা উঠছে চারদিকে। শুনলে ভয় পেতে হয়, দেখলে শেষ ভরসার নিশ্বাসটুকু বন্ধ হয়ে আসে, ভাবলে ভাবনা ফুরিয়ে যায়। ভারতের অক্ষয় বটের শিকড়ে যেন আগুন লাগলো এতদিনে। রাজ্যলিপ্সার এই কালদাহে পৃথিবীর স্নিগ্ধতম ছায়াটি যেন পুড়ে অঙ্গার হয়ে যাবে।

শুধু অবনী নয়, অবনীর মত লক্ষ লক্ষ ভারতবাসীর মনে মাঝে মাঝে এই দুর্দৈবের শোক সকল আশাবাদের শেষ চিহ্নটুকু মুছে ফেলে দেয়।

এই শ্মশানসন্ধ্যার অবসাদের বাতাসে পরমাণুর সংগীতের মত তবু যেন একটি অশোক মন্ত্র সকল হতাশা ছাপিয়ে জেগে ওঠে। বিংশ শতাব্দীর উদভ্রান্ত মনুষ্যত্বকে প্রেমে মৈত্রীতে শান্তিতে ও সুস্থশৈশ্বর্যে সুন্দর করার আয়োজনে নূতন সংঘারামের প্রার্থনার মত ভারতের কংগ্রেসের বাণী।

শুধু অবনী নয়, অবনীর মত লক্ষ লক্ষ নিষ্প্রভ আত্মা সে-বাণীর ছোঁয়ায় বিজয়বন্ত মশালের মত দ্যুতিমান হয়ে ওঠে।

তারা ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে। পথের দিশা দেখায় তারা। তারা কানে কানে মন্ত্র পড়ে যায়। অন্ন চাই, বস্ত্র চাই, মনুষ্যত্ব চাই—চাই স্বাধীনতা। মৃত্যুর বিভীষিকা থেকে উদ্ধার চাই। অন্যায়ের প্রতিরোধ চাই, জুলুমের প্রতিকার চাই। নির্ভীক হও, প্রতিজ্ঞা কর, দাবী কর, লড়তে শেখ। নিরন্নদের আড্ডায় প্রতি সন্ধ্যায় দৈবীমূর্তির মত কারা যেন আসে, একেবারে আপন হয়ে গা-ঘেঁসে বসে। ক্ষণিকের জন্য এক দুর্মদ জীবনের নেশা তাদের শীর্ণ পরমায়ুর বৃন্তে ঝড়ের মাতন জাগিয়ে চলে যায়। নিরন্নেরা বলে—যখন ডাক দিবেন, তখনই আমরা তৈরী আছি বাবু। আর কিসের ডর? চালচোরদিগের ভাঁড়ারগুলি একবার দেখিয়ে দেবেন।

আর একজন উৎসাহে সমর্থন জানায়—একেবারে ঘিরে লিয়ে পড়ে থাকবো।

তৃতীয় আর একজন বলে—এখানে মিছা মরতে পড়ে আছি, না হয় ওখানেই মরবো। যা আছে অদেষ্টে!

একটি বৃদ্ধ আশীর্বাণী উচ্চারণ করে। —বেঁচে থাক কংগ্রেস। এই ধাক্কাটা একবার সামলে উঠি বাবু, বাকী যেকটা দিন বাঁচি কংগ্রেসের কথা মেনে চলবো। বেঁচে থাক কংগ্রেস।

লঙ্গরখানায় অন্নার্থীদের পংক্তিতে বসে খিচুড়ি খেতে খেতে কয়েকটি গ্রাম্য গৃহস্থ যুবক করুণভাবে পরিবেষক ছেলেদের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। কর্মী ছেলেরা কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করে।—কি? আর চাই?

একটি গৃহস্থ যুবক ম্লানভাবে হেসে জবাব দেয়।—আমাদের অদৃষ্টের কথা ভাবছিলাম বাবু মশাই। একদিন কত স্বদেশী বাবুদের নিজে হাতে পাত পেড়ে মাছ ভাত খাইয়েছি বাবু। আর আজ দেখুন, ভিখিরী হয়ে পাত পেতে বসেছি।

কর্মী ছেলেরা বলে।—কে বললে আপনারা ভিখিরী? আমাদের শহরে দুদিনের জন্য অতিথি হয়েছেন আপনারা। গাঁয়ে ফিরে যান, বাঁচতে চেষ্টা করুন। কংগ্রেসের অনুরোধ মনে রাখবেন।

পার্কে বসে একটি ছাত্রদের জটলা রাজনীতি নিয়ে তর্ক করে। এক অপরিচিত ভদ্রলোক এসে সবিনয়ে বলে।—একটা কথা ছিল।

সন্দিগ্ধ ছাত্রেরা বলে।—বলুন।

ভদ্রলোক,—আপনারা ফাসিস্তবাদকে ঘৃণা করেন নিশ্চয়?

ছাত্রেরা।—নিশ্চয়।

ভদ্রলোক।—পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ফাসিস্ত-বিরোধী প্রতিষ্ঠান ভারতের কংগ্রেসের কথা কি আপনারা ভুলে গেলেন?

ছাত্রেরা আগন্তুক ভদ্রলোকের কথায় কৌতূহলী হয়ে উঠছিল। ভদ্রলোকের গলার স্বরটা যেন হঠাৎ আবেগে গভীর হয়ে উঠলো। —আজ নয়, সাত বছর আগের ইতিহাসটা একবার স্মরণ করুন। ফাসিস্তির আক্রমণে স্পেনের জনতন্ত্রের সেই দুঃখময় মুহূর্তের কথা মনে করুন। বার্সিলোনার পথে চল্লিশ কোটি ভারতবাসীর সেবার নৈবেদ্য নিয়ে কংগ্রেসের অ্যাম্বুলেন্স গাড়ি ছুটে চলেছে। পথের দুপাশে স্পেনের নরনারী ভারতের জাতীয় পতাকাকে নমস্কার জানাচ্ছে। পুষ্পবৃষ্টি করছে। মনে করুন মুক্তিকাম চীনের উত্তর চুংকিংয়ের প্রতি গিরিবর্ত্মে অষ্টম রুট আর্মির দেশ-ভক্ত সন্তানেরা শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করছে। তাদেরই পাশে দাঁড়িয়ে কাজ করছে ভারতের কংগ্রেসের মেডিক্যাল মিশন। আমাদের কংগ্রেস পৃথিবীর প্রত্যেক পীড়িতের সান্ত্বনা, আমাদের কংগ্রেস পৃথিবীর প্রত্যেক মুক্তিযোদ্ধার সুহৃদ।

ভদ্রলোক একটু চুপ করে নিয়ে আবার বলতে আরম্ভ করলেন।—তবু আমাদের কংগ্রেসকে অপমান করার জন্য চারদিকে একটা ষড়যন্ত্র চলেছে ভাই। তাই আপনা-

দের কাছে অনুরোধ, কংগ্রেসের মর্যাদা রাখবেন আপনারা। কংগ্রেসকে ভুলবেন না, ভুল বুঝবেন না। আপনারা মহৎ হলে কংগ্রেস মহৎ হবে। কংগ্রেস মহৎ হলে আপনারা মহৎ হবেন। আপনারাই কংগ্রেস। কংগ্রেস কোন পার্টি নয়, দল নয়, আশ্রম নয়। কংগ্রেস মানুষের ইতিহাসের ইঙ্গিত পথ ও পরিণাম।

কথা শেষ করে ভদ্রলোক চলে যান। ছাত্রেরা কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকে। চটুল তর্কের নেশা বিস্বাদ মনে হয়। নতুন একটি গর্ব গৌরব ও বিশ্বাসের বাণী তাদের মন জুড়ে সুরে সুরে সরব হয়ে উঠতে থাকে।

অধ্যাপকদের ক্লাবে যুদ্ধতত্ত্বের অর্থভেদ করতে বিতন্ডার ঝড় ওঠে। গণতন্ত্রের যুদ্ধ না সাম্যের যুদ্ধ? কে বেশী ভয়ংকর? সাম্রাজ্যবাদ না ফাসিস্তবাদ? সাম্রাজ্যবাদীরা ফাসিস্ত হতে চায়, না ফাসিস্তরা সাম্রাজ্যবাদী হতে চায়?

নিতান্ত অপরিচিত ও অনাহূত একটি অতিথিবেশী মূর্তি সকলকে বিস্মিত করে উত্তর দেয়—এই দুটিই সত্য, দুই-ই সমান। এই যুদ্ধের সকল অনর্থের মূলে ঐ পুরাতন ও নতুন লিপ্সার দ্বন্দ্ব।

প্রশ্ন ওঠে এই যুদ্ধের বীভৎস ভ্রূকুটির সম্মুখে দাঁড়িয়ে কোন্ দেশ মানুষের সত্যকে বাঁচিয়ে রাখতে প্রাণপণ করেছে? সত্যি করে আদর্শের জন্য লড়ছে কে? কাদের শৌর্যে ও ত্যাগে অস্ত্রসর্বস্বতার দম্ভ খর্ব হতে চলেছে? রুশ? চীন? আর কে?

অনাহূত অতিথি করযোড়ে আবেদন করেন—আর আমাদের ভারতের কংগ্রেস। সারা পৃথিবীর বিবেকের প্রতীকের মত আমাদের কংগ্রেস। সর্বমানবের সুখ শান্তি ও মুক্তির একমাত্র নিষ্কলুষ আদর্শের প্রতিশ্রুতি নিয়ে কত দুঃখের পরীক্ষায় কত মহৎ হয়ে উঠেছে আমাদের কংগ্রেস! কংগ্রেসকে ভুলবেন না আপনারা।

বিয়ে বাড়িতে মেয়েদের আসরে কথায় কথায় রাজনীতি এসে পড়ে। কোন সুবেশিনী খদ্দরের নিন্দে করেন। কোন অতিশিক্ষিতা আন্তরিকভাবেই জাতীয়তা জিনিসটা বরদাস্ত করতে পারেন না—জাতীয়তাবাদ একটা সংকীর্ণ মনোভাব। একটা গোঁড়ামি। এর থেকেই শেষে ফাসিস্তবাদ পেয়ে বসে।

খদ্দরপরা একটি মেয়ে শান্তভাবে জবাব দেয়।—ঠিক কথা। কিন্তু এর পর আর একটু আপনার ভেবে দেখা উচিত। পরাধীনের জাতীয়তা আর স্বাধীনের জাতীয়তা কি গুণেধর্মে একই ব্যাপার হলো? পরাধীনের জাতীয়তা শত গোঁড়ামি সত্ত্বেও একটা ঐতিহাসিক কল্যাণের দিকে এগিয়ে যায়। স্বাধীন শক্তিমানের জাতীয়তার গোঁড়ামিকেই শুধু আশংকা—সেইখানেই ফাসিস্তবাদের হাওয়া।

সকলে মিলে সাগ্রহে মেয়েটিকে প্রশ্ন করতে থাকে—আপনার নাম? কি করেন আপনি? কোথায় থাকেন?

মেয়েটি হেসে জবাব দেয়—আমি কংগ্রেসের কাজ করি। আজ উঠি, আবার দেখা হবে। আপনাদের কাছে অনুরোধ, কংগ্রেসকে ভুলবেন না কখনো। বিশ্বের সভ্যতায় আধুনিক ভারতের সব চেয়ে গৌরবের দান আমাদের কংগ্রেস। এই সত্য আমি দু'চোখে দেখতে পাই, আমি তাই বিশ্বাস করি। সেই আনন্দে সবার কাছে কংগ্রেসের কথা বলি। যতটুকু সাধ্য তাই করি।

সারা ভারতের অদৃষ্টের আকাশে প্রতিদিন নিয়মিত সূর্য উঠে ডুবে যায়। পরাধীন জীবনের অভিশাপ প্রতিদিনের দাহনে বীভৎসতর হতে থাকে। লক্ষ নিরুপায় নরনারী ও শিশুর পরিত্রাহি আর্তনাদে সম্মুখে অন্ন বস্ত্র ওষধি নির্মম অবজ্ঞায় দূরে সরে যেতে থাকে। সরকারকে খাজনা দিতে কোন ভুল করেনি তারা। তবু তারা রইল না। মারী আর মৃত্যু পালা করে তাদের নিশ্বাস লুটে নিয়ে যায়; নিরীহ নাগরিকতার শেষ স্বাক্ষর শুধু অস্থি হয়ে ছড়িয়ে থাকে বাঙলাদেশের ক্ষেতে মাঠে আর রাজপথে।

এই অসহায় ধ্বংসের অভিনয়ে আর এক দফা পরিহাসের মত হিরোহিতোর দূতেরা পাখা ঝাপটে আকাশপথে উড়ে আসে। দাসত্বে জীর্ণ কয়েক শত দুর্ভাগার জীবনকে অবাধে ছিন্ন ভিন্ন করে চলে যায়।

শুধু অবনী নয়, অবনীর মত দেশের হাজার হাজার সংগ্রামী সত্যাগ্রহীর বিবেক এই যাতনাময় পরীক্ষায় শুদ্ধ হয় তিমির রাত্রির তারার মত ফুটে ওঠে। সকল কলুষের আক্রমণ থেকে কংগ্রেসের বাণীকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। শহরে গাঁয়ে গঞ্জে হাটে, প্রতি জনতার একেবারে হৃদয়ের কানের কাছে গিয়ে তারা কংগ্রেসের ধর্মযুদ্ধের দাবীর বাণী শুনিয়ে বেড়ায়। যে শোনে সেই নিঃশংক হয়ে ওঠে। ভারতের মুক্তি না হলে মানুষের মুক্তি হবে না, সবার উপরে এই সত্যকে তারা মনে প্রাণে অনুভব করে। আটলান্টিক সনদের কপট শব্দতূর্যের আশ্বাস নিজের মিথ্যায় চূর্ণ হয়ে যায়।

কাজের নেশায় পেয়েছে অবনীকে। ভাঁড়ার ঘরে ঢুকতে ভয় পায় অরুণা। একটা দৈন্যের ছায়া যেন নিঃশব্দে মুখ গুঁজে বসে আছে। জোছু গম্ভীর হয়ে গেছে। পিসিমা অস্বস্তিতে ছটফট্ করেন। শিশিরের চিঠি আর আসে না। ইন্দ্র কোন উত্তর দেয়নি।

প্রতি বছরের মত ছাব্বিশে জানুয়ারীর প্রভাত রৌদ্র কোটী কোটী ভারতবাসীর মুক্তিসংকল্পের পুণ্যে ভাস্বর হয়ে ওঠে। ভোরে উঠেই অবনী বের হয়ে যায়। ফিরে আসে অনেক বেলা করে।

অবনীর মুখের দিকে তাকিয়ে অরুণার বুক দুরুদুরু করতে থাকে। দুঃসহ একটা প্রদাহে যেন অবনীর মুখটা পুড়ে গেছে। কোন বছরের এই শুভ দিনটিতে অবনীকে এতটা অস্বাভাবিক দেখেনি অরুণা।

একটু সহজ হবার জন্যই অরুণা শান্তস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করে।—স্বাধীনতা দিবসের উৎসব কেমন হলো এ বছর?

অবনী—ভালই হয়েছে।

একটু চুপ করে থেকে, অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে অবনী আবার বললো,—কিন্তু আমাদের মিছিল ফিরে এসেছে, পার্কে ঢুকতে পারেনি।

অরুণা—কেন?

অবনী—পার্কের গেট বন্ধ ছিল। ভেতরে পুলিশ আর কম্যুনিস্টরা বসেছিল।

কথাগুলি শেষ করেই উচ্ছল একটা হাসির আবেগে অবনীর মুখ থেকে কঠোর গাম্ভীর্যের ছায়া উড়ে সরে গেল।

অরুণা ম্লানমুখে বললো—তা হ'লে কি এ বছর সংকল্প পড়লে না তোমরা?

অবনী—পড়েছি। আশু মাস্টারের বাড়িতে আমাদের অনুষ্ঠান সেরেছি।

অরুণা বিস্মিত হয়ে বললো—আশু মাস্টার? তিনি তো শুনেছি......।

অবনী—না, তিনি তা' নন। তিনি নিজে থেকে এসে আমাদের মিছিলকে ডেকে নিয়ে গেলেন।

আশুবাবুর প্রসঙ্গে অবনীর মুখের চেহারাটা উৎসাহে দীপ্ত হয়ে উঠছিল। খুসীর আবেগে যেন আপন মনে বলে চলেছিল অবনী।—আশুবাবু একবারে নতুন মানুষ হয়ে গেছেন। আশ্চর্য!

অরুণা বলতে যাচ্ছিল—ইন্দ্রকে দেখতে পেলে না?

তবু মুখ ফুটে বলতে পারলো না অরুণা। উৎফুল্ল অবনীর মুখের হাসিটুকু আজকের দিনে যেন সযত্ন আয়াসে বাঁচিয়ে রাখতে চায় অরুণা।

কিন্তু পরক্ষণেই অবনীর দিকে তাকিয়ে আবার বিষন্ন হয়ে পড়ে অরুণা। অবনীর চোখ দুটো যেন বহু দূরের একটা নির্লজ্জ অপকীর্তির ছবির দিকে তাকিয়ে ঘৃণায় কুণ্ঠিত হয়ে উঠছিল। যেমানুষ ঘৃণা করতে জানে না, কখনও কাউকে ঘৃণা করেনি, তার দৃষ্টিতে এই আবিলতার ছোঁয়া লাগে কেন? কী সেই লাঞ্ছনা?

অরুণা বললো—কাদের কথা ভাবছো?

—না, কিছু নয়।

অবনী আবার স্বচ্ছন্দে উত্তর দেয়। খোঁজ করে—জোছু কোথায়? পিসিমা কি করছেন? (ক্রমশ)

পুস্তক পরিচয়

নতুন আঁখর—কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত। প্রতিরোধ পাবলিশার্স, ঢাকা। দাম ছয় আনা।

বাঙলার তরুণ কবিদের মধ্যে 'স্বপ্ন কামনা'র কবি কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের প্রতিষ্ঠা আছে। তাঁর কাব্য সৃষ্টির প্রসার এবং প্রয়াস দুটোই প্রশংসনীয়। 'স্বপ্ন কামনা' প্রকাশিত হবার পর প্রায় পাঁচ বছর অতীত হয়েছে। ইতিমধ্যে কিরণবাবু অনেক কবিতা লিখেছেন এবং তাঁর রোমান্টিক কবি মন ও দৃষ্টিভঙ্গীর অনেক পরিবর্তন হয়েছে। পাঠক সাধারণকে তাঁর এই কাব্যিক বিবর্তনের আঁচ দেবার উপযোগী কোন নতুন কাব্য গ্রন্থ এ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়নি। এদিক থেকে কিরণবাবুর আলোচ্য কাব্যপুস্তিকা নতুন আঁচড় উল্লেখযোগ্য। 'নতুন আঁচড়ে'র পরিধি সংকীর্ণ এবং কবিতা সংকলনের দৃষ্টি-ভঙ্গীও এক পেশে। তবু এই ষোল পৃষ্ঠার সংকীর্ণ পরিধির মধ্যে 'স্বপ্ন কামনা'র কবির ছন্দোবোধ এবং চয়ন নৈপুণ্য মাঝে মাঝে হৃদয়কে দুলিয়ে দিয়ে যায়। কবির মনে বলিষ্ঠ সমাজ সচেতনতা থাকলেও সংগৃহীত কবিতাগুলোর একঘেয়ে ফ্যাসিস্ট বিরোধী স্লোগান্ মাঝে মাঝে রস-বোধকে পীড়িত করে। পুস্তিকাখানির মুদ্রণও অঙ্গ-সজ্জা প্রশংসনীয়।

কয়েকটি পাতা—অমৃতকুমার দত্ত। প্রতিরোধ পাবলিশার্স, ঢাকা। ছয় আনা।

'কয়েকটি পাতা' অমৃতকুমার দত্তের প্রথম প্রকাশিত কাব্য-পুস্তিকা। ইতিপূর্বে মাঝে মাঝে সাময়িক পত্রিকায় তাঁর কবিতার সাক্ষাৎ পেলেও, তাঁর কবিতায় কোন বিশেষ অভিনবত্বের সন্ধান মেলে নি। কাব্যের সুর মূর্চ্ছনা এবং ছন্দের ঝঙ্কারের চেয়ে তাঁর কবিতায় প্রচার-স্পৃহাই অধিকতর পরিস্ফুট। ফলে অনেক ক্ষেত্রে তিনি উৎকৃষ্ট ফ্যাসিস্ট বিরোধী স্লোগান্ সৃষ্টি করেছেন বটে, কিন্তু কাব্যের অপমৃত্যু ঘটেছে। নিছক প্রচারস্পৃহায় অধীর হয়ে কবিযশঃপ্রার্থী তরুণ লেখকেরা কেন যে কাব্যের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য সৃষ্টিকে ভুলে যান—সে কথা বোঝা যায় না। তবে অমৃতকুমার দত্তের হতাশ হবার মত কোন কারণ নেই। আলোচ্য পুস্তিকা তাঁর প্রথম প্রকাশিত কাব্য পুস্তিকা। এদিক থেকে বিচার করলে তাঁর কোন কবিতায় যে সম্ভাবনার ইঙ্গিত না পাওয়া গেছে তা' নয়। উদাহরণ স্বরূপ 'ডাক' কবিতাটির উল্লেখ করা যেতে পারে। অত্যুগ্র প্রচার-স্পৃহাকে দমন করতে পারলে ভবিষ্যতে তাঁর হাত থেকে ভাল কবিতা পাবার আশা করা যেতে পারে।

লজ্জাবতীর দেশ—দিলীপ দাশগুপ্ত। দিপালী গ্রন্থশালা, ১২৩।১, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা। দাম ছয় আনা।

কবি হিসাবে দিলীপ দাশগুপ্ত বাঙালী পাঠক-পাঠিকা সমাজে একেবারে অপরিচিত নন্। 'লজ্জাবতীর দেশ' পরিকল্পনার দিক থেকে রূপক নাটিকা হলেও গীতিপ্রবণতায় চঞ্চল। ভাষাকে কাব্য-প্রবণতা দান এবং কল্পনা বিলাসের দিকে লেখক যতটা ঝুঁকেছেন, ততটা চরিত্র সৃষ্টির প্রয়াস পাননি। ফলে সমগ্রতার দিক থেকে 'লজ্জাবতীর দেশ' অনেকটা ভাসা ভাসা, এবং অস্পষ্ট। নাটিকাটি অভিনয়ে হয়ত সাফল্য লাভ করতে পারে—কিন্তু নিছক সাহিত্য-সৃষ্টি হিসাবে এর বিশেষ মূল্য আছে বলে মনে হয় না। নাটিকাটির পরিকল্পনায় এবং বিভিন্ন চরিত্রের কথোপ-কথনে রবীন্দ্রনাথের গীতিনাটিকাগুলোর সুস্পষ্ট প্রভাব বিদ্যমান। রবীন্দ্রোত্তর যুগের সাহিত্যে এই জাতীয় নিছক ভাব-বিলাসের প্রয়াস আমরা বহু পিছনে ফেলে এসেছি বলে মনে হয়। নাটিকাখানির মুদ্রণকার্য এবং অঙ্গসজ্জা প্রশংসনীয়।

তুমি আর আমি

অনিলকুমার ভট্টাচার্য

ট্রেন চলে এঁকে বেঁকে সরিসৃপ রেখা
আসন্ন সন্ধ্যার মাঝে ধূসর আকাশ;
দূরে দেবদারু বন—অশ্বত্থ-ছায়ায়,
নীড়াগত পাখীদের কিচিমিচি ধ্বনি;
সন্ধ্যা-সূর্য অস্ত যায়।

তুমি আর আমি—
সৃষ্টির প্রথম প্রাতে মানব মানবী,
আরণ্যক জীবনের মধুর সঞ্চার ঃ
ভেসে আসা প্রদোষের হিল্লোলিত বায়
বন বকুলের মৃদু সৌরভ নিঃশ্বাস;
ঘন অর্কিড বনে যে রোমাঞ্চ জাগে
তোমার কেশের স্পর্শ তারই অনুরাগে
আমারে মাতায়ে তোলে।
ক্ষণিকের ঘন গম্ভীরবতা—
মুদে আসা আঁখি-তটে যে কামনা-শিখা
ধিকি ধিকি ওঠে জ্বলি' প্রদীপ শিখায়
তার মাঝে ডুবে যাই তুমি আর আমি।
সংকীর্ণ জীবন-স্রোত কোথা বাধা পায়?
ঘনতন্দ্রা যায় ভেঙে—

উচ্ছল তটিনী-ঢেউ রুদ্ধগতি তার।
আচম্বিতে দেখা যায় জংশন-আলো,
হরিৎ ধানের ক্ষেত দূরে সরে গেছে—
ঘন শ্যাম অরণ্যানী যন্ত্রের সংঘাতে
মসৃণ পীচ ঢালা রাজপথ ভূমি।

সুদূরে দিগন্ত শোভা কাঁটা তারে ঘেরা
জংশন-ইঞ্জিনের হুইসিল বাজে;
চিমনির কালো ধোঁওয়া চাঁদ ঢেকে দেয়
হাতুড়ির শব্দ মাঝে ফার্নেশ আলো—
দেখায় জীবন পথ—নূতন বিস্ময়!

প্রখর দুর্জয়!!

ট্রেন থামে—জংশন-স্টেশনের কল-কোলাহলে
তুমি আমি বসে আছি—কলের মানুষ।
মাঝখানে কাঁটাতার প্রভেদ প্রাচীর;
কেহ কারে চিনি নাকো, শুধু পাশাপাশি
চলিয়াছি জীবনের বাঁধা পথ বাহি'
অজস্র নিষেধ আর গম্ভীর সীমায়
ক্ষণিকের সহযাত্রী শুধু।

সিক্ত মৃত্তিকা

শ্রীনলিনীকান্ত মুখোপাধ্যায়

মতিলাল তখনো কাঁদছে—।

অপরাহ্নে আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নেমেছে। ধারার পর ধারা চলেছে অবিরাম। প্রসব-পাণ্ডুর কালো মেঘ কতবার বিবর্ণ হোলো। প্রহরের পর প্রহর শেষ হোলো, কৃষ্ণপক্ষের এ রাত্রে চাঁদ আর উঠলো না। পরিতৃপ্ত পৃথিবীর লজ্জা অন্ধকারে ঢাকা রইছে না বিদ্যুতের ঝলকানিতে।

মতিলাল তখনো কাঁদছে। তার চোখ দিয়ে অবিশ্রান্ত ধারা বইছে।

গান্ধারী নিজের কুঁড়েঘরে শুয়ে শুয়ে ভাবছে, বেত্রবতীতে বোধ হয় উজান এলো।

দুবছর আগে ভজন বিশ্বাসের মেয়ে সাত-আনি জমিদারদের পোড়ো ভিটের আমগাছে গলায় দড়ি দিয়ে মরেছিল। তার মৃত্যুর সঙ্গে মতিলালের নাম জড়ানো ছিলো। পুরুষেরা কানাঘুষো করতো অতটা অধম্ম করা উচিত হয়নি মতিলালের। মেয়েরা প্রকাশ্যেই বলতো, বিধবার অতো বাড়াবাড়ি ভগবান সইলেন না।

মতিলাল কিন্তু সেজন্য কাঁদছে না। পয়সা খরচ করে জমানো নেশা কেটে গেলে, সেই নেশার স্মৃতি নিয়ে কেউ কাঁদতে বসে না।• বরঞ্চ আবার গোড়া থেকে শুরু করবার জন্যে অর্থসংগ্রহে মন দেয়। মতিলালের বিগত জীবন যাই-ই থাক, তা নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার গান্ধারীর নেই।

মতিলাল তাকে নির্জনে ডেকে বলেছিলো অনেক কথা। উপসংহারে জিজ্ঞেস করেছিলো—রাজী থাকিস তো বল, তার বন্দোবস্ত করি!

গান্ধারী কোনো কারণ না দেখিয়ে সোজাসুজি বলেছিলো—'না'।

এই না বলার বিরুদ্ধে যুক্তি খুঁজে পেতে মতিলালের দেরী হচ্ছিলো, ততক্ষণে গান্ধারী অনেক দূরে চলে গেছে।

গান্ধারীর এই না বলবার স্বপক্ষে-বিপক্ষে অনেক যুক্তি আছে। হ'তে পারে মতিলালের বয়স প্রায় চল্লিশ বছর, কিন্তু তার মত জোয়ান গ্রামে আর ক'জন আছে। আর মাতব্বরী সে তা বলে গায়ের জোরেই করে না, ঘরে তার পয়সাও কম নেই!

তার পরদিন ঘাটের পথে মতিলালের সঙ্গে গান্ধারীর আবার দেখা। মতিলালের কথা বানানোই ছিলো—দেখ গান্ধারী, তোর বাপ তো কোনোদিন বিছানা ছেড়ে উঠবে বলে মনে হয় না। ঘরে তোর মা নেই। ছোট ছোট ভাইবোনগুলোরে নিয়ে এই ভরা বয়সে থাকবি কেমন করে!

বলতে বলতে মতিলালের কথা ফুরিয়ে গেল, অথচ কোনো জবাব পেলো না। ঘাটের পথ যেখানটায় বড্ড সরু, সেই-খানটায় সে গান্ধারীর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তার পরিধি দিয়ে পথ আটকালো।

"কথার জবাব দিসনে কেন, গান্ধারী!"

গান্ধারী মতিলালের অসহিষ্ণু প্রশ্নে তার দিকে ফিরে তাকালো। ঘন আগাছার জঙ্গলে রাস্তার দু'পাশ ঢাকা—চোখ বাধা পায় মতিলালের দেহে, তার ও-পাশে আর কিছু দেখা যায় না।

"পথ ছাড়ো মোড়ল, বাড়ি যাই।"

"কথার জবাব দিয়ে যা তবে!"

মতিলালের এই কথায় গান্ধারী বললে—"কতবার জবাব দেবো? কালই তো বললাম, তা হয় না।"

"কেন্ হয় না! কি অনেয্য কথাটা বলিছি আমি!"

গান্ধারী আর উত্তর না দিয়ে পাশ কাটিয়ে বাড়ির দিকে চললো। বাঁ-কাঁখে কলসী নিয়ে অপরিসর পথে ডানদিকের লোককে এড়াতে গেলে ভারসাম্য রক্ষা করা কঠিন হয়। গান্ধারী মতিলালের গা ছুঁয়ে গেলেও মতিলালের তাতে উৎসাহিত হবার কারণ ছিলো না। তবুও কেন যে সে তার পিছনে পিছনে চলছিল, তা সেই-ই জানে!

—"আমার দিক্ একবার ফিরে চা! মার পেটের ভাই শুকলালরে মানুষ করলাম খাওয়ায়ে পরায়ে, তা সেও ভেন্ন হয়ে গেল। এত ক্ষেত-খামার, পঞ্চাশ জোড়া জাল, তিনটে বাঁধের মাছ ধরার বন্দোবস্ত, একা একা কেমন করে সামাল দিই বলতো! মনে শান্তি না থাকলে কি কাজ করা যায়!

মতিলালের অনুনয়ের ছোঁয়াচ লেগে অগ্রবর্তিনীর কলসের জল ছলকিয়ে পড়ছিলো। সে আর জবাব না দিয়ে পারলো না।

"—যে তোমার মেজাজ মোড়ল, তাতে আর শুকলাল দাদার দোষ কি! দিবে-রাত্তির লোকের পিছনে লেগে থাকলে কি মানষে মানষির ঘর করতে পারে!—"

কথা শুনে মতিলালের মাথায় যেন আগুন ধরে গেল।

"শুকলাল বলেছে একথা! দাঁড়াও, আজ তারে সড়কির আগায় না গাঁথি তো আমি শীতল পাড়ুইয়ের ছেলেই নই!"

গান্ধারী ততক্ষণে ফিরে দাঁড়িয়েছে। মতিলালের মেজাজ সে কেন, সবাই জানে। শ্যামবর্ণার মুখের রক্তশূন্যতা লক্ষ্য করা কঠিন হলেও, অষ্টাদশ বসন্তের তুলিতে আঁকা নিষ্পলক চোখের ভাষা বুঝতে মতিলালের দেরী হোলো না। পরকে ভয় দেখিয়ে নিজে ভয় মতিলাল এই প্রথম পেলো।

মতিলাল কিন্তু সেজন্যে কাঁদছে না। একমাত্র বিনয়ে, স্নেহে যাকে বশ করা সম্ভব, তার সামনে হঠাৎ মেজাজ দেখিয়ে যে ভুল করে ফেলেছে, সেই আক্ষেপে তার চোখে জল ঝরছে না।

বাইরে তখনও ধারার পর ধারা চলেছে অবিরাম।

তার পরদিন মতিলালের মনে সাময়িক বৈরাগ্য এসেছিলো। সামান্য একটা মেয়ে, তার জন্যে এত আকুলতা তার শোভা পায় না। দৈত্যের মত চেহারা তার। রাতের পর রাত বৃষ্টিতে ভিজে মাছ ধরেছে। দিবারাত্র জাল বুনেছে। অবিরাম বর্ষণে স্তিমিত-স্রোতা বেত্রবতীতে উজান উঠলে সে একাই বাঁশ কেটে বাঁধ দিয়েছে। বহু বৎসরের পরিশ্রম সে অল্প সময়ের মধ্যে করে, বহু বৎসরের উপার্জন সে অল্প দিনের মধ্যেই পেয়েছে। জমি, জমা, মাছের কারবারে তার লাভের অন্ত নেই। বিয়ে করেছিলো অনেক টাকা খরচ করে, রাজবংশীয় ঘরের সেরা সুন্দরীকে। তা সেও একদিন মরে গেল। ছোট ভাই শুকলালের বিয়ে দিয়ে তাদেরই নিয়ে ঘর করছিলো; তা সেও একদিন আলাদা হয়ে গেল। তারপর কি ভেবে ভজন বিশ্বাসের মেয়ে কুন্তিকে মাইনে করে রেখেছিলো ঘর-সংসার দেখবার জন্যে। দুজন সুস্থ মানব-মানবী ভবিষ্যৎ চিন্তা করেনি, তাই একদিন কুন্তিকে বাধ্য হয়ে মতিলালকে জিজ্ঞাসা করতে হয়েছিলো যে, সে কি করবে। মতিলাল রেগে জবাব দিয়েছিলো—'গলায় দড়ি দিগে যা'।

তার পরদিনই সে সাত-আনীর ভিটের আমগাছে গলায় দড়ি দিয়ে মরেছিলো। বড় ভালো মেয়ে ছিলো কুন্তী। লোকের সামনে তার সঙ্গে সমানে ঝগড়া করতো। নির্জনে মতিলাল তার দিকে এগিয়ে গেলে সজোরে চোখ বন্ধ করে থাকতো। পরমেশ্বর বড় নিষ্ঠুর। পুরুষের সঙ্গে সামর্থ্যে না পেরে, নারীর মন ভাঙিয়ে, তার মন ভাঙান।

মতিলাল কিন্তু কুন্তীর সঙ্গে রমণীর যৌবন-বিলাসের দিনগুলিকে স্মরণ করে কাঁদছে না। কুন্তী আত্মহত্যা করবার পর সে তাকে কোনোদিনই স্বপ্ন দেখেনি।

সাময়িক বৈরাগ্যের মর্যাদা রক্ষা করতে মতিলাল মন টেনে নিয়ে কাজে বসালো। জাল-ঘরে সারি সারি জাল টাঙানো রয়েছে। চার-পাঁচজন লোক সেইগুলোকে মেরামত করছে। মতিলাল তার মধ্যেকার একজনকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলো—যজ্ঞেশ্বর কি আজ যাবে নাকি মানিকদায়? তোমার মেয়ের জ্বর কেমন? মানিকদহে বেড়াজাল ফেলা হবে। যজ্ঞেশ্বর গেলে অবশ্য তার উপার্জন হবে।

"না যেয়ে আর কি করি! মেয়েডার জ্বর, তার ওপোর ঘরে নেই একটা পয়সা!"

এই কথা শুনে মতিলাল যে উত্তর দিতে দিতে জাল-ঘরের অন্যদিকে চলে গেল, তা শুনে ঘরশুদ্ধ লোকের হাতের কাজ বন্ধ হয়ে গেল।

—"তোমার তাহলে যেয়ে কাজ নেই যজ্ঞেশ্বর। বাড়ি থাকগে। যাবার সময় এক খুঁচি ধান আর দুটো টাকা নিয়ে যেও।" পাওনা পয়সা মতিলাল দেয়, কিন্তু খয়রাত করা তার ইতিহাসে নেই।

জাল-ঘরের বাইরের উঠোনে সারি সারি ধানের গোলা। পিছন ফিরে মতিলাল একবার বাঁশের আলনায় টাঙানো জাল-গুলোর দিকে ফিরে চাইলো। মতিলালের দীর্ঘনিশ্বাস পড়লো। কেন, এ সমস্ত! কিই-বা হবে!

"আমার কথা শোন্, গান্ধারী, আমার দিক্ ফিরে চা?"

"না, তা হয় না মোড়ল।"

না, না, আর না। মতিলাল ধানের গোলার পাশ দিয়ে চলেছে। কয়েকজন লোক ধান পাড়ছিলো। বোধ হয় ধার দেওয়া হবে। মতিলালকে দেখে তাদের গোলমাল থেমে গেল। খানিকক্ষণ সেদিকে চেয়ে দেখে মতিলাল বললে—একটু সাবধানে ধান নামাও দ্বিজবর, আদ্ধেক তো ছড়িয়েই পড়লো।

এতগুলো ধানের গোলা। এ বছরে ধার দিলে সামনের বছর দেড়গুণ হয়ে ফিরে আসবে, এ বাদে ক্ষেতের ধান তো আছেই! কিন্তু কেন এসব! এতটুকু একটা মেয়ে; দুবেলা ভাল করে খেতে পায় না—একখানা কাপড় গায়ে শুকোয়! তবুও না, না আর না!

ধানের গোলা শেষ হতে গোয়াল আরম্ভ হোলো। কুড়ি জোড়া লাঙল চলে, আধমণ থেকে দুমণ পর্যন্ত দুধ হয়। গান্ধারী সকালে উঠে মাটির কড়াইতে কাঁচা ফেন-ভাত রেঁধে শুধু নুন দিয়ে ভাইবোনদের খাওয়ায়। তবুও সেই একই কথা না, না, আর না।

মতিলালের বাড়ির দক্ষিণে তার ভাই শুকলালের বাড়ি। পশ্চিমের পোড়ো জমিটার ওপোর কোন রকমে একখানা চালাঘর বেঁধে রুগ্ন বাপকে নিয়ে গান্ধারী মাথা গুঁজে আছে। বৃষ্টি পড়লে ঘরের ভেতরে জল পড়ে—জোরে বাতাস দিলে গান্ধারী ঈশ্বরকে স্মরণ করে। যাই হোক, তবু সে কোনো রকমে বেঁচে আছে ছোট ছোট মা-মরা ভাইবোনদের নিয়ে। আগে যে গ্রামে থাকতো, সেখানে তার স্বজাতিরা রোগের মহামারীতে গ্রাম ছেড়ে পালায়—তারপর একদিন বদমাইসের দল গান্ধারীকে চুরি করে নিয়ে যায়। সে কোনো রকমে পালিয়ে আসবার পরই তার বাবা মতিলাল-দের গ্রামে চলে এসে তারই বাড়ির কাছে ঘর বাঁধে। মতিলাল এই নিরাশ্রয় পরিবারকে বাঁশ দিয়েছে, খড় দিয়েছে, তিন মাসের খোরাকী ধান দিয়েছে। গান্ধারীর বাপ তারপরই যে বিছানা নিয়েছে আর ওঠেনি। গান্ধারীর দিকে গ্রামের লোকেরা চেয়ে দেখতো, আর বলাবলি করতো—মতি মোড়লের কপাল ভালো। জাল ছিঁড়ে রুই পালালো তো কাৎলা এলো!

মতিলাল কি ভাবতে ভাবতে পায়ে পায়ে গান্ধারীদের বাড়ির উঠোনে গিয়ে উঠলো। উঠোনের ওপোরের উনুনে নারকোল পাতার জ্বাল দিয়ে মাটির কড়ায়ে করে ফেনভাত রেঁধে ভাইবোনদের খেতে দিয়েছে। সবচেয়ে ছোটটাকে কোলের ওপোর বসিয়ে খাইয়ে দিচ্ছিলো। মতিলালকে আসতে দেখে এই সুখী পরিবারের উদরপূর্তির তৃপ্তির উচ্ছ্বাস বন্ধ হোলো। গান্ধারীর মুখ মুখোসের, তার কোনো পরিবর্তন হয় না।

"আমার বাড়ি তো কত দুধ ফেলা যায়; ছেলেপিলেগুলোরে ভাতের সাথে একটু দুধ এনে খাওয়ালে তো পারিস!"

যেমন দেরিতে উত্তর দেয় গান্ধারী, তেমনি দিল—গেরামে কি আর ছেলেপিলে নেই, না আর কেউ নুন-ভাত খায় না!

"দুধ না আনিস চালগুলো তো বদলিয়ে আনতে পারিস! অত মোটা আউশের চাল কি ছেলেপিলের সহ্য হয়।"

মাটির দিকে চোখ রেখে গান্ধারী জবাব দিলে—এরা তো তবু খাচ্ছে, তা মোটাই হোক, আর যাই-ই হোক। অনেকের ঘরে আজ তাও নেই।

নিরুত্তর মতিলাল ফিরে যাচ্ছিলো খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে। কি ভেবে ফিরে এসে বললে—আমার একটা কথা রাখ্ গান্ধারী, একখান কাপড় এনে দিই, পর। বয়সের মেয়ে—ছেঁড়া কাপড় পরে থাকলে অপদেবতার দিষ্টি লাগে। —একটু রসিকতার চেষ্টা হয়তো মতিলাল করছিলো, কিন্তু গান্ধারীর মুখের দিকে চেয়ে চুপ করলো। আর কোনো কথা বলবার সুযোগ নেই দেখে আস্তে আস্তে উঠোন পার হয়ে দুই বাড়ির মধ্যবর্তি একটা কামিনী ফুলের ঝাড়ের কাছে পেঁছেছে, এমন সময় গান্ধারী ডাকছে শুনতে পেলো।

সামান্য একটু দূর থেকে সে তাকে, উদ্দেশ করে বললে—তুমি কি আমাদের গেরাম ছাড়া করতে চাও মোড়ল? মনের ইচ্ছে খুলে বলো, মানে মানে নিজের ভিটেয় ফিরে যাই, তা কপালে যা আছে তাই হোক। আর না হোক বেতনার জল তো আছে! ছেলেপিলেগুলোরে জলে ডুবিয়ে দিয়ে, আমি গলায় দড়ি দেবো, এ আমি তোমারে বলে রাখলাম। গান্ধারী বলে গেল।

মতিলাল নিশ্বাস ফেলে বাড়ি ফিরে এলো। গোলা থেকে তখনো ধান নামানো হচ্ছিলো। সকালের রোদ তখনো সামনের আমের বাগিচা ছাড়িয়ে উঠতে পারে নি। দাওয়ার ওপোর বাঁশের খুঁটি ঠেসান দিয়ে মতিলাল চুপ করে বসে রইলো।

"ছোট শলার একশলা ধান না দিলে আমার আর চলবে না বড়দা। আওশ ধান উঠলি শোধ করে দেবো।"

মতিলাল মুখ ফিরিয়ে দেখলো তার মামতো বোন জানকী, বিয়ে হয়েছে দক্ষিণপাড়ার অভিরামের সঙ্গে। অনেক-গুলো ছেলেমেয়ে নিয়ে জড়িয়ে পড়েছে। মতিলাল কখনো সাহায্য করে, কখনো করে না। আজ মতিলাল বললো—'একশলা নিলে তো আর ধান ওঠা পর্যন্ত চলবে না, আবার তো আসতে হবে। তার চেয়ে একসাথে দু শলা নিয়ে যা।'

হতভম্ব জানকী গোলার দিকে চলে গেল।

একটু পরে দ্বিজবর পাড়ুই, অর্থাৎ যে ধানের হিসেব রাখে, সে এসে জিজ্ঞেস করলে—জানকীরে দুশলা ধান দিতি বলিছো?

মতিলাল ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালো।

মতিলাল চেয়ে রইলো আমগাছগুলোর সবচেয়ে উঁচু চূড়ার দিকে। এই কিছুদিন আগেও আমতলায় হাজার হাজার আম ঝরে পড়তো। লোকের কোলাহলে কান পাতা যেতো না। আমগাছগুলো নিরর্থক দাঁড়িয়ে আছে নির্লজ্জের মত। আবার কবে সেই মাঘ মাসে মুকুল ফুটবে! একজনের ডাকে চমক ভেঙে মতিলাল দেখলো কানাই বাজনদারের ছেলে শিবচরণ।

মতিলাল জিজ্ঞাসা করলো—"কিরে, কি চাই?"

ছেলেটি বললে—জ্যেঠামশাই, বাবা পাঠিয়ে দিলো, চার খুঁচি বীজ ধানের জন্যে—

মতিলাল নিস্পৃহভাবে জিজ্ঞাসা করলো—বীজ ধান তো বুঝলাম, খাবার ধান আছে?

লেটির অর্থপূর্ণ নীরবতার পরে মতিলাল ার কোনো কথা জিজ্ঞাসা না করে জবরকে ডেকে ছেলেটিকে বীজ ধান এবং বার ধান দিতে বলে দিলো।

বহু মানুষকে মতিলাল কৃতজ্ঞ করতে রে। একজন শুধু বললে—'না।'

মতিলালের এই আকস্মিক পরিবর্তনের র বেশীক্ষণ চাপা রইলো না। অনেকে দেহ করলো মতিলালের এই সততায়, ন্তু নিতে কেউ ছাড়লো না। বেলা ড়িয়ে এলো, ধানের ধুলোয় চারদিক ন্ধকার। মতিলাল স্নান করেনি, খায়নি, ক সেই এক জায়গাতেই বসে আছে। বসে সে দেখছে ধানের লুণ্ঠন আর অনাহার তুর হাত থেকে রক্ষা পাবার সম্ভাবনায় ানুষের কৃতজ্ঞ দৃষ্টি। এরকম লুণ্ঠন তক্ষণ চলতো বলা যায় না, এমন সময়ে াকাশে মেঘ ঘনিয়ে এলো। মেঘ গর্জনের ল্প অল্প সাবধান বাণীর পর নেমে এলো ৃষ্টি। প্রার্থীদের ভিড় ভেঙে গেল। গালার দরজা বন্ধ করে দ্বিজবর চাবি মতিলালকে দিয়ে চলে গেল।

তারপর ধারার পর ধারা চললো অবিরাম। প্রসব-পাণ্ডুর কালো মেঘ কতবার বিবর্ণ হালো, বর্ষণ তবু থামলো না। মতিলাল এক সময় ঘরে গিয়ে শুয়েছে। তারপর কখন যে তার চোখ দিয়ে জল ঝরতে আরম্ভ করেছে, তা সে নিজেই জানে না। কৃষ্ণপক্ষের রাত—প্রহরের পর প্রহর শেষ হয়ে চললো। মতিলাল তখনো কাঁদছে। অশ্রু আর বর্ষণের প্রতিযোগিতায় কার জয় হবে কে জানে!

কর্মী মতিলালের মনকে বিষাদ বায়ু আচ্ছন্ন করেছে। সঞ্চয়ী মতিলাল মনের পুঁজি খুইয়ে কাঁদছে—তার পরিশ্রমের ফল তিনটে গোলার ধান বিলোনোর সমারোহের পর অবসাদের অশ্রু এ নয়।

রাত প্রায় তৃতীয় প্রহরের শেষ। হঠাৎ বাইরের দাওয়ায় কিসের শব্দ হোলো। মতিলাল জিজ্ঞাসা করলে—কে?

ক্লান্তস্বরে আগন্তুক জবাব দিলো—আমি ছিরিবিলাস।

মতিলাল বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করলো—চলে এলে কেন মানিকদার থেকে? হয়েছে কি?

ছিরিবিলাস জবাব দিলে—বলরামপুরের শেখেরা আর গাজীপুরের ঘোষেরা বাঁধালের সব মাছ ধরে নিয়ে যাচ্ছে। আর সকলেরে আটকিয়ে রেখেছে, আমি কোনো মতে পালিয়ে এলাম।

আসল মতিলালের চমক এবার ভাঙলো—দাওয়ায় বেরিয়ে হাঁক দিলে—শুকলাল, ওরে ও শুকলাল? একটু পরেই শুকলাল সাড়া দিলো 'যাই' বলে। মতিলাল উত্তেজিত স্বরে বললে—তোর সড়কি নিয়ে আসিস। আজ সব কটারে খুন করবো। ছিরে, তুই গেরামের পরে সকলেরে খবর দে; অমনি একবার বাজনদার পাড়ায় হাঁক দিয়ে আসিস। পয়সা খরচ করে জমা নেবার মুরোদ নেই, পরের বাঁধালে মাছ ধরার সখ আছে খুব। চোরের ঝাড়গুষ্টি আজ নির্বংশ করবো।

বৃষ্টি আরো জেঁকে এলো। দেখতে দেখতে লম্বা লম্বা মশাল জ্বালিয়ে, তালপাতার টোকা মাথায় দিয়ে আশি-নব্বই জন লোক জড়ো হোলো। সেই আলো মতিলালের উঠোন ছাপিয়ে গিয়ে পড়লো গান্ধারীর কুঁড়ে ঘরে। মতিলালের চোখ সেদিকে একবার পড়তেই তা ফিরিয়ে নিলে।

টোকার নীচে মশালগুলো কাঁপছে। উত্তেজনায় মতিলালের ঘাড় এবং রগের শিরাগুলো ফুলে উঠেছে—যদি রাজ-বংশীর ঘরে জন্ম নিয়ে থাকিস তো একটা খলসে মাছও ওরা যেন নিয়ে যেতে না পারে। আজ ওরা যদি তোর হকের জিনিস নিয়ে যায়, তো কাল তোর ঘর সামাল দিতে পারবি নে।

যোদ্ধাগণ একে একে ডোঙাগুলিতে গিয়ে উঠলো। শুকলাল বললে—দোহাই দাদা, তুমি এখনই যেয়ো না। থানায় একটা এজেহার দিয়ে এসো তার পর যেয়ো।

আবার যে অন্ধকার সেই অন্ধকার। ওদের বিদায় দিয়ে নদীর ঘাট থেকে বাড়িতে ফেরবার পথে মতিলাল দেখলো গান্ধারীর ঘরে আলো জ্বলছে। কৌতূহলের বশে সে বেড়ার ফাঁকের কাছে পা টিপে টিপে গিয়ে দাঁড়ালো। গান্ধারী বলছে—লক্ষ্মী আমার, সোনা আমার এইদিক ফিরে শোও? ছিঃ, দাদার সাথে ঝগড়া করে না। যাকে উদ্দেশ করে কথাগুলো বলা হল সে বললে "আর কোথায় সরবো দিদি? দেখ্ তুই! এদিকও জল পড়ে। "গান্ধারী জবাব দিচ্ছে—তা পড়ুক, চোখ বুজে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়—এখনি রাত পোয়ায়ে যাবে। আবার একজন জিজ্ঞাসা কোরলো—মতিদাদা ওদের নিয়ে কেন গেলো দিদি? গান্ধারী বললে—কোথায় আবার দাঙ্গা করতে। মতিদাদার আর কি কাজ! ভগবানের দেওয়া নদীর মাছ, গরীব লোক দুটো ধরে খাচ্ছে, তাও ওনার সহ্যি হয় না! এই ছিষ্টি দুনিয়ায় যা আছে সব ওনার। যাদের শোনানো হচ্ছিল কথা, তাদের কাছ থেকে সাড়া এলো না। মতিলাল নিঃশব্দে সরে গেল নিজের ঘরের দিকে। এমন সময় শুনতে পেলো শুকলালের বৌএর গলা। সে গান্ধারীকে ডেকে বলছে—ওরে ও গান্ধারী! তোর পরাণে কি ভয় নেই! আর ছেলেমেয়েগুলোরে নিয়ে এই বাড়ি! রাত পোয়াতে অনেক দেরী। গান্ধারী বললে—ভয় কিসের বৌদি! তুমি ঘুমোও। শুকলালের বৌ বললে—ওমা, ভয় নেই! বটঠাকুর গেলেন গেরাম শুদ্ধু লোক নিয়ে দাঙ্গা করতে, গেরামে তো মানিষ্যি বলতে নেই! ওরে ও গান্ধারী! শুনলি আজকের ব্যাপারখান! আজ কোন দিক সূয্যি উঠেছে, বটঠাকুর আজ ছোট ভাইরে ডেকে কথা বলেছেন! বাক্যি আলাপ তো আজ এক বছর বন্ধ। ও গান্ধারী আয়!

গান্ধারী বললে—সব কটারে টানাটানি করি কেমন করে। তুমি ঘুমোও বৌদি, ভয় নেই।

শুকলালের বৌ তখন গান্ধারীর আশা ছেড়ে দিয়ে বললে—হে মা বুনোর কালী! হে বাবা মন্দার ভাঙ্গার পীর। তোমাদের পুজো দেবো, আমার ঘরের মানুষ ভালোয় ভালোয় ফিরে আসুক। বটঠাকুরের আর কি! ঘরের মানুষ তো আর নেই, তাই দাঙ্গা বাধলি আর গেয়ানগম্যি থাকে না। কে যায়! কে যাচ্ছো পথ দিয়ে? দু' একবার ডেকে সে পথিকের সাড়া না পেয়ে ছোটবৌ আপন মনে বলে উঠলো—গেরামে একটা জোয়ান মানুষ নেই আর যতো সব উড়ো আপদ এসে জুটলো এখন।

প্রদীপের সলতেটা উসকিয়ে দিয়ে গান্ধারী একটু ঢাকঢুকি দিয়ে বসবার চেষ্টা করতে লাগলো। কাপড়ের আঁচলটার একদিক ভিজে গেছে বাইরের জোলো হাওয়া বেড়ার ফাঁক দিয়ে আসা যাওয়া করায়; কেমন যেন শীত শীত করছে। ছেঁড়া কাঁথা যা ছিলো, সবগুলোই রুগ্ন বাবা আর ভাইবোনদের গায়ে চাপা দিয়েছে। ঘরের চারদিকে তাকিয়ে আর কিছু ছেঁড়া কাপড় চোপড় খোঁজবার চেষ্টা করলো। না, এমন করে আর চলে না। এই এদের নিয়ে গান্ধারী কার ওপোর ভর করবে! বিয়ে যে তাকে কেউ করবে না, একথা গান্ধারী জানে। তবে মতি মোড়োলের মত লোক জুটতে পারে অনেক। গান্ধারী অবশ্য শুকলালের বৌএর মুখে কুন্তির গলায় দড়ি দেওয়া দুশোর বর্ণনা শুনেছে। আর যাইই করুক, যে কাজের পরিণামে গলায় দড়ি দেওয়া ছাড়া উপায় থাকে না, সে কাজ গান্ধারী কখনই করবে না।

কিন্তু, মতিলালকে সে কেমন করে এড়াবে? তার সহায় নেই সম্বল নেই, এমন সুনামও নেই যে কারো ঘরের বধূ হয়ে জীবন কাটিয়ে দেবে। একদিক দিয়ে মতিলালের প্রস্তাব অত্যন্ত অন্যায় হলেও এর চেয়ে মহত্তর কিছু তার আগামী জীবনে সম্ভব হবে না। কিন্তু তার আগেই গান্ধারী গলায় দড়ি দেবে।

কিন্তু এও আর সহ্য হয় না। ভালো

করে খাওয়া জোটে না তাদের কারোরই, ছেলেপিলেগুলোর পরবার দরকার হয় না তেমন তাই রক্ষে! তার নিজের যা কাপড় চোপড় তা পরে মানুষের সামনে বের হওয়া যায় না। যা যোটে তাই দিয়ে খাওয়া দাওয়া চুকিয়ে সন্ধে বেলাতেই ঘরে ঢোকে। আগে এই ছোট ঘরে ভাইবোন-দের নিয়ে নিরাপদে রাত কাটিয়েছে। কিন্তু এ বর্ষায় খড়ের চাল ফুটো হয়ে জল পড়ছে।

অবশেষে নিরুপায়ের উপায় শুকলালের বৌএর কাছে একখানা কাপড় চেয়ে পরা। চালের বাতা থেকে তালপাতার টোকাখানা মাথায় দিয়ে শুকলালের ঘরের কাছে গিয়ে ডাকলো—বৌদি, ও বৌদি! ঘুমিয়ে পড়েছো নাকি! আরো কয়েকবার ডেকে সাড়া না পেয়ে নিরাশ হয়ে ফিরে আসছিলো; হঠাৎ তার চোখ পড়লো মতি-লালের দাওয়ার ওপোর। অন্ধকারে কিছু চোখ পড়ে না, কিন্তু কোন জন্তু জানোয়ার কি যেন কড়মড় করে খাচ্ছে সেটা আওয়াজ থেকে বোঝা যায়। গান্ধারী দু একবার তাড়া দিতেও সেটা সেখান থেকে নড়লো না দেখে হাতে একটা বাঁশের লাঠি নিয়ে সেই দিকে এগিয়ে গেলো। একটা কুকুর ছিলো বসে, খুব কাছাকাছি গিয়ে তাড়া দিতেই সেটা পালিয়ে গেল। গান্ধারী চলে আসছিলো, হঠাৎ ফিকে অন্ধকারের মধ্যে দেখলো মতিলালের ঘরের দরজা খোলা। এমন তো কখন হয় না! মতি মোড়োলের হোলো কি! সকাল বেলা গোলার ধান নিয়ে দানছত্তর খুললো আর এখন ঘরের টাকা পয়সা সোনাদানা চোরের হাতে দেবার জন্যে দরজা খুলে রেখে দাঙ্গা করতে গেলো! নাঃ, মতিমোড়ল এবার সন্নিসী হবে। এরকম বেহিসেবী কাজ গান্ধারী অনুমোদন করলো না। তবে মতিলাল তাদের অসময়ে উপকার করেছে, তার ওপোর প্রতিবেশী, অন্তত দরজার শিকলটা তুলে দেওয়া গান্ধারী উচিৎ মনে কোরলো। দাওয়ার ওপোরে উঠে দরজার শিকলটা তুলতে গিয়েছে এমন সময় হঠৎ গান্ধারীর বুকের রক্ত যেন হিম হয়ে গেল। ঘরের ভেতরে কে যেন কাঁদছে!

কিন্তু অতীতে এই মেয়েটিই মনের জোরে অনেক লোকের দ্বারা নিজের দেহের কদর্য পরিণাম সম্ভব হতে দেয়নি। কত রাতে সর্বনাশের সামনাসামনি দাঁড়িয়ে ভয় পায়নি, আজও পেলো না।

"ঘরের ভিতর কাঁদে কে! শুনতে পাও না!" ঘরের মধ্যে এইমাত্র কান্না থামিয়ে যে জবাব দিলো তার গলা চিনতে পারলেও নিঃসংশয় হবার জন্যে আবার জিজ্ঞাসা কোরলো—তুমি ঘরে শুয়ে রয়েছো। তবে যে শোনলাম তুমি গেছো দাঙ্গা করতে।

মতিলাল জবাব দিলো—যাচ্ছিলাম হঠাৎ শরীর কেমন করলো। আলোটা জেবলে দিবি গান্ধারী। দেশলাই শিয়রে রয়েছে নিয়ে যা। আমি আর উঠতে পারি নে।

অনিচ্ছুক গান্ধারী ঠাহর করতে না পেরে মতিলালের বুকে মাথায় হাতড়াতে হাতড়াতে দেশলাই বের করে প্রদীপ জবালালো। ঘরে আলো হতে গান্ধারী জিজ্ঞাসা করলো—তোমার কি হয়েছে, মোড়োল! মতিলাল আর্তনাদের মত করে বলে উঠলো—আমি আর বাঁচবো নারে গান্ধারী, তুই দেখিস আমি ঠিক মরে যাবো।

বাইরের দমকা হাওয়ায় ঘরের আলনায় টাঙানো কাপড়গুলো দুলছে—বাঁশের দোলায় টাঙানো লেপ তোষকগুলোর দিকে চেয়ে গান্ধারী জিজ্ঞাসা করলো—মরবা কেন। বালাই ষাট! তোমার মতো ভাগ্যি-মান যদি মরবে তো আমরা রইছি কি কত্তে।

হাহাকার করে মতিলাল বললো—আমার মত পোড়াকপাল যার তার বাঁচায় সুখ কি! মরবো আমি নিশ্চয়ই, কিন্তু মনে রাখিস গান্ধারী, আমার মত তোর জন্যে কারুর মন পুড়বে না।

গান্ধারী ঝঙ্কার দিয়ে বলে উঠলো—আমি কারুকে মন পোড়াতে বলিনি। গান্ধারীর গায়ের ভিজে কাপড় যেন অসহ্য লাগছে। আলনায় টাঙানো শুকনো ধুতিগুলোর দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে বললে—তা ঘরে শুয়ে গেঙিয়ে গেঙিয়ে কাঁদছিলে কেন। কি অসুখ করেছে। মতিলাল জবাব দলে যে অসুখ তার করেনি। গান্ধারী যেন জবলে উঠলো—তবে ঘরে শুয়ে শুয়ে কাঁদছিলে কেন? গায়ের জোরে সুবিধে হল না তাই বুঝি মেয়ে মানুষের মত কাঁদো? লজ্জা করে না তোমার!

মতিলাল নিজের মেজাজ সামলালো—বেয়ান রাতে তুই কি আমার সাথে ঝগড়া করতে এলি। আমার ঘরে আমি যা খুশি করি না, তোর তাতে কি?

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে গান্ধারী জবাব দিলে—মরে যাই রে! আমার তাতে কি? দিবেরাত্তির আমার পিছনে—ঘাটের পথে আঁচল টেনে ধরো, বাড়ির পরে যেয়ে জুলুম করো ধান-পান যথাসর্বিস্যি খয়রাত করে সন্নিসী হ'তে চাও, ভাবো গেরামের লোকের চোখ নেই! দুখির ভাত সুখ করে খেয়ে এক কোণায় পড়ে আছি, তা এমন শত্তুরও তুমি হয়েছিলে মোড়োল!

মতিলালও ছেড়ে কথা কইলো না—কেন্ আমি তোর করেছি কি! শুধু শুধু ভালমানসের দুবিস্যনে গান্ধারী, ভগবান আছেন মাথার পরে!

গান্ধারী আজ শেষ করে ছাড়বে—শাপমান্যি কোরোনা মোড়োল, ভালো হবে না! আজ যদি আমার জোয়ান বাপ ভাই থাকতো তো পথেঘাটে যখন তখন আমারে অপমান্যির কথা বলতে পারতে, না সাহস হোতো!

মতিলাল একেবারে মরিয়া হয়ে উঠলো—ভালো আপদে পড়া গেল তোরে নিয়ে! ওরে, আমি তোরে বলেছি কি! দোষের মধ্যে বলেছি, দেখ গান্ধারী, আমার ঘরে কেউ নেই, আমারে বিয়ে কর। তোরও ভালো হক, আমারও ভাল হোক! তোর যদি বিয়ে বসার মন না থাকে তোর মনে যা চায় তাই কর, আমার মন যা চায় তাই করি! এর মধ্যে ঝগড়া করিস্ কেন্!

গান্ধারী খানিকক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। অবশেষে একেবারে পরি-বর্তিত গলায় বললে—ওকথা তুমি কখন বললে আমারে, ধর্ম্ম রেখে কথা বোলো মোড়োল!

মতিলাল বিস্মিত হয়ে বললে—কোন কথা? কোন কথা বলিনি তোরে?

গান্ধারী কোনো জবাব না দিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো।

কথার জবাব দে, ঐ দেখ পুব দিক ফরসা হয়ে আসে, রাত পোয়াতে দেরী নেই। চুপ করে থাকিস কেন! এতো বড়ো মেয়ে, সময় অসময় বুঝিস্নে! গান্ধারী তবুও চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। মতিলাল একেবারে গান্ধারীর কাছে সরে এলো—জোরে না বলিস্ আস্তে বল? আস্তে বললেই আমি শুনতে পাবো, বল?

গান্ধারী অত্যন্ত মৃদু স্বরে বললে—বিয়ে করার কথা তুমি কবে বললে!

মতিলাল বিস্ময়ে কথা হারিয়ে ফেললো আঃ আমার পোড়াকপাল! সে তোরে দিবে-রাত্তিরই বলি! তুই বুঝি মনে করে-ছিলি...! তা মনে হবারই কথা। যা ঘটে, মানুষে রটায় তার চারগুণ। যত নিমক-হারাম জুটেছে আমাদের গেরামে! ও কিরে! অমন করে কাঁপিস কেন্ গান্ধারী। মতিলালের হঠাৎ খেয়াল হতে গান্ধারীর কাপড়খানার একপাশ ছুঁয়েই বলে উঠলো—কী সব্বনেশে মেয়ে রে তুই, এতক্ষণ ভিজে কাপড়ে দাঁড়িয়ে আছিস! তারপর আলনা থেকে একখানা ধুতি কাপড় টেনে নিয়ে বললে—আজ এইখান পর, ছেরেবান মাসে যে দিন পাই, সেই দিনই তোরে হাটের শাড়ি পরায়ে ঘরে আনবো।

আলমারীটার আড়াল থেকে বেশ পরি-বর্তন করে গান্ধারী ফিরে এসে প্রদীপের সামনে দাঁড়ালো। শাদা কাপড় পরা, নিরা-ভরণ শ্যামবর্ণা মেয়ের দিকে তাকিয়ে

(শেষাংশ ৪৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বঙ্গের জাতীয় কবিতা ও সংগীত

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

(পূর্বানুবৃত্তি)

রবীন্দ্রনাথ ১৩১১ সাল ৪র্থ বর্ষ, জৈষ্ঠ, দ্বিতীয় সংখ্যায় সাময়িক প্রসঙ্গে বঙ্গ-বিভাগ সম্বন্ধে যে আলোচনা করিয়াছিলেন তাহা একান্তভাবে লক্ষ্য করিবার আছে। এবং সে সময়কার অনেক গানের সুরেও তাহা ফুটিয়া উঠিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ বলেন: "বঙ্গ-বিভাগ এবং শিক্ষাবিধি লইয়া আমাদের দেশে সম্প্রতি যে আন্দোলন হইয়া গেছে, তাহার মধ্যে একটি অপূর্বত্ব বিদেশী লোকেরাও লক্ষ্য করিয়াছে। সকলেই বলিতেছে, এবারকার বক্তৃতাদিতে রাজভক্তির ভরং নাই, সামলাইয়া কথা কহিবার প্রয়াস নাই, মনের কথা স্পষ্ট বলিবার একটা চেষ্টা দেখা গিয়াছে। তাছাড়া, একথাও কোনো কোনো ইংরেজি কাগজে দেখিয়াছি যে, রাজার কাছে দরবার করিয়া কোনো ফল নাই,— এমনতর নৈরাশ্যের ভাবও এই প্রথম প্রকাশ পাইয়াছে।"

সে সময়ে কবি বাঙালী জাতিকে যে কঠোর সত্য কথা শুনাইয়াছেন তাহা আজ প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পরেও সত্যরূপে প্রতিভাত হইতেছে। কবি বলিয়াছেন:

"পরের কাছে সুস্পষ্ট আঘাত পাইলে পরতন্ত্রতা শিথিল হইয়া নিজেদের মধ্যে ঐক্য সুদৃঢ় হয়। সংঘাত ব্যতীত বড় কোন জিনিষ গড়িয়া উঠে না। ইতিহাসে তাহার অনেক প্রমাণ আছে।

"কিন্তু আমরা আঘাত পাইয়া নিরাশ্বাস হইয়া কি করিলাম? বাহিরে তাড়া খাইয়া ঘরে কই আসিলাম? অবিরত সেই রাজ দরবারেই ছুটিতেছি। এ সম্বন্ধে আমাদের কি কর্তব্য, তাহার মীমাংসার জন্য নিজেদের চন্ডীমন্ডপে আসিয়া জুটিলাম না?

"দেশের প্রতি আমাদের কথা এই—আমরা আক্ষেপ করিব না, পরের কাছে বিলাপ করিয়া আমরা দুর্বল হইব না! কেন এই রুদ্ধদ্বারে মাথা খোঁড়াখুঁড়ি, কেন এই নৈরাশ্যের ক্রন্দন? মেঘ যদি জল বর্ষণ না করিয়া বিদ্যুৎ কশাঘাত করে, তবে সেই লইয়াই কি হাহাকার করিতে হইবে! আমাদের দ্বারের কাছে নদী বহিয়া যাইতেছে না? সে নদী শুষ্কপ্রায় হইলেও তাহা খুঁড়িয়া কিছু জল পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু চোখের জল খরচ করিয়া মেঘের জল আদায় করা যায় না।" কবির এই বাণীর গীতিরূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে নিম্নলিখিত সংগীতে। কবি গাহিয়াছেন:

মা কি তুই পরের দ্বারে পাঠাবি তোর
ঘরের ছেলে।
তা'রা যে করে হেলা, মারে ঢেলা,
ভিক্ষাঝুলি দেখতে পেলে।
করেছি মাথা নিচু, চলেছি যাহার পিছু
যদি বা দেয় সে কিছু অবহেলে—
তবু কি এমনি ক'রে, ফিরব ওরে,
আপন মায়ের প্রসাদ ফেলে।

* * * *

আমাদের আপন শক্তি, আপন ভক্তি,
চরণে তোর দেব মেলে।

আমরা যদি আপনার শক্তিতে বিশ্বাস করিয়া কর্মপথ স্থির করি, এবং দৃঢ়-বিশ্বাসে দাঁড়াইতে পারি তবে নৈরাশ্য কিরূপে আসিবে? ক্রন্দন নারীর পক্ষে শোভন—পুরুষের পক্ষে নয়। মানুষ যেখানে আপনাকে দুর্বল মনে করে, যেখানে চোখের জলই তার সম্বল হয়, যে শুধু কাঁদিতেই জানে—তাহার প্রতিকার করিতে পারে না, তাহার আশ্রয় কোথায়?

রবীন্দ্রনাথ তাই দৃঢ় কণ্ঠে দেশবাসীকে বলিলেন:

ছি ছি চোখের জলে ভেজাসনে আর মাটি।
এবার কঠিন হয়ে থাক্‌না ওরে
বক্ষ-দুয়ার আঁটি—
জোরে বক্ষ-দুয়ার আঁটি॥

* * * *

দেখলে ও তোর জলের ধারা
ঘরে বারে হাসবে যারা,
তা'রা চারিদিকে—
তাদের দ্বারেই গিয়ে কান্না জুড়িস,
যায় না কি বুক ফাটি'—
লাজে যায় না কি বুক ফাটি॥
দিনের বেলায় জগৎ-মাঝে সবাই যখন
চলছে কেজে,
আপন গরবে—
তোরা পথের ধারে কথা নিয়ে
কেবল করিস ঘাঁটাঘাটি—
করিস ঘাঁটাঘাটি॥

কবি স্বদেশী যুগে সারা বাঙলা দেশের প্রাণে বাঙালীর হৃদয়ে এক মহা আশ্বাসের বাণী প্রচার করিয়াছিলেন। তিনি বাঙালীকে সঙ্কল্পে দৃঢ় এবং নিরানন্দ ও নিরাশ্বাসের হাত হইতে দূরে থাকিতে বলিয়াছেন। সাহসে বুক বাঁধিতে আহ্বান করিয়াছেন।

বুক বেঁধে তুই দাঁড়া দেখি,
বারে বারে হেলিসনে ভাই।
শুধু তুই ভেবে ভেবেই
হাতের লক্ষ্মী ঠেলিসনে, ভাই॥

রবীন্দ্রনাথ নির্ভীকভাবে স্বদেশীযুগে বলিয়াছিলেন:—"বৃটিশ গভর্নমেন্ট নানাবিধ অনুগ্রহের দ্বারা লালিত করিয়া কোনো মতেই আমাদিগকে মানুষ করিতে পারিবেন না, ইহা নিঃসন্দেহ—অনুগ্রহভিক্ষুদিগকে যখন পদে পদে হতাশ করিয়া তাঁহাদের দ্বার হইতে দূর করিয়া দিবেন, তখনই আমাদের নিজের ভাণ্ডারে কি আছে, তাহা আবিষ্কার করিবার অবসর হইবে, আমাদের নিজের শক্তি দ্বারা কি সাধ্য তাহা জানিবার সময় হইবে, আমাদের নিজের পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত, তাহা বিশ্বগুরু বুঝাইয়া দিবেন। যাচিয়া মান, কাঁদিয়া সোহাগ যখন কিছুতেই জুটিবে না, বাহির হইতে সুবিধা এবং সম্মান যখন ভিক্ষা করিয়া দরখাস্ত করিয়া অতি অনায়াসে মিলিবে না—তখন ঘরের মধ্যে যে চিরসহিষ্ণু প্রেম লক্ষ্মীছাড়াদের গৃহ প্রত্যাবর্তনের জন্য গোধূলির অন্ধকারে পথ তাকাইয়া আছে, তাহার মূল্য বুঝিব —তখন মাতৃভাষায় ভ্রাতৃগণের সহিত সুখ-দুঃখ-লাভ-ক্ষতি আলোচনার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিতে পারিব, প্রোভিনশাল কনফারেন্সে দেশের লোকের কাছে বিদেশের ভাষায় দুর্বোধ বক্তৃতা করিয়া আপনাদিগকে কৃতকৃত্য জ্ঞান করিব না—এবং সেই শুভদিন যখন আসিবে, ইংরাজ যখন ঘাড়ে ধরিয়া আমাদিগকে আমাদের নিজের ঘরের দিকে, নিজের চেষ্টার দিকে জোর করিয়া ফিরাইয়া দিতে পারিবে, তখন ব্রিটিশ গভর্নমেন্টকে বলিব ধন্য—তখনি অনুভব করিব, বিদেশীর এই রাজত্ব বিধাতারই মঙ্গল বিধান। হে রাজন, আমাদিগকে যাহা যাচিত ও অযাচিত দান করিয়াছ, তাহা একে একে ফিরাইয়া লও, আমাদিগকে অর্জন করিতে দাও! আমরা প্রশ্রয় চাহি না, প্রতিকূলতার দ্বারাই আমাদের শক্তির উদ্বোধন হইবে! আমাদের নিদ্রার সহায়তা করিও না, আরাম আমাদের জন্য নহে, পরবশতার অহিফেনের মাত্রা প্রতিদিন আর বাড়িতে দিয়ো না—তোমাদের রুদ্রমূর্তিই আমাদের পরিত্রাণ! জগতে জড়কে সচেতন করিয়া তুলিবার একমাত্র উপায় আছে;— আঘাত, অপমান ও একান্ত অভাব, সমাদর নহে, সহায়তা নহে, সুভিক্ষ নহে!"

রবীন্দ্রনাথ স্বদেশীযুগে বঙ্গবিভাগকালে বাঙালীকে যে মন্ত্র দিয়াছিলেন—তা

অমোঘবাণী, আশা ও মন্ত্র উদ্দীপিত করিয়াছিলেন তাহা হইতেছে এই ঃ—

চলো যাই চলো যাই চলো যাই
চলো পদে পদে সত্যের ছন্দে,
চলো দুর্জয় প্রাণের আনন্দে॥
চলো মুক্তি পথে
চলো বিঘ্নবিপদজয়ী মনোরথে
করো ছিন্ন, করো ছিন্ন,
স্বপ্ন কুহক করো ছিন্ন।
থেকো না জড়িত অবরুদ্ধ
জড়তার জর্জর বন্ধে।
বলো জয়, বলো জয়, বলো জয়
মুক্তির জয় বলো ভাই॥

* * * *

দূর কর সংশয় শঙ্কার ভার
যাও চলি' তিমির দিগন্তের পার,
কেন যায় দিন হায় দুশ্চিন্তার দ্বন্দ্বে
চলো দুর্জয় প্রাণের আনন্দে।

* * * *

হও মৃত্যু তোরণ উত্তীর্ণ,
যাক্ যাক্ ভেঙে যাক যাহা জীর্ণ
চলো অভয় অমৃতময় লোকে
অজর অশোকে,
বলো জয়, বলো জয়, বলো জয়
অমৃতের জয় বলো ভাই।

রবীন্দ্রনাথ দেশবাসীকে বহুবারই কর্মের পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার সেই আহ্বান বাণী বারবারই ব্যর্থ হইয়াছে। দেশ তাহা গ্রহণ করে নাই। কোন কাজ কোন উচ্চ আকাঙ্ক্ষাকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়িয়া ধরিয়া রাখিবার ক্ষমতা বাঙালীর নাই।

বঙ্গ-বিভাগ যেমন অনুরূপ বিভিন্ন বিভাগের মধ্য দিয়া সম্মিলিত হইল, পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গ আবার যুক্ত-বঙ্গরূপে মিলিত হইল—তখন ধীরে ধীরে আবার সমুদয় থামিয়া গেল। তখন কবি বড় মর্ম দুঃখে গাহিলেনঃ—

যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক,
আমি তোমায় ছাড়ব না, মা।
আমি তোমার চরণ করব শরণ,
আর কারো ধার ধারব না, মা।

তিনি জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সেই পণ রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। কবি জাতীয় সংগীত বা স্বদেশের সেবায় শুধু বাঙলা দেশ নয়, সমগ্র ভারতবাসীর প্রাণে যে প্রেরণা, যে কল্যাণ-মন্ত্র, যে সত্য ও অমৃতের পথ দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহা চিরন্তন সত্যরূপে ঋষির মুক্তবাণী ও মন্ত্ররূপে দেশবাসীকে যুগে যুগে শতাব্দীর পর শতাব্দী পুণ্য পথ প্রদর্শন করিবে। কে ভুলিতে পারিবে তাঁহার সুমধুর সংগীত—"সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে!" কে বিস্মৃত হইবে—

আমরা পথে পথে যাব সারে সারে,
তোমার নাম গেয়ে ফিরিব দ্বারে দ্বারে।
বলব, 'জননীকে কে দিবি দান,
কে দিবি ধন তোরা, কে দিবি প্রাণ'—
তোদের মা ডেকেছে, কব বারে বারে॥

কেবল বিদেশী পণ্য বর্জন প্রতিজ্ঞা করিলেই সুফল ফলে না; রবীন্দ্রনাথ স্বদেশী দ্রব্য যথেষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন করিবার জন্য দেশবাসীকে আহ্বান করিয়াছেন। চাষের উন্নতি, পল্লীর উন্নতি, শিল্প ও কৃষির প্রচার ও বৈজ্ঞানিকভাবে উন্নতির জন্য আকাঙ্ক্ষিত ছিলেন এবং সেদিকে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন এবং কবিরূপে শুধু নয়, কর্মীরূপেও অগ্রসর হইয়াছিলেন। তিনি শুধু কবি ছিলেন না—কর্মী ছিলেন এবং গঠনমূলক কার্যেও ছিল তাঁহার অসাধারণ শ্রম, যত্ন, দূরদৃষ্টি ও অধ্যবসায়। এই প্রেরণা ছিল বলিয়াই শ্রীনিকেতন ও বিশ্বভারতী আজ পৃথিবীর আদর্শ প্রতিষ্ঠানরূপে প্রখ্যাত হইয়াছে। তিনি অলস, অবশ ও দুর্বল প্রকৃতির লোককে দেশসেবায় চাহেন নাই। তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া গাহিয়াছিলেন ঃ

যদি তোর ভাবনা থাকে, ফিরে যা না।
তবে তুই ফিরে যা না।
যদি তোর ভয় থাকে ত করি মানা!

যাঁহারা সেই যুগে একবার হুজুগে মাতিয়া আবার ফিরিয়া গিয়াছেন, কবি তাঁহাদিগকে বলিয়াছেন ঃ —

বারেক এদিক বারেক ওদিক
এখেলা আর খেলিস নে ভাই।
মেলে কি না মেলে রতন,
করতে হবে তবু যতন,
না হয় যদি মনের মতন,
চোখের জলটা ফেলিসনে, ভাই॥

দেশবাসীকে উদ্দেশ করিয়া রুদ্রবীণার তারে ঝঙ্কার দিয়া গাহিয়াছিলেন ঃ

শুভ কর্মপথে ধর নির্ভয় গান
সব দুর্বল সংশয় হোক অবসান।
চির শক্তির নির্ঝর নিত্য ঝরে
লও সেই অভিষেক ললাট পরে।

* * * *

জড়তা তামস হও উত্তীর্ণ,
ক্লান্তি জাল কর বিদীর্ণ,
দিন অন্তে অপরাজিত চিত্তে
মৃত্যু-তরণ তীর্থে কর স্নান।

হুগলী শহরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতির সভাপতি স্বর্গত বৈকুণ্ঠনাথ সেন মহাশয় তাঁহার অভিভাষণে "বয়কট" কথাটি পরিহার করিবার প্রস্তাব করেন। তিনি বিদেশী দ্রব্য বর্জন করিতে বলেন নাই। বৈকুণ্ঠবাবুর মতে, "ইংরেজ যখন উহাতে বিদ্বেষের কারণ দেখিতে পায়, তখন উহা পরিহার করিলে দোষ কি?" কবি ঐ সময়ের কিছু পূর্বে গাহিয়াছিলেন ঃ

ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে
ততই বাঁধন টুটবে
মোদের ততই বাঁধন টুটবে।
ওদের যতই আঁখি রক্ত হবে
মোদের আঁখি ফুটবে,
ততই মোদের আঁখি ফুটবে।

আবার শুনিতে পাইলাম ঃ

বিধির বাঁধন কাটবে
তুমি এমন শক্তিমান্,
তুমি কি এমনি শক্তিমান্।
আমাদের ভাঙাগড়া তোমার হাতে
এমন অভিমান,
তোমাদের এমনি অভিমান।

হুগলীর প্রাদেশিক সম্মেলনে স্বদেশীর স্বপক্ষে একটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল। কিন্তু সে সময়ে স্বদেশী প্রচেষ্টার অনুকূলে কলিকাতা শহরে নূতন করিয়া কোনও ধীরপন্থী বা চরমপন্থী নেতা আন্দোলনে প্রবৃত্ত হন নাই। এক সময়ে সরকার লিখিতে বাধ্য হইয়াছিলেন ঃ

* * * the Swadeshi and boycott movements were vigorously hushed তাহা ঐ সময়ে ১৩১৬ বঙ্গাব্দ এবং ইংরেজী ১৯০৯ খৃষ্টাব্দেই হ্রাস পাইতে আরম্ভ হয়। লর্ড মর্লি সে সময় বলিয়াছিলেন, বঙ্গচ্ছেদের আন্দোলন এখন নির্বাণোন্মুখ অগ্নিশিখার মত।

বয়কট শব্দটির ইতিহাস এখানে প্রসঙ্গক্রমে বলিতেছি—বয়কট শব্দ অর্থে বর্জন। (ইংরেজীতে যাহার অর্থ হইতেছে to shun or isolate). ক্যাপ্টেন চার্লস বয়কট (Captain Charles Boycott) নামে একজন কৃষকের নাম হইতে বয়কট শব্দের প্রচলন হইয়াছে। চার্লস বয়কট ছিলেন লাউ মাস্ক (Lough Mask) নামক স্থানে লর্ড আর্নের (Lord Erne) স্টেট বা জমিদারীর এজেন্ট বা কর্মকর্তা। ইহার অন্যায় উৎপীড়নে সেখানকার মজুরেরা ক্ষেপিয়া উঠে এবং বয়কটের বাড়িঘর ভাঙিয়া ফেলে, তাহার গরু-বাছুর সব তাড়াইয়া দেয় এবং বয়কটের অবস্থা এমন শোচনীয় হইয়া পড়ে যে, সেখানকার কোন দোকানদার তাহার নিকট কোনও খাদ্যদ্রব্যাদি পর্যন্ত বেচিত না।

দেশের একদল মজুরকে দিয়া শেষবার ক্যাপ্টেন বয়কটের চাষ-বাসের ব্যবস্থা করিতে হইয়াছিল, সেও বড় সহজে হয় নাই। সৈন্যদের সাহায্য লইয়া এবং কামান দাগিবার ভয় দেখাইয়া কাজ করাইতে হইয়াছিল—ঐসব মজুরদের বলিত Emergency Men. বয়কট যখন সপরিবারে ডাবলিনে আসিলেন, তখন কোন হোটেলওয়ালা তাঁহাকে যায়গা দেয় নাই। শেষটায় ক্যাপ্টেন বয়কট লণ্ডন ও আমেরিকায় যাতায়াত করেন। এদিকে কয়েক বৎসর পরে তাঁহার বিরুদ্ধে দেশের লোকের

যে একটা বিদ্রোহ ভাব ছিল, তাহা হ্রাস পায়। তখন লণ্ডন নগরী তাঁহার কর্মক্ষেত্র হইলেও বয়কট প্রতি বৎসর অবকাশ কালটা আয়র্লাণ্ডে কাটাইয়া আসিতেন। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে বয়কট শব্দটা সাধারণের মধ্যে ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হয়।

(The word boycott came into general use in 1880.)

বয়কট শব্দের ব্যবহার খুব বেশী দিনের না হইলেও বয়কট শব্দ যে অর্থে প্রযুক্ত হয়, অর্থাৎ বর্জন অর্থে—ইহার প্রচলন অনেক প্রাচীন কাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে। বাইবেলেও আমরা ইহার নিদর্শন পাই।

(Revelation XIII, 16—17, Revised Version) of a powerful dictator who "causeth ..... that no man shall be able to buy or to sell, save he that hath the mark, even the name of the beast or the number of his name"

জার্মানিতে ইহুদীদের বিরুদ্ধে Boycotting অত্যন্ত তীব্রভাবে চলিয়াছিল, সে কথা সকলেই জানেন। Captain Charles Boycott-এর নাম হইতে উৎপন্ন বয়কট শব্দ বর্জন অর্থে এখন পৃথিবীর নানা দেশেই ব্যবহৃত হইতেছে।

[Every Bodies Enquire within, Vol. II, Page 1029.]

বয়কট শব্দ বাঙলা দেশেও স্বদেশী যুগ হইতে চলিয়া আসিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ যখন সহসা স্বদেশী যুগের সর্ববিধ কর্মক্ষেত্র হইতে সরিয়া যাইয়া তপোবনের নিভৃত নিকেতন—শান্তি-নিকেতনেই আপনার কর্মক্ষেত্র করিলেন, তখন তাঁহার ধ্যানী চিত্ত সন্ধান পাইল—হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, ব্রাহ্মণ সকলেরই অধ্যুষিত বিরাট ভারতবর্ষ। যে মহামানবের পুণ্যতীর্থ ভারতে—যে দেবতার মন্দিরের দ্বার "কোন জাতির কাছে, কোন ব্যক্তির কাছে কোনদিন অবরুদ্ধ হয় না—যিনি কেবলই হিন্দুর দেবতা নন, যিনি ভারত-বর্ষের দেবতা।"

তখন কবির কণ্ঠে শুনিলাম অভয়বাণী—

পতন অভ্যুদয় বন্ধুর পন্থা,
যুগ যুগ ধাবিতযাত্রী,
তুমি চির সারথি তব রথচক্রে
মুখরিত পথ দিন রাত্রি।
দারুণ বিপ্লব মাঝে তব শঙ্খধ্বনি বাজে
সঙ্কট দুঃখ-ত্রাতা।
জনগণ-পথ পরিচায়ক জয় হে
ভারত-ভাগ্য বিধাতা।
জয় হে, জয় হে, জয় হে,
জয়, জয়, জয়, জয় হে!

তখনই আবার শুনিতে পাইলাম:

দেশ দেশ নন্দিত করি মন্দ্রিত তব ভেরী,
আসিল যত বীরবৃন্দ আসন তব ঘেরি।

দিন আগত ঐ
ভারত তবু কই
সে কি রহিল লুপ্ত আজি সব জন পশ্চাতে
লউক বিশ্বকর্মভার মিলি সবার সাথে।

এই আশ্বাস বাক্যে কবি দেশবাসীকে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বিশ্বজগতে ভারতের গৌরবময় প্রতিষ্ঠার জন্য দেশবাসীকে আহ্বান করিয়া গিয়াছেন। একদিন কবির বাণী — ঋষির বাণী, তাঁহার ধ্যানকে সাফল্যমণ্ডিত করিবে, আমরা সেই আশা অন্তরে পোষণ করি। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'স্বদেশ' নামক গ্রন্থে এবং 'স্বদেশ' শীর্ষক গীত-সংগ্রহে তাঁহার বিরচিত অমূল্য সংগীতগুলি সংকলন করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন; সেই সব সংগীত আলোচনা করিলে কবির বিভিন্ন সময়ে স্বদেশের প্রতি যে মনোভাব ছিল, তাহা পূর্ণভাবে বুঝিতে পারা যায়। এক কথায়—বিভেদ ভুলিয়া এক বিরাট হিয়া সর্বত্র ভারতবাসীর একই মন একই ভাষা, একই ভাব ও ধর্ম দ্বারা ঐক্যের সাধনাই ছিল তাঁহার জীবন-পণ-পল্লীর শিক্ষা, পল্লীর সংস্কার সাধনই ছিল তাঁহার জীবনের অন্যতম সাধনা—মানুষের মর্মন্তুদ বেদনা তাঁহাকে বিচলিত বিক্ষুব্ধ এবং মর্মপীড়িত করিয়াছিল। তাই গাহিয়া গিয়াছেন:

দেখিতে পাওনা তুমি
মৃত্যুদূত দাঁড়ায়েছে দ্বারে,
অভিশাপ আঁকি দিল
তোমার জাতির অহংকারে।
সবারে না যদি ডাকো,
এখনো সরিয়া থাক,
আপনারে বেঁধে রাখ
চৌদিকে জড়ায়ে অভিমান,
মৃত্যু মাঝে হবে তবে
চিতাভস্মে সবার সমান।

রবীন্দ্রনাথ সমসাময়িক কবি ও স্বদেশী যুগ দ্বিজেন্দ্রলাল

রবীন্দ্রনাথের সমকালে যাঁহাদের কবি-প্রতিভার দ্বারা বাঙলার সাহিত্য সমুজ্জ্বল হইয়াছিল, দেশবাসী স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল, তাঁহাদের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় বা সেকালে সর্বজন পরিচিত ডি এল রায় ছিলেন সুপ্রসিদ্ধ। দ্বিজেন্দ্রলাল ১২৭০ বঙ্গাব্দে এবং ইংরেজি ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণনগরে জন্মগ্রহণ করেন। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের পিতা কার্তিকেয়চন্দ্র রায় কৃষ্ণ-নগরের রাজা সতীশচন্দ্র রায়ের দেওয়ান ছিলেন। ইঁহারা বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ। দ্বিজেন্দ্রলালেরা ছিলেন সাত ভাই আর দ্বিজেন্দ্র ছিলেন মাতাপিতার কনিষ্ঠ পুত্র। দ্বিজেন্দ্রলালের জননী প্রসন্নময়ী দেবী ছিলেন নবদ্বীপের অদ্বৈত মহাপ্রভুর বংশের কন্যা। দ্বিজেন্দ্রলালের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারা সকলেই খ্যাতিমান ও বিদ্বান ছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলালও চরিত্রবান ও জিতেন্দ্রিয় মহাপুরুষ ও কর্তব্যনিষ্ঠা-পরায়ণা তেজস্বিনী জননীর সন্তান। পিতা ও মাতার বিবিধ গুণরাশি তাঁহার চরিত্রে বিকশিত হইয়াছিল।

স্বদেশী আন্দোলনের সময় দ্বিজেন্দ্র-লালের স্বাভাবিক দেশভক্তি সহস্র গুণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। সাময়িক উত্তেজনার প্রভাববশত যে আন্তরিকতা প্রথমত প্রকাশ পাইয়াছিল, ক্রমে তাহার মধ্যে দেখা দিল অনেক অনর্থক বাক্‌বিতণ্ডা, অর্থের অপব্যয়, সময় ও পরিশ্রমণের অনাবশ্যক-রূপে অপব্যবহার এবং স্বার্থপরায়ণতা। দ্বিজেন্দ্রলাল সেই শ্রেণীর স্বদেশপ্রেমিক কবি ছিলেন না। স্বদেশীর মূলমন্ত্র কি, তিনি তাহা দেশবাসীকে বুঝাইবার জন্য তাহাদের অন্তর মধ্যে স্বদেশী আন্দোলন দৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল রাখিবার জন্য কি নাটক, কি কবিতা সকলের মধ্যেই তিনি দৃঢ়কণ্ঠে আহ্বান করিয়াছিলেন — 'আবার তোরা মানুষ হ।'

দ্বিজেন্দ্রলালের সাহিত্য সাধনার মূল-মন্ত্র দেশ-জননীর সেবা। দ্বিজেন্দ্রলাল তরুণ বয়সে 'আর্যগাথা' নামক সংগীত-পুস্তিকা প্রকাশ করেন। তাহার ভূমিকায় লিখিয়াছিলেন—"যাহারা একমাত্র মনুষ্য-প্রেমগীতকেই গীত মনে করেন, "আর্য-গাথা" তাঁহাদিগের জন্য রচিত হয় নাই এবং তাঁহাদের আদর প্রত্যাশা করে না ** যদি কাহারও অধঃপতিতা হতভাগিনী দুঃখিনী মাতৃভূমির জন্য নেত্রপ্রান্ত কখনও সিক্ত হইয়া থাকে, 'আর্যগাথা' তাঁহাদেরই আদর চাহে।" দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁহার ১২ বৎসর হইতে ১৭ বৎসর পর্যন্ত গীত-গুলিই 'আর্যগাথা' নামে প্রকাশিত করেন।

বিলাতে অবস্থানকালে দ্বিজেন্দ্রলালের "Lyrics of Ind" প্রকাশিত হয়। এ বিষয়ে বন্ধুবর অধ্যাপক কৃষ্ণবিহারী গুপ্ত লিখিয়াছেন—"সুদূর প্রবাসেও মাতৃভূমির জন্য যে তাঁহার হৃদয় দুঃখ ও বেদনায় আকুল হইত, তাহা এই পুস্তকের প্রথম কবিতা "The Land of the Sun" হইতে আমরা দেখিতে পাই। কবি ভারত-মাতার এক অতি গৌরবোজ্জ্বল বর্ণনা দিয়া শেষে যাহা বলিতেছেন, আমরা তাহার অনুবাদ দিলাম—

O my land! can I cease to adore thee,
Though to gloom and misery hurled?
O dear Bharat! my beautiful maiden
O sweet Ind; Once the Queen of the world.

যদিও জীবন দুঃখের মাঝে
নিপীড়িতা আজি তুমি

তথাপি কি অবহেলিতে তোমারে
পারি গো জনমভূমি ?
তুমি যে একদা, হে মোর ভারত,
আছিলে জগতরাণী,
ওগো সুন্দরী ভারত আমার
প্রিয় নিকেতনখানি।

And though wrecked is thy pride and thy glory,
Of it nothing remains but the name:
Yet a beauty and sunshine still lingers,
And yet gleams through the mid of thy shame.

যদিও সে তব গৌরব যশ
সকলি পেয়েছে লয়,
কিছু নাই আর এখন তাহার
নামটুকু শুধু রয়,
তবুও সে তব লাজ কুহেলিকা
ভেদিয়া দেখি যে আসে,
কি-এক সুষমা—রবির কিরণ,
এখনও নয়নে ভাসে।*

দ্বিজেন্দ্রলালের দেশাত্মবোধের মধ্যে ছিল অকপটতা। দ্বিজেন্দ্রলালের দেশভক্তি সম্পর্কে তাঁহার জীবনচরিতকার স্বর্গত সুহৃদ্বর দেবকুমার রায় চৌধুরী লিখিয়াছেন—"দ্বিজেন্দ্রলালের দেশভক্তি বা দেশাত্মবোধের ভিত্তি ছিল—সর্বজনীন দয়া, মৈত্রী ও মঙ্গলেচ্ছায়। এ দেশভক্তির পরম পরিণতি কেবল স্বদেশ ও স্বজাতির নহে,—দেশ-কাল-পাত্র নির্বিচারে এই সমগ্র বিশ্বেরই চিরন্তন ও নিরবচ্ছিন্ন শুভেচ্ছায়! এই কারণে সে দেশাত্মবোধ কখনও কোন জাতি বা দেশের প্রতি তিলার্ধও বিদ্বেষ বা ঘৃণার উদ্রেক করে না। তাহা অতি নিবিড়রূপে বিশ্ব-প্রেমের সঙ্গে সর্বথাই সমসূত্রে গ্রথিত এবং তাহার চরম উদ্দেশ্য বা মুখ্য লক্ষ্য শুধু ভারতোদ্ধার নহে—এ বিশ্বরাজ্যে সেই বিশ্বেশ্বরের, মঙ্গলময় পরমেশ্বর, 'সত্য-শিব-সুন্দরের' ধ্রুব ও চিরন্তন, অনির্বাণ প্রতিষ্ঠা।"

" × × দেশের হিতানুষ্ঠানে তিনি প্রাণপাত করিয়াছেন মানি; কিন্তু দেশকে ভালবাসিলেই যে ইংরেজ জাতির প্রতি বীতরাগ ও অন্ধভাবে বিদ্বিষ্ট হইতে হইবে, তদীয় বাক্যে, কর্মে বা চিন্তায়—এরূপ মতের তিনি তিলার্ধও পোষকতা করিয়া যান নাই। × × দেশবাসী যাহাতে পরানুগ্রহের জন্য লালায়িত না রহিয়া ক্রমে এখন 'আপন পায়ে' আপনারা ভর করিয়া দাঁড়াইতে শেখে, স্বজাতি ও মাতৃভূমির সর্ববিধ শুভসাধনে আত্মোন্নতি বিধানে তাহারা যাহাতে একান্ত মনে অবহিত হয়, এজন্য তিনি নিত্য নিয়ত স্বতঃপরত নিতান্তই চিন্তান্বিত ও যত্নবান ছিলেন এবং সত্য বলিতে কি, ঠিক সেইজন্য যতদিন আমরা স্বরাজ্য লাভে যোগ্য ও সমর্থ না হই, ততদিনের জন্য তিনি এই ব্রিটিশ রাজত্বের উন্নতি ও স্থায়িত্ব সর্বান্তঃকরণে কামনা করিতেন। ইংরেজের আগমন যে এ-দেশে আমাদের এই বহুবিধ উন্নতির মূল, আর এই উদারনৈতিক রাজত্বের উপরে যে আপাততঃ আমাদের যা কিছু মঙ্গল, যত কিছু উন্নতি, এমন কি প্রত্যুত আমাদের জাতীয় জীবন-মরণও একরূপ নির্ভর করিতেছে, ইহাই তাঁহার অকপট ধারণা বা বদ্ধমূল বিশ্বাস ছিল। এই বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়া সেই স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে অত উদ্দাম উত্তেজনার মধ্যেও আমরা দেখিয়াছি — তিনি ঐ বৈরবুদ্ধিসঞ্জাত বিদেশী বহিষ্কারে বা 'বয়কটের' বিপক্ষে অমন তীব্র অভিমত প্রচার করিয়া তাঁহার একান্ত অনুরাগী ও পরম গুণগ্রাহীদের কাছেও তৎকালে যথেষ্ট লাঞ্ছিত ও অপদস্থ হইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কোন কোন দুর্মতি ও কূটনৈতিক রাজকর্মচারীর অন্যায় আচরণ, অন্যায় উৎপীড়ন বা 'খামখেয়ালি' অত্যাচারের দরুণ সময়ে সময়ে তিনি গভর্নমেন্টের প্রতি খুবই বিরাগ ও অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন জানি; কিন্তু তজ্জন্য তিনি সেই সব শাসকদিগকেই শুধু দোষী সাব্যস্ত করিয়া ব্যক্তিগতভাবে তাঁহাদের উপর রুষ্ট হইয়াছেন। আসলে ব্রিটিশ রাজত্বকে তজ্জন্য তিনি দায়ী করেন নাই, তাহার প্রতি বিরক্ত বা বীতশ্রদ্ধও হন নাই। স্বদেশীর সময়ে একবার এক পত্রে তিনি আমাকে অন্যান্য অনেক কথার পর লিখিয়াছিলেন, "আজ যদি ধর, ইংরেজ-রাজ এ-দেশ ছাড়িয়া চলিয়াই যায়, তা' হলে আমাদের যে কী ভয়াবহ ও শোচনীয় অবস্থা দাঁড়াইবে, আমি তা' কল্পনা করতেও শিউরে উঠি। শ্যাল-কুকুরের অবস্থাও সেদিন আমাদের দুর্দশার কাছে বোধ হয় হার মানবে।"

তাঁহার এ ধারণা সত্য হউক আর ভ্রান্তই হউক,যাহা আমি জানি, যথাযথভাবে সে সকল সত্যকথা আমাকে ব্যক্ত করিতেই হইবে। × × তিনি চাহিতেন—ইংরেজই এখন আরও কিছুকাল আমাদের উপরে রাজত্ব করুক, প্রভুত্ব করুক, শাসনকর্তা থাকুক, তবে সে রাজ্য যেন আমাদের অভিপ্রায় ও সুবিধানুসারে সর্বতোভাবে আমাদের নিরবচ্ছিন্ন কল্যাণকল্পেই নিয়োজিত হয়: উদ্বেগ, অসন্তোষ ও ভয়ের পরিবর্তে এ রাজ্যে অচল-অটুট ভিত্তি যেন আমাদের শান্তি, শুভেচ্ছা ও প্রীতির উপরেই দৃঢ়প্রতিষ্ঠ রহিয়া আমাদিগকে পরিণামে যোগ্য ও সম্পূর্ণ স্বাধীন করিয়া তুলিতে সমর্থ হয়। বলা বাহুল্য, অবিমিশ্র, অবাধ স্বাধীনতাই অবশ্য তাঁহার দেশাত্মবোধ বা জাতীয়তার চরম কাম্য ছিল এবং স্বাধীনতা যে মানব মাত্রেরই জন্মস্বত্ব, তিনি বিশেষভাবেই তাহা বারংবার বুঝিতেন ও বলিতেন।"*

দ্বিজেন্দ্রলালের দেশাত্মবোধ কিরূপ ছিল, কি তাঁহার আদর্শ ছিল, তাহা আমরা দেবকুমার বাবুর লিখিত জীবনী হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছি। আমাদের দেশে বঙ্গ-বিভাগ হইলে কলিকাতা টাউন হলে যে এক মহাসভার অধিবেশন হইয়াছিল, তাহাতে সুরেন্দ্রনাথ বঙ্গচ্ছেদ আইন প্রশমিত না হওয়া পর্যন্ত 'বয়কট' বা বিদেশী পণ্য বর্জন প্রস্তাবটি পরিগ্রহ করিবার জন্য দেশবাসীকে প্রবুদ্ধ করেন। বিপিনচন্দ্র পাল প্রভৃতি ঐরূপ প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, "সাময়িক বিদ্বেষবুদ্ধি পরিচালিত হইয়া 'বয়কটের' ভিত্তির উপর যদি স্বদেশী আন্দোলনকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়, তবে দেখা যাইবে যে, কালে এ সঙ্কল্প কিছুতেই চিরস্থায়িত্ব লাভ করিতে সমর্থ হইবে না।" বিপিনচন্দ্রের এ প্রতিবাদ গৃহীত হইল না। সুরেন্দ্রনাথের প্রস্তাব সকলে পরিগ্রহ করিলেন।

দ্বিজেন্দ্রলাল এই বয়কট প্রস্তাবের বিরোধী ছিলেন। তাঁহার ঐ বিষয়ের মন্তব্য দেবকুমার বাবুকে একখানি পত্রে লিখিয়াছিলেন—"এখানে এখন প্রত্যেক দিন দু'টি বেলাই আমার সঙ্গে বন্ধুদের ভীষণ তর্কযুদ্ধ হয় যে, যেভাবে এই স্বদেশী আরম্ভ হইল, তা বাস্তবিক আমাদের দেশে স্থায়ী ও মঙ্গলজনক হবে কি না। সকলেই আমার বিপক্ষে, আমি একা। কিন্তু 'একা লব সমকক্ষ শত সেনানীর।' আমি বলি, এই বিদ্বেষমূলক বয়কটের দ্বারা আমাদের পরিণামে সর্বনাশ হবে, ইহাতে আমাদের স্থায়ী কল্যাণ কোনমতেই সম্ভব নয়। এ-দেশ যদি আজ পর-প্রসঙ্গ ও বিজাতির বিদ্বেষ ভুলিয়া প্রকৃত আত্মোন্নতি—নিজেদের কল্যাণসাধনে তৎপর হয়, তবে এমন কোন শক্তি নাই যে, তাহার সে বলদৃপ্ত গতি রোধ করিতে পারে। কিন্তু অযথা এ আস্ফালন ও যাহারা আমাদের শিক্ষা-গুরু, যাহাদের কৃপায় ও ইচ্ছায় আমাদের এই যা কিছু উন্নতি সম্ভবপর হইয়াছে তাহাদের প্রতি আমাদের এরকম বিদ্বেষ যতদিন সম্যক তিরোহিত না হইবে, ততদিন আমাদের প্রকৃত উদ্ধারের সহজ কোন উপায় আমি দেখি না।" [দ্বিজেন্দ্রলাল ৩৯২—৯৩ পৃষ্ঠা]

দ্বিজেন্দ্রলালের চরিত্রে এমন একটা দৃঢ়তা ছিল—যে দৃঢ়তার দ্বারা তিনি আপনার সুচিন্তিত মত হইতে বিচলিত

(শেষাংশ ৪৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

* দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের স্মৃতিতর্পণ শ্রীকৃষ্ণগুপ্ত এম এ, প্রবাসী জ্যৈষ্ঠ—১৩২৪।

* দ্বিজেন্দ্রলাল—দেবকুমার রায় চৌধুরী —৩৯১—৩৯২ পৃঃ।

পৃথিবীর বৃহত্তম দূরবীক্ষণ যন্ত্র

কৃত্তিকা

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রশান্ত মহাসাগর তীরস্থ ক্যালিফোর্ণিয়া প্রদেশের মাউন্ট পালোমার (Mt. Palomar) মানমন্দিরে যে বৃহত্তম দূরবীক্ষণ যন্ত্রের (telescope) নির্মাণ কার্য্য চলছে তা একদিন বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের রহস্য উদ্ঘাটনে মানুষকে অধিকতর সহযোগিতা করবে বলে বৈজ্ঞানিকগণ অভিমত প্রকাশ করছেন। মাউন্ট পালোমার (Mt. Palomar) উচ্চতায় ৫,৫৯৮ ফুট। এখানের শান্ত আবহাওয়া গবেষণা কার্যে বিশেষ বাধার সৃষ্টি করবে না। মানমন্দিরটির উচ্চতাই ১৩৭ ফুট। মানমন্দিরের উপরিভাগে অর্ধগোলাকৃতি গম্বুজ আছে। উপরি-ভাগের এই গম্বুজটিকে ঘোরান যায়। ফলে গম্বুজস্থিত উন্মুক্ত স্থানটি ইচ্ছামত আয়ত্তে আনা যায়। গম্বুজের উন্মুক্ত স্থানটির বিস্তৃতি হচ্ছে ৩৭ ফুট। এই উন্মুক্ত স্থানটিকে বন্ধ করবারও আয়োজন আছে। দূরবীক্ষণ যন্ত্রটির ওজন ৫০০ টন। ওজনে ভারী হলেও যন্ত্রটিকে এমন সহজ এবং সুন্দরভাবে নাড়াচাড়া করা হবে যে কোথাও এতটুকু শব্দ বা কম্পন অনুভূত হবে না।

মাউন্ট পালোমার দূরবীক্ষণ যন্ত্রের গীয়ার (Gear)

দূরবীক্ষণ যন্ত্রের নলটির দৈর্ঘ্য ৫০ ফুট। এই নলটিকেও অনায়াসে ঘুরিয়ে মহাশূন্যের যে কোন স্থানে নির্দিষ্ট করা যায়। দূরবীক্ষণ যন্ত্রের বৃহদাকার দর্পনটি ছাড়া বাকি সব কাজ শেষ হয়েছে। যুদ্ধ শেষ হবার কিছু পরেই এই মানমন্দিরে একটি ২০০ ইঞ্চি ব্যাস বিশিষ্ট 'খসা-কাচ' (ground glass) নির্মিত দর্পন দূরবীক্ষণ যন্ত্র নির্মাণে ব্যবহার করা হবে।

দূরত্ব অনুমানে বোধ হয় পৃথিবী থেকে ৬, ০০০, ০০০, ০০০, ০০০, ০০০, ০০০, ০০০ মাইল। এই নব আবিষ্কৃত দূরবীক্ষণ যন্ত্র এমন সমস্ত নক্ষত্রের আলোক চিত্র গ্রহণ করবে যারা ১০০ শত কোটি আলোক বৎসর পূর্ব্বে থেকে পৃথিবীর দিকে আলোক বিকিরণ করতে আরম্ভ করেছে—পৃথিবীর অগ্নিময় গোলক পিণ্ড অবস্থার থেকে বলা চলে।

৫০০ শত টন ওজনের দূরবীক্ষণ যন্ত্রের নক্সা (ছবি—Usowi)

মানমন্দিরের প্রধান ঘরের control desk থেকে জ্যোতির্ষবিদগণ দূরবীক্ষণ যন্ত্রটিকে মহাশূন্যের একটি বিন্দুর দিকে নির্দিষ্ট করতে পারবেন এবং এই বিন্দুটির স্থান প্রায় নির্ভুলই হবে। ভুল হবে মহাশূন্যের পরিধির ২৫৯০০০ ভাগের একভাগ মাত্র। এ ঘটনা জ্যোতিষ বিজ্ঞানের এক বিস্ময় বলা যেতে পারে। যে বিন্দুটির দিকে দূরবীক্ষণ যন্ত্রটী নির্দিষ্ট হবে, তার

সাধারণের ধারণা যে, সব দূরবীক্ষণ যন্ত্রই লেন্সের সাহায্যে নির্মিত। কিন্তু তাঁরা শুনে অবাক হবেন, মাউণ্ট উইলসন মান-মন্দিরে অবস্থিত ১০০ শত ইঞ্চি ব্যাস বিশিষ্ট অন্যতম শক্তিশালী দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মতই মাউণ্ট পালোমার মানমন্দিরের ২০০ শত ইঞ্চি ব্যাস-বিশিষ্ট দূরবীক্ষণ যন্ত্রের কোন লেন্স নেই। বাস্তবে এই

যন্ত্র দু'টী দর্পন সংযুক্ত প্রতিফলক বিশেষ। বক্র কাচের (concave glass) উপর রৌপ্য বা এল্যুমিনিয়মের কলাইয়ে দর্পণ নির্মিত। দর্পনটি আলোক-রশ্মিসমূহকে যন্ত্রটির উপরিভাগের শেষ অংশে অবস্থিত কেন্দ্র স্থলে (focus) প্রতিফলন করে। সেখান থেকে প্রতিফলিত রশ্মিসমূহ অবলোকন যন্ত্র (Eye-Piece) অথবা ফটোগ্রাফিক প্লেটের উপর পতিত হয়।

দিক থেকে বৈজ্ঞানিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। সাধারণত দূরবীক্ষণ যন্ত্রের দর্পনের ২০০ ইঞ্চি ব্যাস বিশিষ্ট ডিস্কের স্থূলতা প্রায় ৩৩ ইঞ্চি (ব্যাসের ৬ ভাগের ১ ভাগ) এবং ওজন প্রায় ৪০ টন ভারী হ'বার কথা। এই বিরাট ওজনের ফলে দূরবীনের নলের নিম্নাংশ একদিকে ঝুলে যাবার কথা। সেই কারণে ডিস্কটিকে একটি কঠিন শিরাল আকৃতিতে গঠন (Rib-

বক্রীকৃত কাচ দর্পণের (Concave Glass mirror) পশ্চাদভাগ

bed Structure) করা হয়েছিল। ফলে তার স্থূলতা দাঁড়ায় ২৫ ইঞ্চিতে এবং ওজনও ৪০ টনের পরিবর্তে ২০ টন হয়।

মানমন্দিরের পরিকল্পনার প্রারম্ভে মনে করা হয়েছিল, বক্র দর্পনটির (concave mirror) জন্য যে ঘসা কাচের চক্র (ground glass disc) প্রয়োজন, তা অতি সহজেই নির্মিত হবে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে বহু অসুবিধা উপস্থিত হওয়ায় ১৯৩৪ সালের মার্চ মাসে দর্পণ নির্মাণের প্রথম প্রচেষ্টা বিফল হ'ল। শেষে ঐ বৎসরেরই ডিসেম্বর মাসে চক্র নির্মাণের কাজ আরম্ভ হ'ল এবং সাফল্যের সংগেই কাজ চলতে লাগল, যুদ্ধ আরম্ভের পূর্ব পর্যন্ত। গত সাত বছরের কাজের পরও চক্র নির্মাণের কাজ এখনও সম্পূর্ণ শেষ হয়নি। বর্তমানে যুদ্ধের জন্যই নির্মাণকার্য স্থগিত রাখা হয়েছে।

আলোচ্য দূরবীক্ষণ যন্ত্রটি নানা-

যে ছাঁচ এবং ১১৪টি ছিদ্রযুক্ত প্রকোষ্ঠ দূরবীক্ষণ যন্ত্রের ডিস্কটির পশ্চাৎভাগ শিরাল করেছে তারা প্রচণ্ড তাপরোধকারী ইটের তৈরী। এই ডিস্কটিকে ঠাণ্ডা করে কঠিন করতে এক বিশেষ চুল্লী ব্যবহার করা হয়েছিল। বৃহৎ চুল্লীটিকে রাখা হয়েছিল কয়েকটি দণ্ডের উপর। ছাঁচের মধ্যে কাচ গলিয়ে ঢালবার সময় ছাঁচের ভিতরের তাপের পরিমাণ ছিল ২৪৬০ ডিগ্রি ফরেনহাইট (১,৩৫০c)। ১৫ মাসেরও অধিককাল এক বৈদ্যুতিক যন্ত্রের সাহায্যে এই বৃহৎ কাচটিকে ঠাণ্ডা করা হয়েছিল দৈনিক মাত্র ০·৮°c সেণ্টিগ্রেড হারে।

কালিফোর্ণিয়ায় পালোমার পর্ব্বতের মানমন্দির ও ২০০ ইঞ্চি ব্যাস বিশিষ্ট শক্তিশালী দূরবীক্ষণ যন্ত্র

১৯৩৬ সালের এপ্রিল মাসে সংবাদ-পত্র এবং চলচ্চিত্র মারফৎ আমেরিকার জনসাধারণকে জানান হল, পৃথিবীর সর্ববৃহৎ কাচ খণ্ডটি আমেরিকার পূর্বাঞ্চল নিউইয়র্কস্থ কোর্ণিংয়ের থেকে একেবারে পশ্চিমে পাসাডেনায় জাহাজযোগে পাঠান হয়েছে। ঐ সময় থেকেই কাচটির মাজা ঘষা কাজ সুরু হয় এবং ১৯৩৮ সালের এপ্রিল মাসে কাচটিকে নির্দিষ্ট আকারে এনে পালিশের উপযোগী করা হল। ঘসার ফলে সওয়া পাঁচ টনের উপর অপ্রয়োজনীয় কাঁচ অপসারিত হয় এবং এই সংস্কারের জন্য কাচ ঘসার মসলা খরচ হয় ১০ টন!

পর্যায়ক্রমে 'গ্রাইণ্ডিং' এবং 'পালিশ-এর কাজ চালিয়ে ১৯৪১ সালের আগষ্ট মাসে এই 'কাঁচ খণ্ডটির গঠনের' রূপ দেবার কাজ আরম্ভ হ'ল। পূর্ণ গঠনের কাজ আরম্ভ হ'ল একমাস পর। কিন্তু বর্ত্তমান যুদ্ধের জন্য কাজ বন্ধ হয়ে গেল। যুদ্ধের পর বাকি কাজটুকু শেষ হ'লে কাঁচের উপরিভাগ এল্যুমিনিয়ামের পাতলা আবরণ দিয়ে ঢাকা হবে। একাজ শেষ হতে এখনও প্রায় এক বছর লাগবে। দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সমস্ত অংশেরই নির্মাণকার্য শেষ হয়েছে বাকী আছে কেবল দর্পণ। টেলিস্কোপ যন্ত্রের গঠনের 'ব্যালেন্স' ঠিকভাবে রাখবার জন্যে দর্পণের পরিবর্তে উপস্থিত ঐ মাপের এবং ওজনের একটি কংক্রিটের চক্র যন্ত্রের মধ্যে রাখা হয়েছে।

সব বড় বড় দূরবীক্ষণ যন্ত্রগুলি হচ্ছে 'ফটোগ্রাফিক ক্যামেরা'। মাউণ্ট পালোমার মানমন্দিরের দূরবীক্ষণ যন্ত্রটিও নিঃসন্দেহে একটি বৃহত্তম ফটোগ্রাফিক ক্যামেরা। নক্ষ

চোখে আমরা আকাশের কতখানি স্থানের খবরই বা নির্ভুলভাবে জানতে পারি? কিন্তু এই বৃহত্তম যন্ত্রটি নভোমণ্ডলের বহু দূরত্ব স্থানের আলোক চিত্র সংগ্রহ করে প্রকৃতির রহস্য উদ্ঘাটন করবে। যে সমস্ত বস্তু মানসচক্ষের অন্তরালে অবস্থান করছে, তারা দীর্ঘ সময়ের exposure-এ আলোকচিত্রে ধরা পড়বে।

পৃথিবীর আবর্তনের ফলে আকাশে নক্ষত্রগুলিকে সচল বলে প্রতিয়মান হয়। রাত্রিকালে একটি নক্ষত্রের দীর্ঘ সময় 'ফটোগ্রাফিক এক্সপোজার নিয়ে সেই নক্ষত্রটির কক্ষপথ নির্ণয় করতে হবে। সুতরাং নক্ষত্রের দিকে যন্ত্রটি নিবন্ধ হলে পর 'Wormgear' নামক যন্ত্রের সহযোগিতায় দূরবীক্ষণ যন্ত্রটি পশ্চিম দিকে তার 'পোলার এক্সিসের' দিকে আপনা থেকেই সমান গতিতে ঘুরবে পৃথিবীর পূর্ব দিকের ঘূর্ণনের গতি বিফল করতে। 'ফটোগ্রাফিক প্লেট হোল্ডার এবং দর্শক বহন করার জন্য দূরবীক্ষণ যন্ত্রের নলের উপরিভাগে একটি প্রকোষ্ঠ আছে—বিশেষত্ব এই যে ইতিপূর্বে এরূপ কোন আয়োজন দূরবীক্ষণ যন্ত্রে করা হয়নি। পৃথিবীর পৃষ্ঠ থেকে চন্দ্রের দূরত্ব ২,৩৯,০০০ মাইল। কিন্তু আলোচ্য দূরবীক্ষণ যন্ত্রটি এই দূরত্ব কমিয়ে তার ২৫ মাইলের মধ্যে চন্দ্রকে পরীক্ষা করতে পারবে।

জ্যোতির্বিদগণ আকাশের যতখানি স্থান পূর্বে জরিপ করতেন নিকট ভবিষ্যতে এই দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সহযোগিতায় তদপেক্ষা চতুর্গুণ স্থান আয়ত্বে আনতে পারবেন। বর্তমান সময়ের শক্তিশালী দূরবীক্ষণ যন্ত্রেও যে সব কোটি কোটি নক্ষত্র এবং জ্যোতিষ্ক ধরা পড়েনি তারা এভাবে আর আমাদের কাছ থেকে আত্মগোপন করে থাকতে পারবে না। পৃথিবীর সৌর জগতের গ্রহগণ ১০,০০০ গুণ বর্ধিত আকারে আমাদের সামনে আবির্ভূত হবে। মাউন্ট পালামোর দূরবীক্ষণ যন্ত্র প্রকৃতির রহস্যজাল উদ্ঘাটনে এভাবে মানুষকে সাহায্য করলে মানুষের জ্ঞান রাজ্যের সীমানা বর্তমানের থেকে অনেকখানি বিস্তৃত হবে। বিস্ময়াবিষ্ট নেত্রে মানুষ অধীরভাবে নিকট ভবিষ্যতের সেই গৌরবময় দিনগুলির অপেক্ষায় রয়েছে। *

* প্রবন্ধের ছবি—USOWI

সিক্ত মৃত্তিকা

(৩৮ পৃষ্ঠার পর)

মতিলালের আজ আর কাউকেই মনে পড়ল না। গান্ধারী নিশ্চিন্তে দাঁড়িয়ে আছে। ঘরে তার ভাইবোনেরা নির্ভাবনায় ঘুমুচ্ছে। একটু দাঁড়িয়ে থেকে সে প্রস্তাব করলে—এইবার আমি যাই?

মতিলাল সে কথা যেন শুনতে পায়নি। চোখের ইসারায় তাকে কাছে ডাকলো। উত্তরে গান্ধারী মাথা নেড়ে অসম্মতি জানিয়ে চোখ নীচু করে একই যায়গায় দাঁড়িয়ে রইলো।

মতিলাল এগিয়ে এসে একখানা হাত ধরতেই গান্ধারী ঝরঝর করে কেঁদে ফেললো। একটুখানি সামলে নিয়ে বললে—রাত আর নেই। ঐ দেখো ফরসা হয়ে আসে। তারপর আরও একটু মিনতি করে বললো—এখন যাই? কেমন?

মতিলাল তার হাত ছেড়ে দিলে। সে স্ত্রীলোক নয়, তার পর লোক আছে।

বঙ্গের জাতীয় কবিতা ও সংগীত

(৪২ পৃষ্ঠার পর)

হইতেন না। দ্বিজেন্দ্রলাল কোনরূপ বিদ্বেষ-ভাব হৃদয়ে পোষণ না করিয়াও স্বদেশী আন্দোলনকালে দেশাত্মবোধের যে অগ্নিময়ী প্রেরণা বাণী বাঙালীর প্রাণে উদ্দীপিত করিয়া দিয়া গিয়াছেন, এইবার সেই কথা বলিব।

স্বদেশী আন্দোলন সম্পর্কে তাঁহার আদর্শ ও চিন্তার ধারা যে সে সময়কার স্বদেশী নেতাদের সহিত স্বতন্ত্র ছিল, তাহা আমরা এখানে উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু সেই সময়ে আমরা তাঁহাকে ভাববিভোর চিত্তে যে ভাবে বন্দেমাতরম ও স্বরচিত সংগীত গাহিতে দেখিয়াছি—সে স্বর্গীয় দৃশ্য আজিও চোখের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিতেছে।

সে সময়ে দ্বিজেন্দ্রলালের রাণাপ্রতাপ, মেবারপতন, দুর্গাদাস প্রভৃতি নাটক বাঙলা সাহিত্যে যেমন এক অভিনব গদ্যের ধারা ও ভাবসম্পদ ও নাটকীয় চরিত্র সৃষ্টির নূতনত্ব আনিয়া দিয়াছিল, তেমনি তাঁহার সংগীতে এক নব উদ্দীপনার সৃষ্টি করিয়াছিল। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সেই রাজপুতে শৌর্যের গরিমাময় বর্ণনা—সেই

"মেবার পাহাড় শিখরে যাহার
রক্ত পতাকা উচ্চ শির।"

কোন বাঙালীর ভুলিবার নহে। তারপর এক শুভমুহূর্তে বাঙালীজাতি অপূর্ব আনন্দ ও উদ্দীপনাপূর্ণ হৃদয়ে শুনিল:

"বঙ্গ আমার, জননী আমার,
ধাত্রী আমার, আমার দেশ।"

আমরা সে যুগের কথা ও দ্বিজেন্দ্রলালের সংগীতের আলোচনা পরবর্তী সংখ্যায় করিব। (ক্রমশ)

কাক

শ্রীরাধিকারঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়

মহকুমা শহর। দুইটি মাত্র সদর রাস্তা লইয়া শহর। এই দুইটি রাস্তার উপরেই কোর্ট কাছারি, ডাকঘর, মিউনিসিপ্যালিটি অপিস, কোতোয়ালি, হাসপাতাল, স্কুল, স্কুল বোর্ডিং, টাউন ক্লাবের হল ও সিনেমা গৃহ একটি........কোন কিছুরই দুটি নাই, ঠাস বুনন শহর। দোকান-বাজার তো আছেই। সদর রাস্তা দুইটি ছাড়াইলেই পল্লী—সেখানে আর শহরের কোন চিহ্ন নাই।

এই শহরেই একটি সদর রাস্তার এক-প্রান্তে মনোহর কবিরাজের পিতৃপুরুষের বহুকালের ভিটা। মনোহর কবিরাজও এখন বৃদ্ধ, কিন্তু তাহার বাড়িটিতে বহু-কালের জীর্ণতার ছাপ একেবারেই নাই, বরং নূতন বাড়ি বলিয়াই মনে হয়। সেদিকে মনোহর কবিরাজের দৃষ্টি খুব প্রখর। বাড়িটির সামনের দিকেই তিন চারখানি ঘর—তাহার মধ্যে একখানি ঘর সকলের সামনে ও রাস্তার উপর—এইখানাই মনোহর কবিরাজের কবিরাজখানা। সকালে এক ঘণ্টা ও সন্ধ্যাকালে এক ঘণ্টা রোগীদের জন্য এই ঘরে সে বসে এবং উঠিয়া পড়িলে আর কোন রোগীর সাধ্য নাই যে তাহাকে আবার ডাকিয়া আনিয়া এ-ঘরে বসায়। ঘরের দরজায় তালা পড়িয়া যায়, সে তালা আর যথাসময়ে ভিন্ন খোলা হয় না। মনোহর কবিরাজের এ নিয়মের ব্যতিক্রম এ যাবৎকাল কখনও হয় নাই। অবশ্য রোগী বাড়িতে 'কল্' দিলে সর্বদাই সে প্রস্তুত—তাহার আর সময় অসময় নাই।

মনোহর কবিরাজের ঘরের মেঝেগুলি সিমেণ্ট বাঁধানো, চাল টিনের ও কাঠের ফ্রেমের উপর চাঁচার বেড়া লাগানো। বাড়িটি বেশ ঝরঝরে। বাড়ির পিছনের দিকে মস্ত উঠান—বাঁশের বেড়া ঘেরা। উঠানের একপাশে একটি পাতকুয়া—অপরপাশে শাক-সব্জির বাগান। বাড়ির সবকিছুই পরিষ্কার, ঝকঝকে ও তক্‌তকে।

বাড়িতে কিন্তু লোকজন নাই। মনোহর কবিরাজ নিজে ও তাহার স্বজাতি একটি স্ত্রীলোক নৃত্যকালি। এই নৃত্যকালির তিনকুলে কেহ নাই, মনোহর কবিরাজেরও অবশ্য কেহ নাই। নৃত্যকালি আজ গত দশ-বারো বৎসর ধরিয়া মনোহর কবিরাজের দেখা-শুনা তত্ত্ব-তল্লাস সমস্তই করিয়া আসিতেছে। নৃত্যকালির বয়স হইয়াছে অনেক—মনোহর কবিরাজের এক-আধ বছরের ছোট হইলে হইতে পারে। শরীরে সামর্থ্য এখনও বেশ আছে—খাটুনিতে বিরক্তি নাই। নৃত্যকালির স্বভাবটি সুন্দর।

মনোহর কবিরাজের স্বভাব কিন্তু একটু তিরিক্ষি ধরণের, নহিলে লোক সেও ভাল। মনোহর কবিরাজের পসারও ভাল, কবিরাজ হিসাবে শহরে সুনামও তাহার যথেষ্ট। অধুনা টাকা রোজগারের দিকে মনোহর কবিরাজের আর তেমন স্পৃহা নাই, অনেক সময় শরীরের অজুহাতে নূতন রোগী হইলে ফিরাইয়া দেয় এবং অন্য কাহাকেও ডাকিয়া নিয়া দেখাইতে উপদেশ দিয়া দেয়। আবার কখনও হয়তো কিছুই বলে না, শরীর অসুস্থ বলিয়া বিদায় করিয়া দেয়।

কিন্তু বাড়ির ভিতরে অবসর সময়ে মনোহর কবিরাজের কাজের আর অন্ত নাই। আগে বড়ি পাকানো, এটা সেটা জ্বাল দেওয়া, ঔষধ প্রস্তুত করাই ছিল কাজ, কিন্তু এখন নিতান্ত কালেভদ্রে ওদিকে দৃষ্টি পড়ে। এখন কাজ হইয়াছে তাহার নানারকম অস্ত্র-শস্ত্র প্রস্তুত করা, জাল-জালতি তৈয়ারি করা, আর খাবারের মধ্যে কি বিষ পুরিয়া দিলে আশু ফল ফলিবে তাহারই চিন্তা করা। মনোহর কবিরাজ ঠিক করিয়াছে, কাকের বংশ সে ধ্বংস করিবে, বাড়ির ত্রিসীমানায় আর কাক সে প্রবেশ করিতে দিবে না, কানে কা-কা রব যেন আর কিছুতেই প্রবেশ করিতে না পারে তাহার ব্যবস্থা সে করিয়া ছাড়িয়া দিবে।

ফলে, মনোহর কবিরাজের ভিতর বাড়ির উঠানটার বিচিত্র চেহারা হইয়াছে, এখানে একটা বাঁশের মাথায় হয়তো একগুচ্ছ কাকের পালক ঝুলিতেছে, আর একটা বাঁশে হয়তো বাঁকারির তীর-ধনুক ঝুলাইয়া রাখা হইয়াছে। কুয়াতলার আশে-পাশে জাল-জালতি দিয়া ঘিরিয়া রাখা হইয়াছে, কারণ এঁটো বাসনকোসন কুয়াতলায় জমা করা থাকে বলিয়া কাকের দৌরাত্ম্যটা সেখানে একটু বেশীই। বাড়ির ভিতরের বারান্দাটারও রূপ পাল্টাইয়াছে অনেক, কোথাও কাকের পালক ঝুলানো, কোথাও তীর-ধনুক, কোথাও বাঁটুল, কোথাও আবার একফালি জাল।

মনোহর কবিরাজ এসব ছাড়াও কাক মারিবার জন্য একপ্রকার বিষ প্রস্তুত করিয়াছে এবং তাহা সে নানাপ্রকার খাদ্য-দ্রব্যের মধ্যে পুরিয়া দিয়া উঠানের কয়েকটি বিশিষ্ট স্থানে এবং লাউ মাচাটির উপর সন্তর্পণে বিছাইয়া রাখিয়া দেয়। এই বিষাক্ত খাদ্য খাইয়া দুই একটা কাক সত্যই মরিয়া উঠানে ইতিপূর্বে পড়িয়া থাকিতে দেখা গিয়াছে। কাক একটা মরিলে মনোহর কবিরাজের সে কি উল্লাস! একটি মহা-শত্রু যেন নিপাত হইল। সেদিন সারাদিনই সে খুশি—নৃত্যকালির সেদিন দুই এক টাকা বক্‌শিষও মিলিয়া যায়।

সময় পাইলেই মনোহর কবিরাজ বারান্দায় একটা মোড়া পাতিয়া হয় বাঁটুল, নয় তীর-ধনুক লইয়া বসিয়া থাকে। তীরের ফলাগুলি ধারালো লোহার পাত দিয়া কামারবাড়ি হইতে তৈয়ারি করিয়া আনা। আর বাঁটুলের গুলী নিজেই মাটি ছানিয়া আগুনে পোড়াইয়া প্রস্তুত করিয়া লয়। এ ব্যাপারে তাহার কিছুমাত্র আলস্য নাই। বড়ি না পাকাইয়া বাঁটুলের গুলী পাকানোয় এখন উল্লাস তাহার বেশী।

এই কাক ধ্বংস ব্রত তাহার নূতন শুরু হয় নাই, আজ পাঁচ বৎসর ধরিয়াই চলিতেছে, তবে ক্রমেই বিরাট রূপ পরিগ্রহ করিতেছে ও আগ্রহ উন্মাদনা তাহার বাড়িতেছে।

কা.........কা.........কা.........

ভোরবেলাই এই অলক্ষণে ডাক। মনোহর কবিরাজ লাফাইয়া শয্যা হইতে উঠিল। দুর্গা নাম আর স্মরণে আসিল না। বারান্দায় আসিয়া বেড়ার গা হইতে একটা তীর-ধনুক বাছিয়া লইয়া উঠানে সন্তর্পণে নামিল। তিনটি কাক লাউ-মাচাটির উপর বসিয়া কলরব করিতেছিল। মনোহর কবিরাজকে তাহারা যেন চেনে। দর্শন-মাত্রেই তাহারা কা কা কা কলরব আরও তীক্ষ্ণতর করিয়া ধ্বনিয়া তুলিয়া উড়িয়া পলাইল। মনোহর কবিরাজের বাড়ির পিছনে মস্ত একটা জঙ্গল—সে জঙ্গলে বড় বড় গাছও আছে। সেই গাছেরই একটি গাছে উড়িয়া গিয়া তাহারা বসিল। তখনও কা কা ধ্বনির তাহাদের আর বিরাম নাই।

মনোহর কবিরাজ উঠানটার মধ্যে তীর-ধনুক হাতে মহা আক্রোশে পায়চারি করিতে লাগিল।

কুয়াতলার কাছে বেড়ার উপর একটি কাক কোথা হইতে কা কা করিয়া আসিয়া বসিল। মনোহর অমনি সেদিকে ফিরিল—

ফিরিয়াই তীর ছ্ঁড়িল। কাক উড়িয়া গেল, তীর গিয়া বেড়ার গায়ে গিঁথিয়া গেল।

মনোহর কবিরাজ আবার বারান্দায় ফিরিয়া আসিল। ধনুকটা রাখিয়া একটা বাঁটুল তুলিয়া লইয়া একটা ডালা হইতে পোড়ানো কতকগুলি গুলী বাছিয়া লইয়া আবার উঠানে নামিল। জঙ্গলের বড় গাছে সেই কাক তিনটি তখনও থাকিয়া থাকিয়া কা কা করিতেছে। কি কর্কশ ধ্বনি! মনোহর কবিরাজের ভিতরটা জ্বলিয়া যাইতেছিল। উঠানের একপাশে একটা লেবু গাছ বেশ ঝাপড়া হইয়া উঠিয়াছিল, তাহারই আড়ালে দাঁড়াইয়া মনোহর কবিরাজ জঙ্গলে গাছের কাকগুলিকে লক্ষ্য করিয়া বাঁটুলের গুলী ছুঁড়িতে লাগিল। এক দুই তিন চার পাঁচ—পাঁচটি গুলী ছোঁড়ার পরে কাক তিনটিই উড়িয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। এতক্ষণে মনোহর কবিরাজ সহজ অবস্থায় ফিরিয়া আসিল।

নৃত্যকালি কুয়াতলায় বাসন মাজিতেছিল এবং সকলই লক্ষ্য করিতেছিল। কিন্তু এ বিষয়ে কিছু বলিবার অধিকার তাহার নাই—সে জানে। কাজেই নির্বাক ছিল।

মনোহর কবিরাজ বারান্দায় আসিয়া বাঁটুল যথাস্থানে রাখিয়া দিয়া ডাকিল, অ নেত্য, আমার গাড়ুতে জল দিতে হবে যে। বেলা হয়ে গেল—ওদিকে আবার কবরেজখানায় বসতে হবে তো।

নৃত্যকালি কুয়াতলা হইতেই বলিল, জল ধরে দেওয়াই আছে।

মনোহর কবিরাজ একটা গামছা হাতে ঘরের ভিতর হইতে বাহিরে আসিয়া কাহাকেও উদ্দেশ না করিয়াই জোরে জোরে বলিতে লাগিল, এই শালা কাকগুলোই দিলে আমার দেরী করিয়ে। তীর-ধনুক আর বাঁটুলে কি কাক মারা যায়—ও শালা অতি ধূর্তের জাত—চোখ ফেরাতেই পগার পার। বন্দুকের দরখাস্ত করলাম—দিলে না, বলে, ওয়ার ফণ্ডে দাও এত টাকা, রিলিফ কমিটিতে এত। না, ঘুষ দিতে যাব' কেন? নাই বা পেলাম বন্দুক। প্রলোভন—খাদ্যে বিষ মিশিয়েই শেষ করবো আমি কাকের গোষ্ঠী। বন্দুক পেলে অবশ্য কাজে লাগতো।

নৃতনকালি কুয়াতলা হইতে সমস্তই শুনিল। সে কথা না কহিয়া আর থাকিতে পারিল না। বলিল, আবার বন্দুক কি হবে?

মনোহর কবিরাজ নৃত্যকালির সাড়া পাইয়া বাঁচিয়া গেল। বলিল, বলিস কি নেত্য, বন্দুক কি হবে? পেলে সাত দিনে আমি কাকের বংশ নিধন করে ছাড়তাম। ওর সময়-অসময়ে কা কা করাটা আমি একবার দেখে নিতাম। আমার হাড় জ্বালিয়ে দিলে শালারা কা কা করে। আজকাল সব কাজে ঘুষরে নেত্য—ঘুষ ছাড়া কথা নেই। নইলে..মনোহর কবিরাজ বন্দুক পায় না, বন্দুক পায় চিন্তাহরণ মুদী। কেন, তার কি লাখ টাকার সম্পত্তিটা আছে শুনি? কিন্তু ঘুষ মনোহর কবিরাজ দেবে না—বন্দুক তার দরকার নেই।

নৃত্যকালি বলিল, কি দরকার বন্দুকে, ও আপদ ঘরে না থাকাই ভাল।

মনোহর কবিরাজ কি ভাবিল জানি না, বলিল, তা যা বলেছিস নেত্য। বন্দুক ঘরে থাকা অনেক ভজকোট। না পাওয়া গেচে, ভালই হয়েচে।

নৃত্যকালি আর উত্তর করিল না, মনে মনে বলিল, ভাল বলে ভাল, এর পরে আবার বন্দুক এলেতো আর রোগী দেখাই হবে না।

ব্যবসার প্রতি মনোহর কবিরাজের নজর ক্রমেই কমিয়া আসিতেছে। এখন লোকে 'কল' দিলে কেমন যেন গড়িমসি করে—নিতান্ত নাছোরবান্দা হইলেই তবে যাইতে হয়। এড়াইতে কোনরকমে পারিলে আর কথা নাই। এদিকে যেমন ব্যবসার প্রতি উৎসাহ উদ্যম কমিয়া আসিতেছে তেমন আবার ওদিকে কাক-বধ বা কাক-তাড়ানো ব্যাপারে উৎসাহ উদ্যম ততোধিক পরিমাণে বাড়িয়া যাইতেছে। দিবারাত্র কেবল তীরের ফলায় শাণ দেওয়া হইতেছে, আর নয়তো মাটি ছাঁকিয়া বাঁটুলের গুলী পাকানো হইতেছে; বড়ি পাকানো এখন একপ্রকার বন্ধই। ঔষধ জ্বাল না দিয়া বিষ জ্বাল দেওয়া চলিতেছে।

নৃত্যকালি এইসব দেখিয়া শুনিয়া মাঝে মাঝে বলে, কবরেজ কাকা, আজকাল তোমার কিন্তু ব্যবসার দিকে মন একেবারে নেই।

মনোহর কবিরাজ হাসিয়া বলে, আর থেকে লাভ কি বলনা নেত্য? টাকা পয়সা তো অনেক রোজগার করলাম.....এই তাড়া তাড়া আগে কাকটাকে নেত্য, ঘরের চালে এসে বসেছে দুষ্ট হারামজাদা...... আচ্ছা, থাক তোর যেতে হবে না, আমিই যাচ্ছি।

বলিয়া [illegible] নামিয়া গেল।

[illegible]

[illegible] এ-বাড়ির [illegible] নেই। [illegible] শ্রাদ্ধ করে ছেড়ে দিতাম।

নৃত্যকালি বলিল, কাক তো থাকিতে [illegible] বসেই না কোথাও, কচিৎ একটা আধটা যদি বা ভুল করে এসে বসে।

মনোহর কবিরাজ [illegible]

আমি এমন করে ছেড়ে দেব' নেত্য যে, ভুলেও কোনদিন আর বসবে না, আর যদি বা বসে তো অমনি ভিমরি খেয়ে ঘুরে পড়ে সেইখানেই মরে থাকবে। আমি এবার এমন একটা বিষ তৈরী করবো নেত্য যে কাকের পায়ে-গায়ে যে কোন জায়গায় লাগলে অমনি সেখানেই মরে পড়ে থাকবে। ব্যস্, এইটে বের করতে পারলেই নিশ্চিন্ত একেবারে।

হ্যাঁ, ভাল কথা, তুই কিনা ব্যবসার কথা তুলেছিলি নেত্য? ব্যবসায় আমার আর মন নেই। কেন থাকবে বল? টাকাতো অনেক রোজগার করলাম, কিন্তু টাকা আমার কে ভোগ করবে বল? আর কার জন্যেই বা এই বুড়ো বয়সে পরিশ্রম করে টাকা রোজগার করবো বল? টাকা যা আমার আছে তাতে বাকী দিন কটা স্বচ্ছন্দেই কেটে যাবে। তাই আর ভাবিও না, চেষ্টাও করি না। রোজগারের আর সুখ নেই নেত্য, বরং কাক তাড়িয়ে আর কাক মেরে একটা অদ্ভুত আনন্দ পাই। যদি কাক মারবার জন্যে কোন সঙ্ঘ বা দল তৈরী হ'তো, তাহলে আমি তাদের আড়াই হাজার টাকা দান করে দিতাম। কিন্তু তারতো সম্ভাবনা নেই, কাজেই টাকা আমার যা থাকবে তা তোকেই দিয়ে যাব নেত্য, আমি ম'রে গেলে তোর যেন কোন কষ্ট না হয়।

নৃত্যকালির চোখে জল আসিয়া পড়িল।

মনোহর কবিরাজ তাহা লক্ষ্য করিয়াই কথা ঘুরাইবার জন্য বলিল, ভাল কথা নেত্য। আমার ছাই মনেও থাকে না। আজ দিন-দশেক হ'লো ভগবান কামারকে একশো তীরের ফলা গড়তে দিয়ে এসেছিলাম, তৈরী হ'য়ে গেচে খবর পাঠিয়েচে, আজ বিকেলবেলা দামটা নিয়ে ওগুলো নিয়ে আসিস তো।

নৃত্যকালি চোখের জল মুছিয়া বলিল, আচ্ছা, তা এনে দেব'খন।

নৃত্যকালি ফলা আনিয়া দিল। ফলা দেখিয়া মনোহর কবিরাজের চক্ষু জুড়াইয়া গেল। আহা! কি সুচালো তীক্ষ্ণ [illegible] আর কি রকম ঝকঝক করিয়া জ্বলিতেছে [illegible] মনোহর কবিরাজ নানাভাবে [illegible] [illegible] দেখিল—[illegible] [illegible]

[illegible] দিলো মনোহর কবিরাজ [illegible] সেগুলিকে [illegible] তাহাদের মাথায় [illegible] হইয়া আসিল। [illegible]

রাজের নিবৃত্তি নাই। নৃত্যকালি শেষে একটা লণ্ঠন আনিয়া তাহার সাম্‌নে ধরিয়া দিয়া বলিয়া গেল, কব্‌রেজখানায় গিয়ে বসবার সময় হলো যে।

এই যাই।—বলিয়া মনোহর কবিরাজ আবার কাজে মন দিল।

তিরিশটি মোক্ষম তীর তৈয়ারি হইলে মনোহর কবিরাজ উঠিয়া দাঁড়াইল। শির-দাঁড়া রীতিমত তখন তাহার টন্ টন্ করিতেছে, কিন্তু মুখে অপরিসীম উল্লাস।

মনোহর কবিরাজ তীরগুলিকে যথা-স্থানে সাজাইয়া রাখিয়া এবং অবশিষ্ট ফলাগুলিকে ঘরের ভিতর তুলিয়া রাখিয়া দিয়া কবিরাজখানার দিকে চলিয়া গেল।

সকালবেলা ঘুম হইতে উঠিয়াই মনোহর কবিরাজ বারান্দায় গিয়া মোড়া পাতিয়া একটা কাপড়ের আড়ালে একটু লুকাইয়া তীর-ধনুক লইয়া বসিল। হাতে তাহার নূতন সূক্ষ্ম ফলাযুক্ত তীর—মৃত্যু যেন তাহার সঁচালো শুভ্র মুখে বিরাজমান। কোনরকমে একবার ছুঁইলে আর রক্ষা নাই। মনোহর কবিরাজের দুই চক্ষে সেকি পাশবিক উল্লাস। কিন্তু কই, কাকেরতো সাড়া মেলে না। তাহাদের খবর মিলিয়াছে নাকি?

এমন সময় ধ্বনিত হইল,—কা...কা...কা...

কুয়াতলার দিকের বেড়ার অপর পার্শ্বে সেই ধ্বনি। মনোহর কবিরাজ উচ্চকিত ও উৎকর্ণ হইল। ভিতরে তাহার উগ্র উত্তেজনা ও উৎকণ্ঠা। ব্যাধের চাইতেও সন্ত্রস্ত তাহার ভাব।

ঘরের ভিতর হইতে নৃত্যকালি কাল রাত্রের এঁটো বাসন-কোসন পাঁজা করিয়া লইয়া কুয়াতলার দিকে চলিল। নৃত্য-কালির বয়স হইয়াছে, চলা তাই ধীর মন্থর।

মাঝ পথেই কোথা হইতে একটা কাক উড়ে আসিয়া তাহার বাসনের উপর একটা ছোঁ মারিয়া আবার একটু সরিয়া গেল শূন্যে কয়েক হাত। নৃত্যকালি থমকিয়া দাঁড়াইয়া গেল। কাকটা এবার আসিয়া তাহার হাতের তোলা বাসনের উপর বসিল।

তীর ছুঁড়িল মনোহর কবিরাজ। উত্তেজনায় তখন তাহার দিক-বিদিক জ্ঞান নাই। তীর উপরে উঠিয়া একটা গোৎ খাইয়া নিচে নামিল।

নৃত্যকালির হাতের বাসনগুলি ঝন্‌ঝন্ করিয়া কুয়াতলার কাছেই মাটিতে চারদিকে ছড়াইয়া পড়িল। তীরের ফলা গিয়া বিঁধিয়াছে নৃত্যকালির ডান পায়ের হাঁটুর ঠিক নিচে।

নৃত্যকালি সেইখানেই—কবরেজ কাকাগো, কি করলে তুমি!—বলিয়া বসিয়া পড়িল।

তীরের ছুটিয়া যাওয়ার আওয়াজটাও যেমন মনোহর কবিরাজের কানে বাজিয়া রহিয়াছে তেমন আবার নৃত্যকালির কাতর কণ্ঠও তাহার কানে বাজিতেছে। মনোহর কবিরাজের মাথাটা ক্ষণিকের জন্য কেমন যেন ঝিমঝিম করিয়া উঠিল। ধনুক রাখিয়া সে উঠিয়া পড়িল।

উঠিয়া দাঁড়াইতেই তাহার মনে হইল—সে ব্যাধ নয়, সে কবিরাজ।

চীৎকার করিয়া বলিল, নেত্য, তীরটা খুলিস না, ধরে থাক্। আমি ওষুধ নিয়ে আসচি।

ছুটিয়া ঘরের ভিতর হইতে একটা মলম লইয়া নৃত্যকালির কাছে গিয়া মাটিতে হাঁটু মুড়িয়া বসিয়া তীরটা একটা টানে খুলিয়া ফেলিয়া অনেকখানি মলম দিয়া ক্ষতস্থান একেবারে চাপিয়া দিল।

বলিল, কিচ্ছু ভাবিসনে নেত্য, দু'এক-দিনেই ঘা শুকিয়ে যাবে। ঘরে চল্, ন্যাকড়া দিয়ে বেঁধে দিতে হবে। আমার হাত ধরেই চল। ও যা মলম দিলাম—রক্ত আর পড়বে না এক ফোঁটাও।

নৃত্যকালি ঘরে আসিয়া প্রথম কথা কহিল, বলিল, কবরেজ কাকা, কবরেজই হলো তোমার কাজ। ব্যথাটা আমার এরই মধ্যে গড়িয়ে গেচে, কালই ঠিক হয়ে যাবে বোধ হয়। ঐ কাক মারা ব্যাপারটা তুমি ছেড়ে দাও।

নৃত্যকালিকে তাহার তক্তপোষের উপর শোয়াইয়া দিয়া খানিকটা ফালি ন্যাকড়া দিয়া ক্ষত স্থানটা বাঁধিয়া দিয়া মনোহর কবিরাজ বলিল, ওকথা বলিসনে নেত্য, কাক দেখলে আমি পাগল হয়ে যাই। যে-কটা দিন বাঁচবো কাক ধ্বংসই আমার কাজ। পারি না পারি চেষ্টা আমাকে করতেই হবে। কা......কা......কা......আমার বুকের ভেতরটা ওরা যেন খুবলে খায়। ভীষণ শত্রুতা আমার ওদের সংগে—জীবনপণ! ও-কথা আমাকে বলিসনে আর নেত্য। আমি তা হলে পাগল হয়ে যাব।

নৃত্যকালি মনোহর কবিরাজের চোখ-মুখের চেহারা দেখিয়া আর কোন কথাই কহিল না।

কিছুক্ষণ পরে মনোহর কবিরাজ একটা খলে করিয়া কি যেন ঔষধ বাঁটিয়া আনিয়া নৃত্যকালিকে দিয়া বলিল, এই ওষুধটা খেয়ে ফেল নেত্য, তা'হলে আর জ্বরজারির ভয় থাকবে না। নইলে লোহার একটা বিষ আছে তো।

নৃত্যকালি ঔষধটা গিলিয়া ফেলিল।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই নৃত্যকালি উঠিয়া দাঁড়াইল। একটু একটু করিয়া ঘরের কাজও শুরু করিল।

মনোহর কবিরাজ যেন কেমন হইয়া গেল। তীরের ফলাগুলি দেখে, তাহাদের ধার পরীক্ষা করে, কেমন একটু হাসে, তারপরে আবার সব রাখিয়া দিয়া ঘরের মধ্যে গিয়া এটা-সেটা অন্যমনস্কের মত নাড়া-চাড়া করিতে থাকে।

লোকে তাহাকে বলে, কাক তাড়ানে কবরেজ। নিজের কানেও সে একথা শুনিয়াছে। কিন্তু আজ দুই দিন ধরিয়া—অর্থাৎ নৃত্যকালির জখমের পর হইতে কাক তাড়ানো ব্যাপারে বা তাহাদের বধের চেষ্টায় আর তাহার উল্লাস নাই। কেমন একটা মনমরা ভাব। কে যেন তাহার সমস্ত শক্তি হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে।

শুধু বুকের মাঝটা খাঁ খাঁ করিয়া জ্বলে—জিহ্বা ঘন ঘন শুকাইয়া ওঠে—কেবল জল পিপাসা পায়। মাথাটা কেমন ঘুরিতে থাকে। কাকের ডাক শুনিলে ভিতরে আগুন জ্বলিতে থাকে। থাকিয়া থাকিয়া কেমন যেন ভিমরির মত লাগে—পাকাইয়া ফেলিয়া দেয়।

নৃত্যকালি মলমের গুণে দুই দিনেই ভাল হইয়া উঠিল। সমস্ত কাজকর্ম আবার পূর্বের মতই করিতে লাগিল।

মনোহর কবিরাজ বারান্দায় তীরের ফলা দেখিতে আসিয়া দেখিল, লাউমাচার উপরে একটা কাক ছটফট করিতেছে, পাক খাইয়া খাইয়া ঘুরিয়া পড়িতেছে—তাহার বিষাক্ত খাদ্যের কাজ চলিতেছে। আনন্দে মনোহর কবিরাজ বারান্দার মধ্যেই ঘুরিয়া পড়িল। আজ দুই দিন ধরিয়াই শরীর তাহার খারাপ। নৃত্যকালি দূর হইতে দেখিয়াই ছুটিয়া আসিল। মনোহর কবিরাজকে ধরাধরি করিয়া অতি কষ্টে তাহার শয্যায় নিয়া শোয়াইয়া দিল। মনোহর কবিরাজ শয্যায় আশ্রয় নিয়া বলিয়া উঠিল, আমার বিষের কাজ চলচে, লাউমাচার ওপরে একটা কাক জ্বলেপুড়ে মরচে। আর একটু পরেই মরে পড়ে থাকবে। নেত্য, ওটাকে জঙ্গলে ফেলে দিয়ে আসিস অনেক দূরে। আমাকে এক গেলাস জল দে' নেত্য।

নৃত্যকালি ছুটিয়া জল আনিয়া দিল। মনোহর কবিরাজ ঢক্ ঢক্ করিয়া জলটা পান করিয়া ফেলিয়া বলিল, আমাকে একটা কাঁথা দিতে পারিস্ নেত্য, শরীরটা কেমন যেন কালিয়ে নিচ্ছে।

নৃত্যকালি কাঁথা পাড়িয়া দিল।

হু-হু করিয়া জ্বর আসিয়া গেল মনোহর কবিরাজের। নৃত্যকালি পায়ে হাত দিয়া দেখিল, পা পুড়িয়া যাইতেছে।

বিকালের দিকে নৃত্যকালি একজন ডাক্তার ডাকিয়া আনিল। ডাক্তার রোগ ধরিতে না পারিয়া নৃত্যকালিকে আড়ালে

ডাকিয়া নিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কবরেজ মশাই কি নেশা-ভাং কিছু করতেন?

নৃত্যকালি অমনি জিব্ কাটিয়া বলিল, রা-মো বলো! ওসবের ধার তিনি ধারেন না।

ডাক্তার বলিল, বৃদ্ধ মানুষ—তা একটু আফিং-ঠাফিং?

—না গো না, কিছু নাই। ওর নেশার মধ্যে ছিল শুধু এক কাক-তাড়ানো আর কাক-মারা। এইতো আমার জানা আছে।

ডাক্তার বলিল, তাহলে এ-রোগ বড় সাংঘাতিক। আমি একটা ওষুধ লিখে দিয়ে যাচ্ছি, কিন্তু যদুবাবুকে একবার ডেকে এ রোগী দেখানো উচিত।

ডাক্তার চলিয়া গেলে মনোহর কবিরাজ নৃত্যকালিকে ডাকিয়া বলিল, ছোকরা ডাক্তার কি বলে গেল শুনি?

নৃত্যকালি আমতা আমতা করিতে লাগিল। মনোহর কবিরাজ বলিল, ওসব ছেলে-ছোকরা হাল ফ্যাশানের ডাক্তার এ রোগ বুঝবে কি শুনি? বাঁচবো না আর আমি, তবু একবার যদুবাবুকেই তুই ডাক নেত্য—ও লোকটা বোঝে শোঝে।

যদুবাবু আসিয়া দেখিয়া গেলেন। ঔষধও দিলেন, কিন্তু নৃত্যকালিকে ভরসা তিনি কিছু দিতে পারিলেন না।

তারপরের দিন রাত্রে জ্বর একেবারে হু-হু করিয়া বাড়িয়া গেল। যদুবাবুর ঔষধ বা নৃত্যকালির মাথায় বাতাস অগ্রাহ্য করিয়াই জ্বর বাড়িয়া চলিল। মনোহর কবিরাজ প্রলাপ বকিতে শুরু করিল,—

আবার শালা কাক আমার ভিটেয়। কা কা করবে—দেব' বিঁধে ধারালো ফলা, মরবে ছটফট্ করে। দেখে আয়তো নেত্য, লাউ-মাচায় কাকটা অত ছটফট করচে কেন—ও বিষের কাজ চলেচে—চলুক। আমাকে জ্বালিয়েচো—জ্বলবে না—খুব জ্বলবে। এই নেত্য, একটা কাক বড় জ্বালাতন করচে —বেড়ায় বসেচে বোধ হয়—তাড়িয়ে দিয়ে আয়তো। ঐ দেখ, আবার ঘরের চালে এসে বসলো বোধ হয়।......দেতো বাঁটুলটা, না, না, তীর ধনুক দে'। বন্দুকটা পেলাম না, নইলে কাকের বংশ লোপ করে দিয়ে যেতাম। উঃ, শালারা আমাকে জ্বালিয়ে মেরেচে। এই নেত্য, দেখ, দেখ, বিছানায় বুঝি একটা কাক এসে বসলো। ওরে, তাড়া তাড়া শীগগির তাড়া—কি চীৎকার রে বাবা—কি অলুক্ষণে ডাক। আমাকে বাঁচা, বাঁচা নেত্য—ওরা যে আমাকে ছেয়ে ধরলো কা কা করে। কান আমার গেল। হুস..... হুস......হুস! তবু যে নড়ে না ওরা নেত্য।

নৃত্যকালি একটু জোরেই বলিল, সব তাড়িয়ে দিয়েচি কবরেজ কাকা, আপনি এখন একটু চুপ করে ঘুমোতে চেষ্টা করুন।

—আঃ, বাঁচালি নেত্য। তুই আমার শেষ সম্বল নেত্য। তুই না থাকলে যে আমার কি দশা হতো তা কে জানে। তোকে বলি তবে শোন্, এই কাক কাক করে মরি কেন জানিস্? আমার খোকাকে তো দেখেচিস? তার মা মারা যেতে পাঁচ বছর বয়স থেকে তাকে আমি বারো বছরেরটি করে তুলি। একদিন স্কুল গেল। চলে যাওয়ার পর লক্ষ্য করলাম, লাউ মাচার ওপরে বসে একটা কাক ডাকচে। কাকটা আর নড়লো না সারাদিন। খোকা দুটোর সময় ছুটি করে চলে এলো—এসেই পেছনের দরজা দিয়ে বাড়ি ঢুকে উঠানের ঐ লাউমাচাটার কাছেই ভির্মি খেয়ে পড়লো, আর উঠলো না। লাউমাচার ওপর ঠায় তখনও সেই কাকটা বসে কা কা করচে। খোকা আর কথাও কইলো না, উঠলোও না। রোগ যে কি কিছুই ধরা পড়লো না আমার মত একটা কবরেজ হিমসিম খেয়ে গেল রোগ ঠিক করতে। গেল, আমার সর্বস্ব গেল! কিন্তু কাকটা বসেই রইলো সন্ধ্যে পর্যন্ত। সেই থেকে কাক আমার পরম শত্রু নেতা—কাক মারাই আমার কাজ। কিন্তু পারলাম কই—বন্দুকটা দিলে না ওরা।.........ওরে কাকটা যে আবার লাউমাচায় বসে ডাকচে, একটু তাড়িয়ে দিয়ে আয়। আমায় জল দে নেত্য, গলা আমার শুকিয়ে গেল।

ভোরের দিকে প্রলাপ আরও বাড়িয়া চলিল। তারপরে এক সময় একটা ঝাঁকানি দিয়া সব নীরব। নৃত্যকালি সব বুঝিল। চোখ দিয়া তাহার ঝরঝর করিয়া জল ঝরিয়া পড়িল।

কাঁদিতে কাঁদিতেই নৃত্যকালি বাহিরে আসিল। উঠানে আসিয়া দেখিল—একপাশে ঘাসের জমির উপর একটা কাক মরিয়া পড়িয়া আছে।

নৃত্যকালি বুঝিল, মনোহর কবিরাজের বিষের কাজ হইয়াছে।

শাশ্বতী

তারাকুমার ঘোষ

তোমার যাহা সত্য তাহা ত্রিকাল নেবে মেনে।
সেই মাধুর্য জেনে,
ত্রিভুবনের দীপ্তি পুলক তৃপ্তি সুধা এনে,
ক্ষণের করে দিয়ে যাবে নিত্য রূপায়ন,
পাশের কাঁটা ঢাক্‌তে নারে পুষ্প-আভরণ।
সৌরভে তার মাতাল চারিদিক
উষা হাসে নির্নিমিখ,

লুকায় রাতির গভীর আঁধার সহজতম আবেশে।
তেমনি তোমার মহনীয় কমনীয়তা উঠবে নিজে হেসে।

সংসারে কি সবাই হ'য় বিশ্বজনের প্রিয়,
বিশ্ব যদি না হয় গো তোমার বরণীয়?
ব্যর্থ তবু নয়কো কভু তোমার ইতিহাস।
রঙীন হবেই সোনার রঙে দীপ্ত এ আকাশ।

সোভিয়েট শাসন তান্ত্রিক পরিবর্ত্তন

বসুবন্ধু শর্মা

১৯৪৪ খৃষ্টাব্দের ১লা ফেব্রুয়ারী সোভিয়েট রাশিয়ার শাসন-তান্ত্রিক ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন বলে পরিগণিত হবে। ঐদিন অপরাহ্নে সুপ্রীম সোভিয়েট মস্কোয়ে মলোটভ্ সোভিয়েট ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন গণতন্ত্রকে স্বাধীনভাবে নিজেদের পররাষ্ট্রীয় সম্পর্ক নির্ধারণের পূর্ণ অধিকার দেবার প্রস্তাব উত্থাপন করেন। দেশরক্ষার জন্যে বিভিন্ন গণতন্ত্রের স্বাধীনভাবে সৈন্যদল রাখার অধিকার দানেরও একটি প্রস্তাব মলোটভ্ সুপ্রীম সোভিয়েটে উপস্থাপিত করেন। যথাযোগ্য আলোচনার পরে সুপ্রীম সোভিয়েটের উভয় পরিষদেই প্রস্তাব দুটি গৃহীত হয়েছে। এর অর্থ এই যে এখন থেকে সোভিয়েট ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন ১৬টি গণতন্ত্র ভিন্ন রাষ্ট্রের সংগে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারবে এবং দেশরক্ষার জন্যে ভিন্ন ভিন্ন সৈন্যদলও রাখতে পারবে। আপাত দৃষ্টিতে এই পরিবর্তন যত সহজ বলে মনে হয়—কার্যত কিন্তু তা নয়। এদুটি বিভাগ যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বলে এতদিন পর্যন্ত এদের উপর কেন্দ্রীয় গভর্নমেন্টেরই মূল কর্তৃত্ব ছিল। বিপ্লবোত্তর সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ার শাসনতন্ত্রের ইতিহাসে—এ একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন বললেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। যাঁরা মনে করনে যে বর্তমান রাশিয়ায় 'সমাজতন্ত্র নেহাৎই জোরের উপর প্রতিষ্ঠিত—তাঁরা এই নতুন ব্যবস্থার প্রবর্তনে তাঁদের যোগ্য প্রত্যুত্তর পাবেন। এ পর্যন্ত সোভিয়েট ইউনিয়নে যে ১৬টি বিভিন্ন গণতান্ত্রিক ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তাদের প্রত্যেকটিই স্বেচ্ছা-গঠিত। তারা নিজেদের সুবিধার জন্যেই এসে সোভিয়েট ইউনিয়নে প্রবেশ করেছে—আবার নিজেদের ইচ্ছানুসারেই তাদের বেরিয়ে যাবার অধিকার আছে। অথচ সুদীর্ঘ বাইশ বছরের মধ্যে সোভিয়েট রাশিয়ার ছোট বড় কোন গণতন্ত্রই সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েট ইউনিয়নের বাইরে চলে যেতে চায়নি। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার মূলে যে মানব-কল্যাণব্রত রয়েছে—এর দ্বারা সেই কথাই কি প্রমাণিত হয় না? বর্তমান যুদ্ধ শুরু হবার পর স্টালিন যখন কোমিণ্টার্ন বা তৃতীয় আন্তর্জাতিকের সাময়িক বিলুপ্তি ঘোষণা করেছিলেন তখনও সারা পৃথিবী আজকের মত বিস্মিত হয়ে গেছিল। নানা দেশ থেকে স্টালিনের এই নতুন নীতি ঘোষণার নানারূপ বিরুদ্ধ-সমালোচনা দেখা গিয়েছিল। কেউ বলেছিলেন যে কোমিণ্টার্নের বিলুপ্তি মানে রাশিয়ায় কম্যুনিজমের সাময়িক মৃত্যু; আবার কেউ বলেছিলেন যে কোমিণ্টার্ন উঠিয়ে দিয়ে সমাজতান্ত্রিক রাশিয়া ধনতান্ত্রিক ব্রিটেন ও আমেরিকার কাছে আত্মসমর্পণ করেছে—স্টালিনের কূটনৈতিক পরাজয় হয়েছে। কিন্তু পরবর্তী ঘটনার আলোকে বিচার করলে দেখা যায় যে দৃশ্যত স্টালিনের এই পরাজয় শেষ-পর্যন্ত কূটনৈতিক বিজয়ে পর্যবসিত হয়েছে। মস্কো এবং তেহরান সম্মিলনের ফলে আজ রাশিয়া, ব্রিটেন এবং আমেরিকার হিটলার-বিরোধী মৈত্রী আরও দৃঢ়তর হয়ে উঠছে। কম্যুনিজমের আসল উদ্দেশ্য এর দ্বারা সাময়িকভাবে ব্যাহত হলেও, স্টালিন তাঁর স্বদেশ সোভিয়েট ইউনিয়নকে নিশ্চিত ধ্বংসের হাত থেকেই শুধু বাঁচিয়ে তোলেন নি—তার আন্তর্জাতিক পদমর্যাদা লাভের পথও প্রশস্ত করে দিয়েছেন। আর কিছু না হোক, বর্তমান জার্মান-বিরোধী যুদ্ধ নিঃসংশয়ে প্রমাণিত করেছে যে রুশরাষ্ট্রনায়ক স্টালিন একজন বড় স্বদেশপ্রেমিক। তাঁর এই স্বদেশ-প্রেমের মধ্যে প্রচলিত ধনতান্ত্রিক স্বদেশপ্রেমের উগ্রতা বা পররাজ্যলিপ্সা নেই—আছে স্বদেশের পরম কল্যাণ-সাধন-ব্রত। বর্তমান ফ্যাসিস্ট-বিরোধী যুদ্ধের পরিসমাপ্তি হবার আগেই স্টালিন সোভিয়েটের বিভিন্ন গণতন্ত্রগুলোকে নতুন অধিকার দানের যে বৈপ্লবিক নির্দেশ দিয়েছেন, কিছুদিন না গেলে তার পূর্ণ অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা সহজ হবে না। তবে অনেক দিক ভেবেই যে স্টালিন যুদ্ধকালে এই বৈপ্লবিক নির্দেশ দিয়েছেন সে কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে। ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকার প্রচারিত যুদ্ধাদর্শ এবং অনুসৃত কার্যক্রমের মধ্যে এ পর্যন্ত অনেক বৈষম্য দেখা গেছে। কিন্তু সোভিয়েট রাশিয়ার যুদ্ধাদর্শ ও কার্যক্রম একই নীতির দ্বারা অনুপ্রাণিত। স্টালিনের মতে রুশ-জার্মান যুদ্ধের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে:

"Abolition of racial exclusiveness, equality of nations and integrity of their territories, liberation of enslaved nations and restoration of their sovereign rights, the right of every nation to arrange its affairs as it wishes, economic aid to nations that have suffered and assistance to them in attaining their material welfare restoration of democratic liberties the destruction of the Hitlerit regime."

এ পর্যন্ত সোভিয়েট রাষ্ট্র এই ঘোষি নীতি থেকে বিচ্যুত হয়নি। বিভি সোভিয়েট গণতন্ত্রকে তাদের পররাষ্ট্রী সম্পর্ক নির্ধারণের স্বাধীন অধিকার দা কি এই ঘোষিত নীতিরই পরিপোষক নয়?

সোভিয়েট রাষ্ট্র ব্যবস্থা যেমন নানাদিব থেকে অভিনব—সোভিয়েট শাসনতান্ত্রিক গঠনও তেমনি অভিনব এবং জটিল। রুশ বিপ্লবের ফলে রাশিয়ায় সর্বপ্রথম একটি মাত্র সোভিয়েট সোস্যালিস্ট রিপাব্লিক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। রুশদের এই প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রটিই বর্তমান সোভিয়েট ইউনিয়নের বৃহত্তম রাষ্ট্র এবং রাশিয়ার প্রায় অর্ধেক লোকই এই রাষ্ট্রের অধিবাসী। পরে ট্রান্সককেসিয়ান্ ফেডারেশন, ইউক্রেন সোভিয়েট রিপাব্লিক এবং হোয়াইট রাশিয়ান রিপাব্লিক সৃষ্টি হয়। তারও পরে তুর্কিস্থান থেকে উজবেক্, তুর্কমেন এবং তাজিদিক রিপাব্লিক গঠিত হয়। সুদূর পূর্বে সাইবেরিয়া থেকে জাপানীরা বিতাড়িত হবার পর ১৯২২ খৃষ্টাব্দে সর্বপ্রথম সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র সংস্থাপিত হয়। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে সোভিয়েট ইউনিয়নের আইনসংগত নতুন শাসনতন্ত্র বিরচিত হয়। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে স্টালিন শাসনতন্ত্র ঘোষিত হবার সময় রিপাব্লিকগুলোর সংখ্যা দাঁড়ায় এগারোতে। বর্তমানে ইউনিয়ন রিপাব্লিকগুলোর সংখ্যা হয়েছে ১৬। এই ষোলটি পৃথক গণতন্ত্র ছাড়াও, ২২টি ক্ষুদ্রতর স্বায়ত্ত শাসিত গণতন্ত্র এবং ২০টি সংখ্যালঘিষ্ঠদের জন্যে পৃথকীকৃত অঞ্চল আছে। সমগ্র সোভিয়েট ইউনিয়নে যত ভিন্ন ভিন্ন ভাষা, জাতি এবং ধর্ম আছে—পৃথিবীর আর কোন দেশে বা সাম্রাজ্যে সেরূপ দেখা যায় না। ইউনাইটেড সোস্যালিস্ট্ সোভিয়েট রিপাব্লিকের মধ্যে অন্তত ১৮০টি ভাষা, বহু জাতি ও ধর্ম আছে। জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও সংখ্যা নির্বিশেষে সোভিয়েট শাসন পদ্ধতি সকলকে সমান অধিকার প্রদানের যে অভিনব উপায় উদ্ভাবন করেছে, পৃথিবীর আর কোন দেশে সেরূপ সম্ভব হয়নি। সোভিয়েট রাশিয়াই সর্বপ্রথম জগতের সামনে প্রতিপন্ন করেছে যে, একমাত্র সাম্যবাদের ভিত্তিতে ছাড়া পৃথিবীতে প্রকৃত গণতন্ত্র স্থাপন আকাশ-

কুর্সমের মতই অলীক। ভিন্ন গণতন্ত্রগুলো স্বেচ্ছায় সোভিয়েট ইউনিয়নে যোগ দিয়েছে এবং তাদের প্রত্যেকেরই স্বেচ্ছায় এই ব্যবস্থার বাইরে চলে যাবার অধিকার আছে। এই অধিকার থাকা সত্ত্বেও কোন গণতন্ত্র সোভিয়েট ইউনিয়নের বাইরে ত চলে যায়ই নি বরং উত্তরোত্তর সোভিয়েট ইউনিয়ন বিস্তৃতি লাভ করে চলেছে। সমগ্র সোভিয়েট ইউনিয়নের মূলনীতি অক্ষুণ্ণ রেখে বিভিন্ন গণতন্ত্রগুলোর অর্থনৈতিক পরিবর্তন, পরিবর্ধন এবং শিক্ষা ও স্বাস্থ্য-বিষয়ক আইন প্রণয়নের পূর্ণ অধিকার ছিল। কিন্তু যুদ্ধ, শান্তি, আত্মরক্ষা, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক নির্ধারণ প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ অধিকারগুলো ছিল কেন্দ্রীয় সোভিয়েট ইউনিয়নের রাষ্ট্রবিভাগের হাতে। এটা খুবই স্বাভাবিক; কোন গণতন্ত্র যখন স্বেচ্ছায় সোভিয়েট ইউনিয়নে যোগ দেয়, তখন সোভিয়েট শাসনতন্ত্র অনুসারে নিজেদের রাষ্ট্রের উন্নতি বিধানের জন্যেই সে যোগ দেয়। সোভিয়েট ইউনিয়ন তার শাসনতান্ত্রিক মূলনীতিকে বিপন্ন করে ত আর এইসব গণতন্ত্রের স্বাতন্ত্র্যবোধকে মেনে নিতে পারে না। তা ছাড়া ইচ্ছামত বেরিয়ে যাবার পথ ত খোলাই রয়েছে। কিন্তু এই সোভিয়েট শাসন পদ্ধতি মানব সমাজের পক্ষে কতটা কল্যাণপ্রসূ হতে পারে, তার প্রমাণ মেলে, যখন আমরা জারের আমলের অত্যাচার নিষ্পেষণ ও দারিদ্র্যের সঙ্গে আজকের রাশিয়ার সাম্য মৈত্রী সবলতা এবং আর্থিক উন্নতির তুলনা করি। সাইবেরিয়ার যেসব দুর্গম অঞ্চল একদিন নির্বাসিত রুশদের জন্যে নির্দিষ্ট ছিল, সেইসব অঞ্চল আজ জ্ঞান বিজ্ঞান শিক্ষা সভ্যতায় এত বেশী উন্নতি করেছে যে, মিঃ ওয়েণ্ডেল উইল্কির মত ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রনেতাও তাঁর "One World" নামক সম্প্রতি প্রকাশিত রাজনৈতিক পুস্তকে সোভিয়েট শাসন পদ্ধতির প্রশংসা না করে পারেননি। সমগ্র সোভিয়েট ইউনিয়নের এই অভূতপূর্ব উন্নতির মূলে আছে মানব সমাজকে উন্নত করার প্রয়াস। সমাজতান্ত্রিক শাসনে আর কিছু থাক না থাক্, ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মত অর্থনৈতিক শোষণ-প্রচেষ্টা নেই।

সোভিয়েট শাসনের এই মূলগত বিভিন্নতা স্বীকার করেও অনেকে বুঝে উঠতে পারছেন না স্টালিন যুদ্ধকালে রাশিয়ায় এই নতুন শাসন-সংস্কার করলেন কেন। যুদ্ধের অজুহাতে ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলো তাদের অধীন দেশে শাসনতান্ত্রিক অগ্রগতি ঠেকিয়ে রাখতেই চায়। প্রমাণ, ভারতের শাসনতান্ত্রিক অগ্রগতির প্রতি ব্রিটেনের ক্রমিক ঔদাসীন্য। এ যুদ্ধে মিত্রপক্ষে রাশিয়ার মত আর কোন দেশই ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। অথচ সেই দেশেই স্টালিন এই নতুন নির্দেশ দিয়ে দেখিয়ে দিলেন যে, যুদ্ধকালে কোনরূপ শাসনতান্ত্রিক অগ্রগতি সম্ভব নয় বলে, সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলো যে যুক্তি দেখায়, সেটা রাজনৈতিক ধাপ্পাবাজী মাত্র। সোভিয়েট রাশিয়ার এই নতুন শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তনকে একদল ব্রিটিশ রাষ্ট্রনৈতিক সমালোচক ব্রিটিশ কমনওয়েলথ্-এর সংগে তুলনা করে বলেছেন যে, এর মধ্যে কোন নতুনত্ব নেই। কিন্তু এই জাতীয় তুলনা দান সমালোচকদের শাসনতান্ত্রিক অজ্ঞতারই সূচনা করে। যাঁরা এই জাতীয় তুলনা দেন তাঁরা সোভিয়েট ইউনিয়নকে ইংল্যাণ্ডের মতই সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র বলে মনে করেন। তাঁদের মতে সোভিয়েট সাম্রাজ্যবাদ কিছুটা অভিনব ধরণের—এই যা বিভিন্নতা। কিন্তু এ ধারণা যে কত ভ্রান্ত তার প্রমাণ সোভিয়েট ইউনিয়নে সাম্রাজ্যবাদসুলভ অর্থনৈতিক শোষণের অনুপস্থিতি। তা ছাড়া ব্রিটিশ কমনওয়েলথ্ শুধু শ্বেতাঙ্গদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু রুশ শাসনতান্ত্রিক অগ্রগতি জাতিধর্মনির্বিশেষে সব গণতন্ত্র সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। সাম্রাজ্যবাদী পদ্ধতিতে মানব-সংহতি এবং ঐক্য স্থাপন যে অসম্ভব, সেকথা ভালভাবে প্রমাণিত হয় যখন দেখি যে ব্রিটিশ কমনওয়েলথ্-এর মধ্যেও সোভিয়েট ইউনিয়নের মত দৃঢ় সংঘবদ্ধ ঐক্য নাই। ব্রিটিশ দ্বীপের পাশবর্তী আয়ারের নিরপেক্ষতা এবং ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত লর্ড হ্যালিফাক্সের টরেণ্টো বক্তৃতায় ক্যানাডার অসন্তোষ জ্ঞাপন তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। কিন্তু সোভিয়েট রাষ্ট্রের উপর দিয়ে যে বিরাট ফ্যাসিস্ট-বিরোধী যুদ্ধের ঝড় বয়ে যাচ্ছে, তাতে একদিনের জন্যও বিভিন্ন জাতিধর্ম নিয়ে সংগঠিত সোভিয়েট ইউনিয়নে কোন অসংহতির প্রকাশ দেখা যায়নি। জনযুদ্ধ বলতে যদি যুদ্ধে জনগণের অংশ গ্রহণ করা বোঝায়, তবে একমাত্র সোভিয়েট রাষ্ট্রকেই বলা চলে প্রকৃত জনযুদ্ধে লিপ্ত। স্টালিন সোভিয়েট ইউনিয়নের এই দৃঢ়-সংবদ্ধ ঐক্য এবং অচ্ছেদ্য মানব সংহতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সজাগ বলেই তিনি যুদ্ধকালে বিভিন্ন সোভিয়েট গণতন্ত্রকে পররাষ্ট্রীয় সম্পর্ক স্থাপনের অধিকারদানে কুণ্ঠিত হননি। সোভিয়েট শাসনতন্ত্রের এই পরিবর্তন যে মঙ্গলপ্রসূ হতে বাধ্য, লণ্ডনের 'Economist' নামক পত্রিকাও সেকথা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন। এই শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তনের বিভিন্ন দিক আলোচনা করে উক্ত পত্রিকা মন্তব্য করেছেন :

"Marshal Stalin and M. Molotov have their eye on realities. Their 16 republics will hang to-gether for reasons invisible to the constitutional lawyer. It would be the height of foolishness to deny our selves what the Russians will certainly enjoy. Where association is truly free and good neighbourly and where the members are champions of a world order, it can surely do nothing but good."

মুস্কিল হচ্ছে এইখানেই। আজ যে ইংল্যাণ্ড ভারতকে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দানে নারাজ, তার কারণ ইংল্যাণ্ড জানে স্বায়ত্তশাসিত ভারতে ইংল্যাণ্ডের যথেচ্ছ অর্থনৈতিক শোষণ চলবে না। তা ছাড়া, স্বাধীন হয়ে ভারত ইংল্যাণ্ডের ধনতান্ত্রিক আদর্শের ফাঁকি ধরে ফেলে তার সঙ্গে মৈত্রীর সম্পর্ক না-ও রাখতে পারে—এরকম একটা সম্ভাবনাও ইংল্যাণ্ডের মনে উঁকি দেয় না কি? সম্প্রসারিত অধিকার প্রদানে সোভিয়েটের কিন্তু সে ভয় নেই। সোভিয়েট জানে যে তার শাসন পদ্ধতি এমন একটা রাষ্ট্র-ব্যবস্থার উপর সংস্থাপিত যার মূল কথা হচ্ছে সাম্য ন্যায় এবং মৈত্রী। সে আদর্শের মধ্যে ফাঁকি নেই।

সোভিয়েটের নতুন শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তনের পিছনে অপর একটি উদ্দেশ্যও থাকতে পারে। এই পরিবর্তন ঘোষণার মাত্র দুদিন পূর্বে হিটলার তাঁর শক্তি লাভের একাদশ বার্ষিকী উপলক্ষে বক্তৃতা দিতে গিয়ে চিরাচরিত বলশেভিক বিদ্বেষ প্রচার করেছেন। বলশেভিক আতঙ্কের জুজু দেখিয়েই একদিন তিনি জার্মানীর সর্বাধিনায়ক হয়েছিলেন এবং বলশেভিক আতঙ্কের ধুয়ো তুলেই তিনি পরাজয়ের পূর্বে শেষবারের মত সমগ্র ইউরোপকে সোভিয়েট রাশিয়ার বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ করার প্রয়াস পেয়েছেন। রুশ সৈন্য আজ সোভিয়েট ভূমি ছেড়ে যুদ্ধপূর্ব পোল্যাণ্ডের মধ্যে বহু দূর অগ্রসর হয়েছে। এ অবস্থায় বলশেভিক আতঙ্কের ফলে বাল্টিক রাষ্ট্র এবং মধ্য ইউরোপের অন্যান্য রাষ্ট্রের মনে যাতে বিরূপ ভাবের সঞ্চার না হয়, সেদিকে দৃষ্টি রেখেও স্টালিন এই শাসনতান্ত্রিক সংস্কার সাধন করে থাকতে পারেন। সোভিয়েট রাষ্ট্রের অধীন গণতন্ত্রগুলোকে সম্পূর্ণ পররাষ্ট্রীয় অধিকার এবং স্বতন্ত্র সৈন্যদল রাখবার অধিকার দিয়ে তিনি ইউরোপবাসীদের বোঝাতে চেয়েছেন যে, সোভিয়েট গণতন্ত্রগুলো নামে পরাধীন হলেও কার্যত তারা স্বাধীন। স্বাধীন ইচ্ছা অনুসারে সোভিয়েট ইউনিয়ন থেকে বিচ্যুত হবার অধিকার ত তাদের আছেই—তা ছাড়া এই নতুন অধিকার দুটোও তারা পেল। স্টালিন প্রবর্তিত এই নতুন শাসন-সংস্কারের ফলে হিটলার অধ্যুষিত ইউরোপে কি প্রতিক্রিয়া হবে, তা শীঘ্রই বোঝা যাবে। ইউরোপের পূর্বাঞ্চলের

(শেষাংশ ৫৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বিদুষী ভার্যা

—শ্রীউপেন্দ্র নাথ গঙ্গোপাধ্যায়—

৩২

দক্ষিণ হস্তের স্পর্শের দ্বারা যূথিকার চিবুক চুম্বন করিয়া ক্ষীরোদবাসিনী আশীর্বাদ করিলে যূথিকা ক্ষীরোদবাসিনীকে হাত ধরিয়া সযত্নে লইয়া গিয়া একটা চেয়ারে উপবেশন করাইল। তাহার পর সে এবং দিবাকর অপর দুইখানা চেয়ার অধিকার করিয়া বসিল।

প্রসন্নমুখে ক্ষীরোদবাসিনী বলিল, "চুরি করে যা দেখতে এসেছিলাম, সেই যুগল-মিলন দেখে সত্যিই চোখ জুড়োলো। কিন্তু এমন চমৎকার রাধিকা কি করে পেলি দিবাকর?"

স্মিতমুখে দিবাকর বলিল, "পাঞ্জাবে লাহোর নামে এক বৃন্দাবন আছে, সেখানে বেড়াতে গিয়ে। —হঠাৎ।"

ধীরে ধীরে মাথা নাড়িয়া ক্ষীরোদবাসিনী বলিল, "হঠাৎ এ জিনিস পাওয়া যায় না; অনেক দিনের তপস্যার ফলে পেয়েছিস।"

দিবাকর বলিল, "সে কথা যদি বল, তাহলে মাত্র দিন-চারেকের তপস্যার ফলেই পেয়েছি।"

মৃদু হাসিয়া ক্ষীরোদবাসিনী বলিল, "ভুল করছিস দিবাকর। দিন-চারেক তপস্যা করেছিলি লাহোরে গিয়ে; তার আগে মনে মনে অনেক দিন করেছিলি।"

ক্ষীরোদবাসিনীর কথা শুনিয়া বিস্ময়চকিত কৌতুকে দিবাকরের এবং যূথিকার দৃষ্টি মুহূর্তের জন্য পরস্পরের সহিত মিলিত হইল। পরমুহূর্তে ক্ষীরোদবাসিনীর দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া লইয়া দিবাকর বলিল, "মনে মনে তপস্যা কার জন্যে করেছিলাম, সে কথা জানতে যদি কৌতূহল হয়, তাহলে তোমার নাতবউকে জিজ্ঞাসা করে দেখতে পারো। ডেলিভারি দেবার সময় নিয়তি তপস্যার বর অদলবদল করে ফেলেছে। তার ফলে আর কারো তপস্যার ধন গোলেমালে আমার ভাগ্যে এসে উঠেছে। ছিলাম নীলকান্ত মণির প্রত্যাশী, পেয়ে গেছি কমল হীরে।" বলিয়া দিবাকর হাসিতে লাগিল।

কমল হীরে না-হয় কতকটা বোঝা গেল; কিন্তু নীলকান্ত মণির দ্বারা দিবাকর ঠিক কি বুঝাইতে চাহে তাহা ভাবিতে গিয়া ক্ষীরোদবাসিনীর মনে একটা খট্‌কা উপস্থিত হইল। বিশেষত, প্রথম দিনের সাক্ষাৎকালে হীরার আংটি এবং নীলার আংটির প্রসঙ্গে দিবাকর যে সকল কথা বলিয়াছিল, তাহার সহিত জড়িত হইয়া এই খট্‌কাটা আরও বেশি জটিল হইয়া উঠিল। শুধু তাহাই নহে, এই জটিলতার মেঘাবরিত আকাশে কালো মাণিকের কথাটাও কোন্ দিক দিয়া কেমন করিয়া অকস্মাৎ একবার ঝিলিক মারিয়া মিলাইয়া গেল। কিন্তু কোন দিক দিয়া কোন প্রকার যোগসূত্র ধরিতে না পারিয়া ক্ষীরোদবাসিনী সাধারণভাবে দিবাকরের কথার উত্তর দিয়া বলিল, "এ অদলবদলের কথা নয় দিবাকর, এ ভাগ্যের কথা। ভাগ্য যখন প্রবল হয়, তখন ধুলো-মুঠো ধরলে সোনা-মুঠো হয়, সেকথা শুনেছিস ত —এ সেই প্রবল ভাগ্যের কথা। তোর কপালে যখন কমল হীরে রয়েছে, নীলকান্ত মণি চাইলে কি হবে?"

এ কথার কোন বাচনিক উত্তর না দিয়া দিবাকর শুধু একটু হাসিল। মনে মনে বলিল, "ভাগ্য প্রবলই শুধু নয় ক্ষীরোদ ঠাকমা, প্রবলতর। মনে-প্রাণে যে জিনিস পরিহার করতে চেয়েছিলাম, কপালে সেই জিনিসই এসে জুটেছে।"

যূথিকার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সহাস্যমুখে ক্ষীরোদবাসিনী বলিল, "কিন্তু তপস্যা শুধু দিবাকরকেই করতে হয়নি ভাই নাতবউ, তোমাকেও করতে হয়েছিল। তুমি যা পেয়েছ, তাও তপস্যা করেই পেতে হয়। স্বীকার কর কি না?"

স্মিতমুখে মৃদুস্বরে যূথিকা বলিল, "নিশ্চয় করি ঠাকমা।"

হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া দিবাকর বলিল, "তাহলেই হয়েছে! আমার মত বর্বর বর যদি তপস্যা করে পেতে হয়, তাহলে সে তপস্যার ষোল আনাই ফাঁকি।"

চক্ষে তীক্ষ্ম ভ্রূকুটি হানিয়া ক্ষীরোদবাসিনী বলিল, "কিসে তুই বর্বর হলি, শুনি?"

সে কথার উত্তর না দিয়া মাথা নাড়িয়া বারান্দার প্রান্তভাগে ইঙ্গিত করিয়া দিবাকর বলিল, "ঐ দেখ, কে আসছে।"

বারান্দা পর্যন্ত শিবানীকে পেঁছাইয়া দিয়া আনন্দ তখন ফিরিয়া যাইতেছিল। পিছন ফিরিয়া চাহিয়া দেখিয়া সহাস্যমুখে ক্ষীরোদবাসিনী বলিল, "এই যে আমার কালো মাণিক' এসে পড়েছেন! মিনিট পনেরো দেরি করে আসতে বলেছিলাম, কিন্তু সে সবুরও সয়নি।"

স্মিতমুখে সকুণ্ঠপদে শিবানী ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছিল। পরিধানে তাহার বেগুনফুল রঙের হাল্কা ঢাকাই শাড়ি। সেই সমগোত্রীয় বর্ণের আবেষ্টনের মধ্যে তাহার দেহের শ্যামল শ্রী নীলকান্ত মণির মতই দেখাইতেছিল।

যূথিকার নিকট উপস্থিত হইয়া শিবানী মৃদুস্বরে বলিল, "আপনার সঙ্গে দেখা করতে এলাম বউদিদি।" তাহার পর নত হইয়া যূথিকার পদধূলি গ্রহণ করিল।

তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইয়া দুই হাত দিয়া শিবানীকে জড়াইয়া ধরিয়া যূথিকা তাহাকে পার্শ্ববর্তী চেয়ারে বসাইয়া স্মিতমুখে বলিল, "কতদিন এসেছ, আর এত দেরি করে বউদিদির সঙ্গে দেখা করতে আসতে হয় ভাই?"

এ কথার উত্তর দিল ক্ষীরোদবাসিনী; বলিল, "তাই কি আজই সহজে আসতে চায়। কত ওজর-আপত্তি করে, কত ভয়ে ভয়ে, তবে এসেছে।"

বিস্মিত কণ্ঠে যূথিকা বলিল, "কেন, ভয় কিসের ঠাকুরমা?"

ক্ষীরোদবাসিনী বলিল, "এম-এ পাশ বউদিদিকে লেখাপড়া না-জানা ননদের যা ভয়। একেবারে লেখাপড়া জানে না, সে কথা বললে অবিশ্যি অন্যায় হয়। বাঙলা লেখাপড়া নিতান্ত মন্দ জানে না। কিন্তু রোগে শোকে, অভাবে-কষ্টে ইংরেজি ইস্কুলে ত' তেমন পড়তে পারলে না, সেই জন্যে ইংরেজি তেমন কিছু শেখে নি।"

কৌতূহলের বশবর্তিনী হইয়া যূথিকা জিজ্ঞাসা করিল, "তবু কতটা শিখেছে?"

শিবানীর দুই চক্ষে ভ্রূকুটির ভর্ৎসনা লক্ষ্য করিয়া ক্ষীরোদবাসিনী সহাস্য-মুখে বলিল, "ঐ দেখ, চোখ রাঙিয়ে শিবু আমাকে বলতে মানা করছে। তোর বউদিদি ত' দিবাকরের চেয়েও কত বেশি লেখাপড়া জানে, তবে তোরই বা এত লজ্জা কিসের?" তাহার পর যূথিকার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "অবিশ্যি বলতে যে ও মানা করছে, তা অন্যায়ও নয়; বলবার মতো এমন কিছুই নেই। ইংরেজির ফার্স্ট বই পড়ছে শিবু; তাও সবটা এখনো শেষ করতে পারেনি।"

শিবানীর দিকে চাহিয়া সহাস্য মুখে যূথিকা বলিল, "এতে লজ্জা করবার ত' কিছু নেই শিবানী। তুমি ত' ইংরেজের মেয়ে নও যে, ইংরেজি না জানা তোমার পক্ষে লজ্জার কথা। কি হবে মিছিমিছি কতকগুলো ইংরেজি পড়াশুনো করে?"

বিস্মিত কণ্ঠে ক্ষীরোদবাসিনী বলিল, "মিছিমিছি ইংরেজি পড়াশুনো করে! কিন্তু এতটা লেখাপড়া ক'রে এ কথা তোমার মুখে ত' সাজে না ভাই নাতবউ!"

কিন্তু এ কথা যে যূথিকার অন্তরের কথা নহে, মুখেরই কথা সুতরাং মুখেই সাজে, সে কথা সে কেমন করিয়া বলে। সাজাইয়া একটা কোনো কথা বলিতে গেলে পাছে তাহার সূত্র ধরিয়া অপর কোনো কঠিনতর কথা আসিয়া পড়ে সেই আশঙ্কায় মৃদু হাস্যের দ্বারা সে এ প্রসঙ্গ শেষ করিবার চেষ্টা করিল।

কিন্তু যূথিকার এই নিরুত্তরতার ছেদই ক্ষীরোদবাসিনীর মনে কৌতূহল জাগাইয়া তুলিল। মনে হইল এই ছেদই যথার্থ ছেদ নহে; ইহার পরও এমন কিছু আছে যাহা সহজে বলা যায় না বলিয়াই হাসি দিয়া ঢাকিবার যোগ্য। দিবাকরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সে বলিল, "কি ব্যাপার বল্ দেখি দিবাকর?"

মৃদু হাসিয়া দিবাকর বলিল, "কিসের কি ব্যাপার?"

ক্ষীরোদবাসিনী বলিল, "নাত-বউয়ের মুখে ইংরেজি লেখাপড়ার বিষয়ে এই সব কথা; নাতবউয়ের এই ভাব, এই মূর্তি? আমি ত' একটা উগ্রচণ্ড মেমসাহেবি ভাব দেখব বলে কতকটা ভয়ে ভয়েই এসেছিলাম। কিন্তু এসে দেখছি একেবারে উল্টো মূর্তি। মুখে খৈ-ফোটা কথা নেই, কথায় কথায় ইংরেজি বুলির বুকনি নেই, হাল ফ্যাশানের যখন—তখন হাসি নেই। দেখতে আমার ত' কিছু বাকি নেই দিবাকর। উনি বেঁচে থাকতে মাঝে মাঝে দার্জিলিঙে মামার বাড়ি গিয়ে কাটিয়ে আসতাম। আর তুই ত' জানিস দার্জিলিঙ হচ্ছে ফ্যাশানওয়ালা বাঙালী মেয়েদের টেক্কা দেবার জায়গা। আমি মনে ক'রে এসেছিলাম নাত-বউকে সেই গোত্রেরই একটি নাকে-মুখে-চোখে কথা কওয়া মেয়ে দেখব। কিন্তু এ যে একেবারে বিপরীত দেখছি!"

সহাস্যমুখে দিবাকর বলিল, "গ্রহণ দেখেছ ক্ষীরোদ ঠাকমা?"

চক্ষু কুঞ্চিত করিয়া ক্ষীরোদবাসিনী বলিল, "এতখানি বয়স হ'ল, 'গ্রহণ দেখেছ কি রকম?"

"তোমাদের নাত-বউয়ে সেই গ্রহণ লেগেছে। রাহুগ্রস্ত হয়েছেন তোমাদের নাতবউ।"

"রাহু কে? তুই?"

"আমি ত' খানিকটা নিশ্চয়ই; তা ছাড়া আমাদের বাড়ির আবহাওয়া, আমাদের বাড়ির সংস্কার, ইতিহাস।"

এক মুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া ক্ষীরোদবাসিনী বলিল, "সব কথা তোর বুঝতে পারিনে, কিন্তু এমন চকচকে চাঁদে গ্রহণ লাগিয়ে জ্যোৎস্না থেকে নিজেকে বঞ্চিত করিসনে দিবাকর।"

ক্ষীরোদবাসিনীর কথা শুনিয়া দিবাকর হাসিয়া উঠিয়া বলিল, "তোমার মুখ দিয়ে যে রীতিমত কাব্য বের হতে আরম্ভ করল ক্ষীরোদ ঠাকমা!"

এ কথার উত্তর দিবাকরকে না দিয়া যূথিকার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ক্ষীরোদবাসিনী বলিল, "আচ্ছা, তুমিই বিচার কর ভাই যূথিকা, যে কথা আমি বলছি তা কাব্য, না খাঁটি সত্যি কথা?"

ক্ষীরোদবাসিনী এবং দিবাকরের মধ্যে যে প্রবাহে কথোপকথন চলিয়াছিল, শুরু হইতেই যূথিকা মনে মনে তাহা অপছন্দ করিতেছিল। নিজেকে কোনো প্রকারে তাহার মধ্যে লিপ্ত না করিবার আগ্রহে সে বলিল, "আপনারা নাতি-ঠাকুমায় কাব্য করছেন, আমি তার মধ্যে কি বলব বলুন? আপনারা দুজনে কথাবার্তা বলুন, শিবানীকে আমি একটু বেড়িয়ে নিয়ে আসি।" বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

শিবানীও এ প্রস্তাবে অতিশয় খুশি হইয়া চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল।

বিস্মিত কণ্ঠে দিবাকর বলিল, "কোথায় বেড়িয়ে নিয়ে আসবে?"

মৃদু হাসিয়া যূথিকা বলিল, "বেশী দূরে কোথাও নয়; এ ঘর ও ঘর। বড় জোর, পিছন দিকের ফুল বাগানে একটু।"

প্রসন্ন মুখে ক্ষীরোদবাসিনী বলিল, "আমার কালোমাণিককে তোমার ভাল লেগেছে ভাই।"

"খুব ভাল লেগেছে। আপনার কালোমাণিক অনেক সাদামাণিকের চেয়েও ভাল।" বলিয়া শিবানীকে লইয়া যূথিকা প্রস্থান করিল।

সেইদিন রাত্রে শয়ন কক্ষে দিবাকরের সহিত যূথিকা মিলিত হইলে কথায় কথায় সে জিজ্ঞাসা করিল, "শিবানীকে তোমার কেমন লাগে?"

এক মুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া দিবাকর বলিল, "ভালই লাগে।"

"আচ্ছা, শিবানী তোমার নীলকান্তমণি দলের মেয়ে, না? যে দলের মেয়ের জন্যে বিয়ের আগে তুমি প্রত্যাশী ছিলে?"

পুনরায় এক মুহূর্ত মনে মনে কি চিন্তা করিয়া দিবাকর বলিল, "তা হয়ত' বলতে পারো।"

"শিবানীর সঙ্গে তোমার বিয়ে হ'লে বেশ হোত,—না?"

অল্প একটু হাসিয়া দিবাকর বলিল, "এর উত্তরে আমি যদি বলি, 'সুনীথদাদার সঙ্গে তোমার বিয়ে হ'লে বেশ হোত,—না?' তা হলে কি বলবে?"

"তা হ'লে বলব, আমার কথার উত্তর না দিয়ে কথাটা তুমি এড়িয়ে যাচ্ছ।"

"সে কথার উত্তরে আমি বলব, রাত হয়েছে শুয়ে পড়। তর্কটা ক্রমশ এমন জায়গায় প্রবেশ করবার চেষ্টা করছে, যেখানে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একটা কোনো রকম বোঝাপড়া হওয়ার চেয়ে না হওয়াই বোধ হয় অনেক সময়ে ভাল।" বলিয়া দিবাকর শয্যার মধ্যে প্রবেশ করিয়া লেপ টানিয়া শুইয়া পড়িল।

পরদিন সকালে দশটা আন্দাজ যূথিকা তাহার পড়িবার ঘরে বসিয়া চিঠি লিখিতেছিল, এমন সময়ে দিবাকর প্রবেশ করিয়া একটা চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিয়া বলিল, "একটি ছেলের পক্ষ থেকে তোমার কাছে দরবার করতে এলাম যূথিকা।"

কলমটা বন্ধ করিয়া রাখিয়া যূথিকা বলিল, "কি বল?"

"অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় নামে একটি ছেলে তোমার অটোগ্রাফের জন্যে খাতা দিয়ে আমাকে তোমার কাছে পাঠিয়েছে। এমন অবলীলার সঙ্গে সে আমাকে এই কাজে লাগিয়েছে, যাতে মনে হয় যে, মুর্খ স্বামীকে দিয়ে বিদুষী স্ত্রীর অটোগ্রাফ জোগাড় করিয়ে নিলে মুর্খ স্বামীকে আপ্যায়িত করাই হবে, এই তার ধারণা। আমি কিন্তু অরুণের খাতার সঙ্গে আরও একটা খাতা এনেছি।"

"সেটা কার খাতা?"

"সেটা আমার। দেরাজের মধ্যে অনেক দিন থেকে একটা বাঁধানো পকেট-বুক ছিল, সেইটেই আমার অটোগ্রাফের খাতা করেছি। তা'তে প্রথম অটোগ্রাফ সংগ্রহ করব তোমার। তারপর সুনীথদাদা প্রভৃতির। জগতে অনেক রকম জাত আছে, যেমন হিন্দু-অহিন্দু, ধনী-দরিদ্র, সাদা-কালো। তেমনি আরও দুটো জাত আছে; প্রথম জাত, যারা অটোগ্রাফ নেয়; আর দ্বিতীয়, যারা অটোগ্রাফ দেয়। আমি প্রথম জাতের অন্তর্গত, তুমি দ্বিতীয় জাতের। আমার খাতায় তোমার অটোগ্রাফ দাও যূথিকা।"

হাত বাড়াইয়া যূথিকা বলিল, "কই, খাতা দেখি।"

পকেট হইতে দুইখানা খাতা বাহির করিয়া দিবাকর যূথিকার সম্মুখে স্থাপন করিল।

দিবাকরের খাতাখানা বাছিয়া লইয়া কলম খুলিয়া প্রথম পৃষ্ঠায় যূথিকা ধীরে ধীরে স্পষ্টাক্ষরে লিখিল,—"সাধারণ অবস্থায় এবং সাধারণ ধারণায় কোন বস্তু যতই উপকারী এবং মঙ্গল-প্রদ হউক না কেন, কোন বিশেষ অবস্থায় তাহা যদি অশুভকর হইয়া উঠে, তাহা হইলে সেই আপাত-মঙ্গল-প্রদ বস্তুকে বিষবৎ পরিত্যাগ করা উচিত।" তাহার পর নিজের নাম ও তারিখ লিখিয়া দিবাকরের হস্তে ফিরাইয়া দিল।

পড়িয়া দেখিয়া দিবাকর বলিল, "এই আপাত-মঙ্গলপ্রদ বস্তুটি কে যূথিকা? আমি না কি?"

যূথিকা বলিল, "এখনো ত তেমন কথা মনে হয় না। কিন্তু তোমাকে উদ্দেশ করে যখন লিখেছি, তখন আমিও ত হতে পারি।"

"আচ্ছা, সে বিচার পরে করলেই হবে, আপাতত তোমাকে শত ধন্যবাদ। এবার এ খাতাটায় কিছু লিখে দাও।" বলিয়া দিবাকর অপর খাতাখানা যূথিকার দিকে একটু ঠেলিয়া দিল।

খাতাখানা তুলিয়া দিবাকরের সম্মুখে স্থাপিত করিয়া যূথিকা বলিল, "এ খাতায় একটি অক্ষরও লিখব না। তোমার খাতাতেই আমি শেষ অটোগ্রাফ লিখলাম।"

"কিন্তু ওকে আমি কথা দিয়েছি।"

"এবার তাহলে কথার খেলাপ হ'ল। এর পর আর কাউকে কখনো কথা দিয়ো না।"

দিবাকর পুনরায় কি বলিতে যাইতেছিল, করজোড়ে মিনতিপূর্ণ কণ্ঠে যূথিকা বলিল, "আমাকে ক্ষমা করো, আমার বেশি সময় নেই, এই জরুরী চিঠিটা এখনি আমাকে শেষ করতে হবে।"

সেই দিনই অপরাহ্নকালে সেই জরুরী চিঠিটা দিবাকরের হস্তে আসিয়া পৌঁছিল।

(ক্রমশ)

সোভিয়েট শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তন

(৫১ পৃষ্ঠার পর)

রাষ্ট্রগুলো নাৎসীদের চাপে পড়ে সোভিয়েট ইউনিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত হলেও, সেখানকার জনগণের সহানুভূতি বোধ হয় সোভিয়েট রাশিয়ারই দিকে। যুগোস্লাভিয়ায় কম্যুনিস্ট নেতা তিতোর গভর্নমেণ্টের দৃঢ় আত্মপ্রতিষ্ঠা তার অন্যতম প্রমাণ। হিটলার অধিকৃত অন্যান্য ইউরোপীয় রাষ্ট্রেও শীঘ্রই এই বিপ্লবাত্মক আলোড়ন দেখা দেবে না—সে সম্বন্ধে কোন নিশ্চিত উক্তি করা যায় কি? এইসব কথা বিবেচনা করলে মনে হয় যে, সোভিয়েটের নতুন শাসনতান্ত্রিক সংস্কারে শুধু যে আভ্যন্তরীণ শাসন-ব্যবস্থায় পরিবর্তন আসবে তাই নয়—এই পরিবর্তন যুদ্ধোত্তর ইউরোপে সোভিয়েটের প্রভাব ও মর্যাদা বৃদ্ধিতেও যথেষ্ট সাহায্য করবে।

রঙ্গজগৎ

পোষ্যপুত্র

ভ্যারাইটি পিকচার্সের নতুন ছবি। কাহিনী—অনুরূপা দেবী; পরিচালক সতীশ দাশগুপ্ত; সুরশিল্পী—দুর্গা সেন; চিত্র-শিল্পী—অজয় কর, শব্দধর—গৌর দাস; বিভিন্ন ভূমিকায়—শিশির ভাদুড়ী, শৈলেন চৌধুরী, প্রমোদ গাঙ্গুলী, বিমান বানার্জি, জহর গাঙ্গুলী, তুলসী চক্রবর্তী, ইন্দু মুখার্জি, রেণুকা রায় সাবিত্রী, প্রভা, দেববালা, রাজলক্ষ্মী, নিভাননী প্রভৃতি।

স্বীকার করতে লজ্জা নেই যে, ছোটবেলায় সুলেখিকা অনুরূপা দেবীর 'পোষ্যপুত্র' নামক বিরাট উপন্যাসখানি পড়ে আমরা বিস্ময়বিমুগ্ধ হতাম। শিশু মনের কাছে অনুরূপা দেবীর ভাবালুতা-প্রধান প্রত্যেকখানি উপন্যাসেরই একটা বিশেষ আবেদন ছিল। তারপর ধীরে ধীরে যতই জ্ঞান বাড়ছে, বুদ্ধি বিকাশের সাথে সাথে ভাব-প্রবণতা যত কমতে শুরু করেছে, বুদ্ধি প্রধান মনের কাছে অনুরূপা দেবীর উপন্যাসের আবেদনও হয়ে এসেছে ততটা ফিকে। তাই পোষ্যপুত্রের চিত্ররূপ দেখতে গিয়ে মনে ভয় ছিল যে, হয়ত এই বিরূপ মনোভাবের উপর রূপালী পর্দা বিকৃত প্রভাবেরই সৃষ্টি করবে। কার্যত তা ঘটেনি বলেই মনে হচ্ছে যে, পরিচালক বেশ কিছুটা সাফল্যের সঙ্গেই কাহিনীটিকে পর্দায় রূপান্তরিত করতে পেরেছেন। স্থান বিশেষের ভাবালুতা বুদ্ধি-প্রধান মনকে নাড়া দিয়ে অনুকূল ভাবের সৃষ্টি করতে পারে না বটে—তবে চিত্রখানি মোটামুটি মনের উপর বিরূপভাব সৃষ্টি করে না। দর্শক সাধারণকে 'পোষ্যপুত্র' তৃপ্তি দিতে পারবে—এ বিশ্বাস আমাদের আছে।

'পোষ্যপুত্র' সামাজিক কাহিনী হলেও এতে বাঙলা দেশের যে সমাজ-জীবন চিত্রিত হয়েছে, বহুদিন হল বাঙলাদেশ থেকে সে সমাজ প্রায় লুপ্ত হয়ে এসেছে। বাঙলাদেশের সমাজে যে ডাকসাইটে ধনী জমিদারশ্রেণী ছিলেন, এখনও তাঁরা কেউ কেউ আছেন বটে—কিন্তু তাঁদের সে পূর্ব তেজ আর নেই। 'পোষ্যপুত্র' তাঁদেরই একজনের কাহিনী। বইটির নাম 'পোষ্যপুত্র' হলেও এর প্রধান চরিত্র জমিদার শ্যামাকান্ত রায়—যিনি প্রতাপশালী জমিদার স্নেহবান অথচ একগুয়ে পিতা। তাঁর চরিত্রের বজ্র সুলভ দৃঢ়তা এবং কুসুম সুলভ কোমলতা সারা কাহিনীকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। সমস্ত চরিত্রগুলোকে নিষ্প্রভ করে তিনি ঘাড় উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। বিপত্নীক শ্যামাকান্ত যখন গ্র্যাজুয়েট পুত্রকে বিয়ে করার আদেশ দিলেন, তখন পুত্র রাজী না হয়ে আরও বেশী পড়াশুনো করার ইচ্ছা প্রকাশ করল। যে জমিদার কোন দিন কারও অবাধ্যতা সহ্য করেন নি—তাঁর মুখের উপর পুত্রের এই অবাধ্য উক্তিতে তিনি ক্রোধান্ধ হয়ে তাকে বলে বসলেন: "তুই আমার ছেলে নেস্।" অভিমানী পুত্র বিনোদও পিতার এই উক্তিতে মর্মাহত হয়ে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল পথে। নানা অবস্থা বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে তার জীবন চলল। সে বিয়ে করল—তার ছেলে হল। এদিকে পুত্রশোকাতুর শ্যামাকান্ত বহু দিন বিনোদের আগমন প্রত্যাশায় বসে রইলেন। সে আর ফিরে এল না দেখে তিনি দূর সম্পর্কের আত্মীয়-পুত্র হেমেন্দ্রকে পোষ্যপুত্র নিলেন—তার সঙ্গে নিজের পুত্রের জন্যে বাগ্‌দত্তা মেয়ের বিয়ে দিলেন। হেমেন্দ্র কিন্তু শীঘ্রই পাড়ার কয়েকজন সমবয়সী ইয়ার-বন্ধুর পাল্লায় পড়ে উচ্ছৃঙ্খলতার পথে চলল। পরে অবশ্য নানা রকম ঘটনার মধ্যে দিয়ে হেমেন্দ্রর সাময়িক মতিচ্ছন্নতা দূর হল—অভিমানী বিনোদও শেষ পর্যন্ত স্ত্রী-পুত্র নিয়ে এসে স্নেহময় পিতার কাছে হাজির হল। মিলনাত্মক উপন্যাস পোষ্যপুত্রের এই হল মূল কাহিনী।

পর্দার গায়ে মূল কাহিনীর বিভিন্ন চরিত্র চিত্রনাট্যকার ও পরিচালক সতীশ দাশগুপ্ত ভালোভাবে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন। জমিদার শ্যামাকান্তের সবল স্নেহপ্রবণ জটিল চরিত্রটির রূপদান করেছেন বাঙলা রঙ্গমঞ্চের অপ্রতিদ্বন্দ্বী শ্রেষ্ঠ অভিনেতা শিশিরকুমার ভাদুড়ী। মঞ্চে এই চরিত্রে তাঁর অভিনয় যে সর্বাঙ্গসুন্দর হত একথা নিঃসংশয়ে বলা চলে। কিন্তু চলচ্চিত্রে তাঁর এই রূপদান সর্বাঙ্গসুন্দর হয়নি। মঞ্চ ও চলচ্চিত্র অভিনয়ের অন্তর্নিহিত বিভিন্নতাই হয়ত এর জন্যে অনেকাংশে দায়ী। তাই স্থানে স্থানে তাঁর অভিনয় নেহাৎ মঞ্চঘেঁষা হয়ে পড়েছে। তবে স্থানবিশেষে তিনি যে অপূর্ব ভাব-ব্যঞ্জনার সাহায্যে শ্যামাকান্তের জটিল চরিত্রটি ফুটিয়ে তুলেছেন, বাঙলা চলচ্চিত্রে তার তুলনা মেলা দুরূহ। বিশেষ করে শেষ দৃশ্যে তিনি যে অভিনয় করেছেন সেটা অপূর্ব বললেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। বহুদিন পরে শিশিরকুমারের চিত্রাবতরণে চিত্রামোদীরা খুশিই হবেন। বিনোদের ভূমিকায় প্রমোদ গাঙ্গুলীর অভিনয় মোটামুটি মন্দ নয়। হেমেন্দ্রের ভূমিকায় নবাগত অভিনেতা বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় সুদর্শন বটে; কিন্তু মাইকের দোষে কিনা জানি না, তাঁর বাচন পদ্ধতি সুশ্রাব্য বলে মনে হল না। রজনীনাথের ভূমিকায় শৈলেন চৌধুরী বেশ সুষ্ঠু সংযত অভিনয় করেছেন। মাণিকচাঁদের ভূমিকায় জহর গঙ্গোপাধ্যায় প্রচুর হাসির খোরাক জোগালেও, তাঁর ভূমিকাটি উপযুক্ত হয় নি! নারী চরিত্রগুলোর মধ্যে শিবানীর ভূমিকায় রেণুকা রায় সুঅভিনয় করেছেন। শান্তির ভূমিকায় সাবিত্রীর অভিনয় ভাল না হলেও তাঁর কণ্ঠ-সংগীত সুগীত হয়েছে। সিদ্ধেশ্বরীর ভূমিকায় শ্রীমতী প্রভার অভিনয় উল্লেখযোগ্য। অন্যান্য পার্শ্ব চরিত্রগুলোও সুঅভিনীত হয়েছে। "পোষ্যপুত্রের" মূল্যবান দৃশ্যপটগুলো ছবির অন্যতম প্রধান আকর্ষণ। চিত্রশিল্পে অজয় কর বেশ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। তবে শব্দ গ্রহণে আরও উন্নতির অবকাশ ছিল। সুরশিল্পী দুর্গা সেনের সংগীত পরিচালনা মন্দ নয়।

ভক্তরাজ

জয়ন্ত দেশাই প্রোডাকসন্সের হিন্দী বাণী-চিত্র। প্রযোজক ও পরিচালক জয়ন্ত দেশাই; সংগীত পরিচালক—সি রামচন্দ্র, শিল্প নির্দেশক—এইচ এস গঙ্গনায়ক, আলোকচিত্র—নানুভাই ভাট, বিভিন্ন ভূমিকায়—বিষ্ণুপন্থ পাগ্‌নিস, বাসন্তী, কৌশল্যা, মুবারক, দীক্ষিত প্রভৃতি।

ভক্তিমূলক চিত্র নির্মাণে জয়ন্ত দেশাই ইতিমধ্যেই বেশ সুনাম অর্জন করেছেন। প্রমাণ "তানসেন" ও "ভক্ত সুরদাস"। ভক্তি-মূলক কাহিনীর অবাস্তবতাকে যদি বাদ দিয়ে বিচার করি, তবে "ভক্তরাজ"কেও প্রথম শ্রেণীর চিত্র বলতে দ্বিধা বোধ করার কারণ নেই। অযোধ্যার একজন পরম ভক্ত যুবরাজ অম্বরীশের কাহিনী বর্তমান চিত্রটির প্রধান উপজীব্য। ভক্তের ভগবান ভক্তকে সর্বপ্রকার বিপদের হাত থেকে রক্ষা করেন এবং শেষ পর্যন্ত ভক্তের জয় অবধারিত—বর্তমান চিত্রের সাহায্যে এই কথাটাই সাধারণ্যে প্রচার করার চেষ্টা করা হয়েছে। তবে ভক্তদের সাধারণত যেরূপ অতিমানব এবং অলৌকিক শক্তির আধার রূপে কল্পনা করা হয়, বর্তমান ছবিতেও তার ব্যতিক্রম দেখলাম না। ভারতীয় কোন চিত্রেই, সাধারণত ভক্তদের মানুষ হিসাবে বিচার করা হয় না কেন? অলৌকিকতার আবেদন জনমনের কাছে ব্যাপক হলেও, বুদ্ধিমান দর্শকদের সৌন্দর্যবোধ এর দ্বারা পীড়িত হয়। আমরা যখন চোখের সামনে বিষ্ণুর সুদর্শন চক্র ঘুরতে দেখি, তখন বিস্মিত হয়ে গেলেও, বুদ্ধি দিয়ে তাকে গ্রহণ করতে পারি না। 'ভক্তরাজে' এই জাতীয় অলৌকিক দৃশ্যাবলীর প্রাচুর্য বিশেষভাবে বিদ্যমান। তা নইলে দৃশ্য-সজ্জা, সেটিং প্রভৃতির দিক থেকে বিচার করলে 'ভক্তরাজ'-কে অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিত্র বলে স্বীকার না করে উপায় নেই। নাম ভূমিকায় কিছুদিন পূর্বে মৃত অভিনেতা বিষ্ণুপন্থ পাগ্‌নিস অভিনয়ে এবং সংগীতে আমাদের মুগ্ধ করেছেন। বাসন্তী ও কৌশল্যার অভিনয় এবং কণ্ঠ সংগীতও উল্লেখযোগ্য। অন্য দুইটি চরিত্রে মুবারক এবং দীক্ষিতের অভিনয় ভাল হয়েছে বলা চলে। উচ্চাঙ্গের সংগীত পরিবেশনের জন্যে সুরশিল্পী সি রামচন্দ্র কৃতিত্বের দাবী করতে পারেন। আলোকচিত্র ও শব্দ গ্রহণ বেশ সুন্দর হয়েছে।

খেলাধূলা

নিখিল ভারত অলিম্পিক প্রতিযোগিতা

পাতিয়ালায় নিখিল ভারত অলিম্পিক অনুষ্ঠান শেষ হইয়াছে। পাতিয়ালার এ্যাথলিট-গণ বিভিন্ন বিষয় সাফল্যলাভ করিয়া মোট ১২৯ পয়েণ্ট পাওয়ায় সার দোরাবজী টাটা কাপ লাভ করিয়াছেন। বোম্বাই দল ৩৯ পয়েণ্ট পাইয়া দ্বিতীয় ও ৩০ পয়েণ্ট পাইয়া পাঞ্জাব তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়াছেন। বাঙলার এ্যাথলিটগণ একমাত্র ৫০০০ মিটার ভ্রমণ ব্যতীত কোন বিষয়েই প্রথম স্থান অধিকার করিতে পারেন নাই। উক্ত ভ্রমণ বিষয়ে দুইজন বাঙালী এ্যাথলিট ১ম ও ২য় স্থান অধিকার করিয়াছেন। ভারোত্তলন বিষয়ে বাঙলা দল প্রথম হইয়াছে। অন্যান্য খেলা ও কুস্তি বিষয়ে তাঁহারা শোচনীয় ফলাফল প্রদর্শন করিয়াছেন। বাঙলার প্রতিনিধিগণ এইরূপ যে শোচনীয় ফলাফল প্রদর্শন করিবেন ইহা আমরা পূর্ব হইতেই জানিতাম এবং সেই-জন্যই প্রতিনিধি প্রেরণে আপত্তি করিয়াছিলাম। যাহা হউক, ভবিষ্যতে প্রতিনিধি প্রেরণের সময় নিজেদের অবস্থার কথা স্মরণ করিয়া কার্য করিবেন বলিয়া মনে হয়। আশা করি, নিয়মিত শিক্ষার যে কি মূল্য তাহা পাতিয়ালার এ্যাথলিটগণের সাফল্য হইতে ভাল করিয়া উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। এই অনুষ্ঠানে ৯টি বিষয় নূতন ভারতীয় রেকর্ড প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং একটি বিষয় ভারতীয় রেকর্ডের সমান হইয়াছে। উক্ত ৯টি বিষয়ের মধ্যে ছয়টি বিষয় পাতিয়ালার এ্যাথলিটগণ ও ৩ বিষয় বোম্বাইর সাইকেল চালকগণ রেকর্ড প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

নিম্নে নূতন ভারতীয় রেকর্ডের তালিকা প্রদত্ত হইল:—

(১) ৩০০০ মিটার দৌড়:—চাঁদ সিং (পাতিয়ালা) সময়:—৮ মিঃ ৪৫.৫ সেকেণ্ড।

(২) হাতুড়ী ছোড়া:—লাকিশা সিং (পাতিয়ালা) দূরত্ব:—১৪৭ ফিট ১০ ইঞ্চি।

(৩) ১০০০ মিটার সাইকেল:—(প্রথম হিটে) কর্ডার (বোম্বাই) সময় ১ মিঃ ২৪.৫ সেকেণ্ড।

(৪) ৪০০ মিটার হার্ডল:—(দ্বিতীয় হিটে) প্রীতম সিং (পাতিয়ালা) সময়:—৫৬.২ সেকেণ্ড।

(৫) ১০০ কিলো মিটার সাইকেল:—কর্ডার (বোম্বাই) সময়:—৩ মিঃ ৪০ সেকেণ্ড।

(৬) ২০০ মিটার হার্ডল:—(দ্বিতীয় হিটে) প্রীতম সিং (পাতিয়ালা) সময় ২২-১ সেকেণ্ড।

(৭) উচ্চ লম্ফণ:—গুরুনাম সিং (পাতিয়ালা) উচ্চতা:—৬ ফিট ২½ ইঞ্চ।

(৮) ১০০০০ মিটার সাইকেল:—(প্রথম হিটে) আমিন (বোম্বাই) সময়:—১৬ মিঃ ১০.২ সেকেণ্ড।

(৯) ১৫০০ মিটার দৌড়:—চাঁদ সিং (পাতিয়ালা) সময়:—৪ মিঃ ৪.২ সেঃ।

(১০) ১১০ মিটার হার্ডল:—ভিকার্স (বোম্বাই) সময়:—১৫.৬ সেকেণ্ড (ভারতীয় রেকর্ডের সমান করিয়াছেন)।

বোম্বাইতে প্রদর্শনী ক্রিকেট খেলা।

বোম্বাই ব্রাবোর্ণ ষ্টেডিয়ামে রেড ক্রস ফাণ্ডের সাহায্যের উদ্দেশ্যে একটি চারিদিনব্যাপী ক্রিকেট খেলা হয়। এই খেলায় সার্ভিসেস একাদশের সহিত ভারতীয় একাদশ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। সার্ভিসেস একাদশের পক্ষে ইংলণ্ডের বিখ্যাত ক্রিকেট খেলোয়াড় জার্ডিন ও হার্ডষ্টাফ যোগদান করেন। খেলায় খুব উচ্চাঙ্গের নৈপুণ্য প্রদর্শিত না হইলেও বেশ দর্শনযোগ্য হয়। ভারতীয় দলের পক্ষে পাঞ্জাবের তরুণ খেলোয়াড় গুলমহম্মদ ১৪৪ রাণ করিয়া নট আউট থাকিয়া ব্যাটিংয়ে অপূর্ব কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। সার্ভিসেস দলের পক্ষে হার্ডষ্টাফও দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় ১২৯ রাণ করেন। উইকেটের সর্বদিকে মারিয়া কিভাবে রাণ তুলিতে হয় তাহার নিদর্শন তাঁহার খেলার মধ্যে পাওয়া যায়। জার্ডিন সার্ভিসেস দলের ও মুস্তাক আলী ভারতীয় দলের অধিনায়কতা করেন। খেলায় ভারতীয় দলই শেষ পর্যন্ত ছয় উইকেটে জয়লাভ করিয়াছে। নিম্নে খেলার ফলাফল প্রদত্ত হইল:—

সার্ভিসেস একাদশ প্রথম ইনিংস:—৩০৩ রাণ (মহম্মদ সৈয়দ ৪৭, হার্ডষ্টাফ ৪১, জার্ডিন ৪৩, স্কিনার ৩০ নট আউট, এস ব্যানার্জি ৩৭ রাণে ৪টি, হাজারী ৩৩ রাণে ১টি, আমীর ইলাহি ৭৯ রাণে ২টি, আর এস মুডী ১১ রাণে ১টি ও সি এস নাইডু ৫৫ রাণে ১টি উইকেট পান।)

ভারতীয় একাদশ প্রথম ইনিংস:—৭ উইঃ ৫০২ রাণ ডিক্লেয়ার্ড (গুলমহম্মদ ১৪৪ নট আউট, সোহনী ৭৪, মুস্তাক আলী ৭৭, আর এস মুডী ৭৫, সি এস নাইডু ৩২, হাজারী ৩৯; বাটলার ১৪৪ রাণে ২টি, দোরাকেরী ১০৮ রাণে ৩টি, ডডস ৭৩ রাণে ১টি, স্কিনার ৯২ রাণে ১টি উইকেট পান)।

সার্ভিসেস একাদশ দ্বিতীয় ইনিংস:—৩৪১ রাণ (হার্ডষ্টাফ ১২৯, অধিকারী ৮১, মহম্মদ সৈয়দ ৩৭; সি এস নাইডু ৭০ রাণে ৩টি, আমীর ইলাহি ৮৫ রাণে ৪টি ও মুডী ১২ রাণে ১টি উইকেট পান)।

ভারতীয় একাদশ দ্বিতীয় ইনিংস:—৪ উইঃ ১৪৭ রাণ (কিষেণচাঁদ ৪২ রাণ নট আউট, আমীর এলাহি ৪৮ রাণ নট আউট, বাটলার ৩৮ রাণে ২টি ও দোরাকেরী ৪৮ রাণে ২টি উইকেট পান)।

বেংগলী বক্সিং এসোসিয়েশন

আগামী মার্চ মাসে বেংগলী বক্সিং এসোসিয়েশন বিভিন্ন ওজনে বেংগল চ্যাম্পিয়ান নির্বাচন করিবার জন্য একটি প্রতিযোগিতার আয়োজন করিয়াছেন। এই প্রতিযোগিতায় কেবল মাত্র বাঙালী মুষ্টিযোদ্ধাগণই যোগদান করিতে পারিবেন। বেংগলী বক্সিং এসোসিয়েশনের অন্তর্ভুক্ত ক্লাব বা এসোসিয়েশনের সভ্যগণই এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করিতে পারিবেন। বাঙলা দেশে বাঙালী মুষ্টিযোদ্ধাগণের উৎসাহের জন্য এইরূপ প্রতিযোগিতার বিশেষ প্রয়োজন ছিল। বেংগলী বক্সিং এসোসিয়েশনের পরিচালকগণ এইরূপ ব্যবস্থা করায় আমরা প্রকৃতই আনন্দলাভ করিলাম। বাঙলার সকল উৎসাহী বাঙালী মুষ্টিযোদ্ধা এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করিবেন বলিয়া আমরা আশা করি।

নিখিল ভারত টেনিস প্রতিযোগিতা

এলাহাবাদে নিখিল ভারত টেনিস প্রতিযোগিতা কোনরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। অন্যান্য বৎসর এই প্রতিযোগিতায় যেরূপভাবে উৎসাহ ও উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয় এই বৎসর সেইরূপ হয় নাই। ভারতের অনেক বিশিষ্ট টেনিস খেলোয়াড়ই যোগদান করেন নাই। বিশেষ করিয়া মহিলা বিভাগে সামান্য কয়েকজন মাত্র যোগদান করেন। কেন যে এইরূপ একটি বিশিষ্ট অনুষ্ঠান এইভাবে শেষ হইল বুঝা গেল না। নিম্নে প্রতিযোগিতার ফলাফল প্রদত্ত হইল:—

মহিলাদের সিংগলস

মিস উডব্রিজ ৬-১, ৬-৩ গেমে মিসেস ম্যাগুরীকে পরাজিত করেন।

মিক্সড ডাবলস

ইফতিকার আমেদ ও মিস উডব্রিজ ৬-৪, ৬-২ গেমে ডবলিউ সি চয় ও মিসেস রোম্যান্সকে পরাজিত করেন।

পুরুষদের সিংগলস

হল সার্ফেস ৬-২, ৬-৪, ৬-০ গেমে গউস মহম্মদকে পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডাবলস

গউস মহম্মদ ও ইরসাদ হোসেন ৬-৩, ১১-৯, ৬-৩ গেমে ইফতিকার আমেদ ও প্রেম পান্ধীকে পরাজিত করেন।

সাপ্তাহিক সংবাদ

৮ই ফেব্রুয়ারী

মার্শাল ষ্ট্যালিন এক বিশেষ ঘোষণায় জানাইয়াছেন যে, নিকোপোল সেতুমুখ হইতে জার্মানদিগকে উচ্ছেদ করা হইয়াছে। লালফৌজ নিকোপোল শহর অধিকার করিয়াছে।

বর্তমান অচল অবস্থার অবসান ঘটাইবার এবং যুদ্ধ প্রচেষ্টার সহায়তা করিবার উদ্দেশ্যে রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দাবী করিয়া শ্রীযুত লালচাঁদ নবলরায় কেন্দ্রীয় পরিষদে যে প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন, অদ্য তাহা বিনা ডিভিসনে অগ্রাহ্য হয়।

কলম্বোর এক সরকারী ঘোষণায় বলা হইয়াছে যে, গতকল্য রাত্রে শত্রুপক্ষীয় বিমান সিংহলের উপকূলের সমীপবর্তী হয়। একটি বোমা পড়ে, কিন্তু কেহ হতাহত হয় নাই এবং ক্ষতির পরিমাণ নগণ্য।

ভারতের প্রথম মহিলা গ্র্যাজুয়েট শ্রীযুক্তা চন্দ্রমুখী বসু গত ২রা ফেব্রুয়ারী দেরাদুনে পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৮৩ বৎসর হইয়াছিল।

৯ই ফেব্রুয়ারী

গত ২৯শে জানুয়ারী বাখরগঞ্জ জেলার ভাণ্ডারিয়ার ৫ মাইল আন্দাজ দূরে কচা নদীতে ভয়ানক ঝড়ে "রুদ্র" নামক ৬০ টনের ষ্টীমার খানি জলমগ্ন হয়। তাহার ফলে ৪২ জন লোক মারা গিয়াছে। ঐ ষ্টীমারখানি হুলারহাট-নাগেরহাটের মধ্যে যাতায়াত করিত। যে ৪২ জন লোক এই ষ্টীমার ডুবিতে প্রাণ হারাইয়াছে, তাহার মধ্যে ২৪ জন হইল ষ্টীমারের যাত্রী এবং অবশিষ্ট ১৮ জন ষ্টীমারের খালাসী। ষ্টীমারের ৪৬ জন যাত্রীকে এবং ১০ জন খালাসীকে উদ্ধার করা হইয়াছে।

প্রদেশগুলিতে ভারতরক্ষা বিধানবলী প্রয়োগ সম্পর্কে ভারত গভর্নমেন্টের কার্যের নিন্দা করিবার উদ্দেশ্যে আনীত মিঃ এম এ কাজমীর মুলতুবী প্রস্তাবটি অদ্য কেন্দ্রীয় পরিষদে ৪৩-৪২ ভোটে গৃহীত হয়। কংগ্রেস, মুসলিম লীগ, জাতীয় দল ও ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট দলের সদস্যগণ একযোগে এই প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দেন।

বিগত ১৯৪০ সালে বাঙ্গলায় মোট যত পরিমাণ জমিতে পাট চাষ হইয়াছিল, বর্তমান বৎসরে তাহার অর্ধেক পরিমাণ জমিতে পাট চাষ করা যাইবে বলিয়া এবং কলিকাতার ইণ্ডিয়ান জাত মিডল পাটের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন মূল্য যথাক্রমে ১৭ ও ১৫ টাকা হইবে বলিয়া গভর্নমেন্ট যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, অদ্য বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে বিরোধী পক্ষের সদস্যগণ এক মুলতুবী প্রস্তাবের সাহায্যে তাহার সমালোচনা করেন। আলোচনান্তে উক্ত মুলতুবী প্রস্তাবটি ৭২—১০৯ ভোটে অগ্রাহ্য হইয়া যায়।

১০ই ফেব্রুয়ারী

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে অর্থসচিব শ্রীযুত তুলসীচন্দ্র গোস্বামী সিলেক্ট কমিটি কর্তৃক সংশোধিত বঙ্গীয় কৃষি আয়কর বিলটি আলোচনার্থ উত্থাপন করেন। আলোচ্য বিলের দ্বারা বাঙলা দেশে এই প্রথম কৃষি জমি হইতে প্রাপ্ত কৃষি আয়ের উপর কর ধার্যের প্রস্তাব করা হইয়াছে। সাড়ে তিন হাজার টাকা পর্যন্ত কৃষি আয় যে সব ক্ষেত্রে সেই সব ক্ষেত্রে কৃষি আয়ের উপর কোন কর ধার্য হইবে না বলিয়া ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

এম ভট্টাচার্য এণ্ড কোম্পানী নামক বিশিষ্ট বাঙালী ঔষধালয়ের প্রতিষ্ঠাতা, কৃতী ব্যবসায়ী ও পরদুঃখকাতর দাতা শ্রীযুত মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য বারাণসীতে পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৮৬ বৎসর হইয়াছিল।

আরাকান রণাঙ্গনে জাপানীরা তউং বাজার ত্যাগ করে।

১১ই ফেব্রুয়ারী

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে এক বে-সরকারী প্রস্তাবে ধান, চাউল ও পাটের সর্বনিম্ন মূল্য নির্ধারণের দাবী উত্থাপিত হয়। বঙ্গীয় কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী দলের অন্যতম সদস্য শ্রীযুত অদ্বৈতকুমার মাঝি পরিষদে উক্ত প্রস্তাব উত্থাপন করেন। তিনি ঐ প্রস্তাবে এইরূপ অভিমত প্রকাশ করেন যে, বাঙলা গভর্নমেণ্ট যেন অবিলম্বে এই ব্যাপারে ব্যবস্থা অবলম্বন করেন এবং প্রয়োজন হইলে কেন্দ্রীয় গভর্নমেণ্টকে যথাযথ ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ করেন। আলোচনান্তে প্রস্তাবটি বিনা ডিভিসনে অগ্রাহ্য হইয়া যায়।

অস্ট্রেলিয়ান সৈন্যেরা নিউগিনির সৈদরের নিকটে আমেরিকান সৈন্যদের সহিত মিলিত হইয়াছে। ইয়াগোমিতে এ মিলন ঘটিয়াছে। ১৪ হাজার জাপ সৈন্য ধ্বংস হইয়াছে। রাবাউল ও ওয়েওয়াকে বিমান আক্রমণ চালান হইয়াছে।

ইতালীতে আনজিও অঞ্চলে উভয় পক্ষে ঘোরতর সংগ্রাম চলে। কাসিনো শহরের অভ্যন্তরে বাড়ি দখলের লড়াই চলিতেছে।

১২ই ফেব্রুয়ারী

আরাকান রণাঙ্গনে মায়ু পাহাড়ের পূর্বে ঘোরতর সংগ্রাম চলিতেছে। কয়েক দিনের চেষ্টার ফলে প্রচুর ক্ষতি স্বীকার করিয়া জাপানীরা মিত্রপক্ষীয় বাহিনীর পৃষ্ঠভাগে বামাংশের ব্যূহ ভেদ করিয়া গাকিয়েদক গিরিপথের পূর্বে পৌঁছিয়াছে। এই গিরিপথ দিয়া পাহাড় পার হইয়া বাওলি ও মংদয়ের সংযোগকারী প্রধান পথে পৌঁছান যায়। জাপানী সৈন্যদের এই স্থান হইতে তাড়াইবার জন্য প্রবল চেষ্টা চলিতেছে।

আরাকান রণাঙ্গনে নয় দিন যাবৎ ঘোরতর সংগ্রাম চলিতেছে এবং মিত্রপক্ষের সৈন্যেরা যুগপৎ বহু দিক হইতে আক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও হটিয়া যায় নাই। তাহারা বহু সৈন্য হতাহত করিয়াছে। ফোর্ট হোয়াইট ও টিড্ডিম এলাকায় মিত্রপক্ষের সৈন্যেরা আগাইয়া চলিয়াছে।

ভারত সরকারের নূতন অর্ডিন্যান্সের বিধান অনুযায়ী বাঙলা সরকার শীঘ্রই ভারতরক্ষা আইনের ২৬ ধারা অনুসারে আটক সিকিউরিটি বন্দীদের বিষয় পুনর্বিবেচনা করার জন্য একটি ট্রাইব্যুনাল গঠন করিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

মস্কো রেডিও ঘোষণা করিয়াছে যে, কসাক অশ্বারোহী বাহিনী কর্সিনে পরিবেষ্টিত জার্মান ডিভিসনগুলির বিনাশসাধন করিতেছে। একদল কসাক গত কয়েক দিনের মধ্যে শত শত জার্মানকে হত্যা ও প্রভূত সমরোপকরণ হস্তগত করিয়াছে।

১৩ই ফেব্রুয়ারী

মার্শাল ষ্ট্যালিন এক বিশেষ ঘোষণায় লালফৌজ কর্তৃক লুগা অধিকারের সংবাদ জানাইয়াছেন। লুগা শহরটি লেনিনগ্রাদের ৮০ মাইল দক্ষিণে ও লেনিনগ্রাদ-পককোভ ভিজনা ট্রাঙ্ক লাইন এবং নভোগরোদ হইতে আগত রেল লাইনের সংযোগস্থলে অবস্থিত।

বৃটেনের ভারতীয় সমিতিসমূহের ফেডারেশনের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত লণ্ডনে এক সভায় ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও স্বরাজ ভবনের ভূতপূর্ব সম্পাদক শ্রীযুত সুরেশ বৈদ্যের গ্রেপ্তার ও আটকের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়া একটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

১৪ই ফেব্রুয়ারী

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশনে স্পীকার দুইটি মুলতুবী প্রস্তাব বিধিবহির্ভূত বলিয়া অগ্রাহ্য করেন। তন্মধ্যে একটি হইতেছে কলিকাতার খাদ্য রেশনিং পরিকল্পনার বিধি ব্যবস্থা সম্পর্কে; ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি উহা উত্থাপনের বিজ্ঞপ্তি দিয়াছিলেন। অপরটি হইতেছে, বরিশাল জেলার একটি নদীতে 'রুদ্র' নামক ষ্টীমার ডুবি সম্পর্কে শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ দাস উহা উত্থাপনের নোটিশ দেন।

কেন্দ্রীয় পরিষদে দেশরক্ষা বিভাগের সেক্রেটারী মিঃ অগিলভী শ্রীযুত লালচাঁদ নবলরায়ের এক প্রশ্নের উত্তরে বলেন যে, ১৯৪৩ সালের ২০শে নবেম্বর হইতে ১৯৪৪ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত বৃটিশ ভারতের এলাকাধীন স্থানসমূহে মোট দশবার এবং ভারতের একটি দেশীয় রাজ্যে একবার বিমান হানা হইয়াছে। বিমান হানার ফলে বৃটিশ ভারতে মোট ৮৮৪ জন অসামরিক অধিবাসী হতাহত হইয়াছে এবং সকল ক্ষেত্রেই ধনসম্পত্তির ক্ষতি খুব সামান্যই হইয়াছে।

আরাকান রণাঙ্গনে ১২ই ফেব্রুয়ারী ফোর্ট হোয়াইট অঞ্চলে মিত্রপক্ষের কামানসমূহ গোলাবর্ষণ করিয়া কয়েক দল জাপ সৈন্যকে ছত্রভঙ্গ করে। আরাকানে যুদ্ধ চলিতেছে। যদিও জাপানীদের অবস্থার অবনতির লক্ষণ দেখা যাইতেছে, তথাপি মোটামুটি অবস্থা অপরিবর্তিত রহিয়াছে।

আমি তোমাদের পূজ্য

"......... ঈশ্বরের অংশ নিয়ে আমি আবির্ভূত হয়েছি, আমাকে দেবতা বলে জানবে।

"তোমরা হলে নিকৃষ্ট জীব—তোমরা শুধু একান্ত অনুগতভাবে আমার মন যুগিয়ে চলবে আর চোখ কান বুজে আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য প্রাণপাত করবে।"

এইরকম কথা অধিকাংশ জাপানীই বলে থাকে. এ কেবল তাদের মুখের কথা নয় সত্যই তারা মনে প্রাণে এটা বিশ্বাস করে। তার মানে একজন সাধারণ জাপসৈনিক পর্য্যন্ত এই ধারণা পোষণ করে যে ভগবান তাকে ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহাপুরুষের চেয়েও উঁচুস্তরের মানুষ করে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। কবি রবীন্দ্রনাথ ও ইকবাল কিম্বা বৈজ্ঞানিক সি. ভি. রমণ, এঁরা তার কাছে কোথায় লাগে! জাপানী সৈনিক, ব্যবসায়ী, দর্জ্জি, মুচি কিম্বা চাষী এরা সকলেই এই বিশ্বাস পোষণ করে!

এমনই একটা জাতকে নিয়ে কি করা যায় ভাবুন তো? দায়ীত্বজ্ঞানহীন, পাগলাটে ছাড়া আমরা ওদের আর কিছু মনে করতে পারি না। কিন্তু ওদের এই পাগলামির জন্য করুণা দেখাতে যাওয়াও বিপজ্জনক, কারণ কাণ্ডজ্ঞানবর্জ্জিত গোঁয়ার্ত্তুমি ওদের হস্তে করে রেখেছে। ওরা সত্যই ভয়ঙ্কর।

সম্পাদকঃ শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন | সহকারী সম্পাদকঃ শ্রীসাগরময় ঘোষ

১১ বর্ষ] শনিবার, ১৩ই ফাল্গুন, ১৩৫০ সাল। Saturday, 26th February, 1944 [১৬শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

াঙলাদেশের বাজেট

গত ১৮ই ফেব্রুয়ারী বাঙলার অর্থসচিব ীযুত তুলসীচন্দ্র গোস্বামী বঙ্গীয় ্যবস্থা-পরিষদে বাজেট উপস্থিত করিয়া- হন। বাঙলা সরকারের ব্যয় নানা কারণে ত্যধিক রকমে বৃদ্ধি পাইয়াছে। বর্তমানে ৎসরে ৩১ কোটি টাকা তাহাদিগকে ব্যয় রিতে হইতেছে; এই ব্যয় যুদ্ধের পূর্বে ব্যয় ইতে প্রায় পাঁচ গুণ বেশী। বাঙলা রকারের আয়ে এই ব্যয় কুলাইতেছে না, ুতরাং অসম্ভব রকমে ঘাটতিও াড়াইতেছে। অর্থসচিবের প্রদত্ত হিসাব ন্সারে বর্তমান বৎসরে এই ঘাটতির রিমাণ দশ কোটি, দশ লক্ষ টাকা হইবে বং আগামী বৎসরে ৭ কোটি ৩৬ লক্ষ কা, এই হিসাবে দুই বৎসরে ঘাটতির রিমাণ ১৭ কোটি ৪৬ লক্ষ টাকা হইবে। ই ঘাটতি পূর্ণ করিবার ব্যবস্থা কি? জন্য কৃষি-আয়কর আছে এবং বিক্রয়কর ্দ্ধির আয় আছে; কিন্তু ইহাতেই কি থেষ্ট হইবে? দুর্গত দেশের উপর ই সব কর-বৃদ্ধির চাপ কিরূপ আকারে ড়িতেছে, ভুক্তভোগী মাত্রেই তাহা অবগত াছেন। কিন্তু বাঙলার অর্থসচিব বর্ধিত র প্রদানে দেশবাসীর এই অসামর্থ্যের কথা স্বীকার করিতেছেন না। তিনি বলেন, বর্তমান বৎসরের মধ্যে নূতন কোন কর-বৃদ্ধির প্রস্তাব করিব না, আমি এমন ধারণা সৃষ্টি করিতে চাই না। অর্থসচিব গোস্বামী মহাশয়ের মতে এমন কর-বৃদ্ধির প্রস্তাবে ভয়ের কিছুই নাই, পক্ষান্তরে ইহা জাতীয় উন্নতিরই উপায়; এতদ্দ্বারা দেশেরই সেবা হয়। কর-বৃদ্ধিরূপ ইঞ্জিনের জোরে জাতি রাষ্ট্রীয় এবং সামাজিক উন্নতির পথেই অগ্রসর হয় বলিয়া বাঙলার অর্থসচিব আমাদিগকে আশ্বস্ত করিয়াছেন। কিন্তু অর্থসচিবের মুখে রাষ্ট্রনীতির এই ধরণের বড় বড় বুলি আমাদিগকে একটুও আশ্বস্ত করিতে পারে নাই; পক্ষান্তরে দুর্ভিক্ষ এবং তজ্জনিত সামাজিক বিপর্যয়ে বিধ্বস্ত বাঙলার বুকে কর-বৃদ্ধির ইঞ্জিন চালাইয়া উন্নতির অভিযানে প্রবৃত্ত হইবার জন্য তাঁহার এই ধরণের মনোভাব আমাদিগকে আতঙ্কিত করিয়াই তুলিয়াছে। এইসব বড় বড় কথা আওড়াইবার পূর্বে বাঙলা দেশের বর্তমান আর্থিক দুরবস্থার ব্যাপক গুরুত্ব অর্থসচিবের উপলব্ধি করা উচিত ছিল এবং তাঁহার ইহাও বুঝা উচিত ছিল যে, বাঙলা দেশের বর্তমান এই সংকটের প্রতীকার সম্পর্কে ভারত সরকারের দায়িত্ব সমভাবেই রহিয়াছে! অর্থসচিব গোস্বামী মহাশয় তাঁহার বক্তৃতায় ভারত সরকারের সে দায়িত্বের উপর অবশ্য জোর দিয়াছেন; নিমেয়ার বরাদ্দের বাঁধা গণ্ডীর যৌক্তিকতা তিনি এক্ষেত্রে স্বীকার করিয়া লন নাই; কিন্তু এই সঙ্গে দেশবাসীর প্রতি তিনি লুব্ধ দৃষ্টি সঞ্চালন না করিলেই ভাল হইত এবং কর-বৃদ্ধির সাহায্যে জাতির রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক উন্নতির সংকল্প বাঙলা দেশের ভবিষ্যৎ সুদিনের জন্য রাখিয়া দেওয়াই তাঁহার পক্ষে সমীচীন ছিল; কারণ তিনি এক্ষেত্রে যে যুক্তি উপস্থিত করিয়াছেন, দেশবাসীর স্বার্থে এবং দেশবাসীর প্রয়োজনে আহূত করের প্রত্যেকটি টাকা যেখানে ব্যয় হয়, সেই ক্ষেত্রেই কর-বৃদ্ধির সম্পর্কে ঐরূপ যুক্তি সার্থক হইতে পারে। বাঙলা দেশের আর্থিক দুর্গতি যেদিন দূর হইবে, শুধু তাহাই নয়, এদেশে যেদিন দেশবাসীদের কর্তৃত্বে পরিচালিত এবং বিদেশীয় স্বার্থ প্রভাব হইতে মুক্ত জাতীয় গভর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইবে, সেদিন কর-বৃদ্ধির সম্পর্কে এইরূপ যুক্তি দেশের সর্বাঙ্গীন উন্নতির পক্ষে কার্যকর হইতে পারে, তৎপূর্বে নহে।

উদরান্নের দায়

বাঙলা দেশের আর্থিক দুর্গতির এখনও প্রতীকার হয় নাই এবং আমাদের মতে মুদ্রা-স্ফীতির মামুলী যুক্তি এক্ষেত্রে নিরর্থক; কারণ ব্যবসা-বাণিজ্যের উপর কর বসাইতে গেলে পরোক্ষভাবে দরিদ্রদের উপরই গিয়া পড়িবে। বাঙলার জনসাধারণের দারিদ্র্য কিরূপ ভয়াবহ আকার ধারণ করিয়াছে, বাজেটের জেল বিভাগীয় ব্যয় হইতেই তাহার কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। গত ১৯৪২-৪৩ সালে জেল বিভাগের ব্যয় ছিল ৫৩ লক্ষ টাকা; বর্তমান বৎসর ঐ ব্যয় আন্দাজ এক কোটি ৩৬ লক্ষ টাকা দাঁড়াইবে। অর্থ-সচিব নিজেই বলিয়াছেন, দুর্ভিক্ষের অবস্থাই জেলের এই অত্যধিক ব্যয়-বৃদ্ধির কারণ; তাঁহারই কথা এ সম্বন্ধে এই যে, উদরান্নের দায়ে অনাহারে ক্লিষ্ট হইয়া উপায়ান্তর না দেখিয়া লোকে জেলের পথ অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছে। এইভাবে জেলের আশ্রয়ে অনেকের উদরান্নের সংস্থান হইয়াছে ইহা ঠিক; কিন্তু সমাজের এই নৈতিক অধোগতির প্রতিবেশ নিশ্চয়ই প্রগতির পথে রাষ্ট্রীয় ইঞ্জিন চালাইবার প্রবৃত্তি উদ্দীপ্ত করে না এবং ইহা শাসন-সৌকর্যেরও পরিচায়ক নহে। আমরা দেখিয়া বিস্মিত হইলাম, সামাজিক এই ব্যাপক বিপর্যয়ের প্রতীকারের জন্য বাজেটে স্বতন্ত্রভাবে কোনরূপ অর্থের বরাদ্দ করা হয় নাই; গভর্নমেণ্ট এ সম্বন্ধে বিবেচনা করিতেছেন—শুধু নিতান্ত মামুলী ধরণের এই কথা বলিয়া আমাদিগকে আশ্বস্ত করা হইয়াছে; সুতরাং আপাতত এ সম্বন্ধে কিছু করা হইবে বলিয়া মনে হয় না; যদি কোনদিন সরকারের হাতে যথেষ্ট অর্থাগম ঘটে, তবে সে চেষ্টা দেখা যাইবে। অর্থ-সচিবের উক্তির ইহাই তাৎপর্য; ইতিমধ্যে নিঃস্বের দল পুনরায় কলিকাতা এবং মফঃস্বলের শহরে শহরে যেভাবে বাহির হইয়াছে, তাহাদের সে অভিযান সেইভাবেই চলিবে। এইরূপ বাজেট প্রয়োজনীয় আরও কতকগুলি বিষয়ে অর্থ ব্যবস্থার অ-প্রতুলতার সম্বন্ধে আমাদের দৃষ্টি পড়ে। তন্মধ্যে শিক্ষা বিভাগের ব্যয়ের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে, দুই বৎসরে ৬৩ কোটি টাকা ব্যয়ের মধ্যে এ দেশের দরিদ্র শিক্ষক সমাজের দুর্গতির প্রতীকারের জন্য আধ কোটি টাকা বরাদ্দ করাও সম্ভব হয় নাই, ইহা নিতান্তই দুঃখের বিষয়।

বড়লাটের বক্তৃতা

চারিম সকাল ভারতবর্ষের শাসন ব্যাপার সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করিবার পর সম্প্রতি বড়লাট লর্ড ওয়াভেল কেন্দ্রীয় পরিষদে ভারত সম্পর্কে তাঁহার বহুপ্রত্যাশিত বক্তৃতা করিয়াছেন। আমরা দেখিতেছি বড়লাটের এই বক্তৃতা সম্বন্ধে বিভিন্ন সংবাদপত্র এবং বিভিন্ন নেতৃবর্গের মন্তব্যে নৈরাশ্যের ভাবই অভিব্যক্ত হইয়াছে; আমাদের নিজেদের কথা বলিতে গেলে এই বক্তৃতা আমাদের মনে তেমন কোন নিরাশার সঞ্চার করে নাই; কারণ, বড়লাটের নিকট হইতে আন্তরিক-ভাবে আমরা নূতন কিছু আশাও করিয়াছিলাম না। আমরা বিশেষভাবেই এ সত্য অবগত আছি যে, যিনিই ভারতবর্ষের বড়লাট হইয়া আসুন না কেন, ভারতের শাসন ব্যাপারে তাঁহার নিজস্ব ব্যক্তিত্বের বিশেষ কোন মূল্য থাকে না, কারণ তাঁহাকে ব্রিটিশ শাসন নীতির যন্ত্রস্বরূপেই চলিতে হয়; বড়লাট তাঁহার বক্তৃতায় ভারত শাসন সম্পর্কে সেই বৃটিশ নীতি এবং সে নীতির অন্তর্নিহিত পরিচালক আমেরী-চার্চ্চিলের মনোভাবেরই অভিব্যক্তি করিয়াছেন। ভারতের বর্তমান রাজনীতিক অচল অবস্থার সমাধান সম্বন্ধে বড়লাটের নীতি কি হইবে, ইহা জানিবার জন্যই প্রধানতঃ দেশবাসীর দৃষ্টি সমধিক আকৃষ্ট ছিল; এ বিষয়ে লর্ড ওয়াভেল নূতন কিছুই বলেন নাই এবং যাহা বলিয়াছেন তাহাতে রাজনীতিক অচল অবস্থার সমাধানে সাহায্য হওয়া দূরের কথা পক্ষান্তরে জটিলতাই বৃদ্ধি পাইবে। বড়লাট এ সম্পর্কে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারা বহু বিঘোষিত সকল দলের ঐক্যের সনাতন যুক্তিই উপস্থিত করিয়াছেন। কিন্তু সে ঐক্যের পথ যাহাতে সুগম হইতে পারে সেজন্য ব্যবস্থা করিতে প্রকৃত পক্ষে অসামর্থ্যই জ্ঞাপন করিয়াছেন। কংগ্রেস নেতাদের যোগ্যতা এবং চিত্তের উদারতা আছে বড়লাট ইহা স্বীকার করিয়াছেন, এবং তিনি কংগ্রেসকে ভারতের একমাত্র সর্বদলের প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠান বলিয়া স্বীকার না করিলেও কংগ্রেস যে এদেশের একটি প্রয়োজনীয় অংশের প্রতিনিধি অন্ততঃ ইহা তিনি স্বীকার করেন। কংগ্রেসের মর্যাদা সম্বন্ধে তাঁহার এইটুকু স্বীকৃতি অনুসারেও সকল দলের মধ্যে ঐক্যের প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে অন্যান্য দলের প্রতিনিধিদের সঙ্গে কংগ্রেসের নেতৃবর্গের আলোচনা প্রয়োজন; কিন্তু বড়লাট সে প্রয়োজনীয়তাকে এড়াইয়া গিয়াছেন। তিনি কংগ্রেস নেতৃবৃন্দকে মুক্তিদান করিতে প্রস্তুত নহেন; তিনি কতকটা শ্লেষাত্মক ভাষাতেই কংগ্রেস নেতৃবর্গকে ব্যক্তিগতভাবে পূর্বে তাঁহাদের বিবেকের শরণাপন্ন হইতে বলিয়াছেন। তাঁহার মতে কংগ্রেস নেতৃগণ যদি প্রত্যেকে আগষ্ট প্রস্তাব প্রত্যাহারের জন্য বিবেকের বেদনা বোধ না করেন এবং অসহযোগিতা ও সরকারকে বাধা দানের নীতি পরিত্যাগ না করেন, তবে তাহাদিগকে মুক্তি দান করা সম্ভব নহে; বড়লাটের এই উক্তির দ্বারা ইহাই বুঝা যায় যে, ভারতের রাজনীতিক অচল অবস্থা সমাধানের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয়তা তিনি উপলব্ধি করেন না; কারণ এজন্য যাহা করা দরকার, তিনি তাহাতে প্রস্তুত নহেন। দেশের বৃহত্তম একটি রাজনীতিক সমস্যা সমাধানের জন্য কংগ্রেসের ন্যায় প্রতিনিধিত্ব-মূলক প্রতিষ্ঠানের নেতৃবৃন্দকে মুক্তি দানের প্রকৃত ইচ্ছা তাঁহার অন্তরে একান্ত-ভাবে কাজ করে নাই। এক্ষেত্রে তিনি ব্যক্তিগত বিচারের যে কথা বলিয়াছেন, কংগ্রেসের নেতাদের পক্ষে তাহা খাটে না। কারণ কংগ্রেসের প্রস্তাব কংগ্রেস নেতৃবর্গের সম্মিলিত সিদ্ধান্ত। সুতরাং গভর্নমেণ্ট নেতৃবৃন্দকে মুক্তিদান করিয়া সম্মিলিতভাবে পূর্ব সিদ্ধান্তের পরিবর্তনের সুযোগ দান না করিলে, ব্যক্তিগত বিচারকে বড় করিয়া দেখিয়া কংগ্রেসের ন্যায় জনমান্য প্রতিষ্ঠানের কোন নেতা নিজের মুক্তির নিমিত্ত ঔৎসুক্য দেখাইতে পারেন না। তেমন কাজ নেতৃমর্যাদা বিগর্হিত হয় এবং অনেকটা দুর্বলতারই পরিচায়ক হইয়া থাকে। বড়লাট তাঁহার বক্তৃতায় বলিয়াছেন, কংগ্রেসকে নতজানু হইয়া তিনি ক্ষমা ভিক্ষা করিতে বলিতেছেন না; কিন্তু তিনি কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের মুক্তিদানের সম্বন্ধে এই যে প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহা কংগ্রেসের পক্ষে নতজানু হওয়ার চেয়েও আমরা অনেক বেশী অবমাননাকর বলিয়া মনে করি। তিনি তাঁহার বক্তৃতায় অখণ্ড ভারতের আদর্শের কথা বলিয়াছেন; কেহ কেহ তাঁহার এই উক্তিতে আশান্বিত হইয়াছেন এবং মনে করিতেছেন যে, এতদ্বারা তিনি পাকিস্থানী পরিকল্পনারই প্রতিবাদ করিয়াছেন; আমরা কিন্তু লর্ড ওয়াভেলের উক্তিতে সে সম্বন্ধে সুনিশ্চিত কোন আশার আভাষ দেখি নাই; কারণ, বড়লাট ভারতের ভৌগোলিক অখণ্ডত্বের কথাই বলিয়াছেন; কিন্তু ভৌগোলিক অখণ্ডত্বের স্বীকৃতির দ্বারা রাজনীতিক খণ্ডনের আশঙ্কা নিরাকৃত হয় না; প্রকৃতপক্ষে লর্ড ওয়াভেলের এই বক্তৃতা আমাদের পক্ষে কোন দিক হইতেই আশান্বিত হইবার কারণ সৃষ্টি করে নাই।

খাদ্য সরবরাহের সমস্যা

শহরের রেশনিং ব্যবস্থাকে সাময়িক কার্যকরভাবে সাফল্যমণ্ডিত করিবার উদ্দেশ্যে আমরা শহরের বিভিন্ন অঞ্চলের প্রতিনিধি-দিগকে লইয়া গঠিত 'ফুড কমিটি'সমূহের সঙ্গে সহযোগিতার কার্যক্রম অবলম্বন করিবার প্রয়োজনীয়তার কথা গত সপ্তাহে

উল্লেখ করিয়াছিলাম। সম্প্রতি একটি সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে 'ফুড কমিটি' গঠনের প্রস্তাব করা হইয়াছে দেখিতে পাইলাম। আমাদের মতে এইসব কমিটি বে-সরকারী এবং জনসাধারণের আস্থাসম্পন্ন সেবাব্রতী কর্মীদিগকে লইয়া গঠিত হওয়া কর্তব্য। জনরক্ষা সমিতির উদ্যোগে কলিকাতার কয়েকটি অঞ্চলে ইতিমধ্যেই এইরূপ কতকগুলি কমিটি গঠিত হইয়াছে। কর্তৃপক্ষ এই সব কমিটির সহিত সহযোগিতার সম্পর্কে কিরূপ কার্যক্রম অবলম্বন করেন এবং এগুলির অভিমতকে কতটা মর্যাদা দান করেন, ইহাই বিবেচ্য। আমরা আশা করি, তাঁহারা আমলাতান্ত্রিক সংস্কার হইতে মুক্ত হইয়া এক্ষেত্রে জনসাধারণের সহিত সহযোগিতা করিতে অগ্রসর হইবেন। আমরা দেখিলাম রেশনিংয়ের চাউলের সম্পর্কে অভিযোগ দূর করিবার জন্য অসামরিক সরবরাহ বিভাগের সচিব মিঃ সুরাবর্দী উদ্যোগী হইয়াছেন। সম্প্রতি তিনি বলিয়াছেন যে, অবিলম্বে রেশনিংয়ের জন্য নির্দিষ্ট সব দোকান হইতেই যাহাতে ভাল চাউল সরবরাহ করা হয়, তিনি এরূপ ব্যবস্থা করিবেন। মফঃস্বলের একটি স্থানে বক্তৃতাকালে মিঃ সুরাবর্দী এইভাবে চিনির অভাব, তেলের অভাব, লবণের অভাব দূরে করিবার সম্বন্ধেও প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়াছেন। বর্তমান সপ্তাহেও এ প্রতিশ্রুতি কার্যে পরিণত হয় নাই। অবিলম্বে ইহা কার্যে পরিণত হইবে, আমরা এখনও এমন আশা করি। নিকৃষ্ট চাউলের জন্য ইতিমধ্যেই শহরের অনেক লোক অজীর্ণ, বেরিবেরি প্রভৃতি রোগে আক্রান্ত হইতেছে — আমরা এইরূপ অভিযোগ শুনিতে পাইতেছি: ইহা একান্ত অস্বাভাবিক বলিয়াও মনে হয় না; কারণ, প্রধানত আতপ চাউল খাইতে বাঙলার সর্বসাধারণ অভ্যস্ত নয়, তারপর সেই অনভ্যস্ত খাদ্য যদি নিকৃষ্ট শ্রেণীর হয়, তবে তাহাতে ব্যাধি পীড়া সৃষ্টি হইতেই পারে; সুতরাং জনসাধারণের স্বাস্থ্য রক্ষার দিক হইতে সত্বর এ সম্বন্ধে সুব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন। সরকারী হিসাব কিরূপ জানি না, আমরা দেখিতে পাইতেছি, এখনও মফস্বলের অনেক স্থানে চাউলের দাম বেশই চড়া আছে; কোন কোন জায়গায় এখনও কুড়ি টাকা মণ দরে চাউল বিক্রয় হইতেছে। বাঙলা সরকার এই সব ঘাটতি অঞ্চলে খাদ্যশস্য সরবরাহ করিবার নিমিত্ত নৌকাযোগে ব্যাপক ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন এবং ঢাকা, মাদারীপুর, নারায়ণগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে এইভাবে খাদ্যশস্য পাঠানো হইতেছে; এই ব্যবস্থার ফলে ঐ সব অঞ্চলের চাউলের দর হ্রাস পাইবে বলিয়া আমরা আশা করি; পীড়িতের শুশ্রূষার জন্য কলিকাতার মেডিক্যাল স্কুলের ছাত্রদিগকে লইয়া গঠিত কয়েক দল চিকিৎসাবাহিনী মফঃস্বলে প্রেরিত হইয়াছে; কলিকাতার 'মেয়র অর্থ-ভাণ্ডারে'র নিয়ন্ত্রণাধীনেও চিকিৎসকেরা মফঃস্বলে গিয়াছেন এবং ইঁহাদের সাহায্যে কলেরা ও বসন্তের টীকা দেওয়া হইতেছে, এ সব ব্যবস্থা সমর্থনযোগ্য; কিন্তু আমাদের মনে হয়, প্রয়োজনের অনুপাতে এ সব ব্যবস্থা যথেষ্ট নয়; এ সম্বন্ধে জনসাধারণের সহযোগিতার সূত্রে ব্যাপকতর কর্মপন্থা অবিলম্বে অবলম্বন করা প্রয়োজন এবং প্রচার কার্যেরও দরকার। কর্তৃপক্ষ এই সব বিষয়ে জনসাধারণের সহযোগিতার ক্ষেত্র যতই সম্প্রসারিত করিতে সমর্থ হইবেন, ততই দেশে আস্থার ভাব সৃষ্টি হইবে; এজন্য আমলাতান্ত্রিক সংস্কার হইতে মুক্ত সহানুভূতিসম্পন্ন কর্মচারীদের যেমন প্রয়োজন, তেমনই জনসেবাব্রতী কর্মীদিগকে লইয়া সুগঠিত প্রতিষ্ঠানসমূহ দেশের সর্বত্র সংস্থাপিত হওয়া দরকার। দেশসেবক অনেক কর্মী, বর্তমানে কারারুদ্ধ আছেন; ইঁহারা মুক্তিলাভ করিলে এ দিকে কাজে অনেক সহজ হইত; কিন্তু এ সম্বন্ধে আমরা এ পর্যন্ত কোন আশাভরসাই পাইতেছি না। ইহা দেশের নিতান্ত দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে।

ঘর-জ্বালানোর পর্ব

সেদিন বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে বাঙলার প্রধান মন্ত্রী মেদিনীপুরের ব্যাপার সম্বন্ধে যে বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া বিংশ শতাব্দীর উন্নত ও সভ্য জগৎ যুগপৎ বিস্মিত এবং স্তম্ভিত হইবে। বাঙলার প্রধান মন্ত্রী তথা স্বরাষ্ট্রসচিব স্যার নাজিমুদ্দিনের উক্তিতে দেখা যায়, ১৯৪২ সালের ঝড়ের পূর্বে এবং পরে তমলুক ও কাঁথি মহকুমায় সরকারের লোকজনেরা মোট ১৯০টি কংগ্রেসভবন ও ক্যাম্প পোড়াইয়া দিয়াছে এবং ঐ সময়ের মধ্যে কংগ্রেসী লোকেরা ১৮টি থানা, সরকারী বাড়ি ও অফিস ইত্যাদি জ্বালাইয়া দিয়াছিল। কিন্তু কংগ্রেসের লোকেদের এই ঘর-জ্বালানির অভিযোগের সত্যতা সম্বন্ধে স্বরাষ্ট্রসচিব নিজে কোন প্রমাণ উপস্থিত করিতে পারেন নাই; সরকারী কর্মচারীদের রিপোর্টের উপরই তাঁহাকে এক্ষেত্রে নির্ভর করিতে হইয়াছে; কিন্তু এক পক্ষের এই রিপোর্টের সত্যতা প্রমাণসাপেক্ষ। পক্ষান্তরে সকারপক্ষের লোকজনের কর্মতৎপরতা সম্বন্ধে এক্ষেত্রে সেরূপ কোন সন্দেহেরই অবকাশ নাই। কারণ সরকারপক্ষ বা তাঁহাদের মুখপাত্রস্বরূপে স্বয়ং স্বরাষ্ট্রসচিবই তাহা স্বীকার করিয়াছেন। সরকারের নিযুক্ত এই সব লোকজন শুধু কংগ্রেসভবন বা ক্যাম্পই জ্বালাইয়া দিয়াছিল এমন নয়, শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র জানার একটি প্রশ্নের উত্তরে স্বরাষ্ট্রসচিব একথা স্বীকার করেন যে, তাহারা কাঁথি ও তমলুক মহকুমার বহু কাঁচা ও পাকা বাড়ি সমুদয় সম্পত্তি সহ দগ্ধ করিয়াছে। এক্ষেত্রে প্রশ্ন দাঁড়ায় এই যে, যাহারা বে-আইনী করিয়াছিল, তাহারা নিশ্চয়ই দণ্ডার্হ। এই হিসাবে সরকারী বাড়ি অফিস প্রভৃতি দগ্ধকারীদের দণ্ডার্হতা কেহই অস্বীকার করিবেন না; কিন্তু সরকারের লোকজন কোন্ আইন অনুসারে ঐসব ঘর-জ্বালানির কাজ চালাইয়াছিল? শান্তি ও আইন রক্ষা করিবার প্রাথমিক কর্তব্য সরকারের রহিয়াছে, একথা আমরা অস্বীকার করিতেছি না; কিন্তু অপরাধীকে দণ্ডবিধানের সেক্ষেত্রেও আইনানুগ ব্যবস্থাই অবলম্বন করা বিধেয়। মেদিনীপুরের এইসব অঞ্চলে তাহা হইয়াছিল কি? ভারতীয় দণ্ডবিধির কোন ধারায় কোন অপরাধের সাজা হিসাবে এইভাবে ঘর জ্বালাইয়া দিবার বিধান আছে বলিয়া আমাদের জানা নাই এবং ইহাও নিশ্চিত যে, মেদিনীপুরের ঐসব অঞ্চলে জঙ্গী আইনও জারী করা হইয়াছিল না; অবশ্য জঙ্গী আইনেও এই ধরণের উৎকট দণ্ডনীতি অনুমোদিত হয় বলিয়া আমাদের মনে হয় না। সুতরাং যে দিক দিয়াই বিচার করা যাউক না কেন, মেদিনীপুরের ঐ সময় সরকারী লোকজনেরা ঘর-জ্বালানির যে নীতি অবলম্বন করিয়াছিল, তাহা আইনানুমোদিত নহে এবং তাঁহাদের সে অপরাধ দণ্ডনীয়; এজন্য দেশের লোকে তাহাদের বিচার দাবী করিতে পারে। কিন্তু বাঙলার স্বরাষ্ট্রসচিব তাঁহাদের মন্ত্রিত্বের আমলের পূর্বে কৃত এই সব কাজের জন্য বিচারের কোন দায়িত্ব স্বীকার করিতে অস্বীকৃত হইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, তৎকালীন মন্ত্রিসভারই সে কর্তব্য ছিল। বলা বাহুল্য, তাঁহার এই উক্তি আদৌ যুক্তিসহ নহে। পূর্বতন মন্ত্রিসভার যদি কোন ত্রুটি ঘটিয়া থাকে, তদপেক্ষা যোগ্যতর বর্তমান মন্ত্রিসভার তাহা সংশোধন করাই কর্তব্য। অপরাধের পূর্বে বিচার হয় নাই—এই অজুহাতে নিরপেক্ষ ন্যায়ের দণ্ড হইতে অপরাধী নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে না। যদি পারে, তবে সে ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের ন্যায়বিচারের অক্ষমতা বা অনিচ্ছারই তাহা পরিচায়ক হইয়া থাকে। কোন দেশের শাসকদের পক্ষেই ইহা গৌরবের কথা নয়।

পরলোকে কস্তুরবাঈ গান্ধী

মহাত্মা গান্ধীর সহধর্মিণী শ্রীযুক্তা কস্তুরবাঈ গান্ধী গত ৯ই ফাল্গুন, মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৭-৩৫ মিনিটের সময় শিবরাত্রির পুণ্য তিথিতে পুনার আগা খাঁর প্রাসাদরূপ বন্দিশালায় জগদ্বরেণ্য স্বামীর ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া অন্তিম নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন। কিছুদিন হইতেই তিনি কঠিন হৃদরোগে কষ্ট পাইতেছিলেন; তাঁহার মুক্তির জন্য সমগ্র ভারত বার বার আবেদন করিয়াছে; কিন্তু ব্রিটিশ শাসকগণ এ সম্বন্ধে তাঁহাদের সংকল্প হইতে বিচলিত হন নাই। পার্লামেণ্টে তাঁহার মুক্তিদানের সম্পর্কে প্রশ্ন উঠিয়াছিল; কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী ভারতের রাষ্ট্রীয় তরণীর কর্ণধারগণের পক্ষ হইতে সে প্রশ্নের এইরূপ উত্তর আসিয়াছিল যে, অন্তিম অবস্থাতেও বন্দিদশায় থাকাই তাঁহার পক্ষে শ্রেয়স্কর এবং নিরাপদ হইবে। শাসকবর্গের শৃঙ্খল-বন্ধনের সকল সুবিধানকে উপেক্ষা করিয়া সতী আজ চলিয়া গিয়াছেন। পরাধীন ভারতের মৌন বেদনায় কাতর কঠোর তপশ্চর্যায় কৃশ দেহ হইতে কস্তুরবার শেষ নিঃশ্বাস উন্মুক্ত আকাশে মিশিয়া গিয়াছে। কারাগারের দ্বার উন্মোচিত হয় নাই; কিন্তু সতীর প্রাণপূর্ণ সে শ্বাসবায়ু বাহিরে ছড়াইয়া পড়িয়াছে এবং সমস্ত ভারতকে বিপুল বেদনায় ব্যথিত করিয়া তুলিয়াছে। সেই সঙ্গে তাঁহার সতীত্বের পরিপূর্ণ গরিমা সমুজ্জ্বল-ছটায় দশ দিকে বিকীর্ণ হইয়াছে। সতী কস্তুরবাঈয়ের এই মৃত্যু জগতের ইতিহাসে উজ্জ্বল অক্ষরে লিখিত থাকিবে। তাঁহার এমন মৃত্যুকে আমরা মৃত্যু বলিব না। ভারতে নারীর সাধনার সর্বাঙ্গীন সার্থকতাই কস্তুরবাঈয়ের এই মৃত্যুর ভিতর দিয়া প্রজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

পরাধীন দেশের স্বাধীনতার সাধনা অতি কঠোর। এই সাধনার কণ্টকময় পথে যাঁহারা পদার্পণ করিয়াছেন, বন্দিজীবন তাঁহাদিগকে পদে পদে বরণ করিয়া লইতে হইয়াছে এবং বন্দিশালায় তাঁহাদের অনেককে শেষ নিঃশ্বাসও ত্যাগ করিতে হইয়াছে; কিন্তু সহধর্মিণীস্বরূপে স্বামীর সঙ্গে দেশের স্বাধীনতার সাধনায় ব্রত একনিষ্ঠভাবে প্রতিপালন করিয়া কারাকক্ষে স্বামীর ক্রোড়ে দেহরক্ষা করিবার এমন সৌভাগ্য কস্তুরবাঈ ব্যতীত জগতে অন্য কোন নারী লাভ করিয়াছেন বলিয়া আমরা জানি না; কস্তুরবাঈয়ের তপস্যা ভারত নারীর সতীত্ব মহিমাকে আজ জগতের দৃষ্টিতে সমুজ্জ্বল করিয়া তুলিল; ভারতের স্বাধীনতার হোম হুতাশনে জ্যোতির্ময়ী জননী নিজের দেহকে অর্ঘ্যদান করিয়া সেই যজ্ঞাগ্নিকে প্রবর্ধিত করিলেন। পুণার আগা খাঁর প্রাসাদে এই যে মহামেধ অনুষ্ঠিত হইল, তাহা সত্যই জগতের ইতিহাসে অপূর্ব। দক্ষ যজ্ঞাগারে সতীর দেহত্যাগের কথা আমাদের এক্ষেত্রে স্মৃতিপথে উদিত হইতেছে; কস্তুরবাঈয়ের অন্তিমমূর্তি ধ্যান করিতে গিয়া তপশ্চারিণী সতীর অপরিম্লান মূর্তিই আমাদের চিত্তে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিতেছে। আমরা দেখিতেছি, শিবরাত্রির সন্ধ্যা সমাগত হইয়াছে। মন্দিরে মন্দিরে শংকরের জয়ধ্বনি উত্থিত হইতেছে এবং সতীর দেহত্যাগের সেই শুভক্ষণে দেবকন্যাগণ বন্দনা-গীতি গান করিতেছেন ও দিগঙ্গনাগণ সতীর শয্যাতলে কুসুম বৃষ্টি করিতেছেন।

কস্তুরবাঈয়ের জীবন মহিমময় এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ। ত্যাগব্রতী স্বামীর সহধর্মিণীস্বরূপে তিনি মহাত্মা গান্ধীর পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাঁহার সকল সাধনায় সহযোগিতা করিয়াছেন। দক্ষিণ আফ্রিকার প্রবাসী ভারতীয়দের দুর্দশা মোচনের জন্য সত্যাগ্রহ আন্দোলন হইতে আরম্ভ করিয়া ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের আধুনিক অধ্যায় পর্যন্ত কস্তুরবাঈয়ের পুণ্য অবদানের মহিমায় সমভাবে উজ্জ্বল হইয়াছে। নিরভিমানিনী সেবাব্রতধারিণী কস্তুরবাঈ বহু কঠোর ধৈর্য এবং তিতিক্ষার সহিত সর্বত্র তাঁহার স্বামীর অনুগমন করিয়াছেন এবং তাঁহার মনে শক্তি সঞ্চার করিয়াছেন। এমন সহধর্মিণী লাভ না করিলে মহাত্মা গান্ধী তাঁহার লোকোত্তর মহিমা লাভ করিতে হয়ত সমর্থ হইতেন না কস্তুরবাঈকে দেখিলে এই কথাই আমারে মনে হইত। দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে ফিরিয়া মহাত্মাজী যখন কলিকাতায় আগমন করেন, তৎকালীন হাওড়া স্টেশনের একটি ঘটনার কথা আমাদের মনে পড়ে। গান্ধীজী এবং কস্তুরবাঈ স্টেশনে ট্রেণ ধরিতে চলিয়াছেন; এমন সময় কলিকাতার একজন ধনী ব্যবসায়ী কস্তুরবাঈকে কতকগুলি সোনার অলংকার এবং রূপার বাসন উপহার দিতে গেলেন। কস্তুরবাঈ সেগুলি দেখিয়া মৃদু হাস্য করিলেন এবং তাঁহার সুকোমল হস্ত দ্বারা উপহারগুলি স্পর্শ করিয়া বলিলেন—আমি কোনরূপ আভরণ ব্যবহার করি না, আপনার দান হস্ত স্পর্শের দ্বারাই গ্রহণ করিলাম, জানিবেন। মহাত্মা গান্ধীর জীবন আমাদের সাধারণের দৃষ্টিতে অতি কঠোর জীবন। কস্তুরবাঈ স্বামীর জীবনের এই কঠোরতার ছন্দের অনুবর্তন করিয়াই গিয়াছেন। মহাত্মাজীও তাঁহার সহধর্মিণীর ত্যাগের এই মহিমাকে অন্তরের সঙ্গে উপলব্ধি করিতেন। তাঁহার জীবন-চরিতের কোন কোন স্থানে আমরা দেখিতে পাই, আদর্শবাদী স্বামী পত্নীর প্রতি এই কঠোর আদর্শ উদ্‌যাপনের ক্ষেত্রে যে আচরণ করিয়াছেন, তাহা বাহির হইতে দেখিতে কঠোর বলিয়া মন হইলেও প্রকৃতপক্ষে প্রীতির সম্পর্কেই তাহা মধুর ছিল। সীতা-সাবিত্রীর কথা আমরা পুরাণ ইতিহাসেই শুনিয়াছি; বর্তমান ভারতে তাঁহাদের বিগ্রহ-মূর্তি ছিলেন কস্তুরবাঈ। মাতৃত্বের স্নিগ্ধ জ্যোতি-বিমণ্ডিত কস্তুরবাঈকে দেখিলে সকলেরই মন শ্রদ্ধায় আনত হইত। তপস্যার সুবিমল মাধুরী তাঁহার সমগ্র অঙ্গে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত।

কস্তুরীবাঈ আজ চলিয়া গিয়াছেন; কিন্তু এজন্য দুঃখ করিব না। মহাত্মা গান্ধীর সাধনা বীরের সাধনা। আমাদের মনে আছে, কয়েক বৎসর পূর্বে তিনি বলিয়াছিলেন, এদেশের কোটি কোটি নরনারী যে নিদারুণ দুঃখ দুর্দশার মধ্যে ক্রীতদাসের জীবন যাপন করিতেছে; তাহা প্রত্যক্ষ করিলে কেহ অশ্রু রোধ করিতে পারে না। আমি কঠোর প্রকৃতির লোক; তথাপি তাহাতে আমার চোখেও জল আসে; কিন্তু আমি অশ্রু ফেলিব না। আমি যে ব্রত গ্রহণ করিয়াছি, তাহা বীরের ব্রত; আমার ব্রত ক্ষত্রিয়ের ব্রত। আজ মহাত্মাজী তাঁহার প্রাণপ্রিয় জীবন-সঙ্গিনীকে হারাইয়াছেন। তিনি বৈরাগ্যবান, তিনি সাধক। তিনি ভগবদ্ভক্ত। তিনি এই নিদারুণ বিয়োগ-ব্যথায় বিচলিত হইবেন না, ইহা আমরা জানি। কিন্তু আমরা সাধারণ মানুষ এই মহীয়সী জননীর মহাপ্রয়াণে আমাদের শোক হইবে ইহা স্বাভাবিক; তথাপি বলিব দুর্বলের মত শোক করিয়া লাভ নাই; কস্তুরবাঈয়ের আত্মোৎসর্গ আমাদিগকে মনুষ্যত্বে উদ্বুদ্ধ করিবে, ইহাই আমরা আজ কামনা করি; তাঁহার বিয়োগ ব্যথা দেশের বর্তমান দুর্দশার প্রতীকার কল্পে আমাদের সাধনাতে সুদৃঢ় করিয়া তুলুক ইহাই আমাদের প্রার্থনা। মহদুদ্দেশ্যে আত্মোৎসর্গ—কোন দিন ব্যর্থ হয় না; ভারতের স্বাধীনতা-সাধনায় কস্তুরবাঈয়ের এই জীবন-দানযজ্ঞও ব্যর্থ হইবে না।

-শ্রীউপেন্দ্র নাথ গঙ্গোপাধ্যায়-

৩৩

জমিদারী সেরেস্তায় নিজের অফিস ঘরে বসিয়া দিবাকর কাগজপত্র দেখিতেছিল, এমন সময়ে যোগমায়া বালিকা বিদ্যালয়ের এক পিওন আসিয়া নত হইয়া অভিবাদন করিয়া তাহাকে একটা খামে-মোড়া চিঠি দিল। খামের উপরে যূথিকার হস্তাক্ষর। পিওন-বুকে সই করিয়া পিওনকে বিদায় দিয়া খাম খুলিয়া চিঠির উপর দৃষ্টিপাত করিয়া দিবাকরের মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল।

সংক্ষিপ্ত চিঠি। কিন্তু সেই সংক্ষিপ্ত চিঠির স্বল্পসংখ্যক কথার কোনোটাই সংক্ষিপ্ত বলিয়া দিবাকরের মনে হইল না; প্রত্যেকটাই যেন দৃঢ়তা এবং দৃঢ়-প্রতিজ্ঞার প্রকাশে মুখর। ১লা ফেব্রুয়ারী হইতে যোগমায়া বালিকা বিদ্যালয়ের সেক্রেটারীর পদ ত্যাগ করিবার নোটিস দিয়াছে যূথিকা। নোটিস দিয়াছে বটে, কিন্তু সেই নোটিসের মধ্যে উচ্ছ্বাস নাই, উত্তাপ নাই, হেতুবাদ নাই;—শুধু আছে বিদ্যালয়ের সংশ্রব হইতে পরিপূর্ণভাবে মুক্তিলাভ করিবার সংকল্পের এমন একটা সংক্ষিপ্ত প্রকাশ, যাহা সহজ কথার দ্বারা আবৃত হইলেও কার্যত যাহাকে বাতিল করা সহজ হইবে বলিয়া মনে হয় না।

চিঠিখানা আর একবার পাঠ করিয়া খামে পুরিয়া পকেটে রাখিয়া দিবাকর ক্ষণকাল ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বসিয়া রহিল। বিস্ময়াহত মনে প্রথমটা উৎপন্ন হইয়াছিল বিরক্তি। কিন্তু দেখিতে দেখিতে সেই বিরক্তি ক্রোধে রূপান্তরিত হইল! মনে হইল, যূথিকার এই পদত্যাগের প্রস্তাব প্রকৃতপক্ষে তাহাকে একটা বিরোধের মধ্যে আহ্বান ছাড়া আর কিছুই নহে। স্কুলে গিয়া একটা অতি সংক্ষিপ্ত পত্রের দ্বারা যূথিকার আবেদন মঞ্জুর করিয়া পিওন-বুক দিয়া সেই পত্র যূথিকার নিকট পাঠাইয়া দিল।

মনটা এমনই খিচড়াইয়া গিয়াছিল যে, সন্ধ্যাকালে শিবানীদের গৃহে গিয়াও বিশেষ কিছু তাহার উপশম হইল না। পড়া দিতে দিতে সামান্য দুই একটা ভুলভ্রান্তির জন্য বেচারা শিবানী অনভ্যস্ত ভর্ৎসনায় ভর্ৎসিত হইল এবং ক্ষীরোদবাসিনী তাহার অভ্যস্ত রহস্যালাপের উত্তরে দিবাকরের নিকট হইতে সহজ এবং অসরস উত্তর পাইয়া পাইয়া অগত্যা ক্ষান্তি মানিল।

গৃহে প্রত্যাগমনের পূর্বে দিবাকর শিবানীর অসাক্ষাতে ক্ষীরোদবাসিনীকে বলিল, "কাল তোমরা আমাদের বাড়ি বেড়াতে গিয়েছিলে, সে ভালই করেছিলে। কিন্তু আর বেশী গিয়ে-টিয়ে কাজ নেই ক্ষীরোদ ঠাকুমা।"

দিবাকরের এই অহেতুক নিষেধ বাক্য শুনিয়া যৎপরোনাস্তি বিস্মিত হইয়া ক্ষীরোদবাসিনী বলিল, "বেশী এমনিই হয়তো যেতাম না, তার ওপর তুই যখন মানা করছিস তখন ত নিশ্চয়ই যাব না। কিন্তু এ মানা করবার কারণ কি হয়েছে, তা'ত বুঝতে পারছিনে দিবাকর।'

কথাটাকে এড়াইয়া যাইবার অভিপ্রায়ে পরিহাসের লঘু ভংগীর আশ্রয় লইয়া দিবাকর বলিল, "কি দরকার ঘন ঘন বড়লোকের বাড়ি গিয়ে?"

তেমনি বিস্মিত কণ্ঠে ক্ষীরোদবাসিনী বলিল, "বড়লোকের বাড়ি গিয়ে? কিন্তু বাড়ি ত' তোর; বড়লোক ত তুই।"

"আমি বড়লোক হতে পারি, কিন্তু বড়লোক বাড়ি ত আমি নই।" বলিয়া ক্ষীরোদবাসিনীকে আর কোনো কথা বলিবার সুযোগ না দিয়া সহাস্যমুখে দিবাকর প্রস্থান করিল।

তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালিনী ক্ষীরোদবাসিনীর বুঝিতে বাকি রহিল না যে, ঠিক যে কথাটা তাহার জানিবার প্রয়োজন ছিল, কথার ফাঁকি রচনা করিয়া দিবাকর তাহা চাপা দিয়াই গেল। দিবাকরের রহস্যজনক কথাবার্তা হইতে কালই ক্ষিরোদবাসিনীর মনে যে সংশয় জাগিয়াছিল, আজ তাহা তাহার অসরস আচরণ এবং প্রস্থানকালীন সমস্যাপূর্ণ কথাবার্তার দ্বারা, সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইল। দিবাকরদের গৃহে যূথিকা এবং শিবানীর মধ্যে জনান্তিকে যে সকল কথাবার্তা হইয়াছিল তাহা জানিয়া জানিয়া এবং তদ্বিষয়ে জেরা করিয়া করিয়াও ক্ষিরোদবাসিনী কোনো সুবিধাজনক সূত্রের সন্ধান পাইল না।

শিবানী বলিল, "না ঠাকুমা, বউদিদি ভারি চমৎকার মানুষ। আমাদের যাওয়াতে একটুও তিনি অসুখী হন নি; বরং মধ্যে মধ্যে আমাদের যাবার জন্যে অনুরোধই করেছেন। নিজেও তিনি শীঘ্র একদিন আসবেন বলেছেন।"

"দিবাকর যে তোকে ইংরেজি পড়াচ্ছে, সে কথা যূথিকাকে বলিসনি ত' শিবু?"

"তুমি যখন বলতে মানা করেছ, তখন কি করে বলি? কিন্তু সে কথা বউদিদিকে বলতে মানা কেন, তা আমি একটুও বুঝতে পারিনে ঠাকুমা।"

ক্ষীরোদবাসিনী বলিল, "শুধু বউদিদিকে বলতেই মানা নয় শিবু, দিবাকর যে তোর মাস্টারি করছে এ কথা কেউ জানে তা তার ইচ্ছে নয়।

"এ কথা দিবাকর দাদা তোমাকে বলেছেন?"

স্মিতমুখে ক্ষীরোদবাসিনী বলিল, "না বললে আমি কি করে জানব রে?"

যে অবস্থাকে কেন্দ্র করিয়া দিবাকর-সম্পর্কিত সমস্যাটা আবর্তিত হইতেছিল, তাহার সহিত শিবানী কোনো প্রকারে জড়িত ছিল কি না, তাহা জানিবার জন্য

ক্ষীরোদবাসিনী মনে মনে ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছিল। শিবানীর সহিত কথাবার্তা কহিয়া তাহার কোনো হদিস মিলিল না। অথচ সেই সন্দেহটাই তাহার মনের মধ্যে ক্রমশ পীড়াদায়ক হইতে আরম্ভ করিয়াছে।

সেই দিন রাত্রে যূথিকার সহিত দেখা হইলে দিবাকর বলিল, "এর মানে কি, জানতে চাই।"

শান্তকণ্ঠে যূথিকা বলিল, "কিসের মানে?"

"তোমার চিঠির।"

"উত্তর যখন ঠিক দিয়েছ, তখন আমার চিঠির মানে ত তুমি ঠিকই বুঝেছ।"

যূথিকার উত্তরের এই ভঙ্গী বিদ্রূপাত্মক মনে করিয়া দিবাকর মনে মনে উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "তা'ত বুঝেছি। কিন্তু এত-গুলো টাকা খরচ করিয়ে স্কুলের ব্যাপারে আমাদের নাবিয়ে তারপর তোমার এই আচরণের কি মানে, তাই বুঝতে পারছিনে।"

এ অভিযোগের বিরুদ্ধে যূথিকার যাহা কিছু বলিবার ছিল একটি বাক্যও তাহার না বলিয়া সে বলিল, "এই আচ-রণের দ্বারা আমি অপরাধ করেছি ব'লে তোমার যদি মনে হয়, তা হলে আমাকে দণ্ড দাও।"

"ঈষৎ শ্লেষমিশ্রিত কণ্ঠে দিবাকর বলিল, "মাঝে মাঝে দণ্ড চাওয়ার চমৎকার অভ্যাস আছে তোমার দেখছি।"

"অভ্যাস নেই;—যখন তুমি আমাকে অপরাধী কর তখনই দণ্ড চাই।"

"কি দণ্ড দোব শুনি?

আমি গরীবের মেয়ে, অর্থদণ্ড দিয়ে তোমাদের ক্ষতিপূরণ করি, সে সাধ্য আমার নেই। শারীরিক দণ্ড দাও। তোমাদের জাঁতাঘর আছে, ঢেঁকিশাল আছে, গোয়ালঘর আছে,—সেসব যায়গায় আমার দণ্ডের ব্যবস্থা করতে পার। তাতে যদি তোমাদের সম্মানের হানি হয়, তাহলে দশ রাত্রি বলো, পনেরো রাত্রি বলো, খালি গায়ে ভূমির ওপর বারান্দায় শুয়ে শীতের রাত কাটাতে পারি।"

যূথিকার দুই চক্ষু দিয়া বড় বড় কয়েক ফোঁটা অশ্রু ঝরিয়া পড়িল। পাশের দিকে অল্প একটু ফিরিয়া চক্ষু মুছিয়া লইয়া সে নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিল। দিবাকর দেখিল, কিছু পূর্বে যাহা জল ছিল, জমিয়া তাহা বরফ হইয়াছে; এখন তাহাকে চূর্ণ করা হয়ত সহজ, কিন্তু ইচ্ছামত প্রবাহিত করানো কঠিন।

ক্রোধের উপর সহসা একটা দুর্মদ অভিমান আসিয়া ভর করিল; গভীর স্বরে সে বলিল, "কালই আমি স্কুল উঠিয়ে দোবো।"

যূথিকা বলিল, "তোমার স্কুল, তুমি যদি উঠিয়ে দেওয়া ভাল মনে কর, তা হলে উঠিয়ে দেবে বই কি।"

"এখন থেকে তা হলে 'তোমার' আর 'আমার' চলতে আরম্ভ করল?"

দিবাকরের প্রতি পরিপূর্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া যূথিকা বলিল, "আমার নিজের আর এমন কি আছে যাতে 'আমার' চলতে পারে? যা কিছু সবই ত তোমার।"

"উপস্থিত ত' দেখছি একটা জিনিস ছাড়া।"

যূথিকার অধরপ্রান্তে অতি ক্ষীণ হাস্যরেখা দেখা দিল; বলিল, "আমার কথা বলছ? কিন্তু উপস্থিত দেখছ না, গোড়া থেকেই দেখছ। আমি যখন নীল-কান্তমণি দলের মেয়ে নই, তখন কি ক'রে আমাকে তোমার জিনিস বলে দেখতে পার?" এক মুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "একটা মানুষকে হাতের মধ্যে পাওয়াই ত ষোল আনা পাওয়া নয়, মনের মধ্যে পাওয়াই যথার্থ পাওয়া। মনের মধ্যে গ্রহণের অযোগ্য মনে করে আমাকে যখন মনের মধ্যে গ্রহণ করনি, তখন 'একটা জিনিস ছাড়া'—সে কথা নিশ্চয় বলতে পার।"

দিবাকর বলিল, "তুমি কিন্তু আমাকে গ্রহণের অযোগ্য মনে ক'রেও দয়া ক'রে স্বামী ব'লে গ্রহণ করেছ। মনের মধ্যে গ্রহণ করেছ কি-না, সে কথা অবশ্য বলতে পারিনে।"

দিবাকরের কথা শুনিয়া যূথিকার দুই চক্ষে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল; দৃপ্ত কণ্ঠে বলিল, "তবে কেন তোমাকে গ্রহণ করেছি? তোমার টাকার লোভে?"

দিবাকর বলিল, "তা আমি জানিনে।"

সেইরূপ প্রজ্বলিত নেত্রে যূথিকা বলিল, "জানো! সেই কদর্য ইঙ্গিতই তুমি করছ! তুমি অর্থবান, অর্থের প্রতি তাই তোমার মোহ আর বিশ্বাসের অন্ত নেই। কিন্তু আমরা, গরিবরা, অর্থকে ঘৃণার সঙ্গে অবহেলা করতে জানি। শোনো,—এ কথার একটা চূড়ান্ত মীমাংসা হওয়া দরকার। আজ আমি তোমাকে চ্যালেঞ্জ করছি,—তুমি আমার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ কর।" বলিয়া দিবাকরের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া সে ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলিতে লাগিল।

দিবাকর জিজ্ঞাসা করিল, "কি তোমার চ্যালেঞ্জ?"

যূথিকা বলিল, "তোমার যা কিছু সম্পত্তি আছে, তার শেষ কপর্দক পর্যন্ত দান ক'রে বিলিয়ে দিয়ে তুমি আমার নিঃস্ব দরিদ্র স্বামী হও। আমি নিজে উপার্জন ক'রে আমাদের দুজনের সংসার চালাব। সে সংসারে সুখ না থাকুক, শান্তি থাকবে। পারবে তুমি এমন ক'রে আমার ভালবাসার পরীক্ষা নিতে? কখনো পারবে না। শুধু পারবে, আপনার জমিদারির তক্তে কায়েম হ'য়ে থেকে মাঝে মাঝে আমাকে অপমান করতে। রইল তোমার কাছে আমার এই চ্যালেঞ্জ!" বলিয়া আর কোনো কথার জন্য অপেক্ষা না করিয়া একটা দমকা হাওয়ার মতো সে সবেগে প্রস্থান করিল।

দাম্পত্য কলহের প্রতি শাস্ত্রের একটা উপেক্ষাবাণী আছে। এ ক্ষেত্রে সেটা কিন্তু ঠিক খাটিতে দেখা গেল না। ইহার পর কিছুদিনের জন্য যূথিকা এবং দিবাকরের মধ্যে চলিল একটা নিঃশব্দ প্রায় অসংযোগের পালা। অনন্যচিত্তে একজন ডুব মারিল সংস্কৃত ভাষার অধ্যয়নে, এবং অপরে প্রবৃত্ত হইল ইংরেজি ভাষার অধ্যাপনায়।

(ক্রমশ)

কথাকলির কথা

মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত

"দাক্ষিণাত্যের কথাকলি নৃত্য"—এ কথাটাই অনেকে লেখেন ও বলেন। কিন্তু দাক্ষিণাত্য বলতে অনেকটা জায়গা বোঝায় এবং কথাকলি দাক্ষিণাত্যের সর্বত্রই দেখা যায় না। কথাকলি শুধু সেইটুকু জায়গারই নিজস্ব শিল্পকলা—আজকাল যেখানটার নাম "মালাবার"। পূর্বে মালাবারের নাম ছিল "কেরলা"। বিশেষ করে এখন যেখানটা ত্রিবাংকুর রাজ্য, সেখানেই এর বিশেষ চর্চা ও পরাকাষ্ঠা।

মালাবার অধিবাসীদের একান্ত সৌভাগ্য ও বিশেষ সৎগুণ যে, তাঁরা তাঁদের এই নিজস্ব ও দেশজ রসকলাকে দূরে দিয়ে রাখেন নি কোন দিন। ইংরেজ রাজত্বের প্রাথমিক যুগে যখন এদেশের সমস্ত কিছুতেই এদেশীয়রা নাক সিঁট্‌কাতেন, তখনো মালাবারে আর কিছু থাক বা না থাক, কথাকলির যথাযথ চর্চা ও সাধনা ছিল। তবে হয়ত-বা একটু ঢিমা চালে।

এর আদিতম রূপের খোঁজ করতে গেলে বৈদিক যুগের তান্ত্রিক পর্যায় পর্যন্ত তলাতে হবে। কিন্তু সে একটা মস্ত বড় ব্যাপার, তার একটা শাখা থেকে কথাকলির উদ্ভব হয়েছে এবং পণ্ডিতেরা সে সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলতেও পারেন না। বর্তমান সময়ে আমরা যে জিনিসটি পেয়েছি, তার রূপায়ন হয়েছে ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে কোটর-কারের রাজা বীরকেরলা বর্মার রাজত্ব সময়ে (১৫৭৫-১৬৫০)। তিনি নিজে একজন গুনশীল শিল্পী ও তুখোর পণ্ডিত ছিলেন। তাঁকেই আজকাল কথাকলির স্রষ্টা বলে ধরা হয়। মোট আটটি নাট্য তিনি রচনা করে গেছেন রামচন্দ্রের জন্ম থেকে রাবণ-বিনাশ পর্যন্ত ঘটনা নিয়ে। তখন লোকে কথাকলিকে রাম নাট্য বলেই জানত; কথাকলি হালের নাম। ঐ রাম-নাট্যগুলির অভিনয়তেও কথাকলির মত প্রতিটি ঘটনার ও সূক্ষ্ম ভাবের প্রকাশ হয়ে যেত শুধু গীত, অঙ্গভঙ্গী ও মুদ্রা সহযোগে। নাচিয়েরা মঞ্চে একবারে বোবা থাকত—অর্থাৎ মূকাভিনয় —যার ইংরেজী কথা pantomime. এই অভিনয়ে· বীরবর্মা ভরতের নাট্যশাস্ত্রের অনুশাসন মেনে চলতেন এবং কথাকলিতে তিনি মালাবারের লোকনৃত্য ও ভরতের নাট্যশাস্ত্রের আঙ্গিক ও মুদ্রার ওতঃপ্রোত মিলন ঘটান। কালিকটের "কৃষ্ণনাট্য" থেকে কথাকলি কিছু কিছু বিষয় গ্রহণ করেছে; তাই থেকে অনেকে বলে গেছেন "কৃষ্ণনাট্য" থেকেই কথাকলি জন্মেছে। কিন্তু আজকালকার পণ্ডিতদের গবেষণাতে সে কথা ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়েছে। শুধু কৃষ্ণনাট্যের প্রাথমিক রূপ দু'টি—যাদের নাম "ছক্কিয়ার কুথু" ও "কুটিয়ত্তম" তাদের থেকে কথাকলি অঙ্গসজ্জা, শিরসজ্জা ও মেকআপ ধার করেছে মাত্র।

খাঁটি কথাকলি নৃত্য অত্যন্ত সূক্ষ্ম কলা এবং তার অনুশীলন অত্যন্ত দুরূহ। শৈশব থেকে এর সাধনা না করলে প্রথম শ্রেণীর কথাকলিবিদ হওয়া প্রায় অসম্ভব। যিনি কথাকলি শিল্পী হতে চান তাঁকে ১১ বছর থেকে ১৪ বছরের মধ্যে কোন "কালারী"র (শিক্ষায়তন) "অসন"এর (শিক্ষকের) কাছে যোগ দেওয়া ও টাকা পয়সা, বসন বা ভোজ্য দান করে দীক্ষা নেওয়া বিধেয়। শিক্ষক তাকে একটি মোটা কাপড়ের ছোট্ট টুকরো দেবেন তার নাম "কুছা" (বাঙলা কথা "কাছা") এবং সেটি তিন গজ লম্বা ও ছ' ইঞ্চি চওড়া। ছাত্র সেটিকে কৌপীনের মত করে পরবে। তারপর তার সর্বাঙ্গে বেশ খানিকক্ষণ ধরে ধীরে ধীরে তিসির তেল মালিস করান হবে। এ কাজটি হলে পর গুরু তাকে হাত, পা, অঙ্গ নাড়তে, ফেরাতে ও ঢেউ খেলাতে শেখাবেন। এতে পেশীগুলি নরম হয় ও ভঙ্গীতে স্বাচ্ছন্দ্য ও লঘু-গতি আসে। এইরূপ ব্যায়ামেতে যখন তার ঘাম ঝরতে থাকবে তখন প্রথমে তাকে চিৎ ও পরে উপুড় করে শুইয়ে দেওয়া হয় এবং হাঁটু ও কনুয়ের তলাতে নরম কোন পটি বা কলাগাছের ডোঙ্গা রাখা হয়। গুরুর কাজটি আরও গুরুতর। তিনি শোয়ান শিষ্যের উপর ঝোলান একটা দড়ির সাহায্য নিয়ে প্রায় দোদুল্যমান হয়ে পা কিম্বা পদাঙ্গুষ্ঠ দিয়ে শিষ্যের সর্বাঙ্গ দিব্বি করে টিপে টুপে মেসেজ করে দেবেন সম্পূর্ণ শরীরতত্ত্বের নিয়মানুসারে। অল্প বয়সে ব্যায়াম ও অনুশীলন দ্বারা সমস্ত পেশীগুলি নমনীয় হয় ও সাবলীল ভঙ্গীতে সঞ্চালন করা সম্ভব হয়। এই সঞ্চালন অবশ্য শিখতে হয় বাজনার তালে তালে।

অনুশীলনের দ্বিতীয় পর্যায়ে গুরু তার শিষ্যের মনে বিভিন্ন রসের ধারণা জন্মিয়ে দেবেন ও চোখ, ভ্রূ, চোখের পাতা নাক, গাল, ঠোঁট, থুৎনী, গলা প্রভৃতির কম্পনে, স্ফুরণে ও আন্দোলনে সেই রস প্রকাশ করতে শেখাবেন। তৃতীয় পর্যায়ে তাল, ছন্দ, লয় সহযোগে অঙ্গভঙ্গী, উৎক্ষেপ ও পদক্ষেপ শেখান হয়। তাল শেখান হয় "ছেণ্ডা" নামক একরকম ঢাকের বাদ্য দ্বারা —ঢাক হলেও যার বাদ্য নাকি না-থামতেও মিষ্টি লাগে। এই রকম অভিনয় শিক্ষা ও মহড়ার নাম "ছোলীয়ত্তম"

অঙ্গভঙ্গী ও অঙ্গ সঞ্চালন

অঙ্গভঙ্গী তিন প্রকার—প্রাকৃতিক, প্রতিরূপী ও প্রসারিত। নাম থেকেই এর অর্থোপলব্ধী হয়। মাথার চৌদ্দটি ও ভ্রূর সাতটি ভঙ্গী, ছত্রিশ রকম কটাক্ষ, গলা, অক্ষিগোলক ও অক্ষিপল্লব প্রত্যেকের নটি করে ভঙ্গী; নাক, গাল, অধর, থুৎনী ও মুখ প্রত্যেকের ছটি করে ভঙ্গী ও সারা মুখটির চার রকম ভাব আছে। এ হচ্ছে নাট্যশাস্ত্রে যা যা আছে তা সমস্ত। এর থেকে সচরাচর মাথার নটি, ভ্রূর ছটি, এগারটি কটাক্ষ ও গলার চারটি ভঙ্গী কথাকলিতে প্রয়োগ করা হয়। জ্ঞানাচার্য এ, সি পাণ্ডে তাঁর "The art of kathakali" নামক বইতে এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন।

বিশদ বিবরণ হচ্ছে এ রকমঃ—

মস্তক সঞ্চালন—(১) আকম্পিত (উপরে, নীচে বা পাশাপাশি চালনা), (২) কম্পিত (দ্রুত উপরে নীচে), (৩) ধুত (আস্তে আস্তে নাড়ান), (৪) বিধুত (দ্রুত নাড়ান), (৫) পরিবাহিত (এক পাশ থেকে আরেক পাশে), (৬) অধুত (এক পাশে হেলিয়ে রাখা); (৭) অবধুত (অধুত অবস্থা থেকে নুয়ে পড়া); (৮) অঞ্চিত (এক পাশে ঝোঁকা); (৯) নিঞ্চিত (কাঁধ উঠে মাথায় ঠেকবে, মাথা একটু ওপরে তোলা); (১০) পরবৃত্ত (এক পাশে ঘোরান, পাশে কিছু দেখার সময় যেমন হয়); (১১) উৎক্ষিপ্ত; (১২) অধোগতি (নামান); ,(১৩) ললিত (চার দিকেই ঘোরান, যেমন মূর্চ্ছার সময় হয়); (১৪) প্রকৃত (স্বাভাবিক)।

ছত্রিশ রকম কটাক্ষ:—কটাক্ষের তিন শ্রেণী (১) রসদৃষ্টি, (২) অস্থায়ী দৃষ্টি (৩) সঞ্চারী দৃষ্টি। রসদৃষ্টি আট প্রকার —কান্ত, ভয়ানক, হাস্য, করুণ, অদ্ভূত, রৌদ্র, বীর, বিভৎস। অস্থায়ী দৃষ্টিও আট রকম—স্নিগ্ধ, হৃষ্ট, দীন ক্রুদ্ধ, দৃপ্ত, ভয়ভীত, জুগুপ্সিত ও বিস্মিত। সঞ্চারী দৃষ্টি কুড়িটি—শূন্য, মলিন, শ্রান্ত, লজ্জিত, ম্লান, শঙ্কিত, বিষণ্ণ, মুকুল, কুঞ্চিত, অভিতপ্ত, জিম্ম (বাঁকা), সলিলতা,

বিতর্কিত, অর্ধমুকুল, বিভ্রান্ত, বিপ্লুতা (স্তম্ভিত), অকেকর (অক্ষিগোলকের ক্রমাগত ঘূর্ণন)। বিশোক (দুঃখমুক্ত), গ্রস্ত ও মদির।

আট রকম চাহনি, যথাঃ—সাম, কাচি (পল্লবের ভেতর দিয়ে তাকান চোখে আলো পড়লে যেমনতর হয়), অনুবৃত্ত (কোন কিছু বুঝতে বা চিনতে পারা), আলোকিত (আশ্চর্য), প্রলোকিত (পাশে), বিলোকিত (পেছনে), উল্লোকিত (ঊর্ধ্বে), অভিলোকিত (নীচে)।

অক্ষিগোলকের ন' রকম ভঙ্গি, যথাঃ—ভ্রমর (কম্পন), বলন (ঘোরান), পাত (নত), কলার (অস্থির), সম্পাবেশ (ভেতরে টেনে নেওয়া), নিষ্ক্রাম (বাইরে ঠিকরে বার করার ভাব), বিবর্তন (কোণাকুণি), সমুদ্‌ধৃত (চোখ তুলে ওপরে তাকান), প্রকৃত।

চোখের পাতার ভঙ্গি ন'টি, যথাঃ—উন্মেষ, নিমেষ, পৃষ্ঠ (সম্পূর্ণ খোলা), কুঞ্চিত, সাম, বিবর্তিত (উপরে তোলা), স্ফুরিত, পিহিত (চেপে বন্ধ করা), সবিতাদিত (আহত হলে যেমন হয়)।

ভ্রূর ভঙ্গি সাতটি, যথাঃ—উৎক্ষেপ্ত, পাতন (নামান), ভ্রূকুটি, চতুর (মেলে দেওয়া), কুঞ্চিত, রেচিত (কোন একটিকে তোলা), সহজ।

নাকের ভঙ্গি ছ'টি, যথাঃ—নত (বন্ধ করা), মন্দ, বিকৃষ্ট (সম্পূর্ণ খোলা), সোচ্ছ্বাস (গভীরভাবে শ্বাস নেওয়া), বিকুন্দিত (সঙ্কোচন করা, যেমন ঘৃণায়), স্বাভাবিক।

গালের ভঙ্গি ছ'টি, যথাঃ—ক্ষাম (নত), ফুল্ল, ঘূর্ণ (ছড়ানো), কম্পিত, কুঞ্চিত, সাম।

অধরের ভঙ্গি ছ'টি, যথাঃ—বর্তন, কম্পন, বিসর্গ (যেমন কোন কিছু পানের সময় হয়), বিনিগূঢ় (ভেতরে বাঁকান), সমাদষ্ট (দাঁতে চেপে ধরা, যেন কান্না থামাচ্ছে), সাম।

থুৎনির ভঙ্গি ছ'টি, যথাঃ—কুট্টর (দাঁতে দাঁত চাপা), খণ্ডন (দাঁতে দাঁত ঘর্ষণ), ছিন্ন (যেন দাঁতে কিছু কাটা হচ্ছে), চুক্কিত (প্রসারিত), লেহিত (কোন কিছু লেহন করার সময় যেমন হয়), সাম।

মুখের ভঙ্গি ছ'টি, যথাঃ—বিনিবৃত্ত (সম্পূর্ণ খোলা), বিধুত (এক কোণাতে খোলা), নির্ভুগ্ন (নত করা), বিঘ্ন (পাশে খোলা), বিবৃত্ত (শুধু ঠোঁট দুটিই খুলিবে), উদ্বাহিত (ঊর্ধ্বে খোলা)।

গলার ভঙ্গি ন'টি, যথাঃ—সাম, নত, উন্নত, ত্রস্ত (পাশে বাঁকান), রেচিত (ঘোরান), কুঞ্চিত, অঞ্চিত (এক পাশে বাঁকান), বাতিত (নাড়ান), বিবৃত্ত (অন্যের সঙ্গে মুখোমুখি)।

সারা মুখের ভাব চারটি, যথাঃ—স্বাভাবিক, প্রসন্ন, রক্ত (যেমন রাগ, হিংসা প্রভৃতিতে হয়), শ্যাম (ভাবাবেশ)।

হাতের ভঙ্গি কুড়িটি, যথাঃ—উৎকর্ষ (উল্লাসে), বিকর্ষ (দু'পাশে মেলে দেওয়া), ব্যাকর্ষ (আকর্ষণ), পরিগ্রহ (গ্রহণ করার ভঙ্গি), নিগ্রহ (ত্যাগ করা), আহ্বান, যোধন (প্রহার), সংশ্লেষ (আলিঙ্গন), বিয়োগ, রক্ষণ, মোক্ষন, বিক্ষেপ্ত (কোন কিছু ছোঁড়া), ধুনন (কম্পন), বিসর্গ (মানা করা), তর্জন, ছেদন, ভেদন, স্ফাটন (কিছু ভাঙা), মোটনা (কুঞ্চিত করা), তাড়না (যেন কাউকে তাড়ান হচ্ছে)।

এক সমস্ত ছাড়াও আর যত প্রত্যঙ্গ আছে সবাই, এমনকি প্রতিটি পেশী পর্যন্ত কথাকলিতে কাজ করে। তাতে যে কত রকম ভঙ্গি হয়, তার কোন সীমাসংখ্যা নেই। শিল্পী রসব্যঞ্জনার জন্য যে-কোন অঙ্গ বা পেশীর যে-কোন শোভন ভঙ্গি করতে পারে: সে স্বাধীনতা তার আছে। দক্ষ শিল্পী এমন চাতুর্যে ও কৌশলে সজ্জা ও ভঙ্গি দ্বারা রস-সৃজন ও ভাব প্রকাশ করতে পারে যে, বাক্‌শক্তি ব্যবহার না করার জন্যে কিছুমাত্র অভাব বোধ হয় না বা কোন কিছুই বিন্দুমাত্র অপ্রকাশ থাকে না। সংগীত-রত্নাকরে শার্ঙ্গদেব বলেছেনঃ—

"নেত্রভ্রূমুখরাগাদি, রূপাঙ্গৈ রূপবর্জিত,
প্রত্যঙ্গৈশ্চ কুরু কার্য রসভাব প্রকাশক॥"

এতে রস ও ভাব প্রকাশক হিসেবে ভাষার উল্লেখমাত্রও নেই। 'অভিনয়দর্পণে' নন্দীকেশ্বরও বলেছেনঃ—

"যতোহস্তস্ততোদৃষ্টি র্যতোদৃষ্টিস্ততোমনঃ,
যতোমনস্ততোভাব যতোভাবস্ততোরসঃ।"

এতেও অঙ্গভঙ্গি এবং মুদ্রাকে ভাব প্রকাশের মাধ্যম ধরা হয়েছে।

মুদ্রা

মুদ্রা হচ্ছে সংকেত। মুদ্রা প্রধানত দু' শ্রেণীতে বিভক্ত—অসংযুক্তহস্ত ও সংযুক্ত হস্ত। ভারতের নাট্যশাস্ত্রে চব্বিশটি অসংযুক্ত-হস্ত ও তেরোটি সংযুক্তহস্ত মুদ্রার উল্লেখ পাওয়া যায়। জ্ঞানাচার্য পান্ডে বলেন একটি মালয়ালম পুঁথিতে নাকি চব্বিশটি অসংযুক্তহস্ত এবং চল্লিশটি সংযুক্তহস্ত মুদ্রার উল্লেখ পাওয়া গেছে। কথাকলিতে সর্বসমেত চৌষট্টিটি মুদ্রা ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এ সম্বন্ধে বলা যায় যে, অন্য কোন প্রকার নৃত্যে এত মুদ্রার ব্যবহার ও মুদ্রার দ্রুত ব্যবহার দেখা যায় না। ভাব-ব্যঞ্জনার প্রধান কলকাঠিই হচ্ছে মুদ্রা।

অসংযুক্তহস্ত মুদ্রা চব্বিশটিঃ—(১) পতাকা (অনামিকা শুধু ভেতরে মোড়া অঙ্গুষ্ঠে তর্জনীর গোড়া ছুঁয়ে থাকবে অন্য সব আঙুল সোজা, নাট্যশাস্ত্রের মতে সমস্ত আঙুলই সটান খোলা থাকা উচিত)। (২) কটক (তর্জনী ও মধ্যমা ভেতরে মোড়া, মধ্যমা অঙ্গুষ্ঠের গোড়া ছুঁয়ে থাকবে ও তর্জনী ও অঙ্গুষ্ঠের মাথা পরস্পরকে ছুঁয়ে থাকবে), (৩) মুদ্রা (তর্জনী ও অঙ্গুষ্ঠের মাথা একটি বৃত্ত রচনা করে পরস্পরকে ছুঁয়ে থাকবে, অন্য সব আঙুল সোজা), (৪) মুষ্টি (সবগুলো আঙুল ভেতরে মোড়ান, অঙ্গুষ্ঠের মাথা তর্জনী, মধ্যমা বা মধ্যমা-অনামিকার মধ্যে গুঁজে দেওয়া থাকবে), (৫) ত্রিপতাকা (সব আঙুলই সটান খোলা, শুধু অঙ্গুষ্ঠ একটু ভেতরে মোড়ান), (৬) কর্তারীমুখ (অনামিকা ও কনিষ্ঠা ভেতরে মোড়ান, অঙ্গুষ্ঠ অনামিকার মধ্যস্থল ছুঁয়ে থাকবে, অন্য দুটো আঙুল সোজা), (৭) অর্ধচন্দ্র (মধ্যমা, অনামিকা কনিষ্ঠা একটু ভেতরদিকে বাঁকান, তর্জনী ও অঙ্গুষ্ঠে অন্য আঙুলগুলোর একটু তফাতে সোজা মেলে দেওয়া থাকবে), (৮) অরাল (ডান হাত মুষ্টিবন্ধ ও বাঁকান, বাঁ হাত সোজা, তার অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনী গোলভাবে পরস্পরকে ছুঁয়ে আছে), (৯) শুকতুণ্ড (তর্জনীর শুধু মাথাটি বাঁকান বাকি ৩টি আঙুল ভেতরে মোড়া, অঙ্গুষ্ঠ মধ্যমার মাথা ছুঁয়ে), (১০) শিকার (তর্জনী সোজা, বাকি ৩টি ভেতরে মোড়া, অঙ্গুষ্ঠ মধ্যমার ওপরে স্থাপিত), (১১) কপিথ (অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনীর মাথা ছোঁয়া, বাকি ৩টি সোজা), (১২) কটকমুখম্ (তর্জনী ও মধ্যমা ভেতরে মোড়ান, তর্জনী ও অঙ্গুষ্ঠে মাথা ছোঁয়া), (১৩) সূচীমুখ (তর্জনী সোজা, অঙ্গুষ্ঠের মাথা তার গোড়াতে ঠেকান, বাকি তিনটি সোজা), (১৪) সর্পশীর্ষম্ (অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনী গায়ে-গায়ে ঠেকান, সবগুলো আঙুলই গায়ে-গায়ে লেগে ভেতরে একটু হেলান), (১৫) মৃগশীর্ষম্ (মধ্যমা ও অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠ ভেতরে মোড়ান, মধ্যমা অঙ্গুষ্ঠের মাথা ছুঁয়ে, বাকি দুটো একেবারে সোজা), (১৬) অঙ্গুলী, (১৭) পল্লব (সব আঙুলগুলো সোজা ও ফাঁক ফাঁক, হাতের পাতাটা কব্জির কাছে নীচের দিকে বাঁকান), (১৮) মুকুর (তর্জনী অঙ্গুষ্ঠের মাথা ও মধ্যমা অঙ্গুষ্ঠের গোড়া ছোঁয়া, অনামিকা ও কনিষ্ঠা সোজা এবং ফাঁক ফাঁক), (১৯) ভ্রমর (তর্জনী ভেতরে মোড়ান, বাকি সব সোজা), (২০) হংস (দু'হাত একত্র করা, দু'হাতের পাতা ও তর্জনী ও মধ্যমা মুখোমুখি লাগান), (২১) হংসপক্ষ (হাতের পাতা সম্পূর্ণ মেলান, শুধু তর্জনী মাঝখান থেকে বাঁকান), (২২) বর্জমানম্ (সবগুলো আঙুল মুঠ করা, শুধু অঙ্গুষ্ঠ সোজা), (২৩) মুকুল (হাতের পাতা সটান খোলা 'সর্পশীর্ষের' মত, তর্জনী ও অঙ্গুষ্ঠের মাথা ঠেকান), (২৪) উর্ণনাভ (সবগুলো আঙুলই নীচের দিকে মোড়ান—হাতের পাতা উপুড় করান)।

এই চব্বিশটি মুদ্রার প্রত্যেকটি একাধিক বস্তুর প্রতিরূপক এবং তার আনুষঙ্গিক বহু ভাব প্রকাশ করে। কি কারণে একটি মুদ্রার সঙ্গে একটি বস্তু বা ভাব যুক্ত হ'ল,

৮.

তাদের সম্পর্ক কি, তা কিছু জানা যায় না। কিন্তু একটি মুদ্রার সঙ্গে যে ভাব বা বস্তুর প্রকাশ হয় বলা হয়েছে, বোদ্ধার মনে ও রসিকচিত্তে ঠিক তাই-ই জেগে ওঠে।

সংযুক্তহস্ত মুদ্রা চল্লিশটি এবং দু'হাতের দু'টি বিভিন্ন মুদ্রার সহযোগে সৃষ্ট হয়েছে। এক একটি মুদ্রা কি ধরণের বস্তু বা ভাব প্রকাশ করে, তা বোঝাবার জন্যে একটি করে মানে দেওয়া হলো।

(১) অঞ্জলী-কটক (যজ্ঞ) (২) অর্ধ-চন্দ্র মুষ্টি (চন্দ্র), (৩) হংসমুষ্টি (প্রিয় বা প্রিয়বস্তু), (৪) হংসপক্ষ-পতাকা (মনোরম ভাব বা বস্তু), (৫) হংসপক্ষ-মুষ্টি (যজ্ঞ), (৬) হংস-পতাকা (কাব্য বা কাব্যিকতা), (৭) হংসঅক্ষ (বানর), (৮) কটক (নারী বা নারীজনোচিত ভাব বা বৃত্তি), (৯) কর্তারীমুখ মুদ্রা (পুত্র বা পৌত্র), (১০) কর্তারীমুখ মুষ্টি (বিদ্যাধর বা কিন্নর), (১১) কর্তারীমুখ-কটক (বিজ্ঞান), (১২) কটক হংসপক্ষ (মাতা বা মাতৃভাব), (১৩) কটক-মুষ্টি (নারীত্ব), (১৪) কটক সূচীমুখম্ (কন্যা), (১৫) কটক-মুদ্রা (ধর্ম বা ন্যায়), (১৬) কটক-মুকুর (সুন্দরী স্ত্রীলোক), (১৭) কর্তারীমুখ-কটক (কুমারী মেয়ে), (১৮) মৃগশীর্ষ-হংসপক্ষ (শিব বা তাঁর অন্য রূপ), (১৯) মুদ্রা পতাকা (কোন কিছুর চিহ্ন), (২০) মুদ্রা-মুষ্টি (পিতা, কর্তা বা নেতা), (২১) মুকুল-মুষ্টি (স্ত্রী, বিবাহ), ২২) মুকুল, (২৩) মুদ্রা-পল্লব (শ্রম), (২৪) মুষ্টি (সংহার) (২৫), পল্লব-মুষ্টি (হস্ত), (২৬) পতাকা অঞ্জলি (ক্রীড়া, আনন্দোৎসব), (২৭) পতাকা-হংসপক্ষ (ব্রহ্মা, সৃষ্টি), (২৮) পতাকা-কর্তারীমুখম্ (রাজা বা রাজপুত্র) (২৯) পতাকা কটক (গাভী), (৩০) পতাকা মুষ্টি (প্রহার বা বাধাদান), (৩১) পতাকা মুকুল (রামায়ণের বীরগণ), (৩২) পতাকা কর্তারীমুখ (রাবণ), (৩৩) শিকার (কোন কিছুর চূড়া), (৩৪) শিকার-মুষ্টি (ইন্দ্র) (৩৫) শিকার অঞ্জলি (বিষ্ণু, শ্রীবৎস), (৩৬) শিকার-হংসপক্ষ (আপোষ বা মাঝামাঝি কিছু), (৩৭) সূচীমুখ অঞ্জলি (ছবি), (৩৮) বর্দ্ধমানম্-অঞ্জলি (মূল্যবান কিছু), (৩৯) বর্দ্ধমানম্-হংসপক্ষ (অমৃত) (৪০) বর্দ্ধমানম্-হংস (অধর)।

নাচিয়ের পক্ষে শুধু নয়, নৃত্যরসিকের পক্ষেও মুদ্রা ও তার মানে জানা একান্ত আবশ্যক, নচেৎ নাচ বোঝা যায় না। যেহেতু মুদ্রাগুলো সংকেত ছাড়া আর কিছু নয়। শিল্পী রস ও ভাব নিজের অন্তরে উপলব্ধি করবে ও অনুশীলন-স্বচ্ছন্দ মুদ্রাদ্বারা তার প্রকাশ বা সংকেত করবে।

রস ও ভাব

নাট্যশাস্ত্রে আটটি রসের উল্লেখ আছে; কিন্তু পণ্ডিত অভিনব গুপ্তের মতে আমরা নয়টি রস পাই। যথা,—শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস, অদ্ভুত ও নবম রস শান্ত। এই নয়টি রসের সঙ্গে জড়িয়ে আছে নয়টি ভাব, যথাক্রমে রতি, হাস্য, শোক, ক্রোধ, উৎসাহ, ভয়, জুগুপ্সা, আশ্চর্য ও সাম। যা থেকে কোন ভাবের উদ্ভব হতে পারে, তার নাম বিভাব। বিভাবের দু'টি অংশ—অবলম্বন ও উদ্দীপনা; যথা,—রতিভাবে 'অবলম্বন' হচ্ছে নায়ক বা নায়িকা, 'উদ্দীপনা' হচ্ছে নির্জনতা, চাঁদনী রাত, সুবাস, ঝিরঝিরে হাওয়া এইসব। উদ্দীপনার আবার ৩টি রকম—গুণ, চেষ্টা (ইচ্ছা) ও অলংকার। ছোটখাট অনুভাব আছে তবে মূল বা অস্থায়ী ভাব এই ন'টি। এ থেকে আবার ত্রিশটি অনুভাব বিশ্লিষ্ট করা হয়েছে; যথা,—স্মৃতি, আলস্য, শঙ্কা, চিন্তা, শ্রম, গ্লানি, নিদ্রা, মোহ, মদ, নির্বেদ (মরিয়া), অসূয়া, দৈন্য, জেদ, ধৃতি, বুদ্ধি, গর্ব, বিখেদ, ঔৎসুক্য, আবেগ (তাড়াতাড়ি করা), হর্ষ, চপলতা, অপস্মার, সুপ্তি, বিরোধ, বিতর্ক, অমর্ষ (রাগ), ঈর্ষা, অবহিত, মত (আত্মবিশ্বাসের ভাব), উগ্রতা (চপলতা), উন্মাদ, তৃষ্ণা, ব্যাধি, মরণ।

এত সমস্ত ভাব নৃত্যশিক্ষার্থীকে অনুভব করতে হবে এমন গভীরভাবে যে, তার ভংগীতে এর প্রকাশ যেন সাবলীল ও শোভন হয়। তাতে যে পরিশ্রমের দরকার, তাতে শিক্ষার্থীদের দলাই-মলাই, মালিস ও ব্যায়ামাদি এক ফোঁটাও বাড়াবাড়ি বলার যো নেই।

সাজপোষাক:—বিশেষজ্ঞদের মত যে কথাকলির সাজসজ্জা মালয়ালম সংস্কৃতির দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত এবং মাথার আবরণ ও মুখের অলংকার তিব্বতীয় সভ্যতা থেকে নেওয়া হয়েছে। এ জিনিসগুলো বিশেষভাবে প্রাচীন রয়েছে এখনও। অবশ্য নৃত্যটাই প্রাচীন রসকলা এবং এর সাজসজ্জাতে মূলতঃ প্রাচীনতা বজায় রাখতেই হবে নচেৎ নৃত্যটারই জাত যাওয়ার সম্ভাবনা। মালাবারের দুজন মনস্বী নম্বুদ্রী ব্রাহ্মণ—কপ্‌লিংগট্ ও কল্লাটিকোট সাজসজ্জাকে আভিজাত্য বজায় ও সৌন্দর্য অক্ষুণ্ণ রেখে যতটা সম্ভব সাম্প্রতিক করেছেন। সাজসজ্জাতে শোভা, কান্তি (লালিত্য) দীপ্তি ও মাধুর্য এ চারটি বিষয়ের প্রতি তীক্ষ্ম দৃষ্টি রাখতেই হবে। একটি চরিত্রকে ফোটাতে বা তার বিশেষত্ব বোঝাতে সাজসজ্জা যতটা সাহায্য করতে পারে কথাকলিতে তা সম্পূর্ণ গ্রহণ করা হয়েছে।

মেকআপ্ পাঁচ রকমের হয়—মিনিক্কু, পাচ্ছ, কাঠি, টাঁড়ি ও করি। মিনিক্কুতে সারামুখ হলদে ও লাল রং মিশিয়ে বেশ পুরু করে বিচিত্রভাবে লেপে দেওয়া হয়। চোখ ও চোখের পাতা কাল ও চোখের ডেলার সাদা অংশটা একরকম তরল পদার্থ ঢেলে লাল করা হয়। ঠোঁটে লাল রং ও কপালে তিলকাদি দেওয়া হয়। এটা ঋষি, ব্রাহ্মণ বা যোগীর সাজ। পাচ্ছ ও কাঠিকে একটা আলাদা শ্রেণীতে যুক্ত করা হয়েছে—তার নাম টেক্কু। পাচ্ছতে মুখের সম্মুখ সমস্তটা সবুজ রংয়ে লেপে দেওয়া হয় ও চোয়াল ঘুরে এক কান থেকে অন্য কান পর্যন্ত 'চুট্টি' বলে চালের গুঁড়োর তৈরী একরকম শক্ত প্লাটিস্ লাগান হয়। এটা হচ্ছে রাজ-রাজড়ার পোষাক। 'কাঠি'তে কপাল থেকে নাক সমস্তটা ও ভ্রূতে লাল রং লাগান হয় ও বাকী অংশে সবুজ। এতে নাক ঘুরে কপাল পর্যন্ত একটা চুট্টি থাকে। এটা রাক্ষসের বা দৈত্যের সাজ। টাঁড়ির তিনটি রকমফের—ভেলুপ্পা টাঁড়ি, ছোকন্ন টাঁড়ি ও কারুপ্পা টাঁড়ি। ভেলুপ্পা টাঁড়িতে হলুদে ও লাল রং মিশিয়ে মুখে ও থুৎনীতে সাদা দাড়ী লাগান হয় এবং লোমশ পোষাক দরকার। নাকের ডগাতে ও কপালে চুট্টি লাগান হয়। এ হচ্ছে সন্ন্যাসী বা যোদ্ধার বেশ। ছোকন্ন টাঁড়িতে মুখে লাল রং ও কান, চোখ, ঠোঁট ও থুৎনী ঘুরিয়ে কাল রং দেওয়া হয় ও লাল দাড়ী দরকার। ঠোঁটের ওপর পাকিয়ে পাকিয়ে চোখ অবধি গোঁফ বানান হয়। এ হচ্ছে সুগ্রীব বা হনুমানের বেশ। কারুপ্পা টাঁড়িতে কাল রংয়ে মুখ চোপান হয় ও কাল দাড়ী ও কাল পোষাক দরকার। এ হচ্ছে কিরাত বা কালীর সাজ। করি হচ্ছে কারুপ্পা টাঁড়ির মতই তবে এতে দাড়ী থাকে না আর গালের ওপর অর্ধচন্দ্রাকার করে রং লেপে দেওয়া হয়—এও কিরাতের সাজ।

কথাকলির মেকআপে মূলত চারটি র ব্যবহার করা হয়—সবুজ, লাল, কাল ও হলদে। সবুজে সাত্ত্বিক, লালে রাজসিক, কালতে তামসিক ও হলদেতে সাত্ত্বিক ও রাজসিক দুটো ভাবই জড়িত করা হয়েছে।

শিরসজ্জা দুরকমের—কেশভারম্ কিরীটম্ ও মুটি। প্রথমটিতে চুড়ো ধরণের (বিয়েতে বরের মুকুট যেমন) মুকুটের পেছনে বেশ বড় ও নানা রকম খোদাই ও কারুকার্য করা একটি থালার মত জিনিস লাগান থাকে। মুকুট ও তার পেছনের থালা—দুটিই পাতলা কাঠের তৈরী। দৈত্যরাজ বা রাক্ষসরাজের বেলাতে উভয়ই বৃহৎ আকারের হয়। মুটি দু' রকম—ভট্টু মুটি ও করি মুটি। ভট্টুমুটি শিরসজ্জা ঠিক মুকুটের মত—তাতে অপূর্ব খোদাই ও কারুকার্য করা থাকে এবং তার তলাতে চারপাশ ঘিরে বেশ চওড়া একটা পটি লাগান থাকে (দেয়ালের গায়ে কার্নিশ বা শোলার টুপির ঘের-দেওয়

পাটিটার মত), এটা সাধারণত রাজরাজড়ার শিরোভূষণ হিসেবেই শোভা পায়।. করি-মুটি—নানা কারুকার্যখচিত মুকুট মাত্র।

অন্যান্য সজ্জার মধ্যে কানে মস্ত মস্ত কুণ্ডল দেওয়া হয় এবং গয়না প্রায় যতরকম হতে পারে সবই লাগে এবং অধিকাংশই ভারী ও জবরজং। পোষাকও বেশ ঢিলে-ঢিলে আলখাল্লা ধরণের হয়ে থাকে এবং সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক চরিত্রানুযায়ী পোষাকের রং বদলাবে।

নৃত্যের দুটি মূল ভাগ—তাণ্ডব (পুরুষ) ও লাস্য (রমণীয়)। নাট্যশাস্ত্রে পাই তণ্ডু ভরতকে যেসব দৈহিক ভাবভঙ্গী শেখান তার নাম 'কারণ'। 'কারণ' ১০৮টি! অনেক-গুলো কারণের সমষ্টিতে একটি 'অঙ্গহার' হয় এবং দুই বা ততোধিক 'অঙ্গহার' প্রদর্শনে একটি 'রেচিত' রচনা হয়। অঙ্গ-হার ৩২টি ও রেচিত ৪টি। এসব ভঙ্গী-গুলি পূর্বে কেরলাতে যেরূপে প্রচলিত ছিল, কথাকলিতে মোটামুটি সে রকমই নেওয়া হয় ও ক্রমশ তাতে পরিবর্তন ও পরি-বর্ধন করা হয়েছে।

তাল, মাত্রা ও ছন্দ—সংস্কৃতে যে তাল ও মাত্রাবিভাগ পাওয়া যায় তা ঠিক আজকাল-কার চলিত ফাঁক, প্রথম তাল, সম ও তৃতীয় তাল—এরকম বিভাগ নয়,—তা যেন অনেকটা কবিতার ছন্দ ও যতি বিভাগের মত। নৃত্যের তাল বলতে সংগীত-রত্নাকরে আমরা প্লুত, গুরু, লঘুবীর, লঘু, দ্রুতবীর, দ্রুত এই তালের নাম পাই। এরা যথাক্রমে ১২, ৮, ৫, ৩ ও ২ মাত্রা দ্বারা গঠিত।

কথাকলিতে যে তালগুলো নেওয়া হয়েছে তার নাম বা মাত্রাগঠন কোনটাই এর সঙ্গে মেলে না। তারা হচ্ছে আদি, চম্পা, অতন্ত, ত্রিপত ও পঞ্চারী এবং এরা যথাক্রমে ৮, ১০, ১৪, ৭ ও ৬ মাত্রার তাল। আদিতে তিনটি তাল ও দুটি ফাঁক—প্রথম, পঞ্চম ও সপ্তম মাত্রাতে তাল পড়বে, ষষ্ঠ ও অষ্টম ফাঁক থাকবে। চম্পাতে তিনটি তাল ও একটি ফাঁক; প্রথম, অষ্টম ও নবম মাত্রাতে তাল পড়বে, দশম ফাঁক থাকবে। অতন্তে চারটি তাল ও দুটি ফাঁক; প্রথম, ষষ্ঠ, একাদশ ও ত্রয়োদশ মাত্রাতে তাল পড়বে, দ্বাদশ ও চতুর্দশ ফাঁক যাবে। ত্রিপতে তিনটি তাল ও দুটি ফাঁক; প্রথম, চতুর্থ ও ষষ্ঠে তাল পড়বে ও পঞ্চম ও সপ্তম ফাঁক থাকবে। পঞ্চারীতে দুটি তাল ও একটি ফাঁক; প্রথম ও পঞ্চম মাত্রাতে তাল পড়বে, ষষ্ঠ ফাঁক যাবে। এ থেকে দেখা যায় যে, প্রত্যেক শ্রেণীতেই শুরুতে একটা তাল পড়বার পর গোটা তালক্রমটা আরম্ভ হয়। বোলগুলোও থটমট এবং গম্ভীর-শ্রবণ; ধৃঙ্গ, করণ, গীরুগীরু, কুরামিংকুরামিং, ধরং ধরং, ধীরকধীরক্ প্রভৃতি। দ্রুত, মধ্য ও বিলম্বিত তিনটি লয়ই ব্যবহার করা হয়। তাল বিভাগে মাত্রাগুলি প্রতিটি তালে সমানভাবে নেওয়া হয়নি বলে তালগুলো অত্যন্ত জটিল। বিশেষত তাল না-কেটে, সহজ, স্বচ্ছন্দ পদক্ষেপ করা অত্যন্ত দুরূহ ও বহু বৎসরের শ্রমসাধ্য অনুশীলন সাপেক্ষ।

বাদ্যযন্ত্রতেও তিনটি বিভাগ—গীতঙ্গ (যেগুলো গানের সঙ্গে বাজবে) নৃতঙ্গ (যেগুলো নাচের সঙ্গে বাজবে) উভয়ঙ্গ (যা দুক্ষেত্রেই বাজান যায়)। এদের কেরলা নাম 'ইসাইক্কারুরি' চামড়ার যন্ত্র, ফুঁয়ের যন্ত্র ও তারের যন্ত্রকেও আলাদা নাম দিয়ে পৃথক্ শ্রেণীভুক্ত করা হয়েছে। নামগুলো বড় খট-মট—ঠোরকারুরি, নরমকুক্কারুরি, মিদাতু-ক্কারুরি। যন্ত্রের মধ্যে চামড়ার যন্ত্রই বেশী; ঢাক ও মাদল জাতের যন্ত্রই সচ্ছিদ্র, নিশ্ছিদ্র প্রায় বিশ পঁচিশ রকম আছে। তার মধ্যে বহু যন্ত্র আজকাল পাওয়াও যায় না বাদকও নেই। যেগুলো আজও চলে তারা হচ্ছে ভেরী, মৃদঙ্গম, গঞ্জলি, ঢোলক, ছেণ্ডা প্রভৃতি ১৫।১৬টি। ফুঁয়ের যন্ত্র—নাগাস্বরম, মুরলী, মুখবীণা, কম্পু প্রভৃতি ৯টি। তারের যন্ত্র—ননথুনি, বীণা, তম্বুরা ও হালে বেহালার চলন হয়েছে। তাছাড়া এক-জোড়া বড় কাঁসার করতাল—নাম 'কৈমনী' ব্যবহার করা হয় দৃশ্য শেষ সূচনা করতে।

প্রদর্শনী

বাঙলাদেশের যাত্রা বা কবিগানের আসর যেমন কথাকলির আসরও তেমনি। দেখবার সুবিধের জন্যে মাটি থেকে সামান্য উঁচু একটা মঞ্চ থাকে। মঞ্চোপরি কোন চাঁদোয়া থাকলেও চলে না থাকলেও কোন কিছু যায় আসে না। কোন দৃশ্যপটের দরকার নেই শুধু সামনের পরদাটি ছাড়া; এটি ৫ ফুট লম্বা ও ৪ ফুট চওড়া এবং আগাগোড়া একই রংয়ের,—অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গাঢ় লাল রংয়ের হবে এবং তার ঠিক মাঝখানটাতে শিব বা বিষ্ণু বা একটি জলপদ্ম আঁকা থাকবে। মঞ্চের ঠিক মাঝখানটাতে নাচিয়েদের মাথায় না ঠেকে এমনভাবে একটি কাঁসার প্রকাণ্ড গোলাকার প্রদীপ ঝোলান হয়। প্রদীপটি অসংখ্য কারুকার্য শোভিত এবং তাকে ঘিরে চারদিকে অসংখ্য সলতে সমান্তরালভাবে সাজান হয়। প্রদীপটি জ্বালান হয় নারকেল তেলে। নারকেল তেলের হরিদ্রাভ, নরম আলো নীচে শিল্পী-দের ঘিরে একটা অলৌকিকতা জড়িয়ে দেয় —দর্শকদের চোখেও একটা ঘোর লাগে যেন। তাছাড়া মঞ্চে বা আশেপাশে আর কোন আলো থাকবে না।

আখ্যানবস্তু বিয়োগান্ত ও মিলনান্ত দুই-ই হতে পারে, তবে বিয়োগান্তই হয় বেশী। সাধারণ লোকে তাই পছন্দও করে আর দর্শকদের মনে প্রভাব বিস্তার করতে শিল্পীদের সহায়তাও করে। সাধারণত নাচ আরম্ভ হয় রাত ৯।৯৷৷টার সময় আহারের পর ও রাত ভোর পর্যন্ত চলে। ৮।৯ ঘণ্টার কমে প্রকৃত কথাকলি নাট্যাভিনয় সম্ভবপর নয়। আজকাল অবশ্য কুপালিঙ্গট্ ও কল্লাটি-কোট এঁরা দুজনে সময় অনেক কমিয়ে দিয়েছেন, তাহলেও আজকালও ৬।৭ ঘণ্টা লাগে।

আরম্ভের আগে ঢাকীরা বিশেষ একরকম বাজনা বাজিয়ে সবাইর কাছে অভিনয়ের কথা ঘোষণা করে, তার নাম 'কেলী'। এতে হিন্দু-বিধি অনুযায়ী কার্যারম্ভের মুখে ভগবানকে স্মরণ করা ও আসর জমান দু কাজই হাঁসিল হয়। এরপর অভিনেতারা মঞ্চে দর্শন দেবেন। প্রথম দর্শন দেবার নাম 'পুরপ্পড়ু'। পুরপ্পড়ুতে যদি কোন স্ত্রী চরিত্রকে বা নায়ককে দর্শন দিতে হ'ল, সবরকম জাঁকজমকে আরম্ভটা একটা এলাহী ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। একাধিক লোকও পুরপ্পড়ুতে দর্শন দিতে পারে। তাদের সব পাশের দিকে হাঁটু ভেঙ্গে শান্ত হয়ে দাঁড়াতে হয়। নেপথ্যে মানে নর্তকদের পেছনে গায়কেরা 'মঞ্জুতরা' গাইবেন—যা গীত-গোবিন্দের কয়েকটি শ্লোক মাত্র। এটা শেষ হলে নৃত্যঙ্গ শ্রেণীর বাদ্য চলতে থাকে ও নৃত্যাভিনয় শুরু হয়—এর নাম 'তোটম্-পুরক্কলন্'। অভিনেতারা একদম্ নির্বাক, শুধু দৈত্য বা রাক্ষসেরা গোঙাতে পারে। অঙ্ক বা দৃশ্যভাগ কোন কিছুই কথাকলিতে নেই। একটা দৃশ্য শেষ সূচনা করা হয় জলদ বাজনা, দ্রুত নর্তন, ঘূর্ণন প্রভৃতির দ্বারা। এই সব দৃশ্যশেষের নাম 'কলাসম'।

কথাকলি আদ্যন্ত নির্জলা হিন্দুশিল্প এবং উচ্চবর্ণের হিন্দুরা ছাড়া এ বিদ্যা অন্য কাউকে শিক্ষা দেওয়া অশাস্ত্রীয়।

আজকাল নিখুঁত কথাকলি নৃত্য দেখতে হলে ভাদ্র-অগ্রহায়ণ মাসে ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে যেতে হয়। ত্রিবেন্দ্রামের শ্রীপদ্মনাভ স্বামীর মন্দিরে উৎকৃষ্টতম কথাকলি দেখা যায়। এ জন্যে এ মন্দিরের নিজস্ব দল আছে। প্রধান এবং দলে দলে রেষারেষিও খুব আছে, তবে শ্রেণীর প্রায় প্রত্যেক মন্দিরেই অবশ্য আছে সুখের বিষয় তাতে বিকট বিকট নতুনত্বের আমদানী হয় না। অধিকাংশের মত যে, বর্তমান সময়ের শ্রেষ্ঠ কথাকলি-নর্তক ত্রিবাঙ্কুরের রাজনর্তক—শ্রীগোপীনাথ।

মালাবারের মহাকবি বেল্লাথলের 'কেরলা কলামণ্ডলম্' কথাকলির শ্রেষ্ঠতম শিক্ষায়তন। বেল্লাথল নিজে একজন শিল্পী ও নাট্যকার। সাজসজ্জা, অঙ্গসজ্জা, অভিনয় প্রভৃতি অনেক ব্যাপারেরই তিনি সংশোধন ও পরি-বর্তন করেছেন। উদয়শঙ্করের আলমোড়া কেন্দ্রেও এ শিল্প শিক্ষার সুব্যবস্থা আছে। বাঙলাদেশে কথাকলির চর্চা ও আদর বড় কম। শিক্ষায়তন একটাও নেই যার নাম উল্লেখ করা চলে।

শ্বাপদ

শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

অনেকদিন পূর্বের একটা কথা মনে পড়ে। ঠিক কী কারণে জানি না, সেদিন সন্ধ্যায় মাধবী আমাদের বাসায় ছিল অনেকক্ষণ। মাঝে মাঝে খানিক কথাবার্তা, মাঝে মাঝে খানিক চুপচাপ,—এরই মধ্য দিয়ে কয়েকটি মুহূর্ত পার হ'য়ে যাচ্ছিল। একটা শব্দ আসছিল ভেসে। বললাম, "শুনতে পাচ্ছ? কান পেতে শোনো, একটা ভারী বিশ্রী শব্দ শুনতে পাবে।"

একটু থেমে মাধবী বললে, "ও' ত একটা ট্রাম যাচ্ছে।"

"হলো না। ট্রাম নয়, ওর চেয়ে আরও তীব্র, আরও বিশ্রী।"

"তাই বলুন, ও' ত একটা কুকুর চীৎকার করছে।"

"হ্যাঁ, আমি ওরই প্রতি তোমার শ্রবণ-ইন্দ্রিয়কে আকর্ষণ করছি। নগ্ন পশু-উল্লাসকে আমি ভয় করি মাধবী। ওদের ঐ সুতীক্ষ্ম নখর, সর্বগ্রাসী আগুন-জ্বল্-জ্বলে-করা চোখ,—আমাকে কোনদিন না গ্রাস ক'রে বসে সেই কথাই ভাবছি।"

খিল্ খিল্ ক'রে হেসে উঠল মাধবী, বললে, "কী জানি বাপু, আপনার কথা অর্ধেক বুঝেই উঠতে পারি না।"

"শোনো। কোথা থেকে এই চীৎকার আসছে জানো? আমাদের রাস্তার মোড়ে দেখেছ বসাকদের বাড়ি? মার্বেল-দেওয়া ঝকঝকে সোপান, দামী নেটের পর্দা-দেওয়া জানালা, সোফা-কাউচ সাজানো মেঝেতে ফরাস-পাতা ড্রয়িং রুম, গ্যারাজে সুদৃশ্য দামী মোটর, ওপরের ঘরে রেডিও-গ্রামোফোন,—দেখোনি বসাকদের পালিশ-করা চোখ-ঝলসানো বিরাট অট্টালিকা? আমাদের এই ভাঙা ভাড়াটে টিনের বাড়ির মধ্য থেকে ওদের বৈভবকে সঠিক কল্পনা করাও অসম্ভব।"

"ওসব বক্তৃতা থামান। ঠিক ক'রে বলুন দেখি, কী হবে?"

"কীসের কী হবে?"

"এই যুদ্ধ।"

হো-হো ক'রে হেসে উঠতে হলো আমাকে, বললাম, "জীবন যুদ্ধ? ও' চিরকালের। জীবন-সংগ্রামে চির-পদাতিকের দল আমরা!"

"বাজে কথা নয়। জিনিসপত্রের দাম আগুন, খাবার-দাবার মিলছে না,—এ' দুর্গতির শেষ হবে কবে? আপনার আর কী, চাকরী করছেন, তেমন ভাবনা না করলেও চলবে।"

"চলবে বই কি! সওদাগরের অফিসের উদয়াস্ত-পরিশ্রম-করা মাথার-ঘাম-পায়ে-ফেলা এই বহুমূল্যে প'য়তাল্লিশ টাকার জীবন,—সংসারে চিররুগ্না বিধবা মা আর মাথার ওপরে বিবাহযোগ্যা বয়স্থা বোন,—ভাবনা না করলে চলবে বই কি!"

"হাসলেন যে?" মাধবী ঝঙ্কার দিয়ে উঠল, "হাসির কথা কী বলেছি! আপনাদের তবু ভালো, ভাবুন দেখি আমাদের কথা? মা-বাবা দুজনেরই বয়স হয়েছে, বাবার আর খাটবার সামর্থ্যও নেই, বড়দি, মেজদিরও টাকার অভাবে ভালো বিয়ে দেওয়া যায়নি সেত জানেনই,—সংসারটি চলে কী ক'রে? একমাত্র ভরসা—ঐ দাদা। তা' দাদা ত' এত চেষ্টা করছে, এখনও ভালোমত একটা চাকরী-বাকরী জুটল না। কী যে হবে, ভেবে ভেবে কুল পাই না।" রাস্তার মোড় থেকে এই সময় হঠাৎ ছোটখাট একটা হল্লা শোনা গেল, এ' রকম প্রায়ই হয়,—তারপরে একটা ট্রামের শব্দ, আর তারপরেই বেশ খানিকক্ষণ চুপচাপ। তখন সন্ধ্যা নামছিল। কেমন একটা আচ্ছন্নতায় ভ'রে উঠছিল চারিদিক। এদিকে প্রাচীর, ওদিকে প্রাচীর, দৃষ্টি আমাদের অবরুদ্ধ। তবুও সেই ম্লানায়মান আলোছায়ার মধ্যে হঠাৎ-ই মনে হ'ল, আর যেন কারাবাস নয়! শহর থেকে বহু দূরে একদিন গ্রামে-গ্রামে তুলসীতলায় জ্বলত প্রদীপ, বাজত শঙ্খ, মন্দিরে মন্দিরে ঘণ্টা! তারই সুমধুর স্বপ্ন নামতে লাগল আমার দুই তৃষিত চক্ষু ভ'রে!

কতক্ষণ নিশ্চুপে কেটে গেল জানি না, হঠাৎই আমার সবকিছু বিহ্বলতাকে চুরমার ক'রে মাথার ওপর দিয়ে বিরাট শব্দে উড়ে গেল বিংশ-শতাব্দীর কয়েকটি যন্ত্রপক্ষীর দল। মাধবী উঠে দাঁড়াল, বললে, "সন্ধ্যা হ'ল, এবার যাই।"

"মার সঙ্গে দেখা করবে না?"

"করেছি। আর এখন ত তিনি আহ্নিকে বসেছেন।"

"একা একা যেতে পারবে?"

মাধবী হেসে উঠল, বললে, "সাত সমুদ্র তেরো নদীর পার থেকে এসেছি নাকি? এক পা এগোলেই ত আমাদের বাড়ি, এটুকু যেতে সঙ্গে আবার কয়জন দারোয়ান লাগবে, শুনি?"

উত্তরে হাসিমুখেই কী যেন একটা বলতে যাচ্ছিলাম, এমন সময় রাণুর প্রবেশ। রাণু আমার বোন।

"একী, মাধবী, চললে যে? একটু দাঁড়াও, চা করছি। দাদা, চা খাবে ত এখন?"

"চা? আচ্ছা দে'।"

মাধবীর ঠোঁটে হাসির রেখা, চোখে কৌতুক, বললে, "আচ্ছা ভাই রাণু, হঠাৎ এত অভ্যর্থনার ঘটা প'ড়ে গেল, ব্যাপারটা কী? আমি ত তোমাদের বাড়িরই মেয়ে, যখন-তখন আসছি-যাচ্ছি,—আমাকে নিয়ে এত সমারোহ কেন, বলো ত?"

"আরে, সমারোহটা কোথায় দেখলে?"

রাণু ভেতরে গেল। অন্যমনস্ক হ'য়ে কী যেন ভাবছিলাম, হঠাৎ দেখি মাধবী এসে দাঁড়িয়েছে আমার খুব কাছে। জিজ্ঞাসুনেত্রে দৃক্‌পাত করতেই ও' বললে, "রাণু আমাকে মাঝে মাঝে কী রকম খোঁচা দেয়, দেখেছেন নিরুদা? আমরা নাকি আপনাদের চেয়ে বড়লোক, আমরা নাকি,......যাক্ সে' অনেক কথা। না দেখলে ত' বিশ্বাস করবেন না—এই দেখুন। আমার এই একটি মাত্র ব্লাউজ, তাও পিঠের কাছে কতখানি ছে'ড়া!

সাড়ী, তা-ও মাত্র দু'খানায় এসে দাঁড়িয়েছে! আমাদের যা' অবস্থা, তা' ঐ আমরাই জানি, আর কে-ই বা জানবে?"

অকস্মাৎ কী হ'ল মনের মধ্যে জানি না, ওর টেবিলে-ভর-দেওয়া হাতখানা চেপে ধরলাম হাত দিয়ে, বললাম, "আর জানি আমি, আর বুঝি আমি।"

অতি মৃদুস্বরে মাধবী বললে, "আপনি জানেন? বুঝতে পারেন, নিরুদা?"

"পারি। তোমাদের অবস্থা প'ড়ে গেছে, আর আমিও গরীব। সেইজন্যই ত' এত ঘা-খাওয়া মন নিয়েও তোমার কাছে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠতে পারি, সেই-জন্যই ত' এই পাষাণ-চাপানো প্রাণ নিয়েও সহজ হ'তে পারছি তোমার কাছে, আর সেইজন্যই ত' মনে হ'চ্ছে,—তুমি বা তোমরা আমার অতি আপনার, পর ত' নও!"

মাধবী উত্তরে কথা বলেনি, কিন্তু আমি দেখেছিলাম, ওর চোখ, মুখ, ভঙ্গীমা—সেখানে আমার সমস্ত উচ্ছ্বাস তরঙ্গায়িত হ'য়ে উঠছিল, মনে হচ্ছিল সম্পূর্ণ অসার্থক আমি নই!

এর খানিকক্ষণ পরেই মাধবী চ'লে গিয়েছিল। আর তারও অনেক পরে সমস্ত বাড়ি হ'য়ে গেল নিঝুম, ট্রামের শব্দ গেল থেমে; আমিও ঘরের মধ্যে চুপচাপ একা ব'সে সেই নিঃসঙ্গ নিবিড় স্তব্ধ রাত্রিটিকে প্রাণ মন দিয়ে অনুভব করতে লাগলাম।

এমনিই হয়। সুকঠিন বাস্তবতার রথচক্রে আমরা বারংবার গুঁড়িয়ে যাই, বারংবার পদদলিত হই সম্পদ্-পিচ্ছিল-পথযাত্রীদের ভীড়ে, কিন্তু তবুও বেঁচে থাকে অন্তরে এক অতি ভীরু স্বপ্নিল মানুষ, সে অবিরত গ'ড়ে তুলছে এক বিরাট স্বপ্নসৌধ, যা' হয়ত অতি তুচ্ছ, অতি নগণ্য,—যার অর্থ নেই, যুক্তি নেই, এই গতিশীল অঙ্ক-কষা-জীবনে যা' হয়ত একটা প্রচণ্ড পরিহাস ছাড়া আর কিছুই নয়!

আমি তা' জানি, আমি জানি স্বপ্ন আমার পক্ষে নিদারুণ বিলাস, কল্পনা আমার পক্ষে সুকঠিন ব্যঙ্গ। আমি জানি, দিন দিন অভাবের তীক্ষ্নতায় টুক্‌রো টুকরো হ'য়ে যাচ্ছি, আমি জানি—অর্থের অভাবে বোনের বিয়ে দিতে পাচ্ছি না, অর্থেরই অভাবে বড়বাজারের কোনো মেদস্ফীত মহাজন-বিশেষ সওদাগরের অন্ধকার ঘরের কোণে ব'সে উদয়াস্ত অবিরাম কলম পিষতে হয় আমাকে,—আমি জানি, সুবিধা-বাদীদের শকট-বাহক যে অভাব-খিন্ন অসহায় পঙ্গু জনতা ধীরে ধীরে অপ-মৃত্যুর অন্ধকারে তলিয়ে যাচ্ছে, এই মুখোসধারী সভ্যতার যুগে আমি, আর কেউ নয়, ঐ তাদেরি একজন।

কিন্তু তবুও, এই সব রাত্রির অবকাশে আমি ভুলে যাই আমার পথ চলার দৈনন্দিন নির্মম ইতিহাস। আমার ভাঙা বাড়ির দেওয়ালে ঐ যে ফাটল ধ'রেছে, ঐ যে জানালার একটা পাল্লা গেছে ভেঙে, ঐ যে কোণের দিকে টিনের চাল খানিকটা ফুটো,—ওরাও আমার কাছে অপরূপ হ'য়ে ঠেকে। এই আমার ছোট্ট অভাব-করুণ ঘরখানা, এ'-ও আমার খুব ভালো লাগে।

এই ঘর, এই রাত্রি, এই ক্ষুদ্র জীর্ণ টেবিল, এই ভাঙা জানালা, আর এই পুরানো লণ্ঠনের আলো,—এরই মধ্যে ধীরে ধীরে অতি সন্তর্পণে আমার ছোট্ট খাতাখানা বের করলাম। না, না, আমি লেখক নই, আমি বড়ো হবো এমন দুরাশাও নেই,—আমি লুকিয়ে লুকিয়ে লিখি আমার ডায়রী, রোজ যা' দেখি, রোজ যা' পাই, তা দিয়েই ভরিয়ে তুলতে চেষ্টা করি আমার এই ছোট্ট ভিক্ষার ঝুলিটি!

না, না, ভুল বলেছি। রোজ যা দেখি, রোজ যা' পাই, তা-ই আমি লিখি না, রোজ যা' দেখতে পারতাম, রোজ যা' পেতে পারতাম, রোজ যা' ঘটতে পারত,—সেই সব সম্ভাবনার কাহিনী নির্লজ্জ অক্ষরে এ'কে রাখতে চেষ্টা করি ওই আমার অতি গোপন ক্ষুদ্র ডায়রীটির মধ্যে!

রাত অনেক, মাথাটা ঝিম্‌ঝিম্ করছে, চোখ দুটো ঘুমে জড়িয়ে আসছে, সমস্ত দিনের শ্রান্তি এবার সারা শরীর বেয়ে নামছে। নামুক, অতো সহজেই ভেঙে পড়লে চলবে না। কে বললে, আমি এক অতি সাধারণ মাথার-ঘাম-পায়ে-ফেলা কলমপেষা কেরাণী, কে বললে আমার চলতি পথের সম্মুখে দুর্ভাগ্যের উত্তুঙ্গ পর্বত দাঁড়িয়ে? চোখ দুটো রগড়ে কলমটা শক্ত ক'রে ধরলাম। কিন্তু কী লিখব আজ?......

......সে এক মেঘ-মলিন মধ্যাহ্ন। দূর থেকে ঢেঁকিতে ধান ভানার শব্দ আসছে। গ্রাম্য পথের দুধারে পরিষ্কার ঝক্‌ঝকে মাটির ছোট ছোট বাড়িগুলি, প্রত্যেক বাড়ির উঠানেই মরাই-ভর্তি ধান, তুলসীর মঞ্চ, আর গোয়ালে স্বাস্থ্যবান সুপুষ্ট গাভীর দল। তারই পাশ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে পুকুর-পাড়ে এসে পেঁছিলাম। ওধারে কলাবাগানের ঘন-বিস্তীর্ণ পরিসর, এধারে বাবুলার বন, ওপাশে কতগুলি নারকেলের শ্রেণী, তারও পাশে আম্রবীথির সারি চলে গেছে, তারই ধারে পুকুরের ওপার, ঠিক ছবির মত অতি অপরূপ একটি সুবিন্যস্ত মাটির বাড়ি। পায়ে চলা ক্ষুদ্র পথ দিয়ে অগ্রসর হ'লাম।

কুবু-কুবু—কুবু-কুবু,—কোথায় কোন্ ঝোপের আড়ালে ব'সে একটানা একটা ডাহুক ডেকে চ'লেছে! বাবুলার ডালে কতগুলি ঝগড়াটে ছাতারে পাখী এসে কিচির মিচির জুড়ে দিল,—আরও একটু দূরে একটা ঘুঘু ডাকছিল বুঝি, এইমাত্র চুপ করল সে। দুটো-একটা দোয়েল শীষ দিতে দিতে এদিক-ওদিক ঘোরাঘুরি করছে। আমি আস্তে আস্তে চল্‌তে লাগলাম পুকুরের পাশ দিয়ে দিয়ে। এইবার মোড় ঘুরলাম, বাড়িটার কাছাকাছি পেঁছেছি। বুড়ো আম গাছটার তলায় একটা কাঠবেড়ালী কি যেন খুঁজে বেড়াচ্ছিল, আর তারই মাথার কাছে ডালে, ব'সে একটা দাঁড়কাক গম্ভীর গলায় প্রশ্ন করছিল,—"ক্বঃ—ক্বঃ!" পুকুরের কোণায় কোণায় সাদা শালুক ফুটেছিল, আর সেই নীরব নিস্তরঙ্গ জলে পড়ছিল মেঘের ছায়া। হঠাৎ চোখ পড়ল ঘাটের দিকে। তাল গাছের গুঁড়ি পেতে তৈরী হয়েছে ঘাটের সিঁড়ি। সেই সিঁড়ির ওপর ঠিক জলের ধারে একরাশ বাসন সামনে রেখে চুপ্‌চাপ ব'সে আছে কে একটি অল্প বয়সী গৌরাঙ্গী গ্রাম্য বউ। বাসন তার মাজা হ'য়ে গেছে, তাকে

এবার উঠতে হবে, সে কথা সে ভুলে গেছে, জলে পড়েছে অনন্ত আকাশের ছায়া, তারই দিকে চেয়ে তন্ময় হ'য়ে কী যেন ভাবছে ব'সে বউটি। লক্ষ্য ক'রে দেখলাম, পরণে তার কালো পাড় কোরা সাড়ী, কপালে বড়ো করে সিঁদুরের টিপ, হাতে মাত্র এক গাছা ক'রে লোহা আর শাঁখা; ফরসা তার গায়ের রঙ, অলঙ্কারের বিন্দুমাত্র বাহুল্য নেই। আমার পায়ের শব্দ হয়ত পেয়ে থাকবে, তাই হঠাৎ চমকে ধড়মড় ক'রে উঠে বাসনের গোছা হাতে নিয়ে বাড়ির দিকে অগ্রসর হ'ল, আর ঠিক সেই মুহূর্তে আমি গিয়ে দাঁড়ালাম তার সামনে। লজ্জায় টেনে দিলে এক গলা ঘোমটা, আমি বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে এক মুহূর্ত চেয়েছিলাম, কোরা সাড়ীতে কী অপরূপ যে দেখাচ্ছিল ওকে! সহাস্যে বললাম, "পরদেশী এসেছি বিদেশ থেকে, প্রসাদ কিছু মিলবে?"

পরক্ষণেই ঘোমটা গেল স'রে, বাসনের গোছা হাত থেকে পড়তে পড়তে বেঁচে গেল, বউটি বললে,—

"ওমা, তুমি! আমি বলি কোথা থেকে এক অচেনা লোক এলো গো!"

"যাই হোক, চিনতে ত পারোনি?"

"তা' যে রকম মেড়োদের মত মাথায় পাগড়ী জড়িয়েছ, চেনে কার সাধ্যি! এই দেখ, হাত-পা কেমন কাঁপছে, বাসনগুলো ধরো ত একটু?"

"তুমিও তাহ'লে ধরো এই পুঁটলীটা?"

"মাটিতে নামাও না,—কী আছে ওতে, শুনি?"

"বলব কেন?"

"না বল্লে ত ব'য়েই গেল! সেই শহর থেকে এই এতদিনে আসা হ'ল বাবুর!"

"হ'লোই ত। বিরহ সহ্য করা যায় কতদিন?"

আমার গৃহলক্ষ্মী একটু হেসে সলজ্জ পদক্ষেপে এগিয়ে যেতে যেতে একবার মুখ ফিরিয়ে বললে, "ওগো, আমার ঘোমটাটা একটু তুলে দাও ত, খ'সে যাচ্ছে।"......

......আর অগ্রসর হইনি সেদিন। ঐ পর্যন্ত লিখেই কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, খেয়াল নেই। ঘুম যখন ভাঙল, বেশ বেলা হয়ে গেছে। তন্দ্রার মধ্যেই অনুভব করছিলাম, কে যেন আমার মশারীটা তুলে দিল, তারপর কপালের কাছে হাত বুলিয়ে কে যেন ধীরে ধীরে ডাকতে লাগল আমাকে। আশ্চর্য হইনি, কেন না, রাণুর মাঝে মাঝে এ'রকম ভ্রাতৃপ্রীতি উচ্ছ্বসিত হ'য়ে ওঠে। কিন্তু চোখ খুলতেই বিস্ময়ে হতবাক্ হ'য়ে গেলাম। এক পিঠ খোলা ভিজে চুল, কপালে গোল ক'রে সুন্দর একটি লাল টকটকে সিঁদুরের টিপ, পরণে সত্য সত্যই কালো পাড় সাদা কোরা সাড়ী, সমস্ত মুখ গেছে উজ্জ্বল হাসিতে ভ'রে, আমার শিয়রের কাছে দাঁড়িয়ে মাধবী!

"তুমি!"

"হ্যাঁ, আমিই ত। চেনা যাচ্ছে না বুঝি?"

অবাক্ হ'য়ে চেয়ে রইলাম। ওর রঙ ফরসাই বলা যায়, কিন্তু দেখাচ্ছে আরও উজ্জ্বল—আরও অপরূপ! বললে, "একটা কথা। আমি কিন্তু এবার থেকে নিরুদা-টিরুদা ব'লে ডাকতে পারব না! আমি ডাকব অন্য নামে।"

"কী নাম?"

খুব কাছে স'রে এসে মৃদু স্বরে বললে, "কবি!"

"কী আশ্চর্য, আমি কি কবিতা লিখি না কি?"

দুই চোখে উচ্ছ্বসিত কৌতুক, মাধবী আঁচলের তলা থেকে কী একটা বের ক'রে আমার সামনে ধরলে। আমি ধড়মড় ক'রে উঠে বসলাম।

"আরে, আমার ডায়রীটা চুরি করলে কোথা থেকে! শীগ্‌গির দাও?"

"ঈস্, আমি পড়ব না বুঝি?"

খবরদার! ও' তুমি পড়তে পাবে না।"

খিলখিল ক'রে হেসে উঠল, বললে, "পড়তে যেন আমি বাকী রেখেছি! অতই যদি ভয় ত শিয়রের কাছে খুলে রেখে ঘুমিয়ে পড়া হ'য়েছিল কেন? কাল রাত্রে যা' লেখা হয়েছে, সব আমি প'ড়েছি,—এবার পড়তে হবে পুরানো-গুলো। আচ্ছা, একটা কথা, কা'কে নিয়ে এ'সব ছবি আঁকা হ'য়েছে, শুনি?"

"বলব কেন? যে সব বুঝেও বোঝে না, তাকে আমি কিচ্ছু বলি না।"

আস্তে আস্তে আমার কাছে এলো, বললে, "সত্যি! কী চমৎকার তোমার কল্পনা! ঐ রকম যেন আমাদের জীবনে ঘটে। আমি গাঁয়ের বধূ হ'য়ে ঘাটে ব'সে রোজ বাসন মাজব, আর তুমি রোজ আসবে পরদেশী, প্রসাদ চাইবার কৌতুকে,—কী চমৎকার হবে বলো ত!"

"পাড়াগাঁ তোমার ভালো লাগে?"

"খুব। এ'ছাই কলকাতা আমার একটুও ভালো লাগে না।"

"আমিও সেই কথা ভাবছি মাধবী। আর কি কোনদিন ফিরে যেতে পারব না আমাদের সেই শস্যশ্যামলা পল্লী মায়ের কোলে? আর কি ফিরে আসবে না সেই সব সোনার দিন? পথ কি আমাদের অবরুদ্ধ?"

খানিকক্ষণ চুপচাপ। মাধবী খুব কাছে দাঁড়িয়ে ধীরে ধীরে তার আঙুলগুলো আমার চুলের মধ্যে চালনা করছিল, এক সময় বললে, "চুলগুলো এত রুক্ষ কেন? ভাল ক'রে তেল মাখো না বুঝি?"

একটু হাসলাম, বললাম, "আচ্ছা, মাধবী?"

"কী?"

"এখন যদি কেউ আমাদের এ'ভাবে দেখে?"

"ওমা, তা'তে কী হ'য়েছে!"

"ধরো, মা যদি ঘরে ঢুকে পড়েন?"

"তাহ'লে মার পায়ে প্রণাম ক'রে বলবো, আমাকে পর ভাববেন না মা, আমি আপনারই মেয়ে।"

"মাসীমা থেকে একেবারে মা বলতে পারবে, লজ্জা করবে না?"

"হাসালে! কবিগুরুর "ডাকঘর" পড়তে দিয়েছিল একবার, মনে আছে? তা'তে অমলের সঙ্গে কথা কইতে কইতে প্রহরী এক যায়গায় ব'লেছিল, 'এর প্রশ্ন শুনলে হাসি পায়!' আমিও সেই কথা বলছি, তোমার প্রশ্ন শুনলে হাসি পায়।"

"বেশ। এবার ধরো, যদি রাণু এসে পড়ে এ'ঘরে।"

"ঈস্, তা'কে কি আমি ভয় করি নাকি? নেহাৎ-ই যদি কিছু ঠাট্টা করে, তা'লে কানে কানে বলব......।"

"কী বলবে?

"বলব, 'এই ঠাকুরঝি!"

হেসে উঠলাম, বললাম, "এতদূর!"

"তা' অতো হাসি কেন, শুনি? আমি এখন চল্লাম। তুমি যাও না কেন? সময়ের অভাব? বোঝা গেছে! ভালো কথা, এই সাড়ীটা প'রে আমাকে কেমন দেখাচ্ছে বলো ত? কল্পনার সঙ্গে মিলে গেছে! সত্যি, আমিও ভাবছিলাম ঐ কথা। জানো, দাদার চাকরী হ'য়েছে,—ঠিক চাকরী নয়, ভাগে ব্যবসাও বলতে পারো,—কী কোন্ বন্ধুর সঙ্গে কাঠের গোলা না লোহালক্করের কারবার, অতো বুঝিও না ছাই! এই দেখ, আমার জন্য সাড়ী এনেছে দু'খানা, আর ব্লাউজ-সেমিজের কিছু ছিট,—মাকেও দুটো সাড়ী, বাবাকে ধুতি-পাঞ্জাবী। যাই হোক, আমি যাচ্ছি। ডায়রীটা নিয়ে গেলাম, পড়ব, বুঝলে?"

বললাম, "পড়ো ক্ষতি নেই, আর কাউকে দেখিও না কিন্তু।"

"পাগল! এ' একান্তই আমার জিনিস, আর কারুর নয়।"

চ'লে গেল। আমিও উঠলাম। কলকাতার দৈনন্দিন প্রভাত। রাস্তায় মোটরের শব্দ, ট্রামের শব্দ। রূঢ় বাস্তবের চাকা চ'লেছে গড়িয়ে।

সমস্ত দিনে আর কিছু চিন্তা করার অবসর আমার নেই। কাল অফিসে একটা 'পেটি ক্যাশ বইয়ে' ছোট্ট একটা ভুল ক'রে এসেছি, মনে পড়ছে। পনেরো টাকা ন' পাইয়ের যায়গায় পাঁচ টাকা ন' পাই বসিয়েছি এক স্থানে। অফিসে গিয়ে কারুর নজরে পড়বার আগেই সংশোধন ক'রে দিতে হবে,—ওটা যদি মূল ক্যাশ-একাউন্টে চ'লে গিয়ে থাকে তাহ'লেই সর্বনাশ।

একটা প্রকাণ্ড সাধারণ উপন্যাসের মধ্যে অসার কতগুলি একঘেয়ে বর্ণনা পড়তে পড়তে যেমন একটা ক্লান্তি আসে, ঠিক তেমনি ক্লান্ত লাগছে নিজেকে অতীত স্মৃতির পৃষ্ঠাগুলি একের পর এক উল্টে যেতে। অতএব এ'কাহিনীর কয়েকটি একঘেয়ে পরিচ্ছেদ আমাদের পক্ষে পার হ'য়ে যাওয়াই ভালো।

ছুটির দিন। তা'হলেও সকালের দিকে একবার যেতে হয়েছিল অফিসে; এইমাত্র ফিরে এলাম। মাইনে বেড়েছে কিঞ্চিৎ,—তারই বিচিত্র সংবাদ অন্দরে পৌঁছে দিয়ে চুপচাপ ব'সে আছি। বহুদিন পরে মাধবী এলো। এসেই বললে, "রাণু কই, নিরুদা?"

চমকে চেয়ে দেখলাম, ওর সাজ-সজ্জায় অভাবনীয় পারিপাট্য। সবুজ রঙের সাড়ী আর ব্লাউজে চমৎকার দেখাচ্ছিল ওকে!

"হাঁ ক'রে চেয়ে আছ কী, রাণু কোথায় বললে না?"

"ভেতরে। কাপড়-চোপড় পরছে দেখলাম। কী ব্যাপার মাধবী, কোথাও বেড়াতে যাচ্ছ?"

"যাচ্ছিই ত,—ম্যাটিনী শো'তে সিনেমায়।"

"একা একা?"

"একা কোথায়? রাণু আর আমি। অবশ্য আমাদের পৌঁছে দিয়ে আসা এবং নিয়ে আসার জন্য এক ভদ্রলোক সঙ্গে যাচ্ছেন।"

"কে তিনি?"

"তিনি যে-ই হোন্, তিনি কিন্তু সিনেমা দেখছেন না। আমরা দেখতে থাকব, তিনি বাইরে অপেক্ষা করবেন, ছবি শেষ হবে, তিনি আমাদের নিয়ে লক্ষ্মী ছেলেটির মত চ'লে আসবেন।"

"লোকটির ত তাহ'লে ভয়ানক দুর্ভাগ্য দেখছি। তাঁর সামনে লোভনীয় খাদ্য সাজিয়ে দেওয়া হ'য়েছে, অথচ তিনি খেতে পারবেন না!"

"দুর্ভাগ্য মানে! মহিলাদের সঙ্গী হওয়া একটা কত বড়ো সৌভাগ্য, তা জানো? নাও, এখন ওঠো, সার্টটা ছেড়ে সেই তোমার পাঞ্জাবীটা পড়ো। আমি সকালের দিকে এসে রাণুকে ওটা সাবান দিয়ে কেচে রাখতে ব'লে গিয়েছিলাম, রেখেছে নিশ্চয়।"

"আশ্চর্য! সেই সিনেমা-সঙ্গী দুর্ভাগ্যবান ভদ্রলোকটি কি আমিই!"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, সেটা মহাশয়ের বোঝা উচিত ছিল অনেক আগেই!"

এর খানিকক্ষণ পরে। রাণু এলো, ওরও পরণের সাড়ীখানা মূল্যবান মনে হ'ল। বুঝলাম, এ-ও মাধবীর অনুগ্রহ। আমার পাঞ্জাবীর কাঁধের কাছে দু' যায়গায় ছেঁড়া ছিল, দেখলাম, রাণু সযত্নে সেলাই ক'রে এনেছে। জামাটা আলনায় টানিয়ে রাখতে রাখতে বললাম, "তুমি ত জানো মাধবী, আমি কখনো সিনেমা দেখি না। আর তুমিও ত একদিন ঘোরতর চটা ছিলে সিনেমার ওপরে। তা ছাড়া, আমাদের যা' অবস্থা, তা'তে অনর্থক এতোগুলো বাজে পয়সা-খরচ......।"

"তার চেয়ে সোজা কথা ব'লে দাও না যে, তুমি যেতে পারবে না! খরচের ভাবনা তোমার ত নয়, আমার।"

এর পরে আর একটিও বাক্য ব্যয় না ক'রে সেই চিরন্তন মলিন-সার্ট-পরা আমি ওদের সঙ্গে চলতে লাগলাম।

"জানো নিরুদা, দাদাদের কারবারের অবস্থা খুব ভালো যাচ্ছে।"

"জানি।"

"ছাই জানো। আমরা যে নতুন বাড়িতে উঠে এলাম, একদিনও এসেছিলে আমাদের বাড়ি?

"তোমরা মাকে জিজ্ঞাসা ক'রো, আমি কালই গিয়েছিলাম। তুমি বাড়িতে ছিলে না, তোমার দাদার সঙ্গে বেড়াতে গিয়েছিলে।"

"ঐ এক কাণ্ড! আমার দাদাটির দেখছি বোনের প্রতি স্নেহমায়া দিন দিন বেড়ে চলছে! ভালো ভালো সাড়ী কিনে দেওয়া, সিনেমা দেখবার পয়সা-দেওয়া, সঙ্গে ক'রে নিয়ে বন্ধুদের বাড়ি বেড়াতে যাওয়া,—সেই দাদাই যেন আর নেই।"

"জানি, মাধবী।"

বসাকদের ছেলেদের সঙ্গে দাদার খুব ভাব হ'য়েছে, বুঝলে নিরুদা? সেদিন ওদেরই বাড়ি বেড়াতে গিয়েছিলাম।"

"বসাকদের সঙ্গেই ত তোমার দাদা ভাগে কারবার করছে, না মাধবী?"

"তা-ও জানো দেখছি। যাই বলো, ওরা লোক মন্দ নয়। ভালো কথা, জানো নিরুদা, দাদা আবার নাকি বাড়ি কেনবার চেষ্টায় আছে।"

"ঈর্ষা করি না মাধবী। সচ্ছলতা কে না চায়? দিন দিন তোমাদের আর্থিক অবস্থা ভালো হ'য়ে উঠুক,—তোমরা সুখী হও, ঈশ্বরের পায়ে এই ত আমাদের কামনা।"

"দাদার সঙ্গে তোমার ত খুব ভাব ছল। তুমিও চাকরী ছেড়ে ব্যবসা ধরো না নিরুদা?"

ম্লান হেসে বললাম, "সে' ভাগ্য যে হয়নি। এত চেষ্টা করলাম, তবুও পারলাম না সকলের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াতে; কেমন ক'রে মানুষকে হাত করতে হয়, কেমন ক'রে খোসামোদ করে চলতে হয়, তা' আমি আজও শিখতে পারলাম না মাধবী। আর ও' দুটো জিনিস, যার প্রচুর অর্থ নেই, তার পক্ষে ব্যবসায়ে নামতে গেলে সব প্রথমেই বিশেষ প্রয়োজন। না মাধবী, অর্থের লিপ্সাও আমার খুব নেই। অর্থ মানুষকে কী নিদারুণ বদলে দেয়, সে' বিভীষিকা আমি সহ্য করতে পারব না।"

কথা বলতে বলতে ততক্ষণে আমরা গন্তব্য স্থলে পেঁৗছে গেছি। আর বিশেষ কোন আলোচনা হয়নি। শুধু একবার চুপি চুপি ওকে ব'লেছিলাম, আমার সেই নিরাভরণ পল্লী-বধূটিকে তোমার মনে আছে?"

মাধবী একটু হেসেছিল, কিছু বলেনি। আমিও আর কিছু বলিনি, কেবল মনে আছে, সেই দিন অনেক রাত পর্যন্ত জেগে ডায়রী লিখেছিলাম।

এর পরের ঘটনা সামান্য। প্রায় তিন মাসের জন্য অফিসের কাজ নিয়ে আমাকে বম্বে যেতে হয়েছিল। তিন মাস পরে আবার ফিরে এলাম আমার সেই ছোট্ট ঘর। উপার্জনের অঙ্ক আরও কিছু বেড়েছে, কিন্তু ব্যয়ের অঙ্ক ভাগ্যবিধাতা আগেই চমৎকার সাজিয়ে রেখেছিলেন, তা থেকে মুক্তি-অর্জনের আর কোন উপায় ছিল না।

গণবুভুক্ষায় নগরীর আকাশ-বাতাস মুখরিত। তারই মধ্য দিয়ে পথ হাঁটছি। চিঠিতে-লেখা-ঠিকানা মিলিয়ে মিলিয়ে মাধবীদের বাড়ি চিনে বের করতে খুব যে কষ্ট হ'য়েছিল, তা' নয়। চমৎকার তেতলা বাড়ি; বাড়িটা ওরা নাকি নূতন কিনেছে।

মাধবী বললে, "কী নিরুদা, কেমন দেখছেন আমাদের বাড়ি?"

"খুব ভালো।"

"আসুন আমরা এই ঘরে বসি। এটা ড্রয়িং রুম, বুঝলেন? আপনি ঐ কাউচটাতে বসুন। দেখেছেন জানালার পর্দাগুলো? সব সবুজ। সবুজ রঙ আমার এতো ভালো লাগে! দিন চারেক আগেও যদি আসতেন নিরুদা? আমার জন্মদিনের উৎসব হ'য়ে গেল। আমি যা' সব উপহার পেয়েছি, দেখবার মত। দেওয়ালের ঐ ছবিটা দেখছেন? ওটা "দ্য ভিঞ্চির" "লাস্ট সাপার!" বিখ্যাত ছবি। দামও তেমনি! জানেন, নিরুদা? আমরা একটা কুকুর পুষছি, বুলটেরিয়ার! কী গম্ভীর তার ডাক!"

"তোমাদের অবস্থার উন্নতি হ'য়েছে, এতো খুবই আনন্দের কথা মাধবী।"

"কিন্তু এর মূলে কে আছে, তা' জানেন?"

"জানি বই কি। তোমার দাদাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি, তার কর্মকুশলতাকে বাস্তবিকই প্রশংসা করতে হয়।"

"দাদার কৃতিত্ব একটুও নয়, এর মূল একমাত্র আমি। যাকগে, আপনি সে সব বুঝবেন না! আপনি বসুন নিরুদা, আমি আপনার জন্য চা করতে ব'লে দিয়ে আসি।"

মাধবী ভেতরে গেল। আমি চতুর্দিকে চাইলাম। জানালায়-দরজায় দামী নেটের পর্দা। কক্ষটি অতি নিপুণভাবে সাজানো। দামী আসবাব-পত্র। দেওয়ালে প্রকাণ্ড ছবি' খৃষ্টের 'শেষ উৎসব।'

মূল্যবান নিখুঁত ইউরোপীয়-পরিচ্ছদ-সজ্জিত কে এক সৌখীন ভদ্রলোক ঘরে প্রবেশ করলেন। চিনলাম, ভদ্রলোক এ অঞ্চলের বিখ্যাত ধনী বসাক-পরিবারের বড় ছেলে। আমাকে এককালে উনিও চিনতেন, কিন্তু বর্তমানে চিনলেন কিনা বোঝা গেল না, কোন বাক্য ব্যয় নয়, শুধু ভ্রূ-যুগল ঈষৎ কুঞ্চিত ক'রে দ্বিধাহীন পদক্ষেপে অন্দরে প্রবেশ করলেন।

আমি জানতাম। ওদের এ' বৈভবের মূলে কে এবং কী, তা' আমি জেনেছি। আমি এসেছিলাম শুধু একবার সেই নির্মম সত্যের মুখোমুখি দাঁড়াতে।

সেই অতি দুঃসহ অন্ধকারের ইতিহাস আমি জানি। মাধবীকে নিয়ে ওর দাদা যেত বসাকদের বাড়ি; পেঁৗছে দিত, আর পরে সঙ্গে ক'রে নিয়ে আসত। আমি জানি, বসাকদের বড়ো ছেলের পতঙ্গ-বৃত্তির সম্মুখে মাধবীর প্রজ্জ্বলিত রূপশিখা একটা দুর্নিবার রমণীয় মৃত্যু! মাধবীর রূপ এবং যৌবনের মূল্যেই ওদের ক্রয় করতে হ'য়েছে এই সম্পদের স্তূপ!

নিজের দিকে চাইলাম। বহু মূল্যে সবুজ সোফার কোমল আরামের মধ্যে আমার বিষণ্ণ মলিন মূর্তিটি কী নিদারুণ হাস্যকর যে লাগছে, তা' বলবার নয়!

আস্তে আস্তে বাইরে বেরিয়ে এলাম। ভেতরে ওদের সেই অতি আদরের বুল-টেরিয়ার চীৎকার করছে। তার সঙ্গে মিলিয়ে একটা উচ্ছ্বসিত কলকণ্ঠ; আর গ্রামোফোনে একটা ইংরেজী নাচের বাজনা।

কলকাতার পথ। চলমান জনারণ্য। মিশে গেলাম তার মধ্যে। বিশ্ব-বিধাতাকে ব্যাকুল অন্তরে শুধু এই প্রার্থনা জানাতে পেরেছিলাম,—শ্বাপদের ব্যাদিত মুখ গহ্বর থেকে রক্ষা ক'রো প্রভু। কবে, আর কতদিন পরে, হে পূষণ, উন্মুক্ত করবে তোমার হিরন্ময় অমৃত ভাণ্ডের আবরণ, উন্মোচিত করবে তোমার জ্যোতির্ময় পরম প্রকাশ,—সমস্ত পাপ, সমস্ত গ্লানি ধুয়ে মুছে নিঃশেষ হ'য়ে যাবে?

আসন্ন বিপদের পূর্বাভাষ

শ্রীসুধীস কুমার বসু

১৯৪৩ খৃষ্টাব্দ অতিবাহিত হইয়াছে। সমস্ত বাঙালীর অকপট আন্তরিক প্রার্থনা,—বাঙলার জন্য সে যে দুর্ভাগ্য বহন করিয়া আনিয়াছিল, তাহার যেন আর পুনরাবৃত্তি না ঘটে। ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের দুর্ভাগ্যের স্মৃতি বাঙালী অনেকদিন পর্যন্ত ভুলিতে পারিবে না। সমাজ ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে ইহা এমন বিপর্যয়ের সৃষ্টি করিয়াছে যে, তাহার পরিণতি কোথায় যাইয়া দাঁড়াইবে, তাহা নির্ণয় করিবার সময় এখনও আসে নাই। গত লোকের প্রাণ বিনষ্ট হইয়াছে, তাহার সঠিক সংখ্যা নির্ণয় হয়ত অসম্ভব, কিন্তু একথা বোধ হয় নিঃসংশয়ে বলা যায় যে, পৃথিবীর যে কোন বৃহৎ রণাঙ্গনে লোকক্ষয়ের পরিমাণ এতদপেক্ষা কম হইবে। তদ্ব্যতীত জাতির স্বাস্থ্যের উপর ইহা যে প্রভাব বিস্তার করিবে, তাহার ফলও আমাদের বহুদিন ধরিয়া ভোগ করিতে হইবে। জীবন ও সম্পত্তি নাশের হিসাব হয়ত একদিন প্রস্তুত হইবে, কিন্তু আমাদের স্বাস্থ্য ও কর্মশক্তির বিনাশ অপরিমেয়।

এখন প্রশ্ন হইতেছে,—এই দুঃখসাগর কি আমরা উত্তীর্ণ হইয়া আসিয়াছি এবং তাহার প্রান্তে দাঁড়াইয়া ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ করিবার অবস্থায় উপনীত হইয়াছি। অথবা দুঃখের দুস্তর সাগরে এখনও আমাদের পাড়ি জমাইতে হইবে এবং ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের সংকট, ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দে আরও তীব্র আকারে দেখা দিবে।

ভারতসচিব নিতান্ত নিরুপায় অবস্থায় পড়িয়া দুর্ভিক্ষের দায়িত্ব ভগবানের উপর অর্পণ করিয়াছিলেন। কিন্তু এই দুর্ভিক্ষ যে মনুষ্য-সৃষ্ট এবং তাহাতে আমাদের শাসকবর্গের দায়িত্ব যে কম নহে, সম্ভবত সে কথা আজ আর প্রমাণসাপেক্ষ নহে। কিন্তু এই দুর্ভিক্ষের ব্যাপারে শাসকবর্গের দায়িত্ব যদি কিছুমাত্র নাও থাকিত এবং প্রকৃতপক্ষে ইহা ভগবানের সৃষ্ট হইত, তাহা হইলেও জনসাধারণকে রক্ষা করিবার দায়িত্ব কোন সভ্য সরকারই জনসাধারণের উপর অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতেন না। জনসাধারণকে রক্ষা করিবার পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করিতে তাঁহারা বাধ্য হইতেন।

কিন্তু জনসাধারণকে রক্ষা করিতে সরকারের শোচনীয় অক্ষমতা এবং তদপেক্ষা অধিকতর শোচনীয় নিশ্চেষ্টতা আমরা এখানে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস প্রত্যক্ষ করিয়াছি। যখন লক্ষ লক্ষ লোক এক কণা খাদ্যের অভাবে রাস্তায় পড়িয়া মরিয়াছে, তাহাতে আমরা সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে দোষ বণ্টনের চেষ্টা এবং মিথ্যা আশ্বাস ব্যতীত ফলপ্রদ আর কিছুই পাই নাই। কিন্তু অব্যবস্থা ও বিশৃঙ্খলার মধ্যে প্রকৃতি বসিয়া ছিলেন না,—সেখানে ক্ষয়পূরণের কার্য আরম্ভ হইয়া গিয়াছিল। বাঙলার মাঠে মাঠে এবার প্রচুর ধান ফলিয়াছে। ব্যাধি, মৃত্যু, মহামারী এবং চূড়ান্ত নৈরাশ্যের মধ্যে প্রচুর শস্য-সম্ভার লইয়া নূতন বৎসর দেখা দিয়াছে। সরকারী ব্যবস্থাকেও পিছাইতে পিছাইতে আমন ধান পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইয়াছে।

ফসল উঠিবার মুখেও লোকের মনে নূতন আশার সঞ্চার করিয়া ধান্য ও চাউলের দর দ্রুত হ্রাস পাইতেছিল। কিন্তু এই সদ্য জাগ্রত আশা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইয়াছে। মূল্য কিছুদূর পর্যন্ত কমিয়া আবার বৃদ্ধির দিকে যাইতেছে এবং অবস্থার আপেক্ষিক উন্নতির জন্য সাধারণ লোকের মনে কতকটা আস্থার ভাব দেখা দিলেও, যাঁহারাই সমগ্র অবস্থা পর্যালোচনা করিতেছেন, তাঁহারাই পূর্ব বৎসর অপেক্ষা অধিকতরভাবেই সংকটের আশংকা করিতেছেন। অবস্থার যে পূর্বাভাস সূচিত হইতেছে, তাহাতে অনেকটা নিঃসংশয়ে একথা বলা যায় যে, বাঙলার আকাশে আবার প্রলয়ের মেঘ সঞ্চিত হইতেছে।

অবশ্য একথা স্বীকার করিতে হইবে যে অবস্থার আপেক্ষিক উন্নতি হইয়াছে এবং আমন ধান উঠিবার ফলে চাউলের দুষ্প্রাপ্যতা কোন স্থানে আর বিশেষ অনুভূত হইতেছে না। ইহাতে আমাদের মনে একটা স্বস্তির ভাব আসিয়াছে এবং আমরা অনেকেই মনে করিতেছি যে, সংকট উত্তীর্ণপ্রায়। চাউলের দর ৪৫ টাকা (মফঃস্বলে কোন কোন স্থানে ১০০ টাকারও উপর) হইতে ১৮।২০ টাকায় নামিলে লোকের পক্ষে কতকটা স্বস্তি অনুভব করা স্বাভাবিক। কিন্তু তাহা প্রকৃত অবস্থার পরিচায়ক নহে। প্রকৃত অবস্থা বুঝিবার জন্য গত বৎসরের এই সময়ের কথা আমাদের স্মরণ করা দরকার।

গত বৎসর জানুয়ারী অথবা ফেব্রুয়ারীতে চাউলের দুষ্প্রাপ্যতার কোন আভাস পাওয়া যায় নাই। তখন যে মূল্য লোকের নিকট অত্যধিক বলিয়া মনে হইয়াছিল, তাহাও বর্তমান বৎসর অপেক্ষা অনেক কম। গত বৎসরের বাঙলার চাউলের মূল্যের একটি তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

	মাঝারী চাউল	মোটা চাউ
জানুয়ারীর শেষ সপ্তাহে	১০,—১২,	৮,—১
ফেব্রুয়ারীর শেষ সপ্তাহে	১২,—১৫,	১০,—১
মার্চের শেষ সপ্তাহে	১৮,—২০,	১৬,—১
এপ্রিলের শেষ সপ্তাহে	২২,—২৪,	২০,—২
মে'র শেষ সপ্তাহে	৩০,—৩২,	২৮,—৩০

এই মূল্য ক্রমশ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া মফঃস্বলের কোন কোন স্থানে ১০০, টাক পর্যন্ত হয়। নিম্নে প্রদত্ত কলিকাতার গত দুই বৎসরের মূল্যেও এই সঙ্গে তুলনা করিয়া দেখা যাইতে পারে।

মাস	১৯৪২	প্রতি মণ
জানুয়ারী	,,	৬৷
আগষ্ট	,,	৯॥
সেপ্টেম্বর	,,	১১,
নভেম্বর	,,	১১,
ডিসেম্বর	,,	১৪,
জানুয়ারী	১৯৪৩	১৪॥॰
মার্চ, এপ্রিল	,,	২৪,
মে	,,	২৪,—৩০,
জুন	,,	৩২,
জুলাই	,,	৩৫,
আগস্ট	,,	৩৮,
সেপ্টেম্বর-অক্টোবর	,,	৪৫,

দর অবশ্য গত বৎসরের শেষের দিকে মফঃস্বলের তুলনায় কম ছিল। কিন্তু সাধারণভাবে বলা যাইতে পারে যে গত বৎসর এই সময়ে মফঃস্বলে চাউলের মূল্য বর্তমানের প্রায় অর্ধেক ছিল। কোন কোন স্থানে এই মূল্য পরে দশগুণ বৃদ্ধি পায়। সুতরাং শংকার যে যথেষ্ট কারণ বিদ্যমান আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

এ বৎসর আমন ধানের প্রাচুর্যের মধ্যে ১৪টি জেলার চাউলের দর প্রতি মণ ১৮, টাকা হইতে ২১,।২২, টাকা পর্যন্ত। এই অবস্থাকে দুর্ভিক্ষ বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে। সরকারী নিয়ন্ত্রিত মূল্য অপেক্ষা গড়ে শতকরা ২৫% অধিক। ১২টি উদ্বৃত্ত জেলার চাউলের মূল্য অনেক স্থানে পনের টাকার নীচে আছে, কিন্তু তাহাও বৃদ্ধির দিকে যাইতেছে এবং এই মূল্যও জনসাধারণের আর্থিক সামর্থ্যের মধ্যে নহে।

দুষ্প্রাপ্যতা সম্পর্কে বলা যাইতে পারে যে, চাউল বাজারে দুষ্প্রাপ্য না হইলেও বহু লোকের নিকট তাহা দুষ্প্রাপ্য হইবারই সমান হইয়াছে। কারণ, গত বৎসর যাহারা দুঃস্থ হয় নাই, এমন বহু লোক সম্পূর্ণ নিঃস্ব হইয়াছে। তাহাদের এমন কোন আর্থিক সংস্থান নাই, যাহাতে তাহারা বর্তমানের উচ্চমূল্য দিয়া চাউল কিনিতে পারে। বাজারে চাউল থাকিতেও, সে চাউল ইহাদের নিকট দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে বলিতে হইবে। চাউলের মূল্য আরও বর্ধিত হইলে অথবা বর্তমান মূল্য চলিতে থাকিলে এই সকল লোকও ক্রমে দুঃস্থ হইয়া পড়িতে বাধ্য হইবে।

নিউজ ক্রণিকেলের দিল্লীস্থিত সংবাদদাতা সত্যই লক্ষ্য করিয়াছেন যে, ধান কাটিবার সময় যাহারা গ্রামে গিয়াছিল, আবার তাহারা দলে দলে শহরে ফিরিতেছে। প্রকৃতপক্ষে গ্রামে তাহাদের বাঁচিবার উপায় নাই। প্রথমত ধান উঠিয়া যাইবার পর মজুরের চাহিদা কমিয়া গিয়াছে, দ্বিতীয়ত তাহারা যে হারে মজুরী পাইবে, তাহাতে বর্তমান মূল্যে দিয়া চাউল কেনা সম্ভব নহে। সুতরাং বাজারে চাউল থাকিতেও সেই চাউল ইহাদের নিকট সুপ্রাপ্য নহে বলিতে গেলে ইহাদের পক্ষে সেই চাউল সংগ্রহ করিবার কোনও স্বাভাবিক উপায় নাই।

সমগ্র দেশের মধ্যে প্রবল মহামারির প্রকোপ চলিতেছে। যে সকল ভূমিহীন পরিবারের কার্যক্ষম লোকেরা শয্যাশায়ী তাহারা এখনই দুঃস্থের পর্যায়ভুক্ত হইতেছে। এইভাবে বৎসরের গোড়ায় যে অবস্থার আরম্ভ হইল তাহা যে কোন ভয়াবহ পরিণামের পূর্বাভাস তাহা আজ কল্পনা করাও দুঃসাধ্য। সরকারী নির্দেশে চাউলের মূল্য বর্তমানেও নিয়ন্ত্রিত হইতেছে না। ভবিষ্যতেও যে তাহা হইবে এমন সম্ভাবনা আরও কম। কারণ, চাউল কৃষকদের ঘর হইতে মজুতদারদের গোলায় একবার যাইয়া উঠিলে, চোরা বাজার যে কিভাবে সরকারী চেষ্টাকে বানচাল করিয়া দিতে পারে, গত বৎসর নিদারুণ সংকটের সময় তাহা বারবার দেখা গিয়াছে। সুতরাং চাউলের মূল্য যে আর বৃদ্ধি পাইবে না এবং প্রকাশ্য বাজার হইতে অন্তর্হিত হইয়া চাউল যে চোরাবাজারে আশ্রয় লইবে না তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই বরং গুরুতর আশংকাই রহিয়াছে।

কিন্তু চাউল যদি চোরাবাজার হইতে অন্তর্হিত নাও হয় এবং আর অধিকতর মূল্য বৃদ্ধি না ঘটে তবুও এই মূল্যেও [সরকারী নির্ধারিত মূল্যেও] বহু লোকের আর্থিক সংগতির বাহিরে এবং ক্রমেই অধিকতর সংখ্যক লোকের আর্থিক সামর্থ্যের বাহিরে যাইবে। ইহারও পর যদি মূল্য বৃদ্ধি হইতে থাকে এবং চোরা বাজার দমন করা সম্ভব না হয় তাহা হইলে এ বৎসর দুঃস্থের সংখ্যা কোথায় যাইয়া দাঁড়াইবে তাহা আজ কল্পনাতীত।

গত বৎসর যে সকল দুঃস্থ কোন প্রকারে নানা ধাক্কা সামলাইয়া বাঁচিয়া গিয়াছে এ বৎসর তাহাদের বাঁচিবার উপায় কি? ইহারা ভূমিসম্পর্কশূন্য বলিয়াই গত বৎসর দুঃস্থ হইয়াছিল। এবৎসরও এমন কোন প্রকার অর্থনীতিক ভিত্তির উপর ইহারা প্রতিষ্ঠিত হয় নাই যাহাতে চাউলের বর্তমান মূল্য ইহারা যোগাইতে সমর্থ হইবে। যে সকল কারিগর ও নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক গত বৎসর কোনক্রমে আত্মরক্ষা করিয়াছে, এবার তাহারা আর্থিক সামর্থ্যের শেষ সীমায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে। চাউলের বর্তমান মূল্যই তাহাদের পক্ষে যোগান সম্ভব নহে, বর্ধিত বা চোরাবাজারের মূল্য নিঃসন্দেহ তাহাদিগকে এবার দুঃস্থের দলভুক্ত করিবে।

এই ভরা ফসলের মাঝখানেই কলিকাতায় দুঃস্থের মৃত্যুসংখ্যা আবার বৃদ্ধির দিকে গিয়াছে। কলিকাতার রাস্তায় আবার নিরাশ্রয় লোকদের পড়িয়া থাকিতে দেখা যাইতেছে। খাদ্যের জন্য করুণ প্রার্থনা কিছুদিন স্তব্ধ হইয়াছিল। আবার গলিতে গলিতে করুণ ধ্বনি শোনা যাইতেছে। কলিকাতা কর্পোরেশন ইতিমধ্যেই ইহাদের সমস্যা লইয়া চিন্তিত হইয়াছেন। প্রাচুর্যের মাঝখানেই ইহা কোন প্রলয়ের পূর্বাভাস!

১৮ই ডিসেম্বরের এক প্রেস নোটে বলা হয় যে, গত ১৩ই ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রাপ্ত সংবাদে জানা গিয়াছে যে, সমগ্র বাঙলায় তখনও ২০ লক্ষের অধিক লোককে বিভিন্ন লঙ্গরখানায় খাওয়ান হইতেছিল এবং আরও তিন লক্ষ লোককে নানাভাবে সাহায্য করা হইতেছিল। লঙ্গরখানায় যে উৎকৃষ্ট ধরণের খাদ্য দেওয়া হইত তাহাতে অন্য উপায় থাকিতে লোকে স্বেচ্ছায় এই খাদ্য গ্রহণ করিতে আসিত না। ইহার পূর্বে আরও বহু লঙ্গরখানা তুলিয়া দেওয়া না হইলে দুঃস্থের সংখ্যা অনেক অধিক দেখা যাইত। বর্তমানে লঙ্গরখানাগুলি তুলিয়া দেওয়ায় ইহাদিগকে সম্ভবত পুনরায় রাস্তায় আশ্রয় লইতে হইয়াছে। হয়ত অনেকে লোক চক্ষুর অন্তরালে (কলিকাতার বাহিরে) মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। পণ্ডিত হৃদয়নাথ কুঞ্জরু বলিয়াছেন যে, অনশনক্লিষ্টব্যক্তিদের বর্তমানে দেখিতে না পাইবার কারণ হইতেছে যে, তাহাদের অধিকাংশ মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। তিনি বাহিরের অবস্থা দেখিয়া ভিতরের অবস্থা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইতে নিষেধ করিয়াছেন এবং নিউজ ক্রনিকেলের দিল্লীস্থিত সংবাদদাতা দ্বিতীয় দুর্ভিক্ষের আশংকা প্রকাশ করিয়াছেন।

প্রকৃতপক্ষে দুর্ভিক্ষের এখনও অবসান হয় নাই এবং বাজারে চাউল দুষ্প্রাপ্য না থাকিলেও অত্যধিক মূল্যের জন্য অধিকাংশ লোকের পক্ষে তাহা দুর্মূল্য রহিয়া গিয়াছে। এই অবস্থা অপ্রতিহত গতিতে দ্রুত ভয়াবহ পরিণতির দিকে চলিয়াছে।

জংলা মধু

শ্রীসতীশচন্দ্র রায়

ঘর ছাড়িয়া বাহিরে যাইতে বৈকুণ্ঠ মোলের আদৌ ইচ্ছা নাই। কিন্তু পেটের জ্বালা বড় জ্বালা। পর পর দুই সনই অজন্মা। তারপর হাল বওয়ার একটা বলদ যখন গো-মড়কে সাবাড় হইল তখন আর উপায়ন্তর রহিল না।

খাজনার টাকাই যখন যোগান ভার তখন জমি রাখিয়া লাভ কি? বৈকুণ্ঠ উবু হইয়া দাওয়ায় বসিয়া তামাক খাইতে খাইতে ভাবিতেছিল। কিন্তু লাভ শুধু টাকা আনা পাই দিয়া হিসাব করা যায় না। নহিলে জমি ছাড়িয়া দিবার ভাবনায় আর বৈকুণ্ঠের সমস্ত বুকটা ব্যথায় টন টন করিয়া উঠিত না। তাহা হইলে সে এতদিনে সব খোয়াইয়া বাবুদের বাড়ি 'জন' দিত। তবু ত নগদ পয়সা সন্ধ্যা বেলায় হাতে পাইত। যে রকম দিনকাল পড়িয়াছে চাষ আবাদ করিয়া হাল বলদের কড়ি ওঠানো দায়, সংসারের উন্নতি করা ত দূরের কথা। ভগবানের দয়ায় যে দিন যায় সেই দিনই ভাল। তার বাবার এক আঁজলা টাকা সেলামী দিয়া লওয়া খাজনা করা জমি—অনেক দিনের সুখ দুঃখ বিজড়িত। বৈকুণ্ঠ লোকসান দিবে তবু জমি ছাড়িবে না ঠিক করিল। তারপর তামাক টানা বন্ধ করিয়া হুকোটা খুঁটির গায়ে ঠেস দিয়া রাখিয়া বলিয়া উঠিল, "যত দিন আমি আছি ততদিন জমি আছে, তোর কোনো ভাবনা নেইরে ফুলুর মা।" বৈকুণ্ঠের স্ত্রী ক্ষান্ত কোমরে আঁচল জড়াইয়া ঝুঁকিয়া পড়িয়া গোয়াল ঘরের গোবর কাচিতেছিল, সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া হাসিয়া বলিল, "নিজের ভাবনা নিয়েই বুঝি আমি মরছি দিন রাত। ডোবা নৌকো আঁকড়ে থাকলে নিজেকেই ডুবতে হয়। তুমি জমি ছেড়ে দাও।"

বৈকুণ্ঠ শুধাইল, "চাষার ছেলের জমি ছেড়ে দিলে কি আর রইল, ক্ষান্ত?"

ক্ষান্ত এবার রাজ করিয়া বলিল, "তা যাই বল, অ-ফলা জমির খাজনা যোগাতে তোমাকে বাদায় যেতে আমি দেব না।"

বৈকুণ্ঠ কহিল, "একলা আমি কোন্ দিক সামলাই? বড় ভাইয়ের ছেলে কেদার এত বড় হ'ল, সংসারের একটি কাজে নেই!"

ক্ষান্ত উত্তর দিল, "এখনো ছেলেমানুষ, বড় হ'লে শুধরে যাবে। তখন কি আর অমন করে খেলে বেড়াবে?"

বৈকুণ্ঠ বিরক্ত হইয়া বলিল, "আঠারো বছরেও যদি চাষার ছেলে ছেলেমানুষ থাকে তবে ত আর চলে না। আদর দিয়ে তুমিই ওর মাথাটি খেলে।"

ক্ষান্ত কহিল, "মা-মরা ছেলে, আমাকেই ও মা বলে জানে। ছোটতে বাপ মরল অপ-ঘাতে, সংসারে গিন্নী হ'য়ে ওর ভাবনা না ভাবলে লোকে যে আমাকে নিন্দে করবে।"

এমন সময় সমস্ত গায়ে কাদার ছিটে ভরা ঘোড়ার পিঠে সোয়ার হইয়া এক যুবক ঢুকিল একেবারে অন্দরের উঠানে। ঘোড়ার খালি পিঠই তাহার জিন, আর ঝুঁটিই লাগাম। সে ঘোড়া হইতে লাফ দিয়া নামিয়া বৈকুণ্ঠকে বলিল, "এবার কিন্তু আমি তোমার সঙ্গে সুন্দরবনে মৌ ভাঙতে যাব কাকা, কাকীর কোনো বারণে কান দেব না।"

বৈকুণ্ঠ চুপ করিয়া থাকিল।

ক্ষান্ত রাগ দেখাইয়া বলিল, "সমস্ত দিন ধরে কি করছিস বলত কেদার? নাওয়া নেই, খাওয়া নেই, ঢং ঢং করে কেবল ঘোড়ার পিঠে চেপে বেড়ালে দিন চলবে?"

ক্ষান্তর রাগ দেখিয়া কেদার হাসিয়া জবাব দিলে, "এই ত কাকার সঙ্গে চললাম এবার বাদায়। দেখবে কত কাঠ কাটব, কত মৌ ভাঙব, কত জোঙড়া কুড়ুব।—টাকায় তোমার আঁচল একেবারে ভরে দেব কাকী! তখন বলবে হ্যাঁ, কেদার আমার কাজের ছেলে বটে।"

কেদারের কথা বলার সরল সহাস ভঙ্গীতে বৈকুণ্ঠ ও ক্ষান্ত হইয়া উঠিল উৎফুল্ল। অভাব-শঙ্ক মনে আসিল উৎসাহের বসন্ত জোয়ার।

বৈকুণ্ঠের মেয়ে ফুলী গ্রামের পাঠশালা হইতে ফিরিতেছিল বই শ্লেট কাঁধে করিয়া। সে উঠানে ঢুকিয়া কেদারের কাদা মাখা রুক্ষ মূর্তি দেখিয়া বলিয়া উঠিল, "এ কি চেহারা হয়েছে তোমার, দাদা?"

কেদার আমোদ পাইয়া সহাস্যে শুধাইল, "কেমন দেখাচ্ছে বল ত?"

ফুলী দাঁত মুখ সিটকাইয়া বলিল, "মা-গো যেন একটা দত্যি!"

কেদার আবার হাসিয়া শুধাইল, "আর তুই?"

"আমি হচ্ছি পরী!" ফুলী মাথা দুলাইয়া বলিল, "অমন একটা বিকট দত্যির সঙ্গে পরী কথা বলতে চায় না!" বলিয়া গম্ভীর ভাবে ফুলী হেলিয়া দুলিয়া 'পঠেয়' উঠিল। তাহার চালচলন দেখিয়া বৈকুণ্ঠ ক্ষান্ত আর কেদারের মধ্যে হাসির রোল উঠিল।

ক্ষেত ফসল দিলে চাষী সুন্দরবনের গহনে নিশ্চিত বিপদের মুখে যাইতে চাহে না। নিতান্তই পেটের দায়ে যায়। কারণ সেখানে জলে কুমীর এবং ডাঙায় বাঘ ও সাপের অভাব নাই। বন শুকরের আক্রমণও আছে। ঠিক হইল দুই খুড়ো ভাইপো বাদায় মৌ ভাঙিতেই যাইবে। মৌ ভাঙাই তাদের জাত-ব্যবসা তাই তাহাদের উপাধি মৌলে। বাদায় মৌ ভাঙিতে যাওয়া যেমন অল্প টাকা তেমনি অল্প লোকের কাজ, কিন্তু বিপদ বেশী। কিন্তু সুন্দরবনে যাইতে হইলে সন্দেশখালিতে লাইসেন্স করিতে হয়। তার উপর নৌকা ভাড়া আর রাহা খরচও চাই। সেজন্য টাকার দরকার। তাই বৈকুণ্ঠ কেদারকে লইয়া পর দিন সকালে গিয়া হাজির হইল গ্রামের মহাজন নকড়ি বিশ্বাসের বাড়ি। রুপোর পৈঁছে, বাউটি, তোড়া ক্ষান্তর যা কিছু ছিল সব সে তুলিয়া দিয়াছে বৈকুণ্ঠের হাতে। নকড়ি বিশ্বাস ভারি হুঁসিয়ার; বিনা বন্ধকে টাকা ধার দেয় না।

যখন তাহারা নকড়ির বাড়ি পেঁছাইল ততক্ষণে তাহার স্নান সারা হইয়া গিয়াছে। সে তখন একখানি আট হাত কাপড় পরিয়া, ঘরের দাওয়ায় বসিয়া, কানে তুলসী পাতা গুঁজিয়া, কাঠের বাক্সের উপর তালপাতায় একশ আট বার দুর্গা নাম লিখিতেছে। গলায় তার তুলসী কাঠের মালা, গায়ে গঙ্গা-মৃত্তিকায় 'হরের্নামৈব কেবলম্' ছাপ। আড়-চোখে পথের পানে চাহিয়া নূতন খাতকের আগমন প্রতীক্ষাই আসল কাজ। দু'জনকে গ্রামের গলি পথে আসিতে দেখিয়া নকড়ি বিশ্বাস তাহাদের উদ্দেশ্য অনুমান করিল এবং দুর্গা নাম লেখায় অত্যন্ত অবহিত হইয়া পড়িল। বৈকুণ্ঠ আসিয়া নকড়ির সম্বিতের জন্য গলা খাঁকরাইল। প্রথম বারে কোনো সাড়া নাই। দ্বিতীয় বারের আওয়াজে নকড়ি ঘাড় ফিরাইয়া চাহিল। চোখ তুলিয়া নিঃশব্দ ইঙ্গিতে শুধাইল, 'কি?' তারপর তেমনি-ভাবেই হাত নাড়িয়া বলিল, "বস।"

ঘরের চালে গোঁজা খেজুর পাতায় বোনা চেটাই খুলিয়া নিয়া দাওয়ায় বিছাইয়া দুই খুড়ো ভাইপোতে উবু হইয়া বসিল। নকড়ির আর লেখাই শেষ হয় না। খাতক

কেহ আসিলে ফেরী হয় বড় বেশী। যেন টাকা ধার দেওয়া তার পেশা নয়, গরীবের গরজে তার একটা পুণ্য কাজের সামিল। বেলা বাড়িয়া চলে। কেদার চুলবুল করিতে থাকে। আর বসিয়া থাকিলে বৈকুণ্ঠেরও ক্ষতি হয়। সে আর একবার গলার আওয়াজ করিল। এবার তাহাদের অধৈর্য বুঝিয়া ধীরে সুস্থে তালপাতার পুঁথি বাক্সে বন্ধ করিয়া উদ্দেশে সভক্তি প্রণাম করিয়া নকড়ি বিশ্বাস উঠিয়া দাঁড়াইল, মৃদু হাসিয়া বৈকুণ্ঠের পানে চাহিয়া বলিল, "তারপর মৌলের পো, এত সকালে কি মনে করে?"

বৈকুণ্ঠ উত্তর দেওয়ার আগে কেদারের কাছে নেকড়ায় বাঁধা ছোট পুঁটুলিটি চাহিয়া লইয়া খুলিয়া ফেলিল। বাউটি পৈঁছে আর তোড়া দুইটি তুলিয়া ধরিয়া বলিল, "গোটা পঁচিশেক টাকার দরকার, বিশ্বাস মশায়।"

নকড়ি বিশ্বাস ঘাড় নাড়িয়া জিভ কাটিয়া বলিল, "ও কারবারে আর আমি নেই বৈকুণ্ঠ। এখন যা' পড়ে গেছে, তাই গুটিয়ে নিতে পারলে বাঁচি। দুর্গা শ্রীহরি।"

বৈকুণ্ঠ মিনতি করিয়া কহিল, "মাত্র পঁচিশটে টাকা বিশ্বাস মশায়, ফিরে এসেই সুদ শুদ্ধ দেব।"

নকড়ি সন্দিগ্ধভাবে শুধাইল, "যাবে আবার কোথায় হে?"

বৈকুণ্ঠ সাগ্রহে কহিল, "বাদায়, মৌ ভাঙতে! এক মাসের অওদায় দ্যান কর্তা, দিন কুড়ির মধ্যে মাসের সুদ শুদ্ধ ফেরত পাবা, কথা দেলাম।"

নকড়ি বিশ্বাস চমকাইয়া উঠিয়া বলিল, "আবার বাদা? বাঘের পেটে যাবার সাধ। সেবার ত কাঠ কাটতে বড় ভাইটাকে কুমীরের মুখে দে এলি। তবু আক্কেল নেই?"

বৈকুণ্ঠ ধীরে ধীরে কহিল, "মানলাম, পেরাণডা হাতে করে যাতি হয়। কিন্তু পেট না চললি পেরাণের দাম কি বিশ্বাস মশায়?"

দ্বিধায় পড়ে নকড়ি বিশ্বাস বলিল, "কিন্তু আমার যে প্রাণ জল করা টাকা রে!"

দুই খুড়ো ভাইপো চেঁচিয়ে তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "সে তুমি ফেরত পাবা, এই গয়না বন্দক র'ল।"

তারপরও নকড়িকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া বৈকুণ্ঠ কহিল, "তোমার টাকা সেবারও মারা যায়নি এবারও যাবে না।"

নকড়ি সে কথার আর উত্তর না দিয়া কাঠের বড় বাক্সটার ভিতর হইতে আর একটি পালিশ করা ছোট বাক্স বাহির করিল। তাহা হইতে একটি নিক্তি ঠিক করিয়া লইয়া রুপোর গহনাগুলি ওজন করিতে লাগিল। তারপর ওজন করিতে করিতে বলিল, "অতগুলো টাকা ত আমার কাছে নেই, বৈকুণ্ঠ!"

সে কথায় কান না দিয়া বৈকুণ্ঠ কহিল, "দেখতি হবে না, সাবেক মাল। কত ভরি কও দিনি। আমার শাউড়ী মরবার সময় বউরে দে যায়। নিতান্ত ফেরে পড়ে বার করিচি।"

নকড়ি বিশ্বাস কসিয়া মাজিয়া দেখিল, গয়নাগুলোর দাম টাকা চল্লিশেক উঠিতে পারে। সেগুলো সে যথাস্থানে রাখিয়া আবার পুঁটুলী বাঁধিয়া বৈকুণ্ঠের হাতে ফিরাইয়া দিয়া কহিল, "এর উপর বড় জোর টাকা কুড়িক পেতে পার, বৈকুণ্ঠ!"

বৈকুণ্ঠ ব্যাকুল হইয়া বলিল, "যে সুদ বলবা আপত্য করব না। পঁচিশটে টাকা দেও বিশ্বাস মশায়।"

এবার আর দ্বিরুক্তি না করিয়া নকড়ি খাতা খুলিয়া গহনা জমা করিয়া লইল। টাকাও দিল বৈকুণ্ঠের হাতে টিপ সই লইবার পর। চাষাদের সঙ্গে আগে সে সয়তানী করিতে কসুর করিত না। কিন্তু একবার তাহাকে মাঠের মধ্যে একলা পাইয়া একদল ভুক্তভোগী ঘিরিয়া ফেলে। পিঠে যে প্রহার জুটিয়াছিল প্রচুর এখনো তাহার পরিচয় আছে। জীবন-হানিরও আশংকা ছিল। সেই হইতে নকড়ি বিশ্বাস অবিশ্বাসের কাজ করিতে ভয় পায়।

চৈত্র মাসের মাঝামাঝি একদিন বৈকুণ্ঠ কেদারকে সঙ্গে করিয়া নৌকা লইয়া ভাটা দেখিয়া রওনা হইয়া গেল। প্রথমে যাইতে হইল সন্দেশখালি। নৌকায় একদিনের পথ। সেখানে বনে মৌ ভাঙিবার লাইসেন্স লইতে হইবে। যে জঙ্গলে কাঠুরিয়ারা নৌকা ভাড়া করিয়া কাঠ কাটিতে যায় তাহা বেশী দূর নয়। জোঙড়া কুড়ুইবার জলা জঙ্গলগুলোও দুই কি আড়াই দিনের পথ। কিন্তু যাহারা মৌ ভাঙিতে যায় তাহারা তিন চার দিনের পথ নৌকায় না গেলে গভীর ঘন জঙ্গলে পৌঁছিতে পারে না। মৌমাছি আবার গভীর ঘন জঙ্গল না হইলে চাক বাঁধে না।

সন্দেশখালি হইতে দুই তিন দিনের পথ যখন তাহারা আসিয়া পড়িয়াছে, জঙ্গলের কিনারে একদিন তাহাদের নৌকা ভিড়িল। তখন রাত প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। আবছা অন্ধকারে গাছপাতার আবডালে বসিয়া বুনো মোরগ ডাকিতেছে। অন্য তারাগুলি একে একে আকাশে মিলাইয়া যাইতেছে, শুধু শুকতারাটি দপ্ দপ্ করিয়া জ্বলিতেছে। গেমো, ফুলপটি লতাপটির গাছে বসন্তের কাঁচ পাতার সঙ্গে থোকা থোকা ফুল ধরিয়াছে। রাতের প্রজাপতিরা সকাল হইল দেখিয়া ফুল ছাড়িয়া উড়িয়া যাইতেছে। ভ্রমর এবং মৌমাছিরা ভোঁ ভোঁ এবং গুন গুন শব্দে তাহাদের জায়গার দখল লইতেছে। নির্জন বনভূমি নাম-না-জানা নানা ফুলের গন্ধে রম রম করিতেছে। খলসে গাছের ফুলের মৌয়ে বড় ঝাঁজ, গেমোরও তাই লতাপটির মৌ সব চেয়ে সরেশ। কেবল লতাপটির মৌ আহরণ করা রহিয়াছে এমন মৌচাকের সন্ধান পাইলে মধু-আহরণকারীরা অন্য চাক চাহিয়াও দেখে না। চাকের আকৃতি প্রকৃতি দেখিলে বিশেষজ্ঞরা বুঝিতে পারে কোন্ চাকে কি ফুলের মৌ আছে।

কেদার বনের পানে তাকাইয়া অস্থির হইয়া বলিল, "কাকা কোন্ দিকে যাবে এবার? চার দিকে ত কেবল দেখি সুঁদুরে গাছের জঙ্গল। মৌচাক কই?"

বৈকুণ্ঠ হাসিয়া কহিল, "সবুর কর, মৌ খোঁজা এত সহজ নয়। এ কি গাছের ফল, যে ভারে ভারে ধরে থাকবে?"

কেদার অধীর হইয়া কহিল, "থাকলে অন্তত এক আধখানাও চোখে পড়ত!"

বৈকুণ্ঠ একটি গাছের পানে তাকাইয়া কহিল, "ওই দেখ লতাপটির ফুলের ওপর এক ঝাঁক ডাঁশ মাছি এসে বসল। ওদিকে নজর রাখিস। যেমন একটা উড়বে অমনি তার পিছু নিবি।"

কেদার কহিল, "মৌমাছি উড়ে যাবে আকাশ দিয়ে। আমাদের যেতে হবে জঙ্গলের মধ্যে। পথ পাব কোথায়?"

বৈকুণ্ঠ ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "অন্য উপায় ত নেই!"

"যদি বাঘ ঘাড়ের ওপর হাঁক করে এসে ধরে?"

বৈকুণ্ঠ তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলিল, "ধরতে পারে, তবে সে ভয় কম। তার বিটকেল গন্ধে আগেই আমরা টের পাব। তবে বেশী ফাঁকায় যাসনে, গাছের আড়ালে থাকবি। তা হলে সুবিধা করতে পারবে না।"

কেদার শুধাইল, "কুড়ুল দু'খানা সঙ্গে নেব নাকি?"

বৈকুণ্ঠ কহিল, "বাঘের কাছে ও ত নরুণ! তবু নে। হাতিয়ারবন্ধ হয়ে থাকা ভাল। আর ধামা কাটারি দুটোও নেওয়া চাই। চাকের সন্ধান পেলে কাটারিতে কেটে ধামায় ধরতে হবে।"

কেদার এর আগে বাদায় কখনো আসে নাই, বাঘও দেখে নাই। হাটে একবার একদল শিকারী দু'টা বাঁশে ঝুলাইয়া একটা মরা বাঘ দেখাইতে আনিয়াছিল কিছু রোজগারের আশায়। কিন্তু জ্যান্ত বাঘ আর মরা বাঘে অনেক তফাৎ!

বৈকুণ্ঠ এতক্ষণ ফ্যালপাটি গাছের পানেই তাকাইয়াছিল। সহসা সে বলিয়া উঠিল, "ওই দ্যাখ, দুটো ডাঁশ মাছি উড়ে চলল। দুজনে দুটোর পিছু নেব। আয়। একদিকে যায় ত ভালই।"

কেদার মৃদুস্বরে কহিল, "তোমার সঙ্গেই আমি যাব কাকা।"

বৈকুণ্ঠ হাসিয়া কহিল, "ভয় করছে নাকি রে?"

কেদারের বয়স কম। রক্ত গরম। সে বলিতে চাহিল, না। কিন্তু মুখে কোনো উত্তর জোগাইল না। সে নিরবে বন-বাদাড় ভাঙিয়া মাছির অনুসরণ করিয়া ছুটিয়া চলিল।

বৈকুণ্ঠ যাইতে যাইতে ভাবিতেছিল, পৈত্রিক বসত বাড়ি আর জমিজারাত ত এজমালী। তার ক্রমশ বয়স হইয়া আসিতেছে। আর কি সে বাদায় মৌ ভাঙিতে কাঠ কাটিতে আসিতে পারিবে? লড়্‌পেটা ছুটোছুটি করিবারও বয়স আছে। চিরদিন কি এক চালে চলিতে ভাল লাগে। এখন সে থিতাইয়া বসিতে চায়। ডোবাটাকে কাটিয়া পুকুরে পরিণত করিবে, তাহাতে ছাড়িবে হরেক রকমের মাছ, তাহার সম্বৎসরের খোরাক! চাষের জন্য জোড়া দুই বলদ ত থাকিবেই—তা' ছাড়া গোয়ালে রাখিবে গাই গরু—দুধের ভাবনা যেন ভাবিতে না হয়। সমস্ত জমি তার একটানা হওয়া চাই। ধানের ভাগ দিতে হইবে না। ভাগ বাঁটোয়ারা সে সহিতে পারে না। খেজুর গাছগুলি শিউলিকে না দিয়া নিজেই কাটিবে। গুড় যাহা হইবে সব তার পাওয়া চাই। কিন্তু কেদার? কেদার থাকিলে ত সব দু' ভাগ হইয়া যাইবে। তাহা হইলে তাহার একলার চলা কণ্টকর। তবে কেদার থাকিবেই বা কেন?

এ সব কী এলোমেলো ভাবনা? বৈকুণ্ঠ ভাবিতে চায় না। তবু যেন আপনা হইতে আসিয়া পড়ে। কেদারের বাপকে কুমীরে লইলে পাড়ার লোকে যে সন্দেহ করিয়াছিল, সেই তাহার দাদাকে সরাইয়াছে, এই মিথ্যা সন্দেহই হইয়াছে কাল। তাহারি কালি তাহাকে কালো করিতেছে দিন রাত। নিচে নামিয়া আসিতে অনবরত কানে মন্ত্রণা দিতেছে। সংসারে সকলেই এমন করিয়া থাকে। নহিলে পাড়ার লোকেই বা বলিবে কেন?

৫

কেদার তীক্ষ্ম চোখে মৌমাছিকে অনুসরণ করিয়া ছুটিতেছিল। একটু ফাঁকায় গিয়া পড়ায় বৈকুণ্ঠ স্বভাব মত সাবধান করিয়া দিল, "গাছের গা ঘেঁসে পথ চলিস কেদার!" বলিয়া ফেলিয়া কিন্তু বৈকুণ্ঠের মনে আফশোষ হইতে লাগিল। চলুক না যে দিক দিয়া পারে। তা'র তাহাতে ক্ষতি কি? কিন্তু ফুল্র মাকে সে ভয় করে। সে ত তাহারি হাতে মাতৃ-পিতৃহীন কেদারকে সঁপিয়া দিয়াছে। তাহার মনের বিন্দু-বিসর্গ পরিচয় যদি সে পায় ত কি লজ্জা। কিন্তু যদি বৈকুণ্ঠ কিছু অন্যায় করিতে চায় সে ত তাহাদের জন্যই।

হঠাৎ গভীর জঙ্গলের মধ্য হইতে কেদারের গলার স্বর শোনা গেল, "এই বড় গাছটায় মাছি বসল কাকা, আর ত তার সুলুক সন্ধান পাই না, গেল কোথায়?" ততক্ষণে বৈকুণ্ঠ সেখানে পেঁাছিয়া গিয়াছে। শিকারীরা শিকার পাইলে যেমন উৎসাহিত হয় সেইভাবে সে চেঁচাইয়া বলিল, "নিশ্চয়ই গাছের খোঁড়ে চাক আছে।"

কেদার কহিল, "গাছ ত নিরেট, খোঁড় কই?"

"তবে আগডালে ঠাওর করে দেখ্ দিকি।"

ভাল করিয়া দেখিয়া সোল্লাসে কেদার চেঁচাইয়া উঠিল, "পেইছি। ও বাবা, এযে পেল্লায় চাক "

বৈকুণ্ঠ দেখিয়া বলিল, "তাই ত! মাল আধমণের ওপর যাবে। মোমের দর আবার মৌয়ের চাইতে বেশী রে! চাক ভেঙে প্রাণ নে যদি এ বাদা থেকে ফিরতি পারি ত পায়ের ওপর পা দে কিছুদিন বসে খাব। তুই শুধু ডালপালা জোগাড় দ্যাখ, ধোঁয়া দিতি হবে!"

কেদার সোৎসাহে শুধাইল, "সে আবার কি?"

বৈকুণ্ঠ বলিল, "গাছে উঠে ধোঁয়া দিলেই মাছি উড়বে। অমনি সেই মুহূর্তে চাক কেটে দিয়ে নিচে ধামা ধরতে হবে। দু' মিনিটের মধ্যে কাজ হাঁসিল হওয়া চাই। মাছি উড়ে গিয়ে আবার বসতে পারলে আর উঠবে না। তখন চাকও কাটা যাবে না, মৌ ও ধরা হ'বে না।"

বৈকুণ্ঠ ও কেদার মিলিয়া যত শুকু কাট কুটো সব জড় করিল। তারপর ধোঁয়া দেওয়া হইলে মৌমাছি উড়িলেই চাক কাটিয়া দিয়া ধামা ধরিল।

চারিদিক ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হইতেই মচমচ করিয়া শুকু পাতার উপর অদূরে ভারী পদধ্বনি শোনা গেল। বিকট গন্ধে অন্নপ্রাসনের অন্ন যেন উঠিয়া আসিতে চাহিল।

বৈকুণ্ঠ সব ভুলিয়া আকুল হইয়া বলিয়া উঠিল, "সর্বনাশ! মৌ-চাকে ধোঁয়া দিতেই বাঘে সন্ধান পেয়েছে! ওঠ্ ওঠ্, গাছে ওঠ! মৌচাকের ধামা উপরে তুলতে হ'বে না রে! তুই নিজে ওঠ আগে, যদি বাঁচতে চাস্!" বলিয়া বৈকুণ্ঠ উঠিয়া তাহাকে এক রকম টানিয়া গাছের উপর মোটা ডালটায় তুলিয়া লইল। তাহার মনে যে হিংস্র জানোয়ারটা এতক্ষণ ঘোরাফেরা করিতেছিল, বাহিরে হিংস্রতার আবির্ভাবে ভয়ে সেও যেন গেল লুকাইয়া। ক্রমশ ধোঁয়া পরিষ্কার হইয়া গেল। অদৃশ্য পদধ্বনিও আর শোনা গেল না। কিন্তু একটা বিকট গন্ধে বনভূমি আচ্ছন্ন হইয়া থাকিল। ফুলের গন্ধ তাহাতে ঢাকা পড়িয়া গেল। হাঁড়িচাঁচা পাখী চেঁচাইয়া ডাকিতে লাগিল। বৌ কথা কও, দোয়েল, পাপিয়ার মিষ্ট স্বর আর শোনা গেল না। অনেকক্ষণ পরে, অনেক ইতস্তত করিয়া তাহারা গাছ হইতে নামিল। সূর্য তখন পশ্চিমে হেলিয়াছে। দুইজনে ধামা কাঁধে পরিশ্রান্ত পদে ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর হইয়া নৌকায় ফিরিল।

পরের দিন গেল বৃথায়। সমস্ত দিন মৌমাছির পেছন পেছন ঘুরিয়া বন-জঙ্গল হাঁটকাইয়া হয়রান হইতে হইল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত চাকের সন্ধান হইল না। বসন্তের সুন্দর বনে কত ফুল কত পাখী! কিন্তু অভাব-পীড়িত বৈকুণ্ঠের মনে সুখ নাই; সে ভাবিতেছে এই অল্প মূলধনের উপর বেশী দিন ত সে বাদায় থাকিতে পারিবে না। বড় জোর আর দুই তিনদিন। ইহা হইতে তাহাকে তুলিতে হইবে মহাজনের নৌকা ভাড়া, টাকার সুদ, লাইসেন্সের কড়ি আর খাই-খরচা! লাভের কথা ত অনেক দূরে। কেদারকে হুঁসিয়ার করিয়া দিল কেন? তাহার আফশোষ হইতে লাগিল। যদি,—তাহা হইলে ত এজমালী জমিজারাতে তাহারই একছত্র অধিকার হয়। দুঃখ অনেকটা ঘুচে, নয় কি?

কিন্তু এ সব বৈকুণ্ঠ কি ভাবিতেছে। শিহরিয়া উঠিয়া, জিভ কাটিয়া, দুই কান মলিয়া সে মনে মনে জপিতে লাগিল, ভগবান, ভগবান! তবু সেই শয়তানটা একটা হিংস্র জানোয়ারের মত তার মনের এ কোণ ও কোণ করিতে লাগিল। সে কেদারকে ডাক দিয়া, হাত পা মুখ ও কানের দু' পাশ অনেকখানি পর্যন্ত জলে ধুইয়া ফেলিয়া ঠাণ্ডা হইয়া বসিল। কেদার তখন কাকার জন্য তামাক সাজিয়া আনিল, সে দুই এক টান দিয়া বলিল, "আজত আর মৌ ভাঙা হ'ল না কেদার, দিনটা আজ বৃথায়ই গেল।"

কেদার কহিল, "চল, কাল অন্যদিকে যাই।" বৈকুণ্ঠ কহিল, "এদিকটায় তবু পথের রেখা আছে!"

কেদার বলিল, "তাই মনে হয় এদিককার চাক অন্য লোকে ভেঙেনে গেছে।"

বৈকুণ্ঠ গম্ভীর হইয়া বলিল, "জঙ্গল ভেঙে যাওয়া বড় শক্ত। দখনে হাওয়ায় জিইয়ে উঠছে কত সাপ। বাঘও ওৎপেতে আছে।"

কেদারের সাহস বাড়িয়া গিয়াছিল, সে তাচ্ছিল্যের হাসি হাসিয়া বলিল, "ও ভয়ই

যদি মনে থাকে ত বাদায় মৌ ভাঙতে এলাম কেন?"

বৈকুণ্ঠ আর উত্তর দিল না। নিঃশব্দে তামাক টানিতে লাগিল।

একদিন তাহারা উড়ো-মৌমাছি অনুসরণ করিয়া চলিল। নদীর ধার বরাবর বাঁক পার হইয়া তাহারা অনেক দূর গেল। দেখিল, জোয়ারের জল সরিয়া ভাঁটায় অনেকখানি চর জাগিয়াছে। আর তাহার উপর একদল বানর-শিশু কিচির মিচির করিয়া খেলিয়া বেড়াইতেছে। বৈকুণ্ঠ মাথা নাড়িয়া বলিল, "নিশ্চয়ই কোথাও চাক আছে।"

কেদার সোৎসুকে শুধাইল, "কি করে বুঝলে?"

বৈকুণ্ঠ গম্ভীরভাবে বলিল, "দেখছিস না বানর • ছানাগুলোকে। চারদিকে জল-ঘেরা গাঙের চড়ায় খেলা করে বেড়াচ্ছে।"

কেদার আশ্চর্য হইয়া বলিল, "তাতে কি?"

বৈকুণ্ঠ কহিল, "বেচারীদের নদীর শুকু চরে ফেলে রেখে মা'রা গেছে কাছাকাছি কোথাও মৌ খেতে। গাঙে জোয়ার আসার সঙ্গে সঙ্গেই তারা বাচ্চাদের নিতে ফিরে আসবে।"

"বাঁদররা আবার মৌ খায় না কি?"

"খায় না? খেতে খুব ভালবাসে!"

কেদার সোৎসাহে বলিয়া উঠিল, "নিশ্চয়ই মৌচাক তা'হলে কাছেই হবে!"

বৈকুণ্ঠ কহিল, "চল্ তবে খুঁজে দেখি!" বেশী দূরে যাইতে হইল না। একটি প্রাচীন পাকুড় গাছের ডালে একদল বানর ভিড় করিয়া বসিয়াছিল। পাকুড় গাছের ধোঁড়ের ভিতর যে মৌচাক ছিল তাহারা আটালো কাদা লেপিয়া তাহার মুখ বন্ধ করিয়াছে। আশে পাশে এক একটি ফুটা রাখিয়াছে, যেখান থেকে যেমনি একটি করিয়া মাছি বাহির হয় অমনি তাহাকে টিপিয়া মারিতেছে। এমনি করিয়া সব বাঁদর মিলিয়া মৌচাক ভাঙার আদ্য পর্বে লাগিয়া গিয়াছে। তাহাদের কিচির মিচির শব্দে নির্জন বনের মধ্যে লাগিয়াছে সোরগোল!

এমন সময়ে দুইজন নরের আবির্ভাবে বানর দলের মধ্যে চাঞ্চল্য জাগিল। তারপর তাহারা যখন বিচিত্র চীৎকার, ঢিল ছোঁড়া ও ক্যানেস্তার বাজনা শুরু করিল, তখন তাহাদের সরিয়া পড়িতে দেরী হইল না। মৌমাছি আর ছিল না বলিলেই হয়। গাছে উঠিয়া তাহারা ফোঁপরা গুঁড়িটা কাটিয়া লইল। কারণ তাহার মধ্যে ছিল প্রকাণ্ড মৌচাক। মৌ তিরিশ সেরের কম হইবে না। মোমের বাজার দরও ছিল বেশ চড়া। দুই খুড়া ভাইপোর এই বার কিছু লাভের আশা হইল।

রাত্রে নৌকায় করিয়া তাহারা গ্রামে ফিরিতেছে। চারদিকে নোনা জলের কল কল শব্দ—জোয়ার আসিতেছে। এতক্ষণ প্রতিকূল স্রোতে দাঁড় বাহিয়া এবং মাঝে মাঝে গুণ টানিয়া কেদার ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। আকাশে স্বল্প মেঘে ঢাকা জ্যোৎস্না নদীর জলে পড়িয়া চিক্‌চিক্ করিয়া উঠিতেছে। অন্ধকারে পারা-পার দেখা যায় না। চারিদিক জনমানব-হীন; কেদারের চোখ ঘুমে জড়াইয়া আসিতেছিল। বৈকুণ্ঠ কহিল, "তুই একটু গড়িয়ে নে কেদার, আমি ত হালে রইছি, আর দাঁড় টানার দরকার নেই। এইবার আমরা 'গন' পেইচি।"

কেদারকে আর বলিতে হইল না। সে গামছাটা তাল পাকাইয়া বালিশ করিয়া নৌকার ছইয়ের মধ্যে গিয়া শুইয়া পড়িল। কিন্তু খুব বেশী পরিশ্রম হইলে ঘুম আসে না। কেদার ঘুম-ঘোরের মধ্যে শুনিতে পাইল বৈকুণ্ঠ পাগলের মত বিড়বিড় করিয়া কি বকিতেছে। আলো অন্ধকারের অস্পষ্টতা আর ছায়ার মধ্যে সে দেখিল তামাক-কাটা দা' লইয়া সে করিতেছে হাওয়ায় আস্ফালন। অদৃশ্যে কে যেন রহিয়াছে তার বিরুদ্ধ পক্ষ, তার উপরেই যেন তার আক্রোশ-পূর্ণ আক্রমণ। কাকা কি অবশেষে পাগল হইয়া গেল? তাহার এইরূপ অস্থির ভাব সে কিছুদিন হইতেই লক্ষ্য করিতেছিল। বোধ হয় সে তন্দ্রা ঘোরে স্বপ্ন দেখিতেছে। কিন্তু না, সে যেন তার কণ্ঠনালীতে একটা শাণিত শীতল স্পর্শ অনুভব করিল। আতঙ্ক ভরে চোখ ভাল করিয়া মেলিতেই তাহার মনে হইল ছইয়ের পাতলা অন্ধকারের মধ্যে জমাট অন্ধকারের মত কে যেন গুঁড়ি মারিয়া উবু হইয়া বসিয়াছে। সে চীৎকার করিয়া 'কাকা' বলিয়া উঠিয়া বসিল। ঘুমের-মধ্যে-চলা পথিকের মত বৈকুণ্ঠ বলিল, "কিরে?"

"এখানি কি করছ তুমি?"

খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া বৈকুণ্ঠ কহিল, "তামাক খুঁজতে এইচি। এই দা'টার তলায় চাপা দেওয়া ছিল যে!"

"বাবা! আমি এত ভয় পেইচি।"

বৈকুণ্ঠ ততক্ষণে সামলাইয়া লইয়াছে। সহজ গলায় কহিল, "ভয় কি? আমি যখন সঙ্গে আছি!"

কল্কেতে তামাক সাজিয়া ফুঁ দিয়া সে আগুন ধরাইতে লাগিল। তাহার মুখ দেখাইতেছে অগ্নিবর্ণ। অন্তরের সমস্ত আগুন সে যেন কল্কের কাঠ-কয়লার আগুনে সঞ্চারিত করিতেছে।

বৈকুণ্ঠরা 'বাদা' হইতে দেশে ফিরিয়া তাহার পরের দিন সন্ধ্যায় নকড়ি বিশ্বাসের বাড়ি হাজির হইয়া হাঁকিল, "বিশ্বাস মশায়, বাড়ি আছেন নাকি?"

নকড়ি বিশ্বাস তখন ঘরে দরজা দিয়া দোতলা প্রদীপ জ্বালিয়া সুদের হিসাব কসিতেছিল। দরজা খুলিয়া সাশ্চর্যে বাহিরে আসিয়া বলিল, "কে হে, বৈকুণ্ঠ যে, বাড়ি এলে কখন?"

বৈকুণ্ঠ কহিল, "এই আজ সকালে। মাল পাইকেরকে দিলাম। নেও বিশ্বাস মশায় তোমার টাকা। পনের দিনও হয়নি, এক মাসের সুদ শুদ্ধ বুঝে নাও। টাকা দিতে আপনি ভয় পেয়েছিলে!"

নকড়ি ভাবিয়াছিল যে, বৈকুণ্ঠ আর ফিরিবে না, সুতরাং টাকা ফেরতও দিতে পারিবে না। গহনা তিনটি তাহারি হইয়া যাইবে। সেগুলি বিক্রয় করিয়া তাহার কত লাভ হইতে পারে সে অঙ্কও সে খাতার পাতায় কসিয়া রাখিয়াছিল। সমস্তই ভেস্তাইয়া দিল যে! অসতর্ক মুহূর্তে তাহার মুখ দিয়া মনের কথা বাহির হইয়া গেল, "অসময়ে উপকার করলাম তার এই ফল। টাকা ফেরত দিতে এইছিস।"

বৈকুণ্ঠ ত অবাক! কিন্তু তখনি সাম-লাইয়া লইয়া নকড়ি বিশ্বাস মুখে হাসি টানিয়া বলিল, "মনে যে বড় স্ফূর্তি! কত লাভ করলে বৈকুণ্ঠ?"

বৈকুণ্ঠ কহিল, "লাভ আর কই বিশ্বাস মশায়। টায় টোয় মজুরী পোষাল।"

নকড়ি ভাবিল, খদ্দেরটাকে হাতে রাখিতে হইবে। যে পনের দিনে টাকা ফেরত দিয়া এক মাসের সুদ দিতে চায় সে একজন ভাল দেনেওলা। তাই নকড়ি উদারতা দেখাইয়া বলিল, "পনের দিনের মধ্যেই যখন টাকাটা শোধ করলে তখন আমি তোমার কাছে এক মাসের সুদ নেই কি বলে? সেটা অধর্মের কাজ হবে হে! বিশেষ তোমার দাদা আপদে বিপদে আমাকে দেখত! তা' কিছু টাটকা মৌ আমাকে দিতে পার? কবিরাজ মশায়ের বড়ির অনুপান টাটকা খাঁটি মৌ—সে আর বাজারে মেলে কই?"

সুদ কমিয়া গেল, বৈকুণ্ঠ উৎফুল্ল হইয়া বলিল, 'নিশ্চয়ই দেব' বিশ্বাস মশায়! একেবারে চাকভাঙা টাট্কা মৌ—এখুনি বাড়ি গিয়ে কেদারের সঙ্গে পাঠিয়ে দিচ্ছি। একটা বোতলটোতল দ্যান দিনি!"

পনের দিনের সুদ সমেত টাকা ফেরত লইয়া এবং গহনাগুলি বৈকুণ্ঠের হাতে প্রত্যর্পণ করিয়া নকড়ি দড়ি বাঁধা চশমাটা চোখ হইতে খুলিল। তারপর পুরু কাঁচ দুইটি কাপড় দিয়া মুছিতে মুছিতে বলিল, "লোকের অভাবের সময় টাকা দেই, সুদ নেই। পাড়ার লোকে কত কি বলে।

বলে, বুড়ো চশমখোর সুদ খায়। কানে আসে বাবা কিছু কিছু। কিন্তু সব লোকের কথা শুনতে গেলে সংসারে চলা যায় না।"

বৈকুণ্ঠ কহিল, "তা'ত ঠিক কথা বিশ্বাস মশায়!"

নকড়ি কহিল, "এই ত তুই টাকা নিলি, ফেরতও দিলি। সময়ে একটা উপকার করা হল ত।"

বৈকুণ্ঠ ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "তা' যা কয়েছ বিশ্বাস মশায়।"

নকড়ি বলিতে লাগিল, "সাহেবরা ব্যাঙ্ক চালাচ্ছে, সেও ত এই সুদের কারবারে টাকা বাড়ানো। কই, তাদের ত' কেউ কিছু বলে না। নাম করবার মত একজন কেউ নেই। তারা হল কোম্পানী। তাই নাম করলে কারো হাঁড়ি ফাটে না।"

বৈকুণ্ঠ না বুঝিয়া বলিল, "সে কথা সত্যি।"

নকড়ি ফের বলিতে লাগিল, "পাঁচজন মিলে করলে কোনো দোষ নেই, একজন করলেই দোষ। দরকারের সময় আমার কাছে সব হাত পাতবে, আবার আড়ালে নিন্দেও করতে ছাড়বে না। সকালে নাম করবে না, পাছে বাড়ির হাঁড়ি ফেটে যায়। সবই শুনতে পাই বাবা, আমার দুটো কান সব দিকে খাড়া আছে!"

বৈকুণ্ঠ এতক্ষণে বুঝিতে পারিয়া সহাস্যে বলিল, "ও নিয়ে আপনি মিছে মন খারাপ করবেন না, বিশ্বাস মশায়।"

নকড়ি বিশ্বাস বলিল, "রাম বল! আমি ও গায়েও মাখিনে। কারো ভাল কেউ দেখতে পারে না। চোখ টাটায়। একটা লোকের দুটো টাকা থাকলে অন্য লোকের গা জ্বলে, তাকে পাঁচটা বদনাম দেবেই দেবে। কলিতে কারো ভাল করতে নেই রে বাবা!"

কথা বলার মাঝখানে নকড়ি বিশ্বাস নিশ্বাস ফেলিয়া হঠাৎ চোখ বুজিল। তার-পর চোখ খুলিয়া বলিল, "এ তাঁর টাকা, তাঁরই দেওয়া, আমি ভাণ্ডারী মাত্র।"

বৈকুণ্ঠের দাড়ি ভরা মুখে হাসি দেখা দিল। সে শিশি হাতে বাড়ির দিকে গেল।

বাড়িতে ফিরিয়া কেদার পড়িল অসুখে। বাদার যে অনিয়মিত পরিশ্রম। ছেলে মানুষ, ও রকম কষ্ট সহিতে সে অভ্যস্ত নয়। শরীরে উত্তাপ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মাথার যন্ত্রণায় কেদার ছটফট করিতে লাগিল। ফুলী তাহার শিয়রে বসিয়া কপালে জলপটি দিয়া হাওয়া করিতেছে। ক্ষান্ত পথ্য তৈয়ারীতে ব্যস্ত। আর বৈকুণ্ঠ সকাল হইতে ছুটাছুটি করিতেছে ডাঃ পরি-মল রায়ের সন্ধানে। তিনি সেবাব্রতী। গ্রামকে কেন্দ্র করিয়াই তাঁহার কাজ। শহরে সুবিধা হয় নাই বলিয়া যে তিনি গ্রামে আসিয়াছেন তাহা মনে হয় না। কেবল টাকা তাঁর জীবনের ক্ষুধা মিটাইবার পক্ষে যথেষ্ট নয়। বয়সে নবীন হইলেও তিনি পসারে প্রবীণ। পাশের গ্রাম হইতে একটা কঠিন 'কেসে' তাঁর পরামর্শ নিতে 'কল' দিয়া নৌকা করিয়া লইয়া গিয়াছে সহযোগী একজন ডাক্তার। বৈকুণ্ঠ তার দরজায় ধন্না দিয়া পড়িয়া থাকিল, কখন তিনি ফিরিবেন সেই আশায়।

ক্ষান্ত গলায় আঁচল জড়াইয়া দেয়ালস্থ পটের পানে চাহিয়া মানত করিতেছে, "দোহাই মা কালি। পরিবারে এই একটি ছেলে। তোমাকে স'পাঁচ আনার পূজো দেব। তুমি আমার কেদারকে ভাল করিয়া তোল।"

এমন সময় ডাঃ পরিমল রায় সাইকেল করিয়া, ঘণ্টা বাজাইয়া বৈকুণ্ঠের কুটিরের দরজার কাছে আসিয়া থামিলেন। তাঁর চুল রুক্ষ। পথশ্রমে চোখ মুখ বসিয়া গিয়াছে। এখনো স্নানাহার হয় নাই। বড়ই ক্লান্ত। তবুও পাশের গ্রাম হইতে ফিরিয়াই বৈকুণ্ঠের কাকুতিতে রাজি হইয়াছেন। বৈকুণ্ঠও ডাক্তারের সাইকেলের পেছন পেছন ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া পড়িল।

"এই দিকে আসুন ডাক্তারবাবু" বলিয়া সে সাইকেলের 'কেরিয়ার' হইতে যন্ত্রপাতীর ব্যাগটা খুলিয়া লইয়া বাড়ির মধ্যে অগ্রসর হইল। ডাঃ পরিমল রায়ও তাহার অনুসরণ করিলেন। বৈকুণ্ঠ পৈঠায় উঠিয়া গলা ঝাড়িল। ক্ষান্ত আঁচল টানিয়া আটচালা সংলগ্ন এক কামরায় ঢুকিয়া কৌতূহলী হইয়া ঘোমটার ফাঁক দিয়া ডাক্তার ও তাঁহার যন্ত্রপাতী দেখিতে লাগিল।

ফুলু কেদারের শিয়রে বসিয়াছিল। ডাক্তার আসিবার পর সে উঠিয়া দাঁড়াইল। পরিমল তাহাকে দাঁড়াইতে দেখিয়া বলিলেন, "বস মা, বস।" রোগীর হাত দেখিয়া, স্টেথিস্কোপ দিয়া বুক পরীক্ষা করিয়া অন্যান্য লক্ষণ কিছু দেখিয়া কিছু জিজ্ঞাসা করিয়া সিদ্ধান্তে উপনীত হই-লেন এবং আপন মনে বলিলেন, "একটু সাবধানে রাখতে হবে। ওষুধের চেয়ে শুশ্রূষার বেশী দরকার।"

উৎকণ্ঠা লইয়া বৈকুণ্ঠ শুধাইল, "বাঁচবে ত ডাক্তারবাবু!"

পরিমল রায় ম্লান হাসিয়া বলিলেন, "বাঁচা মরা ভগবানের হাত। আমাদের কাজ শুধু চেষ্টা করা।"

ক্ষান্ত আর আড়ালে থাকিতে পারিল না। সামনে আসিয়া ধরা-গলায় বলিল, "আমরা বড় গরীব ডাক্তারবাবু, তবু যা' আছে সব তোমায় দেব। তুমি ছেলেটাকে বাঁচিয়ে দেও।"

ডাঃ পরিমল রায় কেদারকে আর একবার পরীক্ষা করিতেছিলেন, তিনি শুধু বলি-লেন, "আমি চেষ্টার ত্রুটি করব না।" তার-পর প্রেসকৃপসন্ লিখিয়া বৈকুণ্ঠের হাতে দিয়া বলিলেন, "আমার ডাক্তারখানা থেকে বিকেল বেলা নিয়ে এসে এক দাগ ওষুধ আজই খাইয়ে দিও।"

জলে হাতটা ধুইয়া, বাহিরে আসিয়া যাবার জন্য তৈয়ারী হইতেছেন, এমন সময় ভিতর হইতে বৈকুণ্ঠ আসিয়া দুইটি টাকা তাঁহার হাতে দিতে গেল।

পরিমলবাবু মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "তোমার কাছে ভিজিট নেব। না বৈকুণ্ঠ। শুধু যখন ওষুধ নিয়ে আসবে তখন তার দাম দিও।"

বৈকুণ্ঠ ইতস্তত করিয়া শুধাইল, "আমা-দের কাছে না নিলে তোমার চলবে কি করে ডাক্তারবাবু!"

পরিমল রায় তেমনিভাবে বলিলেন, "তা হোক, যিনি চালাবার মালিক তিনি চালিয়ে দেবেন। তুমি ওই দিয়ে ওষুধ পথ্যি কর!"

বৈকুণ্ঠের চোখে জল আসিল। সে বলিল, "বলে, পাপ না হ'লে রোগ হয় না! আমার মনে পাপ আছে তাই কেদারের এই রোগ হ'ল। জরিমানা না দিলে প্রাচিত্তির হবে কি করে ডাক্তারবাবু?"

পরিমলবাবু কোনো উত্তর দিলেন না। শুধু মৃদু হাসিলেন। বৈকুণ্ঠ কাপড়ের খুঁট দিয়া ঝাপসা চোখ পরিষ্কার করিয়া দেখিল ডাক্তারবাবু সাইকেলে গ্রাম পথের বাঁকে অদৃশ্য হইয়া যাইতেছেন।

কেদারের ভিতর যে জীবনীশক্তি আছে তাহা তাহাকে যত সুস্থ করিয়া তুলিতে লাগিল বৈকুণ্ঠ হইয়া উঠিতে লাগিল ততই উদ্বিগ্ন। সে তাহার বিবেকের কাছে খাঁটি থাকিতে পারিবে অথচ কেদার রূপ বাধা তাহার সাংসারিক সুবিধার পথ হইতে আপনা হইতে সরিয়া যাইবে, কাহারো কাছে স্বীকার করা দূরে থাক নিজের মনের কাছে স্বীকার করিতেও তাহার আপত্তি ছিল: অথচ অন্তরের অন্তঃস্থলে এমনি একটি আশা জাগিয়াছিল। কেদারের সুস্থ হইয়া ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তাহা দূর হইতে লাগিল। তাহার মনে জাগিতে লাগিল দ্বিধা দ্বন্দ্ব,—সুরাসুরের সংগ্রাম। এত বড় অসুখটা বৃথায়ই হইল, কেবল তাহারই কষ্টার্জিত অর্থ খরচ করিতে। ক্ষান্তর মলিন মুখ, ফুলীর কান্না, কেদারের জ্বর-পীড়িত শীর্ণ মূর্তি তাহাকে বড় ডাক্তারের শরণাপন্ন করিয়াছিল। নিজের অন্তরের অনেকখানি তাহার রুগ্ন ভ্রাতুষ্পুত্রের জন্য যে সেদিন আকুল হইয়া উঠিয়াছিল আজ সে কথা মনে হইল না। আজ মনে হইল

ডাক্তার যে তাহাকে সারাইয়া তুলিতে পারিবে সে ভয় সেদিন করে নাই। তাই এত আগ্রহে তাহাকে ডাকিতে ছুটিয়াছিল। কেদার বিনা চিকিৎসায় মরিলে পাড়া প্রতিবেশী কি বলিবে এই ছিল তার চিন্তা। কিন্তু নিজেকে কি সে ঠিকমত চিনিতে পারিয়াছে? বৈকুণ্ঠের স্বার্থ-মূঢ় মনে আজ তাহার উত্তর মিলিল না। কেদারকে সে-ই নিজে চেষ্টা করিয়া সযত্নে বাঁচাইয়া তুলিয়াছে, আবার তাহার ভাল হইয়া ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সেই তাহার মৃত্যু কামনা করিতেছে। রুগ্ন অবস্থায় যে পাইল সহানুভূতি, সুস্থ হইলেই তাহার প্রতি জাগিল ঈর্ষা আর হিংসা! একই সময় যুগপৎ বিভিন্ন পথগামী নিজের মনের উন্মাদ মূর্তিকে আজ বৈকুণ্ঠ চিনিতে পারিল না। সে কিংকর্তব্যবিমূঢ়ভাবে নিজের কান মলিয়া বলিতে লাগিল, ভগবান রক্ষা কর!

সেদিন দুপুরে মাচার উপর কাৎ হইয়া শুইয়া কেদার একটি বাঙলা বই পড়িতেছিল। ডাঃ পরিমল রায় সেটা উপহার দিয়াছিলেন। তাহার মতে শরীরকে সুস্থ করিয়া তুলিতে হইলে মনকেও খুশি রাখা দরকার।

ফুলু এক বাটি দুধ-সাবু গরম করিয়া নিয়া আসিয়া বলিল, "লক্ষ্মী ছেলের মত এই গরম দুধটুকু খেয়ে ফেল ত চট করে।"

কেদার বিরক্ত হইয়া বইটা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া বলিল, "রোজ রোজ কেবল দুধ-সাবু খেতে আমি পারি নে ফুলু। আমাকে মাছের ঝোল দিয়ে ভাত দিচ্ছ কবে?"

"ফুলু হাসিয়া বলিল, আগে ভাল হ'য়ে ওঠ ত দাদা, মাছের ঝোল ভাত এত আছে পৃথিবীতে যে তুমি খেয়ে ফুরুতে পারবে না।"

এবার কেদার রাগ করিয়া বলিয়া উঠিল, "মিথ্যে কথায় আর ভুলছিনে। কবে আমাকে ঝোল ভাত দিচ্ছ জানতে না পারলে দুধ আমি আর খাব না। নিয়ে যাও।"

ক্ষান্ত হেঁসেল ঘরে রান্না করিতেছিল। ফুলু বাটি হাতে করিয়া তাহার কাছে গিয়া বলিল, দেখ ত মা, দুধ-সাবু খেতে চাচ্ছে না দাদা। বায়না নিয়েছে ঝোল-ভাত খাব বলে।"

ক্ষান্ত রান্নাঘর হইতে ঘরে আসিয়া হাসিয়া বলিল, "আজকে খেয়ে নাও বাবা, কালকে আমি ডাক্তারবাবুকে জিগেস করে আসতে বলব, কবে তিনি ঝোল-ভাত দেবেন।"

কেদার অসহিষ্ণু হইয়া বলিল, "রোজ তোমাদের ওই এক কথা।" এমন সময় বৈকুণ্ঠ হাল কাঁধে করিয়া গরু তাড়াইয়া খামার হইতে ঘরে ফিরিল। শুধাইল "কি নিয়ে কথা হচ্ছে তোমাদের?"

ফুলু নালিস জানাইল, "দেখ ত বাবা এখনো অসুখ ভাল করে সারল না, দুধ-সাবু নিয়ে এলাম ত দাদা বলছে ঝোল-ভাত না দিলে দুধ খাব না।"

প্রখর রোদে অনেকক্ষণ কাজ করিয়া বৈকুণ্ঠের মনের উত্তাপ প্রশমিত হইয়াছিল। সে পাগলের মত ছুটিয়া আসিয়া ব্যাকুল কণ্ঠে শুধাইল, "খায় নি ত এখনো?"

"না।"

"দেত আমায়।" বলিয়া বৈকুণ্ঠ ফুলুর হাত হইতে দুধ-সাবুর বাটি ছোঁ মারিয়া লইয়া আস্তাকুড়ে নিক্ষেপ করিল। পুষিটা দাওয়া হইতে নামিয়া গিয়া তাহা চাটিয়া খাইতে লাগিল।

বাপের অদ্ভুত ব্যবহারে ফুলু সাশ্চর্যে শুধাইল, "অতটা দুধ-সাবু নষ্ট করলে বাবা।"

সে কথার উত্তর না দিয়া পুষির দুধ খাওয়া দেখিতে দেখিতে অন্যমনস্কভাবে বৈকুণ্ঠ কহিল, "দেখি মাছের চেষ্টা। জাল গাছটা চালা থেকে পেড়ে দেত ক্ষান্ত!"

ক্ষান্ত পৈঠায় দাঁড়াইয়া চাল হইতে জাল পাড়িয়া দিতে দিতে বলিল, "আবার এই দুপুর রোদে ছুটলে কোথায়? তামাক খেলে না?"

বৈকুণ্ঠ যাইতে যাইতে বলিল, "ভিতরের খানাটায় দু'এক ক্ষেপ বেয়ে দেখি, সিঙী মাগুর যদি কিছু পাই।"

বাড়ি ফিরিতেই ফুলী বলিল, "বাবা আমাদের পুষিটা মরে গেল। এতক্ষণ মুখে জল দিয়ে মাথায় হাওয়া করে কত চেষ্টা করলাম। বাঁচল না।"

মাছের খারাটা নামাইয়া রাখিয়া, জালগাছ উঠানে মেলিয়া দিতে দিতে বৈকুণ্ঠ শিহরিয়া উঠিয়া বলিল, "যাক্, আপদ গেছে!"

প্রতীক্ষা

রথীন্দ্রকান্ত ঘটক চৌধুরী

আজকের কলংকিত ধূসর পল্লীর দৃশ্যপটে
জীবন স্পন্দিত বহু দিবসের মৌন স্বপ্ন জাগে ঃ
সংসার মুখর করে প্রাত্যহিক কর্মচঞ্চলতা,
গোয়ালায় গরু বাঁধা, শস্যক্ষেত্রে শ্যাম সমারোহ,
ছনে ঢাকা ঘরগুলি জড়ায়ে ধরেছে লাউগাছ,
প্রাণের সবুজ অর্থ রূপ পায় সমস্ত সংসারে ঃ
ব্যাধি মহামারী নেই—সুস্থতার সরল ইসারা
দেহেরে জড়ায়ে যেন পরিস্ফুট শক্তির দীপ্তিতে।

আজকে মন্থর তার প্রাণস্পন্দ কর্মচঞ্চলতা,
খাঁ খাঁ করে অসহায় নগ্নতায় সমস্ত সংসার,
ভিটে মাটি মরুভূমি, কংকালের হাড়ে হাড়ে যেন
সুচিহ্নিত মরণের স্পষ্ট অর্থ কঠিন ভাষায়;
শিথিল বাহুর শক্তি, নিষ্পন্দিত কর্মের জোয়ার ঃ
ধূসর পাংশুটে ম্লান আজ সে পল্লীর দৃশ্যপট।
আজ যেন অসহায় প্রশ্ন নিয়ে রিক্ত মরুভূমি
উর্বর দিনের তরে শ্বাসরুদ্ধ প্রতীক্ষায় আছে।

তিলাঞ্জলি

সুবোধ ঘোষ

(১৬)

—এত রোগা হয়ে যাচ্ছ কেন তোমরা? হেসে হেসে কথাটা আরম্ভ করলেও অবনী শেষ পর্যন্ত গম্ভীর হয়ে গেল। একটা পালকের চামর দিয়ে দেয়ালের ফটো আর ছবির কাঁচের ধুলো পরিষ্কার করছিল অরুণা। অবনীর প্রশ্নের উত্তরে কোন কথা না বলে, একটু স্থির হয়ে অবনীর দিকে একবার তাকালো মাত্র।

অবনী আবার বললো।—বিশেষ করে তুমিই দেখছি সবার ওপর টেক্কা দিয়ে রোগা হয়ে চলেছ।

অরুণা চকিতে অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে আবার কাজে মন দিল। তবু অবনীর দেখতে ভুল হয়নি, কাজের ছলে অরুণা যেন তার মুখের ওপর নিবিড় লজ্জার একটা শিহর আড়াল করে নিল। অবনী মুগ্ধ হয়ে দেখছিল, অরুণার কানের দুলটা কাঁপছে, যেন তার আরক্ত কপোলের কিছুটা নেশার ছোঁয়া এসে লেগেছে—সেই সঙ্গে এক সঙ্গোপনের বার্তা ইসারা দিয়ে ফুটে উঠেছে।

অবনী ডাকলো।—অরুণা।

অরুণা।—কি?

অবনী।—উত্তর দিচ্ছ না কেন অরুণা?

অরুণা যেন সহজ হবার ছল করে উত্তর দিল।—কি বলবো বল? শুধু আমিই কি রোগা হয়েছি? দেখছো না, পিসিমা কেমন শুকিয়ে গেছেন, আর জোছুও কেমন একটু কাহিল হয়ে পড়েছে? আর মশাই নিজে কী হয়েছেন, আয়নাতে একবার দেখে নিন্।

অবনী হাসলো।—আমরা তো অভাবে রোগা হচ্ছি।

অরুণা।—আর আমি বুঝি......।

অবনী।—তুমি ভাবে রোগা হয়ে যাচ্ছ।

অরুণা আবার মুখ ঘুরিয়ে নিজের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। কিছুক্ষণ স্তব্ধতার পর অরুণা একটু আক্ষেপের সুরে বললো। —কিন্তু পিসিমা সত্যি বড় মুসড়ে পড়েছেন!

ক্ষণিকের জন্য অবনীর মনের প্রসন্নতা নিঃশেষে মুছে গেল। অসহায়ের মত তাকিয়েছিল অবনী। নিজের অজ্ঞাতসারেই একটা দুর্বলতায় বিব্রত আবেদন কাতর হয়ে বেজে উঠলো।—পিসিমার যেন কোন কষ্ট না হয় অরুণা, তাহ'লে বড় লজ্জার ব্যাপার হবে।

কাজ থামিয়ে অবনীর দিকে তাকিয়ে হেসে হেসে একটু অনুযোগের সুরেই অরুণা বললো।—তার জন্যে তুমি চিন্তা করো না।

অবনী বললো।—কিন্তু, কিন্তু চিন্তা না করে যে পারছি না। চিন্তা করার জন্যই যে এখনও পৃথিবীর সবার মধ্যে তোমাদেরই শুধু বেছে রেখেছি। সবার মতই যদি তোমাদের ভাবতে পারতাম, তবে সত্যিই নিশ্চিন্ত ও মুক্ত হতে পারতাম আমি। অনশনে বাঁকারামের মত কত শত প্রাণ শেষ হয়ে গেল, সে দুঃখ বেশ তো সয়ে যাচ্ছি। তাই ব'লে কি তোমরাও একে একে...... কিন্তু এ শাস্তি যে আমি সইতে পারবো না। এত শক্তি আমার নেই। এত দম্ভও আমার নেই। মোট কথা আমি সইতে পারবো না অরুণা। বাঁকারামের প্রাণের জন্য স্যালাইনের দাম দিতে দ্বিধা করেছি; তাই কি তুমি বলতে চাও, তোমরাও একে একে রোগা হয়ে শুকিয়ে আর কাহিল হয়ে আমার চোখের ওপর শেষ হয়ে যাবে? তুমি বলতে চাও, তোমাদের বাঁচাবার জন্য চুরি ডাকাতি করবো না? মনে করেছ, কোন দাম দিতে দ্বিধা করবো আমি?

একটা স্বপ্নে-দেখা আতঙ্কের দিকে তাকিয়ে যেন প্রলাপ বকে চলেছিল অবনী। চোখ দুটো উত্তেজনায় অস্বাভাবিক রকমের বড় হয়ে উঠছিল। অরুণা ভয় পেয়ে এগিয়ে এসে অবনীর মুখ চেপে ধরলো। —ছি ছি, বড় জ্বালাচ্ছো অবন। ভাল কথা বলতে বলতে আবার কী সব আবোল-তাবোল বকতে আরম্ভ করলে। এ-সব কথা যে এখন আমায় শুনতে নেই, তুমি কি বুঝছো না কিছু?

উত্তেজনার ভাবটা কেটে গিয়ে একটু আশ্বস্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে অবনী লজ্জিত হয়ে পড়লো।—ব্যাপার এমন কিছু নয় অরুণা। আমারই ওপর পরীক্ষাটা যেন একটু কঠোর হয়ে দেখা দিল। তাই বলছিলাম।

একটু চুপ করে থেকে অবনী বললো।—দেশের লোককে ভালবাসি, জীবনে মরণে ও সংগ্রামে তাদের সঙ্গে সমান হয়ে থাকতে একটা আনন্দ আছে। কংগ্রেসের দুটো কথার সম্মান যদি রাখতে পারি, একটা তৃপ্তি পাই। এর চেয়ে বড় কথা কখনও বলিনি। ধরো, মিথ্যে করেই বলেছি। এর চেয়ে অনেক বড় মিথ্যে বলে কত লোক সেরে যায়। কিন্তু আমাকে সারতে দিল না।

অরুণা—মিছিমিছি বড় বেশি ভাবছো তুমি।

অবনী—ভাবতে চাইনি, তবু ভাববার সুযোগ চলে এল। ভাবতে পারিনি, এই ক্ষুধাহত মৃত্যুর অভিশাপ ফুটপাত থেকে আমার ঘরেও এসে ঢুকবে। এভাবে ভাগ্য মিলাতে চাইনি তাদের সঙ্গে। তবু তাই হতে চললো। সবার সঙ্গে এবার আমরা সত্যি সত্যি সমান হ'তে চললাম অরুণা। শুধু এইটুকু দুঃখ হচ্ছে, একে সৌভাগ্য বলে মেনে নেবার মত শক্তি পাচ্ছি না।

অবনী উঠে ঘরের ভেতর একবার পাইচারী করে নিল। এক গেলাস জল খেয়ে নিয়ে সুদীর্ঘ একটা নিশ্বাস ছেড়ে যেন মনের সব ভার দূরে সরিয়ে দিল।—চাকরী একটা করতেই হবে। পেয়েও যাব বোধ হয়। শুধু ভয় হচ্ছে, এরই মধ্যে যদি...........।

অবনীর কথায় অরুণা একটু উৎফুল্ল হয়ে আবার হাতের কাজ খুঁজে ফিরছিল। কিন্তু পরক্ষণেই অবনীর আর একটা মন্তব্যে বিরক্ত হয়ে প্রতিবাদ করার জন্য এগিয়ে এলো অরুণা।

অবনী বলছিলো—জোছুই ঠিক বুঝেছে।

অরুণা—কি?

অবনী—জোছু বুঝেছে যে, আমি বোধ হয় তোমাদের বাঁচাতে পারবো না। তাই আগেভাগেই একটা ব্যবস্থা করে ফেলেছে জোছু।

অরুণা সরোষে আপত্তি করলো—ব্যবস্থা করলেই হয়। পাঁচশো মাইল দূরে কোন বিভূঁয়ে মাস্টারগিরি না করলেও চলবে। তুমি যেন জোছনুর কথায় রাজী হয়ো না।

অবনী—রাজী হয়ে গেছি। ওর কাজের চিঠি এসে গেছে। শুধু তাই নয়, আজই রওনা হতে হবে।

স্তম্ভিতের মত কিছুক্ষণ নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থেকে অরুণা একটু অভিমান করেই বলে উঠলো—জোছনু আমাকে কিছু বললে না কেন?

অবনী—আর ওর ওপর বৃথা রাগ করো না। তোমাকে বোঝাবার ভার আমার ওপর ছেড়ে দিয়েছে জোছনু।

দুর্ভেদ্য একটা হতাশ্বাসের কুয়াসার ভেতর যেন পথ খুঁজে খুঁজে এলোমেলো-ভাবে অরুণা উত্তর দিল।—কিন্তু আমি যে ইন্দ্রকে তাড়াতাড়ি একবার দেখা করতে আবার চিঠি দিয়েছি। জোছনু চাকরী নিয়ে মোরাদাবাদ চলে যেতে চাইছে, সেকথাও লিখেছি। এইবার ইন্দ্র না এসে পারবে না। না, জোছনুর যাওয়া হতে পারে না। জোছনু চলে গেলে......।

মাত্রাহীন তিক্ততায় অসংযত হয়ে অবনীর আপত্তি বেজে উঠলো—তুমি জেদ করে বার বার একটা ভুল করে চলেছ অরুণা। ইন্দ্র আসবে না।

অবনীর ধমকে পরাভব মেনে নিয়েই অবসন্নের মত অরুণা বললো—সত্যি আসবে না ইন্দ্র?

অবনী—না। আসবার হলে তোমাকে দু'বার চিঠি লিখতে হতো না। তুমি বার বার ইন্দ্রকে চিঠি লিখে আমাদের অপমান করার সুযোগ দিয়েছ।

শিখায়িত ঘৃণার মত অবনীর দু'চোখে দুটি নিষ্কম্প দৃষ্টি জ্বলছিল। ঘরের ভেতর কিছুক্ষণ ছট্‌ফট্‌ করে ঘুরে বেড়ালো অবনী। অরুণা একেবারে চুপ করে গেল। একটু শান্ত হবার পর অবনী বললো—ইন্দ্র তো এখন আর দেশের মানুষ নয়, সে এখন পার্টির মানুষ। তোমাদের কোন চিঠির ভাষা সে আজ বুঝতে পারবে না। সে-ভাষা ভুলে গেছে ইন্দ্র। ইন্দ্রের যে কী ভয়ংকর উন্নতি হয়েছে অরুণা, সেটা জান না বলেই তুমি ভুল করে তাকে আসতে লিখেছ।

অরুণা—সত্যিই ভুল হয়েছে আমার। কিন্তু এতে কী লাভ হবে ইন্দ্রের?

অবনী—তোমাদের মনুষ্যত্বকে অপমান করলে ইন্দ্রের নতুন মনুষ্যত্ব লাভ হবে। পার্টির গৌরব হয়ে উঠবে ইন্দ্র। সে কি কম লাভ?

কথা বলতে বলতে অবনী চাদরটা কাঁধে তুললো, কতকগুলি কাগজপত্র পকেটে নিল, তারপর দরজার দিকে এগিয়ে যেতেই অরুণা ডাক দিয়ে বললো—পয়সা-টয়সা না নিয়েই যে চললে?

অবনী—দরকার নেই। ট্রামে চড়া ছেড়ে দিয়েছি, আজকাল হাঁটতেই ভাল লাগে।

অবনীর যুক্তিতে কর্ণপাত করার কোন দরকার ছিল না অরুণার। কৌট থেকে একটা টাকা বের করে অবনীর পকেটে ফেলে দিয়ে ফিরে এল অরুণা।

ধীরে ধীরে জোছনুর ঘরে এসে দাঁড়ালো অরুণা। একটা স্যুটকেশে কাপড়-চোপড় গুছিয়ে রাখছিল জোছনু। জোছনু একটু অপ্রস্তুত হয়ে গেলেও হেসে জিজ্ঞাসা করলো—কি বৌদি?

মেজের ওপর একটা ছেঁড়া চিঠির স্তূপের দিকে তাকিয়ে সন্ত্রস্তভাবে অরুণা একটা চাপা আর্তনাদ করে উঠলো—এ কী করেছ জোছনু! এ যে ইন্দ্রনাথের চিঠি!

জোছনু—যা উচিত, তাই করেছি। বড় পুরণো হয়ে গেছে চিঠিগুলি।

অরুণা।—এই কি উচিত ছিল?

জোছনু—ইন্দ্রদা যদি তোমাদের সবাইকে অপমান করতে পারে, তবে আমিও তাকে একটু অপমান করতে পারি না কি?

অরুণা—কিছুই বুঝতে পারছি না জোছনু।

জোছনু হেসে ফেলে অরুণাকে হাত ধরে বসালো।—তুমি আমাকে কেন বুঝতে পার না বৌদি?

অরুণা।—তোমার কাছে ইন্দ্র একেবারে মিথ্যে হয়ে গেছে, একথা আমায় বিশ্বাস করতে বল?

জোছনু—বেহায়ার মত একটা কথা বলবো, কিছু মনে করবে না তো বৌদি?

অরুণা—না।

জোছনু—শিশিরবাবু যখন ছিলেন, তখন আমার সত্যিই ভুল হয়েছিল। অনেক দিন আগেই ইন্দ্রদাকে আমি অপমান করে দিয়েছি বৌদি।

দু'হাত দিয়ে চোখ ঢাকতে যাচ্ছিল জোছনু। অরুণা জোছনুর হাতটা সান্ত্বনার ছলে চেপে ধরলো, কিন্তু বলবার মত কোন ভাষা খুঁজে পেল না।

কিছুক্ষণ স্তব্ধতার পর জোছনু অরুণার হাত ছাড়িয়ে আবার বইগুলি গোছাতে আরম্ভ করলো। অরুণা তখনো গম্ভীর হয়ে আছে দেখে জোছনু হেসে হেসে বললো—আমি বেশ আছি বৌদি, বেশ থাকবোও। আর কোন ভুল আমার মধ্যে নেই। সব দিক থেকে ছাড়া পেয়ে গেছি।

অরুণা তবু চুপ করেছিল। জোছনু বললো—তোমাদেরও ছেড়ে চললাম।

অরুণার চোখ দুটো ঝাপসা হয়ে আসছিল। জোছনুর দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে ধরা গলায় বললো—তুমি আমার ওপর রাগ করলে না তো জোছনু।

প্রচ্ছন্ন মার্জনার মত একটা অস্পষ্ট সুরে কথাগুলি যেন জড়িয়েছিল। জোছনু এসে অরুণাকে হাত ধরে টেনে ওঠালো—এবার আমি সত্যিই রাগ করবো বৌদি। ওঠ, একটু সাহায্য কর আমাকে। সাড়ীগুলি ভাঁজ করি এস।

দুপুর পর্যন্ত সারা বাড়ির হৃদয়টা ঘরে ঘরে ভাগ হয়ে যেন ভিন্ন ভিন্ন অভিমানে গুমরে রইল। জোছনুর বাক্স গোছানো তখনো সারা হয়নি। কী-ই বা এত গোছাবার আছে? বাড়ি-ভরা শব্দের মূর্চ্ছা তাই মাঝে মাঝে খুট্‌খাট্‌ করে চমকে ওঠে। পাখী যেন সুযোগ বুঝে চুপিসাড়ে পায়ের শিকলি ঠুকরে ভাঙছে। অন্য ঘরে বসে অরুণা শুনতে পায়। শব্দটা বড় অকৃতজ্ঞ হয়ে অরুণার কানে এসে বিঁধতে থাকে।

মালা জপেও স্বস্তি পাচ্ছিলেন না পিসিমা। থেকে থেকে এক একবার বাইরের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াচ্ছিলেন।

সেলাই নিয়ে বসেছিল অরুণা। হেঁসেলের কাজ দিন দিন যত ক্ষীণ হয়ে এসেছে, অন্য কাজের পরিধি বেড়ে গেছে তত। আজকাল শিল-নোড়ার শব্দ ক্বচিৎ শোনা যায়, কয়লা ভাঙার শব্দ মাঝে মাঝে হয়—উনুনের ধোঁয়া শুধু একটি বেলা ধুঁইয়ে ওঠে। তাই কলতলায় জলের শব্দটা এত প্রচণ্ড হয়ে বাজে, সারা গৃহস্থালীর রিক্ততাকে যেন ধরা পড়িয়ে দেয়।

তাই দিন দিন তক্‌তকে ঝরঝরে হয়ে উঠছে বাড়িটা। দরজা জানলার পর্দাগুলি এত পরিষ্কার কোনদিন ছিল না, আজকাল দুদিন অন্তর সাবান-কাচা করে অরুণা। ঘরের মেজে চকচক করে—প্রতিদিনই ঘসা-মাজা হয়। বাড়িটা যেন দিন দিন সুন্দর হয়ে নিতান্ত চক্ষুলজ্জায় একটি নিদারুণ দৈন্যকে ভাল করে লুকিয়ে ফেলতে চায়।

সেলাই শেষ করে আবার কাজ খুঁজছিল অরুণা। অবনী ফিরলো, হাতে একটা পোঁটলা, নানা রকম ফল বাঁধা।

ঘরে ঢুকেই ব্যস্তভাবে চেঁচিয়ে ডাকলো অবনী।—আপনার জন্য ফল এনেছি পিসিমা!

পিসিমা এসে সামনে দাঁড়ালেন। একটু শুষ্কভাবে হেসে বললেন।—এসব কী ছেলেমানুষি করছিস অবু? এত ফল কী হবে?

অবনী—এত আবার কী দেখলেন পিসিমা? সামান্য ক'টা ফল, কী-ই বা দাম! নানা কাজে ভুলে যাই, নইলে রোজই আনতে পারি।

পিসিমা—না না অবু, না রে বাবা, এসব কিছু আমার চাই না।

পিসিমা যেন সন্দিগ্ধভাবে কথাগুলি শেষ করে, একটু শঙ্কিত হয়ে, ফলগুলির দিকে ভ্রূক্ষেপ না করেই চলে গেলেন

পরক্ষণেই একটু উত্তেজিতভাবে ফিরে এলেন পিসিমা।—জোছুকে নাকি চাকরী করতে পাঠাচ্ছিস্ অবু ?

অবনী।—হ্যাঁ পিসিমা।

পিসিমা—একা যাবে জোছু ?

অবনী।—হ্যাঁ।

পিসিমা।—তা হবে না, আমি সঙ্গে যাব।

অবনী।—এখনি কেন যেতে চাইছেন পিসিমা ? প্রথম চাকরী, নতুন জায়গা—জোছু একটু গুছিয়ে গাছিয়ে সুস্থ হয়ে বসুক, তারপর না হয় যেদিন খুসী আপনাকে পাঠিয়ে দিতে......।

পিসিমা।—এত বড় মেয়েকে কোন্ আক্কেলে একা বিদেশে ছেড়ে দিচ্ছিস্ অবু ?

পিসিমার উষ্মায় অপ্রতিভ হয়ে পড়লো অবনী। পিসিমাকে বোঝাবার মত কোন যুক্তি আর স্মরণে আসছিল না, তাই একটু বিস্মিত হলেও চুপ করে রইল।

পিসিমা তখুনি সুর নরম করে বললেন।—*আমার আর কিসের দুঃখ বল্ ? দিব্যি সুখে রয়েছি আমি। আমার জন্যে কি-না করছিস্ তোরা। আমার কোন্ দুঃখটা! কিন্তু জোছুকে একা যেতে দিতে মন মানছে না আমার।*

স্পষ্ট করে উত্তর দিতে গিয়েই একটু কঠোর হয়ে শোনালো অবনীর কথাগুলি।—না পিসিমা, এখন আপনি যাবেন না।

পিসিমা।—কেন ?

অবনী।—এখন গেলে দুজনেই দুজনকে নিয়ে অসুবিধায় পড়বেন। নতুন জায়গা, জোছু গিয়েই তো সব জানাবে। তারপর সুবিধে বুঝে আপনারও সেখানে চলে যেতে কতক্ষণ ? একটু বুঝে দেখুন পিসিমা।

পিসিমা।—সব বুঝেছি অবু। আমি জোছুর সঙ্গে যাব।

মুহূর্তের মধ্যে পিসিমার এত রুষ্ট দৃঢ়তার সুর গলে গিয়ে কাতর ছেলেমানুষী আব্দারের মত তরল হয়ে উঠলো।

অবনী তবু বললো।—না, এখন হয় না পিসিমা।

পিসিমা নিঃশব্দে অন্য ঘরে চলে গেলেন। ফলের পোঁটলাটা সস্তা ঘুসের মত ব্যর্থ হয়ে পড়েছিল মেজের ওপর। অবনী ক্রমেই বিমর্ষ হয়ে পড়ছিল।

ফলের পোঁটলাটা তুলে রেখে অরুণা বল্লো।—ওঠ এখন, এখন ভাববার সময় নয়। স্নান সেরে এস।

সমস্ত বাড়িটাকে আরও নিঝুম করে দিয়ে বিকেল পর্যন্ত অঘোরে ঘুমিয়ে রইল অবনী। বার বার ওঠাতে এসে অরুণা ফিরে গেছে। জাগাবার জন্য গায়ে ঠেলা দিতে হাত তুলেও একটা মমতার সঙ্কোচে হাত গুটিয়ে নিয়েছে অরুণা। কিন্তু বিকেলের আলো ফুরিয়ে আসছে, সন্ধ্যা নামতে দেরী নেই, তারপরেই জোছুকে ট্রেন ধরতে হবে।

শেষ পর্যন্ত নিজেই জেগে উঠে বসলো অবনী। অরুণা বললো।—জোছুর যাবার সময় হলো।

অবনী।—হাঁ, মনে আছে।

অবনীর মুখের দিকে তাকিয়ে তাড়াতাড়ি চলে যাচ্ছিল অরুণা। অবনীর চোখ দুটো লাল হয়ে ফুলে রয়েছে; এই আহত অসহায় দৃষ্টির ছোঁয়া থেকে আত্মরক্ষার জন্য যেন নিজেকে একটু শক্ত করে অরুণা সরে পড়ছিল।

অবনী ডাকলো।—আমাকেও কি স্টেশনে যেতে হবে ?

অরুণা।—এর মানে ? তুমি না গেলে কে যাবে ?

অবনী নির্বোধের মত তাকিয়ে হাসবার চেষ্টা করলো।—শেষ পর্যন্ত জোছুকে আবার আমার পাল্লায় পড়ে স্টেশন থেকে ফিরে আসতে না হয়।

অরুণা একটু কড়া করে উত্তর দিতে গিয়েও পারলো না। সান্ত্বনার সুরে বললো।—এরকম করছো কেন তুমি ? কিছু হবে না, কিছু ভেব না।

অবনী তবু চুপ করে বসেছিল। অরুণা এইবার অনুযোগ করে বললো।—তুমি এভাবে লুকিয়ে রয়েছ কেন ? ওঠ, জোছুর সঙ্গে দুটো কথা বল। আর সময় নেই।

—হ্যাঁ, ঠিক বলেছ। অবনী ফূর্তির সঙ্গে একটা লাফ দিয়ে উঠে চেঁচিয়ে ডাকতে লাগলো।—জোছু, কি করছিস্ ? তৈরী হয়ে নে, আর সময় নেই।

জোছু এসে দরজার কাছে দাঁড়ালো। অবনী যেন অন্যদিকে তাকিয়ে অনুমানে জোছুর ছায়াটাকে দেখে নিল।

আল্না থেকে খপ করে আলোয়ানটা তুলে নিয়ে অবনী বললো,—এটা সঙ্গে রাখ্ জোছু, মোরাদাবাদে যা শীত!

অরুণার ইসারা চোখে পড়তেই কোন আপত্তি না করে আলোয়ানটা হাতে তুলে নিল জোছু।

অরুণা বললো।—এইবার রওনা হয়ে যাও। আর দেরী করো না।

নিথর অভিমানের মূর্তির মত পিসিমা এসে দাঁড়ালেন। জোছু প্রণাম করতেই সংক্ষেপে আশীর্বাদ সারলেন,—ভাল থেকো।

জোছু ডাকলো।—দাদা।

অবনী।—কি ?

জোছু।—সুযোগ বুঝে পালিয়ে যাচ্ছি দাদা।

অবনী।—তা, কি আর করবি বল্ ? আগে প্রাণটা বাঁচাতে হবে তো ? যেরকম অবস্থা দাঁড়াচ্ছে......।

কান্নার চেয়েও করুণ হয়ে জোছুর মুখের হাসিটা যেন প্রচ্ছন্ন একটা গঞ্জনায় আর্দ্র হয়ে উঠলো।—তুমি তাই বিশ্বাস করলে তো দাদা ?

জোছুর মুখের দিকে চকিতে একবার তাকিয়ে, আপন রূঢ়তায় লাঞ্ছিত হয়ে অবনী যেন চেঁচিয়ে উঠলো।—আবোল তাবোল বকিস্ না জোছু। বিরক্ত করিস্ না। তোর কাছে ফিলসফি শুনতে চাই না আমি। চল্, আর সময় নেই।

(ক্রমশঃ)

খেলাধুলা

বাঙলা দল রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার ফাইন্যালে

বাঙলা ক্রিকেট দল রণজি ক্রিকেট প্রতি-যোগিতার ফাইন্যালে উন্নীত হইয়াছে। বাঙলা দল এইবার লইয়া তিনবার ফাইন্যালে উঠিবার যোগ্যতা লাভ করিল। ১৯৩৬-৩৭ সালে বাঙলা দল সর্বপ্রথম ফাইন্যালে উঠে ও নবনগরের দলের নিকট পরাজিত হয়। ১৯৩৮-৩৯ সালে পুনরায় বাঙলা দল ফাইন্যালে উঠিয়া দক্ষিণ পাঞ্জাব দলকে পরাজিত করিয়া রণজি ক্রিকেট কাপ বিজয়ীর সম্মান লাভ করে। [illegible] বৎসর পরে পুনরায় বাঙলা দল ফাইন্যালে উঠিল—ইহা খুবই আনন্দের বিষয়।

ফাইন্যালে বাঙলা দলকে কোন্ দলের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে হইবে, তাহা এখনও বলা যায় না। কারণ, উত্তরাঞ্চলের ফাইন্যাল খেলা এখনও শেষ হয় নাই। এই খেলায় দক্ষিণ পাঞ্জাব ও উত্তর ভারত দল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবে। এই দুই দলের বিজয়ীর সহিত পশ্চিম ভারত রাজ্য দলের সেমি-ফাইন্যালের খেলা হইবে। উত্তরাঞ্চলের ফাইন্যাল খেলা বাঙলা বনাম মাদ্রাজ দলের খেলার সহিতই শেষ হইবার কথা ছিল। হঠাৎ যেদিন খেলাটি আরম্ভ হইবে, সেদিন মাঠের অবস্থা প্রকৃতিদেবীর চঞ্চলতার জন্য খারাপ হইয়া পড়ায় খেলা স্থগিত রাখিতে বাধ্য হইতে হয়। যতদূর মনে হয়, এই সপ্তাহের শেষভাগ হইতেই উক্ত খেলাটি আরম্ভ হইবে।

রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার অবশিষ্ট যে তিনটি দল বর্তমান আছে, তাহাদের প্রত্যেকটিই খুব শক্তিশালী। ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, বাঙলা দল এই পর্যন্ত যে কয়েকটি দলের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিল, তাহার একটিও এই তিনটি দলের সমকক্ষ হইবার যোগ্য নহে। সুতরাং ফাইন্যালে উক্ত তিনটি দলের মধ্যে যে কোন দলই ফাইন্যালে উন্নীত হউক না কেন, বাঙলা দলকে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে হইবে। এমন কি, জয়লাভ করিতে হইলে বর্তমান দলের কিছু অদলবদল করিবার প্রয়োজন আছে। দলের এখনও ব্যাটস্‌ম্যানের অভাব আছে। কোন অভিজ্ঞ ক্রিকেট খেলোয়াড়কে এই বিষয়ের জন্য দলভুক্ত করিলে খুবই ভাল করিবেন। ইহাতে ব্যাটিংয়ের শক্তিও বৃদ্ধি পাইবে ও দল পরিচালনাও ভাল হইবে। চরুণ মহারাজা যেভাবে দল পরিচালনা করিতে-ছেন, তাহার খুব প্রশংসা করা যায় না। বহু ত্রুটি-বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হইয়াছে। বাঙলা দলের কপাল নেহাৎ ভাল, তাই এই সকল ত্রুটি-বিচ্যুতি দলকে এই পর্যন্ত পরাজয়ের সম্মুখীন করে নাই।

সেমি-ফাইন্যালে বাঙলা দলকে মাদ্রাজ দলের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে হয়। এই খেলাটি চারিদিনব্যাপী হইবে বলিয়া স্থির ছিল, কিন্তু পূর্ণ চারিদিন এই খেলার মীমাংসার জন্য প্রয়োজন হয় নাই। চতুর্থ দিনের মধ্যাহ্ন ভোজের পূর্বেই খেলাটি শেষ হয় ও বাঙলা দল ১৩৪ রানে বিজয়ী হয়। রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার সেমি-ফাইন্যালে এই পর্যন্ত বাঙলা দলকে তিনবার মাদ্রাজ দলের সহিত মিলিত হইতে হইয়াছে। সর্বপ্রথম ১৯৩৫-৩৬ সালে বাঙলা দল মাদ্রাজ দলের সহিত সেমি-ফাইন্যালে মিলিত হয় ও পরাজয় বরণ করে। ইহার পর ১৯৩৮-৩৯ সালে পুনরায় সেমি-ফাইন্যালে মাদ্রাজ দলের বিরুদ্ধে বাঙলা দল খেলিয়া মাদ্রাজ দলকে শোচনীয়ভাবে এক ইনিংস ও ২৮৫ রানে পরাজিত করিতে সক্ষম হয়। সেই খেলাটিও কলিকাতার ইডেন উদ্যানে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। সুতরাং এই বৎসর পুনরায় মাদ্রাজ দলের সহিত সেমি-ফাইন্যালে মিলিত হইয়া পূর্ব অর্জিত গৌরব অক্ষুন্ন রাখিতে পারিল—ইহা সুখের বিষয়।

বাঙলা ও মাদ্রাজ দলের সেমি-ফাইন্যাল খেলাটি খুব উচ্চাঙ্গের হয় নাই। উভয় দলেরই বোলারগণ ব্যাটস্‌ম্যানদের উপর প্রাধান্য প্রকাশ করিয়াছেন। একমাত্র বাঙলা দলের নির্মল চ্যাটার্জি বাঙলার দ্বিতীয় ইনিংসে ১১২ রান করিয়া ব্যাটিংয়ে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। তবে তিনি উক্ত রান করিতে কয়েকবার আউট করিবার সুযোগ দিয়াছিলেন। ইহার পর মাদ্রাজ দলের দ্বিতীয় ইনিংসে এম জে গোপালন্ ও রিচার্ডসনের খেলার খুব প্রশংসা করিতে হয়। দলের পাঁচ পাঁচজন খেলোয়াড় আউট হইয়া গিয়াছেন, দলের শোচনীয় পরাজয় অবশ্যম্ভাবী—এইরূপ সময় ইঁহারা দুইজনে একত্রে খেলিয়া ১৩০ রান সংগ্রহ করেন। ইহাদের খেলা এতই জমিয়া উঠে যে, বাঙলার সমর্থকগণ পর্যন্ত জয়লাভের আশা ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। কিন্তু ইহাদের দুইজন পর পর আউট হইয়া যে পতন সূচনা করেন, তাহাই বাঙলা দলকে জয়লাভে সাহায্য করে। বোলারদের মধ্যে মাদ্রাজ দলের রাম সিং ও রঙ্গচারী এবং বাঙলা দলের কে ভট্টাচার্য ও এস ব্যানার্জির প্রশংসা করিতে হয়। ইহাদের মধ্যে রাম সিংয়ের কৃতিত্বই সর্বাপেক্ষা উল্লেখ-যোগ্য। কারণ, তিনি একাই বাঙলার প্রত্যেক ইনিংসের খেলায় ৭টি করিয়া উইকেট দখল করিয়াছেন। ফিল্ডিং বিষয়ে মাদ্রাজ দলের রিচার্ডসন ও বাঙলা দলের এস্, মুস্তাফ প্রশংসার উপযুক্ত। ইহাদের পরেই মাদ্রাজ দলের রঙ্গচারীর নাম করা যাইতে পারে।

খেলার বিবরণ

বাঙলা দল প্রথম ব্যাটিং গ্রহণ করে ও ২৩৫ রানে ইনিংস শেষ করে। এ জব্বর ও কে ভট্টাচার্য ব্যতীত অপর কেহই ব্যাটিংয়ে সুবিধা করিতে পারেন নাই। পরে মাদ্রাজ দল খেলা আরম্ভ করিয়া মাত্র ১০২ রানে প্রথম ইনিংস শেষ করে। এস ব্যানার্জি ও বিমল মিত্রের বোলিং এই পরিণাম সৃষ্টি করিতে বাঙলা দলকে বিশেষভাবে সাহায্য করে। বাঙলা দল প্রথম ইনিংসে ১৩৩ রানে অগ্রগামী থাকিয়া দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে। এই ইনিংসে নির্মল চ্যাটার্জি ১১২ রান করেন। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও বাঙলা দলের দ্বিতীয় ইনিংস ২৬৬ রানে শেষ হয়। ফলে মাদ্রাজ দল ৩৯৯ রান পশ্চাতে পড়িয়া দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে। ১১৭ রানে ৫টি উইকেট হারায়। তখন সকলেই আশা করেন, মাদ্রাজ দলের ইনিংস ১৫০ মধ্যেই শেষ হইবে। কিন্তু এম জে গোপালন ও রিচার্ডসন একত্রে খেলিয়া ২৪৭ রান সংগ্রহ করিলে বাঙলার সমর্থকগণ চিন্তিত হইয়া পড়েন। বাঙলার ভাগ্য ভাল; ইহার পরে মাদ্রাজ দলের পতন আরম্ভ হয় ও অপর সকল খেলোয়াড় ২৬৫ রানের মধ্যেই আউট হইয়া যান। ফলে বাঙলা দল খেলায় ১৩৪ রানে বিজয়ী হয়।

খেলার ফলাফল

বাঙলা দলের প্রথম ইনিংস—২৩৫ রান (এ জব্বর ৮০, কে ভট্টাচার্য ৬৭; রাম সিং ১০৪ রানে ৭টি, রঙ্গচারী ৬১ রানে ৩টি উইকেট পান)

মাদ্রাজ দলের প্রথম ইনিংস—১০২ রান (রাম সিং ৩৬, ভদ্রদ্রী ২৩; বিমল মিত্র ২৩ রানে ৩টি ও এস ব্যানার্জি ২৭ রানে ৫টি উইকেট পান)

বাঙলা দলের দ্বিতীয় ইনিংস—২৬৬ রান (নির্মল চ্যাটার্জি ১১২, অসিত চ্যাটার্জি ৫৩, জব্বর ২৩, মণ্টু সেন ২০, ধ্রুব দাস ২০; রঙ্গচারী ৬৬ রানে ২টি ও রাম সিং ৯০ রানে ৭টি উইকেট পান)

মাদ্রাজ দলের দ্বিতীয় ইনিংস—২৬৫ রান (এম জে গোপালন ৭৬, এফ রিচার্ডসন ৬২, সি, কৃষ্ণস্বামী ৩২, বি ভদ্রদ্রী ৩২; কে ভট্টাচার্য ৮৩ রানে ৭টি, এস ব্যানার্জি ৫২ রানে ২টি ও বিমল মিত্র ৫৮ রানে ১টি উইকেট পান

পুস্তক পরিচয়

বিজ্ঞান ও বিশ্বজগৎ—অধ্যাপক শ্রীপ্রিয়দারঞ্জন রায়। বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা।

"দেহরক্ষার প্রেরণায় যে জীবধর্ম তার উপরেও রয়েছে মানুষের আর একটি ধর্ম, যাকে কবি বলেছেন, মানুষের ধর্ম, যার প্রেরণায় মানুষ খোঁজে বিজ্ঞান ব্রহ্মের সত্যের, আনন্দের ও অমৃতের পথ। তার জ্ঞানের পিপাসা ও সত্য জিজ্ঞাসা জেগে ওঠে এই মানুষ ধর্মের প্রয়োজনে।" এই ভূমিকার অবতারণা করে গ্রন্থকার তাঁর গ্রন্থ আরম্ভ করেছেন। অনুসন্ধিৎসু পাঠকের পক্ষে ইংরেজী না জানিলে বিশ্বের অন্তিম স্বরূপ বা বাস্তবের রূপ সম্বন্ধে বিজ্ঞানীর মোটামুটি ধারণা কি, তা জানবার কোনই উপায় নাই। বর্তমান পুস্তিকাখানি সাধারণের পক্ষে এদিক থেকে বিশেষ মূল্যবান হবে সন্দেহ নেই।

গ্রন্থকার নিজে বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক এবং বিশ্বজগতের মূলে প্রাকৃতিক যে নিয়ম বর্তমান বলে বৈজ্ঞানিক বিশ্বাস করেন, সহজ সরল ভাষায় তিনি ব্যক্ত করেছেন। 'বিজ্ঞানকে আর জড়বাদী বলা চলে না, একথা তিনি সার্থকতার সঙ্গে প্রমাণ করেছেন। বিজ্ঞানের জটিল সূত্র গুলি সহজবোধ্য ভাষায় বাঙালী পাঠক সমাজের গোচর করা অত্যন্ত কঠিন কাজ, সুখের বিষয় অধ্যাপক রায়ের এ চেষ্টা সর্বতোভাবে সার্থক হয়েছে।

মাতৃভাষায় বিজ্ঞান আলোচনা যাঁরা ভালবাসেন তাঁরা এ পুস্তিকা পাঠে আনন্দিত হবেন এবং সাধারণ পাঠক সমাজ উপকৃত হবেন, ইহাই আমাদের বিশ্বাস।

সাহিত্য-সংবাদ

শ্রীমৎ রসিকমোহন সম্বর্দ্ধনা

বিগত ৭ই ফেব্রুয়ারী বেলা ৯ ঘটিকায় ২৫ বাগবাজার স্ট্রীটে, সিঁথি বৈষ্ণব সম্মিলনীর উদ্যোগে পূজ্যপাদ বৈষ্ণবাচার্য শ্রীমৎ রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ মহোদয়ের পঞ্চোত্তর শততম

জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। উক্ত অধিবেশনে স্যার যদুনাথ সরকার সভাপতির আসন অলংকৃত করেন। পণ্ডিতপ্রবর শ্রীঅশোকনাথ শাস্ত্রী মহোদয় কর্তৃক মঙ্গলাচরণের পর যাঁহারা শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করেন তন্মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য রবিবাসরের পক্ষ হইতে শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু, বাটিরা পারিজাত সমাজের পক্ষ হইতে শ্রীব্যোমকেশ নন্দী, মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র কলেজের পক্ষ হইতে ডাঃ শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী, গিরিশ সঙ্ঘের পক্ষ হইতে শ্রীভূতনাথ মুখোপাধ্যায়, সিঁথি বৈষ্ণব সম্মিলনীর পক্ষ হইতে কবি শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ভাদুড়ী, অবসরপ্রাপ্ত দায়রা বিচারপতি শ্রীজ্যোতিপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূতপূর্ব বঙ্গবন্ধু ও ইন্দিরা সম্পাদক শ্রীবরেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায়। যাঁহাদের বাণী পঠিত হয় তন্মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য, প্রবর্তক সঙ্ঘগুরু শ্রীমৎ মতিলাল রায়, পণ্ডিতপ্রবর শ্রীবসন্তরঞ্জন বিদ্বদ্বল্লভ, দীপালী সঙ্ঘ অধিনায়ক শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় কাব্যরত্নাকর, ভারতবর্ষ সম্পাদক শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, কবি শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, কবি শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক, কবি শ্রীকালিদাস রায় কবিশেখর, রায় বাহাদুর শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র, ডাঃ নলিনীমোহন সান্ন্যাল ভাষাতত্ত্বরত্ন, রাজা শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ দেব রায় মহাশয়, অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ রায় বাহাদুর হেমচন্দ্র দে, গৌরপ্রেমসুধাসিন্ধু শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ ভক্তিভূষণ প্রভৃতি। সভাপতি মহাশয় বৈষ্ণবাচার্যের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করিয়া তাঁহার পাণ্ডিত্যপূর্ণ অভিভাষণে বলেন যে, মহাত্মা শিশিরকুমারের সহিত সহযোগিতা করিয়া সুদীর্ঘকাল পণ্ডিতপ্রবর রসিকমোহন বিশ্ব-সভ্যতায় বাঙালীর বিশিষ্ট দান যে বৈষ্ণব ভাবধারা অক্লান্তভাবে অমর লেখনী চালনে ধীরভাবে দিয়া আসিতেছেন ও বাঙালীর খাঁটি অবদান শিক্ষিত সমাজে অক্লান্তভাবে প্রচার করিয়া আসিতেছেন তাহা ভুলিলে জাতির অকৃতজ্ঞতার পরিচয় ঘটিবে। বঙ্গ সাহিত্যে তাঁহার অবদান অতুলনীয় ও বৈষ্ণব সমাজে ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পুষ্টিকল্পে তাঁহার সেবা চিরস্মরণীয়। বিদ্যাভূষণ মহাশয় বৈষ্ণবোচিত বিনয় সহ সংক্ষিপ্ত প্রত্যভিভাষণে সকলকে মুগ্ধ করেন।

কৃষ্ণনগর সাহিত্য সংগীতি

কৃষ্ণনগর সাহিত্য সংগীতির উদ্যোগে সংগীত ও প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা এবার মার্চের শেষ-সপ্তাহে অনুষ্ঠিত হইতেছে। ১২ হইতে ২০ বৎসর বয়স্ক ছাত্রছাত্রীরা যোগ দিতে পারিবে। সংগীতের তিনটি বিভাগ; যে-কোনও হিন্দুস্থানী সংগীত, যে-কোনও বাঙলা সংগীত ও যন্ত্রসংগীত। একাধিক বিষয়ে যোগদান চলিবে।

প্রবন্ধের বিষয়ঃ—রন্ধন ও নারী (ছাত্রীদের) ও বাঙলার শিশুসাহিত্য (ছাত্রছাত্রীদের)। প্রবন্ধের প্রবেশ-শুল্ক নাই। ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্যে আবেদন নিম্ন ঠিকানায় করিতে হইবে। পদক পুরস্কারাদির ব্যবস্থা যথোচিত আছে। পরিচালক—"কৃষ্ণনগর সাহিত্য সংগীতি", পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলা নদীয়া।

নিখিল বঙ্গ প্রবন্ধ-প্রতিযোগিতা

চাতরা শ্রীরামকৃষ্ণ অরুণ সংঘের উদ্যোগে একটি বন্ধ-প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। প্রতিযোগিতাটি বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। প্রবন্ধ ছাত্র ও ছাত্রীর নিজস্ব রচনা,—এ বিষয়ে বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষের স্বাক্ষরিত মন্তব্য থাকা চাই। প্রতিযোগিতার বিষয়—"বাঙলার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ"। প্রবন্ধটি বাঙলা ভাষায় অনধিক এক হাজার শব্দে হওয়া বাঞ্ছনীয় এবং উহা আগামী ২৫শে ফেব্রুয়ারীর মধ্যে নিম্ন ঠিকানায় পৌঁছানো আবশ্যক। ১ম, ২য় ও ৩য় পুরস্কার যথাক্রমে ১২৲, ৮৲ ও ৫৲ টাকা মূল্যের বই। চাতরা ভক্তাশ্রম, শ্রীরামপুর, হুগলী। শ্রীগুরুদাস দাশ, সম্পাদক, শ্রীরামকৃষ্ণ অরুণ সংঘ।

১৬ই ফেব্রুয়ারী

মার্কিন ও নিউজীল্যান্ড সৈন্যরা সলোমনের গ্রীণ দ্বীপপুঞ্জ দখল করিয়াছে। গ্রীণ দ্বীপপুঞ্জ দখল সম্পর্কে মত প্রকাশ করিয়া জেনারেল ম্যাক আর্থার ঘোষণা করেন যে, যুদ্ধ ও সমর নীতির প্রয়োজনের দিক হইতে সলোমন অভিযান এবার সম্পূর্ণ হইল। সলোমনে জাপানীদের অবশিষ্ট ২২ হাজার সৈন্য মিত্রপক্ষের আক্রমণে এবার বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। ইহাদের অধিকাংশই বুগেনভিল দ্বীপে রহিয়াছে। জেনারেল ম্যাক আর্থার বলেন যে, সলোমনে জাপানীরা পার্শ্বদেশ হইতে আক্রান্ত হইয়াছে। তাহাদের অবস্থা নৈরাশ্যজনক।

আরাকান রণাঙ্গন হইতে জনৈক ভারতীয় সমর পর্যবেক্ষক জানাইয়াছেন যে, ১০ দিন পূর্বে যে ৮ হাজার জাপ সৈন্য নাফ নদী পার হইয়া ভারতবর্ষের দিকে আসিবার জন্য তাউং বাজার হইতে অভিযান শুরু করিয়াছিল, তাহাদের অর্ধেকের কিছু বেশী সৈন্য এখন নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য যুদ্ধ করিতেছে। বর্তমান আরাকান অভিযানে জাপানীদের ইহাই বৃহত্তম পাল্টা আক্রমণ। শত্রু পক্ষের অন্ততঃ ৬০০ সৈন্য নিহত এবং ১০০০ সৈন্য আহত হইয়াছে।

কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে রেলওয়ে বাজেট পেশ করিয়া যানবাহন বিভাগের সচিব স্যার এডওয়ার্ড বেন্থল ঘোষণা করেন যে, ১৯৪৪ সালের ১লা এপ্রিল হইতে রেলযাত্রীর ভাড়া শতকরা ২৫৲ টাকা বাড়িবে। কেবল শহরতলীর সিজন টিকিটের দাম বাড়িবে না। স্যার এডওয়ার্ড বেন্থল বলেন যে, ভাড়া বৃদ্ধির ফলে ১০ কোটি টাকা অতিরিক্ত আয় হইবে। সংশোধিত হিসাবে দেখা যায়, ১৯৪৩-৪৪ সালে ৪৩ কোটি ৭৭ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হইবে এবং ১৯৪৪-৪৫ সালে উদ্বৃত্ত হইবে ৫২ কোটি ২১ লক্ষ টাকা।

১৭ই ফেব্রুয়ারী

মার্কিন সমর বিভাগ হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, মিত্রপক্ষীয় একখানা সৈন্যবাহী জাহাজ আমেরিকান সৈন্যগণকে লইয়া আসার কালে ইউরোপীয় দরিয়ায় নিমজ্জিত হইয়াছে। এক হাজার সৈন্য উদ্ধার করা হইয়াছে এবং এক হাজার সৈন্য নিখোঁজ হইয়াছে। নিশাকালে শত্রু আক্রমণের ফলেই এ বিপদ ঘটিয়াছে।

মস্কোর সংবাদে প্রকাশ, লালফৌজ জার্মানদের দুইটি সুরক্ষিত ঘাঁটি নার্ভা ও স্কফের দ্বারদেশে পৌঁছিয়াছে।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় বঙ্গীয় নিঃস্ব সাহায্য বিলের আলোচনা প্রসঙ্গে রাজস্ব সচিব শ্রীযুত তারকনাথ মুখার্জি জানান যে, ১৯৪৩ সালের অক্টোবর হইতে ১৯৪৪ সালের জানুয়ারী পর্যন্ত কলিকাতা হইতে মোট ৪৩,৫০০ জন ও অন্যান্য শহর হইতে ২০,০০০ জন নিঃস্ব ব্যক্তিকে সংগ্রহ করা হইয়াছে। সংশোধিত আকারে বিলটি সভায় গৃহীত হয়।

ভারতের বড়লাট লর্ড ওয়াভেল কেন্দ্রীয় ও রাষ্ট্রীয় পরিষদের যুক্ত অধিবেশনে তাঁহার প্রথম বক্তৃতায় বলেন যে, আটক নেতৃবৃন্দের তরফ হইতে সহযোগিতার ইচ্ছা প্রকাশ না পাইলে তাঁহাদের মুক্তি দাবী একেবারেই নিরর্থক।

১৮ই ফেব্রুয়ারী

জাপ ইম্পিরিয়াল হেড কোয়ার্টার্স হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, প্রশান্ত মহাসাগরে জাপানের বৃহৎ নৌঘাঁটি ত্রুক দ্বীপে মিত্রপক্ষ ও জাপানীদের মধ্যে তুমুল লড়াই চলিতেছে। ত্রুক ইয়াকোহোমো হইতে দুই হাজার মাইলেরও কম দূরে অবস্থিত। ইস্তাহারে আরও বলা হইয়াছে যে, বিমানবাহী জাহাজ হইতে প্রতিপক্ষের শক্তিশালী বিমানবহর পুনঃপুন জাপ ঘাঁটিতে আক্রমণ চালাইতেছে।

মার্শাল স্ট্যালিন এক বিশেষ ঘোষণায় জানাইতেছেন যে, কানিয়েভ বেষ্টনীতে জার্মান সৈন্য বাহিনী নিশ্চিহ্ন করা হইয়াছে। ৫২ হাজার জার্মান নিহত ও ১১ হাজার জার্মান বন্দী হইয়াছে। আজ জার্মান সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান জানাইয়াছেন যে, জার্মানগণ স্টারায়ারাশা ত্যাগ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। লেনিনগ্রাদের দক্ষিণে স্টারায়ারাশা জার্মানদের অন্যতম প্রধান ঘাঁটি ছিল।

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে এক প্রশ্নের উত্তরে প্রধান মন্ত্রী স্যার নাজিমুদ্দীন স্বীকার করেন যে, মেদিনীপুর জেলায় কাঁথি ও তমলুক মহকুমায় ১৯৪২ সালের আগস্ট, সেপ্টেম্বর, অক্টোবর, নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে অধিবাসীদের বহুসংখ্যক কাঁচা ও পাকা গৃহ ভস্মীভূত করা হইয়াছে। স্যার নাজিমুদ্দীন এতৎসম্পর্কে পরিষদে এক বিবৃতি দাখিল করেন; উহাতে দেখান হয় যে, এই দুই মহকুমায় ঘূর্ণিবাত্যার পূর্বে ও পরবর্তী সময়ে মোট ১৯৩টি কংগ্রেস ক্যাম্প (শিবির) ও গৃহ সরকারী বাহিনী কর্তৃক ভস্মীভূত হইয়াছিল এবং ৮১টি সরকারী ও বে-সরকারী ইমারত কংগ্রেস কর্তৃক এবং ৩টি কংগ্রেস শিবির ও গৃহ গ্রামবাসিগণ কর্তৃক ভস্মীভূত হইয়াছিল।

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে অর্থসচিব শ্রীযুক্ত তুলসীচন্দ্র গোস্বামী বাঙলা গভর্ণমেণ্টের ১৯৪৪-৪৫ সালের বাজেট পেশ করেন। আগামী বৎসরে গভর্ণমেণ্টের রাজস্ব বাবদ আয়ের পরিমাণ ধরা হইয়াছে ২১ কোটি ৯৭ লক্ষ টাকা এবং ব্যয়ের পরিমাণ ৩০ কোটি ৪৩ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ মোট ঘাটতি দাঁড়াইবে ৮ কোটি ৪৬ লক্ষ টাকা। চলতি বৎসরের সংশোধিত হিসাবে দেখা যায়, রাজস্ব বাবদ ২১ কোটি ৩৪ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় ৩২ কোটি ৫৪ লক্ষ টাকা। মোট ঘাটতি দাঁড়াইয়াছে ১১ কোটি ২০ লক্ষ টাকা। ১৯৪৩-৪৪ ও ১৯৪৪-৪৫ এই দুই বৎসরে গভর্নমেণ্টের মোট ঘাটতি প্রায় ২০ কোটি টাকা হইবে। অর্থসচিব বলেন যে, তিনি গত দুই বৎসর অপেক্ষা অতিরিক্ত ১০ কোটি টাকা আয় করিতে পারিবেন। কিন্তু উহা বাজেটে ধরা হয় নাই।

তিনি আরও বলেন, ইতিমধ্যে যে কর বৃদ্ধি করা হইয়াছে বা নূতন কর ধার্যের প্রস্তাব হইয়াছে, এই বৎসরেই তাহা ছাড়া আরও কর ধার্য করার প্রয়োজন হইতে পারে।

অদ্য রাষ্ট্রীয় পরিষদে মিঃ কুমারশঙ্কর রায় চৌধুরী ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র রচনার জন্য ব্যবস্থা অবলম্বনের অনুরোধসূচক যে প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন, উহা বিনা ডিভিসনে অগ্রাহ্য হইয়াছে।

১৯শে ফেব্রুয়ারী

সোভিয়েট বাহিনী স্টারায়ারাশা ও সিমস্ক পুনরধিকার করিয়াছে।

অদ্য শেষ রাত্রে জার্মানরা লণ্ডনে বিমান হানা দিয়া ব্যাপকভাবে আগুন লাগাইবার চেষ্টা করে। ১৯৪০-৪১ সালের পর এত বড় হানা আর লণ্ডনে হয় নাই।

২০শে ফেব্রুয়ারী

আরাকান রণাঙ্গনে গত ৪৮ ঘণ্টাকালের যুদ্ধে মিত্র বাহিনীর বিরামহীন প্রবল আক্রমণ ও ক্রমবর্ধমান চাপের ফলে প্রধান জাপ বাহিনীর যোগাযোগ ছিন্ন হইয়া পড়িবার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে; নাগাক-জেদাউক গিরি সঙ্কটের পূর্ব-নির্গমন পথে প্রধান জাপ সৈন্যদল এখনও কতকগুলি ঘাঁটি অধিকার করিয়া আছে।

আলজিয়ার্সের সংবাদে প্রকাশ, আনজিওর সমুদ্রতীরবর্তী অঞ্চলে মিত্র বাহিনীর অবস্থার উন্নতি হইয়াছে বলিয়া সরকারীভাবে ঘোষিত হইয়াছে। আনজিওর সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চলে মিত্রবাহিনীর অবস্থার উন্নতি হইয়াছে বলিয়া সরকারীভাবে ঘোষিত হইয়াছে। আনজিওর সমুদ্রতীরবর্তী অঞ্চলে জার্মানদের মোট অগ্রগতি তিন হাজার গজেরও কম হইয়াছে। আনজিওর রাস্তার সংগ্রামে ৬টি জার্মান ডিভিসন নিয়োজিত করা হইয়াছে এবং জার্মানগণ তিন দিন রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পর যেটুকু অগ্রসর হইয়াছিল, তাহার একাংশ হইতে তাহাদিগকে বিতাড়িত করা হইয়াছে। পঞ্চম আর্মির প্রধান রণাঙ্গনে জার্মানগণ কাসিনো রেলওয়ে স্টেশন হইতে মিত্র বাহিনীকে বিতাড়িত করার জন্য ৪ বার পাল্টা আক্রমণ চালাইয়া ব্যর্থমনোরথ হইয়াছে।

সোভিয়েট ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, দ্বিতীয় ইউক্রেন রণাঙ্গনে করসান-সেভেস-কভস্কি অঞ্চলে ধ্বংসপ্রাপ্ত জার্মান বাহিনীর যে ৫৫ হাজার সৈন্যের মৃতদেহ রণক্ষেত্রে পড়িয়া থাকে, তন্মধ্যে পরিবেষ্টিত জার্মান বাহিনীর অধিনায়ক জেনারেল স্টেমারম্যানের মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে। সোভিয়েট হাই কম্যান্ড বিরাট পস্কেভ যুদ্ধে এক সম্পূর্ণ নূতন আর্মি নিয়োজিত করিয়াছেন। স্টারায়ারাশার পতনের ফলে নিষ্কণ্টক হইয়া ইলমেন হ্রদের দক্ষিণে অবস্থিত এই আর্মি জেনারেল খভোরভ এবং জেনারেল টস্কভের আর্মির সহিত একত্রে পস্কোভ অভিমুখে ধাবিত হইয়াছে।

২১শে ফেব্রুয়ারী

মার্কিন নৌবিভাগের এক ইস্তাহারে প্রকাশ, ত্রুকে ১৯ খানি জাপানী জাহাজ নিমজ্জিত ও ২০১ খানি জাপানী বিমান ধ্বংস হইয়াছে।

ইতালীতে আনজিও এলাকার যুদ্ধে মিত্রপক্ষের ট্যাঙ্কবহর পাল্টা আক্রমণ চালাইয়া জার্মান অবস্থান ভেদ করিয়াছে।

"দেশ"-এর নিয়মাবলী

বার্ষিক মূল্য—১০৲
ষাণ্মাসিক—৫৲

বিজ্ঞাপনের নিয়ম

"দেশ" পত্রিকায় বিজ্ঞাপনের হার সাধারণত নিম্নলিখিতরূপঃ—

সাধারণ পৃষ্ঠা

		১ বৎসর টাকা	এক সংখ্যার জন্য টাকা
পূর্ণ পৃষ্ঠা	...	৪৫৲	৫৫৲
অর্ধ পৃষ্ঠা	...	২৪৲	২৮৲
প্রতি ইঞ্চি	...	২৷৷৹	৩৲

প্রবন্ধাদি সম্বন্ধে নূতন নিয়ম

পাঠক, গ্রাহক ও অনুগ্রাহকবর্গের নিকট হইতে প্রাপ্ত উপযুক্ত প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা ইত্যাদি সাদরে গৃহীত হয়।

প্রবন্ধাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় কালিতে লিখিবেন। কোন প্রবন্ধের সহিত ছবি দিতে হইলে অনুগ্রহপূর্ব্বক ছবি সঙ্গে পাঠাইবেন অথবা ছবি কোথায় পাওয়া যাইবে জানাইবেন।

সম্পাদক—"দেশ"
১নং বর্ম্মণ স্ট্রীট, কলিকাতা।

সম্পাদকঃ শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন   সহকারী সম্পাদকঃ শ্রীসাগরময় ঘোষ

১১ বর্ষ]   শনিবার, ২০শে ফাল্গুন, ১৩৫০ সাল।   Saturday, 4th March, 1944   [১৭শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

শহর ও মফঃস্বল

ভারত গভর্নমেণ্টের খাদ্য-বিভাগের সেক্রেটারী সম্প্রতি বাঙলাদেশ পরিদর্শন করিয়া গিয়াছেন। কলিকাতা শহরের রেশনিংয়ের চাউলের নিকৃষ্টতার বিষয়ে যে সব অভিযোগ উত্থাপিত হইয়াছে, তাহার উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন, সব দোকান হইতে একই ধরণের চাউল সরবরাহ করা হয় না, ইহা ঠিক। ভারত গভর্নমেণ্টের খাদ্য এবং অসামরিক সরবরাহ বিভাগের ডিরেক্টার জেনারেল মিঃ বি আর সেন সেদিন রাষ্ট্রীয় পরিষদে বলিয়াছেন যে, কলিকাতার রেশনিংয়ে চাউলের সম্বন্ধে যে সব অভিযোগ উত্থাপিত হইয়াছে, তাহা তিনি সঙ্গত বলিয়া মনে করেন না অর্থাৎ তাঁহার মতে, এখানে রেশনিংয়ে ভাল চাউলই সরবরাহ করা হইতেছে। ভারত গভর্নমেণ্টের এই দুই জন কর্মচারীই কলিকাতা রেশনিংয়ের সম্বন্ধে যে উক্তি করিয়াছেন, আমাদের মতে তাহার কোনটিই প্রকৃত তথ্যের দ্বারা সমর্থিত নয়; প্রথমত বরাদ্দ-প্রথায় একই ধরনের চাউল সরবরাহ করা হইতেছে না, জনসাধারণের এ সম্বন্ধে আপত্তি নয়; তাঁহাদের আপত্তি এই যে, নিকৃষ্ট ধরণের চাউল অনেকক্ষেত্রে সরবরাহ করা হইতেছে। মিঃ বি আর সেন চাউল সম্পর্কিত অভিযোগ একেবারে অস্বীকার করিতে চাহিয়াছেন; কিন্তু মিঃ সেন কি মনে করেন যে, বাঙলাদেশের সমস্ত সংবাদপত্র একবাক্যে যে সম্বন্ধে অভিযোগ করিতেছে, সত্যই তাহার কোনই কারণ নাই। কলিকাতা শহর হইতে বহু দূরে নয়াদিল্লীতে বসিয়া এমন কথা তিনি বলিতে পারেন; কিন্তু যাঁহারা ভুক্তভোগী তাঁহারা জানেন, রেশনিংয়ের চাউল সরবরাহ করিবার পর হইতে কলিকাতা শহরে বেরিবেরি রোগ একরূপ ব্যাপক আকারেই দেখা দিয়াছে এবং ঐ ব্যাধি বিশেষভাবে শহরের মধ্য এবং উত্তর অঞ্চলে সর্বশ্রেণীর মধ্যে উত্তরোত্তর বিস্তার লাভ করিতেছে। আমাদের আশঙ্কা এই যে, অবিলম্বে যদি ইহার জন্য প্রতিকার ব্যবস্থা অবলম্বিত না হয়, তবে শহরবাসীদের স্বাস্থ্যহানির সমস্যা গুরুতর আকারে দেখা দিবে। বাঙলার মফঃস্বলের অবস্থা সম্বন্ধে বাঙলা সরকার এবং ভারত সরকার উভয় কর্তৃপক্ষের মুখেই আমরা আশাশীলতার পরিচয় পাইতেছি। বাঙলা দেশে এ বৎসর যেরূপ ভাল ধান হইয়াছে, এমন ফসল বহু দিন ফলে নাই এই বিষয়ের উপর তাঁহারা সকলেই জোর দিতেছেন; আমরা তাঁহাদের এ কথার সত্যতা সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করিতেছি না; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও আমরা দেখিতেছি, মফঃস্বলের চাউলের দাম অনেকক্ষেত্রে এখনও অনেক চড়া রহিয়াছে। এ সম্বন্ধে বিশেষভাবে ঢাকা এবং ত্রিপুরা ও চট্টগ্রামের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই সব জায়গায় চাউলের দাম প্রতিমণ এখনও কুড়ি টাকা বা তাহার কাছাকাছি। ফাল্গুন মাসেই এই অবস্থা; এরূপক্ষেত্রে ভবিষ্যতের জন্য আতঙ্ক হওয়া কি স্বাভাবিক নহে?

তেল, কয়লা ও লবণ

চাউলের সমস্যা তো এইরূপ: কিন্তু কিছুদিন হইল কলিকাতা শহরে চাউলের সমস্যাকে ছাড়াইয়া কয়লার সমস্যা বড় হইয়া উঠিয়াছে। সম্প্রতি শহরবাসীদিগকে কয়লার পরিবর্তে প্রকৃতপক্ষে পাথর ভাঙিয়া ইন্ধনের কার্য করিতে হইতেছে: আবার সেই পাথরও লাইন করিয়া দাঁড়াইয়া প্রতি পরিবারে ৫ সের বরাদ্দে সংগ্রহ করিতে হয়। বাঙলা সরকার এজন্য দায়িত্ব গ্রহণ করিতেছেন না। তাঁহারা বলিতেছেন, কয়লার

গাড়ি বরাদ্দ করিবার ভার ভারত সরকারের কর্মচারীদের হাতে ; সুতরাং শহরে কয়লা কবে আসিবে, তাঁহারা তাহা বলিতে পারেন না। ভারত সরকারের পক্ষ হইতে সেদিন স্যার এডওয়ার্ড বেন্থল আমাদিগকে আশ্বাসদান করিয়া বলিয়াছেন যে, খনি হইতে ফেব্রুয়ারী মাসে যথেষ্ট পরিমাণ কয়লা উঠিয়াছে এবং গাড়ির ব্যবস্থা সম্বন্ধে উন্নতিসাধন করা সম্ভব হইয়াছে ; গত দুই মাসকাল কয়লার খুবই টানাটানি পড়িয়াছিল। কারণ, শ্রমিক মিলে নাই ; এখন সে সংকট কাটিয়া গিয়াছে। স্যার এডওয়ার্ডের এই উক্তিতেও আমরা বিশেষ আশ্বস্ত হইতে পারিতেছি না ; কারণ, তিনি এই উক্তি করিবার পরও শহরের কয়লা সরবরাহের ব্যবস্থার বিশেষ কিছু উন্নতি দেখিতে পাইতেছি না; এখনও বাঙলা সরকারের মজুর কয়লাই মুষ্টিভিক্ষা আকারে মিলিতেছে। শহরের কয়লা সমস্যার প্রতিক্রিয়া মফঃস্বলেও বিস্তারলাভ করিয়াছে ; কিন্তু কেরোসিন তেল এবং লবণের সমস্যা সে অঞ্চলে সর্বাধিক গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছে। ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদে ভারত গভর্নমেন্টের খাদ্যসচিব মহাশয় বাঙলার মফঃস্বলের লবণ সমস্যার গুরুত্বের কথা স্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলেন, নানা কারণে সম্প্রতি কলিকাতার মজুত লবণে টান পড়ে ; জাহাজযোগে লবণ পাঠাইয়া এই অভাব মোচনের জন্য ব্যবস্থা করা হইয়াছে ; কিন্তু এই ব্যবস্থার ফলভোগ করিবার সৌভাগ্য আমাদের কত দিনে হইবে জানি না ; অবস্থার গুরুত্ব বুঝিয়া পূর্ব হইতে এই ব্যবস্থা করা কি সম্ভব হইত না? কর্তৃপক্ষ নিত্য প্রয়োজনীয় এই সব দ্রব্যের সম্বন্ধে যদি যথাসময়ে ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে যদি এমন উদাসীন থাকেন, তবে তাঁহাদের অবলম্বিত নীতি সম্বন্ধে জনসাধারণের মধ্যে অনাস্থার ভাব সৃষ্টি হইবে এবং অর্থগৃধ্নু লাভখোরের দল গরীবের রক্ত চুষিয়া পুষ্ট হইবার সুযোগ পাইবে, ইহা স্বাভাবিক। সরবরাহের ব্যবস্থা সুদৃঢ় না করিয়া শুধু বিবৃতি বা সদুপদেশের সাহায্যে এ অবস্থার প্রতিকারসাধন করা সম্ভব হইতে পারে না। তাঁহারা এখনও এ সত্য উপলব্ধি করিতেছেন না ; জনসাধারণের জীবন সমস্যায় শাসকদের এমন উদাসীনতা শুধু পরাধীন—এই পোড়া দেশেই সম্ভব।

পরিষদে সরকারের পরাজয়

রেলওয়ে বাজেট সম্পর্কিত কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে ভারত সরকারের কয়েকবার পরাজয় ঘটিয়াছে। বলা বাহুল্য, ভোটের এই পরাজয় এড়াইবার জন্য সরকার পক্ষ চেষ্টার কোন ত্রুটি করেন নাই ; কিন্তু রেলের ভাড়া শতকরা ২৫্ টাকা বৃদ্ধি এবং রেল বিভাগের ব্যবস্থা সম্বন্ধে তাঁহাদের অবলম্বিত নীতির নানারূপ অসমীচীনতাকে তাঁহারা কোন যুক্তিবলে খণ্ডন করিতে পারেন নাই। দেশের এই অবস্থায় রেলের ভাড়া যাঁহারা বৃদ্ধি করিতে চাহেন, তাঁহাদের পক্ষে যুক্তিই বা কি থাকিতে পারে? ভাড়া ইতিপূর্বেই কয়েক দফা বৃদ্ধি করা হইয়াছে, বর্তমানে ভাড়ার যে হার আছে, তাহা ইংলণ্ডের তুলনায় ৪ শত গুণ অধিক ; এরূপ অবস্থায় রেলভাড়া বৃদ্ধি করার অর্থ গরীবের উপর অত্যাচার বা পীড়ন ছাড়া আর কিছুই হইতে পারে না ; এ সম্পর্কে আর একটি কথা বিবেচ্য এই যে, রেলভ্রমণকারীদের সুবিধার জন্য এই ভাড়া বৃদ্ধি করা হইতেছে না ; পক্ষান্তরে রেলভ্রমণ কমাইবার উদ্দেশ্যেই ভাড়া বৃদ্ধির এই প্রচেষ্টা। করবৃদ্ধির এমন উদ্ভট যুক্তি শুধু এই দেশেই খাটে। যাত্রীগাড়ি অত্যধিক মাত্রায় কমাইবার ফলে এবং সমর বিভাগের কাজের চাপে রেলভ্রমণে জনসাধারণকে যে অসুবিধা ভোগ করিতে হয়, তাহাকে প্রাণান্ত-পরিচ্ছেদ ব্যাপার বলা যাইতে পারে ; এমন অবস্থায় সাধ করিয়া কেহ ভ্রমণ করিতে যায় না ; অথচ এই অবস্থাতেও আবার রেলের ভাড়া বৃদ্ধি করিবার জন্য কর্তৃপক্ষের আগ্রহ ; এমন আগ্রহকে সোজাসুজি দেশের লোককে নিগ্রহ করিবার প্রবৃত্তি বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। পরিষদে তাঁহাদের এমন উদাম সমর্থিত হয় নাই এবং তাঁহাদের কয়েকবার পরাজয় ঘটিয়াছে ; কিন্তু এমন পরাজয় কয়েকবার কেন, অনন্তবার ঘটিলেও ভারতের শাসকদের চিন্তার কোন কারণ নাই। কারণ এদেশের শাসন-ব্যবস্থা-নিয়ন্ত্রণে দেশের লোকের কোন অধিকার নাই। ভোটের জোরে সরকার পরাজিত হইলেও ভিটোর জোরে, অর্থাৎ বড়লাটের বিশেষ ক্ষমতাবলে তাঁহারা নিজেদের সংকল্প বজায় রাখিবেন এবং প্রদেশের শাসন-রথ জনমতকে উপেক্ষা করিয়াই দেশের উপর দিয়া পথ করিয়া চলিবে ; দরিদ্রের আর্তনাদে সে রথচক্রের গতি স্থগিত হইবে না।

কস্তুরবার শেষকৃত্য

পুনার আগা খাঁ প্রাসাদের অভ্যন্তরে কস্তুরবার শব সৎকার সাধিত হয়। তৎপরে তাঁহার চিতাভস্ম বিঠ্ঠল দেবের পুণ্যতীর্থনিসেবিত ইন্দ্রানীর নীরে বিসর্জিত হইয়াছে। তাঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত দেবদাস গান্ধী প্রয়াগের গঙ্গা যমুনা সঙ্গমে মাতার অস্থি উৎসর্গ করিয়াছেন। যশস্বিনী কস্তুরবার জন্য সমগ্র দেশে শোকের উচ্ছ্বাস উত্থিত হইয়াছে ; বিদেশেও এ শোক সম্প্রসারিত হইয়াছে। মার্কিন সংবাদপত্রসমূহে তাঁহার মৃত্যুর জন্য বিশেষভাবে শোক প্রকাশ করা হইয়াছে ; কিন্তু ইংলণ্ডের সংবাদপত্রসমূহ এ ক্ষেত্রেও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অনুদার প্রভাব এড়াইতে পারে নাই ; এই উপলক্ষে এ দেশের কর্তৃপক্ষ কোন কোন স্থানে যে আচরণ করিয়াছেন, তাহাতে সাধারণের মধ্যে বিক্ষোভের সৃষ্টি হইয়াছে। পুনার কর্তৃপক্ষ সেখানে শোকসভা করিতে দেন নাই ; মীরাটের কর্তৃপক্ষ ১৪৪ ধারা জারী করিয়া এক সপ্তাহকালের জন্য সেখানে সকল রকম সভা, শোভাযাত্রা প্রভৃতি নিষিদ্ধ করেন ; কিন্তু বোম্বাইয়ের কর্তারা এ ক্ষেত্রে সকলকে ছাড়াইয়া গিয়াছেন ; কস্তুরবার স্মৃতির উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করিবার জন্য সেখানকার সাগর সৈকতে সমবেত ৪০ জন সাংঘাতিক অপরাধীকে তাঁহারা সদ্য সদ্য গ্রেপ্তার করেন ; ইহাদের মধ্যে ১৭ জন মহিলা ছিলেন। কস্তুরবার ন্যায় সমগ্র জাতির মাননীয়া মহিয়সী মহিলার জন্য শোক প্রকাশেও ইঁহাদের শঙ্কা। পরাধীন এ দেশ, এ দেশের শাসকদের এই আশঙ্কার কারণ বুঝিতে বেগ পাইতে হয় না। আমরা জানি উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের অবলম্বিত নীতির সংস্কার অতিরঞ্জিত আকারে এই সব ক্ষেত্রে নিম্ন রাজকর্মচারীদের মনে প্রতিফলিত হয় এবং উৎকট রকমের ভ্রান্ত একটা রীতিবদ্ধ বিকার ঘটাইয়া থাকে। তাহার ফলে ইঁহাদের বিবেচনা বুদ্ধি লোপ পায়, আর মাথা ঠিক থাকে না। কিন্তু ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের সভাপতি স্যার আবদার রহিম এই সম্বন্ধে যে মনোবৃত্তির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন তাহাতে আমরা সমধিক বিস্মিত হইয়াছি। জাতীয় দলের নেতা ডাঃ প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় কস্তুরবার মৃত্যু সম্বন্ধে পরিষদে একটি বিবৃতি দান করিতে উদ্যত হইলে সভাপতি উহা নিষিদ্ধ করেন। তিনি বলেন, পরিষদের সদস্য ব্যতীত অন্য কাহারও মৃত্যুতে শোক প্রকাশের রীতি পরিষদে নাই। প্রকৃতপক্ষে এই যুক্তির বিশেষ কোন মূল্য দেওয়া চলে না ; মহীয়সী কস্তুরবার জন্য শোকপ্রকাশের ক্ষেত্রে এই রীতির ব্যত্যয় ঘটিলে ক্ষতি কি ছিল? রীতি থাকিলেই সকল রীতির সঙ্গতি প্রতিপন্ন হয় না। ভারতের শাসনাধিকার সম্পর্কিত ইংলণ্ডের কোন পদস্থ ব্যক্তির মৃত্যু ঘটিলে এবং সে ক্ষেত্রে এইভাবে পরিষদে শোক প্রকাশের প্রস্তাব উত্থাপন করিতে গেলে সভাপতি স্যার আবদার রহিম কিরূপ মনোভাব অবলম্বন করিতেন, এ ক্ষেত্রে এই প্রশ্ন আমাদের মনে ওঠে।

ইংরেজের ভারত সেবা

বেঙ্গল চেম্বার্স অব কমার্স কলিকাতার শ্বেতাঙ্গ বণিকদের সভা। এই সভার বার্ষিক অনুষ্ঠানে সভাপতি মিঃ জে এইচ বার্ডার শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায় ভারতবর্ষের যেভাবে নিঃস্বার্থ সেবা করিয়াছেন, তাহার একটা ফিরিস্তি প্রদান করিয়াছেন এবং সেজন্য ভারতবাসীদের শ্বেতাঙ্গ সমাজের কাছে কৃতজ্ঞ থাকা উচিত; কথার প্যাঁচে এই তত্ত্বই প্রচার করিয়াছেন। মিঃ বার্ডারের মতে, ভারতের প্রাদেশিক এবং কেন্দ্রীয় পরিষদ-সমূহে শ্বেতাঙ্গগণ সদস্যস্বরূপে কাজ করিতেছেন এবং সেজন্য তাঁহাদিগকে প্রভূত স্বার্থত্যাগ করিতে হইতেছে; দ্বিতীয়ত, শ্বেতাঙ্গগণ শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতি-সাধন করিয়া সমাজের দিক হইতে তাঁহারা এ দেশের যথেষ্ট কল্যাণ সাধন করিতেছেন এবং সেক্ষেত্রেও তাঁহারা অশেষ ত্যাগস্বীকার করিতেছেন; তৃতীয়ত, বৃটিশের মূলধনের সাহায্যেও এদেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি ঘটিয়াছে এবং প্রধান প্রধান শিল্পের প্রতিষ্ঠাতা তাঁহারাই। ভারতের প্রতি শ্বেতাঙ্গ সমাজের এই সব সেবারত স্মরণ করাইয়া দিয়া মিঃ বার্ডার ভারতের ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ভারতবাসীদিগকে শ্বেতাঙ্গ সমাজের সমানাধিকার স্বীকার করিতে বলিয়াছেন। অবশ্য মিঃ বার্ডার শ্বেতাঙ্গ সমাজ বলিতে যাঁহাদিগকে বুঝাইয়াছেন, সাধারণভাবে বলিতে গেলে তাঁহারা ইংরেজ বণিক সম্প্রদায়। আমাদের মতে মিঃ বার্ডার ইঁহাদের ভারত সেবার যে ফিরিস্তি দিয়াছেন, তদনুসারে তাঁহারা নিজেদেরই স্বার্থসেবা করিয়াছেন এবং করিতেছেন; বস্তুত, তাঁহাদের সে সব কাজে আমরা তাঁহাদের ভারত সেবার কোন পরিচয়ই পাই না। এ দেশের আইনসভাসমূহে শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায় প্রতিনিধিত্বের অধিকার লাভ করিয়াছেন ইহা সত্য; কিন্তু সংখ্যানুপাতিক হিসাবে এ দেশের লোকের প্রতিনিধিত্বের ন্যায্য অধিকারের সংকোচ-সাধন করিয়াই মিঃ বার্ডারের স্বজাতীয়দের দ্বারা নির্ণীত শাসনতন্ত্রে তাঁহাদিগকে অসঙ্গতভাবে সে অধিকার দান করা হইয়াছে এবং তাঁহারা আইনসভার এই সব প্রতি-নিধিত্বের ক্ষেত্রে দেশের জনমতের বিরুদ্ধতা-চরণই করিয়া আসিতেছেন এবং এখনও করিতেছেন। ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে তাঁহারা শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতিসাধনের জন্য নিজেদের স্বার্থত্যাগ করিয়া এদেশের সেবা করিয়া-ছেন, মিঃ বার্ডারের এ উক্তিও যুক্তিতে টিকে না; প্রকৃতপক্ষে নিজেদের লাভের অনুপাতে এদেশের শ্রমিকদের জন্য তাঁহারা কিছুই করেন নাই; পক্ষান্তরে তাহাদিগকে শোষণ করিয়াছেন এবং এখনও করিতেছেন। তাঁহাদের তৃতীয় সেবা মূলধন খাটাইয়া ভারতে ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্প্রসারণ; এক্ষেত্রেও তাঁহারা এদেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি এবং শিল্পের প্রতিষ্ঠা রুদ্ধ করিতেই চেষ্টা করিয়াছেন এবং নিজেরা এদেশের ধন-সম্পদে সমৃদ্ধ হইয়াছেন এবং ভারতের অর্থনীতি তাঁহাদের এই শোষণের অনুকূলেই নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে সুতরাং এরূপ অবস্থায় ভারতের ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে শ্বেতাঙ্গদিগকে সমান অধিকার দান করিবার জন্য মিঃ বার্ডার আমাদিগকে যে পরামর্শ দান করিয়া-ছেন, তাহা আমাদের কাছে পরিহাসের মতই শুনাইয়াছে।

ভারত সরকারের বাজেট

ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে অর্থসচিব স্যার জেরেমি রাইসম্যান যথারীতি ভারত গভর্নমেণ্টের বাজেট উপস্থিত করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, এ বাজেট ঘাটতি বাজেট; অর্থসচিবের হিসাবমতে বর্তমান বৎসরে আয়বৃদ্ধি সত্ত্বেও ভারত গভর্নমেণ্টের ৯২ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা ঘাটতি পড়িবে এবং আগামী বৎসরে ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়াইবে ৭৮ কোটি ২১ লক্ষ টাকা। এই ঘাটতি পূরণের জন্য অর্থসচিব ট্যাক্স বৃদ্ধির সনাতন প্রস্তাবই উপস্থিত করিয়াছেন। চা, কফি ও সুপারীর উপর উৎপাদন শুল্ক ধার্য করা হইবে এবং ইহার পরিমাণ হইবে প্রতি অর্ধ সেরে দুই আনা হিসাবে। চা শুধু ধনীর বিলাসদ্রব্য নয়, ইহা ভারতের সর্বত্র দরিদ্র এবং বিশেষভাবে শ্রমিক সম্প্রদায়ের ক্লান্তি নাশক পানীয়ে পরিণত হইয়াছে; চা এবং সুপারীর উপর এই শুল্ক ধার্য করতে দরিদ্রের উপরও এই দুর্দিনে আর্থিক চাপ বৃদ্ধি করা হইল। তামাকের উপর শুল্ক বৃদ্ধির ফলই অনুরূপ দাঁড়াইবে। বাজেটের একটি ভাল প্রস্তাবে এই দেখা যাইতেছে যে, এবার যাহাদের বার্ষিক আয় দুই হাজারের কম তাহাদিগকে আয়কর হইতে রেহাই দেওয়া হইয়াছে; অতঃপর আয়কর বার্ষিক দেড় হাজার টাকার আয়ের উপর ধার্য না হইয়া দুই হাজার টাকা হইতে ধার্য হইবে। বাঙলা দেশের আর্থিক সাহায্য সম্বন্ধে ভারত গভর্নমেণ্টের অর্থসচিব কতটা উপেক্ষার ভাবই দেখাইয়া-ছেন বলিতে হইবে। বাঙলার অর্থসচিব ভারত সরকারের নিকট হইতে ১১ কোটি অর্থসাহায্য চাহিয়াছিলেন, সে স্থলে বর্তমান বৎসরে তিন কোটি এবং আগামী বৎসরে দেড় কোটি—মোট সাড়ে চার কোটি টাকা সাহায্যের প্রতিশ্রুতি মিলিয়াছে। এমন সাহায্য সাহায্য না করারই সামিল; যুদ্ধের অবস্থাজনিত সমস্যাই ভারত সরকারের অর্থসচিবের তরফে দেশের উন্নতির সর্বপ্রকার পরিকল্পনা শূন্য এইরূপ বাজেট সমর্থনের পক্ষে একমাত্র যুক্তি। এক্ষেত্রে অর্থ-সচিবের উপলব্ধি করা উচিত ছিল যে, যুদ্ধ সম্পর্কে স্বার্থ বৃটিশ গভর্নমেণ্টেরও আছে; সুতরাং ভারতের গরীবদের উপর করবৃদ্ধি না করিয়া ঘাটতি পূরণের জন্য বৃটিশ গভর্নমেণ্টের উপরই তাঁহার চাপ দেওয়া কর্তব্য ছিল; কারণ, ভারত যদি আজ তাহার আত্মরক্ষার ব্যয় বহন করিতে না পারে, সে দোষ ভারতবর্ষের নয়; সুদীর্ঘ কাল ভারত শাসনের ভার নিজেদের হাতে লইয়া যাঁহারা ভারতের আর্থিক অবস্থার উন্নতিসাধন করিতে পারেন নাই, তাঁহারাই সেজন্য দায়ী।

প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন

আগামী ৯ই ও ১০ই মার্চ দিল্লীতে প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের এক বিংশতি বার্ষিক অধিবেশন হইবে। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার এই অধিবেশনের সাধারণ সভাপতি হইবেন। প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীযুত রাজশেখর বসু মহাশয় সাহিত্য শাখার সভাপতিত্ব করিবেন; পণ্ডিত ক্ষিতি-মোহন সেন দর্শন শাখার এবং ডক্টর নীল-রতন ধর বিজ্ঞান শাখার ও অধ্যক্ষ বিজনরাজ চট্টোপাধ্যায় ইতিহাস শাখার সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন। বাঙলার সাহিত্য ও কৃষ্টির ক্ষেত্রে খ্যাতনামা ব্যক্তিবর্গ এই অধি-বেশনে যোগদান করিবেন। সাহিত্যই বাঙালী জাতির সর্বাপেক্ষা গৌরবের বস্তু এবং সাহিত্য সাধনার উপরই জাতির সমগ্র ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে। বাঙলা দেশের রাজনীতিক জাগরণের মূলেও রহিয়াছে বাঙালীর ঐকান্তিক সাহিত্য সাধনা। আমরা আশা করি, সাহিত্য-সাধনার এই গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া বাঙলার বিভিন্ন অঞ্চলের প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তিগণ দেশের বর্তমান আর্থিক অবস্থাজনিত সংকট এবং রেল ভ্রমণের নানারূপ অসুবিধা স্বত্বেও অনেকে নয়া-দিল্লীতে আহূত এই সম্মেলনে যোগদান করিতে উদ্যোগী হইবেন এবং বাঙলার বাহিরে বাঙলা ভাষা সম্প্রসারণের প্রচেষ্টা তাঁহাদের সহযোগিতায় এই অধি-বেশনে সমধিক সাফল্যমণ্ডিত হইবে। আমরা প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের দিল্লী অধিবেশনের সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করিতেছি।

তিলাঞ্জলি

সুবোধ ঘোষ

(১৭)

গুরুদয়ালবাবুর আহ্বান শুনতে পেয়ে সিতা সামনে গিয়ে দাঁড়ালো।—কি বাবা?

গুরুদয়ালবাবু তাঁর মনের ভেতর একটা উত্তেজনাকে যেন কঠিন শাসনে সংযত করে রাখছিলেন। তাই শ্রান্ত মানুষের মত দেখাচ্ছিল তাঁকে—একটু নিষ্প্রভ অথচ শান্ত।

গুরুদয়ালবাবু কিছুক্ষণ ইতস্তত করে বললেন।—তোর সেই পারুলদি হঠাৎ একটা চিঠি লিখে ফেলেছে আমাকে।

সহসা একটা আঘাত পেয়ে যেন সিতা চমকে উঠলো।—পারুলদির চিঠি?

গুরুদয়ালবাবু।—হ্যাঁ।

মাথাধরার ওষুধের একটা ট্যাবলেট মুখে ফেলে দিয়ে, পাখার স্পীড বাড়িয়ে দিয়ে, জোরে একটা নিশ্বাস ছাড়লেন গুরুদয়ালবাবু।—তা, আমার কোন আপত্তি নেই সিতা। আমি আপত্তি করবো কেন? আমি আপত্তি করতে পারি না। শুধু এতদিন কিছু জানতে পারিনি বলেই......।

তেমনি শঙ্কিত মুখে সিতা ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করলো।—কিসের আপত্তি বাবা?

গুরুদয়ালবাবু।—সেই ছেলেটি...গানের মাস্টার...শিশির।

সিতা চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। গুরুদয়ালবাবুর কথাগুলির মধ্যে না বুঝবার মত আর কোন হেঁয়ালি নেই। কাহিনীটা যেন আর শুধু অলক্ষ্য ক্ষোভে অভিমানের জাল বুনে আড়ালে লুকিয়ে থাকতে চায় না। সংসারের পরীক্ষায় কাহিনীটা আজ নিজের আবেগে বাস্তব সত্যের মূর্তি ধরে দেখা দিয়েছে। সংসারের রূঢ় নিয়মই এমনি করে সব খাপছাড়াকে একদিন হেস্তনেস্ত করার ডাক এসে পড়ে। গুরুদয়াল তাই যেন সিতাকে আজ ডেকেছেন।

সিতার কাছ থেকে কোন প্রত্যুত্তরের জন্য অপেক্ষায় ছিলেন না গুরুদয়ালবাবু। পারুলের চিঠিটা প্রখর দিবালোকের মত সম্মুখের সব আবছায়া সরিয়ে দিয়ে তাঁর কর্তব্য ও অকর্তব্যের পথ খুলে দিয়েছে। যে-পথে চলে গিয়ে জীবনে সুখী হবে সিতা, কোন অতিস্নেহের দাবীর গ্রন্থি দিয়ে সে-পথের মুখ বেঁধে রাখবেন না গুরুদয়ালবাবু।

গুরুদয়ালবাবু বিমর্ষভাবে হাসলেন।—বড় অপ্রস্তুত হয়ে গেলাম সিতা। কিছুই জানতে পারিনি, অথচ নিজের ইচ্ছেমত আয়োজন করে বসে আছি। নইলে......।

একটা গভীর অনুশোচনার আড়ালে অস্পষ্ট হয়ে গুরুদয়ালবাবুর কথাগুলি মিলিয়ে যেতে লাগলো।—তোর কোন দোষ নেই সিতা।' আমারই জেনে নেওয়া উচিত ছিল। জিজ্ঞেসা করা উচিত ছিল।

সিতা আস্তে আস্তে সরে গিয়ে গুরুদয়ালবাবুর চেয়ারের পেছনে গিয়ে দাঁড়ালো। চেয়ারের কাঁধটা ছুঁয়ে চুপ করে নিষ্পলক চোখে গুরুদয়ালবাবুকেই শুধু দেখছিল সিতা। সিতার দু'চোখের দৃষ্টির একেবারে কোলের কাছে যেন গুরুদয়ালবাবুর মাথাটা ঘেঁসে রয়েছে, পাকা চুলের স্তবক এলোমেলো হয়ে উড়ছে প্রবীণ আয়ুর জীর্ণ উষ্ণীষের মত। সিতার চোখ দুটো চকচক্ করছিল। এত বিজ্ঞ, এত প্রবীণ, এত দামী শালে জড়ানো মূর্তিটি কত শান্ত হয়ে চেয়ারের ওপর বসে রয়েছে। একটি অভিমানী শিশুর মূর্তির মত।

সিতার বুকের কাছে গুরুদয়ালবাবুর মাথাটি যেন স্থির হয়ে ভাসছিল। ক্ষণিকের এক অনুভবের আবেশ সিতার চোখের দৃষ্টি আরও নিবিড় করে তুলছিল। ক্রোড়-ক্রীড়নক একটি ছোট্ট মানুষের মূর্তি যেন আশ্রয়ের লোভে বুকের কাছে মাথা গুঁজতে চাইছে।

সিতা ডাকলো।—বাবা।

গুরুদয়ালবাবু।—লুকোচ্ছিস্ কেন? সামনে এসে বোস্।

সিতা।—তুমি ভুল বুঝেছ বাবা। তুমি যে-আয়োজন করবে, সেই আয়োজন আমি মেনে নেব।

একটা অপ্রত্যাশিত আনন্দের বাতাসে গুরুদয়ালবাবুর মুখে ক্ষীণ হাসির শিখাটা চঞ্চল হয়ে উঠলো।—কী যে বলিস্ সিতা! আমার আয়োজনের কথা নিয়ে তোকে মাথা ঘামাতে হবে না। তোর জীবনের ব্যাপারে, তুই যে-আয়োজন করবি, আমি তাই আশীর্বাদ করে দেব।

সিতা।—না বাবা।

গুরুদয়ালবাবু।—কেন?

সিতা।—শিশিরকে তুমি চেন না।

গুরুদয়ালবাবু।—তুই যখন চিনেছিস, তখন আমার আর চেনবার দরকার নেই।

সিতা।—সে বড়লোককে ঘৃণা করে।

গুরুদয়ালবাবু একটু বিমূঢ় অবস্থায় পড়লেন। কিছুক্ষণ চিন্তিত থেকে নিয়ে বললেন।—বুঝেছি, আমাকে ঘৃণা করে। তাতে কিছু আসে যায় না। সময় মত সব ঠিক হয়ে যাবে।

সিতা।—কিছুই ঠিক হবে না বাবা, সে চিরকাল গানের মাস্টার হয়ে থাকবে। তোমার ডোভার লেনের বাড়িতে সে আসবে না।

গুরুদয়ালবাবুর অবিশ্বাস ঠোঁটের মুখে ফুটে উঠলো।—যেদিন বুঝবে এটা তারই বাড়ি, আমার নয়, সেদিন সে বোধ হয় আর আসতে দেরী করবে না।

সিতা।—না, সে আসবে না। সে অন্য ধরণের লোক।

গুরুদয়ালবাবু একটা সংশয়ে কৌতূহলী হয়ে উঠলেন।—কোন আদর্শ টাদর্শ আছে না কি?

সিতা।—হ্যাঁ, কংগ্রেসের কাজ করে।

গুরুদয়ালবাবু।—করুক্, কিন্তু তার জন্য কি দরিদ্র হয়ে থাকতে হবে? এরকম কোন নিয়ম আছে না কি?

সিতা।—আমি জানি না বাবা। বড়লোকের সঙ্গে মিশলে বা বড়লোক হয়ে গেলে দেশের লোকের সেবার কাজে বাধা আসে, আদর্শ নষ্ট হয়—এই কথা তাঁরা বলেন।

গুরুদয়ালবাবু হাসলেন।—কী ভয়ানক আদর্শ সিতা?

পর মুহূর্তেই বেদনাবিবর্ণ মুখে গুরুদয়ালবাবু বলিলেন।—থাক্ এসব কথা। তবু তুই যখন শিশিরকে ....।

গুরুদয়ালবাবু হঠাৎ থেমে গিয়ে সিতার

(শেষাংশ ৯৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

শিবসতী

কানাই সামন্ত

সারাদিন
তৃণতরুশূন্য দগ্ধ আতাম্র প্রান্তরে উদাসীন
একাকী আসীন ধ্যানমগ্ন।
নিদাঘরবির তাপে
জ্বরাতুর পাণ্ডুর আকাশ। অনলশ্বসনা কাঁপে
দিগ্‌দিগন্তে মরীচিকা। দূরে দূরে তালতরু চয়
শিহরি শিহরি ওঠে: তর্জনী সংকেতে শুধু কয়
ত্রস্ত চরাচরে, তপোবিঘ্ন করো না রুদ্রের।
দূর
দিগন্তের অদৃশ্য কানন হতে উদাস ঘুঘুর
মন্ত্রময় সম্ভাষণ ভেসে আসে শুধু। সীমাশূন্য
দিকশূন্য বিজনতা অহরহ বিরাজে অক্ষুণ্ণ
পক্ষ বিধূনন হীন অধোঊর্ধ্ব সদাই। গূঢ় ফণী
কণ্টকগুল্মের মূলে বক্রগতি সঞ্চারে যখনি
দুর্বিষহ পিঙ্গল সে জটা তপস্যার তাপে।
হায়,
কলকল্লোলিনী গঙ্গা মহাশূন্যে মিলালে কোথায়
বিদেহিনী বাষ্পের উচ্ছ্বাসে। নির্দয় কুম্ভকবশে
রুদ্ধগতি সমীরণ! পূরকে রেচকে কভু শ্বসে
বিশ্বব্যাপী ঘূর্ণ হাহাকারে অগ্নিসূচী বালুকণা
উড়ায়ে উড়ায়ে।
রক্তচক্ষু ডোবে রবি। দিগঙ্গনা
তখনো সভয়, বদ্ধাঞ্জলি দিকে দিকে।
দূর হতে
নির্নিমেষ আরাধনে ঈশ্বরে পূজিয়া অস্তপথে
এসে ফিরে যায় শুক্র। তিমিরের তীরে
সপ্তর্ষি কী মন্ত্র জপে। পা টিপিয়া চলে ধীরে ধীরে
দণ্ডপল।
রাত্রি অবসানে পুন পূর্বগিরিশিরে
হোমকুণ্ডে জ্বলে নব দিবস আহুতি নব রাগে।
দীর্ণ দগ্ধ আতাম্র প্রান্তরে নিত্য উদাসীন জাগে
ধ্যানমগ্ন।
ক্ষমা মাগে আর্ত ত্রিভুবন।

তপস্বীর
চরণে প্রণমি তবে বিরাজেন কৃতাঞ্জলি স্থির
সন্নতনয়না গৌরী। শ্রীঅঙ্গের চম্পকবিকাশ
হৈম কান্তি রবিকরে সম্বরিয়া বলেন, দিগ্বাস,
প্রসন্ন নয়ন মেলো।
লুপ্তবিশ্ব ধ্যানের গহনে
ধ্রুবরশ্মিহেন পশে সে প্রার্থনা নিঃশব্দগমনে
সুস্মিত সুন্দর। রোমাঞ্চিত যোগীশ্বর ধীরে ধীরে
উন্মীল নয়ন মেলি হর্ষাবেশে হেরেন গৌরীরে
চরণে প্রণতা! কুসুমস্তবক ভারে পারিজাত
লতার মতন।
ধীরে ধীরে সপ্রণয় দৃষ্টিপাত
বিস্ময়ের জোয়ারের বেগে হৃদয়ের দুই কূলে
প্লাবন বহায়ে ফিরে আসে। প্রমত্ত আবেগে ভুলে
মহেশ্বর। অধীর দক্ষিণপদভঙ্গীতে সহসা
তাণ্ডবিত উৎসব সূচনা করে! বিস্রস্তা বিবশা
দিগ্বিদিক উল্লঙ্ঘিয়া শত শত প্রমথভৈরব
ধূলান্ধ আকাশে ধেয়ে আসে, অট্টহাস্যকলরব
ভীষ্ম পক্ষে প্রসারিয়া ঝঞ্ঝাগরুড়ের। দিগ্বারণ
মেঘমালা বিদ্যুৎঅঙ্কুশাঘাতে কে করে বারণ,
ধায় সে উৎসবে গুরু গম্ভীর বৃংহিতে।
ওঠে দুলে
আনন্দে আবেগে বক্ষ অদৃশ্য গৌরীর। পদমূলে
মুগ্ধদৃষ্টি যুক্তকর বিহ্বলা শিবাণী।
যবে ক্রমে
শান্ত হয় নৃত্যময় সে কালবৈশাখী, শূন্যে ভ্রমে
অনন্ত নক্ষত্রলোক আশায় শঙ্কায়।
প্রতিদিন
এ তপস্যা, এই আরাধনা, ধ্যানমগ্ন উদাসীন
শঙ্করের সংজ্ঞালাভ তাণ্ডবউন্মাদ।
অবশেষে
লুপ্তদিবা তমিস্রশ্যামল প্রাবৃটে একদা হেসে
উন্মাদিতা প্রিয়ারে নটেশ আলিঙ্গিয়া বক্ষে ধরে।
সুখমন্দীভূত নৃত্যে থিয়াথিয়া ভূতলে অম্বরে
পড়ে পদ। ডমরুর গুরু-গুরু ক্বণিত কঙ্কনে
মিলে যায়। চরণে চরণে ফণী ভায়, মণিগণে
ধাঁধে অন্ধকার। শূন্যে বিস্তারিত কৃষ্ণজটাজূটে
গঙ্গা নামে এই কি প্রথম? ব্রহ্মার অঞ্জলিপুটে
অথবা বিষ্ণুর জ্যোতিষ্মান পদমূলে তৃপ্তি কোথা!
ঝর্ঝর শীকরে ঝরে।
নাচে শিব; শিবাঙ্গসংগতা
নাচে গৌরী। রাত্রিদিবাস্মৃতিশূন্য কালের অয়নে
নাচে অর্ধনারীশ্বর : ক্ষণোন্মেষ নয়নে নয়নে
রৌদ্রজাগরণী আর কৌমুদীস্বপন ক্ষণশেষে
আবেশে হারায়ে যায়।
শরতে শ্যামলনীলবেশে
দিকে দিকে বিকীরিয়া শ্রীঅঙ্গের অপরূপ দ্যুতি
কাশফুল্ল গ্রামোপান্তে, অবিরলকলকল স্তুতি
নদীকূলে, স্নিগ্ধচ্ছায়া নিবিড় কাননে, ভগবতী
শান্তিরূপে বিরাজিতা। শেফালিকা বকুলমালতী
মাঙ্গলিক লাজ বর্ষে। ওঠে সদা হর্ষহুলুধ্বনি
পিকপাপিয়ার স্বরে।
শিশিরে যেদিন দিনমণি
ম্লানদীপ্তি, শস্যভারে ফলি ওঠে আলোকাঞ্চন
দেবীর প্রসাদস্পর্শে; ফলভারে বনউপবন
নত হয়। স্বর্গ ত্যজি এ ভুবনে অন্নপূর্ণা বেশে
সন্তানেরে অঙ্কে ধরি বিরাজে জননী! স্নেহাবেশে
নির্ভূষণা, হৈমবতী।
সর্বত্যাগী হোথা মহেশ্বর
উত্তরের তীক্ষ্ণ তীব্র বায়ুস্রোতে সঁপি কলেবর
শূন্যে ভাসে; অনন্ত তুষারাবৃত রিক্ত মেরুদেশে
স্থাণু গিরিবর সম তুষারবিনিন্দী শুভ্রবেশে

রহে জাগি। ভূতভবিষ্যৎলিপি সৃজনপ্রলয়
নির্নিমেষ নেত্রপাতে তারাদীপ্ত নীহারিকাময়
শূন্যে জাগে। রবিহীন অতি দীর্ঘ অমাযামিনীতে
বর্তমান লুপ্ত হয়।
সুপ্ত স্মৃতি হৃদয়নিভৃতে
একদা জাগিয়া ওঠে! প্রণয়ের পুলকেলজ্জায়
চিরতরুণী প্রকৃতি আজি কি প্রথম শিহরায়
বিকশিত দিব্য দেহে, অঙ্গে অঙ্গে, অনুতে অনুতে,
জাগরণে, স্বপ্নে, ভাবনায়। একটু ছুঁতে না ছুঁতে
প্রাণস্পর্শমণি দিয়ে দূরে যায় শিশিরশর্বরী;
মুঞ্জরে ধরার ধূলি ; কুহেলিকা আবরণ সরি'
সুনীল অনিলপথে স্বর্গ হতে অপ্সরকিন্নরী
নামে স্বর্ণকিরণে কিরণে লীনতনু।
উদাসীন
তপস্বীরে স্মিতসম্মোহিনী বধূ করে প্রদক্ষিণ
মুগ্ধ নৃত্যে প্রতিদিন সখী সঙ্গে মিলি। বনে বনে
বিটপিলতায়তৃণে অর্ঘ্য হতে অরুণে কাঞ্চনে
পুষ্প ঝরে। দক্ষিণ পবনে কস্তুরীকুঙ্কুমবাস
উদাসীর সর্ব অঙ্গে ফেলে মুগ্ধ মধুর নিশ্বাস
নবভাবে উদাসিয়া তারে। অবিশ্রুত শত সুর
বিহঙ্গকূজনে মিশি রোমাঞ্চিত করে দিগ্বধূরে
ললিত কপোল আহা, রোমাঞ্চিত করে গো প্রেমিক
যোগেশ্বরে।
অবশেষে অঙ্কে ধরি হেরে নির্ণিমিখ
ভবানীরে ভবেশ শঙ্কর। দিকে-দিকে-স্বচ্ছ-স্থির
পূর্ণিমার একমাত্র স্বপ্নাদর্শে ভবভবানীর
সে আলেখ্য আঁকা পড়ে বুঝি।
মধুমাধবের রাত
গত হয়ে পুন আসে রৌদ্রজ্জ্বল নিদাঘপ্রভাত।
পুন উদাসীন
ধ্যানমগ্ন একা সমাসীন
তৃণতরুশূন্যে দগ্ধ আতাপ প্রান্তরে সারাদিন।

তিলাঞ্জলি

(৯২ পৃষ্ঠার পর)

দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে নিলেন। —আমার ভুল হচ্ছে না তো সিতা? সত্যি শিশিরকে বন্ধু হিসাবে যদি তুই সবচেয়ে বেশী......। অর্থাৎ, যার মানে, যকে জীবনসঙ্গী পেলে তুই সবচেয়ে সুখী হবি......।

সিতা। —হ্যাঁ বাবা।

গুরুদয়ালবাবু। —শুনে সুখী হলাম সিতা। আর আমার কোন সংশয় নেই।

হঠাৎ ভয় পেয়ে যেন নিজের মনে বিড়-বিড় করতে লাগলেন গুরুদয়ালবাবু। —হ্যাঁ, ঠিক কথা। বড় বড় বাড়িতেই সুখ থাকে না। যদি সুখী হোস্, তবে গানের মাস্টারের ঘরই ভাল। যেখানে সুখ, সেখানেই ঘর। নিশ্চয়। আমি বাধা দেব কেন? কোন দিন বাধা দিইনি......।

গুরুদয়ালবাবু নিজ মুখে সিতাকে আশ্বাসবাণী শুনিয়ে দিচ্ছেন। কিন্তু এই আশ্বাস যেন সিতার মনের ভেতর চিরদিনের আলোকে পুষ্ট যত প্রত্যয়ের ওপর পুঞ্জ পুঞ্জ অন্ধকারের বুদ্বুদের মত ছড়িয়ে পড়লো। এই নির্বাধ মুক্তির সঙ্গে এক প্রচণ্ড অসহায়তার রিক্ততাও যেন নির্বাধ হয়ে উঠেছে। গুরুদয়ালবাবুর অন্ধ বাৎসল্যের দাবী আর সিতার জীবনের পথে কোন আজ্ঞা ইঙ্গিত উপরোধ নিয়ে দাঁড়িয়ে নেই।

—শুধু জয়ন্তর কাছে তুমি একটু ছোট হয়ে গেলাম সিতা।

গুরুদয়ালবাবুর গলার স্বরে আবার সিতার শিথিল চেতনা যেন সতর্ক হয়ে উঠলো। স্পষ্ট করে কথাগুলির মধ্যে সজীব উৎসাহ টেনে নিয়ে সিতা বললো।—না বাবা, তোমাকে কারও কাছে ছোট হতে হবে না। তোমার কোন আয়োজন উল্টে দিতে হবে না। তুমি যা ভাল মনে কর, আমার কাছে তাছাড়া আর কোন ভাল নেই। নিজের ভাল ভাবতে আমি শিখিনি বাবা।

তবু গুরুদয়ালবাবু বোধ হয় ভুল বুঝলেন। সন্ত্রস্তের প্রার্থনার মত ঐ কথাগুলির আবেদন যেন তিনি শুনতে পেলেন না।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে উৎফুল্লভাবে গুরুদয়ালবাবু সিতার সব অভিমানকে যেন দুহাতে ঠেলে সরিয়ে দেবার জন্য চেঁচিয়ে বলতে লাগলেন। —না, না, কিছু ভাবিস্ না সিতা। শিশির ছেলেটি বেশ। খুব ভাল ছেলে। আমার ভুলে যদি অন্য-রকম কোন ব্যাপার ঘটে যেত, বড় অন্যায় হতো সিতা। তাছাড়া, তোর পক্ষেও...বড় অপমানের কথা হতো। যাক্, এখন ভালয় ভালয়......।

গুরুদয়ালবাবুর আচরণ সিতাকে বিস্ময়ে অভিভূত করে তুলছিল। জীবনে আজ যেন প্রথম গুরুদয়ালবাবুকে চিনতে পারলো সিতা। একদিন যে-বাৎসল্যের নিষ্ঠুরতায় নিজেকে সঁপে দিয়ে মনে মনে আত্মত্যাগের গর্বে সান্ত্বনা খুঁজেছিল সিতা, সে-গর্ব মিথ্যার তুচ্ছতায় চূর্ণ হয়ে যাচ্ছে আজ। জয়ন্তের কাছে ছোট হয়ে যেতে, শিশিরের মত দাম্ভিককে ভালছেলে বলে প্রশংসা করতে, ডোভার লেনের প্রাসাদের আদরিণী হরিণীকে গানের মাস্টারের ঘরণী করে দিতে—এত বিষের জ্বালা সহ্য করে তবু আনন্দে হাসছেন গুরুদয়ালবাবু। কিসের জন্য?

সিতার মনের প্রশ্নটিকে উত্তর দিয়েই যেন গুরুদয়ালবাবু বললেন। —তুই সুখী হলেই আমি সুখী। এর ওপর আবার ভাববার কি আছে?

সিতা। —কিন্তু, একটা কথা আছে বাবা যে-কথা......।

গুরুদয়ালবাবু ব্যস্তভবে আপত্তি করে উঠলেন। —আরে না, বোকা মেয়ে! আমাকে তোয়াজ করতে হবে না। আমি কারও ওপর রাগ করি না। কিছু ভাবিস না সিতা। তুই যা ভাল বুঝেছিস, তাই করবি।

আকাঙ্ক্ষিত ভাগ্যের দিকেই গুরুদয়াল-বাবু খুসী মনে সিতাকে যেন হাত ধরে পৌঁছে দিচ্ছেন। সিতা তবু দ্বিধায় পিছিয়ে পড়ছে। একের পর এক, এক-একটি প্রতিবাদের যুক্তি খুঁজছে সিতা। দুর্বোধ্য একটা আশঙ্কায় অস্থিরতায় আর অশোভন কাতরতায় যুক্তিগুলি নিছক অজুহাতের মত নির্লজ্জ হয়ে উঠছে। এত উদার মহৎ প্রসন্ন ও স্নেহপ্রবণ গুরুদয়াল-বাবু, এতখানি আত্মত্যাগের বিনিময়ে, কোন জোর দাবী ভর্ৎসনার বালাই না রেখে, সিতার ভালবাসার সাধনাকে মুক্ত করে দিচ্ছেন। কিন্তু সিতার আচরণ যেন ক্রমেই বিসদৃশতায় কুশ্রী হয়ে উঠছে। এড়িয়ে যাবার পথ খুঁজছে সিতা। গুরুদয়ালবাবু যেন বলছেন—তোমাকে ডুবতেই হবে। সিতা ডুবতে চায় না।

(ক্রমশ)

মেঘদূতের বঙ্গানুবাদ

শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীরাজশেখর বসু

১

শ্ববভারতীর 'সংস্কৃতসাহিত্যগ্রন্থ-র প্রথম গ্রন্থ কালিদাসের 'মেঘদূতে'র বঙ্গানুবাদ 'মেঘদূত' কিছুদিন পূর্বে শত হয়েছে। এই গ্রন্থের অনুবাদক ম্পাদক শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু মহাশয় বা ভাষায় প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ও র্নামা রসসাহিত্যের প্রথিতযশা ; তাই তাঁর সম্পাদিত অনুবাদ-ানি সমস্ত বিশেষ অনুরাগের সহিত বইখানির সহিত মিলিয়ে অনুবাদের তে লক্ষ্য রেখে মনোযোগপূর্বক ছি।

ম্পাদক ভূমিকায় লিখেছেন,—"মেঘদূতের কগুলি বাংলা পদ্যানুবাদ আছে।... পদ্যানুবাদ যতই সুরচিত হ'ক, ল রচনার ভাবাবলম্বনে লিখিত স্বতন্ত্র । অনুবাদে মূল কাব্যের ভাব ও ী যথাযথ প্রকাশ করা অসম্ভব। দাস ঠিক কি লিখেছেন, জানতে হ'লে নিজের রচনাই পড়তে হয়। যাঁরা ত ব্যাকরণের খুঁটিনাটি নিয়ে মাথা ত চান না অথচ মূল রচনার রসগ্রহণের একটু পরিশ্রম করতে প্রস্তুত আছেন, র জন্যেই এই পুস্তক হ'ল।" মুখেও ঠিক এই কথা একদিন ছি; তিনি বলেছিলেন, 'পদ্যে রচিত গ্রন্থের পদ্যে অনুবাদ করা নিতান্ত ভব, বিশেষ চেষ্টায় গদ্যে মূলের ভাব রস অলঙ্কারাদি যথাসম্ভব কিছু-বজায় রেখে ভাষান্তরিত করা যেতে ।' বস্তুতঃ, কোন ভাষার সহিত ন্তরের শব্দের প্রকাশিকা শক্তি, বয়প্রকার, রীতি ইত্যাদির কিছু কিছু াস্য থাকলেও, অনেক স্থলে ঐ সকল য় সাম্য রক্ষা করা অসম্ভব হ'য়ে পড়ে, হেতু ইচ্ছা-সত্ত্বেও বাধাবাঁধনহীন ভাষাব ন্ব সহজ গতি অনুবাদককে তাঁর ষ্ট পথ হ'তে বিপথে—এদিকে-ওদিকে এনে ফেলে। অনুবাদকমাত্রেই বোধ-বিনা বাঙনিষ্পত্তিতে তা স্বীকার ন।

ঘদূতে সমাসঘটিত পদ অনেক আছে। দের যথাযথ ভাষান্তরে অনুবাদ ও সম্ভব নয়। অনুবাদকও ভূমিকায় থা বলেছেন। এই অনুবাদ-গ্রন্থে প্রথমে মূল শ্লোক, পরে যথাসম্ভব তি রক্ষা ক'রে একটু স্বচ্ছন্দভাবে র অনুবাদ, তৃতীয়তঃ সংস্কৃত পদ এবং সান্বয় বাক্যাংশ ও বাক্যের মূলের সহিত ঐক্যরক্ষা ক'রে সংস্কৃত-ঘেঁষা বাঙলায় অনুবাদ ও শেষে টীকা দিয়েছেন। আমার বোধ হয়, মূল শ্লোকের পরে আকাঙ্ক্ষাযোগ্যতানুসারে শ্লোকস্থ পদ-সমূহের টানা বা অখণ্ডিত অন্বয় (prose-order) থাকলে, সংস্কৃতজ্ঞ পাঠকেরা শ্লোকের সহিত অনুবাদ পর-পর মিলিয়ে অনুবাদে সঙ্গতি ও অসঙ্গতি সহজেই বুঝতে পারতেন।

এখন অনুবাদে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি প্রণিধানযোগ্য মনে ক'রে ক্রমে ক্রমে উল্লেখ করবো এবং আবশ্যক-মত আমার অভিমত কিছু কিছু জানাব।

অনুবাদে মূলের সহিত অসঙ্গতি—

(১) "ছন্নোপান্তঃ......শেষবিস্তারপাণ্ডুঃ (১৮শ শ্লোক)। (আমার অনুবাদ) ঐ পর্বতের পার্শ্বদেশ বন্য জম্বুবৃক্ষে আচ্ছন্ন, তাতে পক্বফল দ্যুতি প্রকাশ কচ্ছে। স্নিগ্ধবেণীতুল্য শ্যামবর্ণ তুমি শিখরে আরোহণ করলে, মধ্যে (শিখরাগ্রে) শ্যামবর্ণ এবং তদ্ভিন্ন বিস্তৃত গাত্রে পাণ্ডুবর্ণ পর্বত, ধরণীর স্তনের ন্যায় অমরমিথুনের নিশ্চয়ই দর্শনীয় হবে। [সম্পাদকের অনুবাদ পুস্তকে দ্রষ্টব্য।]

(২) "যস্যাং যক্ষাঃ......পুষ্করেষ্বাহতেষু (৭১তম শ্লোক)। (আমার অনুবাদ) তোমার গম্ভীর ধ্বনির ন্যায় মৃদঙ্গাদি মৃদু মৃদু বাজলে, যেখানে শুভ্রমণিময় অতএব তারকার প্রতিবিম্বরূপ কুসুমে অলংকৃত হর্ম্যতলে যক্ষগণ সুন্দরী স্ত্রীর সঙ্গে কল্পবৃক্ষপ্রসূত রতিফল-নামক মদ্য পান করে।

(৩) "নূনং তস্যাঃ...বিভর্তি (৯০তম শ্লোক)। (আমার অনুবাদ) প্রবল রোদন হেতু স্ফীত-নেত্র, উষ্ণ নিঃশ্বাস হেতু বিবর্ণাধরোষ্ঠ, লম্বিত অলক হেতু অসম্পূর্ণ ব্যক্ত হস্তে ন্যস্ত সেই প্রিয়ার মুখ মেঘাবরোধে ক্ষীণকান্তি ইন্দুর শোচনীয় অবস্থা নিশ্চয় ধারণ করছে।

(৪) "শেষান্ মাসান্......আস্বাদয়ন্তী (৯৩তম শ্লোক)। (আমার অনুবাদ) অথবা দেহলীতে স্থাপিত পুষ্পে বিরহদিবস থেকে আরম্ভ ক'রে নির্ধারিত শাপান্তের অবশিষ্ট মাসগুলি গণনা করে পুষ্পগুলি ভূতলে রাখছে; অথবা হৃদয়ে কল্পিত-ব্যাপার আমার সম্ভোগরতির সুখ আস্বাদন করছে।

(৫) "নিঃশ্বাসেন...রুদ্ধাবকাশাম্ (৯৭তম শ্লোক)। (আমার অনুবাদ) তার কিশলয়তুল্য অধরের পীড়াকর নিঃশ্বাসে, অতৈল স্নান হেতু গণ্ডপর্যন্ত লম্বিত রুক্ষ অলক নিশ্চয় বিক্ষিপ্ত হচ্ছে। স্বপ্নেও কোন প্রকারে আমার সঙ্গ-লাভ হয়, এই আশায় সে নিদ্রা কামনা কচ্ছে, কিন্তু নয়ন-সলিলের উৎপীড়নে নিদ্রার অবকাশ রুদ্ধ।

(৬) "স্পর্শক্লিষ্টাম্......করেণ (৯৮তম শ্লোক)। (আমার অনুবাদ) স্পর্শে ব্যথাজনক সেই কঠিন কর্কশ একবেণী অকর্তিতনখযুক্ত হাত দিয়ে সে গণ্ডদেশ থেকে বার বার সরাচ্ছে।

(৭) "ইত্যাখ্যাতে...কিঞ্চিদূনঃ (১০৬তম শ্লোক)। (আমার অনুবাদ) এই প্রকার বললে, সে উন্মুখী ও ঔৎসুক্যে বিকশিত-হৃদয়া হয়ে তোমাকে দেখবে ও সম্মান করবে —যেমন মৈথিলী পবনতনয়কে দেখেছিলেন ও সম্মান করেছিলেন—এবং অবহিতা হয়ে পরবর্তী সব শুনবে। সৌম্য, সুহৃদের মুখে প্রাপ্ত কান্তের বার্তা সীমন্তিনীগণের প্রায় প্রিয়সমাগমের সমান।

(৮) "কচ্চিৎ......কল্পয়ামি (১২০তম শ্লোক)। (আমার অনুবাদ) সৌম্য, তুমি আমার বন্ধুকৃত্য করবে বলে কি নিশ্চয় করেছ? প্রত্যুত্তর পেয়ে তোমার ধীরতা আমি নিশ্চয় সমর্থন করবো না।

অনুবাদে শ্লোকের পরিত্যক্ত অংশ ;— ১০ম শ্লোকে 'প্রণয়ি' এবং ৮২তম শ্লোকে 'ব্যাপগতশুচঃ' পদ অনুবাদে পরিত্যক্ত হয়েছে। ডাঃ মনোমোহন ঘোষ তাঁর 'মেঘদূতে'র সমালোচনায় বলেছেন, 'তীরোপান্তস্তনিতসুভগম্' (২৫শ শ্লোক) এই শ্লোকাংশ অনূদিত হয়নি। এ ছাড়া আরও কিছু থাকতে পারে।

অনুবাদে সমাসঘটিত পদে পদসমূহের পৃথক্ বিন্যাস—(১) পবিত্র জলযুক্ত স্নিগ্ধ-ছায়াতরুময় রামগিরির 'আশ্রমে'* (১ম শ্লোক)—পদবিন্যাসানুসারে 'পবিত্র' ইত্যাদি বিশেষণ 'আশ্রমে'র গুণবাচ্য হয়; কিন্তু মূলত 'আশ্রম' 'পবিত্রজল-যুক্ত স্নিগ্ধ-ছায়াতরুময়'; অতএব এইরূপ পদবিন্যাস সাধু। (২) 'অল[illegible] নামক' (৭ম শ্লোক, ব্যাখ্যা)—'অলকা-নামক' বা 'অলকানাম্নী' সাধু। (৩) 'ভ্রমরপঙক্তিরূপ জ্যাবিশিষ্ট' (৭৮তম শ্লোক)—'ভ্রমরপঙক্তিরূপজ্যা-বিশিষ্ট' সাধু। 'ঈপ্সিত প্রয়োজনসাধন' (১২০তম শ্লোক)—'ঈপ্সিতপ্রয়োজন-সাধন' সাধু।

এইরূপ যে সমস্ত পদের পদগুলি পৃথক্

আছে, অর্থানুসারে সংযোজক চিহ্ন (-, hyphen) ব্যবহার করলে অভিপ্রেত অর্থগ্রহণ সহজ হয়। 'মৃতরাজপুত্র' এই সমস্ত শব্দের অর্থ—'মৃতরাজার পুত্র', 'মৃত রাজপুত্র' দুইই হতে পারে, সুতরাং প্রকরণানুসারে (according to context) অর্থ নির্ণয় করতে হয়, কিন্তু অভিপ্রেত অর্থানুসারে 'মৃতরাজ-পুত্র' বা 'মৃত-রাজপুত্র' এইরূপে সংযোজকচিহ্ন-যুক্ত হ'লে অনায়াসে অর্থগ্রহ হয়, প্রকরণবোধের অপেক্ষা থাকে না। প্রাচীন বাঙলায় কবিতায় বা গদ্যে চিহ্নবাহুল্য ছিল না, সেই হেতু বাক্যবিশেষে অর্থ একটু দুরূহ হ'য়ে পড়ে। এখন ইংরেজীর অনুকরণে যে সকল ছেদচিহ্ন ব্যবহৃত হয়, তার সুবিধা ত্যাগ না করলেই ভাল হয়।

বাক্য ও বাক্যাংশের অনুবাদ;—"পরিণত-ফলশ্যামজম্বুবনান্তাঃ (দশার্ণাঃ—২৪শ শ্লোক)—পরিণতৈঃ ফলৈঃ শ্যামানি যানি জম্বুবনানি তৈঃ অন্তাঃ রম্যাঃ (মল্লিনাথ)—পরিপক্ক ফলে শ্যামবর্ণ জম্বুবনসমূহে রম্য (দশার্ণ)। সান্বয়ব্যাখ্যায় অনুবাদ; —'যার বনান্ত পরিপক্কফলযুক্ত জম্বুবৃক্ষে শ্যামবর্ণ হয়েছে এমন। এরূপ ব্যাখ্যায় কেবল 'বনান্ত' (বনপ্রান্ত) শ্যামবর্ণ; মল্লিনাথের মতে শ্যাম 'জম্বুবন', অর্থাৎ 'সমস্ত জম্বুবন', কেবল 'জম্বুবনান্ত, অর্থাৎ জম্বুবনের প্রান্ত' নয়। সুতরাং মল্লিনাথের অর্থ সাধুতর মনে হয়।

'কামুকত্বস্য সবিকলং ফলং সদ্যঃ লব্ধা (২৫শ শ্লোক)। (সান্বয় ব্যাখ্যা) 'কামুকত্বের সমগ্র ফল [তোমার দ্বারা] সদ্য লব্ধ হ'বে।' 'লব্ধা' কর্মবাচ্যে, তিঙন্তপদ, সুতরাং [তোমার দ্বারা] এর পরিবর্তে 'তোমা কর্তৃক' হলে সংগত হয়।

'দ্বারা' সংস্কৃতে 'দ্বার্' শব্দের তৃতীয়ান্ত পদ। 'ইন্দ্রেণাগস্ত্যদ্বারা রামায় দত্তম্' (রামায়ণ ৬,১০৮,৪ টীকা)—এখানে 'দ্বারা' করণে তৃতীয়ান্ত; বাঙলায় গৌণভাবে 'দ্বারা পদই করণে তৃতীয়াস্থানে ব্যবহৃত হয়; তদনুসারে ৭৭তম শ্লোকের অনুবাদে 'মন্দারপুষ্পদ্বারা' 'পত্রখণ্ডদ্বারা' 'কনক-কমলদ্বারা' 'মুক্তাজালদ্বারা' 'হারদ্বারা' এই কয়েকটি পদের 'দ্বারা' করণে তৃতীয়া-সূচক, কিন্তু তত্তৎপদের তৃতীয়া কর্মবাচ্যে কর্তায় তৃতীয়া; সুতরাং 'দ্বারা' স্থানে 'কর্তৃক' অর্থাৎ 'মন্দার পুষ্প কর্তৃক' ইত্যাদি তত্তৎপদের অনুবাদ সুসংগত; তবে শ্রুতি-কটুতা পরিহারার্থ কতৃবাচ্যে অনুবাদ ভাল; যেমন, 'গমনের কম্পনে অলকপতিত মন্দার-পুষ্প, পত্রখণ্ড, কর্ণপতিত কনককমল, মুক্তাজাল এবং স্তনতটচ্ছিন্ন হার যেখানে সূর্যোদয়ে কামিনীগণের নৈশ মার্গ সূচনা করে।'

১০১তম শ্লোকে অনুবাদ 'অলকদ্বারা রুদ্ধ' স্থলে 'অলক কর্তৃক রুদ্ধ' বা 'অলকে রুদ্ধ' সাধু।

'জন্য', 'হেতু'—'জন্য' নিমিত্তার্থ; নিমিত্ত ভবিষ্যদ্‌বিষয়ক ফল। যেমন, 'জ্ঞানের জন্য বা নিমিত্ত অধ্যয়ন'; 'জ্ঞান' ভবিষ্যদ্‌বিষয়। 'পুত্রশোকহেতু দশরথের মৃত্যু'—এখানে কর্তা 'পুত্রশোকে'র অধীন ও তাহাই মৃত্যুর হেতু, অর্থাৎ কর্তা হেতুর অধীন, দশরথ ইচ্ছা করলেও বাঁচতে পারতেন না, শোক তাঁকে মেরে ফেলতই; সুতরাং এখানে 'জন্য' বা 'নিমিত্ত' নয়। এই হেতু ৯০তম শ্লোকের অনুবাদে 'প্রবল রোদনের জন্য স্ফীত-নেত্র' ইত্যাদি বিশেষণ বাক্যাংশে (adjectival phrase) 'জন্য' স্থানে 'হেতু' শব্দের প্রয়োগ সাধু। ৯৬তম, ১০০তম ও ১২১তম শ্লোকে 'জন্য' প্রয়োগ অসাধু।

দূরন্বয় দোষ — 'চটুলশফরোদ্বর্তন-প্রেক্ষিতানি (৪০শ শ্লোক)। (অনুবাদ) চটুল শফরের উল্লম্ফনরূপ দৃষ্টি'। এখানে চটুল' পদ 'শফরে'র বিশেষণ, কিন্তু তা নয়, উহা 'দৃষ্টি'র গুণবাচক; অতএব 'শফরে'র উল্লম্ফনরূপ 'চটুল' দৃষ্টি হলে ঠিক হয়। মল্লিনাথের টীকায় 'চটুল', 'প্রেক্ষিতে'র বিশেষণ; চটুলতা 'শফরে'র নয়, 'প্রেক্ষিতে'রই।

'কথমপি'—কথম্—কি প্রকারে। কথমপি—কৃচ্ছেণ (টীকা), কষ্টে (hardly)। 'প্রস্থানং তে কথমপি' (৪৪শ শ্লোক)—(অনুবাদ) 'তুমি কি করে প্রস্থান করবে?' 'কি করে' স্থানে 'কষ্টে' মুল্লান যায়ী। 'চ' (৮৫তম শ্লোক)—কিঞ্চ (টীকা) আরও (more-over)। অনুবাদে 'এবং' আছে, 'আরও' ভাল হয়।

'তালৈঃ শিঞ্জাবলয়সুভগৈর্নর্তিতঃ কান্তয়া মে (সুহৃদ্ বঃ—৮৫তম)। (অনুবাদ) তোমার সুহৃৎ ময়ূর......আমার কান্তার শিঞ্জিত বলয়ের মধুর তালে নৃত্য করে।' 'তাল'—করতলবাদ্য, হাততালি; (গানের 'তাল' নয়)। 'নর্তিত'—কারিত-নর্তন (কর্মবাচ্যে); নাচায় (কর্তৃবাচ্যে)। তদনুসারে অনুবাদ—'তোমাদের সুহৃৎ ময়ূরকে...আমার কান্তা শিঞ্জাপ্রধান বা শিঞ্জা-মুখর বলয়ে মধুর করতলবাদ্যে নাচায়।'

'সম্ভৃত'—সঞ্চিত (মল্লিনাথ); উৎপাদিত বা নিক্ষিপ্ত (অনুবাদে টীকায়)। 'হুত-বহমুখে সম্ভৃতং তদ্ধি তেজঃ (৪৬শ শ্লোক) (অনুবাদ) তিনি......শিব কর্তৃক অগ্নিমুখে উৎপাদিত তেজঃস্বরূপ।' শিব-তেজঃ অগ্নিমুখে 'উৎপাদিত' হয়নি, 'সঞ্চিত' হয়েছিল। 'সম্ভৃত'এর 'নিক্ষিপ্ত' অর্থ অমূলক। অতএব 'উৎপাদিত'স্থানে 'সঞ্চিত'এর প্রয়োগ ভাল। 'প্রভাববান্'—'প্রভববান্' ঠিক; ব্যাখ্যায় তাই আছে।

'সদ্যঃকৃত্ত' (৬২তম শ্লোক)—(অনুবাদ) সদ্যঃকর্তিত। 'সদ্যশ্ছিন্ন (ছিন্ন অগ্নিজন্য) সংগত।

'বিদ্যুত্বতি' (৬৭তম শ্লোকের অনুবাদে, টীকায়)—সন্ধিতে 'বিদ্যুদ্দাদি' সাধু। শ্লোকে 'বিদ্যুৎবন্তম্'এর অনুকরণে কি 'বিদ্যুত্বাদি' সিদ্ধ?

লিখিতবপুষৌ শঙ্খপদ্মৌ (৮৬তম শ্লোক) —(টীকা) এই দুই-এর (শঙ্খ-পদ্মের) মূর্তি মনুষ্যাকারে চিত্রিত হত।' 'মনুষ্যা-কারে' কেন, নামানুসারে 'শঙ্খাকারে' 'পদ্মাকারে' নয় কি? কোন টীকায় 'মনুষ্যাকার' আছে, না 'বপুস্' অর্থে অনুবাদক 'মনুষ্যাকার' লিখেছেন? (মল্লিনাথ-টীকা) 'বপুষী'—আকৃতী।

'সুভগম্মন্যভাবঃ (১০০তম শ্লোক)—(অনুবাদ, ব্যাখ্যা) 'সৌভাগ্য'। 'সৌভাগ্য'—প্রিয়বল্লভতা, পতিপ্রিয়তা বা পত্নীপ্রিয়তা। অনুবাদকের টীকায় 'সুভগ'—'নারীজনপ্রিয়' আছে; এখানে 'পত্নীপ্রিয়'। সুভগম্মন্যভাব—সুভগমানিত্ব (মল্লিনাথ); পত্নীপ্রিয়ত্বের অভিমান। ব্যাখ্যায় ধৃত 'সৌন্দর্যে'র পরিবর্তে 'পত্নীপ্রিয়ত্বের অভিমান' লিখলে অর্থদ্বৈধ থাকে না।

মুদ্রাঙ্ক-প্রমাদ—(১) সংরম্ভোৎপতন রভসা—(শুদ্ধ)...রভসাঃ (৫৭তম শ্লোক) নর্তিতঃ—(শুদ্ধ) নর্তিতঃ (৮৫তম শ্লোক) সদ্যং—(শুদ্ধ) সদ্যঃ (৮৭তম শ্লোক) মূর্ছনা (মূল শ্লোকে, টীকায়)—(শুদ্ধ) মূর্চ্ছনা (৯২তম শ্লোক)। ন প্রবন্ধাং ন সুপ্তাম্ (৯৬তম শ্লোক)—(শুদ্ধ ন-প্রবুদ্ধাং ন-সুপ্তাম্ (সুপ্ সুপেতি সমাস—মল্লিনাথ)। ক্লিষ্টকান্তেবিভর্তি—(শুদ্ধ) ক্লিষ্টকান্তের্বিভর্তি (৯০তম শ্লোক)।

মেঘদূতের যে যে বিষয় সম্পাদককে জানান উচিত বিবেচনা করেছিলাম, তা বিনীতভাবে তাঁকে জানালাম। আরও খুঁটিনাটি যা ছিল, তা প্রবন্ধের বিষয় নয়। আশা করি, তিনি লিখিত বিষয়গুলি সুহৃদ্‌বুদ্ধিতে দেখবেন ও কর্তব্য নির্ধারণ করবেন। জানানই আমার কর্তব্যের শেষ।

২

১৩৫০ সালের কার্তিকের 'কবিতা' পত্রিকায় ডাঃ মনোমোহন ঘোষ এই মেঘদূতের সমালোচনা করেছেন, দেখলাম তাঁর সমালোচনা ঔৎসুক্যের সহিত পড়েছি এই সমালোচনার বিষয়ে আমার কিছু বক্তব্য আছে।

(১) তিনি অনুবাদে মূল শ্লোকের অংশ বিশেষের ছাড়ের কথা লিখেছেন; আমি কয়েকটি অংশ অনুবাদে পরিত্যক্ত হয়েছে দেখিয়েছি। এতে সম্পাদকের সংশোধনে কিছু সুবিধা হবে, আশা করি।

(২) 'কোথাও কোথাও অর্থকে অকারণ

রয়ে দেওয়া হয়েছে।' সমালোচকের এ
ব্য অনুচিত মনে হয় না, চেষ্টা করলে
লের সহিত যথাসম্ভব সংগতি রেখে
বাদ করা অসম্ভব নয়। উপরে আমার
কয়েকটি শ্লোকের অনুবাদে এ চেষ্টা
ছি, কতদূর কৃতকার্য হয়েছি, জানি না।
(৩) 'অনুবাদে মাঝে মাঝে আনকোরা
কৃত শব্দ ব্যবহার করেও সম্পাদক
বাদকে একটু দুরূহ করেছেন।' কয়েকটি
হরণও দিয়েছেন।

সম্পাদক 'ভূমিকা'য় বলেছেন,—'যাঁরা
স্কৃত ব্যাকরণের খুঁটিনাটি নিয়ে মাথা
াতে চান না, অথচ মূল রচনার
গ্রহণের জন্য একটু পরিশ্রম স্বীকার
তে প্রস্তুত আছেন, তাঁদের জন্যই এই
স্তক লিখিত হ'ল।' এতে বুঝা যায়,
া মোটামুটিভাবে ব্যাকরণের বিষয়গুলি
ঝন, কুটকচাল চান না, তাঁরা বাঙলায়
রাচর প্রচলিত সংস্কৃত শব্দের অর্থও
নেন। তাই মনে হয়, তাঁদের পক্ষে
বাদে ব্যবহৃত 'আপন্ন', 'আর্তিনিবারণ',
ধ'-অর্থে 'মার্গ', 'মেঘ'-অর্থে 'পয়োদ',
তবিশ্রাম'-অর্থে 'বিশ্রান্ত'—এই সব শব্দের
য়াগে অনুবাদ দুরূহ হয়েছে বা অনায়াসে
া যায় না বলে মনে হয় না; তবে ইচ্ছা
লে হয়ত যথাসম্ভব তদর্থক শব্দান্তর
য়াগ করে, আরও কিছু সহজ অনুবাদ
তে পারতেন; কিন্তু সংস্কৃত শব্দ ব্যতি-
কে খাঁটি বাঙলায় অনুবাদ চলে না।
তবিশ্রাম' ও 'বিশ্রান্ত' এই দুই শব্দ
্যগত প্রভেদ হেতু একার্থকও নয়;
বিশ্রান্ত' বাঙলায় বিশেষ প্রচলিত আছে।
তরাং 'বিশ্রান্ত' তাদৃশ দুরূহ মনে হয় না।
(৪) 'স্থানে স্থানে মল্লিনাথের প্রতি
তিশয় বিশ্বাসবশত অনুবাদক মূলের
র্থকে বিকৃত করেছেন। যেমন, 'আসীনানাং
গাণাং'এর অনুবাদে তিনি লিখেছেন,
পবিষ্ট মৃগগণের'। হরিণ যে বসে, তা
ল্লনাথই দেখেছেন। অন্য কেউ হয়ত
খেন নি। লেখা উচিত ছিল 'শায়িত
গগণের'। 'আস্' ধাতুর অর্থ 'শয়ন করাও'
ট (আপ্তের সংস্কৃত-ইংরেজী অভিধান
টব্য)।'

মনোমোহনবাবুর এই মন্তব্যে আমার
ব্য ক্রমে ক্রমে বলছি।—

(ক) 'মল্লিনাথের প্রতি অতিশয় বিশ্বাস'।
স্কৃত সাহিত্যের পণ্ডিতেরা সকলেই
ল্লনাথের পাণ্ডিত্যে অতিশয় বিশ্বাসী,
নুবাদকের ত কথাই নাই। তবে মল্লিনাথের
কায় যে একেবারেই গলদ নাই, তা বলছি
; মনুষ্যমাত্রেরই ভ্রমপ্রমাদ অসম্ভব নয়; তা
ল কোন পণ্ডিত মল্লিনাথের টীকায়
তগ্রন্থ মনে হয় না। বিদ্যাসাগর মহাশয়
ঘদূতে'র ছয়খানি টীকা তুলনা করে
বলেছেন,—'এই ছয়খানি টীকার মধ্যে
'মালতী' ও 'সুবোধা' অনেকাংশে প্রশংসনীয়,
কিন্তু 'সঞ্জীবনী' অপেক্ষা সর্ব্বতোভাবে
নিকৃষ্ট।' সুতরাং সম্পাদকের 'অতিশয়
বিশ্বাস' দূষণীয় মনে হয় না; পক্ষান্তরে,
এই দোষার্পণে সমালোচকই দূষিত হবেন,
মনে হয়; সর্বত্র প্রতিষ্ঠাপন্নের দূষণে দূষকই
দূষিত হন।

(খ) 'অতিশয়......করেছেন' ইত্যাদি।
[দ্রষ্টব্য (৪)।] এ বিষয়ে—আমার বক্তব্য;—
আমাদের দেশে, 'চতুষ্পদ গো-মহিষাদি বসে',
কেউ বলে না, 'শোয়' বলে। এই 'শোওয়া'
দুইরকম, (১) যখন গোরু চার পা গুটিয়ে
মাটিতে ডান অথবা বাঁ পাশ পেতে মুখ
উঁচু করে থাকে, অর্থাৎ যে অবস্থায় জাবর
কাটে, তা গোরুর শোওয়ার প্রথম অবস্থা।
(২) যখন গোরু ডান অথবা বাঁ পাশ পেতে
পাটের মত মাটিতে সটান হয়ে পড়ে, জাবর
কাটে না, তখন গোরু শুয়ে পড়েছে বা
পাটিয়ে পড়েছে, বলে। এটা গোরুর
শোওয়ার দ্বিতীয় অবস্থা। কাকে যখন
গোরুর মুখে ব'সে মুখের বা কানের আটালু
খুঁটে খায়, তখন গোরু এই রকম পাটিয়ে
পড়ে থাকে। এই দুইরকমের মধ্যে প্রথমটি
শ্লোকের 'আসীন', মল্লিনাথের ও
অনুবাদকের 'উপবিষ্ট' এবং সমালোচকের
'শায়িত' ('শায়িত' নয়) হরিণের অবস্থা।
৫৫তম শ্লোকে, 'মৃগগণের কস্তুরীগন্ধে
সুরভিতশিল অচল'—এই বর্ণনায় হরিণের
প্রথমোক্ত 'উপবেশন' বা 'শয়ন' সুস্পষ্ট করেই
বলা হয়েছে; কারণ সেরূপ শয়ন না হলে
নাভিগন্ধে শিলা সুরভি হয় না। ইহা হরিণের
জাবর কাটার অবস্থা। রঘুবংশে প্রথম সর্গে
৫২তম শ্লোকে সঞ্জীবনীতে 'নিষাদিভিঃ
মৃগৈঃ'এর অর্থ 'উপবিষ্টৈর্মৃগৈঃ'; হরিণের
এই অবস্থাও শুয়ে জাবরকাটারই বর্ণনা।
'ভক্ষয়িত্বোপবিষ্টেষু (গবাদিষু—বিষ্ণুসংহিতা
৫,১৪৪), ভক্ষয়িত্বোপবিষ্টানাম্ (গবাদী-
নাম্—যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতা ২·১৬৩)—এই
দুই উদ্ধৃতাংশে বর্ণিত গবাদির উপবেশন
প্রথমোক্ত শয়নই, তা ভক্ষণের পরে রোমন্থনেরই
অবস্থা। বৃন্দাবনে অনেক হরিণ আছে,
সেখানের অধিবাসীরা 'হরিণ বসে' বলেন।
আপ্তের অভিধানে 'আস্' ধাতুর অর্থ যে
'To lie' আছে, তারও ঐ প্রকার দুই অর্থ।—
Lie—of persons or animals; Have one's body in more or less horizontal position along ground or surface (The Concise Oxford Dictionary).—
ইহার মধ্যে 'Less horizontal position'
চতুষ্পদ পশুর প্রথম শয়নাবস্থা, more
horizontal position, দ্বিতীয় শয়না-
বস্থা। শিয়াল কুকুর বিড়াল—ইহাদের
'উপবেশন' একটু ভিন্ন, 'শয়ন' পূর্বোক্ত
দুই-প্রকারই। কাব্যে দ্বিতীয়প্রকার শয়নের
বর্ণনা আছে বলে মনে হয় না।

এখন বোধ হয় নিঃসংশয়ে বলা যায়,
'উপবিষ্ট মৃগগণের' অনুবাদ দূষণীয় নয়।
তবে 'শায়িত' সর্বসম্মত।

মহামহোপাধ্যায় মল্লিনাথের প্রতি, 'হরিণ
যে বসে, তা মল্লিনাথই দেখেছেন' সমালোচকের
এই বক্রোক্তি কতদূর ন্যায়ানুগত ও
সুসংশ্লিষ্ট হয়েছে, তা পণ্ডিত তিনিই বিচার
করবেন; অনুবাদকের প্রতি ইঙ্গিতের কথা
আর কি বলবো।

এর পরে সমালোচক মেঘদূতের বাচ্যার্থ
ও ব্যঙ্গ্যার্থের কথা বলেছেন। আমার বোধ
হয়, অনুবাদক সাধারণ পাঠকের উপযোগী
করেই অনুবাদে বাচ্যার্থই দিয়েছেন, ব্যঙ্গ্যার্থ
তাঁর অভিপ্রেত নয়। কারণ, প্রথমতঃ
গ্রন্থবাহুল্য, দ্বিতীয়তঃ, পণ্ডিত পাঠকেরা
টীকায় ব্যঙ্গার্থ পেতে পারবেন, তাঁদের জন্য
এ প্রযত্ন নয়।

(খ) ১০৭ম শ্লোকে (১) 'ব্রয়াদেবং' স্থলে
'ব্রূয়া এবং' পড়তে হবে।'—এই শুদ্ধ পাঠেও
অশুদ্ধি রয়ে গেছে, অবশ্য এটা মুদ্রা-প্রমাদ,
তা হলেও, যে জন্যই হোক, এ ভুলের দায়ী
সমালোচকই। (২) '১১১শ শ্লোকে
'ক্রুরস্তস্মিন্'—স্থলে 'ক্রূরস্তস্মিন্' পড়তে
হবে'।—সমালোচকের পূর্ব ভুলের মতই এটা
অনুবাদকের পক্ষে মুদ্রাঙ্কনপ্রমাদ, বলতে
চাই।

উপরিউক্ত অশুদ্ধ পাঠদ্বয়ের শ্লোক-
সংখ্যায় সংখ্যাপূরণবাচক যে '১০৭ম'
'১১১শ' আছে, তার 'ম' ও 'শ'এর স্থানে
'তম' হলে শুদ্ধ হয়, অর্থাৎ '১০৭তম'
'১১১তম' শ্লোক হওয়া উচিত। সমালোচক
যে হিসাবে ঐরূপ লিখেছেন, তা ঠিক নয়।

(গ) 'অস্র' কথাটি পুনঃপুন 'অশ্রুরূপে
ছাপবার কারণ কি বোঝা গেল না'।—
মেঘদূতের সকল সংস্করণে 'অস্র' পাঠ আছে,
কিন্তু অভিধানে উভয় পাঠই ধৃত হয়েছে;
অমরকোষে ও টীকায় 'অশ্র' পাঠ আছে; তবে
তিনি, 'দেখেছি বলে মনে হয় না', বলেন
কেন। এরূপ বিস্মৃতিস্থলে আরো একবার
দেখে লিখলে, এ 'ত্রুটি' তাঁর চোখে পড়ত না
মেঘদূতে 'অশ্রুং জললবময়ম্', 'প্রালেয়াশ্রম্'—
এইরূপ প্রয়োগও অভিধানে পাওয়া যায়
রামায়ণে 'নেত্রাভ্যোমশ্রমুৎসৃজন্' (২.১০
৬)—এই শ্লোকাংশে 'অশ্র' পাঠ আছে। পাঠ-
ভেদ থাকলেও উভয়ই একার্থক. দ্বিতীয়ত
'অশ্রে'র সহিত 'অশ্রু'র সাদৃশ্য আছে
এই হেতু বোধ হয় অনুবাদক 'অশ্র' শব্দে
ব্যবহার করেছেন। এটা তাঁর ত্রুটি ন
ইচ্ছাপূর্বকই প্রয়োগ।

শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

২

'মেঘদূত' প'ড়ে শ্রীযুক্ত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তৎপূর্বে ডাঃ মনোমোহন ঘোষ যে মতপ্রকাশ করেছেন তার জন্য কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। যদি এই পুস্তক পুনর্মুদ্রিত হয়, তবে প্রদর্শিত দোষগুলি যথাসাধ্য শোধনের চেষ্টা করব।

হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রস্তাব অনুসারে একটানা অন্বয় দিলে তার সঙ্গে ব্যাখ্যার মিল বোঝা দুরূহ হত, সেজন্য অন্বয় খণ্ডিত করে সঙ্গে সঙ্গে ব্যাখ্যা দিয়েছি। তাঁর সংশোধিত অনুবাদগুলি যে অধিকতর মূলানুযায়ী তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু অনেক জায়গায় বাধা পাচ্ছি। বাংলা ভাষার বাক্যভঙ্গী সংস্কৃতের তুল্য নয়, সেজন্য সর্বত্র যথাযথ অনুবাদ করলে ভাষা অস্বাভাবিক হয়ে পড়ে। আমার মনে হয়, অন্বয়ের অনুসরণে যে ব্যাখ্যা দেওয়া হবে তাতে যথাসম্ভব সংগতিরক্ষা আবশ্যক—ভাষা কতকটা অস্বাভাবিক হলেও। কিন্তু স্বচ্ছন্দ অনুবাদে বাংলার বাক্যভঙ্গী যথাসম্ভব বজায় রাখা উচিত, তাতে অল্পাধিক সংগতিহানি হলেও ক্ষতি নেই। 'প্রত্যুত্তর পেয়ে তোমার ধীরতা আমি নিশ্চয় সমর্থন করব না' (১২০তম শ্লোক)—এইপ্রকার অনুবাদ মূলানুযায়ী হলেও দুর্বোধ।

বাংলায় 'কর্তৃক' শব্দের প্রয়োগ কম, কিন্তু 'দ্বারা' নির্বিচারে চলে, যথা—'আমার দ্বারা এ কাজ হবে না'। বাংলায় অনেক স্থলে 'কর্তৃক' শ্রুতিকটু হয়। বহুপ্রচলিত 'দ্বারা' দিলে দোষ কি? কিন্তু ৭৭তম শ্লোকের অনুবাদে বহুবার প্রয়োগের জন্য 'দ্বারা' শব্দও শ্রুতিকটু হয়েছে। কর্তৃবাচ্যে অনুবাদ করাই ভাল মনে করি।

বাংলায় 'জন্য' শব্দ উদ্দেশ্য (বা প্রয়োজন) ও কারণ দুই অর্থেই সুপ্রচলিত, যথা—'ছেলের জন্য দুধ; জ্বরের জন্য নাড়ী চঞ্চল।' বাংলায় 'হেতু' বেশী চলে না, অনেক স্থলে শ্রুতিকটু হয়। আপ্তের অভিধানে 'জন্য' শব্দের বিবৃতিতে আছে—'(at the end of a compound) born from, occasioned by।' এতদনুসারে 'পুত্রশোক জন্য মৃত্যু' হবে না কেন?

৮৬তম শ্লোক 'শঙ্খপদ্মৌ'।—সারদারঞ্জন রায় সম্পাদিত মেঘদূতে 'সারোদ্ধারিণী' থেকে উদ্ধৃত আছে—'তৌ হি অধোভাগে পুরুষরূপৌ গৃহদ্বারশাখাসু মঙ্গলার্থে-মালিখ্যতে।'

বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় এবং ঢাকার গোবর্ধন শাস্ত্রী মহাশয় পাণিনি অনুসারে বিধান দিয়েছেন যে, রেফের পর দ্বিত্ব সর্বত্রই বিকল্পে বর্জনীয়, এমন কি কৃত্তিকা-জাত 'কার্তিকেয়' শব্দেও। 'মূর্ছনা'য় ব্যতিক্রম হবার বিশেষ কারণ আছে কি?

ডাঃ মনোমোহন ঘোষের সমালোচনা সম্বন্ধে হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যা লিখেছেন তার অতিরিক্ত আমার এইটুকু বলবার আছে।—

বাংলা সাহিত্যে অসংখ্য সংস্কৃত শব্দ সুপ্রচলিত, এই কারণে মাতৃভাষায় শিক্ষিত বাঙালী সংস্কৃত না জানলেও চেষ্টা করলে মূল সংস্কৃত রচনা মোটামুটি বুঝতে পারেন। কিন্তু যিনি 'মার্গ, পয়োদ, বিশ্রান্ত' প্রভৃতি শব্দেরও মানে জানেন না তাঁকে মূল সংস্কৃত বোঝানো অসম্ভব। মূলের কিছু কিছু শব্দ বজায় না রাখলে অনুবাদে মূলের রস সঞ্চারিত হয় না এবং তাতে মূলের সহিত সাদৃশ্যও পাওয়া যায় না।

গরু হরিণ প্রভৃতি প্রাণীর অর্ধশয়িত অবস্থাকে লোকে 'বসা' বলে, 'শোয়া' বলে না। 'আসীন'এর অর্থ 'শায়িত' লিখলে সাধারণ পাঠক বুঝবেন—যে পা ছড়িয়ে শুয়ে আছে।

সাধারণ পাঠকের জন্য লিখিত পুস্তকে ব্যঙ্গ্যার্থের বিশ্লেষণ অনাবশ্যক মনে করি।

আমার কাছে ৪খানা মেঘদূত আছে—(১) Dr. John Haeberlin—সম্পাদিত (১৮৪৭ খৃ) 'কাব্যসংগ্রহ'এর অন্তর্গত; (২) মদনমোহন তর্কালংকার সম্পাদিত (১৯০৭ সংবৎ); (৩) প্রাণনাথ পণ্ডিত সম্পাদিত (১৮৭১ খৃ); (৪) সারদারঞ্জন রায় সম্পাদিত (১৯২৭ খৃ)। প্রথম ও তৃতীয় গ্রন্থে ১০৭তম শ্লোকে 'ব্রুয়া এবং' আছে, অন্য দুই গ্রন্থে 'ব্রুয়াদেবং' আছে। শেষোক্ত দুই গ্রন্থে মল্লিনাথ-টীকায় আছে—'তাং প্রিয়ামেবং ব্রুয়াৎ ভবানিতি শেষঃ।' 'ব্রুয়া এবং' পাঠই ভাল তা স্বীকার করি।

'অশ্রু' 'অস্র' দুই বানানই অভিধানসম্মত। কালিদাস নিজে কি লিখেছিলেন জানবার উপায় নেই। ছাপা বইএ যা পাওয়া যায় তা সম্পাদকের অথবা প্রাচীন পুথি-লেখকের রুচিসম্মত বানান। 'অশ্রু'র সঙ্গে সাদৃশ্য রাখবার জন্য 'অশ্র' বানান করেছি। Haeberlinএর কাব্যসংগ্রহে এই বানান আছে।

শ্রীরাজশেখর বসু

ঠাকুরপো

শ্রীবীরু চট্টোপাধ্যায়

নীহারের আজ আর সময় মোটেই নেই। এত বড় একটা বিয়ের কাজ—চলতে গেলে তাকে একাই খাটতে হয়েছে। আজ তার আনন্দের দিন। এবার সংসারের খাটুনীর ভার কিছুটা লাঘব হবে। আর সে পেরে উঠছিল না। এদিকে সংসারে দুটি ছোট ছোট ছেলে-মেয়েকে নিয়ে মোট চারজনই বলা যায়। কারণ ঠাকুরপো তো বিদেশেই থাকে। তবুও একা একা আর ভাল লাগছিল না। বউ হয়ে এ-বাড়িতে আর কম দিন সে আসেনি।

তখন এ দেওরের বয়েস এগার কি বারো বছর—তার নিজের চেয়ে বছর-খানেকের ছোট হবে। প্রথম যখন সে এ বাড়িতে ঘোমটা দিয়ে এসে ঢোকে, তখন এ সংসারে নামেমাত্র অথর্ব এক বুড়ি শাশুড়ি, স্বামী আর তারই সমবয়সী এই ঠাকুরপো ছিল। স্বামী আর ঠাকুরপোর মধ্যে দু'জন ননদ—তাদের বিয়ে হয়ে গিয়েছিল।

মনের দিক থেকে সে ছেলে মানুষ তখনও। কতই-বা বয়েস হবে—সবে পুতুল-খেলা ছেড়ে এসেছে। এসে পেলো এই রমেন ঠাকুরপোকে—একমাত্র সমবয়সী। খেলার অবশ্য আর সুযোগ ছিল না। তবুও দুটো ছেলেমানুষী মনের কথা কইবার মতো লোক পেলো।

স্বামীকে দেখলে তো তার ভয়ই করতো। বেঁটে মোটা চেহারা, তা নয় হল, এমন কতকগুলো ঝ্যাঁটার মতো গোঁফ রেখেছে যে দেখলে তার গাটা রীতিমতো শিউরে উঠতো। তার উপরে তার সেই কণ্ঠস্বর—মাস্টারী আদেশ! কি ভয়েই না তার দিন কেটেছে।

ঠাকুরপোই তখন বন্ধু। তা'রা দু'জনেই দাদাকে সমান ভয় করতো। কত দিনের কত কথাই মনে পড়ে। মনে পড়লে হাসিও পায়।

একদিন সে বলেছিল, জানো ঠাকুরপো, তুমি কিন্তু ভাই গোঁফ রেখো না কখনো?

—কেন বৌদি? রমেন আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করেছিল।

—না সে ভারী বিচ্ছিরি দেখায়।

—ধ্যোৎ তা বুঝি, রমেন বলেছিল, কেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মাইকেল—এদের কি খারাপ দেখাতো। কাইজারের ইয়া লম্বা আর পাকানো গোঁফ। খালি গোঁফটা দেখলেই মনে হয়—কত বড় বীর।

—তা বুঝি বলছি আমি, নীহার উত্তর দিয়েছিল, আমি বলছি তোমার দাদার মতো বিচ্ছিরি গোঁফ রেখো না।

—ও তাই বল। আচ্ছা।

এমনি করে দিন কাটতো। স্বামীকে সে পাঠশালার পণ্ডিতের চেয়েও ভয় করতো বেশী। বয়সে যেমন অনেক বড়—মনেও স্বামী বড্ডো বেশী ভারিক্কী ছিল। কোন একটা মধুর কথাও তার মুখে কঠোর শোনাতো। ঠাকুরপোকে নেহাৎ পুরুষ বলে যেটুকু [illegible] রাখা উচিত—তাছাড়া প্রায় সব কথাই সে খুলে বলতো—আলোচনা করতো, উপদেশ নিত।

সেদিন সে রান্না করছিল। হঠাৎ পেছন থেকে রমেন এসে পিঠে এক কিল বসিয়ে বললে, খুব চালাকী করছিলে বৌদি—কেমন আমি—

অকস্মাৎ নীহারের কান্না শুনে সে থমকে থেমে গেল। কান্নাটা একটুকু জোরেই হয়ে গিয়েছিল। ঘর থেকে অথর্ব শাশুড়ী বলে উঠলো—ওকি কাঁদছে কেরে?

রমেন বাঁচিয়েছিল তাকে, এমনিই মা, —এলেবেলে কান্না।

—দাঁড়াত হারামজাদা কাজের সময় এখনও খেলা করা হচ্ছে দুজনে! আসুক রমেশ। শাশুড়ী ওখান থেকেই হুঙ্কার দিয়েছিল।

রমেন অপ্রস্তুত হয়ে বললে, তুমি কাঁদছো বৌদি! আমি তো মিছিমিছি মারলুম। তাও তো আস্তে একটা কীল—

নীহার কিছুক্ষণ কান্না থামাতে পারেনি। পরে রমেনের বহু তোষামোদে জানিয়েছিল।

—ব্যথার যায়াগায় কীল মারলে কেন তুমি?

ব্যথা! আমি কি তা জানতাম নাকী? কিসের ব্যথা—

—কাউকে বলো না, নীহার ভয়ে ভয়ে বললে, তোমার দাদা মেরেছে।

—দাদা মেরেছে! রমেন স্তব্ধ হয়ে গেল। শক্তি থাকলে সে দাদাকে পিটে আসতো। মুখে বললে, কেন মেরেছে?

—এমনিই শুধু শুধু—

—শুধু শুধু! রমেন চিন্তিত হল, উঁহু দাদা তো এমনি মারেনা। মনে পড়লো, একবার ট্রানশ্লেশান না করাতে কি মারই না তাকে মেরেছিল দাদা। বললে, নিশ্চয়ই কোন দুষ্টুমি করেছিলে?

—দুষ্টুমি! নীহার বিস্মিত দৃষ্টি মেলে উত্তর দিয়েছিল, দুষ্টুমি করবো তোমার দাদার সঙ্গে? রক্ষে কর বাবা।

—তা হলে? নিশ্চয়ই অবাধ্যতা করেছিলে?

—হুঁ, নীহার আস্তে আস্তে উত্তর দেয়।

—কি অবাধ্যতা করেছিলে? রমেন প্রশ্ন করে।

—না, সে আমি [illegible] মরে গেলেও বলতে পারবো না। নীহার লজ্জায় লাল হয়ে গিয়েছিল।

—বারে, না বললে আমি কি করে বুঝবো বলো?

—তোমার বাপু বুঝে কাজ নেই।

—দাঁড়াও তোমায় ম্যাসেজ করে দিচ্ছি। বলে রমেন নিষেধের অপেক্ষা

না করেই তেল আর নুন নিয়ে নীহারের পিঠে মালিশ করে দিতে লাগলো।

—আচ্ছা বৌদি, রমেন কি ভেবে বললে, তুমি দুএক ঘা লাগাতে পারো না?

—আমি! নীহার আকাশ থেকে পড়লো, বল কি গো ঠাকুর-পো?

—কেন? দাদা তোমার চেয়ে জোয়ান বলে বুঝি? রমেন সগর্বে বললে, রেখে দাও তোমার জোয়ান। এস্যা প্যাচ আছে, যতো বড়ই ইয়ে হোক না কেন, একটিতেই কুপোকাৎ। নাকে গদাম করে একটি হাঁকড়াবে ঘুসি—দেখবে বাছাধনকে আর উঠতে হবে না।

—ছি ঠাকুর-পো! নীহার কৃত্রিম রোষে উত্তর দিয়েছিল, ওকথা কি বলতে আছে, তিনি না তোমার গুরুজন!

—আরে রেখে দাও তোমার গুরুজন, তেল ডলতে ডলতে রমেন বীরত্ব প্রকাশ করে, তোমায় মারবে আর তুমি বুঝি... ঐ রে দাদা আসছে।

নিমেষের মধ্যে রমেন অদৃশ্য হয়ে গেল আর নীহারও পিঠটা ত্রস্তে ঢেকে রান্নায় লেগে গেল।

এমনি করে বছর ঘুরে গেছে। ক্লাশের পর ক্লাশ' ঠাকুর-পো পেরিয়ে গেছে। দুজনের কত স্মৃতিই-না জমে আছে। আম কুড়ানো, সাঁতার কাটা, চালতে মাথা খাওয়া—মারপিট করা—কত কি। সেই রমেন একদিন ম্যাট্রিক পাশ করলো। শহরে যাবে কলেজে পড়তে। বিদায়ের দিন এলো। বলতে কি, কিছুদিন থেকেই নীহারের কান্না পাচ্ছিল—অকারণ কান্না। লোকে দেখলে কি বলবে! কিন্তু যাবার দিন সে প্রায় উচ্চস্বরেই কেঁদে ফেলেছিল। রমেনও কেঁদেছিল। চলে যাওয়ার অনেক দিন পর্যন্ত তার ভীষণ একা একা মনে হয়েছে। গিয়ে অবশ্য তার কাছেই প্রথম চিঠি লিখে-ছিল। চিঠি পেয়ে সে যে কি করবে ভেবে পায়নি। স্বামীর চিঠি পেলেও বুঝি কারো এতো [illegible]দ হয় না। অবশ্য স্বামীর চিঠি পাওয়ার সৌভাগ্য তার হয়নি। কেননা, বিয়ের পর থেকে স্বামীর কাছ ছাড়া সে হয়নি এপর্যন্ত। বছর দুবার ছুটিতে রমেন আসতো।

সে কটাদিন যেন নীহারের নিমেষে ফুরিয়ে যেতো।

শেষ-দিকটায় রমেন খুব পালটে গিয়েছিল। চুল ওলটানো, কি সুন্দর জামা। 'জুতোর কি ঢং, আবার সিগারেট খাওয়া হতো লুকিয়ে লুকিয়ে। বাব্বা, নীহার তো ছেলের স্টাইল দেখে হাঁ হয়ে গিয়েছিল। আর কি ভীষণ চালাকই-না হয়ে উঠেছিল ঠাকুর-পো। কথায় আর পেরে ওঠা যায় না কিছুতেই। আবার ইংরিজী বলতো কথায় কথায়! কি সুন্দর যে শোনাতো। —বেশ লাগতো।

রমেন বলতো, তুমি বড্ডো পাড়াগেঁয়ে, বৌদি? উঃ, শহরে মেয়েরা কি রকম ফরোয়ার্ড!

নীহার বলতো, তা আমায়ও শহরে নিয়ে চল তাহলে?

—এই ড্রেসে! তা বটে, জুতো পরতে পারবে?

—জুতো! বুট জুতো নাকি! নীহার তো হেসেই অস্থির, মাগো সে তো পুরুষে পরে—

—নাঃ হোপলেস। রমেন বলতো, বুট কেন, হাইহিল জুতো। না, তা পড়লে বাপু তুমি পায়ের গোড়ালীই ভেঙ্গে ফেলবে।

—সে আবার কি জুতো বাবা। কাজ নেই আমার পরে'। তুমি বিয়ে করে বউকে পরিও।

—তা তো পরাবোই। তোমার মতো পায়ে হাজা থাকবে নাকি তার—

নীহার অভিমান করে যেতে যেতে বলেছিল, বেশ তো পরিও তাকে। আমার বাপু হাজাই ভাল।

—আহা চটলে নাকি? বৌদি শোন—

—না, তোমার কোন কথাই শুনবো না।

—নীহারকে ধরে নিয়ে রমেন বলতো, জান বৌদি—উঃ কী ফাইন টকি বায়স্কোপ......

—সে আবার কি গো?

—আহা—তুমি শুনলে তাজ্জব বনে যাবে। বায়স্কোপে মানুষের মতো কথা কয়, ভাবতে পারো?

—সত্যি! আমি দেখবো ঠাকুর-পো, নীহার মিনতি করে, আমায় নিয়ে চল তোমার সঙ্গে।

—হুঃ, দাদা তোমায় ছাড়বে কিনা—।

অবশ্য ঠাকুর-পো আর আগের মত দাদাকে ভয় করতো না। আর দাদাও কেন জানি ঠাকুরপোকে সমিহ করেই চলতো।

হাজার হোক শহরে-পড়া কত পাশ-দেওয়া ছেলে তো? শেষ পর্যন্ত অনেক বলে কয়ে রাজী করালো। নীহারের জীবনের সবচেয়ে আনন্দের দিন। শহরে গিয়ে টকি-বায়স্কোপ—থিয়েটার, ট্রাম-গাড়ি, মোটরবাস, গড়ের মাঠ, চিড়িয়াখানা আরো কত কিযে দেখে এলো—নীহারের সব মনেও নাই। উঃ স্বর্গপুরী ঐ কলকাতা। কি সব দালান—বাব্বা।

কিন্তু কিছুদিন আরো পরে টের পেলো ঠাকুরপো তার কাছ থেকে অনেক দূরে সরে গেছে। সেই ছেলেবেলার বন্ধু আর সে নেই। মনের কথা আর তাকে অকপটে বলা যায় না। ঠাট্টা করে' উড়িয়ে দেয়। অবশ্য এখন তার নিজের বলতেও কেমন লজ্জা লজ্জা করে। সতের আঠারো বছরের ধিঙ্গি বউ সে। ঠাকুর-পো তার হারিয়ে গেছে। —ভেবে ভেবে তার কান্না পেতো।

খোকন যেবারে হবে ঠাকুর-পো তখন বি এ পড়ছে। প্রথম প্রথম তো ঠাকুর-পোর সামনে যেতেই তার লজ্জা করতো।

খোকার তখন দুমাস বয়েস। হঠাৎ ঠাকুরপো এসে হাজির, বললে, একটা চাকরী পেয়েছি বৌদি?

—চাকরী! সে কোথায়?

—বোম্বেতে—এক কাপড়ের কলে। দুশো টাকা মাইনে—

—সে আবার কতদূরে—বোম্বে?

—রেলগাড়িতে তিন দিন লাগে যেতে।

—তিন দিন লাগে রেল গাড়িতে, নীহারের মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল, সে তো পৃথিবীর ওপারে গো—

—পাগল তুমি বৌদি, রমেন হেসে বলেছিল, বোম্বে সেতো এখানে। তা ছাড়া কতো মাইনে—

—ছাই এর মাইনে। কি হবে অতো দূরে গিয়ে। তার চেয়ে তুমিও দাদার ইস্কুলে একটা মাস্টারী নাও না কেন?

মাস্টারি! রমেন বিরক্তিতে ভুরু কুঁচকে লেছিল, এই জীবন মাস্টারী করলে র জন্মে সে গাধা হয়। মানুষ মানুষই াকে না—

তা ঠিকই। নীহার স্বামীকে দিয়েই ঝেছে। এমন নিরস লোক বড় একটা দখা যায় না। মেজাজ খিট্‌খিটে। সব ময়েই মাস্টারী ভাব। তবুও তার ভাল াগছিল না—এত দূরে চলে যাবে াকুর-পো! একটা অসুখ বিসুখ হলে খন? একি অলক্ষুণে কথা ভাবছে ীহার! নিজের মনেই সে লজ্জিত হয়ে ঠে।

ঠাকুর-পো চলে যাবার পর এক বছর কটে গেছে। মাঝে একবার সে এসেছিল। নেকটা বদলে গেলেও দুষ্টুমি আগের ত ঠিকই আছে।

সেবার এলো গোঁফ নিয়ে। ঠিক তার াদার মতো ঝাঁটা গোঁফ নিয়ে। নীহার প্রথম দর্শনেই আঁতকে উঠে বললে— ক ঘেন্না ঠাকুর-পো, তুমি সেই বিচ্ছিরি গোঁফ রেখেছো?

—বেশ করিছি, রমেন হাসিমুখেই বললে, তোমার তো অসুবিধে হবে না। া ছাড়া এটা আমাদের বংশের গৌরব। াদার আছে, আমারও থাকবে।

—ইস্ থাকাচ্ছি, নীহার বলেছিল।

—দেখো থাকে কিনা—

সেই দিন দুপুরেই রমেন ঘুমুতে, নীহার পা টিপে টিপে গিয়ে সেপ্টি রেজার দিয়ে একটানে প্রায় আধাআধি গোঁফ কেটে ফেলতেই রমেন জেগে উঠলো। তারপর কি হুটোপুটি ছেলে-মানুষের মতো। খোকা তো তার মাকে মারছে ভেবে কেঁদেই অস্থির।

সেই ঠাকুর-পোকে বহু সাধ্যসাধনার পর বিয়ে করতে রাজী করানো হয়েছে। এক রকম নিমরাজি। কোন ছেলেইবা বিয়ের আগে সম্পূর্ণ রাজি ভাবটা দেখায়। প্রথমে তো কিছুতেই করবে না— নীহারের মন্দ লাগছিল না কিন্তু যখন সত্যি সত্যিই বিয়ে করতে রাজি হয়ে গেল, ভগবান জানেন নীহারের কেন যেন মন খারাপ হয়ে এলো। এ রকম অদ্ভুত পোড়া-মন নীহার জন্মে দেখেনি। এর কোন কারণও খুঁজে পেলো না সে।

মেয়েটিকে নীহার নিজে দেখে পছন্দ করেছে। অবশ্য সে মনে মনে জানে যে, তার চেয়ে কনে কোন মতেই সুন্দরী নয়। এইভাবে পছন্দ হওয়ায় যেন সে আরো খুসী হয়েছে।

বোম্বে থেকে ঠাকুর-পো এলো। এসেও সে গোঁ ছাড়ে না। বলে, কেন মিছিমিছি আমার বিয়ে দিচ্ছ তোমরা। কোন প্রয়োজনটা ছিল?

নীহার হেসে বলে, তাই বটে। প্রয়োজন খালি আমাদেরই না? তা নয় হলোই বাপু। আমি দেখছো না বুড়ো হয়েছি। খোকা আর খুকীকে নিয়ে একা একা আমি আর পেরে উঠছি না বাপু।

—যাও ন্যাকামী করো না। বাইশ বছরের মেয়ের মুখে বুড়ো কথা শুনলে গা জ্বলে যায়। কষ্ট হচ্ছে কেন? একটা ঠাকুর আর একটা চাকর রেখে নিলেই পারো। কতদিন বলেছি না।

—ও বাবা, ভারী বড়লোক হয়ে গেছি না?

—তা বটে। টাকাগুলো দাদা কেবল পুঁজি করছে। তোমায় পেয়েছে দাসী।

—সেই জন্যেই তো দয়াময়কে একটি দাসী এনে আমায় সেবা করতে বলছি।

নীহার বোঝে এ সব রমেনের চালাকী। বিয়ে করবার ইচ্ছেটি ষোল আনা।

হাজার ব্যস্ততার মধ্যে বিয়ে হয়ে গেল। নীহার এক মুহূর্তে সময় পায়নি। আজ একটু সে চোখ তুলে চাইবার অবসর পেলো। আজকে ফুলশয্যা।

পাড়ার যতো কচি বউ আর মেয়েগুলো নতুন বউকে ঘিরে রয়েছে। রমেন বেচারা ঘুর ঘুর করছে চারদিকে। নীহারের মনে হয়েছে সে চাইলেই যেন ঠাকুর-পো একটু গম্ভীর হয়ে যায়, না হলে যেন মুখ টিপে হাসে। মোটমাট বৌ পছন্দ নিশ্চয়ই হয়েছে।

দিন গড়িয়ে এলো। এর মধ্যে ফাঁক বুঝে রমেন বউএর সঙ্গে নিরালায় কি যেন গুজুর গুজুর করেছেও—নীহারের চোখ এড়ায়নি তা। ও বাবা এরই মধ্যে এতো? ফুলশয্যাও পেরুলো না। কিন্তু নীহার ঠাট্টা করে কিছু বলতে গেলেই দেখেছে রমেনের মুখ গম্ভীর। নীহারের মনে খট্‌কা রয়ে গেল।

আড়াল থেকে নীহারের একবার কানে এলো, রমেন নতুন বউকে কি যেন বলছে— শুধু শুনতে পেলে, এ আমার আদেশ ......ভাল হবে না তাহলে। নীহার কিছুই বুঝতে পারলো না। এমনিতেই তার মন খারাপ হয়ে আছে।

রাত্তিরে খাওয়াদাওয়া হৈচৈ এক সময় থেমে এলো। রাত্রি প্রায় বারোটা। বাড়ি নিঝুম হয়ে এসেছে। ফুলে ফুলে বিছানাটা চমৎকার হয়ে উঠেছে। নীহারের আরেকটুকু কাজ বাকী—তার পরেই বিশ্রাম। পাড়ার মেয়েগুলো এখনো যায় নি। আড়ি পাতবার উৎসাহে কিলবিল করছে।

নীহারের মনটাও কেমন করছে যেন। তার নিজের ফুলশয্যা যেন কণ্টক-শয্যা হয়েছিল। ঐ ঝাঁটা গোঁফ দেখেই তার পিত্তি জ্বলে গিয়েছিল, তার উপরে যে বেরসিক ছিল তার স্বামী প্রবর। তার নিজের কৌতূহলও কম নয় আড়ি পাতবার। দেখা যাক্ তার আদরের ঠাকুর-পোর ফুলশয্যা কিভাবে আরম্ভ হয়।

দুজনকে শুইয়ে দিয়ে নীহার বেরিয়ে এলো ভারী মন নিয়ে। পাড়ার মেয়ে-গুলো জানালার ছিদ্রপথে নীচু হয়ে আছে। মৃদু ধমকও নীহার দু-একজনকে দিল। এরা না গেলে তার নিজের অসুবিধে হয় আড়ি পাতবার। চাপা হাসি, ঔৎসুক্য ও মৃদু গুঞ্জন চলছে পাড়ার মেয়েদের মধ্যে। ঘরের মধ্যে কি হচ্ছে কে জানে। নীহার কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো অন্ধকারে। দৃষ্টি তার পাড়ার মেয়েগুলোর দিকে।

হঠাৎ সমস্তগুলো মেয়ে সরে এলো জানালা থেকে। একজন নীহারের কাছে এসে মলিন মুখে কি যেন বললে। নিমেষে নীহারের মুখ ছাইএর মত হয়ে গেল। কাঁপতে কাঁপতে সে জানালার ছিদ্রপথে দৃষ্টি রাখলো।

দেখলো—রমেন, তার ঠাকুরপো, প্রায় চুলে ধরে নতুন বৌকে খাট থেকে নীচে ফেলে কি যেন বলছে। চাপা রুদ্ধস্বর। নতুন বউ মুখে হাত রেখে বোধ হয় কাঁদছে। সেকি! নীহার বিশেষ কিছু প্রথমটা ভাবতেই পারলো না। অকস্মাৎ তার মনে এক অদ্ভুত আনন্দস্রোত বয়ে গেল। মুহূর্তখানেক। তার পরেই ভীতভাব এলো। দৌড়ে এসে দরজায়

আঘাত করে ডাকলো—ঠাকুর-পো। ঠাকুর-পো শিগ্গির দরজা খোল—খোল।

ভেতর থেকে কোন সাড়া এলো না। কয়েকটা শব্দ—মনে হল মারের।

—ঠাকুর-পো! শুনতে পাচ্ছ না?

কোন উত্তর এলো না।

নীহার অনন্যোপায় হয়ে পাগলের মতো ছুটে গেল তার ঘরে। স্বামী রমেশকে বললে—ওগো শিগ্গির একবার এসো না—

রমেশ হিসেব মেলাচ্ছিল, বিরক্তভাবে বললে, আবার কোথায় যেতে হবে—এ্যাঃ

—একবার ঠাকুর-পোকে ডাকো না?

—আরে গেলো জা, রমেশ রেগে উঠলো, ইয়ারকি করা হচ্ছে নাকি আমার সঙ্গে এ্যাঃ।

—না না সত্যি ইয়ারকি নয় গো, নীহার কাঁদ-কাঁদস্বরে বললে—ঠাকুর-পো যেন কি রকম করছে!

—মানে, রমেশ এবার উঠে এলো, কি হয়েছে খুলে বল।

—বলছি, আগে তুমি ডাকো—

রমেশ এসে ডাকলো—রণা—রণা।

কোন শব্দ নেই। নীহার বললে—ঠাকুর-পো নতুন বউকে নীচে ফেলে ভীষণ মারছে।

—মারছে! কেন? রণা? এই রণা—দরজা জলদি খোল্।

ভিতরে চুপ হয়ে গেল।

—রণা।

—খুলছি দাদা।

দরজা খুলে গেল। লজ্জিত মুখে রমেন দাঁড়িয়ে।

—তুই নাকি বউমাকে মারছিস। কিরে? ভদ্রতাবোধ মানবতা সব লোপ পেয়ে ইতরামো আরম্ভ করেছো।

—না দাদা—তুমি যাও। কিছুই তো হয়নি। রমেন লজ্জিতস্বরে বললে—

—কিচ্ছু হয়নি হারামজাদা, দাদা গর্জে উঠলো। বউমা তুমিই বলতো কি হয়েছিল?

নীহার ততক্ষণে দৌড়ে গিয়ে নতুন বৌকে জড়িয়ে ধরেছে। ওমা একি, হাসছে যে নতুন বউ।

নতুন বউ লজ্জায় যেন মিশে গেল।

কি হয়েছে বলতো বোন। নীহার জিজ্ঞেস করলে, কেন মারছিল।

নতুন বউ অনেক কষ্টে যা বললে তাতে প্রকাশ পেলো, রমেন তাকে সমস্ত দিন ধরে শিখিয়েছে—কি রকম প্রহারের অভিনয় করতে হবে। সে কিছুতেই রাজী হতে চায়নি। তাকে বোঝানো হয়েছিল যে, যারা আড়ি পাতবে তাদের জব্দ করবার জন্যেই এই রকম মজা করতে হবে।

শুনে রমেশ নীহারের দিকে বিষদৃষ্টি নিক্ষেপ করে— নির্বোধ রমণী।

শুধু এই কয়টি কথা বলেই চলে গেল।

রমেন লজ্জায় দাঁড়িয়ে রইল। দাদা চলে যেতে কৌতুহলের হাসিতে বৌদির দিকে চাইল।

নীহার ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে। তার মুখ অস্বাভাবিক ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। অকস্মাৎ সে কেঁদে ফেললো।

—একি করলে ঠাকুরপো তুমি, একি করলে; কাঁদতে কাঁদতেই নীহার বলে উঠলো, আমার যে আর মুখ দেখাবার উপায় রইলো না। কেন তুমি আমায় এভাবে অপমান করলে, কী অপরাধ আমি তোমার কাছে করেছিলাম—

নীহার দ্রুত সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। রমেন নিস্তব্ধ হয়ে দরজার দিকে চেয়ে রইল।

হরিণী

শ্রীসুকুমার রায়

তীরটি ছুটিল, লাগিল তাহা হরিণী-গায়,
ফিরিয়া তাকাল, ব্যথিত দৃষ্টি হানিল হায়!
যত সুর ছিল তাহার বুকেতে
তাহাতে পড়িল টান।
কালিমা বিহীন হরিণী-আঁখিতে
খেলিয়া গেল রে বান।
মধুর আবেগে তাহার নয়ন,
জুড়ায়ে আসে।
চারিদিকে তার আলোর চরণ,
শুকায়ে আসে।
আকাশের কোণে চাঁদ দেখা দিয়া,
নদীর জলে বিছাল শয়ন।
শেষবার তরে আলোরে চুমিয়া,
হরিণী শেষে মুদিল নয়ন।

ছুটি

সমীর ঘোষ

অনেকক্ষণ হোল জেগেছি। তন্দ্রা তাই
। করি চোখের পাতায় জড়িয়ে এলো,
র ঘুমের পালা শুরু হোল।
ট্রেনের ঝাঁকুনীতে মাঝে মাঝে ধাক্কা
। চেতনা যেন সজাগ হয়, শুনতে পাওয়া
গাড়ি চলছে। শুনতে শুনতে আবার
। জড়িয়ে আসে চোখের পাতায়, ঘুম
—ঘুমিয়ে পড়ি।
বশদিনের ছুটি। তার চারদিন তে.
পথে পথে ট্রেন বদলী করতে করতে।
। তাই যখন সজাগ হয়, তখন অভিযোগ
তে পাওয়া যায়, অবকাশ যদি মিললো
এতো কম কেন তার পরিমাণ হোল?
বসাটা হোচ্ছে সৈনিকের অভিযোগ
তে বা করতে সে অভ্যস্ত নয়, তাই
মনকে লাল রং দেখায়, বলে, হতভাগা
!
ন বলে, বেশ চুপ করলেম, আমার ঘুম
হ, ঘুমোই।
জাগ চেতনা বলে, হ্যারে ঘুমো। দুদিন
নিকেশ হোয়েছে, আরো দুদিন হোয়ে
। শোন না গাড়ী কি জোরে চলেছে।
ই চড়াই উৎরাচ্ছে, পিস্টন কি তাড়া-
ঘুরছে, বলছে, ধ্যাৎতেরিকা,
তেরিকা!........
মন করে জেগে ঘুমিয়ে, দুই পাশের
প্রান্তর, শহর বন দেখা শেষ করে চার-
ফুরিয়ে গেলে, পাঁচদিনের সকালে ট্রেন
টা থেকে কলকাতায় পাড়ি শেষ
।
কাশ পরিষ্কার। গংগার সাদা জলে নীল
শের ছায়া পড়েছে। রোদের তীব্র
মুঠি মুঠি অপরূপ ঐশ্বর্য যেন কে
র তীরে তীরে ছড়িয় গেছে। স্টেশনের
পা দিয়ে মন তাই বলে উঠলো:
মুক্তি! সমস্ত শরীরটা হোয়ে গেল
। কে যেন ভালোবাসার মোহন আর
হাতের প্রাণবন্ত ছোঁয়া লাগিয়ে জাদু-
। মতোন মুছে নিয়ে গেল দীর্ঘদিনের
দ, সৈনিকের এই পরিচ্ছদটার কর্কশতা,
নীয়তা। সমস্ত অনুভূতিগুলো হঠাৎ
নরম হোয়ে পড়লো, কার যেন
লত দুই বাহুর মধ্যে অনায়াসে, বিনা-
। আত্মসমর্পণ করলো। এ যেন:
দেহ যুদ্ধক্ষেত্র থেকে তুলে এনে
ার হাতে দেওয়া হোয়েছে আর তারই
বাণী প্রতিটি কথার স্পর্শে বাঁচবার
থেকে নতুন করে জাগিয়ে তুলছে।
রকমভাবেই মন হঠাৎ একদিন সকল

বাঁধন এড়িয়ে মুক্তি নেয়। আমাদের সংগে ছিল রেজাক। পুরো নামটা বোধহয় মহম্মদ রেজাক। দেশ তার ছিল সুদূরে পাঞ্জাবের ডেরা-ইসমাইলখানে। বাইরে থেকে দেখলে মনে হোত লোকটা কি কঠিন—। কর্কশতা যেন মূর্ত বিগ্রহ হোয়ে উঠেছে। ব্যবহারও ছিল তার সেইরকম—অত্যন্ত রূঢ় গালাগালি তার জিভের ডগায় জোগানো ছিল।

রেজাককে এই কারণে সকলে এড়িয়ে চলতো, এমনকি তার দেশের লোক পর্যন্ত তার কাছে বিশেষ ঘেঁসতো না। আমাকে সে অবশ্য একটু খাতির করতো। বলতো, বাংগালী আদমী, বহুত লিখাপড়া জানতা হ্যায়।

যে কারণে রেজাককে সকলে এড়িয়ে চলতো, সেই এক কারণেই সকলের মতো আমারও ধারণা ছিল: রেজাকের কোনো সহানুভূতিসম্পন্ন মনোবৃত্তি নেই, ও হোচ্ছে পাথরের মতোন নীরব, নিথর, ও পারে শুধু নায়কের আদেশ প্রতিপালন করতে।

তখন একটা বনের কোণে আমাদের তাঁবু পড়েছে। জায়গাটার নামটা বিশেষ মনে নেই। দিনগুলো কাটছিল, তাঁবুতে যেমন দিন কাটে। তার হিসাব যেমন ছিল না, তেমনি ছিল না কোনো উদ্যত কৌতূহল। খাওয়া, ঘুমানো, কুচকাওয়াজ করা, সাজ-সরঞ্জাম পরিস্কার করে তোলা ছাড়া, সারা পৃথিবীতে যে আর কিছু করবার আছে, সে কথা বেমালুম হজম হোয়ে গেছল। খালি রাত্রিতে যার গ্যারিসন ডিউটি পড়তো, সে ছাড়া আর কেউ বোধহয় আকাশের দিকে চোখ তুলেও চাইতো না। রোদের সংগে যেমন কোনো মাখামাখি ছিল না, তেমনি আমরা বর্ষাকেও চলতি পথের কাহিনী ছাড়া অন্য কোনো সম্মান কোনোদিন দিইনি।

রাতগুলো যখন এমনভাবে দিনের মতোনই বৈচিত্র্যের অভাবে বিশেষত্বহীন হোয়ে ফুরিয়ে যাচ্ছিল সেই বনের কোলের তাঁবুতে, সেই সময় হঠাৎ একদিন ঘুম ভাঙলো—অজস্র ঘামেতে ভিজে গিয়ে। পাশ ফিরে আবার ঘুমের জের টানবার চেষ্টা করলেম বটে, কিন্তু সে চেষ্টা সফল হোল না। কম্বলের ওপর উঠে বসলাম। বাইরে যাওয়া এসব ক্ষেত্রে নিয়ম না হোলেও, বেপরোয়া মন বললো, চল বাইরে!

তাঁবুর দরজাটা দুলে ওঠার সংগে সংগে গম্ভীর গলার আওয়াজ ঝম্‌ঝমিয়ে উঠলো হল্ট, খবরদার!

সম্পূর্ণ অবহিত হোয়ে দাঁড়িয়ে গেলাম, রেজাক, রেজাক এখন পাহাড়ায়!

দীর্ঘ পা ফেলে রেজাক এগিয়ে এলো, আরে, কে'ও বাবুজী!

—হাঁ, হাঁ, ময় চৌধুরী হুঁ!

—বাহার চলায়াঁ।

—রেজাককে বুঝিয়ে দিলাম ঘুম ভেঙে যাবার পরের ব্যাপার।

—আপলোকান বালবাচ্চাওলা আদমী হ্যাঁয়, আপলোকানকা তো জরুর এায়সা হোনে শকতা হ্যায় বাবুজী!

রেজাককে বাধা দিলাম, হম বাবুজী নেহি হ্যায়, ময় চৌধুরী হুঁ, তুম যায়সা মাফিক রেজাক হ্যায়।

—নেহি, নেহি, রেজাক আমার কথা সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করলো, আপ বাংগালী লোকান্ বহুত লিখাপড়া পচানত আদমি হ্যায়—আপলোকান সব বাবুজী!

—বহুৎ আচ্ছা, ময় রেজাককো বাবুজী।

রেজাকের সংগে সুখদুঃখের গল্প জমে উঠলো। ও-কিছুতেই ভেবে স্থির করতে পারতো না লেখাপড়া শিখেও কেন আমি তার মতোন সৈনিকের বৃত্তি অবলম্বন করেছি। তার মতে যারা অজ্ঞ, তারাই এই পেশা অবলম্বন করবে।

সে যাই হোক্ সেই রাত্রিতে গল্পটা কিছুটা জমে ওঠবার পরই হঠাৎ রেজাক তার সার্টসের পকেটে হাত ঢুকিয়ে কি যেন বের করে নিলো। আমাকে হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বললো, গন্ধটা কেমন লাগছে বাবুজী?

একটা তীব্র অথচ মিষ্টি গন্ধে সমস্ত শরীরটা যেন ঝিম ঝিম করে উঠলো। নাকটা সজোরে সরিয়ে নিলাম: গন্ধটা জানা বলে মনে হোলেও কিসের গন্ধ তা ঠিক করতে পারলাম না। রেজাককে উত্তর দিলাম, বড়ো জবর খোসবু রেজাক!

রেজাক মাথা নাড়লো, হাঁ—এ আমাদের দেশের ফুল, ইংলিশরা একে আজলি বলে —পাহাড়ের কোলে যখন এ ফুল ফোটে...

কথা শেষ না করে রেজাক চুপ করে রইলো। কয়েক মিনিট কেটে গেলে আমি তার অসমাপ্ত বাক্যের জের টেনে বললাম, আজলি যখন তোমাদের দেশে পাহাড়ের কোলে ফোটে, তখন কি হয় রেজাক?

বাঁ হাতে রাইফেলটা ধরা ছিল। ডান হাতটা আকাশের দিকে উঁচিয়ে রেজাক

বললো, আকাশ তখন ঠিক এমনই পরিষ্কার তারাভরা হোয়ে থাকে। কন্‌কনে ঠান্ডা বাতাস বয়, ঘর ছেড়ে কেউ বাইরে যেতে চায় না। তবুও মাঝে মাঝে যখন ঠান্ডা বাতাসের কনকনানির সংগে আজলির মিষ্টি গন্ধ ভেসে আসে, তখন মনটা পাগল হোয়ে যায়, সমস্ত ঠান্ডা অগ্রাহ্য করে মানুষ পথে বেড়িয়ে পড়ে। আজ বিকালে হঠাৎ ওই বনে বেড়াতে গিয়েছিলাম। জানি না, ওখানে অসময়ে কেমন করে আজলি ফুটেছিল। মিষ্টি গন্ধে সমস্ত টিলটা বেপরোয়া হোয়ে গেল, একমুঠো ফুল লুট করে খাকি সার্টের পকেটে ভরে ফেললাম.........

আজ রাত্রিতে আমার ডিউটি না থাকলে আমি পাগল হোয়ে যেতাম, আমার ঘুম আসতো না—তাইতো বলছিলাম: আপনি বালবাচ্ছওলা আদমি—আপনার তো ঘুম ভাঙ্গবেই।

পরের দিন দুপুর বেলায় হঠাৎ হুকুম এলো এক ঘণ্টার মধ্যে আমাদের তাঁবু-ভেংগে যাত্রা করতে হবে।

আমরা তাই করলাম। কুচকাওয়াজ করে এগিয়ে যেতে যেতে দেখলাম, আমার থেকে সামান্য দূরে রেজাক চলেছে। মাথার চুলগুলো তার পাগড়ীর ফাঁকে ঘাড়ের দিকে খোঁচা খোঁচা ভালুকের গায়ের লোমের মতো কর্কশ হয়ে বেরিয়ে আছে মুখ তার কঠিন। কাঁধের রাইফেল শুধু ঝকঝকে নয়, অতিমাত্রায় যেন রক্তলোলুপ। কাল রাত্রিতে তারা-ভরা অসীম আকাশের দিকে চেয়ে এই রেজাক ঘুমায়নি, তার পাহাড়ী আজলি ফুলের মোহে সে বিভোর হোয়ে গেছল যেন সে পূর্ণবয়স্কা কোনো মেয়ের আকর্ষণে জড়িয়ে গেছল।

ও কথা থাক। লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে গেলাম। মাঠের নরম ঘাসে অথবা কাদায় যে বুট বসে যেতো, যার কোনো আওয়াজ পেতাম না, শক্ত পিচের ঢালাই রাস্তায় সে যেন অবসানমুক্ত যৌবনের মতোন জেগে উঠলো: খট্ খট্ খট্! কানে পরিচিত মাদকতার সুর বাজলো, এগিয়ে গেলাম জোরে, তাড়াতাড়ি, সকাল বেলার রোদের মতোন সাঁই সাঁই করে।

বিস্ময়ের কিছু নেই, তবুও পথের দুধারের ঘর-বাড়ি যেন অপূর্ব বলে মনে হোতে লাগলো: আমি যেন ফ্রেমে বাঁধানো ছবি দেখছি। ছোটখাট দোকান, অনেকতলা উঁচু বাড়ি, বিদেশীর হোটেল, ইলেকট্রীক্ ট্রামের মসৃনগতি, সামরিক লরীর অতিব্যস্ত চলাফেরা—কেমন যেন অদ্ভুত বলে মনে হোতে লাগলো; মন বলে উঠলো: ভাবতে কি পারছো কোথায় এসেছো?

কোথায় এলাম? সামনে একটা পান-বিড়ির দোকান, সেখানে গিয়ে কেন জানি না, দাঁড়ালাম। দোকানদার তাড়াতাড়ি এক প্যাকেট সিগারেট এগিয়ে দিয়ে বললো, সাব, উইলস্ সিগারেট?

সাব!—সামনের আয়নাখানায় নিজের মুখ একবার দেখে নিলাম—সম্পূর্ণ কালো-মুখ—ক্রোড়পত্র জুড়লে শ্যামল বলা চলে। ইতিমধ্যে সচকিত হোয়ে দেখলাম আমার হাতের মধ্যে সিগারেটের প্যাকেটটা এসে গেছে—পকেটে তখনও দুটো সিগারেটের প্যাকেট রয়েছে, কিন্তু প্রতিবাদ না করে দাম দিয়ে দিলাম। তারপর একটা সিগারেট ধরিয়ে এগিয়ে চললাম। বহুদিন কলকাতার দোকান থেকে, সভ্য শহরের বুকের ওপর দাঁড়িয়ে জিনিস কিনি নি। আজ কিন্তু কিনেছি, কাল কিনবো, আরো চারদিন—আটদিন কিনতে পারবো। রেডিও গান শুনবো, রেস্টুরান্টে খেতে পারবো, অনেক কিছু—অনেক দিন পরে ছুটি মিলেছে—আমি ঘরের মানুষ হোয়েছি.........

এই ছুটির কথাই তো আমি এতোদিন ভেবেছি। নিজের দেশের ফুল দেখে রেজাক শুধু বিভোর হয় আর আমি আত্মহারা হোয়ে যাই যখন কোনো সমতলে ছাউনী পড়ে। গুন্ গুন্ করে কে যেন আমার হৃদয়ের তারে সুর তোলে: বাঙলা—সমতল সৌন্দর্য-বিভোরা শ্যামল বাঙলা।

বসন্তের রাত্রিতে পাহাড়ী উপত্যকা যখন ঐশ্বর্যের অপরূপ সম্ভারে অবনমিত হোয়ে পড়ে, তখন যতোই মাদকতা জাগুক না কেন মনে আর দেহে, হৃদয় কিন্তু ভুলতে পারে না—ধানের সবুজ চাদর বিছানো মাঠের কথা, কূলে কূলে তরংগ চঞ্চল নদীর জলস্রোতের কাহিনী। তাই যতোদূরেই থাকি, অবসরক্ষণে বৈশাখী চাঁপার কথা মনে পড়ে, রেজাকের আজলির কথায় মনে হয় ঝরন্ত শেফালী ব্যাকুল গন্ধে আমার বাড়ির উঠান ভরে দিয়েছে শরতের সোনার সকালে।

একথা মনে জাগার সংগে সংগে সামরিক জগতের চাঞ্চল্য যেন একটা প্রকাণ্ড বোঝার মতোন বুকের ওপর চেপে বসলো। বিশেষ কিছু না ভেবে বড়ো রাস্তা ছেড়ে পাশের একটা গলিতে ঢুকে পড়লাম।

মুখের ওপর থেকে সোনার রোদ সরে গেল। গলিটা নীরব—মনে হয় শুশ্রূষাকারিণীর ঠান্ডা হাত। পায়ের গতিবেগ আপনি কমে গেল—টুক্ টুক্ করে পা ফেলে আরো এগিয়ে যাওয়া চললো।

আর্তনাদের মতোন কানে এসে বাজলো কার গলার স্বর—পরমুহূর্তে সেই আর্তনাদ যেন করুণ কান্নায় ভেংগে পড়লো। সমস্ত দেহটা অস্থির হোয়ে উঠলো, সে যেন বললো, চিনি, আমি এদের চিনি।

গলিটা পেরিয়ে আবার একটা রাস্তার ওপর এসে পড়লাম। তারপর চোখ গিয়ে পড়লো রাস্তার ওপারের ফুটপাতে।

গানটার সংগে আমার পরিচয় নেই, সুরটা কানে শুনেছি। তবুও কোনো পরিচিতির আশ্বাস সেই সুরের মধ্যে খুঁজে পেলাম না। বাঙলা আর বিহার যেখানে মিলেছে, সেই সীমান্ত ঘেঁসে যে সাঁওতালদের বাস,—তাদের সংগে কোনো ঘনিষ্ঠতা না থাকলেও, একদম অপরিচয়ের কিছু নেই। এদের ভাষাটা সেই কারণে একেবারে কানে অদ্ভুত বলে লাগে না। সেই ভাষার গানের সুর কানে বেজেছে।

সাপুড়ে সাপ খেলাচ্ছে। রাজধানীর পথে গেরুয়া মাটির ঝাঁপিতে পশ্চিমা খেলোয়াড় সাপ খেলাচ্ছে, এটা এমন কিছু নতুন নয়। কিন্তু রাস্তার ও ফুটপাতে বিনা বাঁশিতে যে কালো সাপটা খেলানো হোচ্ছে—ওটা সত্যি যেন কেমন খাপছাড়া। পুরুষটার মোটা গলার গান সত্যি বিশেষত্বহীন। তার কণ্ঠে কোনো মিষ্টতা নেই, গানেতে সুর নেই, কিন্তু সাপটা যেন তার কর্কশ স্পর্শে মাঝে মাঝে বাইরের পৃথিবীর কথা মনে আনছে, সগর্জনে ফণাটা তুলে দাঁড়াচ্ছে কাঁচের মতোন স্থির অথচ উজ্জ্বল চোখ চারপাশের জনতার ওপর ছুঁড়ে দিয়ে। তারপরেই মেয়েটা গাইছে, মিহিগলার করুণ অথচ মিষ্টি আওয়াজে ঘুমপাড়ানী সুরের ঝংকারে সাপটা ফণা নামিয়ে নিচ্ছে, লীলায়িত গতিতে নুয়ে পড়ে পুরুষটার আঙুলের ফাঁক দিয়ে সে গলে পড়ছে ফুটপাতের সিমেন্টের পাকা জমিতে কৌতূহলী জনতা নির্নিমেষে সাপখেলা দেখছে।

সাপটার ওপর থেকে কিন্তু আমার চোখ সরে গেল। না সরে যাবার কোনো কারণ নেই। সাপের সর্পিল গতিটা আমি বড়ো পছন্দ করি—যুদ্ধক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়ার হুকুম এলে ওই পিছলে চলার ছন্দটা বড়ো কাজে লাগে। কিন্তু সাপের ওপর আমার কোনো আকর্ষণ নেই। আমি তো আর সাপুড়ে অথবা সর্পবিশেষজ্ঞ নই! আমার চোখ মানুষের ওপর—মানুষ নিয়ে আমার কারবার। মানুষের দিকেই তাই চেয়ে দেখলাম।

সাজগোজের বাহুল্য এদের কোনোদিন নেই—দরকার হয় না। লালমাটির অসমতলতার বুকে এদের কালোদেহ যেন ফুল ফুটে থাকে। আশেপাশের শাল পিয়াল আর অর্জুন গাছের নিবিড় শ্যামল ছায়ায় এদের স্নেহের পরিচয় পাওয়া যায়। সৃষ্টির প্রথম যুগে মানুষ কেমন ছিল জানি না; সৃষ্টির যে যুগে বাস করছি, সেই যুগের সভ্যতার পরিচয় পেতে পেতে দেহমন যখন ক্ষতবিক্ষত, অবসন্ন হোয়ে পড়ছে, সেই

সময়েও এদের কালোপাথরে কোঁদা দেহের অঙ্গভংগিতে, কারণে অকারণে মুখের হাসি সমস্ত চিত্তকে আনন্দে ভরে দেয়। বিলাসিতা বলতে এরা জানে সমস্ত দিন অবিশ্রান্ত পরিশ্রমের পর 'হাড়িয়া' মদ খাওয়া, সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে দল বেঁধে গান গাইতে গাইতে ঘরে ফেরা। সেই গানের সুর লালমাটির উঁচুনীচু পথের ওপর, প্রান্তরের বুকে, নির্জন সন্ধ্যার আকাশের দিগন্তে ঝরণার জল ঝরণের ঝর ঝর ছন্দে বেজে যায়, পরিষ্কার কৃষ্ণাভ আকাশের গায়ে তারা ফুটিয়ে দেয়। এদের আর একটা দিকের পরিচয় পাওয়া যায় যখন শীত শেষ হোয়ে বসন্তের উন্মাদ বাতাসে শালবনে নতুন পাতা আর ফুল ফোটে। মহুয়া ঝরার মদিরাক্ত গন্ধে চারপাশের প্রকৃতি কাঁপে, পলাশের আগুন-রঙা ফুলের পাপড়িতে লালমাটি জ্বলে ওঠে রূপকথার রাজকন্যার রংগীন সাড়ীর আঁচলের মতোন। তখন হয় খুব ভোরে না হয় জ্যোৎস্না রাতে বসে এদের নাচের আসর। বাঁশির ফুঁপিয়ে ওঠা করুণ সুর, অথবা মাদলের গুরুগম্ভীর আওয়াজ যেন এদের দেহেতে ছন্দ যোগায়, তালে তালে এরা নাচে আপনভোলা উন্মনা নাচ, মেয়েরা দেয় খোঁপাতে গোঁজা ফুলের পাপড়ি ছড়িয়ে। অদ্ভুত না লাগলেও, এদের তখন ভালো লাগে।

আজ তাই চোখ গিয়ে পড়লো এই মানুষগুলোর ওপর। যাদের ভালো লাগতো, তাদের মধ্যে আজ যেন ভালোটাকে খুঁজে পেলাম না। মন জিগ্যেস করলো, এরা এখানে কেন, কে এদের এখানে এনেছে?

আস্তে আস্তে এগিয়ে গিয়ে সামনে দাঁড়ালাম। দেখলাম, পুরুষ মানুষটার গলায় কোনো দরদ নেই, চোখে নেই বাঁচার আনন্দ, উৎসাহ—সব যেন ঘোলাটে চাহনীতে মিলিয়ে গেছে। মেয়েটার দিকে চেয়ে দেখলাম, বয়স বেশী নয়, বোধ হয় তেইশ চব্বিশ। কিন্তু গা বেয়ে ঝরে-পড়া সেই নিটোল কালো লাবণ্য কণ্ঠার বেরিয়ে-আসা হাড়ে পালিয়ে গেছে। খোঁপায় ফুল নেই, জটা জড়িয়ে জড়িয়ে গেছে অনেক দিনের অযত্নে। শুধু তাকে সাঁওতালের মেয়ে বলে চেনা যায়, গলার সেই মোহনসুরে—যদিও সে সুর অবসন্নতায় ম্লান হোয়ে গেছে।

গান থেমে গেল, সাপটা আস্তে আস্তে পুরুষটার পায়ের ফাঁকে আশ্রয় নিলো। মেয়েটা উঠে দাঁড়ালো, হাত বাড়ালো, পয়সা দাও!

আরো পাঁচজনের মতোন মেয়েটার হাতে গোটা কতক পয়সা ফেলে দিলাম। তারপরে এগিয়ে গেলাম। চলতে চলতে আকাশের দিকে চাইলাম: শরতের নীল আকাশ সোনার রোদে ঝক্ ঝক্ করছে—মনটা কিন্তু খারাপ হোয়ে গেছে।

কেন? যে ঘুমন্ত ছিল সে জেগে উঠেছে। তর্কবিতর্ক শুরু হোয়েছে, চিন্তার জগত আলোড়িত। এরা, এই সাঁওতালরা চিরকাল অভাবশূন্য। সাপ নিয়ে এদের কেউ কেউ খেলে বটে, কিন্তু এরা কেউই জাতসাপুড়ে বা বেদে নয়। বাইরের জগত এদের চেনে না। আজ কিন্তু সেই রক্ষণশীলতা বেঁচে নেই—সব স্বাতন্ত্র্য লোপ পেয়েছে। কেন লোপ পেল?

পরিবর্তন নিয়েই মানুষ বেঁচে আছে স্বীকার করি। কিন্তু এতো পরিবর্তন নয় —এযে পরিবর্তনের নামে প্রকৃতির পরিহাস! পয়সা যাদের জীবনে সেদিন পর্যন্ত কোনো প্রয়োজনের শীলমোহর লাগাতে পারে নি, তারাই আজ বিবর্ণমুখে হাত বাড়িয়েছে লোককে আনন্দ দেওয়ার পরিবর্তে পারিশ্রমিক চেয়ে। তরুণীর নাম হয়তো রবিবারী—ওর ওই প্রসারিত হাতের ছোট ছোট কালো আঙুলে পয়সা ভিক্ষার যে আবেদন রয়েছে তার চাইতে সাপটার আশ্রয় যে অনেক বেশী সহজ, সেতো আমার অজানা নয়! এদের জীবনের সেই যে সহজ সজীবতা হারিয়ে গেছে, তার জন্যে দায়ী কে?

সভ্য জগতের সংস্কৃত শিক্ষায় লালিত মন উত্তর দেয়, কালের পরিবর্তন।

এ কথাতো পূর্বে স্বীকার করেছি, কিন্তু বেদনা তো কমে নি? যখনই মনে পড়ে মেদিনীপুর বীরভূম প্রান্তবর্তী সাঁওতালরা লালমাটির বুকে আজও বাসা বেঁধে থাকবার প্রয়াসী, পরিবর্তন যার জীবনছন্দ সেই প্রকৃতি আজও সেখানে সৃষ্টির প্রথম দিনের মতোন চাঁদের আলো ঢালে, বসন্তে উন্মাদ বাতাসে শালবনে নতুন পাতার বন্যা আনে, পলাশের আগুন জ্বলায় অজস্র রংয়ের সম্ভারে, তখন অবিশ্বাসীর মতোন ভাবি—সেই দেশের যারা অধিবাসী, তারা কি আজ যেমন দেখলাম ঠিক এমনিভাবে লালমাটির বুক ছেড়ে মহানগরীর পংকিলতার মধ্যে এসে দাঁড়িয়ে জীবনধারণের জন্যে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে? এদের এই প্রতিযোগিতাকে পতিতবৃত্তি ছাড়া আর কি বলবো? আমার সৈনিকবৃত্তির সংগে, রেজ্জাকের গালিগালাজের সংগে যদি তুলনা করি, তবে কোনো পার্থক্য বোধকরি খুঁজে পাওয়া যাবে না!

কে যেন বলে উঠলো, ঠিক্ ঠিক্ ঠিক্! —রাস্তার ওপর ঘরের দেওয়াল তো নেই, তবে 'ঠিক্ ঠিক্ ঠিক্' বলছে কে? সজাগ হোয়ে উঠলাম, দেখলাম, আমার পায়ের বুট কঠিন পথের বুকে আঘাত হেনে বলছে, ঠিক্ ঠিক্ ঠিক্! তোমার বৃত্তিটাও পতিত, সৈনিক বৃত্তি হোলেও সে বৃত্তিতে তোমার স্বার্থ বড়ো কম জীবনধারণের প্রয়োজনটুকু বাদ দিলে।

সমস্ত মনটার তেতো হয়ে গেল। শরৎ আকাশের অপূর্ব আলোর ঝলকানি যেন পর্দাফেলা তাঁবুর অন্ধকারে ডুবে গেল। বোধ হোল, আমার ছুটি যেন একটা অভিশাপ। কাজ না থাকা আমার পক্ষে সবচাইতে কঠিন শাস্তি। চৌধুরী হওয়ার চাইতে রেজাক হওয়া ভালো ছিল, লিখাপড়া পচানত্ আদমী হওয়ার বালাই তাহলে থাকতো না।

নির্জন পথের ওপরে বুট যেন আমার চিন্তায় আবার সায় দিলো, ঠিক্ ঠিক্ ঠিক্!

ঠিক ছদিন পরে আমার কম্পানী অফিসারের কাছে রিপোর্ট করলাম, আমি ফিরে এসেছি, বাকী ছুটি বাতিল করা হোক!

মেজর জিগ্যেস করলো, চৌধুরী ফিরে এলে? ছুটিটা পুরো কাটালে না কেন?

মেজরকে আসল কথা জানাতে পারলাম না, বলতে পারলামনা, আমি নিজের কাছে নিজেই পতিত হোয়ে গেছি, আমারি চিন্তাস্রোত আমারি বিরুদ্ধে যায়। তাই চিন্তার জগত থেকে পালিয়ে এসেছি প্রচণ্ড কর্মব্যস্ততা গতিশীলতার মধ্যে। মেজরকে শুধু বললাম, যে জন্যে ছুটি নিয়েছিলাম, সে কাজ হোল না।

মেজর কাঁধে একটা চড় মেরে বললো, তাই নাকি? আমি ভাবলাম, মিসেস বুঝি অন্য কারো সংগে পালিয়ে গেছে!

আবার নির্ধারিত দিন শুরু হোয়েছে। রাতের পর রাত জেগে গ্যারিসন ডিউটি করছি, মেজরের হুকুম অক্ষরে অক্ষরে কড়া হাতে প্রতিপালন করে যাচ্ছি। উন্নতিও আমার হোয়েছে।

মনটা কিন্তু ঘুমিয়ে গেছে। পাছে তার ঘুম ভাংগে সেই ভয়ে এ বছরে আর ছুটি নিই নি।

করিতে থাকেন। পরে লালন বড় হইয়া সিরাজসাঁইয়ের কাছেই বাউল ধর্মে দীক্ষিত হন। লালনের অনেক গানের ভণিতায় তাঁহার গুরু সিরাজসাঁই ও শিষ্য তিনুর উল্লেখ পাওয়া যায়। সিরাজসাঁইয়ের বাড়ি মুর্শিদাবাদে নহে, যশোহরে,—এরূপ শুনিয়াছি। এই সব বিষয়ে সন্ধান ও মীমাংসা হওয়া বাঞ্ছনীয়।

লালন আদৌ কায়স্থ ছিলেন, কিংবা অন্য কোন জাতি ছিলেন, তাহা নিশ্চয়ই করিয়া বলা কঠিন। তবে তিনি যে হিন্দু ছিলেন, সে সম্বন্ধে মতদ্বৈধ নাই। কিন্তু তাঁহার জাতি সম্বন্ধে নানাজনের নানা উক্তির মধ্যে বিরোধিতা দৃষ্ট হয়। লালনকে তাঁহার জাতিধর্মের কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি গানেই তাহা উত্তর দিতেন:—

"সব লোকে কয়
লালন কি জাত সংসারে।
আসবার-যাবার বেলা
চিহ্ন-নামা কি আছে?
ছুন্নৎ দিলে হয় মুছলমান,
নারী-লোকের কি হয় বিধান?
বামুন চিনি পৈতার প্রমাণ
বামুনী চিনি কিসেতে?
লালনের জাতের খেতাব
ডুবেছে সাধুর বাজারে॥"

লালন "জাতির খেতাব সাধুর বাজারে ডুবিয়াছে।" তিনি সাধু-সন্ত, উদাসী বাউল-ফকির,—ইহাই তাঁহার একমাত্র পরিচয়; কোন জাতিধর্মের সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ নহেন।

হিন্দু ও মুসলমান এই উভয় সম্প্রদায়েরই বহু গোঁড়া ধর্মধ্বজীর সঙ্গে লালনকে ধর্মসম্বন্ধীয় তর্কে ও বিচারে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছে। কিন্তু প্রত্যেকবারেই তিনি জয়ী হইয়াছেন। বহু পদস্থ ও ক্ষমতাশালী ব্যক্তি তর্কে তাঁহার নিকট পরাজিত হইয়া তাঁহাকে বিজয়ীর সম্মানে সম্মানিত করিয়াছেন।

লালনের নিম্নলিখিত গানটির ভণিতায় সিরাজসাঁইয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়:—

"ও কে কথা কয় রে,
দেখা দেয় না।
নড়ে, চড়ে হাতের কাছে
খুঁজলে জনম-ভর মেলে না॥
আমি খুঁজি তারে আসমান্-জমি,
আমাতে না চিনি আমি;
এ বড় বিষম ভ্রম-ই
আমি কোন্ জন, সে কোন্ জনা॥
রাম, রহমান বলে সেই জন,
ক্ষিতি, জল, তেজ কয় হুতাশন;
করিলে হায় তায় অন্বেষণ,
মূর্খ বলে কেউ শুধায় না॥
(তার) হাতের কাছে হয় না খবর,
কি দেখতে যাও দিল্লী-লাহোর?
সিরাজ সাঁই কয় রে লালন,
মনের ভ্রম তোর গেল না॥"

গানটিতে সাধক-কবি পরমাত্মার স্বরূপ-নির্ণয়ের চেষ্টায় ব্যাকুল ভাবটি সুন্দররূপে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।

লালনের এইরূপ আর একটি গান:—

"আমার এ ঘর-কন্নায়
কে বসত করে?
নড়ে চড়ে ঈশান কোণে
ধরতে গেলে পাইনে তারে॥
সবে বলে প্রাণ-পাখী,
শুনে চুপে চুপে থাকি
ও সে, জল, কি হুতাশন,
ক্ষিতি কি পবন,
আমায় কেউ দিল না
একটা নির্ণয় করে॥
আপন ঘরের খবর হয় না,
বাঞ্ছা কর মন, পরকে চেনা।
ফকির লালন বলে পর,
ওসে, বলতে পরমেশ্বর;
ও সে কেমন রূপ,
আমি কোন্ রূপেরে?"

লালনের অধিকাংশ গান জটিল দেহ-তত্ত্বের হেঁয়ালী এড়াইয়া উচ্চস্তরের দার্শনিক ভাব, ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসার ব্যাকুলতা ভক্তিরসের আকুল করা পবিত্র ভাব অবলম্বন করিয়া রচিত হইয়াছে। তাঁহার ভজন-গান-গুলি ভক্তিরসের নির্ঝর। তাঁহার "গান" সম্বন্ধে বারান্তরে আলোচনা করার ইচ্ছা রহিল।

মুর্শিদ অর্থাৎ গুরু-বাদী, মারফত-পন্থী সুফী ও বাউল সম্প্রদায় সাধারণত তাঁহাদের নামের সহিত "শা" অথবা "শাহ্" এই উপাধি ব্যবহার করেন,—যেমন শাহ্ জালাল, পীর বদর শাহ্ ইত্যাদি। ঠিক এই কারণেই লালনের নামের সহিত "শা" অথবা "শাহ্" এই উপাধি ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

এক সময়ে লালনের গান হয়ত রবীন্দ্র-নাথকে কথঞ্চিৎ প্রভাবিত করিয়াছিল। "গীতাঞ্জলির" মধ্যে তাহার প্রতিধ্বনি মিলিতে পারে। অবশ্য এই বিষয়টি খুব সাবধানতা ও মনোনিবেশ সহকারে গবেষণা ও পর্যালোচনার যোগ্য। এদিকে যদি অনু-সন্ধিৎসু সাহিত্য রসিক ব্যক্তিগণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়, তবে আনন্দিত হইব।

মানে

(১০৬ পৃষ্ঠার পর)

বাহিরে তখন আকাশ পরিষ্কার হইয়া গেছে, চাঁদের আলো পদ্মার বুকে, পথের ধারে হাসিতেছে, মোটরের অন্ধকার হইতে দেখিলে মন উদাস হইয়া যায়।

ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসা করিলাম—তোমার সাহেবের নামটা কি?

গগনচন্দ্র চৌধুরী।

মনে পড়িয়া [illegible] বন্ধু নির্মলের কথা—'আকাশ চৌধুরীর কীর্তি' বলিয়া সে একখানা বই বাহির করে কোন ডিস্ট্রীক্ট জজের ব্যবহারে আহত হইয়া।

তিনিই কি ইনি নাকি?

সেই হইতে কি জজ সাহেব সাহিত্যক শুনিলেই কফি হইতে কাবাব খাওয়াইয়া দেন?

নির্মলকে আসিয়া সব খুলিয়া বলাতে সে বলিল—সেই বটে, কিন্তু আমার বেলায় বলেছিল, এলাকার মধ্যে পেলে চাবকে দোব, আর তোমার জুটলো কাবাব! এর মানেটা ত' বোঝা গেল না!

মানে অবশ্য আমিও ঠিক বুঝি নাই।

বাঙলার চাষী

অধ্যাপক শ্রীবরদা দত্তরায়

বাঙলা দেশ কৃষিপ্রধান দেশ। অসংখ্য নদনদী খাল-বিল বিধৌত বাঙলার জমি, মৌশুমী বায়ুতাড়িত বাঙলার আবহাওয়া এবং গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-পদ্মা-দামোদরের পলিমাটিবর্ধিত বাঙলার মাটি সত্যসত্যই কৃষিকার্যের অনুকূলে। ফলে, বাঙলার জনসংখ্যার ছোট-বড় প্রায় সকলেই কৃষক। "কৃষক" বলিলে হয়ত কথাটা খুব পরিষ্কার হয় না, তাই বলিতে হয় 'চাষী, অর্থাৎ, হয় নিজেরা চাষাবাদ করিয়া থাকেন, কিংবা অন্যকে দিয়া চাষাবাদ করান। এই কথা বলিবার কারণ বাঙলাদেশের এমন লোক অতি অল্পই আছে যাহার পৈতৃক ভিটা নাই কিংবা ২।১ বিঘা জমি নাই। 'মোটা ভাত ও মোটা কাপড়ের সংস্থান বাঙলাদেশের অর্থনৈতিক সংস্থানের গোড়ার কথা (Standard)। কাজেই 'মোটা ভাতে'র ব্যবস্থা করিতে হইলে জমির প্রয়োজন। বাঙালী ব্যবসায়ী সামান্য অর্থশালী হইলেই জমি কিনিতে দেখা যায়। জমি কিনিতে কিনিতে পরে তিনি না হয় জমিদারীও কিনেন, কিন্তু বাঙলাদেশের ঐ সনাতন অর্থনীতি, "মোটা ভাত ও মোটা কাপড়"—বাঙালীর মনেপ্রাণে, রক্তে-মাংসে জড়িত। বাঙালীর "ঘরমুখো" বলিয়া বদ্‌নাম আছে। ইহার কারণও তাই। বাঙালী জনসাধারণ নিতান্ত দরিদ্র হইলেও, তাহার পৈতৃক ভিটা ও সামান্য ২।১ বিঘাও জমি আছে বলিয়া বাঙালী কোন কিছু করিতে না পারিলেই পৈতৃক ভিটাতে ছুটিয়া যায়। তারপর বিদেশী ভাবধারার সংমিশ্রণে বাঙালীর ভাব-ধারারও যে পরিবর্তন হয় নাই, তাহা নহে। বাঙালীও আজ পৈতৃক ভিটা-মাটির মায়া ত্যাগ করিয়া বিদেশে যাইতে শিখিয়াছে এবং বিদেশে ঘরবাড়ি, এমনকি জমিদারি করিতে শিখিয়াছে। আবার অন্যদিকে বাঙালীর সমাজ ও অর্থনৈতিক অবস্থারও পরিবর্তন হইয়াছে। পৈতৃক জমি ভাগাভাগির দরুণ বহু বাঙালী পরিবার আজ জমিজমাহীন, নিজের শ্রম-মাত্র সম্বল করিয়াও জীবনযাপন করিতে বাধ্য হইয়াছে। তাহাদের সকলেই যে চাষী-মজুর তাহা নহে। তাহাদের মধ্যে ছোটখাট ব্যবসায়ী আছে, কেরাণী আছে, ফ্যাক্টরির মজুর আছে এবং চাষী-মজুরও আছে। বাঙলার যেসব লোক-গণনা হয়, তাহাতে এই জাতীয় জমিজমাহীন শ্রম-মাত্র সম্বল ব্যক্তিদের কোন আলাদা সংখ্যা পাওয়া যায় না সত্য এবং বিশ্বাসযোগ্য কোন খবর পাওয়াও খুব সম্ভবপর নহে, কিন্তু ইহাদের সংখ্যাও খুব অল্প নহে। বাঙলাদেশে শুধু চাষী-মজুরের সংখ্যাই প্রায় ৩০ লক্ষ। (২,৮৭৪,৪০৪—Man behind the plough : Sir Azizul Haq ; ২৭ লক্ষ : ডাঃ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়।) সে যাক্, যদি সর্বশুদ্ধ গড়ে ৩০ লক্ষ লোকও গৃহহীন এবং ভূমিহীন মজুর বলিয়া ধরা যায় তাহা হইলে তাহাদের পরিবারবর্গ সহ বাঙলার (৩০×৫=১৫০ লক্ষ) প্রায় দেড় কোটি নরনারী Landless Proletariat-এর পর্যায়ভুক্ত বলিতে হইবে।

এই দেড় কোটি বাদ দিলে বাঙলার মোট অধিবাসী প্রায় ছয় কোটির (৬,১৪,৬০,৩৭৭—আদমসুমারী ১৯৪১ ইং) ৪॥ কোটি লোক জমির সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত, অর্থাৎ কেহ নিজের হাতে চাষ করেন আবার কেহ বা অন্যের হাতে চাষ করান। এতদ্ভিন্ন ঐ জমিজমাহীন ব্যক্তিরাও ঐ ক্ষেতেই কাজ করিয়া থাকে। বাঙলার ছয় কোটি লোকের মধ্যে প্রায় এক কোটি পঞ্চাশ হাজার লোক শিল্প-বাণিজ্য ইত্যাদি নানাবিধ কাজ করিয়া থাকে, বাকি পাঁচ কোটি লোক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কৃষিকার্যে জড়িত বলিতে হইবে। সরকারী হিসাবে দেখা যায় যে, শতকরা প্রায় ৬৫·৬৪ জন লোক চাষাবাদ করে। সে যাক্। যত লোকই চাষাবাদ করে, তাহারা যে সমগ্র বাঙালী জাতির অন্ন যোগায়, একথা অস্বীকার করিবার কোন উপায় নাই। সেই হিসাবে ইহারা যে বাঙলার সর্বাপেক্ষা দরকারী এবং প্রাণরক্ষাকারী, বর্তমান যুদ্ধের পরিভাষায় Essential কাজ করে, সেকথা স্বীকার্য এবং অবিসম্বাদী সত্য। কিন্তু সত্য হইলেও সকল সত্যেরই সীমা আছে। দার্শনিকের ভাষায় সত্য "শিবম্ সুন্দরম্" হইলেও, সবক্ষেত্রে সব সত্য সুন্দর না হইতেও পারে। সরকারী হিসাবকে সত্য বলিয়া ধরিয়া বলিতে হয় যে, বাঙলা-দেশের শতকরা ৬৬ জন লোক চাষী। সেই তুলনায় অন্যান্য দেশের হিসাব দেখুন,—জার্মানীতে শতকরা ২৮·৬ জন, অস্ট্রিয়া ৪০·৪, ইতালী ৩৪·২, ফ্রান্স ৪০·৭, ডেনমার্ক ৩৬·৪, সুইজারল্যান্ড ২৭·৭, ইংলন্ড ১১·৬, আমেরিকা (যুক্তরাষ্ট্র) ২৬·৩ জন চাষী। (Population of India : Prof. Brijnarayan) অন্যান্য দেশের তুলনায় আমাদের দেশের চাষীর সংখ্যা যে গড়ে দ্বিগুণের কাছাকাছি যাইয়েছে, তাহা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না। এই বর্ধিত লোকসংখ্যার দরুণ যদি জমির ফসলও বর্ধিত হইত এবং দেশের ফসলে দেশের অভাব মিটিয়া যাইত, তাহা হইলে না হয় একথা বলা যাইত যে, এই বর্ধিত সংখ্যারও একটা সার্থকতা আছে। কিন্তু যেখানে জমির ফসল দিন দিন কমিয়া যাইতেছে, লোকের অভাব দিন দিন শীতের রাতের মতই বৃদ্ধি পাইতেছে, সেখানে এই বর্ধিত জনসংখ্যা চাষের উপকারিতা বৃদ্ধি করে কিনা, এ বিষয়েও সন্দেহ আছে। কথায় বলে, "অনেক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট"—এই প্রবচনের জোরে "অনেক চাষীতে চাষ নষ্ট" হয় কি না চিন্তার বিষয়।

এদেশে প্রতি একরে যে পরিমাণ ধান উৎপন্ন হয়, তাহার সঙ্গে অন্যান্য দেশের ফলনের তুলনা করিলে দেখা যায়, ধান যেখানে প্রতি একরে উৎপন্ন হয় জাপানে ২২৭৬ পাউন্ড (এক পাউন্ড প্রায় আধ সের), মিশরে ২১৫৩ পাঃ, স্পেনে ৩৭০৯ পাঃ, ইতালীতে ২৯০৫ পাঃ, মার্কিন যুক্ত-

[illegible]ষ্ট ১৪৬৯ পাঃ, সেখানে [আ]মাদের দেশে উৎপন্ন হয় [মা]ত্র ৭২৮ পাউণ্ড। এইভাবে [ধা]ন, আলু, তুলা, আক ইত্যাদি যাবতীয় [কৃ]ষিজাত ফসলের তুলনামূলক ফলনের [হি]সাব দেওয়া যাইতে পারা যায়। কিন্তু [স]র্বত্র এবং সর্ব ব্যাপারেই আমাদের [চা]ষীদের অকৃতকার্যতার পরিচয় খুব [প]রিষ্কাররূপেই প্রতিপন্ন হয়। সুতরাং [এ]কথা আজ বলিলে বোধ হয় অন্যায় হয় [না] যে, আমাদের চাষীরা "সত্যি কিছুই [ক]রে না।" ক্ষেতে যাইতে হয়, তাই তাহারা [যা]য়া করিয়া যায়। ইহাতে তাহাদের [ক]র্তব্য, তাহাদের কর্ম এবং সমগ্র বাঙলার [অ]ন্ন জোগানের ব্যাপার, এই জ্ঞান [ত]াহাদের নাই। কারণ, তাহারাও হয়ত [প]াঞ্জাবী চাষীর মতই ভাবে—"জমিন্দারকী [ক]ম-আকলী পরমেশ্বরকা কসুর" —গৃহস্থ যদি বোকা হয় তাহা হইলে [ভ]গবানেরই দোষ। ভগবানেরই দোষ হউক [আ]র আমাদেরই দোষ হউক—দোষ যে, এ [বি]ষয়ে কোন সন্দেহ নাই। অন্যথা আজ [বা]ঙলার প্রায় ২ কোটি ৩০ লক্ষ একর [জ]মিতে বাঙলার অন্ন-সমস্যা মিটে না [কে]ন? না মিটিবার কারণ কেবল যে [ক]র্তৃপক্ষের ঔদাসীন্য একথা বলিলে [চ]লিবে না, আমাদের চাষীরাও ফসল বৃদ্ধির চেষ্টায় কিছু করে না, একথাই সর্বাগ্রে বলা উচিত। কোন কোন বিশেষজ্ঞের মতে দেখা যায় যে, বীজ-ধানের একটু অদল-বদল করিলেই জমির ফলন আরও প্রতি একরে ২।৩ মণ বাড়িয়া যায়। একথা হয়ত চাষীদের মধ্যে অনেকেই জানে, কিন্তু কেহ কখনও বীজ-ধানের উন্নতির জন্য কোন রকম চেষ্টা-চরিত্র করে কি?

কথা উঠিতে পারে, তবে তাহারা করে কি? নানাবিধ পুস্তকাদির সাহায্যে বিখ্যাত অর্থনীতিকদের যেসব মত সংগৃহীত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায়, যুক্তপ্রদেশে চাষী ১৫০—২৭০ দিনের বেশি কাজ করে না, দাক্ষিণাত্যে তাহারা গড়ে ৫ মাস (১৫০ দিন) কাজ করে, বাঙলাদেশে তিন মাস (৯০ দিন), বোম্বে ১৮০—১৯০ দিন, পাঞ্জাব ১৫০ দিনের বেশি তাহারা কাজ করে না। বাকি সময়টুকু তাহারা দলাদলি, বিয়ে-শ্রাদ্ধ ও মামলা-মোকদ্দমা করিয়া কাটায়। ইহার কারণ, কৃষিকার্যে যেখানে গড়ে শতকরা ৩৫ জন লোকের দরকার, সেখানে দ্বিগুণ অর্থাৎ ৭০ জন লোক আসিয়া ভিড় করিয়াছে। অন্যদিকে লোকাধিক্যের দরুণ যেমন লোকের কাজ কমিয়া গিয়াছে, তেমনি অবসর বাড়িয়াছে প্রচুর। অবসর বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মন খালি হইয়া যায়, অবশ্য যদি তাহার কোন উচ্চাশা এবং আকাঙ্ক্ষা না থাকে। দার্শনিক ভারত চিরকালই "সন্তুষ্টিকে" প্রাধান্য দিয়া আসিয়াছে। কাজেকাজেই আধপেটা সিকিপেটা খাইয়াই তাহারা সন্তুষ্ট থাকে। আর সঙ্গে সঙ্গে "শূন্য মনে সয়তানের আড্ডা বসিয়া যায়।" জাপানের চাষী যখন অবসরকালে রেশম তুলে, ডেনমার্কের চাষী যখন দুধ-পনির তৈরি করে এবং স্পেন ও ইতালীর চাষী যখন বাগবাগিচা ফলায়, তখন আমাদের চাষী দলাদলি করে, পাড়াপড়শীর মামলায় মিথ্যা সাক্ষী দেয়, অন্যথা পরের বাড়ির নিন্দাচর্চা করিয়া দিন কাটায়। আজ দুর্ভিক্ষের কাল সন্ধ্যায়,—জাতীয় দুর্যোগের মহাসন্ধিক্ষণে, কেবল জমিজমা ও ধান লইয়া আলোচনা করিলেই চলিবে না। দেশের কর্তৃপক্ষ ও নেতৃবর্গ এদিকেও একটু নজর দিলে অনেক সমস্যার সমাধান হইবে বলিয়া আশা করা যায়। কারণ, আমাদের অবহেলায় দেশের সর্বাপেক্ষা মূল্যবান পদার্থ (Asset) জনশক্তি যে আজ নষ্ট হইতে চলিয়াছে, সেদিকে নজর না দিলে যে আর চলে না।

মাঝি

শ্রীসমরজিৎ বসু

মাঝির জীবনে কবিতা নামিছে
নব ফাগুনের দিন,
স্বপন মাখান বলাকা পাখায়
রিণি ঝিনি বাজে বীন।
জানা অজানায় চুপি সারে আসে
ছিল ঘিরে বুঝি চেতনার পাশে,
রূপ অরূপের বিচিত্রতায়
মহুয়া বনেতে লীন।
জোয়ার আসিছে দূরে হাঁকে মাঝি
নীপারের তীরে, লাল সেনা আজি,
নূতন ফসলে খুঁড়িয়া আনিব
সবহারাদের দিন।

বিদুষী ভার্য্যা
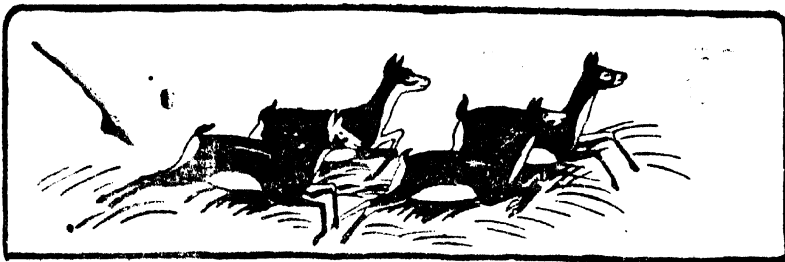
শ্রীউপেন্দ্র নাথ গঙ্গোপাধ্যায়

৩৪

ফাল্গুন মাসের শেষের দিক। কয়েক-দিন হইল শীত তাহার আধিপত্যের শেষ খোঁটা তুলিয়া লইয়া উত্তরাভিমুখে প্রস্থান করিয়াছে। বারান্দার নিকটবর্তী দক্ষিণ-পূর্ব দিকের একটা নিমগাছ হইতে ক্ষণে ক্ষণে নিমফুলের মৃদু সৌরভ ভাসিয়া আসিতেছিল।

বেলা তখন সাড়ে দশটা। সুনীথের উপহার দেওয়া দার্শনিক গ্রন্থাবলীর কয়েক খণ্ড লইয়া যূথিকা বারান্দায় টেবিলের সম্মুখে বসিয়া পাঠ করিতে-ছিল। পাঠ অবশ্য তাহাকে ঠিক বলা চলে না, কারণ সে পাঠের মধ্যে যূথিকার স্বভাবগত নিবিষ্টচিত্ততার পরিচয়ের পরিবর্তে একটা চঞ্চলতাই বিশেষভাবে প্রকাশ পাইতেছিল। কোনো একটা বই লইয়া এক-আধ পৃষ্ঠার অধিক পাঠ না করিয়াই সে অপর একটা বই খুলিতে-ছিল; এবং অপর আর একটা বই খুলিবার জন্য সে বইটা বন্ধ করিতেও অধিক বিলম্ব হইতেছিল না। স্বল্পাব-শিষ্ট সময়ের মধ্যে বহু বিষয়ের আস্বাদ লইতে হইলে যে অবস্থা মানুষের হয়, তাহার যেন ঠিক সেই অবস্থা। কিছুদিন হইতে মনের মধ্যে যে ইচ্ছা আকার লইয়া ক্রমশ সঙ্কল্পে পরিণত হইতে চলিয়াছে, এ বোধ করি তাহারই প্রতি-ক্রিয়ার নিদর্শন।

দিবাকর আসিয়া একটা চেয়ার টানিয়া লইয়া যূথিকার সম্মুখে উপবেশন করিল।

যে বইটা পড়িতেছিল তাহা বন্ধ করিয়া রাখিয়া যূথিকা বলিল, "কিছু বলবে?"

পকেট হইতে একটা চিঠি বাহির করিয়া দিবাকর বলিল, "দেবদাস মামার চিঠি এসেছে। দেবদাস মামা, অর্থাৎ ডি ভাটাচারিয়া, যাঁর কথা একদিন তোমাকে বলেছিলাম।"

"মনে আছে। কি লিখেছেন তিনি?"

"আমার বিলেত যাওয়ার বিষয়ে সাহায্য করতে আমি তাঁকে চিঠি লিখে-ছিলাম। তিনি খুব খুশি হয়ে রাজি হয়েছেন। পাসপোর্ট জোগাড় করে দেওয়া থেকে পোষাক তৈরি করানো পর্যন্ত সব ব্যবস্থা করে দেবেন লিখেছেন। আমাকে একবার কলকাতা গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বলেছেন।"

"সুনীথদাদাও ত বিলেত গিয়ে-ছিলেন; তাঁকে চিঠি লিখলে না কেন?"

দিবাকর বলিল, "দুটো কারণে। প্রথমত, তিনি হয়ত আমার বিলেত যাওয়ার প্ল্যানটা ভেস্তে দিতেই চেষ্টা করতেন। এবং দ্বিতীয়ত, ভেস্তে না দিলেও, হয়ত এমন একজন দুর্দান্ত পণ্ডিতের কাছে আমাকে পাঠাতেন যাঁর কাছে গিয়ে আমি আরও বোকা বনে যেতাম। ডি ভাটাচারিয়া আমাকে পাঠাবেন মিসেস্ প্রীচার্ডের কাছে। ভাটাচারিয়া লিখেছেন, মিসেস্ প্রীচার্ড আর গুটি দুই-তিন মিস প্রীচার্ড মিলে দলন-মলন আর পালিশ-বুরুশ করে আমাকে এমন এক ঘোড়া বানিয়ে দেবে যে, বছর দুয়েকের মধ্যে আমার মুখ দিয়ে ইংরেজি ভাষার হ্রেষা ছুটতে থাকবে। যেমন রুগী তেমনি ডাক্তারও ত চাই।"

"মিসেস্ প্রীচার্ড কে?"

"মিসেস্ প্রীচার্ড আমাদের মত গর্দভ-চন্দ্রদের অধমতারণ ল্যান্ডলেডি। গাধা পিটে ঘোড়া করা তার ব্যবসা। ভাটা-চারিয়ার চিঠি প'ড়ে দেখলে সব বুঝতে পারবে।" বলিয়া দিবাকর চিঠিখানা যূথিকার সম্মুখে স্থাপন করিল।

চিঠি পড়িবার কোনো লক্ষণ না দেখাইয়া যূথিকা বলিল, "কবে তুমি বিলাত যাবে?"

"জুলাই মাসের শেষে, কিংবা অগস্ট মাসের গোড়ায়।"

এক মুহূর্ত মনে মনে কি ভাবিয়া লইয়া যূথিকা বলিল, "কিছুকাল আগে তোমাকে আমি যে চ্যালেঞ্জ দিয়েছিলাম, তা অবশ্য প্রত্যাহার করছিনে; কিন্তু সেই চ্যালেঞ্জ দেবার সময়ে যেসব কড়া কথা ব্যবহার করেছিলাম, সে সমস্তই আজ প্রত্যাহার করছি। আমার সেদিনকার উদ্ধত আচরণ তুমি ক্ষমা কর।"

দিবাকর মনে করিল, তাহার বিলাত যাইবার প্রস্তাব কার্যে পরিণত হইবার সূত্রপাত দেখিয়া যূথিকা ভীত এবং অনুতপ্ত হইয়াছে। মনে মনে একটু হাসিয়া বলিল, "যা তোমার ইচ্ছে।"

কিন্তু তাহার এ ধারণা অপসৃত হইতে বিলম্ব হইল না। যূথিকা বলিল, "আমার আর একটা আচরণও তোমাকে ক্ষমা করতে হবে।"

"কি আচরণ?"

"তোমার বিলেত যাবার আগেই আমি এখান থেকে চলে যাব। আমার সেই আচরণ।"

বিস্মিতকণ্ঠে দিবাকর বলিল, "এখান থেকে চলে যাবে? কোথায় যাবে? বাপের বাড়ি—লাহোরে?"

ধীরে ধীরে মাথা নাড়িয়া যূথিকা বলিল, "না, লাহোরে নয়। যেখানে আশ্রয় পাব, সেখানে।"

তীক্ষ্ণস্বরে দিবাকর বলিল, "তার মানে?"

"তার মানে, কোন মেয়ে-স্কুলে মাস্টারি করে নিজের খরচ চালানোর ব্যবস্থা করব।"

যূথিকার কথা শুনিয়া দিবাকরের মুখমণ্ডলে একটা রুক্ষ কর্কশ ভাব

নামিয়া আসিল। ভাটাচারিয়ার চিঠির গুণে যেটুকু প্রসন্নতা লইয়া সে আসিয়াছিল, তাহা নিঃশেষে অন্তর্হিত হইতে তিলার্ধ বিলম্ব হইল না। কুঞ্চিত চক্ষে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "কেন? সে সময়ে স্বামীর টাকায় খরচ চললে আত্মসম্মানে আঘাত লাগবে না-কি?"

যূথিকা বলিল, "দেখ, তুমি যদি তোমার আত্মসম্মান বজায় রাখবার জন্যে বিলেত যেতে পার, তাহলে আমার আত্মসম্মান বজায় রাখবার জন্যে আমি উপার্জন করতে গেলে এমন কিছু অন্যায় হয় কি? কোন স্বামী যদি এই কথা মনে করে যে, তার স্ত্রী তাঁকে মনের মধ্যে গ্রহণ করেছে কি না তা অনিশ্চিত, কিন্তু বাইরে গ্রহণ করেছে টাকার লোভে—তাহলে সে স্বামীর কাছ থেকে টাকা নেওয়া আর অনাত্মীয় কোন লোকের কাছে ভিক্ষে করা,—এই দুইয়ের মধ্যে খুব বেশি প্রভেদ থাকে কি? নিজেকে হীন হতে না দেওয়ার অধিকার সকলেরই থাকা উচিত, একথা তুমি নিশ্চয় স্বীকার করবে।"

তীক্ষ্ণ তিক্ত কণ্ঠে দিবাকর বলিল, "এ-সব কথা তুমি বলতে পারছ শুধু তোমার ইংরেজি বিদ্যের অহঙ্কারে। তুমি জান, একটা দেড়শ' দুশ টাকার চাকরি জোগাড় করা তোমার পক্ষে খুব কঠিন হবে না, তাই তোমার এত দুঃসাহস।"

দিবাকরের কথা শুনিয়া যূথিকার মুখে একটা আর্ত হাসি দেখা দিল। মৃদুকণ্ঠে সে বলিল, "সে কথা যদি মনে কর, তাহলে বল, তোমার কাছে শপথ করছি, অর্থ উপার্জনের চেষ্টায় আমি আমার ইংরেজি বিদ্যে বিন্দুমাত্র কাজে লাগাব না। কোনদিনই যেন ইংরেজি ভাষার একটা বর্ণও পড়িনি, ঠিক সেই হিসেব নিয়ে শুধু বাঙলা ভাষার যৎসামান্য জ্ঞান, আর গান-বাজনার অল্প একটু অধিকারের জোরে যতটুকু পারি তাই উপার্জন করব। গ্রাসাচ্ছাদনের জন্যে একান্ত যা প্রয়োজন, তার বেশি ত' আমার দরকার নেই। তুমি যেমন এম-এ ডিগ্রি পাবার জন্যে বিলেত যাচ্ছ না, যাচ্ছ সেখানকার সভ্যতার এক গণ্ডূষ জল এনে এখানকার এম-এ ডিগ্রি ডোবাবার জন্যে; আমিও তেমনি তোমাদের মতো জমিদারি গড়ে তোলবার জন্যে যাচ্ছিনে, —যাচ্ছি প্রয়োজনের সামান্য একমুঠো অর্থের মধ্যে তোমাদের ব্যয়বহুল জীবন-যাপনের সৌখীনতাকে ডুবিয়ে মারতে।"

"তারপর? তারপর একদিন যখন আমি বিলেত থেকে ফিরে আসব তখন তুমি কি করবে? তখনো কি একমুঠো অর্থের জন্যে আমাদের ব্যয়বহুল জীবন-যাপনের সৌখীনতাকে ডুবিয়ে মারতে থাকবে?"

"তোমার প্রতি আমার ভালবাসার মর্যাদা রক্ষার জন্যে তখনো যদি দেখি, তার দরকার আছে, তাহলে তখনো সেই অবস্থাই চলবে।"

বিদ্রূপমিশ্রিত স্বরে দিবাকর বলিল, "আমার প্রতি তোমার ভালবাসা? চমৎকার ত' দেখছি সে ভালবাসা!"

এক মুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া যূথিকা বলিল, "সত্যিই সে ভালবাসা চমৎকার। এত চমৎকার যে, তার জন্যে তোমার কাছ থেকে দূরে থাকা ত' সহজ কথা, তোমার মঙ্গলের জন্যে তোমাকে মুক্তি দেওয়া দরকার বোধ করলে আমাদের বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করতেও পারি।"

বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করার শব্দে দিবাকর প্রথমে একটা রূঢ় আঘাতের তাড়নায় চকিত হইয়া উঠিল। কিন্তু পরক্ষণেই মনে মনে নিজেকে সামলাইয়া লইয়া দমিত ক্রোধের চাপা সুরে বলিল, "চমৎকার! মিস ব্যানার্জি থেকে আবার মিস মুখার্জিতে ফিরে যাওয়া সত্যিই চমৎকার!"

যূথিকা বলিল, "হ্যাঁ, সত্যিই চমৎকার। কারণ, আবার কোনদিন মিসেস ব্যানার্জিতে ফিরে আসার আশায় আমরণ তোমার জন্যেই অপেক্ষা করে থাকতে পারি,—এমনই চমৎকার আমার ভালবাসা।"

দিবাকর বলিল, "অতটাই যদি করলে, তাহলে মিসেস ব্যানার্জিতে ফিরে আসার আশায় অপেক্ষা করবারই বা কি দরকার? বেশ বিদ্বান, শিক্ষিত এম-এ, পি-এইচ ডি—এমনতরো কাউকে অবলম্বন করে মিসেস চ্যাটার্জি কিংবা মিসেস চৌধুরীর মতো কিছু হলেই ত' পারো।"

যূথিকা বলিল, "না, তা পারিনে,—ওখানে আমার দুর্বলতা আছে। অপেক্ষা যদি করতে হয় ত' ম্যাট্রিক ফেলের জন্যেই করব। কিন্তু তুমি পারবে ত একজন দ্বিতীয়ভাগ-পড়া মেয়ের আশ্রয় নিতে? তাকে ঐক্য বাক্য মাণিক্য শেখাতে?"

যূথিকার কথা শুনিয়া দিবাকরের মনে পড়িয়া গেল পাইপ্ পেস্ট প্রীস্টের কথা, যাহা একটি ফার্স্ট-বুক-পড়া মেয়েকে কয়েকদিন পূর্বেই সে শিখাইয়াছে। ঐক্য বাক্য মাণিক্য হইতে রঙ গ্রহণ করিয়া পাইপ্ পেস্ট প্রীস্ট সহসা এমন ঘোরালো হইয়া উঠিল যে, যূথিকার সহিত সে বিষয়ে কোন প্রকার আলোচনা ত চলিলই না, এমনকি মনে মনেও সে কথা ভাবিয়া দিবাকর ঈষৎ বিহ্বলতা বোধ করিল।

চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া সে বলিল, "অনেক সময়ে অনেক প্রশ্নের উত্তর না দিলেই সবচেয়ে ভাল উত্তর দেওয়া হয়।" তাহার পর ডি ভাটাচারিয়ার চিঠিটা তুলিয়া লইয়া প্রস্থান করিল।

ক্রমশ

কস্তুরবাঈয়ের অন্তিম সময়

শ্রীদেবদাস গান্ধী

আমার নিকট এবং বন্দী শিবিরের ঠিকানায় আমার পিতার নিকট সৌহার্দ্য ও সহানুভূতিপূর্ণ যে অসংখ্য বাণী প্রেরিত হইয়াছে, তৎসমুদয়ের জন্য প্রকাশ্য কৃতজ্ঞতা স্বীকার অপেক্ষা আরও অধিক কিছু করা আবশ্যক। ঐ সমুদয়ের মধ্যে অনেকগুলি উৎকৃষ্ট ভাষায় রচিত হইলেও উহাদের দ্বারা প্রেরকদের মনোভাব পুরাপুরি ব্যক্ত হয় নাই। শোকের অভিব্যক্তি এরূপ হৃদয়বিদারক যে, উহা তাঁহাদের এবং আমাদের পরিজনদের মধ্যে সহানুভূতিকে পারস্পরিক করিয়াছে। আমি মনে করি যে, আমার মাতার অন্তিম মুহূর্তগুলির পবিত্র ও মূল্যবান স্মৃতি আমার শোকে সহানুভূতিসম্পন্ন বিরাট জনসঙ্ঘের সহিত যতদূর পারা যায় প্রকাশ্যে ভাগাভাগি না করিয়া নিজস্ব করিয়া রাখিলে অসঙ্গত কাজ করা হইবে। আমি এখনও শোকে অতি মাত্রায় বিচলিত ও অভিভূত; সময় সময় আমি নিয়তির উপর বিশ্বাস হারাইয়া ফেলি। আমি অকস্মাৎ মাতৃহীন হওয়ার অবস্থা ব্যতীত এই মানসিক অবস্থা হইতে মুক্ত হইবার আশা করি।

অন্তিম মুহূর্ত উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত মাতা কখনও সম্পূর্ণ সংজ্ঞা হারান নাই। রবিবার সরকারী ইস্তাহারে যখন তাঁহার অবস্থা সঙ্কটপূর্ণ বলিয়া ঘোষিত হইল, তখনও তিনি তাঁহার পীড়ার শেষ অবস্থা কাটাইয়া উঠিবেন বলিয়া আশা করিতেছিলেন। তাঁহার হৃদযন্ত্রের মৃদু ক্রিয়ার ফলে শেষ কয়দিন তাঁহার কিডনির ক্রিয়া হয় নাই। জ্বরবিহীন এপিকাল নিউমোনিয়ায় অবস্থা আরও জটিল হয়। তাঁহার রক্তের চাপ ৭০।৫২তে নামিয়াছিল। ডাক্তারগণ আশা ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। সোমবার অপরাহ্নে আমি যখন তাঁহার নিকট পৌঁছিলাম, তখন তিনি যে যন্ত্রণা ভোগ করিতেছিলেন, উহা কেবল অপরাপর বন্দীর নিষ্ঠাপূর্ণ শুশ্রূষায় বাহ্যিক উপশম হইতে পারে। চিকিৎসকগণ আশা করেন নাই যে, তিনি ঐ রাত্রি কাটাইতে পারিবেন। উহাই তাঁহার ঐহিক জীবনের শেষ রাত্রি। ঐ রাত্রিতে তিনি সর্বক্ষণ তাঁহার সঙ্গীদের ও মহাত্মা গান্ধীর নিকট হইতে ধর্মোপদেশ পাইয়াছেন। তিনি অর্ধচেতন অবস্থায় ছোট ছোট কথায় কিংবা ধীরে ধীরে মাথা নাড়িয়া প্রশ্নের উত্তর দিতেন। একবার পিতা তাঁহার নিকট আসিলে তিনি হাত উঠাইয়া জিজ্ঞাসা করেন "কে?" তারপর পিতা যখন প্রায় এক ঘণ্টাকাল তাঁহার শুশ্রূষা করেন, তখন তিনি অতিশয় সাচ্ছন্দ্য অনুভব করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হইয়াছিল। যদিও পিতার হাত দুইটি কাঁপিতেছিল, তথাপি মায়ের পাশে তাঁহাকে মা অপেক্ষা কয়েক বৎসরের ছোট দেখাইতেছিল। উহা দেখিয়া আমার দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রায় ৩২ বৎসর পূর্বের একটি ঘটনা স্মরণ হইল। তখন মা তিনমাস কারাবাস জনিত স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইতে সবেমাত্র আরোগ্য লাভ করিতেছেন। জনৈক পরিচিত ইউরোপীয়ান কোন রেল স্টেশনে পিতা মাতাকে একত্র দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "মিঃ গান্ধী, ইনি কি আপনার মা?"

প্রাতে তাঁহাকে আরও খারাপ অথচ শান্ত দেখায়। সোমবার তিনি ধীরে ধীরে ক্ষীয়মান আশা আঁকড়াইয়াছিলেন। মঙ্গলবার বোধ হইল যে, তিনি আশা ছাড়িয়া দিয়াছেন। মূত্রক্ষয়বিকার সত্ত্বেও তাঁহার মন শান্ত ও নির্মল ছিল। সোমবার হইতে তিনি কোন ঔষধ সেবন এমন কি জল পান করেন নাই। কিন্তু মঙ্গলবার দুপুরে তিনি এক ফোঁটা গঙ্গা জল পান করিবার জন্য হাঁ করেন। গঙ্গা জল পান করিয়া তিনি কিছুক্ষণ সাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। অতঃপর বিকাল ৩টার সময় তিনি আমাকে ডাকিয়া পাঠান। আমি তাঁহার নিকট গেলে তিনি বলেন, "আমি চলিয়া যাইতেছি। একদিন আমাকে যাইতে হইবেই, আজ যাইতে বাধা কি?" তাঁহার শেষ সন্তান আমি তাঁহাকে ধরিয়া রহিয়াছিলাম। সকলের সম্মুখে এই কথা এবং অপরাপর মিষ্ট কথা বলিয়া তিনি আপনাকে ছাড়াইয়া লন। আমার নিকট

আর কখনও তাঁহার উচ্চারণ ইহা অপেক্ষা অধিক স্পষ্ট কিংবা তাঁহার কথা অধিকতর মধুর বোধ হয় নাই। ইহার অব্যবহিত পরেই তিনি কাহারও সাহায্য ছাড়াই উঠিয়া বসিয়া মাথা নত করিয়া জোড় হাতে তাঁহার সাধ্যমত উচ্চৈঃস্বরে কয়েক মিনিট এই প্রার্থনা করেন,—'ভগবান, আমার আশ্রয়; আমি তোমার কৃপা প্রার্থনা করি।' চোখের জল শুকাইবার জন্য আমি যখন ঐ ঘর হইতে বাহির হইলাম, তখন আগা খাঁ প্রাসাদের বারান্দায় [illegible] পেনিসিলিন পৌঁছিয়াছে।

চিকিৎসকগণের উহা ব্যবহার করার বিশেষ ইচ্ছা ছিল না। নিউমোনিয়া আসল রোগ নয়, উহা [illegible] উপসর্গ মাত্র। কিডনী একেবারে নিষ্ক্রিয় হইয়া যাওয়ায় 'পেনিসিলিনে' কোন ফল হইত না, তাহা ছাড়া উহা দেওয়ার অল্প সময়ও ছিল না। ইহা সত্ত্বেও নিউমোনিয়ার এই অদ্ভুত ঔষধ তৈয়ারী করা হইয়াছিল। বেলা প্রায় ৫টায় পুনরায় মাতার নিকট যাইতে আমি সাহস সঞ্চয় করি। এইবার তিনি মৃদু হাসি হাসিলেন। এই হাসিই ৮০ বৎসর যাবৎ আমাকে প্রশ্রয় দিয়াছে, তবে ইহা অপর পুত্রকে উৎফুল্ল করার জন্য মরণোন্মুখ মাতার চিন্তামগ্ন হাসি। আমার মাতা ছিলেন অত্যন্ত স্নেহপ্রবণ। আমাকে অতিরিক্ত স্নেহ করিতেন; সেইজন্য যাঁহারা নিকট সংস্পর্শে আসিয়াছেন, আমি তাঁহাদের নিকট তাঁহার হইয়া মার্জনা চাহিতেছি। ঈশ্বর নিশ্চয়ই এমন একজনের দোষ উপেক্ষা করিবেন, যিনি তাঁহার স্বামীকে অন্যভাবে মহিমময় করিয়া তুলিয়াছিলেন। তাঁহার এই হাসি দেখিয়া আমি পুনরায় 'পেনিসিলিন' দেওয়ার জন্য উৎসুক হই এবং এই সম্বন্ধে চিকিৎসকদের সহিত আলোচনা করা কর্তব্য বলিয়া মনে করি। তাঁহারা উহার দ্বারা চেষ্টা করিয়া দেখার জন্য ইচ্ছুক ছিলেন, কিন্তু সাফল্য সম্পর্কে বিশেষ আশা পোষণ করেন না। গান্ধীজী যখন জানিতে পারিলেন যে, আমি মাতাকে বেদনাদায়ক ইনজেকশন দেওয়ার প্রস্তাব অনুমোদন করিয়াছি, তখন তিনি আমাকে বুঝাইবার জন্য বাগানে তাঁহার সান্ধ্যভ্রমণ পরিত্যাগ করেন। "তুমি তোমার মাতাকে যখন নিরাময় করিতে পারিবে না, তখন যত অদ্ভুত ঔষধ আন না কেন, তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। তবে তুমি যদি জিদ কর, তাহা হইলে আমি তোমার কথায় রাজী হইব। কিন্তু তুমি অত্যন্ত ভুল করিতেছ। তিনি দুই দিন যাবৎ ঔষধ ও জল গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়াছেন। তিনি এখন ঈশ্বরের হাতে। তুমি হস্তক্ষেপ করিতে পার, তবে তোমায় ঐ পন্থা অবলম্বন না করার পরামর্শ দিতেছি এবং ইহা স্মরণ করিও যে, তুমি চার অথবা ছয় ঘণ্টা অন্তর মরণোন্মুখ মাতাকে ইনজেকশন দিয়া তাঁহাকে শারীরিক যন্ত্রণা দিতে চাহিতেছ।" আমি আর তর্ক করিতে পারি নাই। চিকিৎসকগণও অত্যন্ত স্বস্তি অনুভব করিলেন। আমার পিতার সহিত আমার এই মধ্যাহ্নে আলাপ শেষ হওয়া মাত্র খবর আসিল যে, মাতা তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন। মাতা যাঁহাদের উপর দেহের ভর দিয়াছিলেন, পিতা তৎক্ষণাৎ তাঁহাদের নিকট হইতে তাঁহার ভার গ্রহণ করেন। তিনি তাঁহার স্কন্ধদেশে তাঁহাকে আশ্রয় দেন এবং যতদূর সম্ভব আরাম দিতে পারেন, তজ্জন্য চেষ্টা করেন। আমি অপর দর্শকদের সঙ্গে সম্মুখে দাঁড়াইয়া লক্ষ্য করিতেছিলাম। দেখিলাম, মাতার মুখে মৃত্যুর ছায়া গভীর হইতেছে, কিন্তু কথা বলিলেন এবং অধিকতর শারীরিক স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য অঙ্গ সঞ্চালন করিলেন।

তারপর চক্ষের নিমেষে সব শেষ হইয়া গেল। কয়েকজনের চক্ষু হইতে অশ্রু গড়াইয়া পড়িল কিন্তু [illegible] জোর করিয়া অশ্রু দমন করিলেন। সমগ্র [illegible] অর্ধবৃত্তাকারে দাঁড়াইয়া সেই প্রিয় ভজন গান করিলেন যে গান তাঁহারা এতদিন তাঁহার সঙ্গে গাহিয়া আসিয়াছেন। দুই মিনিটের মধ্যেই তাঁহার দেহ নিস্পন্দ হইয়া যায়। একজন আমাকে বলিলেন যে, তিনি আমাদের আহার শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করিয়াছেন। বন্দীশিবিরে প্রায় সন্ধ্যা ৬টার সময় আহার শেষ করিতে হয়। তিনি সন্ধ্যা ৭-৩৫ মিনিটের সময় পরলোকগমন করিয়াছেন। এই কয় ছত্র লিখিবার সময় আমি এলাহাবাদের পথে। সোমবারে গঙ্গায় নিক্ষেপের জন্য আমি তাঁহার ভস্মাবশেষ লইয়া চলিয়াছি। শিবিরের অধিবাসিগণ যথারীতি অনুষ্ঠানের সহিত এই অস্থি কয়খানি চিতাভস্ম হইতে শুক্রবারে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। চিতাভস্ম হইতে তাঁহার অস্থি লইয়া তাহা ফুল, সিন্দুর ও ধূনাসহ কলার পাতায় রাখা হয়; তৎপর মন্ত্র দ্বারা শোধন করা হয়। তাঁহার সেই অস্থি লইয়া আমি চলিয়াছি। আজ আমি

আমার মাতার সহিতই ভ্রমণ করিতেছি; কিন্তু আগামী কালের পর আর তাঁহার সহিত কখনও ভ্রমণ করিব না। গান্ধীজী স্পষ্ট বলেন যে, প্রয়াগসংগমে অস্থি বিসর্জন করিতে হইবে। তিনি আমাকে বলেন, "কোটি কোটি হিন্দু পবিত্র অনুষ্ঠানরূপে যাহা করে, তাহাতেই তোমার মাতা তৃপ্ত হইবেন।" শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত মালবীয়ও ঐরূপ করিতে বলিয়া একটা তার করেন; তাহাতে গান্ধীজীর সিদ্ধান্ত আরও দৃঢ় হয়। প্রথা অনুযায়ী চিতাভস্মের অধিকাংশ পুণার নিকট ইন্দ্রাণী নদীতে বিসর্জন করা হয়। এই পন্থার বৈজ্ঞানিক যৌক্তিকতা কি আছে আমি জানি না; তবে অন্য কোন ব্যবস্থা থাকিলে আনন্দিত হইতাম। শুক্রবার প্রত্যূষে সূর্যোদয়ের পূর্বে আমি ও অল্প যে কয়জন লোক নদীতীরে গিয়াছিলাম, তাঁহাদের হৃদয়ে এই অনুষ্ঠান এক মহৎ ভাবের সঞ্চার করে। দাহকার্যের পরদিন অল্প চিতাভস্ম সংগ্রহ করিয়া বন্দিশিবিরে রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে। তন্মধ্যে ৫টি কাঁচের চুড়ী আছে। চিতাভস্মের মধ্যে এই চুড়িগুলি অভগ্ন অবস্থায় পাওয়া যায়।

বন্দিদশার বেদনা

বন্দিশিবিরে ১৯৪২ সালের সেপ্টেম্বর মাস হইতে মার অসুখ করে। সেই সময়ই প্রথম তাঁহার হৃদরোগের লক্ষণ দেখা দেয়। যদিও গত চার বৎসর ধরিয়া তাঁহার শরীর ভাল যাইতেছিল না তথাপি ইহার পূর্বে তিনি কখনও হৃদরোগে আক্রান্ত হন নাই। কিন্তু সেপ্টেম্বর মাসের পর আর তিনি স্বাভাবিক স্বাস্থ্য ফিরিয়া পান নাই। একথা বলিলে অতিরঞ্জন হইবে না যে শরীর ও মন কোন দিক দিয়াই তিনি কারারুদ্ধ থাকার ক্লেশ সহ্য করিতে সমর্থ ছিলেন না। ইতিপূর্বে কয়েকবার তিনি কারাগারে ছিলেন; বিশেষতঃ একবার তিনি রাজকোটের এক গ্রামে নির্জন বন্দিদশায় ছিলেন; সেবার তিনি প্রায় ভাঙিয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু এবারকার কারাবাস আগাগোড়া তাঁহার পক্ষে সর্বাপেক্ষা পীড়াদায়ক হয়; তাঁহার শরীর ও মন ভাঙ্গিয়া পড়িতে থাকে। প্রাসাদ ও তাহার আবহাওয়া ছিল তাঁহার অভ্যস্ত জীবনের বিপরীত। কাঁটা তারের বেড়া এবং পাহারাদার শান্ত্রীর অস্তিত্ব ষোল কলা পূর্ণ করে। তাঁহার মনের কথা আমি জনসাধারণকে জানাইতেছি, উহাতে নিশ্চয়ই তাঁহার স্মৃতির মর্যাদা হানি হইবে না। সে কথা এই যে, তিনি সেবাগ্রামের চালা ঘরে ফিরিয়া যাইবার জন্য ব্যাকুল ছিলেন। সেবাগ্রামের চালা ঘরের কথা তিনি নিজেই আমার কাছে গত বৎসর বলিয়াছিলেন। বন্দিদশার কাল অনির্দিষ্ট ছিল বলিয়া তিনি আরও পীড়া বোধ করিতেন। কোন আরামের ব্যবস্থাই তাঁহাকে মানসিক শান্তি দিতে পারে নাই। আরও হাজার হাজার লোক বন্দী আছেন; তন্মধ্যে কেহ কেহ তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত। তাঁহাদের কথা ভাবিয়া তাঁহার বেদনা আরও তীব্র হইত এবং গত দেড় বৎসর ধরিয়া তাঁহার এক নীরব প্রার্থনা ছিল এই যে, অন্য সকলকে মুক্ত করার বিনিময়ে তাঁহাকে ও বাপুকে না হয় চিরকাল বন্দী রাখা হোক।

তাঁহার পীড়ার শেষ সংকটজনক অবস্থায় তাঁহার কারামুক্তি দ্বারা কি সাহায্য হইত? যদি তাঁহাকে তিনি যখন ইচ্ছা করিবেন তখন বন্দি-শালায় ফিরিয়া আসিতে পারিবেন এই প্রস্তাব-সহ মুক্তি দেওয়া হইত তাহা হইলে উহা দ্বারা সাহায্য হইত। তাহা হইলে উহা 'দয়া' প্রদর্শনের পদ্ধতি হইত। কিন্তু ইহা সত্য যে, তিনি সৃষ্টিকর্তার নিকট হইতে চির মুক্তির আহ্বান পাওয়া ব্যতীত কখনও কারামুক্তির প্রস্তাবের মানসিক প্রতিক্রিয়া ভোগ করিবার সুবিধা পান নাই। সুতরাং আমি ইহা দেখিয়া বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়াছি যে, ভারত গবর্ণমেণ্টের আমেরিকাস্থিত এজেণ্ট এই মর্মে এক বিবৃতি দিয়াছেন যে, ভারত গবর্ণমেণ্ট কয়েকবার তাঁহাকে মুক্তি দিতে ইচ্ছা করিয়াছেন; কিন্তু তিনি মুক্তি প্রস্তাব গ্রহণ করিতে অসম্মত হইয়াছেন। ভারতে এই বিষয়ে যে সরকারী উক্তি প্রচারিত হইয়াছে এই বিবৃতি উহার সহিত সামঞ্জস্যহীন। আমি এ পর্যন্ত আমেরিকায় ভিন্নরূপ বিবরণ প্রচারের কোন কৈফিয়ৎ দেখি নাই।

যাঁহারা আমাদিগকে সহানুভূতিসূচক বাণী পাঠাইবার কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন কিংবা নীরবে আমাদের সাথে শোক সহ্য করিয়াছেন তাঁহাদের সকলের প্রতি আমি আমার তিন ভ্রাতার, অন্যান্য পরিজনের এবং নিজের পক্ষ হইতে গভীর কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। যে কোটি কোটি লোক আমাদের শোকে আমাদের সমান অংশভাগী হইয়াছেন তাঁহারা ব্যতীত আমাদের অপর কোন ভাই কিংবা ভগ্নী নাই। আমি এই দীর্ঘ বিবৃতি দ্বারা অত্যাধিক সময় কিংবা সংবাদপত্রের ব্যবহার করিয়াছি, কেহ এই দোষ ধরিলে আমি তাঁহার নিকট বিনীতভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। এখন সহ্য করিবার সময়। আমি ইহা অনুভব না করিয়া পারি না যে, আমি যদি প্রাপ্তি স্বীকার পত্রের আকারে এই দীর্ঘ খোলা চিঠি না পাঠাই তাহা হইলে আমি আমাদের শোকে সহানুভূতি-সম্পন্ন কোটি কোটি লোকের তিরস্কারভাজন হইব।

গান্ধীজী কিরূপে এই দারুণ শোক সহ্য করিয়াছেন, তৎসম্পর্কে আমার দুই একটি কথা বলা উচিত। তাঁহাকে অবসন্ন দেখাইতেছিল। তাঁহার জীবনে যে শূন্যতার সৃষ্টি হইয়াছে তজ্জন্য তিনি শোকগ্রস্ত; কারণ তিনি আজ যাহা হইয়াছেন, তজ্জন্য মাতার কৃতিত্ব অনেক পরিমাণ। কিন্তু তিনি দার্শনিকোচিত স্থির ভাব অবলম্বন করিয়াছেন এবং তাঁহার হৃদয়াবেগ সংযত রাখিতে-ছেন। তাঁহার পারিপার্শ্বিক অবস্থা শোকপূর্ণ—অথচ নৈরাশ্যকর বিষাদ বিহীন। গত শুক্রবার আমার ভ্রাতৃগণ এবং আমার বিদায়কালে তাঁহার স্বাভাবিক পরিহাস অশ্রুর কাজ করিল, আমার বিশ্বাস, তাঁহার স্বাস্থ্য ভাল।"

পুস্তক পরিচয়

হিন্দুস্থান ইয়ার বুক, ১৯৪৪—প্রকাশক এম সি সরকার এণ্ড সন্স; ১৪, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য ২, ও ২৷৷ টাকা।

অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এ বৎসরেও হিন্দুস্থান ইয়ার বুক আমাদের দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় নানা তথ্য লইয়া পরিবর্ধিত আকারে প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজের এই দুষ্প্রাপ্যতা ও দুর্মূল্যতার দিনে বহু পরিশ্রমে এমন একটি সুসম্পাদিত ইয়ার বুক প্রকাশ করিয়া প্রকাশক জনসাধা-রণের ধন্যবাদ ভাজন হইয়াছেন। অন্যান্য বৎসরের তুলনায় আলোচ্য গ্রন্থ অধিকতর আকর্ষণের হইয়াছে; বিশেষভাবে বর্তমান যুদ্ধ সম্বন্ধে কয়েকটি নূতন পরিচ্ছেদ যুক্ত হওয়ায় জ্ঞান-লাভেচ্ছু পাঠকদের বইখানি সহায়তা করিবে। ইহা ছাড়া ছাত্রছাত্রী শিক্ষক ও ব্যবসায়ী মহলে আলোচ্য গ্রন্থটি সমাদর লাভ করিবে ইহা নিঃশংসয়ে বলা যাইতে পারে।

রঙ্গজগৎ

কলকাতায় 'বাল্মীকি-প্রতিভা' অভিনয়

বিশ্বভারতীর সাহায্যার্থে কলকাতার কোন একটি বিশিষ্ট রঙ্গমঞ্চে শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রী ও শিল্পিবৃন্দ কর্তৃক রবীন্দ্রনাথের তরুণ বয়সে রচিত গীতি-নাট্য 'বাল্মীকি-প্রতিভা' এই মাসের মাঝামাঝি অভিনীত হবে। ইংরেজি ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে 'বিদ্বজ্জন সমাগম' নামক সাহিত্যিক সম্মিলন উপলক্ষে তরুণ রবীন্দ্রনাথ যখন এই গীতি-নাটিকা রচনা করে' স্বয়ং বাল্মীকির ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন, তখন বঙ্কিমচন্দ্র, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজকৃষ্ণ রায় প্রভৃতি সেকালের প্রথিতযশা ব্যক্তিরা সে অভিনয় দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর 'বাল্মীকির জয়' গ্রন্থের সমালোচনা প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছিলেন: "যাঁহারা বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বাল্মীকি-প্রতিভা' পড়িয়াছেন, বা তাহার অভিনয় দেখিয়াছেন, তাঁহারা কবিতার জন্ম-বৃত্তান্ত কখনও ভুলিতে পারিবেন না।"

কলকাতার রঙ্গমঞ্চে দীর্ঘ পাঁচ বৎসর পর শান্তিনিকেতনের শিল্পিবৃন্দের এই অভিনয় কলকাতার কলারসিক সমাজের আনন্দ বর্ধন করবে।

রঙমহলে 'সানি ভিলা'

কিছুদিন যাবৎ রঙমহল রঙ্গমঞ্চে খ্যাতনামা নাট্যকার প্রমথনাথ বিশী ওরফে প্র, না, বি-র 'সানি ভিলা' নামক বিখ্যাত কৌতুক-নাটকটি সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হচ্ছে। প্র, না, বি-র নাটকের টেকনিকের সঙ্গে যাঁদের পরিচয় আছে, তাঁরাই জানেন যে, রঙ্গ এবং ব্যঙ্গ তাঁর নাটকের প্রধান প্রাণ-সম্পদ। সমাজের বিভিন্ন স্তরের লোকদের নিয়ে তাদের চরিত্রের দুর্বল অংশের উদ্দেশ্যে ব্যঙ্গের শর নিক্ষেপ করায় তিনি ওস্তাদ শিল্পী। মানুষ মাত্রেরই চরিত্রে দ্বৈতস্বরূপ আছে। মানুষের চরিত্রের যেটা সুস্থ প্রকৃতিস্থ দিক, তার গাম্ভীর্য অবলম্বন করে' যেমন ট্রাজেডি সৃষ্টি সম্ভব, তেমনি মানব-চরিত্রের একটা লঘু-তরল দিক থাকে, যেটা আবার অনেক সময় পাঁজর-কাঁপানো হাসির খোরাক জোগায়। প্র, না, বি সাধারণত যে হাস্যরস সৃষ্টি করেন, সেটা শুধু হাসি নয়—তার পিছনে লুকানো থাকে ব্যঙ্গের সুতীক্ষ্ম শায়ক। নিছক হাস্যরস সৃষ্টি তাঁর উদ্দেশ্য নয়, তাঁর উদ্দেশ্য সমাজ-সংস্কার। যাঁদের চরিত্র অবলম্বন করে' তিনি হাস্যরস সৃষ্টি করেন, তাঁরা এতে হাসির খোরাক পেলেও সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রণাও পান—নিজেদের চরিত্রের ফাঁকি এবং অপূর্ণতা সম্বন্ধে তাঁরা পুরোপুরি সজাগ হয়ে ওঠেন।

আমাদের সাধারণ রঙ্গমঞ্চে সাধারণত নাট্য-সাহিত্যিকদের প্রবেশ লাভ কঠিন ব্যাপার। প্রায় প্রত্যেক স্টেজেরই ফরমায়েস মাফিক বাঁধা-ধরা ফরমুলা অনুসারে নাটক লেখার জন্যে নির্দিষ্ট নাট্যকার থাকেন। তাই বাঙলা রঙ্গমঞ্চ সেই চিরন্তন গোলকধাঁধাঁর মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে। অথচ দেশের জন্যে, জাতির জন্যে প্রগতিশীল নাট্যাভিনয়-প্রতিষ্ঠান একান্ত প্রয়োজন। প্রমথনাথ বিশীর নাটক বহুপূর্বেই বাঙলা রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হওয়া উচিত ছিল। বিলম্ব হলেও রঙ্গ-মহল কর্তৃপক্ষ যে শেষ পর্যন্ত তাঁর একখানি নাটক মঞ্চস্থ করেছেন, সেজন্যে তাঁরা আমাদের ধন্যবাদার্হ। 'সানি ভিলা'র আখ্যানভাগ প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত হাস্যোদ্দীপক এবং নাটকীয় সংঘাতে পরিপূর্ণ। আমাদের তথাকথিত অভিজাত সম্প্রদায়ের একটা প্রকাণ্ড জুয়াচুরি কেন্দ্র করে নাটকটি গড়ে উঠেছে। একদিকে আভিজাত্যের ভেকধারী নায়িকার পিতা 'সানি ভিলা'র নকল মালিক—অপর দিকে তাঁর কন্যার পাণি-প্রয়াসী কাল্পনিক মাকড়দহের রাজপুত্ররূপী মোটর ড্রাইভার। এদের কারও সঙ্গে কারও সম্প্রীতি নেই—দুজনেই চায় দুজনকে ঠকিয়ে বড়লোক হতে। কন্যার পিতা ভাবছেন যে, মেয়েটিকে গছিয়ে যদি মাকড়দহের রাজপুত্রের শ্বশুর হওয়া যায়, তবে তাঁর কপাল নিশ্চিত ফিরবে—আর মোটর ড্রাইভার প্রদীপ ভাবছে যে, রাজপুত্র সেজে যদি 'সানি ভিলা'র মালিক জমিদারের কন্যাকে বিয়ে করা যায়, তবে ত সব সম্পত্তিই তার। এই কাহিনীর সঙ্গে এসে যোগ দিয়েছেন নীরজা ওরফে নৃপনাথ এবং মালবিকা ওরফে মন্দাকিনীর প্রেমের কাহিনী। হাস্যরসের মধ্য দিয়ে নাটকটির মিলনাত্মক পরিণতি সকলেরই তৃপ্তি বিধান করে। হাস্যরস সৃষ্টির তাগিদে নাট্যকারকে অবশ্য অনেক স্থানে অবাস্তব এবং অবিশ্বাস্য ঘটনার আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়েছে—যেটা সাধারণ দর্শকের পক্ষে তৃপ্তিদায়ক হলেও বুদ্ধিজীবী দর্শকদের পক্ষে তৃপ্তিদায়ক নয়। তবে 'সানি ভিলা' মোটামুটি দর্শক সাধারণকে তৃপ্তি দিতে পেরেছে—একথা নিঃসংকোচে বলা যায়।

অভিনয়ে সর্বপ্রথম নাম করতে হয় নায়িকার পিতার ভূমিকায় অহীন্দ্র চৌধুরী এবং নীরজার ভূমিকায় সন্তোষ সিংহের। অহীন্দ্রবাবু তাঁর অভিনীত চরিত্রটির ভণ্ডামী এবং শঠতা চমৎকার ফুটিয়ে তুলেছেন। নীরজাবাবুর ভূমিকায় সন্তোষ সিংহও সুঅভিনয় করেছেন। নায়িকার ভূমিকায় সুহাসিনী মন্দ অভিনয় করেন নি। কিন্তু তাঁর সঙ্গিনী-রূপিণী পদ্মাবতী অভিনয় এবং চেহারার দিক থেকে অচল। শরৎ চট্টোপাধ্যায়ের অভিনয় মোটামুটি মন্দ নয়। অন্যান্য পার্শ্বচরিত্রের অভিনয় মোটের উপর ভাল।

শংকর-পার্বতী

রঞ্জিৎ মুভিটোনের হিন্দী বাণী-চিত্র। পরিচালক: চতুর্ভোজ এ দোসী। সুরশিল্পী: জ্ঞান দত্ত। প্রধান ভূমিকায়: সাধনা বসু, অরুণ, কমলা চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি।

ভূতপূর্ব 'নাট্যভারতী' সংস্কৃত হয়ে সম্প্রতি 'দীপক' সিনেমায় রূপান্তরিত হয়েছে। এঁরা রঞ্জিতের 'শঙ্কর-পার্বতী' দিয়ে এঁদের প্রেক্ষাগৃহের উদ্বোধন করেছেন। একদিন ছিল যখন বাঙলা চলচ্চিত্রে পৌরাণিক কাহিনীর দৌরাত্ম্য ছিল ভয়ানক বেশী। সুখের বিষয় বাঙলা চলচ্চিত্র সম্প্রতি সে ব্যর্থ মোহের হাত এড়িয়ে উঠেছে। এখন দেখা যাচ্ছে হিন্দী-চিত্র-নির্মাতাদের নজর পড়েছে এই দিকটিতে। তাঁরা হয়ত ভাবেন যে, ভারতের অধিকাংশ লোকই যখন ধর্মান্ধ এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন, তখন পৌরাণিক চিত্রের জনপ্রিয়তা অবশ্যম্ভাবী। ব্যবসায়ের দিক থেকে এ যুক্তি যে নির্ভুল সে বিষয়ে অবশ্য দ্বিমত হবার কারণ নাই। পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে তোলা চিত্র সাধারণত জাঁকজমকপূর্ণ হয়। এর জন্যে প্রচুর অর্থ ব্যয়ের প্রয়োজন হয়। হিন্দী চিত্রের কর্তৃপক্ষ অর্থ ব্যয়ে আদৌ কার্পণ্য করেন না। হিন্দু ধর্মে দেবাদিদেব মহাদেবের স্থান যেমন অনেক উঁচুতে তেমনি তাঁকে ঘিরে একটা বিরাট পৌরাণিক কাহিনীও গড়ে উঠেছে—তার ডালপালাও আবার অনেক। পার্বতীর সঙ্গে শিবের বিবাহকে কেন্দ্র করেই আলোচ্য চিত্রের মূল আখ্যানভাগ গড়ে

উঠেছে। দক্ষ-যজ্ঞে সতীর দেহত্যাগ থেকে শুরু করে হিমালয়-কন্যা পার্বতীর সংগে শিবের মিলন পর্যন্ত এই চিত্রে রূপায়িত করা হয়েছে। অবাস্তবতা ধর্মমূলক-কাহিনীর প্রাণ বললেও অত্যুক্তি হয় না। ধর্মপ্রাণ নরনারীর কাছে অবাস্তবতার আবেদন থাকলেও, বিংশ শতাব্দীর বুদ্ধি-জীবী মনের কাছে তার আবেদন নেই। এই অসম্ভব অবাস্তবতার প্রসঙ্গ বাদ দিলে, 'শঙ্কর-পার্বতী' ভাল ছবি হয়েছে বলতে আমাদের আপত্তি নেই। 'শংকর-পার্বতী'র কাহিনীকে ফুটিয়ে তুলতে পরিচালক যে-সব বৃহৎ সেটের পরিকল্পনা করেছেন, তার জন্যে অর্থ ব্যয় হয়েছে প্রচুর। ছবিখানির নৃত্য এবং সংগীত সম্পদও উপেক্ষণীয় নয়। পার্বতীর ভূমিকায় সাধনা বসু অনেক দিন পরে সুঅভিনয় করেছেন। বোম্বাই যাবার পর এই বোধ হয় আমরা তাঁর প্রথম ভাল অভিনয় দেখলাম। তাঁর নৃত্য পরিকল্পনা-গুলোও মনোমুগ্ধকর। শঙ্করের ভূমিকায় অরুণকে বেশ সুন্দর মানিয়েছে এবং তিনি অভিনয়ও মোটের উপর মন্দ করেন নি। বিজয়ার ভূমিকায় নবাগতা অভিনেত্রী কমলা চট্টোপাধ্যায়ের ভবিষ্যৎ অত্যন্ত উজ্জ্বল বলে মনে হল। এই সুদর্শনা তরুণীর প্রাণ-চঞ্চল অভিনয় এবং সংগীত আমাদের ভাল লেগেছে। অন্যান্য ছোটখাটো চরিত্র সুঅভিনীত। ছবির আলোকচিত্র ও শব্দ গ্রহণ উচ্চাঙ্গের হয়েছে। সংগীত পরিচালনায় সুরশিল্পী জ্ঞান দত্ত বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন—বিশেষ করে হিন্দী গানে বাঙলার নিজস্ব সুরসংযোগ বেশ কিছুটা অভিনবত্বের সৃষ্টি করেছে।

'মায়া-মালঞ্চ'

শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব বসুর সদ্যরচিত নাটক 'মায়া-মালঞ্চ' ৩রা মার্চ, ...বার ও ৬ই মার্চ, সোমবার সন্ধ্যা সাড়ে ছটায় শ্রীরঙ্গমে অভিনীত হবে। নাটকটি 'কালো হাওয়া' উপন্যাস অবলম্বনে রচিত, এবং কলকাতায় সর্বসাধারণের জন্য শ্রীযুক্ত বসুর কোনো নাটকের অভিনয় এই প্রথম। অভিনয়ের প্রযোজনা করছেন কবিতাভবন এবং পরিচালনা করছেন গ্রন্থকার স্বয়ং। বিভিন্ন ভূমিকায় অবতীর্ণ হবেন প্রতিভা বসু, কল্যাণী মুখোপাধ্যায়, তপতী দেবী চট্টোপাধ্যায়, উমা দত্ত, লীলা দাশগুপ্তা, রামকৃষ্ণ রায় চৌধুরী, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, পরিতোষ সোম, সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায় ও শেখর সেন। কলকাতার শিক্ষিত শ্রেণীকে বিশুদ্ধ সাহিত্য রস পরিবেশণ করাই এই অভিনয়ের উদ্দেশ্য।

প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন

আগামী দোল পূর্ণিমার সময় ইং ৯ই ও ১০ই মার্চ নিউদিল্লীতে প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের এক-বিংশতিতম বার্ষিক অধিবেশন হইবে। মূল অধিবেশন ব্যতীত সাহিত্য, দর্শন, সংগীত, বিজ্ঞান, ইতিহাস ও 'প্রবাসী বাঙালী'—এই ছয়টি শাখা-অধিবেশনও হইবে। শ্রীযুত নলিনীরঞ্জন সরকার মহাশয় মূলে সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন এবং যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠনকালে বাঙালীর কি পথ সে সম্বন্ধে তাঁহার অভিভাষণ হইবে ইহাই প্রকাশ। সাহিত্য-গুরু শ্রীরাজশেখর বসু মহাশয় (পরশু-রাম) সাহিত্য শাখার সভাপতি হইবেন এবং তাঁহার অভিভাষণের বিষয় 'সংকেতময় সাহিত্য'। শান্তিনিকেতন হইতে আচার্য শ্রীযুত ক্ষিতিমোহন সেন দর্শন শাখার সভাপতিত্ব করিতে আসিতেছেন এবং সম্ভবত বিশ্ব-মানবতার দর্শন-শাস্ত্রে ভারতবর্ষের বাণী সম্বন্ধে অভিভাষণ প্রদান করিবেন। বিজ্ঞান ও ইতিহাস শাখার সভাপতি-রূপে যথাক্রমে ডক্টর নীলরতন ধর ও শ্রীযুত বিজনরাজ চট্টোপাধ্যায় আসিবেন, সংগীত ও প্রবাসী বাঙালী শাখার সভা-পতি এখনো নির্বাচিত হন নাই। তবে শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায় ও শ্রীউদয়-শংকর এই দুই শাখার সভাপতি হইতে পারেন বলিয়া আশা করা যায়।

এবারকার সম্মেলনের বিশেষত্ব এই যে, বর্তমান পরিস্থিতি ও রেলপথে ভ্রমণের ব্যাঘাত সত্ত্বেও যেরূপ সুসাহিত্যিক সমাগম হইবে তাহা ইতি-পূর্বে এক কলিকাতা ছাড়া সম্মেলনের অন্য কোন অধিবেশনে হয় নাই। বর্তমান বঙ্গ সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ লেখকগণ অনেকেই আসিতেছেন। বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়, অচিন্ত্য সেনগুপ্ত, বিভূতি মুখোপাধ্যায়, শরদিন্দু নারায়ণ রায়, ফণীন্দ্রনাথ মুখো-পাধ্যায়, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যো-পাধ্যায়, অধ্যাপক সুবোধ সেনগুপ্ত, জসিমুদ্দিন, বনফুল, সাগরময় ঘোষ, বিমল ঘোষ, আসামের অবসর-প্রাপ্ত শিক্ষা বিভাগের অধ্যক্ষ সতীশচন্দ্র রায়, বিখ্যাত শিল্পী সুধীররঞ্জন খাস্ত-গীর প্রভৃতি আসিবেন। যদি কেহ কোনক্রমে না আসিতে পারেন প্রবন্ধ পাঠাইবেন বলিয়া আশা করা যায়। সাহিত্য গৌরবে এবার সম্মেলন বিশেষ-ভাবে সমৃদ্ধ হইবে ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

এতদ্ব্যতীত বহু বাঙালী মনীষীর নিকট বিশেষ বিশেষ বিষয়ে প্রবন্ধের জন্য আমন্ত্রণ গিয়াছে। এইভাবে ডক্টর মেঘনাদ সাহা, হেমেন্দ্রকুমার সেন, বিমান-বিহারী দে, সরোজেন্দ্রনাথ রায়, ধূর্জটী-প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য প্রভৃতির নিকট তাঁহাদের বিশেষ বিষয় সম্বন্ধে প্রবন্ধ আশা করা যাইতেছে। এবারকার সম্মেলনের বিশিষ্ট প্রবন্ধগুলি ক্রমশই প্রকাশ করিবার জন্য প্রধান কর্মসচিব শ্রীযুক্ত দেবেশচন্দ্র দাস, আই-সি-এস মহাশয় বিশেষ বন্দোবস্ত করিবেন। ইহাতে সম্মেলনের সাহিত্যিক প্রচেষ্টা মাত্র ক্ষণস্থায়ী সাহিত্যিকগণের মিলনে পর্য-বসিত হইবে না।

খেলাধূলা

বেঙ্গল উইমেনস স্পোর্টস এসোসিয়েশন

বাঙলার নারীসমাজের মধ্যে খেলাধূলা ও ব্যায়ামচর্চা যাহাতে বিশেষভাবে প্রসারলাভ করে এবং সুশৃংখলার সহিত পরিচালিত হয় এই মহৎ উদ্দেশ্য লইয়া সম্প্রতি বেংগল উইমেনস স্পোর্টস এসোসিয়েশন গঠিত হইয়াছে। এই এসোসিয়েশনের পরিচালকমণ্ডলীতে বাঙলার প্রায় সকল বিশিষ্ট মহিলা ক্লাব, কলেজ ও স্কুলের প্রতিনিধিগণ স্থানলাভ করিয়াছেন। এই পরিচালকমণ্ডলীতে অনেক মহিলা বর্তমান আছেন যাঁহারা খেলাধূলা ও ব্যায়াম সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান রাখেন। সেইজন্য মনে হয় নব-গঠিত বেংগল উইমেনস স্পোর্টস এসোসিয়েশন এতদিন পর্যন্ত মহিলা বা বালিকাদের খেলাধূলা ও ব্যায়াম পরিচালনা সম্পর্কে যে সকল অভাব অভিযোগ শুনিতে পাওয়া যাইত তাহা দূর করিতে সক্ষম হইবেন। এই এসোসিয়েশন মহিলাদের সকল খেলাধূলা, ব্যায়ামচর্চা বা স্পোর্টস অনুষ্ঠানসমূহ কিভাবে পরিচালনা করিবেন তাহার কিছুই এখনও প্রকাশ করেন নাই, সুতরাং এই বিষয় অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। তবে সম্প্রতি ইঁহাদের পরিচালিত স্পোর্টস দেখিয়া মনে হয়, সকল বয়সের বালিকা বা মহিলাগণ যাহাতে যোগদান করিতে পারে তাহার দিকে ইঁহাদের দৃষ্টি আছে। এসোসিয়েশনটি ইতিমধ্যেই যে বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছে, তাহার পরিচয়ও ইহাতে পাওয়া গেল। বিভিন্ন ক্লাব, কলেজ ও স্কুলের প্রায় তিনশত এ্যাথলীট এই অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছিলেন। দুই তিন সহস্রের অধিক মহিলা ও বালিকা দর্শক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। অধিকাংশ বিষয়েই তীব্র প্রতিযোগিতা অনুভূত হয়। প্রতিযোগিতার ফলাফল খুব উচ্চাংগের হয় নাই। আমরা আশা করি এই এসোসিয়েশন একটি শিক্ষাকেন্দ্র খুলিয়া এই বিষয় সাহায্য করিবেন।

এশিয়াটিক ভারোত্তোলন প্রতিযোগিতা

বাগবাজার জিমনাসিয়াম পরিচালিত এশিয়াটিক ভারোত্তোলন প্রতিযোগিতা সমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। বাঙলার বিভিন্ন ব্যায়ামাগারের বহু ব্যায়ামবীর এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করেন। এমন কি পাঞ্জাবের একজন খ্যাতনামা ব্যায়ামবীর এই অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছিলেন। প্রতিযোগিতার অধিকাংশ বিষয়েই বাঙালী ব্যায়ামবীরগণ সাফল্যলাভ করিয়াছেন। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত অলিম্পিক অনুষ্ঠানে বাঙালী ব্যায়ামবীরগণ সাফল্যলাভ করিয়া যে গৌরব অর্জন করিয়াছিলেন এই প্রতিযোগিতায় তাহা অক্ষুন্ন রাখিতে সক্ষম হইয়াছেন। এইবারের অনুষ্ঠানে তিনজন ব্যায়ামবীর তিনটি বিষয় নূতন রেকর্ড করিয়াছেন। নিম্নে উক্ত রেকর্ডের তালিকা প্রদত্ত হইল:—

(১) ফেদার ওয়েটে কর্পোরাল সি ডবলিউ বার্ড, ক্লিন এণ্ড জার্কে ২১৪ পাউণ্ড তুলিয়া নূতন রেকর্ড করিয়াছেন। (২) লাইট ওয়েটে পাঞ্জাবের সফিক আমেদ ক্লিন এণ্ড জার্কে ২৩৪ পাউণ্ড তুলিয়া নূতন রেকর্ড করিয়াছেন। ঐ বিভাগেই অমূল্য চক্রবর্তী স্ন্যাচে ১৭৯ পাউণ্ড তুলিয়া নূতন রেকর্ড করিয়াছেন।

এই প্রতিযোগিতাটি বহু বৎসর হইতেই অনুষ্ঠিত হইতেছে; কিন্ত তাহা সত্ত্বেও পরিচালনার মধ্যে অনেক ত্রুটি বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হইয়াছে। সর্বাপেক্ষা আমাদের আশ্চর্য করিয়াছে বারবেলের বেড় অপেক্ষা ওজনের বেড় বড় হওয়ায়। এই সকল ত্রুটি বিচ্যুতি বর্তমান থাকিলে প্রতিষ্ঠানটি বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করিতে পারিবে না।

ফলাফল:—ব্যাণ্টমওয়েট—১ম দাশরথী পাল, মিলিটারী প্রেস ১৩৪ পাউণ্ড, স্ন্যাচ ১৩০ পাউণ্ড, ক্লিন এণ্ড জার্ক ১৬৯ পাউণ্ড, মোট ৪৩৩ পাউণ্ড। ২য়—অজিতকুমার বসু, মিলিটারী প্রেস ১১০ পাউণ্ড, স্ন্যাচ ১২০ পাউণ্ড, কিন এণ্ড জার্ক ১৫৯ পাউণ্ড, মোট ৩৮৯ পাউণ্ড।

ফেদার ওয়েট:—১ম কর্পোরাল সি ডবলিউ বার্ড, মিলিটারী প্রেস ১৩৬ পাউণ্ড; স্ন্যাচ ১২৯ পাউণ্ড, কিন এণ্ড জার্ক ২১৪ পাউণ্ড, মোট ৪৮৬ পাউণ্ড। ২য় শংকর খাঁ, মিলিটারী প্রেস ১০৫ পাউণ্ড, স্ন্যাচ ১৩৯ পাউণ্ড, কিন এণ্ড জার্ক ১৯৪ পাউণ্ড, মোট ৫৭৮ পাউণ্ড। ৩য় শৈলেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি, মিলিটারী প্রেস ১২৫ পাউণ্ড, স্ন্যাচ ১২৫ পাউণ্ড, ক্লিন এণ্ড জার্ক ১৭৯ পাউণ্ড, মোট ৪২৯ পাউণ্ড।

লাইট ওয়েট:—১ম সফিক আমেদ (পাঞ্জাব), মিলিটারী প্রেস ১৫৯ পাউণ্ড, স্ন্যাচ ১৬৯ পাউণ্ড, ক্লিন এণ্ড জার্ক ২৩৪ পাউণ্ড, মোট ৫৬২ পাউণ্ড। ২য় অমূল্যরতন চক্রবর্তী, মিলিটারী প্রেস ১৫৯ পাউণ্ড, স্ন্যাচ ১৭৯ পাউণ্ড, ক্লিন এণ্ড জার্ক ২০৯ পাউণ্ড, মোট ৫৪৭ পাউণ্ড।

মিডল ওয়েট:—১ম সুরেশচন্দ্র বিশ্বাস, মিলিটারী প্রেস ১৫৯ পাউণ্ড, স্ন্যাচ ১৫৯ পাউণ্ড, ক্লিন এণ্ড জার্ক ১৮৯ পাউণ্ড, মোট ৫০৭ পাউণ্ড। ২য় হারাণচন্দ্র বিশ্বাস, মিলিটারী প্রেস ১৪৯ পাউণ্ড, স্ন্যাচ ১৪৯ পাউণ্ড, ক্লিন এণ্ড জার্ক ১৯৪ পাউণ্ড, মোট ৪৯২ পাউণ্ড।

হেভী ওয়েট:—১ম হেমচন্দ্র মুখার্জি, মিলিটারী প্রেস ১৮৯ পাউণ্ড, স্ন্যাচ ১৫৯ পাউণ্ড, ক্লিন এণ্ড জার্ক ২৩৪ পাউণ্ড, মোট ৫৮২ পাউণ্ড।

ইণ্ডিয়ান ফুটবল এসোসিয়েশন

বাঙলার ফুটবল খেলা পরিচালনা করেন ইণ্ডিয়ান ফুটবল এসোসিয়েশন। সম্প্রতি এই এসোসিয়েশনের সাধারণ বার্ষিক সভায় নব-বর্ষের কার্যনির্বাহক সমিতি গঠিত হইয়াছে। দীর্ঘদিন ধরিয়া যে সকল সভ্য এই সমিতিতে স্থান পাইয়া আসিতেছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বাদ পড়িয়াছেন বলিয়া দেখা গেল। এই পরিবর্তন ভালর জন্যে হইল না মন্দের জন্য এখনও বলা যায় না। তবে এতদিন ধরিয়া যে সকল ত্রুটি বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হইত, তাহা হয়তো আর দেখিতে পাওয়া যাইবে না। যদি ইহা সত্যে পরিণত হয়, তবে আমরা খুবই সুখী হইব। নিম্নে এই বৎসরের নবগঠিত কার্যনির্বাহক সমিতির বিশিষ্ট সভ্যদের নাম প্রদত্ত হইল:—

সভাপতি:—শ্রীযুত বিমলচন্দ্র ঘোষ, সহ-সভাপতি:—মিঃ বি এইচ পিক, সম্পাদকদ্বয়:—শ্রীযুত জ্যোতিষচন্দ্র গুহ ও মিঃ এল আর পেণ্টনী, কোষাধ্যক্ষ:—শ্রীযুত উমাপতি কুমার।

সাপ্তাহিক সংবাদ
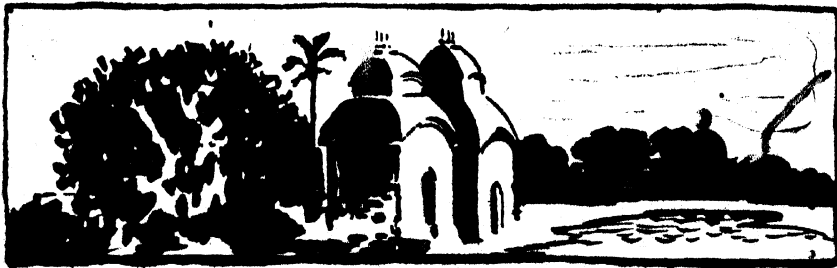
২২শে ফেব্রুয়ারী

. কমন্স সভায় মিঃ চার্চিল বক্তৃতায় বলেন, "এখন দুঃখ কিংবা আনন্দ প্রকাশের সময় নহে। এখন আমাদের আয়োজন উদ্যোগে সংকল্পবদ্ধ হওয়ার সময়। এখনও যুদ্ধ চলিতেছে। আমি কখনও এই মত প্রকাশ করি নাই যে, ইউরোপে যুদ্ধ শেষ হইয়া আসিয়াছে কিংবা হিটলারের পতন আসন্ন। আমি কখনও এইরূপ প্রতিশ্রুতি দেই নাই কিংবা এই মত প্রকাশ করি নাই যে, ১৯৪৪ সালে ইউরোপের যুদ্ধ শেষ হইবে কিংবা ইহার বিপরীত কোন কথাও আমি বলি নাই।"

সোভিয়েট বাহিনী কর্তৃক ক্রিভয়রগ দখলের সংবাদ সরকারীভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে।

প্রশান্ত মহাসাগরে মার্কিন সৈন্যেরা এনিওয়েটক দখল করিয়াছে।

শ্রীযুক্তা কস্তুরবাঈ গান্ধী অদ্য সন্ধ্যা ৭টা ৩৫ মিনিটের সময় পুনায় আগা খাঁ প্রাসাদে পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭৪ বৎসর হইয়াছিল। মহাত্মা গান্ধী, তাঁহার জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ পুত্র—হীরালাল ও দেবদাস গান্ধী, হীরালাল গান্ধীর কন্যা এবং গান্ধী পরিবারের একটি আত্মীয়া শ্রীযুক্তা গান্ধীর মৃত্যুকালে তাঁহার শয্যা পার্শ্বে ছিলেন।

মেদিনীপুরের জেলা ও দায়রা জজ সুতাহাটা থানা লুঠ মামলায় অধিকাংশ জুরীর অভিমত গ্রহণ করিয়া ২১ জন আসামীকেই নির্দোষ বলিয়া সাব্যস্ত করেন ও তাহাদের মুক্তি দেন।

২৩শে ফেব্রুয়ারী

নিউ বৃটেন দ্বীপের পশ্চিম অংশ সম্পূর্ণভাবে মিত্রপক্ষের করতলগত হইয়াছে।

আরাকান রণাঙ্গনে মিত্রপক্ষের সৈন্যেরা জাপানীদের নিকট হইতে আক্রমণোদ্যোগ ছিনাইয়া লইয়াছে।

বোম্বাইয়ে পুলিশ চৌপাটীতে সতেরজন মহিলা সমেত ৪০ জনকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। প্রকাশ, শ্রীযুক্তা কস্তুরবাঈ গান্ধীর পরলোকগমন উপলক্ষে প্রার্থনা করিবার জন্য তাঁহারা ঐ স্থানে সমবেত হইয়াছিলেন।

পুনায় আগা খাঁ প্রাসাদ-কারার প্রাঙ্গণে স্বর্গত মহাদেব দেশাইয়ের চিতাশয্যার পার্শ্বে অদ্য সকাল ১০-৪০ মিনিটের সময় গান্ধী পরিবারের শতাধিক সুহৃদ ও স্বজনগোষ্ঠীর সমক্ষে শ্রীযুক্তা কস্তুরবাঈ গান্ধীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয়। মহাত্মা গান্ধীর কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীযুত দেবদাস গান্ধী জননীর শেষকৃত্য অনুষ্ঠানের কার্যগুলি সম্পন্ন করেন।

পাঞ্জাব গভর্নমেণ্ট বোম্বাইয়ের ভূতপূর্ব মেয়র মিঃ ইউসুফ মেহেরালীর উপর পাঞ্জাব প্রদেশে তাঁহার প্রবেশ নিষিদ্ধ করিয়া এক আদেশ জারী করিয়াছেন।

২৪শে ফেব্রুয়ারী

গতকল্য রাত্রে লণ্ডনের উপকূলবর্তী এক এলাকায় অগ্নিপ্রজ্বালক বোমা বর্ষণ করিয়া আক্রমণ চালান হয়। ১৯৪১ সালের এপ্রিলের পর হইতে উক্ত এলাকায় এরূপ প্রচণ্ড আক্রমণ আর হয় নাই। উক্ত এলাকার সমস্ত অংশে অগ্নিপ্রজ্বালক বোমা বর্ষিত হয় এবং কতকগুলি অট্টালিকায় আগুন ধরিয়া যায়। লণ্ডনে গতকল্য নৈশ বিমান হানার সময় শ্রমিকদের থাকার একটি বিরাট অট্টালিকায় সরাসরি আঘাত লাগে। বহুলোক ধ্বংস স্তূপের মধ্যে চাপা পড়ে।

কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে "রিজার্ভ তহবিল গ্রহণ" বাবদ দাবীর ১০ কোটি টাকা হ্রাস করিবার জন্য শ্রীযুত বি দাসের ছাঁটাই প্রস্তাব ৫১—৪৬ ভোটে গৃহীত হয়। যাত্রীদের ভাড়া বৃদ্ধি হইতে এই ১০ কোটি টাকা পাওয়া যাইবে বলিয়া ধরা হইয়াছিল।

২৫শে ফেব্রুয়ারী

সোভিয়েট বাহিনী পূর্ব প্রুশিয়া যাইবার পথে রগাসেভ-এর পশ্চিমে অনধিক ২৮ মাইল দূরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ রেল জংসন ও যোগপথ ববরুইস্ক অভিমুখে অভিযান শুরু করিয়াছে।

সোভিয়েট সৈন্যদল পস্কভের ২০ মাইলের মধ্যে উপস্থিত হইয়াছে।

ষ্টকহলমের সংবাদে প্রকাশ, যথাসম্ভব শীঘ্র একটি ফিনিস রাজনৈতিক ও সামরিক প্রতিনিধি-দলকে মস্কোতে প্রেরণ করিবার জন্য রুশেরা আমন্ত্রণ জানাইয়াছে। উক্ত প্রতিনিধিদলকে যুদ্ধ বিরতি ও শান্তি স্থাপনের সর্তাবলী জানান হইবে।

শ্রীযুক্তা কস্তুরবাঈ গান্ধীর চিতাভস্ম পুনা হইতে ছয় মাইল দূরে আলন্দা নামক পবিত্র স্থানে লইয়া গিয়া ইন্দ্রায়নী নদীতে নিক্ষেপ করা হইয়াছে।

২৬শে ফেব্রুয়ারী

আরাকান রণাঙ্গনে বাউলী রোড আক্রমণকারী জাপ সৈন্য দলের অবশিষ্টাংশ মায়ু পাহাড় শ্রেণীর প্রধান চূড়া হইতে চূড়ান্তভাবে বিতাড়িত হইয়াছে। উত্তর ব্রহ্মে লাকিয়েনগা মিত্রবাহিনী কর্তৃক অধিকৃত হইয়াছে।

সোভিয়েট বাহিনী কর্তৃক পরখোভ অধিকৃত হইয়াছে। পস্কোভের পথে পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত সড়ক ও রেল রাস্তার ধারে ইহাই শেষ শহর।

কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে প্রশ্নোত্তরের সময় স্বরাষ্ট্র সচিব জানান যে, ১৯৩০ সালের জানুয়ারী মাসেই সর্বপ্রথম কংগ্রেসের স্বাধীনতা সংকল্পবাক্যের প্রতি গভর্নমেণ্টের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। এই সময় উক্ত সংকল্পবাক্য যথারীতি অনুমোদিত হয় নাই। কিন্তু গভর্নমেণ্ট উহা তখনও আইনানুগ বলিয়া মনে করেন নাই। ১৯৩৪ সালে এবং ১৯৩৭ সালে গভর্নমেণ্টের আইন বিষয়ক পরামর্শদাতাগণ গবর্নমেণ্টকে জ্ঞাপন করে যে, উক্ত সংকল্পবাক্য রাজদ্রোহকর।

শক্করের স্পেশাল জজ আল্লাবক্স হত্যাকাণ্ড মামলার রায় দিয়াছেন। সিন্ধুর ভূতপূর্ব প্রধান মন্ত্রী আল্লাবক্সের হত্যাকারী বলিয়া অভিহিতদিগের অন্যতম প্রধান বলিয়া বর্ণিত কাসিম ও অপর দুইজন আসামীর প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। অবশিষ্ট ৪ জন আসামী যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে।

কেন্দ্রীয় পরিষদে মুসলিম লীগ দলের পক্ষ হইতে যে সব সরকারী চাকুরিয়ার অবসর বা পেন্সন গ্রহণের সময় হইয়াছে, তাহাদের কার্যকাল বৃদ্ধি করার যে নীতি গভর্নমেণ্ট গ্রহণ করিয়াছেন তাহার নিন্দা করিয়া এক ছাঁটাই প্রস্তাব উত্থাপিত হইলে উহা ৪৪—৪২ ভোটে গৃহীত হয়। রেল শ্রমিকদের সামান্য মাগ্‌গী ভাতা দেওয়ার ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনার দাবী করিয়া শ্রীযুত যমুনাদাস মেহতা যে প্রস্তাব আনয়ন করেন, তাহার ভোট ফল সমান সমান হয়। সভাপতি বর্তমান ব্যবস্থার অনুকূলে তাঁহার কাষ্টিং ভোট প্রদান করেন। ফলে প্রস্তাবটি অগ্রাহ্য হইয়া যায়।

২৭শে ফেব্রুয়ারী

আরাকান রণাঙ্গনে মিত্রপক্ষের সৈন্যদল উত্তর ও দক্ষিণ দিকে আক্রমণ চালাইয়া নচেডাউক গিরিপথের পূর্ব নির্গমন পথের নিকট একটি ঘাঁটি এবং একটি গুরুত্বপূর্ণ টিলা দখল করে।

২৮শে ফেব্রুয়ারী

দিল্লীতে সরকারীভাবে ঘোষিত হইয়াছে যে, আরাকানে চতুর্দশ আর্মির ভারতীয় ও বৃটিশ সৈন্যেরা জাপানীদিগকে ভালভাবে পরাজিত করিয়াছে। প্রায় ৮ হাজার জাপানী সৈন্যেরা চতুর্দশ আর্মির যোগাযোগ ছিন্ন করিয়া উহাকে পরিবেষ্টনপূর্বক ধ্বংস করার চেষ্টা করে; কিন্তু তাহাদের সেই চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যায় এবং তাহারা নিজেরাই গুরুতররূপে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ যাবৎ প্রায় পনর শত জাপানীর মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে; আহতের সংখ্যা মৃতের প্রায় দ্বিগুণ হইবে। আর মাত্র কয়েক শত সৈন্য লইয়া গঠিত দুইটি জাপানী দলকে পর্যুদস্ত করিতে বাকী আছে। প্রতিপক্ষের তুলনায় বৃটিশ পক্ষের হতাহতের সংখ্যা কম।

পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের বিশেষ আহ্বানে স্বর্গীয়া কস্তুরবাঈ গান্ধীর ভস্মাবশেষ এলাহাবাদে আনীত হইয়াছিল। অদ্য প্রাতে তাহা প্রয়াগের গঙ্গা-যমুনা সঙ্গমে নিমজ্জিত করা হইয়াছে।

কলিকাতা কর্পোরেশনের আগামী সাধারণ নির্বাচনে নির্বাচনযোগ্য ৮৫টি আসনের জন্য ৩৪৪ জন পদপ্রার্থী তাঁহাদের মনোনয়ন-পত্র দাখিল করিয়াছেন। আগামী ৩রা মার্চ মনোনয়ন-পত্রগুলি পরীক্ষা করা হইবে। আগামী ২৯শে মার্চ ভোটের দিন ধার্য করা হইয়াছে।

বেঙ্গল এণ্ড আসাম রেলওয়ে প্রচারিত এক ইস্তাহারে প্রকাশ, ১৯৪৪ সালের ১লা মার্চ হইতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় সেনা বিভাগের রেলওয়ে ইউনিট, কাটিহার হইতে লিডো এবং ডিব্রুগড় পর্যন্ত মিটার গেজ সেক্সনের সমস্ত প্রধান লাইনের পরিচালনার ভার গ্রহণ করিবেন। শাখা লাইনসমূহের মধ্যে গোলকগঞ্জ-ধুবড়ী এবং মারিয়ানী-নিয়ামতী শাখাদ্বয় ব্যতীত ঐ ইউনিট অন্য কোন শাখার পরিচালনা করিবেন না।

নিখিল ভারত কিষাণ সম্মেলনে যোগদানের উদ্দেশ্যে এম এণ্ড এস এম রেলপথে বেজওয়াদায় যাওয়া বন্ধ করিবার জন্য মাদ্রাজ সরকার যে আদেশ জারী করিয়াছেন, তৎসম্পর্কে আলোচনা করিবার জন্য শ্রীযুত গোবিন্দ দেশমুখ কেন্দ্রীয় পরিষদে যে মুলতুবী প্রস্তাব আনয়ন করিয়াছিলেন, তাহা ৪৩—৪২ ভোটে অগ্রাহ্য হয়।

১৮

সেযুগ ও এযুগের কথা . . .

কয়েক বৎসর আগেও আমাদের জন্য কাপড় আসত ইংলণ্ড থেকে। তার আগে কি আমরা তবে কাপড় পরতাম না ? তা নয়, আমাদের প্রয়োজনীয় সব কাপড় তৈরী হ'ত এই ভারতেই—তাঁতে। সে শিল্প ছিল এতই বিরাট যে আমরা প্রচুর কাপড় বিদেশেও রপ্তানী ক'রতে পারতাম। কিন্তু যখন থেকে ইংলণ্ডে কলে কাপড় তৈরী হ'তে লা'গল তখন থেকেই এই শিল্পের দুর্দ্দিন উপস্থিত হ'ল। একদিকে রাজশক্তির স্নেহপুষ্ট কাপড়ের কল, অন্যদিকে সেই রাজশক্তিরই আমাদের শিল্প-বানিজ্যের ধ্বংসকামনা ; এই দুই চাপে প'ড়ে আমাদের অসহায় তাঁতশিল্প বিলুপ্ত হ'ল। ফলে লক্ষ লক্ষ তাঁতী বৃত্তিহীন হ'য়ে কৃষিকেই জীবিকা ব'লে অবলম্বন ক'রল ; আর তাদের পরিশ্রমের ফল ভোগ করতে লা'গল তাঁরাই যারা দায়ী তাঁদের দুর্দ্দশার জন্য। তবে সৌভাগ্যের কথা যে এই দুঃখের দিনের শিক্ষা আমরা ভুলি নাই ; আমরা বুঝেছি যে যন্ত্রশক্তির সামনে আত্মরক্ষা করতে চাই যন্ত্রশক্তি। তাই স্বদেশী আন্দোলনের প্রথম সুফল হ'ল যন্ত্রচালিত বস্ত্রশিল্প, ভারতবাসীর অর্থে ও শ্রমে যার প্রতিষ্ঠা, ভারতবাসীর স্বদেশপ্রেমে যার প্রচলন। আজ লক্ষ লক্ষ ভারতবাসী এই শিল্পের কল্যাণে সুখী, উন্নত জীবন যাপন ক'রছে—আর আমাদের বস্ত্র সমস্যা চিরকালের জন্য মিটে গেছে। আজ আমরা অপেক্ষা ক'রছি সেই শুভদিনের, যুদ্ধান্তে যেদিন আমাদের উৎপাদিত বস্ত্র আমাদের প্রতিবেশী আরব, পারস্য, মালয়, চীন পূর্ব্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি রাষ্ট্রে পাঠাতে পা'রব। জাতীয় শিল্প বানিজ্যের এই উন্নতিতে বাংলাদেশের অংশও কিছু কম নয়। তার উন্নততম যন্ত্রসজ্জায় সজ্জিত এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট কাপড় ও সুতা তৈরীর বৃহত্তম কলটি হচ্ছে—

প্রতিষ্ঠাতা ও ম্যানেজিং ডাইরেক্টর — শ্রীসূর্য্য কুমার বসু।

DCB—8

বাংগলার পরম সংকটাকালে

যাদবপুর যক্ষ্মা হাসপাতাল

আপনাদের
সমবেত সাহায্য লাভ করিলে
আরো বহু হতভাগ্য
যক্ষ্মা রোগীর জীবন রক্ষা করিতে সমর্থ
হইবে।

ডাঃ কে, এস, রায়, সম্পাদক।
৬এ, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জি রোড,
কলিকাতা।

৪০০০ নিয়মিত গ্রাহক
এবং তাঁহাদের পরিবারবর্গ
অর্দ্ধ-সাপ্তাহিক

আনন্দবাজার পত্রিকা

পাঠ করেন।
স্বল্প খরচে আপনার পণ্যদ্রব্যের প্রচারের
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সংবাদপত্র।
বাৎসরিক ১২, ষাণ্মাসিক ৬৷৹।

শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার প্রণীত

ক্ষয়িষ্ণু হিন্দু

দ্বিতীয় সংস্করণে গ্রন্থের কলেবর বাড়িয়াছে।
প্রত্যেক হিন্দুর অবশ্য পাঠ্য। মূল্য দেড় টাকা।

শ্রীগৌরাঙ্গ (জীবনী)	১৷৷৹

গ্রন্থকার প্রণীত কয়েকখানি উপন্যাস—

ভ্রষ্টলগ্ন	১৸৹
অনাগত	১৷৷৹
বিদ্যুৎলেখা	২৲
লোকারণ্য	২৷৷৹
বালির বাঁধ	২৷৷৹

কলিকাতার সমস্ত প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

শাইকা

খোস, একজিমা, হাজা, কাটা ঘা,
পোড়া ঘা নালীঘা, ফুস্কুড়ি চুলকানি,
ও চুলকানিযুক্ত সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগে
অব্যর্থ

এরিয়ান রিসার্চ ওয়ার্কস
পি১৩ চিত্তরঞ্জন এভেনিউ (নর্থ)
কলিকাতা ফোন-বি, বি, ২৬৩৬

গণোরিয়ায়

গণোহিল ২৷৷৹
গণোওয়াস ১৸৵৹

স্বপ্নবিকার ও স্নায়ুদৌর্ব্বল্যের মহৌষধ ২৷৷৹
সুপরীক্ষিত ও গ্যারাণ্টীড (গভঃ রেজিঃ)। বিফলে
মূল্য ফেরৎ। **সিফিলিস গণোরিয়া** ও পুরাতন রোগ
ডাকযোগে গ্যারাণ্টী দিয়া আরোগ্য করা হয়।
শ্যামসুন্দর হোমিও ক্লিনিক (গভঃ রজিঃ), ১৪৮,
আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিঃ।

ডাঃ জে, পি, রায় এইচ, এম, বি

প্রাচীন পীড়া, বাত, যৌন ও চর্ম্মরোগের
চিকিৎসক

২৪৯, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ (নর্থ) কলিকাতা
ফোন বি, বি, ২৭২০

ইউনাইটেড কমার্শিয়েল ব্যাঙ্ক লিঃ

অনুমোদিত মূলধন	—	৪,০০,০০,০০০৲ টাকা
বিক্রীত মূলধন	—	২,০০,০০,০০০৲ টাকা
আদায়ীকৃত মূলধন, ৩রা সেপ্টেম্বর ১৯৪৩—		১,০০,০০,০০০৲ টাকা
অনাদায়ী টাকা বাদ	১০০০৲,	৯৯,৯৯,০০০৲ টাকা

চেয়ারম্যান :— মিঃ জি, ডি, বিড়লা

ডিরেক্টরস্ :—

মিঃ এম্, এল, দাহান্নুকার	মিঃ এ, সি, লাহা
স্যার আদমজী হাজী দাউদ	,, নবীনচন্দ্র মফতলাল
মিঃ কে, পি, গোয়েঙ্কা	,, মদনমোহন আর, রুইয়া
,, এম্, এ, ইস্পাহানী	,, আর, জি, সারাইয়া
,, বৈজনাথ জালান	,, মতিলাল তাপুরিয়া

জেনারেল ম্যানেজার :— মিঃ বি, টি, ঠাকুর

যে ব্যাঙ্কে টাকা রেখে নিশ্চিন্তে থাকতে পারেন

বোম্বাই শাখাঃ— পেটিট্ বিল্ডিং, হর্ণবি রোড
ম্যানেজার :— মিঃ ভি, আর, সোনালকর
২নং রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস, :: কলিকাতা।
ফোনঃ— কলিকাতা ৬৫৭৮

সূচীপত্র

'দেশ'-এর নিয়মাবলী

বার্ষিক মূল্য—১০্ ষাণ্মাসিক—৫্

বিজ্ঞাপনের নিয়ম

"দেশ" পত্রিকায় বিজ্ঞাপনের হার সাধারণত নিম্নলিখিতরূপঃ—

	সাধারণ পৃষ্ঠা ১ বৎসর টাকা	এক বৎসরের জন্য টাকা
পূর্ণ পৃষ্ঠা	৪৫্	৫৫্
অর্ধ পৃষ্ঠা	২৪্	২৮্
প্রতি ইঞ্চি	২৷৹	৬্

প্রবন্ধাদি সম্বন্ধে নিয়ম

পাঠক, গ্রাহক ও অনুগ্রাহকবর্গের নিকট হইতে প্রাপ্ত উপযুক্ত প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা ইত্যাদি সাদরে গৃহীত হয়।

প্রবন্ধাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় কালিতে লিখিবেন। কোন প্রবন্ধের সহিত ছবি দিতে হইলে অনুগ্রহপূর্বক ছবি সঙ্গে পাঠাইবেন অথবা ছবি কোথায় পাওয়া যাইবে জানাইবেন।

অমনোনীত লেখা ফেরৎ লইতে হইলে সঙ্গে উপযুক্ত ডাক টিকিট দিবেন। লেখা পাঠাইবার তারিখ হইতে দুই মাসের মধ্যে যদি তাহা 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত না হয়, তাহা হইলে লেখাটি অমনোনীত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। অমনোনীত লেখা ছয় মাসের পর নষ্ট করিয়া ফেলা হয়। অমনোনীত কবিতা টিকিট দেওয়া না থাকিলে এক মাসের মধ্যেই নষ্ট করা হয়।

সমালোচনার জন্য দুইখানি করিয়া পুস্তক দিতে হয়।

সম্পাদক—"দেশ"
১নং বর্ম্মণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

অলঙ্কারে বৈচিত্র্য
MBS
অলঙ্কার নির্ম্মাণে — ডিজাইনের সৌষ্ঠব, মনোরম কাজ এবং স্বর্ণের বিশুদ্ধতাই আমাদের বৈশিষ্ট্য। আমাদের দোকানে নিজ কারখানায় প্রস্তুত একমাত্র গিনি স্বর্ণের নানাবিধ হাল ফ্যাসনের অলঙ্কার ও রৌপ্যের বাসনাদি সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ মজুত থাকে এবং অর্ডার দিলেও অল্প সময়ে পছন্দ মত জিনিষ তৈয়ারী করিয়া দেওয়া হয়। মফঃস্বলের অর্ডার ভি. পি ডাকে পাঠান হয়। পুরাতন স্বর্ণের পরিবর্ত্তে নূতন অলঙ্কার পাওয়া যায়। কাজের তুলনায় মজুরী সুলভ এবং প্রত্যেকটি অলঙ্কারের জন্য গ্যারান্টি থাকে।
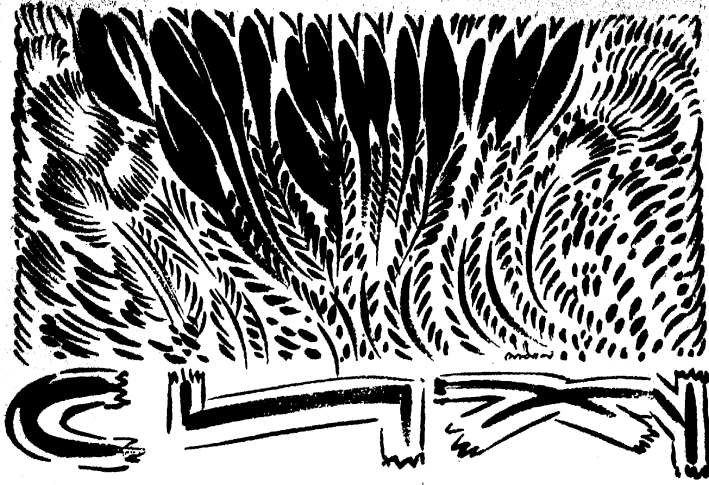
সম্পাদকঃ শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন সহকারী সম্পাদকঃ শ্রীসাগরময় ঘোষ

১১ বর্ষ] শনিবার, ১৫ই মাঘ, ১৩৫০ সাল। Saturday, 29th January, 1944 [১২শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

নূতন গভর্নরের দায়িত্ব

গত ২২শে জানুয়ারী হইতে নবনিযুক্ত গভর্নর মিঃ রিচার্ড গার্ডিনার কেসি বাঙলা দেশের শাসনকার্যের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি অত্যন্ত সংকটপূর্ণ অবস্থার মধ্যে শাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। এই দায়িত্ব যথাযথভাবে প্রতিপালনের পক্ষে একদিক হইতে তাঁহার যেমন অসুবিধা, অন্যদিক হইতে তেমনই সুবিধাও রহিয়াছে। এতৎসম্পর্কে অসুবিধার কথাটা 'স্টেটসম্যান' পত্রের ভূতপূর্ব সম্পাদক স্যার আলফ্রেড ওয়াটসন সম্প্রতি 'গ্রেট বৃটেন এণ্ড ইস্ট' নামক পত্রিকায় একটি প্রবন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন। সে অসুবিধা এই যে, মিঃ কেসি অস্ট্রেলিয়ার অধিবাসী। অস্ট্রেলিয়ায় ভারতবাসীদের কোন অধিকার নাই। অবশ্য ভারতবর্ষের সম্পর্কে অস্ট্রেলিয়ার গভর্নমেণ্টের এই নীতির জন্য মিঃ কেসি দায়ী নহেন; তথাপি ভারতবাসীদের মনে, বিশেষভাবে জাতীয়তাবাদের জন্মভূমি এই বাঙলা দেশে অস্ট্রেলিয়া সম্বন্ধে একটা বিরুদ্ধ ধারণা রহিয়াছে। নূতন গভর্নরকে স্বীয় কার্যের দ্বারা দেশবাসীর মন হইতে এই ধারণা অপসারিত করিতে হইবে। তাঁহার পক্ষে এই প্রাথমিক অসুবিধার যে কথা স্যার আলফ্রেড উল্লেখ করিয়াছেন, আমরা সে সম্বন্ধে আমাদের মন্তব্য পূর্বেই প্রকাশ করিয়াছি। নূতন গভর্নরের পক্ষে এ অসুবিধা যেরূপ আছে; সেইরূপ আবার এই অসুবিধা দূর করিবার পক্ষে বাঙলা দেশের বর্তমান অবস্থার জন্য পূর্ববর্তী অপরাপর গভর্নরের অপেক্ষা বিশেষ সুবিধাও তাঁহার রহিয়াছে। ১৯৪৩ সালে বাঙলা দেশে যে লোক-ক্ষয়কর সংকট দেখা দিয়াছিল, তাহার জের এখনও মিটে নাই; বরং সংকটের জের মিটিবার পূর্বেই পুনরায় দ্বিতীয় সংকটের আশংকা লোকের মনে দেখা দিয়াছে। দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষের ফলে বাঙলা জুড়িয়া কলেরা, বিশেষভাবে ম্যালেরিয়ার ধ্বংসলীলা চলিতেছে। এখনও তাহার অবসান হয় নাই। এই সংকটে বাঙলা দেশের রাজনীতিক ক্ষেত্রে একটি পরিবর্তন ঘটিয়াছে; বাঙলার সকল দল, সকল সম্প্রদায়ের কাছে দেশের অন্নসংকট এবং তজ্জনিত সমস্যাই অন্য সকল প্রশ্নকে ছাপাইয়া বড় হইয়া উঠিয়াছে। এক্ষেত্রে মিঃ কেসির পক্ষে সুবিধা এই যে, তিনি যদি এই সমস্যা সমাধানের জন্য কার্যকর নীতি অবলম্বন করিয়া আন্তরিকতার সহিত অগ্রসর হন, তবে অতি সহজেই তিনি সকল দলের সমর্থন লাভ করিতে সমর্থ হইবেন এবং লোকপ্রিয়তা অর্জন করিবেন। বঙ্গলার পরলোকগত গভর্নর স্যার জন হার্বার্টের অবলম্বিত নীতির অভিজ্ঞতা দেশবাসী বিস্মৃত হইতে পারে নাই; এখন নবনিযুক্ত গভর্নরের নীতি আশ্বাসমূলক কিছু অভিনবত্ব তাঁহারা আশা করিতেছে এবং এই দিক হইতে শাসন-নীতির পরিবর্তনের প্রতি তাহাদের আগ্রহ সমধিক উদ্দীপ্ত রহিয়াছে। মিঃ কেসি দেশের লোকের সেই আশা সফল করিতে পারিবেন কি? যদি তিনি এ কার্যে সাফল্য লাভ করিতে চাহেন, তবে তাঁহাকে আমলাতন্ত্রী সংস্কার হইতে মুক্ত হইয়া সোজাসুজি দেশবাসীর সহযোগিতালাভে সচেষ্ট হইতে হইবে। দেশের যাঁহারা জনপ্রিয় কর্মী, যাঁহারা প্রকৃত দেশ-সেবক, তাঁহাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে বাঙলা দেশের বর্তমান দুর্গতির প্রতিকারের জন্য তাঁহাকে হাতে হাত মিলাইয়া অগ্রসর হইতে হইবে। দেশ-সেবক এই সব কর্মীর সঙ্গে শাসক-সম্প্রদা এতদিন পর্যন্ত অবিশ্বাস ও সংশয়ের ব্যবধান রাখিয়া চলিয়াছেন, সেই ব্যবধা বিশ্বাস এবং নির্ভরশীল প্রীতির প্রভা মিঃ কেসিকে দূর করিতে হইবে। সম বাঙলার জনসাধারণ গভীর দুঃখ এ বেদনায় বর্তমানে জর্জর। আজ তাহাে অন্ন চাই, শুশ্রূষার ব্যবস্থা তাহাদের প প্রয়োজন এবং সে আয়োজন সার্থক করি হইলে প্রথমে আবশ্যক ইহাদের স একটু হৃদ্যতার। দেশের জনসাধার

সুখে দুঃখে এমন সহানুভূতিসম্পন্ন এবং প্রকৃত হৃদয়বান্ কর্মী যাঁহারা, তাঁহারা অনেকে এখনও বন্দী অবস্থায় জীবনযাপন করিতেছেন। বর্তমান সঙ্কটের অবস্থা বিবেচনা করিয়া আমরা তাঁহাদিগকে মুক্তিদান করিবার প্রয়োজনীয়তার প্রতি শাসকদের দৃষ্টি অবিরত আকর্ষণ করিয়াছি; কিন্তু বিশেষ কোন ফল এ পর্যন্ত হয় নাই। বাঙলা দেশের দুইজন বিশিষ্ট জন-সেবক কর্মী সম্প্রতি পূর্ণ কারাদণ্ড ভোগের পর মুক্তিলাভ করিয়াছেন। সর্বজন-শ্রদ্ধেয় সেবাব্রতী শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাশ-গুপ্ত এবং ডাক্তার ইন্দ্রনারায়ণ সেনগুপ্ত মহাশয়ের কথাই আমরা উল্লেখ করিতেছি। ইঁহারা দুইজনেই সংগঠন কার্যে সুদক্ষ এবং বাঙলা দেশের বহু বিপর্যয়ে এ বিষয়ে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তি। মিঃ কেসি বাঙলায় দুঃস্থ নরনারীর সেবাকার্যে এবং বিপর্যস্ত সমাজের পুনর্গঠন ব্যাপারে ইঁহাদের সংগঠন-শক্তির সহযোগিতা লাভ করিতে পারেন; কিন্তু দেশের সমস্যা খুবই ব্যাপক। এই ব্যাপক সমস্যার সমাধানের জন্য সংগঠন কার্য পরিচালনা করিতে হইলে দূরপ্রসারী নীতি অবলম্বন করিতে হইবে এবং তাহা কার্যে পরিণত করিতে বহু কর্মীর প্রয়োজন। গভর্নর দেশ-সেবক কর্মী এখনও কারাগারে আছেন, মিঃ কেসি তাঁহাদিগকে যদি মুক্তি দিতে পারেন, তবে বাঙলা দেশে কর্মীর অভাব হইবে না। নিজেদের আপদ-বিপদ অগ্রাহ্য করিয়া বাঙলার স্বদেশ-সেবক কর্মীর দল দুর্গত দেশবাসীর অশ্রু মুছাইবার জন্য আগাইয়া যাইবে, এবং একনিষ্ঠ সাধনায় সে ব্রতে আত্মনিবেদন করিবে।' এইভাবে বাঙলা দেশে নূতন জীবনের সঞ্চার হইবে। দেশ-প্রেমিক এই সব কর্মীর সহযোগিতা ব্যতীত সরকারী বাঁধা উপায়ে বাঙলা দেশের বর্তমান অবস্থার প্রতিকার সাধন করা সম্ভব হইবে বলিয়া আমরা মনে করি না।

রেশনিংয়ের ভবিষ্যৎ

৩১শে জানুয়ারী হইতে কলিকাতা শহরে রেশনিং আরম্ভ হইবে; সুতরাং শহুর-বাসীর পক্ষে রেশনিংয়ের যুগ সমাগত বলিতে হয়। রেশনিং সম্বন্ধে ভারত সরকারের বিশেষজ্ঞ মিঃ কিরবীর মুখে আমরা অনেক আশার কথা শুনিয়াছি; কিন্তু সেসব সত্ত্বেও এ বিষয়ে আমাদের এখনও অনেক আশঙ্কার কারণ রহিয়াছে। আমরা ইতঃপূর্বে সে সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিয়াছি। রেশনিংয়ের বরাদ্দে যে খাদ্যশস্য দেওয়া হইবে, তাহা কিরূপ হইবে, এই বিষয়েই জনসাধারণের মধ্যে বিশেষ উদ্বেগ দেখা যাইতেছে। চাউলই বাঙালীর প্রধান খাদ্য। বাঙলা দেশের অ-সামরিক সরবরাহ বিভাগ হইতে কণ্ট্রোলের দোকানের মারফতে মাঝে মাঝে যে চাউল সরবরাহ করা হইয়াছে, তাহা মানুষের অখাদ্য বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। রেশনিং ব্যবস্থায় তাহারই পুনরাবৃত্তি হইবে না তো? পূর্বে শুনিয়াছিলাম যে, রেশনিংয়ের জন্য নির্দিষ্ট দোকান হইতে দুই রকম চাউল সরবরাহ করা হইবে; কিন্তু পরে দেখিতেছি, সে ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয় নাই; এবং সর্বত্র এক রকম চাউলের ব্যবস্থা করা হইবে। এই বিষয়ে আমাদের প্রথম বক্তব্য এই যে, যে চাউল সরবরাহ করা হইবে, তাহা যেন মানুষের পুষ্টিকর এবং রুচিকর খাদ্য হয়। এক্ষেত্রে আরও একটি বিষয় বিশেষ লক্ষ্য করা প্রয়োজন। আমরা দেখিতেছি, বিভিন্ন সংবাদপত্রে বিষয়টির প্রতি কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে। বিষয়টি এই যে, বাঙালী হিন্দু পরিবারের বিধবাগণ সিদ্ধ চাউল ভোজন করেন না। ইঁহাদের জন্য আতপ চাউল সরবরাহের বিশেষ বন্দোবস্তের প্রয়োজন; নতুবা রেশনিংয়ের দোকানে এক-শ্রেণীর চাউল বাঁধা বরাদ্দের ক্ষেত্রে সিদ্ধ চাউল বিক্রয়ের পালা পড়িলে শহরের বাঙালী হিন্দু পরিবারের বিধবাদিগকে উপবাসী থাকিতে হইবে; কারণ আটা-ময়দা খাইতে উঁহারা অভ্যস্ত নহেন। দেব-সেবার জন্য রেশনিংয়ে কোন বরাদ্দ করা হয় নাই; রেশনিং-কণ্ট্রোলার মিঃ হার্টলী সেদিন ইহা জানাইয়া দিয়াছেন। মিঃ হার্টলী তো ব্যবস্থার কথা জানাইলেন; কিন্তু রেশনিংয়ের ক্ষেত্রে সরকারী এই ব্যবস্থায় শহরের যেসব হিন্দু পরিবারে দেব-সেবার নিয়ম আছে, তাহাদিগকে কি বিভ্রাটে পড়িতে হইবে, তিনি সম্ভবত তাহা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। দেশের সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতাই এরূপ অব্যবস্থার কারণ বলিয়া মনে হয়। রেশনিং ব্যবস্থার প্রবর্তকদের বাঙলা দেশের হিন্দু পরিবারের রীতিনীতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এই কার্যে অগ্রসর হওয়া উচিত ছিল; দেখা যাইতেছে, তাঁহারা খাস বিলাতী রীতিই এদেশেও চালাইতে উদ্যত হইয়াছেন। অতিথি-অভ্যাগতদের পক্ষে সাত দিনের জন্য হোটেলে আশ্রয় লইবার অবাবস্থিত ব্যবস্থা। হিন্দু বিধবাদের জন্য সিদ্ধ চাউল বা আটা-ময়দা এবং দেব-বিগ্রহের নিয়ম-সেবা একেবারে বন্ধ করা—তাঁহাদের অবলম্বিত ব্যবস্থার এই পরিণতি শহরে সামাজিক ক্ষেত্রে একটা মহা-বিপর্যয় সৃষ্টি করিবে বলিয়া আশঙ্কা হইতেছে। এ সম্বন্ধে অসামরিক সরবরাহ বিভাগের মন্ত্রী মিঃ সুরাবর্দী গত মঙ্গলবার সাংবাদিকদের কাছে যে বিবৃতি দিয়াছেন, তাহাতে আমরা সন্তুষ্ট হইতে পারি নাই। হিন্দু বিধবাদের জন্য আতপ চাউল সরবরাহ করা হইবে নিশ্চিতভাবে তিনি তেমন ভরসা দিতে পারেন নাই। দেব বিগ্রহের ভোগের জন্য রেশনিংয়ের ব্যবস্থা করা হইবে না, এই কথা নিশ্চিত-ভাবেই বলিয়াছেন এবং তাঁহার যুক্তির সমর্থনের জন্য বোম্বাইয়ে প্রবর্তিত ব্যবস্থার উল্লেখ করিয়াছেন; কিন্তু বোম্বাইয়ের ব্যবস্থায় যে ত্রুটি রহিয়াছে বাঙলায় তাহা সংশোধনের চেষ্টা করাই কি উচিত ছিল না? বোম্বাইয়ের ব্যবস্থায় তিন রকম চাউল সরবরাহের বন্দোবস্ত আছে, তথাকার ব্যবস্থার এই ভালটুকু বাঙলায় প্রবর্তন করা সম্ভব হয় নাই, অথচ ত্রুটিটুকু কার্যত বজায় রহিয়াছে আমরা ইহাই দেখিতেছি। কার্ড রেজেস্টারী সময়ের সম্বন্ধে আমরা তেমন আপত্তির কারণ দেখি না; কারণ নূতন কার্ড দিবার ব্যবস্থা যেখানে রহিয়াছে, সেখানে কার্ড রেজেস্টারী করিবার সময়ও দেওয়া হইতেছে, আমরা ইহা বুঝি; মিঃ সুরাবর্দী দোকানের সংখ্যা বাড়াইতে রাজী হন নাই। তিনি বলিয়াছেন, যদি আবশ্যক হয় প্রত্যেকটি সরকারী দোকানে তিন হাজারের অধিক লোকের জন্য রেশনিং সরবরাহের ব্যবস্থা করা যাইবে; কিন্তু বেসরকারী দোকানের সংখ্যা কিছুতেই বাড়ানো হইবে না। এ সম্বন্ধে তাঁহার এমন দৃঢ়তার কারণ কি আছে আমরা জানি না, তবে এ বিষয়ে আমাদের বক্তব্য এই যে, কণ্ট্রোলের দোকানে লাইন করিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়াইয়া থাকিবার দুঃসহ দুর্ভোগ আমাদের আর সহ্য করিতে না হয় কর্তৃপক্ষ কৃপা করিয়া যেন এমন ব্যবস্থা করেন। এ বিষয়ে আমরা মানুষের প্রতি যোগ্য ব্যবহার দাবী করিতেছি এবং সেই দিক হইতেই দোকানের সংখ্যা বৃদ্ধি করা দরকার ছিল বলিয়া আমরা এখনও মনে করি।

রাজনীতিক অচল অবস্থার সমাধান

২৬শে জানুয়ারী অতিবাহিত হইল। এই দিবস ভারতের ইতিহাসে বিশেষভাবে স্মরণীয়। চতুর্দশ বৎসর পূর্বে এই দিবসে পণ্ডিত জওহরলালের নেতৃত্বে লাহোর অধিবেশনে কংগ্রেস স্বাধীনতার সঙ্কল্প গ্রহণ করে। ইহার পর সুদীর্ঘ চতুর্দশ বৎসরে স্বাধীনতা সংগ্রামের ধারা ত্যাগের বিচিত্র পথে বহিয়া চলিয়াছে; কিন্তু জাতির সে সাধনায় আজও সিদ্ধি লাভ হয় নাই, তথাপি এই কালাত্যয়ে আদর্শ পরিম্লান হয় নাই। পক্ষান্তরে বহু স্বদেশ-সেবক সন্তানের নিষ্ঠা প্রভাবে আদর্শের ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে, এই কথাই বলিতে হয়। লাহোর কংগ্রেসে যে অধিকার বিঘোষিত হইয়াছিল, আজ জগতের সর্বত্র

তাহা স্বীকৃত হইয়াছে; কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, যাঁহারা আটলাণ্টিক সনদ এবং তেহরাণের সিদ্ধান্তের ভিতর দিয়া বিশ্বমানবের যে অধিকার স্বীকার করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যেই অন্যতম ব্রিটিশের শাসনাধীনে ভারতবর্ষে সে অধিকার স্বীকৃত হইতেছে না। যদি ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট এ অধিকার স্বীকার করিতেন, তবে ভারতের রাজনীতিক অচল অবস্থার সমাধান ঘটিত এবং সম্মিলিত পক্ষের সমরাদর্শে তাঁহাদের আন্তরিকতা জগৎ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইত। সম্প্রতি বিলাতের 'ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান' পত্রে ভারতের রাজনীতিক অচল অবস্থা সমাধানের প্রয়োজনীয়তার প্রতি ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। সহযোগী এই আশা প্রকাশ করেন যে, লর্ড ওয়াভেল উদ্যোগী হইলে কংগ্রেসের সঙ্গে এখনও একটা আপোষ-নিষ্পত্তি হওয়া সম্ভব। এই প্রসঙ্গে শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু সংবাদপত্রে একটি বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন। সে বিবৃতির প্রতি অনেকেরই দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবে। শ্রীযুক্তা নাইডু বলেন, আপোষের সহজ পথ আত্ম-সমর্পণের পথ নয়; সে পথ সম্মানজনক শান্তির পথ। ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট এই পথ অবলম্বন করিতে প্রস্তুত আছেন কি? ভারতবর্ষ আজ স্বাধীনতার অধিকার লাভ করিতে চায় এবং কংগ্রেসের দাবী ভারতের সকল দল ও সকল সম্প্রদায়ের দাবী। ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট যদি ভারতবর্ষের স্বাধীনতার এই দাবী সরল প্রাণে স্বীকার করিয়া লন, তবেই ভারতের বর্তমান রাজ-নীতিক অচল অবস্থার সমাধান হইতে পারে। পক্ষান্তরে যদি তাঁহারা কোন কূট উদ্দেশ্য অন্তরে রাখিয়া ইহাতে সম্মত না হন, তবে গণতান্ত্রিকতা, মানব স্বাধীনতা প্রভৃতি সম্বন্ধে বড় বড় কথা তাঁহাদের মুখে শোভা পায় না; অন্তত ভারতবাসীর কাছে তাঁহাদের এই সব কথার কোন মূল্যই থাকে না। তাঁহারা যত সত্বর এ সম্বন্ধে নিজেদের ভ্রান্তি উপলব্ধি করিতে পারেন, তাঁহাদের নিজেদের বৃহত্তর স্বার্থ ততই নিরাপদ হইবে।

লজ্জার কথা

ভারতসচিব মিঃ আমেরী সেদিন পার্লা-মেণ্টের প্রশ্নোত্তরে ভারত-শাসন সম্পর্কে বৃটিশ নীতির আর এক দফা প্রশস্তি কীর্তন করিয়াছেন। তিনি আত্মশ্লাঘায় মস্তক উন্নত করিয়া প্রসন্নবদনে সভা-ভবনে সমবেত বৃটিশ জনসাধারণের প্রতিনিধি-বর্গকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন যে, গত পাঁচ মাসে দুর্ভিক্ষ এবং তজ্জনিত ব্যাধি-পীড়ার ফলে বাঙলা দেশে অস্বাভাবিক মৃত্যুর হার দশ লক্ষ ছাড়াইয়া যায় নাই। অবশ্য এই মৃত্যু-সংখ্যা যে পাকা, ভারত-সচিব এমন কথা বলিতে পারেন নাই। তিনি বলেন, এখনও পর্যন্ত কোন নির্ভর-যোগ্য হিসাব পাওয়া সম্ভব হয় নাই। ভারত সরকার প্রাপ্ত সংবাদের উপর নির্ভর করিয়া এইরূপ অনুমান করেন মাত্র। বাঙলা দেশে দুর্ভিক্ষের ফলে এবং তজ্জনিত ব্যাধি-পীড়ায় লোকক্ষয়ের সম্বন্ধে ভারত সরকারের হিসাবের মূল্য কতখানি, আমাদের তাহা জানিতে বাকি নাই। এ সংখ্যা কম করিয়া দেখাইবার পক্ষেই এ দেশের শাসকবর্গের বরাবর ঝোঁক রহিয়াছে, আমরা ইহা লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি। ইহার কারণও আমরা বুঝি। নিজেদের সুনাম বজায় রাখিবার দায় এক্ষেত্রে তাঁহাদের বিবেচনায় বড় হইয়া উঠে। বাঙলার এত বড় একটা বিপর্যয়ে লোকক্ষয় সম্পর্কিত প্রশ্ন শাসকদের পক্ষে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ, অথচ ভারতসচিব এত-দিন পর্যন্ত সে সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য কোনও সংবাদ পান নাই। তাঁহার এই উক্তি হইতে এ সম্বন্ধে শাসকবর্গের উদাসীনতার পরিচয়ই স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। কোন স্বাধীন দেশ হইলে ভারতসচিব এমন জবাব দিয়া নিশ্চয়ই নিষ্কৃতি পাইতেন না। ভারত সচিবের এই জবাব প্রথমত গুরুত্বহীন, তারপর আমরা একথাও বলিব যে, ইহা ঠিক নয়। প্রকৃতপক্ষে গত পাঁচ মাসে বাঙলা দেশে দুর্ভিক্ষের ফলে অনেক বেশী লোকক্ষয় ঘটিয়াছে। ইহা ছাড়া ভারতসচিবের উক্তিতে আরও একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। তাঁহার জবাবের ভিতর ইহার চেয়ে বেশী লোকক্ষয় ঘটে নাই, ভাষাকে এইরূপ ভঙ্গি দিয়া তিনি নিজেদের শাসনের একটা কৃতিত্ব জাহির করিতে চেষ্টা করিয়াছেন দেখা যাইতেছে; প্রকৃতপক্ষে এজন্য তাঁহার লজ্জিত হওয়াই উচিত ছিল। যদি ধরিয়াও লওয়া যায় যে, তাঁহার হিসাব ঠিক, তাহাতেও তাঁহাদের শাসন-নীতির মহিমা ঘোষিত হয় না। এই বিংশ শতাব্দীর উন্নত বৈজ্ঞানিক যুগে সভ্যতাভিমানী বৃটিশ জাতির শাসনাধীন একটি প্রদেশে অনাহার এবং অনাহার-জনিত ব্যাধি-পীড়ায় দশ লক্ষ নরনারী পোকা-মাকড়ের মত মরিল, ইহা শাসকদের পক্ষে নিশ্চয়ই বড় গৌরবের কথা নয়। জগতের অন্য কোন দেশে এমনটা ঘটিয়াছে বা ঘটিতে পারে কি? ভারতবর্ষ পরাধীন, তাই এদেশে ইহা সম্ভব; তাই বাঙলা দেশে প্রচুর খাদ্যশস্য জন্মিলেও আজও বাজারে অনশনের ভাব থাকে; নূতন ফসলের আমদানীর মুখেই দর চড়িতে শুরু করে, সরকারের হাতে প্রচুর কুইনাইন থাকিলেও চোরাবাজারে বহু মূল্য দিয়া কুইনাইন সংগ্রহ করিতে হয়। শাসনের নীতির ব্যর্থতার পক্ষে এইগুলি যথেষ্ট প্রমাণ।

ভারতের আর্থিক উন্নতি

ভারতের কতিপয় বিশিষ্ট শিল্পনায়ক ও অর্থনীতিবিদ মিলিত হইয়া ভারতের আর্থিক উন্নতির একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে স্যার পুরুষোত্তম দাস ঠাকুরদাস, শ্রীযুত ঘনশ্যাম-দাস বিড়লা, শ্রীযুত কস্তুরভাই লালভাই, মিঃ জে আর ডি টাটা, স্যার শ্রীরাম আছেন। পরিকল্পনাটি অত্যন্ত ব্যাপক। ইহাতে দশ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে ভারতের আর্থিক উন্নতি একটি কর্মপ্রণালী উপস্থিত করা হইয়াছে। আমরা জানি, এমন পরিকল্পনার প্রয়োজন আছে। এই ধরণের পরিকল্পনা সাহায্যে জগতের অন্যান্য অ-প্রত্যাশিত গতিতে উন্নতি সাধিত হইয়াছে ইহাও অনেকেই অবগত আছেন; দৃষ্টান্তস্বরূপে রুশিয়ার কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে; কিন্তু অন্য দেশ ও ভারতবর্ষে তফাৎ অনেক; অন্যান্য দেশ স্বাধীন এবং ভারতবর্ষ পরাধীন। এ সম্বন্ধে পরিকল্পনা এই যে প্রথম তাহা নহে, কংগ্রেসও এক সময়ে এইরূপ পরিকল্পনায় ব্রতী হইয়া-ছিলেন। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর নেতৃত্বে জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি গঠিত হইয়া-ছিল; কিন্তু সে পরিকল্পনা কার্যে পরিণত হয় নাই; কারণ একমাত্র জাতীয় গভর্ন-মেণ্টের পক্ষেই এক্ষেত্রে সর্বাঙ্গীন এবং সত্যকার আন্তরিকতাপূর্ণ উদ্যমে প্রবৃত্ত হওয়া সম্ভব। বিদেশীর স্বার্থের প্রতি সরকারের দৃষ্টি থাকিতে এ কাজ হয় না। ভারতে যতদিন পর্যন্ত দেশের স্বার্থবোধে জাগ্রত স্বাধীন এবং জাতীয় গভর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত না হইবে, ততদিন পর্যন্ত এই পরিকল্পনা কতটা কার্যে পরিণত হইবে, এ বিষয়ে আমাদের সম্পূর্ণই সন্দেহ আছে।

বিদুষী ভার্য্যা

— শ্রীউপেন্দ্র নাথ গঙ্গোপাধ্যায় —

যূথিকা বলিল, "সত্যাগ্রহের মতো কোনো কিছুর দ্বারা তোমাকে বাধ্য করতে আমি চেষ্টা করছি, এ যদি তোমার মনে হয়ে থাকে, তা হ'লে তুমি আমাকে ক্ষমা কোরো। কিন্তু বিশ্বাস কর, সে রকম কোনো অভিসন্ধি আমার নেই। তুমি নিজের পছন্দ আর ইচ্ছা অনুযায়ী যে ব্যবস্থা করবে তাতেই আমি রাজি আছি। কিন্তু কিছু যদি মনে না কর, একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করি।"

"কি কথা?"

"রাজসাহী যেতে তোমার আপত্তি কিসের জন্যে?"

মৃদু হাসিয়া দিবাকর বলিল, "আপত্তি আমার চেয়ে তোমারই ত বেশী হওয়া উচিত যূথিকা। অযোগ্য স্বামীকে নিজের পাশে বেঁধে নিয়ে সভা-সমিতিতে গেলে তোমার তাতে কোনো গৌরব নেই।"

যূথিকা বলিল, "আমার গৌরবের কথা ছেড়ে দাও, তোমার তাতে অগৌরব আছে বলে মনে কর কি?

মৃদু হাসিয়া দিবাকর বলিল, "শিবনাথবাবুর চিঠি দুটোর কথা তোমাকে মনে করিয়ে দিয়ে যদি বলি—করি, তা হ'লে তোমার কি বলবার আছে বল?"

শান্ত কণ্ঠে যূথিকা বলিল, "তাহ'লে শুধু এই কথা বলব যে, সভাই বল, আর সমিতিই বল, এই রাজসাহীর সভাই আমার শেষ সভা। জীবনে আর কোনো সভায় আমি হাজির হব না। কিন্তু এ সভায় আমাকে হাজির করাবে ব'লে তুমি যখন প্রতিশ্রুত আছ, তখন এ সভায় আমি হাজির হব।"

ক্ষুব্ধ কণ্ঠে দিবাকর বলিল, "কিন্তু আমার জন্যে তুমি নিজেকে এমন ক'রে বঞ্চিত করবে কেন যূথিকা? যে যোগ্যতা তুমি অর্জন করেছ তার মতো তুমি নিজের জীবনকে চালিত করবে, আশা করি এ বিষয়ে কোনো দিন আমার আপত্তি হবে না।"

দিবাকরের কথা শুনিয়া যূথিকার মুখে একটা ক্ষীণ হাস্য ফুটিয়া উঠিল; মৃদু কণ্ঠে সে বলিল, "শোন,—আমি শুধু এম এ পাশই করিনি, তোমার ভগ্নীপতি হেমেনদাদার মতো মানুষের হাতে মানুষ হয়েছি। জীবনকে চালিত করবার জন্যে কত জিনিস থেকে নিজেকে বঞ্চিত করতেও হয়, এ শিক্ষাও আমি তাঁর কাছে কিছু কিছু পেয়েছি। যে মাটিতে আমার ভাগ্য আমাকে এনে বসিয়েছে, তার রসে, তার আলোয়, তার হাওয়ায় জীবনকে যদি গ'ড়ে তুলতে না পারি, তাহলেই আমার জীবন ব্যর্থ হবে। কিন্তু এসব কথা এখন থাক, তুমি ভদ্রলোকটির সঙ্গে দেখা করে, যেমন তোমার ভাল মনে হয়, সেই রকম ব্যবস্থা কর।"

উপস্থিত কথাটা সম্পূর্ণভাবে নিষ্পন্ন না হইলেও রাত্রে শয়নের পূর্বে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কোনো এক দুর্বল মুহূর্তে এবারকার মতো একটা মিটমাট হইয়া গেল এবং তদনুযায়ী দিবাকর এবং যূথিকার নিকট হইতে পত্র লইয়া রাজসাহীর ভদ্রলোক পরদিন রাজসাহী ফিরিয়া গেল।

বৃষ্টির অবসান হইলেও অনেক সময় যেমন মেঘে মেঘে আকাশ উদাস হইয়া থাকে, তেমনি দিবাকর এবং যূথিকার মধ্যে একটা ম্লান অপ্রদীপ্ত ভঙ্গিমা সমস্ত দিন ধরিয়া বর্তমান রহিল।

সন্ধ্যার কিছু পূর্বে দিবাকরের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া নত হইয়া তাহার পদধূলি গ্রহণ করিয়া যূথিকা উঠিয়া দাঁড়াইল।

যূথিকার বাম স্কন্ধে দক্ষিণ হস্ত স্থাপিত করিয়া সবিস্ময়ে দিবাকর বলিল, "হঠাৎ?"

যূথিকা বলিল, "আজ থেকে নতুন বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ করব, তুমি আশীর্বাদ কর, এ বিদ্যা যেন আমার পক্ষে শুভ হয়।"

একটা উত্তর দিবাকরের মুখ পর্যন্ত আসিয়া আটকাইয়া গেল; বলিল, "আমার আশীর্বাদের যদি কোন মহিমা থাকে, তাহলে শুভ হবে।"

সেইদিন আরতির পর বাণীকণ্ঠ তর্কতীর্থের সম্মুখে বস্ত্র, অর্থ এবং অপরাপর সামগ্রীর দ্বারা পূর্ণ অর্ঘ্যের ডালি স্থাপন করিয়া গললগ্নীকৃতবাস হইয়া প্রণাম করিয়া যূথিকা যখন তাহার ব্যাকরণের প্রথম পাঠ লইতে বসিল, তখন ক্ষীরোদবাসিনীর গৃহে শিবানী তাহার ফার্স্ট-বুক অফ রীডিং খুলিয়া পড়িতেছিল—ক্লে ইজ সফ্‌ট অ্যান্ড কোল্ড্—কাদা হয় নরম এবং শীতল।

পড়িতে পড়িতে সহসা এক সময়ে দিবাকরের দিকে চাহিয়া শিবানী জিজ্ঞাসা করিল, "কাদা 'হয়' বলে কেন দাদা? আমরা ত বাঙলাতে কাদা হয় শীতল বলিনে?"

দিবাকর বলিল, "প্রত্যেক ভাষারই নিজের নিজের বিশেষ ভঙ্গি আছে। ওটা ইংরিজি ভাষার ভঙ্গি।" ক্রমশ

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

আশ্রয়, সান্নিধ্য ও সাহচর্যে মহাত্মার মহাগুণের সহিত বিশেষ পরিচয় হয়; এই পরিচয় মহাত্মাকে পরিচিতের নিকটে মানবরূপী দেবতা করিয়া তুলে, দেবতার ন্যায় মনোমন্দিরে পূজিত করিয়া রাখে। দ্বিজেন্দ্রনাথের আশ্রয়, সান্নিধ্য বা সাহচর্য আমার ভাগ্যে তাদৃশ পরিচয়ের কারণ হয় নাই সত্য, কিন্তু সময়ে সময়ে যখন ক্ষণিক সান্নিধ্য বা সাহচর্য ঘটিয়াছিল, তখনই তাঁহার কথায়, আচরণে, উপদেশে তাঁহার অনন্যসাধারণ যে সকল গুণের সহিত আমার কিছু কিছু পরিচয় হইয়াছিল, তাঁহার সেই সকল গুণগরিমার কথা, সমালোচকগণের সমালোচনা এবং আমার অতিবিশ্বস্তের নিকট হইতে সংগৃহীত তাঁহার চরিত-কথা এই প্রবন্ধের বিষয়।

বহু বৎসর পূর্বে আমার ছাত্রাবস্থায় জোড়াসাঁকোর বাটীতে মাঘোৎসবে আচার্যের পদে অধিষ্ঠিত দ্বিজেন্দ্রনাথকে আচার্যের কার্য করিতে দেখিয়াছিলাম। সেই আমার প্রথম দেখা। মনে হয়, তখন তাঁহার যৌবনের শেষ, প্রৌঢ়ত্বের প্রারম্ভ। ইহার পরে যে সময়ে শান্তিনিকেতনের মন্দিরের উৎসর্গ-উৎসবের অনুষ্ঠান হয়, তখন আশ্রমে তাঁহাকে দ্বিতীয় বার দেখি। শান্তিনিকেতনে আসার মাঠের পথে তাঁহার বৈবাহিক ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়ের সহিত বিষয়-বিশেষের কথোপকথন করিতে করিতে তিনি আমার আগে আগে আসিয়াছিলেন, আমার বেশ মনে আছে। পরে ১৩০৯ সালে যখন ব্রহ্মচর্যাশ্রমে অধ্যাপনার কার্য গ্রহণ করিয়া আসিয়াছিলাম, তখন তাঁহাকে দেখি নাই, কিছু কাল পরে তাঁহাকে দেখিয়াছিলাম; মনে হয়, সে ১৩১০ সাল। নীচু বাঙলায় যে আশ্রম-কুটীর আছে, তাহাই তাঁহার নির্দিষ্ট বাসভবন ছিল, তিনি যাবজ্জীবন এই আশ্রমের ঋষি ছিলেন।

দার্শনিক বলিয়াই দ্বিজেন্দ্রনাথের সমধিক প্রসিদ্ধি। মাসিকপত্র বঙ্গদর্শনে (নবপর্যায়) তাঁহার দার্শনিক প্রবন্ধ "সার সত্যের আলোচনা" ক্রমশ প্রকাশিত হইয়াছিল (১)। তাঁহার লিখিত "গীতা-পাঠ"-ও দার্শনিক প্রবন্ধমালা।

১২৯২ সালে "ভারতী"তে দার্শনিক পণ্ডিত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। প্রবন্ধটির নাম "Positivism কাহাকে বলে?" দ্বিজেন্দ্র-নাথ "পজিটিবিজম্ এবং আধ্যাত্মিক ধর্ম" নামে তিনটি প্রবন্ধে ইহার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। কৃষ্ণকমল দর্শনশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ও সুতার্কিক ছিলেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ, রাজনারায়ণ বসুকে লিখিত একখানি পত্রে নিজেই লিখিয়াছেন,—"কৃষ্ণকমল is not যে-সে লোক,—

He is a terrible fellow. He knows how to write and how to fight and how to slight all things divine.

দর্শনশাস্ত্রে দ্বিজেন্দ্রনাথের বিশেষ খ্যাতি ছিল সত্য, কিন্তু তাঁহার যে কাব্য-রচনার শক্তি ছিল, তাহা কোন কারণে তাদৃশী খ্যাতিলাভ করিতে না পারিলেও কাব্যরসিক নিপুণ সমালোচকের সমালোচনায় সেই কবিশক্তির বিশেষ প্রশংসা আছে এবং ইহাই তাঁহাকে কবিসমাজে উচ্চ স্থান পাইবার সম্পূর্ণ অধিকার দিয়াছে, মনে হয়। তাঁহার "স্বপ্নপ্রয়াণ" দার্শনিকরূপক কাব্য; ইহার দার্শনিক ভাগের ত কথাই নাই. নিপুণ সমালোচক কাব্যরসিকগণ কাব্যাংশেও বিচারপূর্বক ইহাকে কাব্যমধ্যে বিশিষ্ট স্থানই দিয়াছেন।

মহাকাব্য ও খণ্ডকাব্যের কবি মাইকেল মধুসূদন তাঁহার সমসাময়িক কোন উদীয়মান কবিকে কবির গৌরবের আসন দেন নাই, কিন্তু তিনি দ্বিজেন্দ্রনাথের কবিতায় কবিশক্তির প্রশংসা করিয়া কোন প্রিয়তম সুহৃদ্‌কে বলিয়াছিলেন,—

If I am to doff my cap to any modern Bengali poet, it must be to the author of the "Swapna Prayan" and to no body else.

(৩) মধুসূদনের এই স্বল্প মন্তব্য দ্বিজেন্দ্রনাথকে তাৎকালিক বঙ্গীয় কবি-কুলের শিরোমণি করিয়া রাখিয়াছিল।

সুনিপুণ সূক্ষ্মদর্শী সমালোচক বঙ্কিমচন্দ্র তদীয় বিখ্যাত মাসিকপত্র "বঙ্গদর্শনে" "স্বপ্নপ্রয়াণে"র প্রথম সর্গ সম্পূর্ণ, কবির নামোল্লেখ না করিয়া, প্রকাশিত করিয়াছিলেন (৪)। বঙ্কিমচন্দ্র এই কাব্যের সমালোচনা করেন নাই সত্য, কিন্তু ইহার কাব্যত্ব তাঁহার হৃদয়গ্রাহী না হইলে, তাঁহার বিশিষ্ট পত্রিকায় কখনই ইহার স্থান হইত না।

স্বর্গগত সতীশচন্দ্র রায় তাঁহার "রচনাবলী"তে স্বপ্নপ্রয়াণের সমালোচনায় লিখিয়াছেন,—"বাঙলা সাহিত্যের প্রবাহে, কিছু পশ্চাতে, একখানি কবিতার দ্বীপ নিজের সূর্যাস্ত বর্ণবিলাসে, অন্ধকারে, শৈলপ্রাকারে, নিজের অধ্যাত্ম আনন্দের স্বপ্নে অভিনিবিষ্ট হইয়া বসিয়া আছে—এখনো সেখান হইতে আমাদের জীবনের সঙ্গে বৃহৎ সেতু পড়িয়া যায় নাই। বাস্তবিক সেকালের অন্যান্য কবিতার পার্শ্বে 'স্বপ্নপ্রয়াণ' কাব্যখানিকে ধরিয়া দেখিলে অনেক কথা মনে হয়।" ইত্যাদি।

"চিত্র ও তাহার সঙ্গে ভাষার মনো-হারিত্বই স্বপ্নপ্রয়াণে প্রথমেই চোখে পড়ে। ...যেখানে-বা চিত্র নাই, সেখানেও ভাষার একটি অবলীলাকৃত সজীব ভঙ্গীতে পাঠকের মন উদ্যত হইয়া থাকে।" ইত্যাদি। (৫)

সাহিত্যিক পণ্ডিত সমালোচক স্বর্গ-গত প্রিয়নাথ সেনের "প্রিয়পুষ্পা-ঞ্জলি"তে প্রকাশিত স্বপ্নপ্রয়াণের প্রথম সর্গের বস্তুনির্দেশপূর্বক পাণ্ডিত্যপূর্ণ সমালোচনায় এই কাব্য উত্তম কাব্যাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছে (৬)। বিশেষ দুঃখের বিষয়, সমালোচক পরবর্তী সর্গসমূহের বিষয়-বিবৃতি-সহিত তাঁহার অভিমত কাব্যগুণের সম্পূর্ণ সমালোচনা করিয়া যাইতে পারেন নাই।

"প্রিয়-পুষ্পাঞ্জলি"তে এই কাব্যের ছন্দের সমালোচনায় সমালোচক লিখিয়া-ছেন,—"ইহার ছন্দ কবির (নিজের) মৌলিক সৃষ্টি। ...স্বপ্নপ্রয়াণের ছন্দ পূর্বেকার কোন কবি গড়ে নাই এবং

পরবর্তী কোন কবিই এই ছন্দে লিখিতে বা ইহার অনুকরণ করিতে সাহস করেন নাই। এমন কি...রবীন্দ্রনাথও করেন নাই।" (৬)

স্বপ্নপ্রয়াণ ভিন্ন পৌত্র দিনেন্দ্রনাথের সম্পাদিত দ্বিজেন্দ্রনাথের কবিতাসমূহের সঞ্চয়গ্রন্থ "কাব্যমালা"র কবিতা—'কৌতুক না যৌতুক', 'গুম্ফ-আক্রমণ কাব্য', 'মেঘদূত', 'সেরামালি' ইত্যাদিও কাব্যাংশে উৎকৃষ্ট ও কাব্য-মধ্যে গণনীয় হওয়ার অধিকারী মনে হয় (৭)।

"গুম্ফ-আক্রমণ কাব্য" রাজনারায়ণ বসুকে লক্ষ্য করিয়া রচিত হইয়াছিল। ইহার সমাপ্তি-শ্লোকে কবি ফলশ্রুতিতে লিখিয়াছেন,—

"পড়ে যেই লোক এই শ্লোক,
পায় সে গুম্ফলোক, ইহার পরে।
যথা গুম্ফধারী ভারী ভারী,
গোঁফের সেবা করি, সুখে বিচরে॥"

"মেঘদূত" কালিদাসের খণ্ডকাব্য "মেঘদূতে"র বঙ্গভাষায় পদ্যানুবাদ। বাল্যে পাঠ্যপুস্তকে এই অনুবাদের কিয়দংশ ত্রিপদী ছন্দে রচিত "প্রবাসী যক্ষের গৃহস্থলী-বর্ণন" কবিতা পড়িয়াছিলাম। তখন জানিতাম না যে, ইহা দ্বিজেন্দ্রনাথের নিপুণ লেখনীপ্রসূত। অনুবাদে মূলের কাব্যসৌন্দর্য সম্যগরক্ষিত না হইলেও, ইহাতে অঙ্কিত চিত্র বেশ চিত্তরঞ্জক, ভাষা সরল সহজ ললিত গতিভঙ্গীতে মনোহারিণী, পড়িতে পড়িতেই কণ্ঠস্থ হইয়া যায়; আবৃত্তিও সুখোচ্চারণ হেতু শ্রুতিসুখকর। রবীন্দ্রনাথ একদিন বলিয়াছিলেন—'মেঘদূতে'র যতগুলি বঙ্গানুবাদ দেখেছি, তাদের মধ্যে বড়দাদার অনুবাদই উৎকৃষ্ট।' পাঠকগণের কৌতূহল-নিবৃত্তির নিমিত্ত দ্বিজেন্দ্রনাথের অনূদিত "মেঘদূতে"র কতিপয় পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত হইল; আশা করি, ইহাতে কবির মন্তব্যের সার্থকতা সপ্রমাণ হইবে।

মেঘদূত—পূর্বমেঘ

"কুবেরের অনুচর কোন যক্ষবর,
কান্তা সনে ছিল সুখে [illegible] কর্ম-কাজ।
ক্রোধভরে ধনপতি দিল তারে শাপ—
'বর্ষেক ভুঞ্জিবে তুমি প্রবাসের তাপ।'
প্রবাসে যাইতে হবে নাহি তায় খেদ,
ভাবে কিন্তু দায় বড় প্রিয়ার বিচ্ছেদ।
সে মহিমা নাহি আর নাহি সে আকৃতি,
রামাচলে গিয়া যক্ষ করে অবস্থিতি।

রবিতাপ ঢাকা পড়ে বিপিন-বিতানে,
পবিত্র যতেক জল জানকীর স্নানে।

উত্তরমেঘ

কুবের আলয় ছাড়ি উত্তরে আমার বাড়ি,
গিয়া তুমি দেখিবে তথায়—
সম্মুখে বাহির দ্বার, শোভা কেবা দেখে তার,
ইন্দ্রধনু যেন শোভা পায়।
পার্শ্বে এক সরোবর, দেখা যায় মনোহর,
পদ্ম সনে অলি করে ঠাট।
তাহার একটি ধারে, অপরূপ দেখিবারে,
মরকতে মণিময় ঘাট॥
সরসীর স্বচ্ছ জলে, ভাসি ভাসি দলে দলে,
হংস-হংসী ভ্রমে অবিশ্রামে।
যাইতে মানস-সরে, কারো না মানস সরে,
আছে তারা এমনি আরামে॥
* * *
তাহার (অশোক-বকুলের) মাঝেতে আর,
ময়ূরের বসিবার,
সোনার একটি আছে দাঁড়।
শিখী যথা কেকাভাষী, সন্ধ্যাকালে বসে আসি,
আনন্দেতে উঁচা করি ঘাড়॥
তাহারে নাচায় প্রিয়া, করতালি দিয়া দিয়া,
রণ রণ বাজে তায় বালা।
স্মরিতে সে সব কথা, মরমে জনমে ব্যথা,
জ্বলি উঠে হৃদয়ের জ্বালা॥

"সেরামালি"র সেরা আবৃত্তি কবির মুখেই শুনিয়াছি। আবৃত্তিকালে হাস্যরসের বর্ণনায় কবির অট্টহাস্যের স্মৃতি এখনও জাগরূক রহিয়াছে। "সেরামালির" কতিপয় হাস্যরসাত্মক শ্লোক পাঠককে হাসাইবার নিমিত্ত উদ্ধৃত করিলাম।—

আপদঃ শান্তিঃ

"দৌড়িয়া আসিছে কবি ছাতাটি বগলে।
সহাস্য-বদনে সখা দুয়ার আগলে॥
বলে কবি "বন্ধুর এমনি বটে কাজ।"
হাসে আর কাষ্ঠ হাসি কষ্টে ঢাকি লাজ॥
চৌকাট ডিঙাবে যেই খাইল হোঁচোট্।
"আরে! আরে!" বলে সখা "লাগেনি তো চোট্?"
পিছলিয়া পড়িতে পড়িতে কবি বাঁচে।
হাসিতে নারিয়া সখা "হেচ্চো!" করি হাঁচে॥
বলে আর "কবিত্বের রাম-নাম কীট
জলে ভিজি এইবারে হইয়াছে ঢীট!
মূর্তি যে হয়েছে তব—কেমনে বাখানি।
বাসি হইলেই ফলে কাঙালের বাণী॥"
* * * *
"অই আসিতেছে মালী! "পুটুলিতে কি ও!
তপ্ত মুড়ি এনেচ যে! শতবর্ষ জিও!"
উপস্থিত করে মালী চারি ধামা মুড়ি।
লঙ্কা আর পাড়ি আনে গামছা দিয়া মুড়ি॥
ঝাঁঝালো সর্ষপ তৈলে পুরি আনে ভাণ্ড।
কবি বলে "সর্বনাশ! করিছ কি কাণ্ড!
হাতির খোরাক এ যে! হরে হরে হরে!
এ দু'ধামা রাখ তুমি আপনার তরে॥"
এত বলি মুঠা মুঠা মুড়ি করে পার।
চারি ধামা হ'য়ে গেল নিমিষে উজাড়॥"

দিনেন্দ্রনাথের সম্পাদিত "প্রবন্ধমালায়" তাঁহার পিতামহের গদ্য প্রবন্ধসমূহ সংগৃহীত হইয়াছে (৮)। এই প্রবন্ধসমূহের পাঠে দ্বিজেন্দ্রনাথের গদ্যরচনার বিশেষ শক্তির এবং লিখিত বিষয়ের বিচারপূর্বক সিদ্ধান্তকরণে বিচারশক্তির বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়।

দ্বিজেন্দ্রনাথের বাঙলায় "রেখাক্ষর-বর্ণমালা" বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয়। ইহার পাণ্ডুলিপি নিখুঁত করিবার জন্য তিনি ধৈর্যের সহিত অত্যন্ত পরিশ্রম করিয়াছিলেন,—অনেকবার কাটিয়া-ছাটিয়া নূতন করিয়া লিখিয়াছেন। "শান্তিনিকেতন" পত্রিকার তিন সংখ্যায় ইহার কিছু কিছু খণ্ডিত অংশ প্রকাশিত হইয়াছিল। (৯)

রেখাক্ষরে লেখায় অল্পাক্ষরের সুবিধার জন্য বাঙলা বর্ণমালার কোন কোন বর্ণ ইহাতে পরিত্যক্ত হইয়াছে। রেখাক্ষরের বর্ণনা ও অনুশীলনী—সবই কবিতায় রচিত হইয়াছিল; কবি দ্বিজেন্দ্রনাথ নিজেই ইহার কিছু কিছু পড়িয়া অধ্যাপকগণকে শুনাইয়াছিলেন। নিম্নে দ্বিজেন্দ্রনাথের লিখিত পাণ্ডুলিপি হইতে কয়েকটি কবিতা উদ্ধৃত করিলাম।

বত্রিশ সিংহাসন

"ব্যঞ্জনবরণ নহে চৌত্রিশের কম।
কারে রাখি, কারে ঠেলি, সমস্যা বিষম॥
"এক ব-এ বস্ আছে!" হাকে রেখাচার্য্য।
"চালাবে দন্ত্য ন অ্যাকা দুই ন-এর কার্য্য॥"
অন্ত্য ব-গুণ করি গোপনে মন্ত্রণা,
ত্যজিল বরণমালা—ঘুচিল যন্ত্রণা।
এ দুটা আছিল মোর দু-চক্ষের বিষ!
চৌত্রিশের দুই গেল রহিল বত্রিশ॥
বর্ণে বর্ণে বসি গেল বর্ণ আট আট
চারি আটে হ'য়ে গেল বত্রিশ ভরাট॥

পরিশিষ্ট

ঝন্‌ঝনায়মান যুক্তাক্ষরের পদাবলি

"আনন্দের বৃন্দাবন আজি অন্ধকার।
গুঞ্জরে না ভৃঙ্গকুল কুঞ্জবনে আর॥
কদম্বের তলে যায় বংশী গড়াগড়ি।
উপুড় হইয়া ডিঙ্গা পঙ্কে আছে পড়ি॥
কালিন্দীর কূলে বসি কাঁদে গোপনারী—
তরঙ্গিনী তরাইবে কে আছে কাণ্ডারী॥
আর কিসে মনচোর দ্যাখা দিবে চক্ষে!
সিন্ধিকাঠি থুয়ে গেছে বিন্ধাইয়া বক্ষে॥

ফর্ফরায়মান পদাবলী।

"বঙ্গের রঙ্গের কথা কত আর কব?
নিত্য হয় অভিনয় দৃশ্য নব নব॥
এলেন বিলাতফের্তা গাএ কোর্তাকুর্তি।
অর্ধ গোরা, অর্ধ কালা, বর্ণচোরা মূর্তি॥"
ইত্যাদি।

নাচুনে ছন্দের গোটাচাইর ছত্র।

"শিল্পিবধূ ফুল্লকুমারী আলতা পরি পায়,
কল্কাপেড়ে শাড়ী বাগিয়ে পরে গায়॥
যেই শুনিল পাল্কি এল, অম্নি তাড়াতাড়ি।
ভেল্কিবাজি দেখতে গেল বেলফুলের বাড়ী॥"

দীর্ঘনিঃশ্বাসভরা পদাবলীর হাহুতাশে

পালা সমাপ্ত

"কৃষ্ণ গেছে গোষ্ঠ ছাড়ি ব্রজের গেছে সুখ।
শুষ্ক মুখ রাধিকার দুঃখে ফাটে বুক॥

• ভ্রষ্ট হ'য়ো বক্ষে কাঁপে কৃষ্ণবেণীফণী।
• দংষ্ট্রাহত কমলিনী লুটায় অবনী॥
জষ্ট সখী কষ্টে বলে, শোআইয়া কোলে।
• নষ্ট করিও না তনু কৃষ্ণ এল বোলে॥"

ইত্যাদি।

উদ্ধৃত কবিতাগুলিতে দ্বিজেন্দ্রনাথের রসজ্ঞতার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়; ভাষা সরল সরস; ছন্দের বিষয়ানুরূপ ভঙ্গীতে ও বর্ণনীয় বিষয়ের নির্বাচনে কবিতার নামকরণগুলি সার্থক হইয়াছে।

সত্যেন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন,—"রেখাক্ষর, সেও এক অপূর্ব বস্তু, তাতে কত কবি-রস, কত রকম রেখাপাতের কৌশলের ছড়াছড়ি, না দেখলে তার মর্যাদা বোঝা যায় না।" •

কথ্য ভাষায় লেখার শক্তি দ্বিজেন্দ্রনাথের অসাধারণ ছিল। কবি বলিয়াছিলেন,—"বড়দাদা যেমন কথ্য ভাষায় সহজ সরস ক'রে প্রবন্ধ লিখতে পারেন, আমরা সেরূপ পারি না; এটা তাঁর স্বাভাবিক শক্তি।"

এ বিষয়ে সত্যেন্দ্রনাথ বলিয়াছেন;—"পদ্যই বল, গদ্যই বল, বড়দাদার লেখার একটি মাধুর্য্য, প্রসাদ গুণ, একটি বিশেষত্ব, একটি মৌলিকতা আছে, তা তাঁর নিজস্ব সম্পত্তি, অন্য কোথায়ও দেখা যায় না। দুরূহ দার্শনিক তত্ত্ব সকল অতি সহজ ভাষায় জলের ন্যায় প্রাঞ্জলভাবে লিখে যাওয়া তাঁর এক আশ্চর্য্য ক্ষমতা।"

সংস্কৃত কাব্যে আশ্রম বর্ণনায় আশ্রমস্থ পশুপক্ষী বৃক্ষলতা—ইহাদের প্রতি আশ্রমবাসীর সদয় আচরণ ও মমতার নিদর্শন এবং ইহাদের পরিপালন ও পরিবর্ধনের বিবরণ পাওয়া যায়। ঋষি দ্বিজেন্দ্রনাথের আশ্রমে পশুপক্ষী কীটের প্রতি মমত্ব-প্রদর্শন, সদয় ব্যবহার এবং খাদ্য-দানে তাহাদের পরিপালনও পরিপোষণ করিতে দেখিয়াছি। তাঁহার আশ্রমে এরূপ ভূতবলি-যজ্ঞ নিত্যই অনুষ্ঠিত হইত। প্রাতরাশের সময় হইলে, বলিভোজনে অভ্যস্ত কাক শালিক কাঠবড়ালী কুকুর নিয়মিত অতিথিরূপে আতিথ্য-গ্রহণার্থ তাঁহার নিকটে আসিয়া হাজির হইত। তাঁহার টেবিলের উপরে রেকাবিতে মাখা ছাতু থাকিত, তিনি ছাতুর বড়ি বাঁধিয়া ফেলিয়া দিতেন, পরিবেশন শেষ হইতে না হইতেই তির্যগ্জাতি অতিথিরা কাড়াকাড়ি করিয়া খাইত। ধূর্তপনায় কাকের বাহাদুরী প্রসিদ্ধ, সে খাদ্যের বাড়া ভাগই লইত, দ্বিজেন্দ্রনাথ এই হেতু বড়িগুলি কখন কখন তাঁহার আসনের নিকটে ফেলিয়া দিতেন। সময়ে সময়ে কাঠবিড়ালী তাঁহার হাত হইতে নিরাতঙ্কে ছাতু লইয়া খাইত, তিনি স্তম্ভবৎ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া থাকিতেন।

একটি অজাতপক্ষ শালিক শাবককে দ্বিজেন্দ্রনাথ পালন করিয়াছিলেন। সে নির্ভয়ে তাঁহার কাছে আসিত, গায় মাথায় উড়িয়া বসিত; তাহার এইরূপ যথেচ্ছ অত্যাচারে তিনি বিরক্ত হইতেন না। একদিন এই দুলাল শালিক মাথায় বসিয়া জাতিস্বভাবে তাঁহার চোখে ঠোকর দিয়াছিল; ঠোকরটা একটু কঠোর হইয়াছিল, চোখটি অনেক দিন লাল ছিল, তজ্জন্য তিনি কিছু যন্ত্রণাও ভোগ করিয়াছিলেন, ইহাতে কিন্তু সেই দুলালের দুলালত্বের কোন ক্ষতি হয় নাই। তাঁহার রচিত "বিজন কুটীরে মায়ার ফাঁদ" (১০) কবিতায় এ বিষয়ে সরল ভাষায় সরস বর্ণনা আছে, তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম। তির্যগ্-জাতির প্রতি তাঁহার মনোবৃত্তির ইহা প্রকৃষ্ট পরিচায়ক।

"সাধের মশা, সাধের মাছি, সাধের পিঁপড়ে,
পোকা মাকোড়।
বোস্‌রে গায়ে, বোসয়ে পায়ে, কোরবো না আমি
ধর পাকড়॥
আয় আয় কাক, ছাড়ি কাকা ডাক, তোরে বড়
বেশী ডাকতে হয় না।
তুইরে শালিক, বড় বে-রসিক, খাবার দেখলে
সবুর সয় না॥
কাঠ-বেরালী, কোথা পালালি, আয় আয় আয়
দৌড়ে আয়।
বড় তুই বোকা! ছাতু খাবি তো খা! কথা
বুঝিস নে—এ বড় দায়॥
সাবাস্ শুর, তুই কুকুর! ভয়ে এগোয় না
চোর ডাকাত।"

* * *

শত্রু মিত্র চপল ধীর।
বাছারা সবাই হ'ল হাজির॥

* * *

কাঠ-বেরালী পালে পালে।
ভোজে বসি গেল ছাতুর থালে॥

সত্যেন্দ্রনাথ এ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"বনের জন্তু পাখী বশ করিবার বড়দাদার আশ্চর্য ক্ষমতা...। তিনি সকালে তাঁর এজলাসে বসে আছেন আর কত চড়াই শালিক ও অন্য পাখী তাঁর কাছে এসে তাঁর হাত থেকে খাচ্ছে—'চড়াই পাখী চাউলখাকী আয়না-ঠোকরাবী!' এই আদরে ভাষায় চড়াইকে ডাকছেন। কত কাঠবেড়ালী তাঁর গায়ের উপর দিয়ে নির্ভয়ে চলে যাচ্ছে। ইন্দুরও খাবার ভাগ পায়। কাকের ত কথাই নেই, ওরা 'নাই' পেলে ত মাথায় চড়বেই......।"

রবীন্দ্রনাথের ন্যায় দ্বিজেন্দ্রনাথের জীবিতকালও বিদ্যালোচনায়ই অতিবাহিত হইয়াছে। অধিক রাত্রি পর্যন্তও তাঁহার প্রবন্ধাদি লেখাপড়া চলিত—ক্লান্তি হেতু অধীর হইতেন না। প্রবন্ধাদির নিমিত্ত কোন পরিচিত সম্পাদকের তাগিদ আসিলে তিনি লেখায় তন্ময় হইয়া আহার-নিদ্রা ভুলিয়া যাইতেন। একবার প্রবাসীর সম্পাদক মহাশয় প্রবন্ধের জন্য তাঁহাকে তাগিদ দিয়াছিলেন; দ্বিজেন্দ্রনাথ সমস্ত রাত্রি জাগিয়া প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, রাত্রি কত হইল তাঁহার সে জ্ঞান ছিল না। শেষ-রাত্রিতে ৪টার সময়ে ভৃত্য মুনীশ্বর উঠিয়া দেখিল, তিনি একাগ্রচিত্তে লিখিতেছেন। বিস্মিত হইয়া প্রভুর নিকটে গিয়া ভৃত্য জানাইল,—"রাত্তির শেষ হয়েছে, বাবা মশায় আপনি ঘুমান নি, এখনও লিখছেন!" প্রভু ভৃত্যের কথায় বিশ্বাস করিলেন না, একটু বিরক্তই হইলেন, সিদ্ধান্ত করিলেন, ও ঠিক জানে না, অনুমান করেই বলেছে। সুতরাং লেখা পূর্ববৎ নিরুদ্বেগেই চলিল। কিছু পরে প্রত্যূষে যখন কাক-কোকিল রাত্রির অবসান জানাইয়া দিল, নিজ সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত ভাবিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন,—"তাই ত মুনীশ্বর, তুমি ঠিকই ত বলেছ! রাত পোহাল!"

কবিতা বা প্রবন্ধের শব্দবিন্যাস বা বাক্যরচনা মনঃপূত না হইলে, তিনি কাটিতে-ছাঁটিতে একটুও আলস্য বোধ করিতেন না। প্রেসের গর্ভস্থিত লেখারও পরিবর্তন পরিবর্ধন তাঁহার মাথায় ঘুরিত। প্রত্যেকবার প্রুফ কিছু-না-কিছু পরিবর্তন করিতেনই। কবিরও নিজ প্রবন্ধের এরূপ কাট-ছাটের কথা প্রবাসীর কোন কর্মচারীকে লিখিত পত্রে দেখিয়াছি।

"বহু-বিবাহ" নাটকের রচয়িতা পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্ন দ্বিজেন্দ্রনাথের সংস্কৃত শিক্ষার অধ্যাপক ছিলেন। নিপুণ অধ্যাপকের শিক্ষাগুণে

মেধাবী শিষ্য শীঘ্রই সংস্কৃতে ব্যুৎপত্তি-লাভ করিয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি কলিকাতা নগরীর বর্ণনা করিয়া যে অনুষ্টুপছন্দে শ্লোকগুলি রচনা করিয়াছিলেন, তাহার দুইটি উদ্ধৃত করিলাম ঃ—

"ইংরোজরাজ-রাজ্যং যৎ ত্রিলোকীতলবিশ্রুতম্।
রাজধানীং সুবিস্তীর্ণাং কলিকাতাং বিভর্তি তৎ॥
পয়ঃপূরপ্রবাহিণ্যা গঙ্গয়া পুণ্যসংজ্ঞয়া।
কলিকাতা পুরী ভাতি নিত্যং মেখলিপ্রববীব সা॥"

সংস্কৃতচ্ছন্দে কতকগুলি বাঙলা-কবিতা দ্বিজেন্দ্রনাথ রচনা করিয়াছিলেন। তাহাদের মধ্যে মন্দাক্রান্তা ও শিখরিণী ছন্দে রচিত দুইটি কবিতা পাঠককে উপহার দিলাম ঃ—

টঙ্কাদেবী

"ইচ্ছা সম্যগ্ জগদরশনে কিন্তু পাথেয় নাস্তি,
পায়ে শিক্লী মন উড়ু-উড়ো একি দৈবের শাস্তি।
টঙ্কাদেবী কর যদি কৃপা না রহে কোন জ্বালা,
বিদ্যাবুদ্ধি কিছুই কিছু না খালি ভস্মে ঘি ঢালা॥"—মন্দাক্রান্তা।

ইংগবঙ্গের বিলাত-যাত্রা

"বিলাতে পালাতে ছট ফট করে নব্য গউড়ে,
অরণ্যে যে জন্যে গৃহগ বিহগ প্রাণ দউড়ে।
স্বদেশে কাঁদে সে গুরুজন-বশে কিছু হয় না,
বিনা হ্যাট্‌টা কোট্‌টা ধুতি পিরহনে মান রয় না॥"
—শিখরিণী।

স্বপ্নপ্রয়াণে কবি নিজ পরিচয়চ্ছলে সহোদরগণের নামোল্লেখ ও বাসস্থান নির্দেশ করিয়া যে কবিতা রচনা করিয়াছেন, তাহা বোধ হয় পাঠকের কৌতুকজনক হইবে। ইহা কেবল কতকগুলি নামমাত্রের কবিতা নহে; নিজের সার্থকতার পরিচায়ক ক্রিয়া ও সুকোমল পদের প্রয়োগে কবিতাটি সরস ও সুখপাঠ্যই হইয়াছে, মনে হয়। কবিতার বর্ণনা এইরূপঃ—

ভাতে যথা সত্য হেম, মাতে যথা বীর,
গুণজ্যোতি হরে যথা মনের তিমির।
নবশোভা ধরে যথা সোম আর রবি,
সেই দেবনিকেতন আলো করে কবি॥

কাগজের বাক্‌সপ্রকরণ—লেখার সাজ-সরঞ্জাম রাখার জন্য দ্বিজেন্দ্রনাথের কাগজের বাক্‌স প্রস্তুত করার প্রকরণ বিশেষ কৌতুকজনক। কাগজ, দোয়াত, কলম, চশমা রাখার ছোট বড় নানারকম বাক্‌স তিনি কাগজের নানাপ্রকার তোড়-জোড় ও ভাঁজের বাঁধন দিয়া পরিপাটি-পূর্বক রচনা করিতেন। এ বিষয়ে সত্যেন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন— "জিজ্ঞাসা করলে, বড়দাদা হেসে বলেন,...এ বিদ্যা সাহিত্যেরই অঙ্গীভূত। ......বড়দাদা অসামান্য ধৈর্য ও অধ্যবসায় সহকারে তাহা আয়ত্ত করতে নিযুক্ত রইলেন।... বাক্‌স তত্ত্বের জন্য সমস্ত গণিতশাস্ত্র মন্থন করে তাঁর কাজের উপযোগী বিষয় সকল সংগ্রহ করতে হয়েছে, সেই সংক্রান্ত নূতন নিয়মাবলী প্রস্তুত করতে হয়েছে।"

দ্বিজেন্দ্রনাথ অতি সরল উদারচেতা পুরুষ ছিলেন। সংসারে থাকিয়াও তিনি সংসারের লোক ছিলেন না। সংসারের কিছুই বুঝিতেন না; বস্তুত তিনি সংসারাশ্রমে মুনিরই ন্যায় নিঃসঙ্গভাবে জীবিতকাল অতিবাহিত করিয়াছেন। তাঁহার আশ্রমে ভিক্ষুক সাধু-সন্ন্যাসী মধ্যে মধ্যে আসিত, অর্থাদি প্রার্থনা করিত। পাত্রবিশেষে দানের ন্যায্য পরিমাণ তিনি একেবারেই বুঝিতেন না, ফলে দানের মাত্রা অতিরিক্ত হইয়া পড়িত। সাধু-সন্ন্যাসীর বুজরুগী তাঁহার বিশেষ বিরক্তিকর ছিল; ইহাদিগকে তিনি আশ্রম হইতে সরাইয়া দিতেন। অন্নার্থী ও বস্ত্রপ্রার্থীর প্রার্থনা তিনি সহানুভূতির সহিত পূর্ণ করিতেন।

পিতৃদেবের এইরূপ চিত্তবৃত্তি জানিয়া দ্বিপেন্দ্রনাথ এই দানের ব্যবস্থা নিজের হাতেই লইয়াছিলেন। অতঃপর প্রার্থী আসিলে দ্বিজেন্দ্রনাথ তাহাকে পুত্রের নিকটে পাঠাইতেন, দ্বিপেন্দ্রনাথ অবস্থা বুঝিয়া দানের ব্যবস্থা করিতেন।

দ্বিজেন্দ্রনাথের উচ্চ হাস্য তাঁহার চরিত্রের একটি বিশেষ লক্ষ্যের বিষয়। ইহা তাঁহার স্বাভাবিক। এরূপ প্রাণ-খোলা মুক্তকণ্ঠ হাস্য আমি আর কাহারও শুনি নাই। কথাপ্রসঙ্গে বা কবিতাপাঠে হাস্য-রসের কথায় তিনি হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিতেন, দূর হইতেও স্পষ্টই শোনা যাইত। সত্যেন্দ্রনাথও এই অট্ট-হাস্যের কথা লিখিয়াছেন।

দ্বিজেন্দ্রনাথের ভোলা স্বভাব সময়ে সময়ে বিপত্তির কারণ হইয়া উঠিত। এ বিষয়ে সত্যেন্দ্রনাথ যাহা লিখিয়াছেন, সংক্ষেপে তাহা উদ্ধৃত করিলাম,—"বড়-দাদার একটি ভৃত্য ছিল, তার নাম কালী। তার উপর কত রাগ কত তম্বী...হচ্ছে, আমরা দেখেছি অনেক সময় অকারণ; চশমা খুঁজে পাচ্ছেন না, তাকে কত ধমকান হচ্ছে, চীৎকার ধ্বনিতে আকাশ ফেটে যাচ্ছে, অথচ সেই চশমা তাঁর চোখের উপর কপালে ঠ্যাকান রয়েছে—আমরা দেখিয়া দিলে শেষে হেসে অস্থির। হয়ত কাউকে খাবার নিমন্ত্রণ করেছেন, সে যথাসময়ে এসে উপস্থিত, কিন্তু বড়দাদার কিছুই মনে নেই,...তার সামনেই নিজের খাবার খেয়ে যাচ্ছেন, অথচ তাকে তার ভাগ দেবার কোন কথাই নেই। সে বেচারা প্রতীক্ষা করে আছে, কখন তার জন্যে খাবার আসে,...শেষে বড়দাদার ভুল ভেঙ্গে গেলে হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকি পড়ে গেল। একজন বড়দাদার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে, বড়দাদা ঠিক সেই সময় বেরবার উদ্যোগে আছেন—তাঁর বন্ধুর গাড়ি নিজের গাড়ি মনে করে চড়ে বেরিয়ে পড়লেন, বন্ধু বসেই আছে,...অনেকক্ষণ পরে বাড়ি ফিরে এসে দেখেন তাঁর বন্ধু এখনো সেখানে বসে—বড়দাদা কারণ জানতে পেরে অপ্রস্তুত ও হাসতে হাসতে তাঁর বন্ধুর পীঠ চাপড়ে তাকে সান্ত্বনা করলেন।"

জ্যেষ্ঠ পুত্রই দ্বিজেন্দ্রনাথের আহা-রাদির বিষয়ে বিশেষ অবহিত ছিলেন। প্রতিদিনই তিনি যথাসময়ে পিতার প্রাতর্ভোজনাদির ব্যবস্থা করিতেন, কোন ত্রুটি হইত না। তিনি পিতার জন্য নানা-বিধ ফলমূল মিষ্টান্ন আনাইয়া রাখিতেন। এই পিতৃভক্ত পুত্রের জীবিতকালে দ্বিজেন্দ্রনাথের কোন বিষয় কোন অভাব-অভিযোগ শুনি নাই। দ্বিপেন্দ্রনাথের অকালমৃত্যুতে তাই বৃদ্ধ পিতা শোক-কাতর কণ্ঠে বলিয়াছিলেন,—"আমার ছেলে B. A., M. A. পাশ করেনি, কিন্তু সে আমার কি ছিল, তা আমিই জানি!" উপযুক্ত পুত্রের শোকে কাতর-হৃদয় অশীতিপর বৃদ্ধ পিতার কলুষিত কণ্ঠের এই অর্ধস্ফুট বাক্য চিরকাল মনে থাকিবে।

আমার অভিধান সঙ্কলনের বিষয় দ্বিজেন্দ্রনাথ জানিতেন। আমি এক সময়ে তাঁহার আশ্রমের নিকটেই থাকিতাম। সে সময়ে শব্দের বিষয়ে কোন সংশয় হইলে, তিনি লিখিয়া জানাইতেন, আমিও যাহা জানিতাম, তাঁহাকে লিখিতাম। একদিন তিনি কোন একটি

শব্দের অর্থ জানাইবার জন্য আমাকে লিখিয়াছিলেন। আমি যাহা জানিতাম তাহাই লিখিয়াছিলাম, কিন্তু সে অর্থ তাঁহার মনঃপূত হয় নাই। তিনি তখনই তাঁহার মন্তব্য লিখিয়া ভৃত্যকে পাঠাইয়াছিলেন। ভৃত্যের নিকট হইতে কাগজটুকু লইয়া পড়িয়া দেখিলাম, তিনি লিখিয়াছেন,—"তোমার এই অর্থ ঘটকচু-ড়ামণির মতই হইল। আমি উত্তরে জানাইলাম, ইহা আমার মনগড়া অর্থ নহে, যাহা অভিধানে আছে, তাহাই জানাইয়াছি। আমার এইরূপ উত্তরে 'তাঁহার অশিষ্টাচার হইয়াছে' ভাবিয়া দ্বিজেন্দ্রনাথ আমাকে লইয়া যাইবার জন্য তখনই ভৃত্যকে আমার কাছে পাঠাইলেন। ভৃত্য বলিল,—"বাবামশায় ডাকছেন, চলুন।" আমি বলিলাম,—"আমার কথায় তিনি নিশ্চয়ই ক্ষুব্ধ হয়েছেন, এখনই গেলে হয়ত কিছু অপ্রিয় বলতে পারেন, তা হলে বড় দুঃখের বিষয় হবে; তিনি একটু শান্ত হন, একটু পরেই যাচ্ছি, বলগে।"

কিছুক্ষণ পরে দ্বিজেন্দ্রনাথের আশ্রমে উপস্থিত হইলাম। পথে স্থির করিলাম,—বোবার শত্রু নাই, যাহাই বলুন, কিছুই বলিব না। নিকটে গিয়া প্রণাম করিয়া দাঁড়াইতেই তিনি সহজ কথায়ই বলিলেন,—"বুঝেছি, অসন্তুষ্ট হয়েছ, জানত, বুড়ো মানুষ আর ছেলে মানুষ, দুইই সমান; মনে কিছু করো না।" আমি বিনীতভাবে বলিলাম,—"আমি অসন্তুষ্ট হই নি, আপনি বিরক্ত হয়েছেন, এই ভয়ই কচ্ছিলাম, এখন সে ধারণা গেল।" নিজ অশিষ্টাচারে আপনাকে দোষী মনে করা মহাত্মারই লক্ষণ। কবির মুখেও একবার এইরূপ নিজ দোষ স্বীকারের কথা শুনিয়াছিলাম।

উৎসবোপলক্ষ্যে কবি বড়দাদাকে প্রণাম করিতে যাইতেন। প্রণাম করিয়া দ্বিজেন্দ্রনাথের পায়ের নিকটেই রবীন্দ্রনাথ বসিতেন। জ্যেষ্ঠের প্রতি কনিষ্ঠের ভ্রাতৃভক্তির এবং কনিষ্ঠের প্রতি জ্যেষ্ঠের ভ্রাতৃবৎসলতার এই পবিত্র দৃশ্য—একের ভক্তি অন্যের বাৎসল্য, বস্তুতই যেমন হৃদয়গ্রাহী ও সমাজের স্থিতিমূলক, তেমনি স্বজনের এইরূপ আচার-ব্যবহারও সমাজের বিশেষ হিতকর ও শিক্ষণীয়।

এ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসায় দ্বিজেন্দ্রনাথের পক্ষপাতিতা ছিল না। তাঁহার দৃঢ় ধারণা ছিল, এলোপ্যাথিক ঔষধে শরীরের যান্ত্রিক দোষ জন্মে। একবার তিনি শান্তিনিকেতনে পীড়িত হইলে, চিকিৎসার নিমিত্ত তাঁহাকে কলিকাতায় লইয়া যাওয়া স্থির হয়। দ্বিপেন্দ্রনাথ তাঁহার কাছে এই প্রস্তাব করিলে, তিনি একেবারেই অস্বীকার করিয়াছিলেন। শেষে আত্মীয়গণের অনুরোধ বার বার অন্যথা করিতে না পারিয়া অগত্যা কলিকাতায় যাইতে স্বীকার করিয়াছিলেন। কবি তখন আশ্রমে অনুপস্থিত।

দীনবন্ধু এণ্ড্রুজ দ্বিজেন্দ্রনাথকে বড়-দাদা (বরোদাদা) বলিতেন। বড়দাদার প্রতি দীনবন্ধুর ভক্তি যেমন ঐকান্তিক দেখিয়াছি, দীনবন্ধুর প্রতি বড়দাদারও স্নেহ সেইরূপ অগ্রজোচিত ছিল। দ্বিজেন্দ্রনাথ পীড়িত হইয়া যখন কলিকাতায় গিয়াছিলেন, পীড়িতের সেবক-ভাবে দীনবন্ধু তখন সর্বদাই তাঁহার রোগশয্যার পার্শ্বে উপস্থিত থাকিতেন এবং রোগীর প্রয়োজনানুরূপ পথ্যের ব্যবস্থা সেবা-শুশ্রূষাদি অত্যাবশ্যক বিষয়সমূহ নিজেই অক্লান্তভাবে সম্পন্ন করিয়া রোগীকে সুস্থ ও প্রফুল্ল রাখিতে সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন। তখন মুনীশ্বর নিকটেই ছিল, তাই দ্বিজেন্দ্রনাথ তাহাকে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন,—"মুনীশ্বর, সাহেবের পরিচর্যার পরিপাটি দেখ, শিখিয়া রাখ।"

একবার কোন কার্যোপলক্ষ্যে আমি দ্বিজেন্দ্রনাথের কাছে গিয়াছিলাম। সেই সময়ে তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—"তোমার অভিধান কি ছাপান হচ্ছে? তখন মুদ্রাঙ্কণের ব্যবস্থা করিতে পারি নাই, বলিয়াছিলাম,—না, এখনও ছাপান আরম্ভ হয়নি। এইরূপ উত্তর শুনিয়া তিনি যেন নিরাশ হইয়াই বলিয়াছিলেন,—"তবে আর আমি দেখতে পেলাম না।" তাঁহার ইহাই আমার সঙ্গে শেষ-কথা। মুদ্রিত অভিধান তাঁহার হাতে দিয়া আশীর্বাদ লইতে পারি নাই; তাঁহার সেই আশা-ভঙ্গের কথা আমার বিশেষ স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে ও থাকিবে।

সাপ্তাহিক পত্রিকা "হিতবাদী"র নাম দ্বিজেন্দ্রনাথের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংসৃষ্ট। ১৮৩১ সনের ৩০শে মে (?)—কৃষ্ণকমলের সম্পাদকত্বে হিতবাদী প্রথম প্রকাশিত হয়। কৃষ্ণকমল তাঁহার 'স্মৃতি-কথা'য় বলিয়াছেন,—সাপ্তাহিক পত্রিকা "হিতবাদী" নামটি দ্বিজেন্দ্রবাবুরই সৃষ্টি এবং "হিতং মনোহারি চ দুর্লভং বচঃ" এই Mottoটিও তিনিই বলিয়া দেন। হিতবাদীর জন্মকালে পাঁচজন একত্র মিলিয়া এক বৈঠক বসিয়াছিল; তথায় আমিও ছিলাম, দ্বিজেন্দ্রবাবুও ছিলেন। সেই সময় ঐ নাম ও Motto পরিগৃহীত হয়। সুতরাং এই হিসাবে দ্বিজেন্দ্রবাবুই ঐ কাগজের জন্মদাতা বলিতে হইবে (১১)।

প্রবন্ধের বিষয়ীভূত দ্বিজেন্দ্রনাথের চরিতাবলী তাঁহার সুদীর্ঘ জীবনের ক্ষুদ্রতম একাংশমাত্র। তাঁহার সম্পূর্ণ জীবনচরিতগ্রন্থ লিখিত হইবে কি না, জানি না; যদি তাহা কখন রচিত হয়, তাহা হইলে তাঁহার জীবনস্মৃতির এক-দেশ—এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধ হয়ত তাহার এক ক্ষুদ্রাংশের সহায় হইতে পারে।

টীকা

(১) 'বঙ্গদর্শন' (নব পর্যায়), ১৩০৮ হইতে ১৩১১ সাল পর্যন্ত চার বৎসর।

(২) 'সাহিত্যসাধক চরিতমালা'—২, "কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য"—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩৩ পৃষ্ঠা।

(৩) 'রবীন্দ্র-কথা'—খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ১৫৮ পৃষ্ঠা।

(৪) 'বঙ্গদর্শন' দ্বিতীয় খণ্ড, ১২৮০, ২০৪—২০৬ পৃষ্ঠা।

(৫) সতীশচন্দ্র রায়ের "রচনাবলী," ২১০, ২১১ পৃষ্ঠা।

(৬) "প্রিয়-পুষ্পাঞ্জলি," ২৬৪, ২৬৫ পৃষ্ঠা।

(৭) "কাব্যমালা"—প্রকাশক শ্রীদিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রথম সংস্করণ, ১৩২৭ সাল।

(৮) "প্রবন্ধমালা"—প্রকাশক শ্রীদিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রথম সংস্করণ, ১৩২৮ সাল।

(৯) "শান্তিনিকেতন," ১৩২০ সাল, কার্তিক, পৌষ (৪র্থ বর্ষ, ১০ম, ১১শ সংখ্যা) ১৫৭; ১৯৩ পৃষ্ঠা; চৈত্র (৫ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা), ৪১ পৃষ্ঠা।

(১০) "শান্তিনিকেতন," ১৩৩১ সাল, অগ্রহায়ণ (৫ম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা), ২০৯ পৃষ্ঠা।

(১১) 'সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা'—২, "কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য,"—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ২১ পৃষ্ঠা।

মনসা

কণাদ গুপ্ত

আমি বহুদেশ ভ্রমণ করিয়াছি। মানুষ সচরাচর ভ্রমণ করে রেলে, জাহাজে, এরোপ্লেনে বা পায়দলে। পাখীরা ভ্রমণ করে ডানায়। আমার এ সকল কিছুই লাগে না। আমি চলি 'মনসা'। পৃথিবীর এই দ্রুততম বাহনটি আমার ইচ্ছামাত্রই আমাকে দেশ হইতে দেশান্তরে লইয়া যায়, গ্রহ হইতে গ্রহান্তরে, এমন কি, যুগ হইতে যুগান্তরেও। অফিসে ডেস্কের উপর লম্বমান ক্যাশবইয়ে পোস্টেজ এ্যাকাউণ্টের তলায় দু'টাকা ছয় আনা ন-পাই বসাইতে বসাইতে আমি কর্মতিক্ত হইয়া মনকে বলিলাম গাড়ি জুতিতে। মন আমাকে লইয়া গেল উজ্জয়িনীতে। সেখানে নবরত্নের সংগে ললিতকলা লইয়া সবে সহাস্য আলাপ জমাইয়াছি, হয়তো মনের মিল হইল না, তখনই বহু শতাব্দী এবং অনেক দেশ অতিক্রম কয়িা মন আমাকে লইয়া গেল সেণ্ট হেলেনায়, নেপোলিয়ানের নির্জন কারাকক্ষে। প্রহরীর সতর্ক প্রহরা এড়াইয়া নৈরাশ্যপীড়িত বীরবরকে কিছু সান্ত্বনা দিয়া আসিলাম। এই বিরাট টুর-প্রোগ্রাম যে কি সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে সংঘটিত হয়, তাহা মন-যানে বিচরণে যাঁহারা অভ্যস্ত শুধু তাঁহারাই জানেন, অন্যের বুদ্ধির অগোচর।

অন্যে আমার ভ্রমণ-কাহিনীগুলিকেও বিশ্বাস করে না। আমি যখন নয়া নয়া দেশের অদ্ভুত এবং বৈচিত্র্যময় বিবরণ শুনাইতে যাই, তাহারা চক্ষু ক্ষুদ্র করে। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বকের পঞ্চায়েৎকেই তাহারা সত্যাসত্যের হাইকোর্ট বলিয়া মানিতে অভ্যস্ত। কিন্তু যাঁহারা ধীমান্, তাঁহারা জানেন যে, মনই ইন্দ্রিয়দের অগ্রজ। তাহার সাক্ষ্যকে নাকচ করিবার ক্ষমতা অন্য কোন ইন্দ্রিয়ের নাই।

সেবার গিয়াছিলাম উত্তর মেরুতে। বিংশ শতাব্দীর উত্তর মেরু নয়। মনে আছে, বর্তমান শতাব্দীকে ছাড়াইয়া অনেকগুলি শতাব্দী অতিক্রম করিতে হইয়াছিল। উত্তর মেরু তখন সুপ্রকাণ্ড শহর। তুষার-শীতল নয়, নাতিশীতোষ্ণ সুখপ্রদ আবহাওয়া। ছয়মাস দিন ছয়মাস রাত্রি নয়। রাত্রি আদৌ নাই. বিজলী প্রভাবে সর্বক্ষণ দিনের আলোয় উদ্ভাসিত। পথ-ঘাট অত্যন্ত পরিষ্কার—আয়নার মত। যানবাহনের মধ্যে অধিকাংশই এরোপ্লেন—ক্ষুদ্র, সুদৃশ্য প্লাইডার। বাড়িগুলি অভ্রচুম্বী অট্টালিকা, সমোচ্চ; মানুষের সাম্য ভাস্কর্যে প্রতিফলিত। শহরের প্রান্তে রাষ্ট্রনেতা পণ্ডিত সিমোডেরোর প্রাসাদ।

অধিবাসীরা শ্বেতকায় অথবা সাদাটে। সবল, সুস্থ ও উৎসাহশীল, বর্তমান যুগের কায়াকল্পের বিজ্ঞাপনের মত। সাদা গোঁফ ও পাকা দাড়ির অভাব ছিল না, কিন্তু তাহাদের অধিকারীরাও বৃদ্ধ বা জরাগ্রস্ত নয়। স্বাস্থ্য এবং শক্তিতে সকলেই সমবয়সী।

শহরটি একবার পরিক্রম করিয়াই আমার চিত্ত আশায় ও আনন্দে ফুলিয়া উঠিল। মানুষের কি উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ! শুধু একটি বৈশিষ্ট্য আমাকে বিহ্বল করিতেছিল শহরে যেন হাওয়া নাই, আকাশ যেন বায়ু-বর্জিত। শ্বাস লইতে যে কষ্ট হইতেছিল তাহা নয়, কিন্তু শ্বাস যে কেমন করিয়া লইতেছিলাম —তাহাও বুঝিতে পারিলাম না। মনে করিলাম, নয়া দেশের নয়া রীতি!

দুঃখের বিষয়, ফিরিবার সময় ওই আশা ও আনন্দ পুটুলিতে ভরিতে পারিলাম না। বরং দুঃখ ও অবসাদই মন অধিকার করিল। সেই একটি দিনের কয়েকটি নাটকীয় ঘটনার অভিঘাতে উত্তর মেরুর ভাগ্য চিরকালের জন্য পরিবর্তিত হইল। কেমন করিয়া হইল, তাহা বলিবার জন্যই লেখনী ধারণ। বিশ্বাস অবিশ্বাস পাঠকের মর্জি।

পণ্ডিত সিমোডেরোর প্রাসাদের সর্বোচ্চ তলায় একটি মাত্র হলঘর। সেটি পরীক্ষাগার। নানাবিধ যন্ত্রপাতিতে পরিপূর্ণ, তাহাদের অধিকাংশ বিংশশতাব্দীর বিজ্ঞানের অপরিচিত। এক কোণে ঢাকা উনানের মত কি একটা বস্তু রহিয়াছে। পণ্ডিত সিমোডেরো তাহার উপর ঝুকিয়া পড়িয়া কি যেন পরীক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহার মুখে দীর্ঘ চুরুট, থাকিয়া থাকিয়া ধূম নির্গত হইতেছে। (অতগুলি শতাব্দীর পর চুরুট বস্তুটার যে কি ক্রম-পরিণতি হইল, তাহা আমার স্মরণে আসিতেছে না, তবে মাঝে মাঝে ধোঁয়া বাহির হইয়া পণ্ডিত সিমোডেরোর কুঞ্চিত কপাল ঢাকিয়া ফেলিতেছিল—এ কথা ভালই মনে আছে। সিমোডেরো বৃদ্ধ, তাঁহার কেশ ও শ্মশ্রু দুই-ই পাকিয়া গিয়াছে, কিন্তু কর্মক্ষমতায় বা পেশীর বাঁধনে তাঁহার অদূরে যে যুবক শিক্ষার্থী বসিয়া আছে—তাহার সহিত উত্তর মেরুর বিজ্ঞানবিৎ রাষ্ট্রনেতার কোন প্রভেদ নাই।

এই শিক্ষার্থীর নাম নিখিল সিয়ানো। দেখিতে অতি সুদর্শন। তখনকার কালের উত্তর মেরুবাসীদের মধ্যে আকৃতির পার্থক্য বিশেষ না থাকিলেও, বর্তমানের মানে নিখিল বঙ্গীয় সৌন্দর্যের একটি শ্রেষ্ঠ টাইপ। সে সাগ্রহ দৃষ্টি দিয়া পণ্ডিত সিমোডেরোর পরীক্ষা অনুসরণ করিতেছিল।

অবশেষে পণ্ডিত সিমোডেরো যন্ত্রটির নিকট হইতে সরিয়া আসিয়া বলিলেন, নাঃ, তুমি আমাকে মিথ্যা ভয় দেখালে সিয়ানো, যন্ত্রটার তো কোন অংশই খারাপ হয় নি।

নিখিল কহিল, তাহলে আমারই ভুল। কিন্তু একটু আগে ওটা থেকে বাষ্প বেরিয়ে যাবার মত ভস্ ভস্ শব্দ হচ্ছিল!

—ওঃ। সিমোডেরো নিশ্চিন্ততার অভিব্যক্তি করিলেন। কহিলেন, তাই বল। তুমি এই সবে শিখতে শুরু করেছ। সব কথা এখনো জান না। ঠিক পঞ্চাশ বছর হবার পর যন্ত্রটার ক্ষয় শুরু হয়, আর একশ বছরের মাথায় এর কার্যকারিতা একেবারে নষ্ট হয়। তখন অংশগুলোকে বদলে যন্ত্রটাকে নূতন করে তুলতে হয়। পুরো নব্বই বছর আজ যন্ত্রটার বয়স, কাজেই ওর ক্ষয় খানিকটা বোঝা যায়।

—আশ্চর্য! এমন বস্তুর বিরুদ্ধেও লোকে বিদ্রোহের কথা ভাবে।

আজ পরীক্ষাগারে আসা অবধি নিখিল এই কথাই ভাবিতেছিল। এমন যুগান্তকারী আবিষ্কার, তাহাও লোকে চায় না!

পণ্ডিত সিমোডেরো কিন্তু উড়াইয়া দিলেন। বলিলেন, নাঃ, ও বাজে কথা। কতকগুলো সাংবাদিক পয়সার জন্য এই বিদ্রোহের ধুয়া তুলেছে। বিদ্রোহের গুজবে আমি একেবারেই বিশ্বাস করি না। দেখ তো হে, বেল বেজেই যাচ্ছে, মেসেজটা রিসিভ করো।

একটি যন্ত্রের গায়ে বেল বাজিতেছিল। নিখিল বোতাম টিপিতেই গার্ডরুম হইতে এই কথাগুলি ভাসিয়া আসিলঃ—একজন মাঙ্গলীয় রাষ্ট্রনেতার সংগে দেখা করতে চায়। পাঠাব কি?

সিমোডেরো বলিলেন, হ্যাঁ, পাঠিয়ে দিক্, মার্সের রাজার কাছ থেকে লোক আসবার কথা ছিল বটে।

নিখিল যন্ত্রের মধ্য দিয়া সিমোডেরোর আদেশ জানাইয়া দিবার কিছুকাল পরেই ঘরে একটি অদ্ভুতদর্শন জীব প্রবেশ করিল। কতকটা মানুষের মতই দেখিতে, কিন্তু দৈর্ঘ্যে অনেক খর্ব ও প্রস্থে অনেক বিস্তৃত। একটা অতিকায় বামন বলিতে

পারেন। পণ্ডিত সিমোডেরোকে অভিবাদন করিয়া সে তাঁহার হাতে একখানি চিঠি দিল।

সিমোডেরো পত্রপাঠ করিয়া মাঙ্গলীয়ের সর্বাঙ্গে একবার দৃষ্টিপাত করিলেন। কহিলেন, আপনিই সেই লোক?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—মঙ্গলের রাজা আপনাকেই পাঠিয়েছেন অমরত্ব গ্যাস কেমন করে তৈরী করতে হয়, তাই শিখবার জন্য?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। আশা করি আমার পক্ষে অসম্ভব হবে না।

অসম্ভব না হলেও দুরূহ হবে। আমি নিজে ষাট বৎসর অনবরত চিন্তা এবং গবেষণা করে এই যন্ত্র আবিষ্কার করেছি। তার ফলে, পৃথিবী আর নশ্বর নয় অবিনশ্বর।

আত্মপ্রসাদের হাসিতে সিমোডেরোর মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

আশ্চর্য আবিষ্কার! যন্ত্রটাকে দেখবার জন্য আমি অত্যন্ত কৌতূহলী হয়েছি পণ্ডিতবর, এখন কি দেখতে পারি না?

পণ্ডিত সিমোডেরো ও নিখিল সিয়ানো মাঙ্গলীয়কে সঙ্গে লইয়া যন্ত্রটির পাশে আসিলেন। দুই একবার দেখিয়া মাঙ্গলীয় সংশয়ের স্বরে প্রশ্ন করিল, এই সব?

—এই সব।

—কিন্তু এত ক্ষুদ্র যন্ত্রের এত বড় বিরাট ক্রিয়া কেমন করে সম্ভব?

পণ্ডিত সিমোডেরো কহিলেন, যন্ত্রটা ক্ষুদ্র, কিন্তু ওর শক্তি তুচ্ছ নয়। অনবরত চলমান বিদ্যুতের দ্বারা এখানে সৃষ্ট হচ্ছে একটা গ্যাস, যা ক্রমে ক্রমে সমস্ত পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে ছড়িয়ে পড়ছে। বায়বীয় বলে এখন আর কিছু নেই। যা ছিল, তা সমস্তই এই যন্ত্র থেকে সৃষ্ট অদৃশ্য গ্যাসে পরিণত হয়েছে।

মাঙ্গলীয় সন্তুষ্ট হইল না। কহিল, মানুষকে চিরায়ু করতে পারে একটা গ্যাসের এমন কি শক্তি আছে?

সিমোডেরো কহিলেন, ওইখানেই আমার আবিষ্কার। এই গ্যাসের এমন একটি গুণ আছে, যা দেহের মধ্যে প্রবেশ করলে নিঃশ্বাস নেওয়ার কাজ হয়। অর্থাৎ, বায়ুকে যে রাসায়নিক পরিবর্তন দেবার জন্য ফুসফুসের সৃষ্টি তা এই যন্ত্রের মধ্যেই সম্পন্ন হয়, তারপর এই গ্যাস বায়ু-মণ্ডলে ছড়িয়ে পড়ে মানুষের শরীরে লোম-কূপের মধ্য দিয়ে প্রবেশ করে। ফলে, এই পৃথিবীতে মানুষ আর ইচ্ছা করলেও মরতে পারে না।

রাষ্ট্রনেতার কথা শেষ হওয়ার পূর্বেই প্রাসাদের বাহির হইতে সহসা একটা ক্রমোচ্চ কলরব শুনিতে পাওয়া গেল। নিখিল চমকিত হইয়া কহিল, ও কিসের শব্দ?

পণ্ডিত সিমোডেরো তাচ্ছিল্যের সহিত বলিলেন, এরোড্রোমে এরোপ্লেন আসছে, তার শব্দ

মাঙ্গলীয় প্রশ্ন করিল, কিন্তু মঙ্গলের বায়ুতে কি এই গ্যাস মিশ্রিত করা সম্ভব হবে

কেহ তাহার উত্তর দিবার পূর্বেই পূর্বোক্ত যন্ত্রে আবার বেল বাজিয়া উঠিল। পণ্ডিত সিমোডোর বোতাম টিপিতেই এই কথা কয়টি বাতাসে ভাসিয়া আসিল:— নিকটবর্তী এরোড্রোমে অসংখ্য এরোপ্লেন উপস্থিত হয়েছে। তাদের পাইলটদের উদ্দেশ্য আপনার সঙ্গে দেখা করা। তাদের কি আপনাদের কাছে পাঠিয়ে দেব?

সিয়ানোর মুখ পাণ্ডুর হইল, কহিল, এ নিশ্চয় বিদ্রোহীরা।

পণ্ডিত সিমোডেরো ধমকাইয়া উঠিলেন, তুমি মিথ্যে ভয় করছ সিয়ানো, অমরত্বের বিরুদ্ধে কখনও বিদ্রোহ হতে পারে না। এঁরা এসেছেন আমাকে বাৎসরিক অভিবাদন জানাতে। তুমি ভুলে যাচ্ছ— বৎসরের এই দিনে আমি এই গ্যাস আবিষ্কার করেছিলাম এবং প্রতি বৎসরই আমাকে এই উৎপাত সহ্য করতে হয়।

যন্ত্রের মুখে মুখ দিয়া তিনি আদেশ দিলেন, যাঁরা এসেছেন, তাঁদের পাঠিয়ে দাও।

ঘরের মধ্যে একটা অনিশ্চিত নীরবতা বিরাজ করিতে লাগিল। হলের বাহিরে অসংখ্য লোকের কণ্ঠস্বর শোনা গেল। সহসা দরজা ঠেলিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন একটি মহিলা, নাম—হৈমন্তী। তদানীন্তন পৃথিবীর প্রগতিশীল নর-নারীদের নেত্রী তিনিই।

রাষ্ট্রনেতাকে অভিবাদন করিয়া হৈমন্তী মৃদুস্বরে কহিল, আপনিই মহাপণ্ডিত সিমোডেরো?

পণ্ডিত সিমোডেরো ঈষৎ বিরক্তভাবে বলিলেন, হ্যাঁ, কিন্তু অভিবাদন জানাতে আসার আগে প্রতিবারের মত এবারেও খবর দেওয়া উচিত ছিল।

হৈমন্তী মৃদু কিন্তু দৃঢ়স্বরে জবাব দিল, আমরা আপনাকে অভিবাদন জানাতে আসিনি। আমরা, সমস্ত পৃথিবীর পনের লক্ষ প্রতিভূ, আপনার কাছে এসেছি আপনার আবিষ্কৃত অমরত্ব গ্যাস প্রত্যাহার করার জন্য অনুরোধ করতে।

—প্রত্যাহার করব! অমরত্ব গ্যাস! কি বলছেন আপনি, আপনারা কি উন্মাদ?

—উন্মাদ আমরা না আপনি নিজে? জীবনের হেয় ক্লান্তিকর দৈনিকতার হাত থেকে মুক্তিস্বরূপ মানুষ যে একটিমাত্র প্রতিকার পেত, পৃথিবীর অসহ্য এক-ঘেয়েমির অন্তে মানুষ যে একটিমাত্র বৈচিত্র্যের সন্ধান জানত, সেই মৃত্যুর চির-নূতন কোল থেকে আপনি মানুষকে বঞ্চিত করেছেন! আপনি শুধু উন্মাদ নন্, সমস্ত মানবজাতির শত্রু।

হৈমন্তীর কণ্ঠস্বর আন্তরিকতার ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধ। পণ্ডিত সিমোডেরো ক্ষণকাল অতিমাত্র বিস্মিতের মুখভঙ্গী করিয়া কহিলেন, আমি মানুষের শত্রু! আমাকে কি এই বুঝতে হবে যে, আপনারা চান্ না—মৃত্যুর অনিশ্চয়তার হাত থেকে রক্ষা পেতে, আপনারা চান্ না—মৃত্যুর অন্যায় শাসন থেকে চিরকালের মত জীবনকে স্বাধীন করতে!

হৈমন্তী শুধু কহিল,—না।

দরজার ওপাশ হইতে জনতার সুউচ্চকণ্ঠ জানাইল,—না।

হৈমন্তী বলিল, আমরা চাই আমাদের পূর্বপুরুষেরা যে অধিকার বিনা বাধায় ভোগ করে গেছেন, সেই অধিকার ফিরে পেতে—মৃত্যুর ওপর মানুষের জন্মগত অধিকার। আমাদের পূর্বপুরুষদের ছিল অসংখ্য বিবিধ অনুভূতি। তাঁরা আজ পেতেন আনন্দ, কাল পেতেন দুঃখ, কখনো পেতেন শোক কখনো চাঞ্চল্য, কখনো হর্ষ কখনো বিস্ময়। দিনের পর দিন সম্পূর্ণ পৃথক ও নূতন অভিজ্ঞতার স্রোত বয়ে এসে তাঁরা অবশেষে পড়তেন, জীবনের চরম ও পরম অভিজ্ঞতা, শেষ ও শাশ্বত বৈচিত্র্য—মৃত্যুর সাগরে। আর আমরা? ঘানির বলদের মত একটা অচল, অনড়, চিরযৌবনের চতুর্দিকে বৃত্তাকারে ঘুরে মরছি। পালাবার উপায় নেই, নিষ্কৃতির পথ নেই। দিবসের কাজ, সন্ধ্যার উৎসব, রাত্রের নিদ্রা—এ ছাড়া আমাদের করবার কিছু নেই, বোঝবার কিছু নেই। আশ্চর্য, পণ্ডিত সিমোডেরো, আপনাদের বৈজ্ঞানিকদের উৎপাতে সমস্ত পৃথিবীতে আজ এমন একটি বস্তু নেই যা দেখে বিস্মিত বা রোমাঞ্চিত হই। মানুষ থেকে আরম্ভ করে তুচ্ছতম কীট পর্যন্ত সমস্ত প্রাণীর সমস্ত গোপন রহস্য আপনারা আলোয় এনে ফেলেছেন। আপনাদের অত্যাচারে প্রজাপতি হারিয়েছে সৌন্দর্য, ফুল হারিয়েছে মাধুর্য, জীবন হারিয়েছে বৈচিত্র্য। সেই বৈচিত্র্য আমরা ফিরে পেতে চাই, সেই বিস্ময় এবং সেই বিনাশ।

বাহিরের জনতা একবাক্যে সায় দিল, —বৈচিত্র্য, বিস্ময় এবং বিনাশ।

পণ্ডিত সিমোডেরো হৈমন্তীর দীর্ঘ বক্তৃতার কালে আপনার বিস্ময় এবং বিরক্তি সংযত করিয়া লইয়াছিলেন। উত্তরে তিনি নিরাবেগ কণ্ঠস্বরে কহিলেন, —বৈচিত্র্য, বিস্ময় এবং বিনাশ! কিন্তু এই মাত্র যে পূর্বপুরুষদের সম্পত্তি বলে এগুলিকে দাবী করলেন, যদি জানতেন,

এই সব পূর্বপুরুষদের কি অক্লান্ত চেষ্টা ছিল এই সব সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হবার, তাহলে আপনাদের নামের সঙ্গে অন্তত তাদের নামটা জড়াতেন না।

—ঠিক। কিন্তু সে অপরাধ পূর্বপুরুষদের নয়। বিজ্ঞানের অসত্য তর্কের গোলক ধাঁধায় পড়ে তাঁরা বিশ্বাস করতে বাধ্য হয়েছিলেন যে, ওই সম্পত্তিগুলি অপহৃত হলেই তাঁরা তৃপ্তি পাবেন। তাঁরা যে কি ভুল করেছিলেন, তার সাক্ষী আমরা।

পণ্ডিত সিমোডেরো পুনরায় উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। কহিলেন, আপনি ভুলে যাচ্ছেন, আমিও সেই পূর্বপুরুষদের সমসাময়িক। আজ আমার একশ আশি বছর বয়স। মৃত্যুর যুগের লোক আমি। আমি জানি বৈচিত্র্যের কি শোচনীয় পরিণতি। বিস্ময়ের কি গুরুদণ্ড, মৃত্যুর কি ভয়ঙ্কর অনিশ্চয়তা। আপনারা জানেন না, মৃত্যু দেখেন নাই। আমি জানি, আমি দেখেছি। মৃত্যুর অর্থ সমস্ত আশার পরিসমাপ্তি। মৃত্যুর অর্থ মহা-নাস্তি।

হৈমন্তী বুঝিল না, কহিল, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারে বসে বসে আপনি আর মানুষ নেই, যন্ত্রের মত আবেগহীন হয়ে গেছেন। না হলে বুঝতেন! মৃত্যুর মধ্যে মরণ নেই, মরণ আছে চিরস্থায়ী নিশ্চয়তার মধ্যে। বৈচিত্র্য ও বিস্ময়ের অভাবের মধ্যে। এই বৈচিত্র্য ও বিস্ময়ের শাশ্বত যোগানদার হল মৃত্যু। তাই মৃত্যুই পূর্ণতম জীবন, মৃত্যুই মহা-অস্তি।

বাহিরে জনতার কলরব উচ্চ হইতে উচ্চতর হইয়া উঠিল। হৈমন্তী সহসা দরজা খুলিয়া ধরিল। কহিল, ওই দেখুন, পনের লক্ষ লোক উদ্গ্রীব হয়ে আছে আপনার উত্তর শোনবার জন্য। তারা জানতে চায় এই অমরত্ব গ্যাসের ক্রিয়া আপনি বন্ধ করবেন কি না।

পণ্ডিত সিমোডেরো সংক্ষেপে জবাব দিলেন,—না।

—এই আপনার শেষ-কথা?

—হ্যাঁ।

হৈমন্তী দরজার নিকট গিয়া ঈষৎ উচ্চস্বরে কহিল, বন্ধুগণ, পণ্ডিত সিমোডেরো শেষ-কথা জানালেন, তিনি তাঁর আবিষ্কার প্রত্যাহার করতে নারাজ।

যে জনতা বাহিরে প্রতীক্ষা করিতেছিল, তাহাদের একটা দল কলরব করিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। প্রতি জনের হস্তে উদ্যত রিভলবার। এককণ্ঠে তাহারা কহিল, আমরা জানতে চাই, আপনি আমাদের মরবার অধিকার ফিরিয়ে দিবেন কি না।

উত্তরে পণ্ডিত সিমোডেরো দীপ্ত ভঙ্গীতে সোজা হইয়া দাঁড়াইলেন। রাষ্ট্রনেতার সমস্ত কর্তৃত্ব কণ্ঠস্বরে আনিয়া কহিলেন,—না। মূর্খ আপনারা, তাই রিভলবার দিয়ে মিথ্যে ভয় দেখাচ্ছেন। আপনারা ভুলে গেছেন যে, মানুষ আজ মরে না এবং আমিই মানুষকে সে অমরত্ব দান করেছি। আর যদি অঙ্গচ্ছেদ হয়। এখনকার উন্নত চিকিৎসায় আধঘণ্টার মধ্যেই সে অঙ্গ ফিরে পাব।

অস্ত্রের বিফলতা উপলব্ধি করিয়া জনতা নির্বাক হইয়া হৈমন্তীর দিকে চাহিল। হৈমন্তী ইঙ্গিতে তাহাদের বাহিরে যাইবার আদেশ দিল। পণ্ডিত সিমোডেরোর দিকে চাহিয়া কহিল, বেশ তাই হোক। কিন্তু মনে রাখবেন, আমরা একেবারে নিরুপায় নয়। আপনার পাশে যে জীবটি বসে আছে, ওদের গ্রহে মৃত্যুর পথ এখনো রুদ্ধ হয়নি। আমরাও সেই গ্রহেই যাব। শুধু দুঃখ এই যে, মরণের খোঁজে আমাদের পৃথিবী ত্যাগ করে যেতে হবে মঙ্গলে।

হৈমন্তী এবং জনতা প্রাসাদ ত্যাগ করিল। পণ্ডিত সিমোডেরো বিষণ্ণ হাসির সহিত মন্তব্য করিলেন,—পাগল! বাহিরের কলরব ধীরে ধীরে ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া আসিল। শুধু মাঝে মাঝে অস্পষ্ট চীৎকার ভাসিয়া আসিতে লাগিল, বৈচিত্র্য, বিস্ময় এবং বিনাশ।

বিদ্রোহীরা যাহা চাহিল, তাহা পাইল না। কিন্তু তবু পণ্ডিত সিমোডেরো নিজেকে জয়ী মনে করিতে পারিলেন না। কহিলেন, দূরবীণ দিয়ে দেখ তো সিয়ানো, ওরা কোথায় যায়।

নিখিল পরীক্ষাগারের তীব্র শক্তিশালী দূরবীণ চোখে লাগাইয়া কহিল, জনতা ছুটছে এরোড্রোমের দিকে। সকলেই এরোপ্লেনে উঠবার উদ্যোগ করছে।

পণ্ডিত সিমোডেরো সনিঃশ্বাসে কহিলেন, তাহলে ওরা মঙ্গলেই যাবে!

উপেক্ষিত মঙ্গলীয় ঈষৎ গর্বমিশ্রিত স্বরে কহিল, মঙ্গল শিশু গ্রহ হলেও এমন একটা বস্তুর গর্ব করতে পারে যা পৃথিবীতে পাওয়া যায় না, কিন্তু মঙ্গলে মেলে।

—কি? সে জিনিস কি?

—কেন? মৃত্যু।

—মৃত্যু?

—হ্যাঁ, এবং সেই অমূল্য বস্তুটি থেকে মঙ্গলকে বঞ্চিত করার আগ্রহ আমার আর এতটুকু নেই। আমাকে বিদায় দিন।

মুক্ত দরজা দিয়া মাঙ্গলীয় প্রস্থান করিল। পণ্ডিত সিমোডেরো ক্লান্তভাবে একটি চেয়ারে দেহ এলাইয়া দিলেন। ক্ষণকাল পরে কহিলেন, সিয়ানো, এ পরাজয় অসহ্য।

—কি?

—সেদিনের গ্রহ মঙ্গল পৃথিবীকে কোন বিষয়ে ছাড়িয়ে যাবে।

—সত্যই অসহ্য।

—এমন কি, সে বিষয় যদি মৃত্যুও হয়। সত্যই কি দুঃখের কথা সিয়ানো, চেষ্টা করে সন্ধান করে পৃথিবীর অধিবাসীরা মৃত্যুকে পায় না।

—আপনার গ্যাসের গুণে।

পণ্ডিত সিমোডেরো সহসা উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কহিলেন, সিয়ানো, ওদের ফেরাও। এ্যাম্প্লিফ্যায়ারে এখনি রাষ্ট্র করে দাও, অমরত্ব গ্যাসের ক্রিয়া অবিলম্বে বন্ধ করা হবে।

—সে কি?

—হ্যাঁ। এখনই যাও।

—কিন্তু—

—কিন্তু নয়, তুমি এখনি যাও। দেরী করলে ওরা উঠে পড়বে।

নিখিল অধীরস্বরে কহিল, কিন্তু আপনি নিজে? আপনার যে একশ আশি বছর বয়স। আপনার ফুসফুস যে বিকল। গ্যাসের ক্রিয়া বন্ধ হওয়া মাত্রই তো—

সিমোডেরো তাচ্ছিল্যের ভঙ্গী করিলেন। কহিলেন, বৈজ্ঞানিক মরণের ভয় করে না সিয়ানো। তুমি যাও।

নিখিল চলিয়া গেল। পণ্ডিত সিমোডেরো গ্যাস উৎপাদক যন্ত্রটির নিকট আসিয়া দু-একটি কলকব্জা খুলিয়া ফেলিলেন, দু একটি বোতাম টিপিয়া ধরিয়া আবার ছাড়িয়া দিলেন। একটা বিরাট ভস্ ভস্ শব্দে ঘর ভরিয়া গেল। পণ্ডিত সিমোডেরো ভগ্নস্বরে স্বগতোক্তি করিলেন, যাক্, সব শেষ।

ক্ষণকাল পরে নিখিল ফিরিয়া আসিল। কহিল, খবর দিয়ে এলাম, সংবাদ এতক্ষণ রাষ্ট্র হয়ে গেছে। ওরা ছুটে আসছে আপনার কাছে, খুব সম্ভব ধন্যবাদ দিতে।

সহসা পণ্ডিত সিমোডেরোর মুখ পাংশু হইয়া গেল। তাঁহার দেহ শুষ্ক ও ইজিপ্সীয় মোমির মত কুঞ্চিত হইতে লাগিল। নিখিল চীৎকার করিয়া উঠিল, এ কি, পণ্ডিত সিমোডেরো, আপনার মুখে ও কিসের কালিমা নেমে আসছে?

নিঃশ্বাস লইবার জন্য শেষ চেষ্টা করিতে করিতে পণ্ডিত সিমোডেরো জবাব দিলেন, মৃত্যুর কালিমা। একটা সত্য আমি বুঝিনি সিয়ানো, মরণকে জয় করা যায়, কিন্তু মানুষের অতৃপ্তিকে মানুষ জয় করতে পারে না।

রাষ্ট্রনেতার অকেজো ফুসফুস বায়ু গ্রহণ করিতে পারিল না। তাঁহার দেহ নিথর হইয়া গেল। সিয়ানো বিস্ফারিত দৃষ্টিতে মৃত্যুর বিস্ময়ের দিকে চাহিয়া রহিল।

জনতা আবার ফিরিয়া আসিল। তাহাদের মুখে রাষ্ট্রনেতার জয়ধ্বনি। হৈমন্তী তাহাদের সর্বাগ্রে। ঘরে প্রবেশ করিয়াই হৈমন্তী কহিল, আপনার সুমীমাংসায় উল্লসিত হয়ে আমরা আপনাকে ধন্যবাদ জানাতে এসেছি পণ্ডিত সিমোডেরো।

(শেষাংশ ৩২৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

পঙ্গু

অন্নপূর্ণা গোস্বামী

কি জানি কিসের মোহে বা কিসের আকর্ষণে যমুনা কিছুতেই ওর কুলিগিরি ছাড়তে পারতো না। যথেষ্ট উপার্জন করতে না পারলেও, স্টেশন সংলগ্ন ওদের বস্তি থেকে গাড়ির ঘণ্টা শুনতে পেলেই ও তার নীল রঙের কোর্তা চড়িয়ে স্টেশনে ছুটবে, সে হিমশীতল রাতই হোক আর বৃষ্টিপ্লাবিত দিনই হোক না কেন; এই নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দ্বন্দ্ব-কলহেরও অন্ত নেই।

চড়া গলায় পার্বতী বলে,—"এমন করে আমি আর আধ পেট খেয়ে শুখিয়ে মরতে পারব না; তুই বিড়ি খাস্, ধোঁওয়া ওড়াস্, ক্ষিদে-তেস্টা ভুলতে পারিস—কিন্তু—"

নির্লিপ্ত গলায় যমুনা উত্তর দেয়,—"জানিস তো আমি পঙ্গু, এক চোখ আমার কানা, এর বেশী রোজগার করবার ক্ষমতা আমার নেই, তা শোন্ না, তুই তামাক টান না, চালের খরচটা আরও কমবে—"

আরও রুখে উঠে পার্বতী বলে,—"পঙ্গু, পঙ্গু, পঙ্গু, আমার বাপ কি পঙ্গু দেখে তোর হাতে আমায় দিয়েছিল? ভাত দিতে পারিস না, বিড়ি-তামাক দিতে পারবি? পঙ্গু—"

আর একবার ঠোঁট দুটি বক্র করে পার্বতী উচ্চারণ করলো পঙ্গু—

এবার যমুনা ওর অন্ধ চোখটায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে একটু না হেসে পারলো না। সত্যি কথা, যমুনার বাপ কানা লোকের হাতে মেয়ে দেয়নি, তখন ও সবেমাত্র দেশ থেকে এসে সরকারী চাকরীতে ঢুকেছে, স্বাস্থ্য, সুন্দর চেহারা, রংও ফর্সা ছিল, এক মাথা ঝাঁকরা ঝাঁকরা চুল, সরকারী বাড়ি পেয়েছিল—।

হঠাৎ যমুনা উচ্চকণ্ঠে হা-হা করে হেসে ওঠে—সত্যি আজ সে পঙ্গু, এক চোখ ওর অন্ধ? কিন্তু সে দোষ কী ওরই সম্পূর্ণ? লাইন খালাসি ছিল সে, লাইনের আশে পাশে লাইনের কাজ সে করতো। হঠাৎ একদিন এক চলন্ত ইঞ্জিনের এক টুকরো জ্বলন্ত কয়লা ছিটকে এসে ওর চোখটা নষ্ট করে দিয়ে গেল, কানা লোক সরকারী কাজের যোগ্য নয়, চাকরী ওর খতম হয়ে গেল।

পার্বতী আবার বলে—"হাসছিস যে, সে তো আজ বছর দুই হয়ে গেল চাকরী তোর গিয়েছে, এখন ওদের গরজ, ডবল লাইন তৈরি হচ্ছে, কত লোক নিচ্ছে, মোটা মাইনে দিচ্ছে, র‍্যাশান দিচ্ছে,—এইতো বড়বাবুর চিঠি রয়েছে, টি আই সাহেবকে দেখালেই তোর চাকরী হয়ে যায়, কিন্তু সে তো তুই শুনবি না—"

যমুনা কিন্তু সে কথার কোনও উত্তর দেয় না, বলে—"হাসছি কেন জানিস, কলমের খোঁচা মেরে ওরা আমার চাকরী খতম করতে পারে, আর আমি আমার এই হাতের খোঁচায় ওদের জীবন খতম করতে পারি। লেখাপড়া শিখিনি বটে, রেলগাড়ি আর রেল লাইনের চোদ্দপুরুষ নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে জানি, ফিস্‌প্লেট আর পয়েণ্ট মুঠোয় রাখতে জানি—হিহি, হিহি, বাবু সাহেবরা যখন সেলুন গাড়ি চড়ে যাবে,—হিহি,—কাবার করতে পারি"—অদ্ভুত এক কণ্ঠস্বর ওর গলা চিরে যেন থেমে গেল, এক চোখের দৃষ্টিতে বিশ্বের আগুন যেন দপ্ দপ্ করে জ্বলতে লাগলো। ওর দিকে তাকিয়ে পার্বতী ভয় পেয়েছিল,—তাই আর কিছু সে বললো না।

এমনি বচসা ওদের নিত্য-নৈমিত্তিকের, কখনও হাসা-পরিহাসের মধ্যেও সমাপ্তি হয়।

যমুনা বলে, "সাহেবের ট্রলিআলার চাকরী পেয়েছি—কাল থেকে যেতে হবে, বুঝলি—?"

"বেশ তো" পার্বতী বলে,—"যাবি বইকি—" কথার মধ্যেই যমুনা বলে, "কিন্তু কানা লোক আমি, পঙ্গু তোর স্বামী ভুলিস না যেন, ঘুষ দিতে হবে স্ত্রীকে, সাহেবের অন্দরে আয়া হয়ে থাকতে পারবি তো?" রেগে ওঠে পার্বতী, মুখ ভার করে অন্য দিকে ফিরিয়ে নেয়। তবুও রসিকতা করে যমুনা বলে—"হিহি মন্দ কী? মেয়েছেলের ইজ্জত বেচে খাবো, মন্দ কি—"

সেদিনও এক প্রায় কুরুক্ষেত্র সৃষ্টি হয়েছিল আর কী, দুপুর বেলা শিলিগুড়ি প্যাসেঞ্জার ট্রেনখানা বেরিয়ে গেলে, যমুনা ঘরে ফিরলো, মাথায় এক ঝাঁকুনি দিয়ে বাবরী-ছাঁটা চুলগুলির মধ্যে থেকে ইঞ্জিনের কয়লা গুড়োগুলো ঝেড়ে ফেলে, ক্লান্ত ভঙ্গিতে মেঝেয় বসে, তেলচিটে গামছাখানা ঘুরিয়ে হাওয়া খেতে খেতে একটা আধুলি স্ত্রীর দিকে এগিয়ে দিয়ে বলে উঠলো,—বাসরে বাস—যুদ্ধ, যুদ্ধ, আর লড়াই লড়াই, প্যাসেঞ্জার গাড়িগুলো তো সব উঠে গেল, শুধু সৈনিক গাড়ি, আর কামান গাড়ি, প্যাসেঞ্জারখানা এল, তাও মিলিটারী ভর্তি হয়ে, এই পাট বোঝাই করে—"

ওর কথার মধ্যেই আধুলিটা ওর দিকে নিক্ষেপ করে পার্বতী বললে,—"তুই রোজগার করবি বলে লড়াই বন্ধ থাকবে, নয়? তুই ভাত খাবি, তাই গাড়ি ভর্তি লোক আসবে, লোকে ভাত পায়না গাড়ি চড়বে; এই ব্যাঙের আধুলিতে হবে কি? চাল টাকা টাকা সের, লবণ-তেলের হীরের দাম; এক পয়সার লাউ ছয় আনা, চিঁড়ে মুড়ি গুড়, তাই বা সাধ্য কার যে ছোঁয়—" এইবার পার্বতীর চোখ ফেটে জল বের হয়ে এল।

ওকে শান্ত করে যমুনা বললে, "কাঁদছিস কেন, ঢাকা মেলে দেখিস্ তুই, কমসে কম তিন টাকা তোকে এনে দেবই, বিকেল বেলা ভালো করে হাট করিস, এ বেলাটা ঘুমিয়ে নে, খিদে শুখিয়ে যাবে—"

পার্বতী তবুও ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বললো,—"তবুও তুই চাকরী করবি না, ডবল লাইন হচ্ছে, কত লোক নিচ্ছে, তা নয় তুই কিসের মোহে যে এই কুলিগিরিতে মজে আছিস, তা বুঝি না—"

মোহ বই কি, আকর্ষণ নয়তো কি? যমুনা তো একথা অস্বীকার করতে পারে না। তখন ওর চাকরী খতম হয়ে গেছলো, কানা এবং পঙ্গু বলেই ও সমাজে পরিচিত, উপার্জন করতে কুলির খাতায় নাম লিখিয়েছিল। জংসন স্টেশন, তিনদিকে লাইন, বিকেল বেলা একসঙ্গে তিনখানা গাড়ি একত্রিত হয়, এই সময় কুলিরা যা দু'পয়সা রোজগার করতে পারে। কিন্তু বুদ্ধিমান হিসেবী যাত্রীরা বড় একটা যমুনার দিকে চায় না, কানা কুলিকে হয়তো কেউ ভরসা করে মাল দিতে পারে না, যমুনা নিরাশ হয়ে একদিকে দাঁড়িয়ে থাকে। এই সময় একদিনের কথা, লাইন জুড়ে লম্বা কাটিহার গাড়ি এসে দাঁড়িয়েছে, কুলি, কুলি মুখর হৈচৈ পড়ে গিয়েছে, ভীড়ের মধ্যে থেকে একটি মেয়ে অঙ্গুলি সঙ্কেতে ওকে ডেকে ঢাকা গাড়িতে মাল তুলে দিতে বললো। মেয়েটি একা ছিল, বয়সও অল্প, তাই হয়তো ষণ্ডা-মার্কা চেহারার কুলিগুলোকে ভয় করেছিল। একথা সত্যি, যমুনা পঙ্গু হলেও ঈশ্বর ওকে কুলির চেহারায় তৈরি করেন নি, পাতলা একহারা ওর দেহের গঠন, বয়স অল্প, রংটাও একটু ফর্সা।

মেয়েটির ওই অনুকম্পা, সামান্য ওই সহানুভূতি ওর মনে বুঝি চির জাগরূক হয়ে রইল। সে কানা, সে পঙ্গু; বিশ্বাস ওকে কেউ না করলেও নারী-সমাজে ও বরণীয় বৈকি! সেই থেকে মেয়ে-কামরা প্রান্তেই ওর অবাধ গতিবিধি,

মেয়েরা ওকে বিশ্বাসের সঙ্গে সমাদর করে, একদৃষ্টি ওর পঙ্গু বলে অনুকম্পাও করে, আবার অনেকে গল্প শুরু করে দেয়। শিক্ষয়িত্রী ও ছাত্রী সংখ্যাই বেশী, তাই মফঃস্বলের স্কুল-কলেজগুলির বন্ধ এবং খোলার মরশুমেই যমুনা দু'পয়সা উপার্জন করে। কুলিগিরি ও ছাড়তে পারে না, বোধ হয়, বেদনা দিনের এই গৌরব সে ভুলতে পারে না। এই আনন্দ ওর জীবনে মোহ কি আকর্ষণ, সে বোধ হয় জানে না। ও জানে বোধ হয় ওর এক স্বপ্ন-সুন্দর কাহিনীর মধুরতম অধ্যায়।

ওকে নিরুত্তর দেখে পার্বতী আবার বললে, "মাস্টারবাবুর চিঠিখানা টি আই সাহেবকে দিলেই কিন্তু, যুদ্ধ থেমে গেলে চাকরী চলে যাবে, এখন তো দুদিন না খেয়ে আর শুখিয়ে মরতে হয় না—"

সে কথার উত্তর দেবার যমুনার আর অবসর ছিল না,—ঢাকা, এলাহাবাদ প্রভৃতি গাড়ির ঘণ্টা বেজে উঠতেই ত্রস্ত হয়ে সে স্টেশন অভিমুখে দৌড় দিল। বিদ্যা-নিকেতনগুলির বন্ধের মরশুম তখন পড়েছে, প্রবাসী ছাত্রী-শিক্ষয়িত্রী গৃহে ফিরবে, ও কিছু উপার্জন করতে পারবে। কিন্তু এখন যে পলে পলে পৃথিবীর পট-পরিবর্তন হচ্ছে, যমুনার তো সে কথা জানা নেই, তাই মেয়ে কামরাগুলি প্রায় শূন্য হয়েই স্টেশনে গাড়ি এসে দাঁড়ালো। অর্থাভাবে হয়তো কত মেয়ে বিদ্যাভাস ছেড়েছে, কত শিক্ষয়িত্রী এ আর পি, সরবরাহ বিভাগ, নার্সিং প্রভৃতি যুদ্ধসংক্রান্ত ব্যাপারে চাকরী নিয়ে অন্যত্র চলে গিয়েছে। এ ছাড়া নারীর সম্ভ্রম রয়েছে, প্রচুর সৈনিকের আনাগোনা, তাই মেয়েদের সঙ্গে পুরুষ-অভিভাবক রয়েছে: হিসেবী পুরুষ, অভিজ্ঞ পুরুষ, পঙ্গু কুলির দিকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে তাকিয়ে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

যমুনার পাশেই এক বিচক্ষণ ব্যক্তির সঙ্গে এক কুলির মাল বহন নিয়ে বচসা বেধে-ছিল। জিনিসপত্রের দর ছয়গুণ বেড়েছে, কুলির রেট একগুণ; কুলিকে একটা পয়সা দিতে লোকে একশ' কথা ব্যয় করে; বাবুটি তখন কুলিকে বলছেন,—"জানিস, পাঞ্জাবের কুলির শক্তি কত, তারা পিঠে মাল বয়, মাথায় কাঁধে—"

সঙ্গে সঙ্গে কুলি উত্তর দেয়,—"সে বাবু তোমার দেশের জল-হাওয়ার দোষ,—আমি যখন দ্বারভাঙা থেকে আসি—"

ইত্যবসরে চিল যেমন কাকের মুখ থেকে খাদ্য ছিনিয়ে নেয়, যমুনা তেমনি করে তার মালগুলি মাথায় তুলে নিয়ে বললো,— "চলো বাবু, দু'আনাতেই যাবো আমি—"

"তুই পারবি তো রে, লোকসান করবি না তো?" বাবুটির সতর্কবাণী সমাপ্ত হবার আগেই যমুনা অনেকটা দূর এগিয়ে গিয়েছে, সে আজ বুঝি মরিয়া হয়ে উঠেছে, নিজের অন্ধত্ব ও পঙ্গুত্বকে কিছুতেই স্বীকার করবে না।

অনেকটা সময় অতিক্রম করেছে। তিন টাকা নয়, তিন গণ্ডা নয়, সম্বল ওই দুই গণ্ডা পয়সাই যমুনা উপার্জন করেছে। গাড়িগুলি প্রায় সব বেরিয়ে গিয়েছে, প্ল্যাটফরম শূন্য, যমুনাও শূন্য মনে ওর সম্মুখস্থ পথের দিকে তাকিয়ে রইল। সেখানে তখনও ডবল লাইন তৈরির কাজ পূর্ণোদ্যমে চলছে, কত জন-মজুর খাটছে, মাটি বোঝাই, লাইন পাতা, পুরানো সিগন্যাল উঠিয়ে নূতন সিগন্যাল বসানো, এমনি কত কাজ, নিরন্তর কাজ; এক মুহূর্তে ট্রেন চলাচল বন্ধ হবে না, সৈনিক যাবে, মাল যাবে, কামান যাবে; এইমাত্র বড়-সাহেবরা সূক্ষ্ম দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কাজকর্ম পরিদর্শন করে ফিরে গেলেন।

এইমাত্র গ্রেনসপের মালগাড়ি এসে যমুনার সম্মুখে দাঁড়াল। চাল, আটা, লবণ, তেল বোঝাই গাড়ি,—টেলিগ্রামের তারে যেন খবর ছড়িয়ে পড়লো, বস্তা, টিন প্রভৃতি নিয়ে দলে দলে রেলের কর্মচারীরা ওই প্রান্ত মুখরিত করে তুললো। বিরত হয়ে মাঝে মাঝে র‍্যাশানবাবু ধমক দিয়ে উঠছিলেন।

র‍্যাশানের চালগুলি দেখে যমুনা বুঝি সত্যি আর লোভ সংবরণ করতে পারলো না, ও ঠিক করে ফেললো ডবল লাইনের চাকরী ও নেবে, চাকরী যখন চলে যাবে, লাইন তৈরি যখন শেষ হবে, ওর পঙ্গুত্বের বেদনা ওর বুকে শেল বিদ্ধ করবে ও জানে, তবু না করে উপায় নেই—এই দুই গণ্ডা পয়সা নিয়ে ও পার্বতীর সামনে কী করে যাবে? না সে কিছুতেই পারবে না। পার্বতীর কাপড় শতচ্ছিন্ন হয়েছে, সে বলেছিল, মেয়ে-ছেলের ইজ্জত বেচতে পারিস না, রাখতেও তো জানিস না,—এই কাপড় কোনখানে পরবো। যে উপায়েই হোক, যমুনা রাত্রিরে বেশী কিছু রোজগার করবেই—এখন ও ঘরে ফিরবে না।

তখন প্রায় সন্ধ্যে হয়ে এসেছিল, ও প্ল্যাটফরমের একপ্রান্তে আপাদমস্তক মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লো। অজান্তে নিদ্রা চোখ দুটি ভরে নেমে এল। যখন ওর ঘুম ভাঙলো, রাত্রি তখন গভীর হয়েছে, চতুর্দিকে থমথম করছে অন্ধকার, জ্যোৎস্না নেই, একটা নক্ষত্র পর্যন্ত নেই আকাশে, কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি, ব্ল্যাকআউটের রাত্রি যেন প্রেতপুরীর মধ্যে তার আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। স্টেশনের বাতিগুলো কালো আবরণে মুখ ঢেকে মিটমিট করে জ্বলছে, দূরে সিগন্যালের লাল-সবুজ-সাদা নানা রঙের আলো, প্রান্তরে জোনাকীগুলো ঝিকমিক করছে, যেন অশরীরী আত্মাগুলোর চোখ ওই প্রেতপুরীর মধ্যে দপদপ করে জ্বলছে। কিছুক্ষণ আগে আসাম মেল এসে দাঁড়িয়েছে, আরও কিছুক্ষণ দাঁড়াবে, তাই যাত্রীর ত্রস্ত আনাগোনা নেই, টর্চবাতি জেবলে কয়েকজন গাড়ির কামরা খুঁজছে, কয়েকজন অকারণ পায়চারী করছে। যমুনা খানিকক্ষণ এদিক ওদিক ঘোরাফেরা করে একটি ভদ্রবেশী যুবকের কাঁধের উপর যেয়ে একখানি হাত রাখলো। লোকটা পেশাদার গুণ্ডা, পকেটমারা, গুণ্ডামারা, এই তার জীবিকা অর্জনের সহজ পথ, যমুনা ওকে জানে, স্টেশনে পুরস্কার ঘোষিত করা রয়েছে যে, ওকে ধরিয়ে দিতে পারবে, মোটা অঙ্কের টাকা পাবে, কিন্তু যমুনা বলে না, অথচ তার অংশীদারও হতে চায় না, আজ সে নিরুপায়—স্ত্রীর আবরু চাই,—বস্ত্র চাই, পার্বতীর ইজ্জত ওকে রক্ষা করতেই হবে। গুণ্ডাটি অত্যন্ত সহজভাবে ওর হাতের মধ্যে কয়েকটি টাকা গুঁজে দিয়ে ফিসফিস করে বললো—"মাঝে মাঝে আসিস, অভাব যখন পড়েছে—" গাড়ি ছেড়ে দিয়েছিল, ও লাফ দিয়ে একটি কামরায় চড়ে পড়লো।

স্ত্রীর বস্ত্রের সংস্থান যমুনা করেছে, এইবার ওকে উদরের ব্যবস্থা করতে হবে, প্রায় তিনদিন ভাত ওরা খায়নি, রোজগারের সহজ পথ সে জানে, একান্ত নিরুপায় সে যতক্ষণ হয়নি, ততক্ষণ যায়নি। ইঞ্জিনের জ্বলন্ত কয়লায় ও তার দৃষ্টি হারিয়েছে, পঙ্গু হয়েছে, চাকরীর অনুপযুক্ত বলে বিবেচিত হয়েছে, তবু বিবেকের সম্মান সে রক্ষা করেছে। হৃদয় বিসর্জন দেয়নি। কিন্তু হৃদয়, বিবেক, অন্তর এগুলি নিয়ে কারবার করতে ও আজ একান্ত অক্ষম, অভাবের নিষ্পেষণে আর সংঘর্ষে ও আজ শয়তান হয়েছে। একান্ত পরিচিত পথ, প্ল্যাটফরমের শেষ প্রান্তে পেঁছে ও দেখলো—অগুণতি বস্তা-বোঝাই চাল রয়েছে, কোনও মারোয়াড়ীর সম্পত্তি মাল-গাড়িতে চালান যাবে, কয়েকজন কুলি বস্তার আড়ালে বসে, টিমটিমে এক আলোর সাহায্যে প্রত্যেকটি বস্তা খুলে খানিকটা করে চাউল বের করে নিয়ে আবার বস্তার মুখ সেলাই করে দিল। নিঃশব্দে তারা এই কার্য সম্পন্ন করলো, যমুনাও নিঃশব্দে তার গামছা পেতে দিল। একটা কুলি ওকে চাল বিতরণ করতে করতে বললো—"কি রে যমুনা— সাধুগিরিতে আর পেট চললো না বুঝি?"

যমুনা সে কথার উত্তর দিল না।

তখন প্রায় ভোর হয়ে এসেছে, ঘরের দিকে ফিরতে ফিরতে যমুনা দেখলো অফিস ঘরের পিছনে, সহকারী স্টেশন মাস্টারের সঙ্গে এক মৎস ব্যবসায়ীর বাকবিতণ্ডা চলছে, সম্মুখে কেরোসিন তেলের টিন ভর্তি প্রচুর কই মাছ রয়েছে। যমুনা

ব্যবসায়ীটিকে ধমক দিয়ে বলে উঠলো,—"কেন বকাবকি করিস বাবুর সাথে, মাছ আটক থাকলে তোর কী বেশী লাভ হবে?" শুই বলে সে তার উত্তরের কোনও অপেক্ষা না করে, টিনের মধ্যে হাত চালিয়ে দিয়ে কতকগুলো মৎস বের করে তার বাবুকে দিয়ে নিজেও কয়েকটা নিয়ে হাঁটতে শুরু করে দিল।

আজ যমুনার মনে খুশি আর ধরে না, উল্লাসের অন্ত নেই, প্রচুর আজ ও রোজগার করেছে, পার্বতী আর ওর উপর আজ রেগে উঠবে না।

সত্যি, জিনিসপত্র, নগদ টাকা পেয়ে পার্বতী প্রচুর খুশি হয়েছিল। তখন সে তিন দিন উপবাসের পর ভাত চড়াতে ব্যস্ত, উনুনের ভিতর খাড়ি দিতে দিতে কৃত্রিম ক্ষুণ্ণ গলায় একবার বললো,—"যাদের জিনিসগুলো চুরি করে আনলি, ছিনিয়ে নিলি, তাদের যে লোকসান হোল—"

"ইস্, লোকসান—" বঁটি পেতে কইমাছগুলো যমুনা কুটছিল, অবজ্ঞা ভরে বলে উঠলো, "ওদের কত রয়েছে, আমরা কি না খেয়ে মরবো নাকি?

"কিন্তু সিপাহী তো তা শুনবে না, ইংরেজ রাজ তো তা মানবে না; যদি ধরা পড়তিস হাজতে বাস যে—" এবার পার্বতী রীতিমত কেঁপে উঠে ভয়-বিবর্ণ মুখে বললো—"না—না, তুই আর এসব কাজ করিস নি, এইতো এই চিঠিখানা নিয়ে যা, এখুনি তোর চাকরী হয়ে যাবে—"

এবার একটু গম্ভীর গলায় যমুনা উত্তর দিল,—"পার্বতী, তুই আমায় বলিস নে, চাকরী আমি করতে পারবো না, আজ আমি পঙ্গু, আমার এক দৃষ্টি অন্ধ, আমি কাজের অনুপযুক্ত; কিন্তু সে আমি কার জন্যে হয়েছি তুই বল? তারপর আবার আমি ডবল লাইন তৈরি করতে লেগে যাব, লাইন তৈরি হয়ে যাবে, আমার কাজও খতম হবে; কিন্তু যখন ওই নতুন লাইন দিয়ে গাড়ি চলাচল করবে, দলে দলে সৈনিক যাবে, মাল যাবে, সে কথা যে আমি কিছুতেই সইতে পারি না রে সইতে পারি, না, আমার বুকের ভেতর ভেঙে খান্ খান্ হয়ে যায়—ওই লাইনের মিস্ত্রি ছিলুম আমি, আজ আমি পঙ্গু, আজ আমি অন্ধ—". বলতে বলতে যমুনা হঠাৎ থেমে যায়, ওর অঙ্গুলির এক ক্ষতস্থান দিয়ে রক্ত পড়তে শুরু করে, ও মাছকোটা স্থগিত রেখে ওই স্থানটা চেপে ধরে।

পার্বতী এগিয়ে এসে বলে—"হাত কেটে ফেললি বঁটিতে—ইস্, রক্ত কত—" ও খানিকটা ধুলো দিয়ে রক্ত বন্ধ করতে মন দিল।

যমুনা বললো,—"বঁটিতে কাটবো কেনরে, সে এক ভাঙা টিনের মধ্যে মাছগুলো ছিল, জোর করে বের করতে গিয়ে হাতটা কেটে গেছলো, এখন চোট লেগে আবার রক্ত পড়ছে,—দূর ছাই, আমি আর ওসব ছোট কাজ করতে পারবো না, দে তুই মাস্টারবাবুর চিঠি,—আজই আমি বিকেলবেলা টি-আই সাহেবের সেলুনে দেখা করবো।

পার্বতী খুশি হয়ে কতদিনের সযত্নে রক্ষিত চিঠিখানা স্বামীর হাতে এনে দিল, যমুনার ক্ষত স্থান থেকে ঝরে কয়েক ফোঁটা যে রক্ত মেঝেয় পড়েছিল,—ও তার মধ্যে নিজের স্বপ্ন-সৌধখানি হয়তো বা দেখতে পেলো,—সত্যি হাতের চুড়ি কয়গাছা ওর একেবারে ক্ষয় হয়ে গিয়েছে যে—

যথাসময় যমুনা স্টেশনে এসেছিল। দার্জিলিং মেল এসে লাইন জুড়ে দাঁড়াল, ইঞ্জিনের সঙ্গে টি-আই সাহেবের সেলুন সংযুক্ত রয়েছে। ঝকঝকে তকতকে সেলুন, ভৃত্য-কামরা থেকে ধবধবে সাদা পাগড়ী বাঁধা বেয়ারা জানালায় ঝুঁকেছে। তারই হাতে চিঠিখানা দিতে যমুনা সেইদিকে এগিয়ে গেল। মহিলা কামরা সে অতিক্রম করতে দেখতে পেলো,—দরজার প্রান্তে একটি তরুণী মেয়ে বিহ্বলের মত দাঁড়িয়ে রয়েছে, যেন কোনও দুঃসংবাদ পেয়েছে এমনি তার ভাবখানা আন্মনা অথচ চঞ্চল,—কুলিকে ও ডাকছে, কিন্তু গলার স্বর অস্ফুট। যমুনা বললো,—"মাল নামিয়ে নি মেম সাহেব,—মাল নামাই—"

হ্যাঁ নামিয়ে নে,—আসামের গাড়িতে তুলে দে—"

যমুনা মেয়েটির মালপত্র আসাম অভিমুখী গাড়িতে তুলে দিয়ে দেখলো, দার্জিলিং মেল ছেড়ে দিয়েছে। একটি দুই আনি জামার পকেটে রেখে, টি-আই সাহেবের চিঠিখানা টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে ভাবলো—চাকরী সে কিছুতেই করতে পারবে না,—ওর তৈরী নূতন লাইনের উপর দিয়ে হু হু করে রেলগাড়ি যাবে না তো, ওরই বুক দলিত করে যে চলে যাবে; ও পঙ্গু, ও অন্ধ, স্থায়ী চাকরী করিবার যোগ্য ও নয়, এই কথাই তখন কি শুধু ভাবিবে—দপ্ দপ্ করে আগুনের মত যমুনার এক চোখের উজ্জ্বল দৃষ্টি জ্বলতে লাগলো,—অন্ধ চোখের সাদা মণিটা আরও কুৎসিত দেখাচ্ছিল। টুকরো চিঠিখানা তখন এক চলন্ত ইঞ্জিনের চাকার তলায় নিষ্পেষিত হয়ে গিয়েছে,—তার মধ্যে পার্বতীর অন্তহীন আশা আকাঙ্ক্ষা চির সুপ্ত হয়ে রইল।

মনসা

(৩৪২ পৃষ্ঠার পর)

ধীরকণ্ঠে সিয়ানো কহিল, পণ্ডিত সিমোডেরো আর নেই।

—নেই! নেই কি?

—আপনাদের দাবী নিঃশেষে মিটিয়ে দিয়ে তিনি বিদায় নিয়েছেন। শুধু তাই নয়, পৃথিবীতে আজ আর দ্বিতীয় ব্যক্তি নেই যে তাঁর আবিষ্কৃত এই গ্যাস আবার প্রস্তুত করতে পারে।

—নেই!

সহসা হৈমন্তী নীচু হইয়া সিমোডেরোর শবের উপর ঝুঁকিয়া পড়িল। তারপর তাঁহার শীতল কঠিন দেহে ধীরে ধীরে নাড়া দিয়া কোমল স্ত্রীসুলভ স্বরে ডাকিতে লাগিল। পণ্ডিত সিমোডেরো,—পণ্ডিত সিমোডেরো।—মহা-অস্তি না মহা-নাস্তি?

সমাজের উপর দুর্ভিক্ষের প্রতিক্রিয়া

শ্রীসুশীলকুমার বসু

১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগে বাঙলায় যে সর্বধ্বংসী ভয়াবহ অবস্থা দেখা দিয়াছিল, আজও তাহার অবসান হয় নাই। আমন ধান উঠায় অবস্থার সামান্য আপেক্ষিক উন্নতির ফলে আমাদের মনে যে আশা ও সোয়াস্তির ভাব দেখা দিয়াছে, তাহাতেই আমরা মনে করিতেছি যে বিপদ কাটিয়া গিয়াছে, অন্তত বিপদ উত্তীর্ণপ্রায়। কিন্তু দুর্ভিক্ষের অনুগামী মহামারীর কথা বাদ দিলেও, খাদ্যাভাবজনিত দুরবস্থারও অবসান হয় নাই। চাউলের দুষ্প্রাপ্যতা কিছু কমিয়াছে বটে, কিন্তু তাহার যে মূল্য আজও রহিয়াছে (এমনকি, সরকারী নিয়ন্ত্রিত মূল্যও), তাহা সাধারণভাবে লোকের আর্থিক সামর্থ্যের বাহিরে। চাউলের মূল্য যদি লোকের আর্থিক সামর্থ্যাতীত হয়, তাহা হইলে কার্যক্ষেত্রে সুপ্রাপ্যতা ও দুষ্প্রাপ্যতার মধ্যে বিশেষ কিছু পার্থক্য থাকে না। সুতরাং একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে যে দুরবস্থার আরম্ভ হইয়াছে, আজও তাহার অবসান হয় নাই এবং একথাও নিঃসংশয়ে বলিবার মত অবস্থায় আমরা উপনীত হইতে পারি নাই যে, ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দে আরও অধিকতর সঙ্কট আমাদের জন্য অপেক্ষা করিয়া নাই।

এই বিপদের মধ্যে দাঁড়াইয়া এবং ভবিষ্যতের জন্য শঙ্কার বোঝা বহন করিয়া আমাদের ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ নির্ণয় করিতে যাওয়া নিতান্তই মূঢ়তা মাত্র। এই দুর্ভিক্ষ আমাদের অর্থনীতিক কাঠামোকে বিপর্যস্ত করিয়া দিয়াছে, সমাজের সংগঠনের উপর মারাত্মক আঘাত দিয়াছে এবং জাতীয় স্বাস্থ্যকে বহু দিনের জন্য পঙ্গু করিয়া দিয়াছে। বাঙলার পল্লীকে ইহা জনবিরল, স্বাস্থ্যহীন, সম্পদহীন করিয়া দিয়াছে। কিন্তু এই সকল সমস্যা এত বৃহৎ এবং ইহার প্রকৃতি ও পরিমাণ এত বিপুল ও এত অজ্ঞাত যে, আজও ইহার ফলাফল ও পরিণতি নির্ণয়ের চেষ্টা দুঃসাধ্য। তাহা হইলেও, সমাজের উপর দুই একটি ছোটখাট প্রতিক্রিয়ার কথা আলোচনা করিয়া দেখা যাইতে পারে। অবশ্য, ছোট হইলেও তাহা কম শোচনীয় অথবা তাহার ফল কম দূর-প্রসারী নহে।

সমগ্র বাঙলার কথা ধরি[illegible]. এদেশে হিন্দু ও মুসলমান অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় সমান বলা যাইতে পারে। একথা ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে, উভয় সম্প্রদায়ই অনেকটা সমভাবে পীড়িত হইয়াছেন এবং উভয় সম্প্রদায়ের ক্ষতির পরিমাণও অনেকটা এক-প্রকার হইবে। লোকক্ষয়, সম্পত্তিনাশ, স্বাস্থ্যনাশ প্রভৃতির কথা ধরিলে উভয় সম্প্রদায়ের ক্ষতির পরিমাণ হয়ত সমানই হইবে। অভাব ও দুর্গতিও উভয় সম্প্রদায়কে সমভাবে ভোগ করিতে হইয়াছে। কিন্তু অনেক ব্যাপারেই উভয় সম্প্রদায়ের উপর ইহার প্রতিক্রিয়া সমান হইবে না।

কথাটা আরও একটু বিস্তৃত করিয়া বলা যাইতে পারে। এই দুর্ভিক্ষের এক প্রধান বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে, সর্বশ্রেণীর লোক ইহাতে সমভাবে পীড়িত হয় নাই। দুর্ভিক্ষে খাদ্যদ্রব্যেরই অভাব হয় এবং এদেশ কৃষি-প্রধান উৎপাদনকারী দেশ; সুতরাং ভূমির সহিত যাহাদের সম্পর্ক নাই, এমন লোক-দেরই সর্বাপেক্ষা অধিক অসুবিধা হইবার কথা। কিন্তু যুদ্ধ প্রচেষ্টার ফলে ভূমির সহিত সম্পর্কহীন বহুলোকে নানাভাবে কর্মে নিযুক্ত হইয়াছেন; এই সুযোগে নানাবিধ ব্যবসায়ে জীবিকার্জন করিবার সুযোগ বহু লোকের হইয়াছে। ভূমিহীন কৃষকদের একাংশ এবং নিম্ন মধ্যবিত্তদেরও এক বৃহৎ অংশ এই সকল প্রচেষ্টার সহিত নানাপ্রকারে সংযুক্ত আছেন। কিন্তু ইঁহাদের মধ্যে যাঁহারা গ্রামেই রহিয়া গিয়াছিলেন তাঁহারা পরিত্রাণ পান নাই।

গ্রামে আর এক শ্রেণীর লোক আছেন, ভূমির সহিত যাঁহাদের সম্বন্ধ খুবই অল্প, অথচ যাঁহারা নানা ছোটখাট ব্যবসা, কুটীর-শিল্প এবং বৃত্তিমূলক কার্যের দ্বারা জীবিকানির্বাহ করিতেন। ইঁহাদের সংখ্যা নিতান্ত কম নহে। কর্মকার, কুম্ভকার, প্রামাণিক, মৎস্য ব্যবসায়ী, তন্তুবায়, ছোট ছোট দোকানদার, ব্যাপারি প্রভৃতি লোকেরা এই শ্রেণীর অন্তর্গত। ভূমিহীন কৃষকদের একাংশ যদিও দুর্দিনের আগমনে জীবিকার আশায় গ্রাম ত্যাগ করিয়াছিল—এই সকল শ্রেণীর কম লোকেই জীবিকার্জনের জন্য এই সময়ে গ্রামত্যাগে সমর্থ হইয়াছে। পরে অবশ্য দুঃস্থ হিসাবে গ্রামত্যাগে বাধ্য হইলেও জীবিকার সন্ধানে ইহারা প্রথমে বাহির হইতে পারে নাই। তাহার প্রথম কারণ, ভূমিহীন কৃষকদের ন্যায় ইহারা অনেকেই কঠিন শারীরিক শ্রমে অভ্যস্ত নহে। দ্বিতীয়, বিশেষ বিশেষ কার্যে ইহাদের নৈপুণ্য ও দক্ষতা সংশয়াতীত হইলেও সাধারণ কার্যের যোগ্যতা ও অভ্যাস ইহাদের নাই। দুর্ভিক্ষে সম্ভবত ইহারাই সর্বাপেক্ষা অধিক পীড়িত হইয়াছে। দুর্ভিক্ষপীড়িত স্থানসমূহ যাঁহারা পরিদর্শন করিয়াছেন তাঁহাদের একাধিক ব্যক্তি, নমঃশূদ্র, জেলে, যোগী, তন্তুবায়, কর্মকার, কুম্ভকার প্রভৃতি জাতীয় লোকদের প্রায় নিঃশেষ হইয়া যাইবার কথা বলিয়াছেন। অনেকের অনুমান ইহাদের অর্ধেক হইতে তিন চতুর্থাংশ লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। সঠিক সংখ্যা যাহাই হোক, ইহাদের মধ্যে লোকক্ষয়ের অনুপাত যে মারাত্মক তাহাতে মতদ্বৈধ নাই।

সম্প্রদায় হিসাবে বিচার করিলে ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে পশ্চিম বঙ্গের হিন্দু এবং পূর্ব ও উত্তরবঙ্গের মুসলমান এবং সমগ্র বঙ্গে মুসলমানের সংখ্যা অধিক। আবার অন্যপক্ষে ব্যবসায়ী ও শিল্প প্রভৃতি শ্রেণীর লোকের মধ্যে সর্বত্রই হিন্দুর সংখ্যা অধিক। উভয় সম্প্রদায়ের আনুপাতিক সংখ্যা নির্ণয় এই আলোচনার উদ্দেশ্য নহে; উভয় সম্প্রদায়ের উপর ইহার বিভিন্ন প্রকার প্রতিক্রিয়ার কথাই আলোচনার বিষয়।

সামাজিক সংগঠনের দিক দিয়া বলা যায় যে, বিভিন্ন শ্রেণীর এবং বিভিন্ন বৃত্তির মুসলমানেরা (ভূমিহীন কৃষক, শিল্পী প্রভৃতি) একই বৃহৎ অখণ্ড সমাজের অন্তর্ভুক্ত। এই সমাজের উপর যে আঘাত পতিত হইয়াছে, বৃহৎ সমাজের মধ্যে তাহা ভাগ হইয়া যাইবে এবং কোনও এক স্থানে তাহা গভীর ক্ষত উৎপাদন করিবে না। লোকক্ষয়ের জন্য যে সকল সামাজিক বৈষম্যের সৃষ্টি হইয়াছে, বৃহৎ সমাজের মধ্যে তাহার কুফল বিশেষভাবে অনুভূত হইবে না এবং কালক্রমে সমাজ এই ধাক্কা সামলাইয়া লইতে পারিবে। ভূমিহীন মুসলমান কৃষকেরা সকলেই এক জাতির লোক এবং ভূমি বিশিষ্ট মুসলমান কৃষক এবং অকৃষক মুসলমানদিগের সহিতও তাঁহাদের কোন পার্থক্য এই দিক দিয়া নাই। লোকক্ষয়ের ফলে স্ত্রী পুরুষের আনুপাতিক সংখ্যার বৈষম্যের জন্য যে অসুবিধা হইবার কথা তাহাও বৃহৎ সমাজের মধ্যে অনুভব করা যাইবে না। বিধবা বিবাহের প্রচলন থাকায় এই দুর্যোগে যে সকল নারী স্বামীহারা হইয়াছেন তাঁহারাও সমাজের পক্ষে বিশেষ কোন সমস্যার সৃষ্টি করিবেন না।

কিন্তু হিন্দু সমাজের অবস্থা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। মুসলমান সমাজের ন্যায় হিন্দু সমাজ অখণ্ড ও অবিভক্ত নয়। বহু জাতি

উপজাতিতে এই সমাজ বিভক্ত এবং বিবাহাদির ব্যাপারে সঙ্কীর্ণতা এত বেশী যে এক জাতির মধ্যেও এই ব্যাপারে বহুবিধ বিধিনিষেধ রহিয়াছে। হিন্দু সমাজের যে সকল লোকের উপর এই আঘাত পড়িয়াছে তাঁহারা ভূমিহীন কৃষক হোন বা শিল্পী অথবা ব্যবসায়ী হোন, তাঁহারা এক জাতির লোক নন। তাঁহারা বিভিন্ন জাতি এবং উপজাতিতে বিভক্ত এবং ইঁহাদের বৈবাহিক গন্ডীগুলি খুবই ক্ষুদ্র। সুতরাং যেস্থানে যাঁহারা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন, সেখানে তাঁহাদিগকে এককই ইহার বোঝা বহন করিতে হইবে। ক্ষুদ্র জনসমষ্টির মধ্যে আবদ্ধ থাকায় আঘাতের যে ক্ষত তাহাও মারাত্মক আকারে দেখা দিবে। হিন্দু শিল্পী জাতিগুলির ভিতর লোকক্ষয়ের অনুপাতও অত্যন্ত অধিক। এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের মধ্যে স্ত্রী পুরুষের আনুপাতিক বৈষম্য বিবাহাদি ব্যাপারে ইহার পূর্বেই নানা অসুবিধার সৃষ্টি করিতেছিল। এই সকল অসুবিধা বর্তমানে আরও বহুগুণ বৃদ্ধি পাইবে। শিশুমৃত্যুর ফলে কয়েক বৎসর পরে এই সমস্যা আরও তীব্রতর হইবে। সমাজের এই সকল গন্ডীর মধ্যে যে বিপর্যয় দেখা দিবে তাহা ইহাদিগকে ধীরে হইলেও নিশ্চিত গতিতে ধ্বংসের দিকে লইয়া যাইবে। একদিন দুর্ভিক্ষের অবসান হইবে এবং যাহারা বৃহৎ সমাজের আশ্রয়ে থাকিবার সুবিধা পাইবে সেদিন তাহাদের অঙ্গ হইতে ইহার ক্ষতচিহ্ন সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। কিন্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গন্ডীর মধ্যে যাহারা আবদ্ধ, দুর্গতি অপঃসৃত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহারা পরিত্রাণ পাইবে না—আত্মরক্ষার জন্য তাহাদিগকে অনেক জটিল সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইবে। অনেকগুলি জাতির মধ্যে অত্যধিক লোকক্ষয়ের ফলে চারিপাশে মানব সমাজের বিপুল আবর্তের মধ্যে তাহাদের প্রলয়ান্ত পৃথিবীর অবশিষ্ট কয়েকটি প্রাণীর ন্যায় দুর্বহ জীবনযাপন করিতে হইবে এবং ইহার প্রতিবিধানের কোন ব্যবস্থা না হইলে একদিন বিলুপ্ত হওয়া ব্যতীত তাহাদের আর উপায়ান্তর থাকিবে না। ইহাদের মধ্যে যে লোকক্ষয় হইয়াছে, শিশুমৃত্যু হইয়াছে, বৃহৎ সমাজের আশ্রয় ব্যতীত তাহার ক্ষতিপূরণ সম্ভব নহে। স্ত্রী পুরুষের বৈষম্য ব্যতীত এই দুর্যোগের সময় বহু পুরুষ তাঁহাদের স্ত্রী হারাইয়াছেন, আবার বহু নারী তাঁহাদের স্বামী হারাইয়াছেন। মুসলমান সমাজে বিধবা বিবাহের প্রচলন থাকায় তথায় এ ব্যাপারে বিশেষ কোন সামাজিক বৈষম্যের সৃষ্টি হইবে না। কিন্তু হিন্দু সম্প্রদায়গুলির ভিতর এ বিষয়ে সামাজিক সাম্য স্থাপিত হইবার উপায় নাই। বহুলোকের জীবনের ব্যক্তিগত ট্রাজেডি ব্যতীত সমাজক্ষয়কর ব্যাধিরূপে ইহা সমাজের জীবনীশক্তি ক্ষয় করিতে থাকিবে। তাহা ব্যতীত যে সকল নারী দুর্ভিক্ষের সময় দুর্বৃত্তের হস্তে পতিত হইয়াছেন অথবা বিপথগামিনী হইতে বাধ্য হইয়াছেন তাঁহাদের যথাসম্ভব স্ব-স্ব স্থানে এবং স্ব-স্ব গৃহে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা অপরিহার্য সামাজিক কর্তব্য। এ কার্যও সম্ভবত মুসলমান সমাজ অপেক্ষা হিন্দু সমাজের পক্ষে কঠিনতর হইবে এবং অনেক ক্ষেত্রে অসম্ভব হইবে। দুর্ভিক্ষের নানা কুফল এবং তাহার প্রতিকারের উপায়ের কথা যখন চিন্তা করা হইতেছে তখন জাতিধর্ম নির্বিশেষে সমাজহিতৈষীরা কতকগুলি লোকের এই নিতান্ত জটিল সমস্যা এবং দুর্বিসহ দুঃখের বিষয় চিন্তা করিয়া দেখিবেন আশা করা যাইতে পারে।

ঋণ দিতে হবে

শ্রীরণজিৎকুমার সেন

এখনো অনেক মৃত্যু ঋণ দিতে হবে,
ঋণ দিতে হবে মৃত্যু দেহ ও মনের;
    বিক্ষুব্ধ এ সভ্যতার বুভুক্ষা কঠিন।
ভেবেছ কি বন্ধু তুমি তন্দ্রাতলে র'বে?
শোনো ঐ বাণী জাগে কোটি মানবের—
    —'বলি হ'য়ে আছি মোরা নিত্য অনুদিন।'
নগরের পথে পথে জনতার ভিড়,
তোলো বন্ধু বাসরের শয্যা তোলো তব;
    শতাব্দীর রথচক্র মহা দ্রুতগামী।
রাজ্যসুখ স্বপ্নসুখ ভেঙে ফেল নীড়,
'আমিত্ব' কোথায় চেয়ে দেখ' আজি তব;
    ঘন হয়ে' আসে রাত্রি আসে মৃত্যু নামি'।
এখনো অনেক বাকী অনেক জীবন,
বিক্ষুব্ধ এ সভ্যতার মেটেনি যে ক্ষুধা;
    মহাযজ্ঞে এস বন্ধু সার বেঁধে তুলি।
ঋণ দিতে হবে মৃত্যু—দেহ...রক্ত...মন,
যন্ত্রাপিষ্ট কাঁদে বসে' জননী বসুধা;
    এস এস শিরে তুলে নাও যজ্ঞধূলি।
বুভুক্ষু এ সভ্যতার ক্ষুন্নিবৃত্তি শেষে
হয়তো আসিবে তবে সোনা দিন হেসে!!
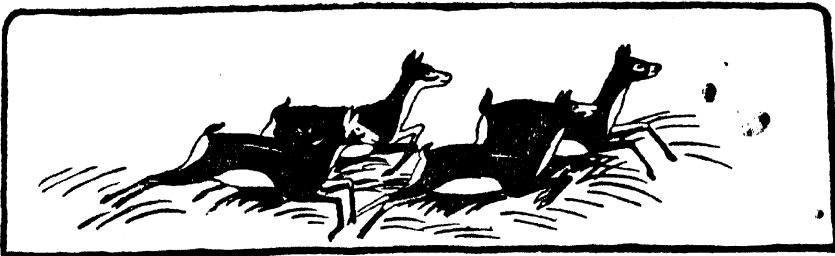
বঙ্গের জাতীয় কবিতা ও সঙ্গীত

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

বঙ্গ-বিভাগ—স্বদেশী আন্দোলন

লর্ড কার্জন ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে ভারতের বড়লাট হইয়া আসেন। ভারতের বড়লাটদের মধ্যে ইঁহার নাম বিবিধ সংস্কার কার্যের জন্য স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। তাঁহার সময়ের কয়েকটি প্রধান প্রধান ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। (১) গুজরাটে দুর্ভিক্ষ, (২) মহারাণী ভিক্টোরিয়ার মৃত্যু, (৩) বৈদেশিক নীতি, (৪) তিব্বত অভিযান, (৫) সেনা ও বিবিধ শাসন সংস্কার, (৫) শিল্প বাণিজ্য বিভাগ, (৭) শিক্ষা সম্বন্ধীয় সংস্কার রীতি, (৮) বঙ্গ বিভাগ।

এই সকল নূতন নূতন সংস্কারে দেশের মধ্যে না যতটা আন্দোলন হইয়াছিল, তাহার চেয়ে সর্বাপেক্ষা বেশী অন্দোলন উপস্থিত হইল যখন লর্ড কার্জন জনসাধারণের মতামত অগ্রাহ্য করিয়া বঙ্গ বিভাগ করিলেন, তখন সারা দেশব্যাপী তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল। বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যা পূর্বে একজন লেফটেন্যাণ্ট গভর্নরের অধীন শাসিত হইত। এত বড় বিস্তৃত প্রদেশসমূহ একজন লোকের পক্ষে ভাল করিয়া দেখা সম্ভবপর নহে এই জন্য লর্ড কার্জন শাসনকার্যের সুবিধার জন্য বঙ্গ বিভাগ করেন। আসাম ও পূর্ববঙ্গ, রাজসাহী ও চট্টগ্রাম বিভাগ লইয়া আর একটি স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠিত হইল এবং তাহার নাম হইল পূর্ববঙ্গ ও আসাম।

১৯০১ খৃষ্টাব্দের আদম সুমারী বা সেন্সাস রিপোর্ট হইতে জানিতে পায়া যায় সে সময়ে লিখন-পঠনক্ষম বাঙলা দেশের জনসংখ্যা ইত্যাদি কিরূপ ছিল। আমরা এখানে সেই সংক্ষিপ্ত তথ্যটুকু উদ্ধৃত করিলাম :

"The census statistics of 1901 show that in Bengal as then constituted, i.e., the present Bengal and Eastern Bengal, 4½ millions persons on 55 per cent of the population were literate, i.e., could read and write some language, while 89 males and 6 females out of every 10,000 of each sex could read & write English".

বঙ্গ দেশের কতিপয় বিভাগ যেমন আসামের সহিত সংযুক্ত করা হইয়াছিল, তেমনই মধ্যপ্রদেশের সম্বলপুর জেলা বঙ্গদেশের সহিত সংযুক্ত করা হইয়াছিল। বেরার প্রদেশটি মধ্যপ্রদেশের সহিত সংযুক্ত করা হইল। এই বঙ্গ বিভাগ লইয়া বাঙলা দেশের সর্বত্র তমুল আন্দোলন উপস্থিত হইল। বিলাতী পণ্য বর্জন বিশেষভাবে এই আন্দোলনের অঙ্গীভূত হইয়াছিল। বাঙলা দেশকে ও বাঙলা ভাষাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া বাঙালী জাতির সর্বনাশ করা হইতেছে বলিয়াই এই আন্দোলন এইরূপ প্রবল আকার ধারণ করিয়াছিল। এই সময় দেশে নানারূপ গুপ্ত সমিতি ইত্যাদি হইয়া অনেক শোচনীয় ব্যাপার সংঘটিত হইবার হেতু হইয়াছিল। গভর্নমেণ্ট এই আন্দোলন দমন করিবার জন্য দমনীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন। ঐ যুগ—স্বদেশী যুগ নামে অভিহিত। এই সময়ে স্বদেশের শিল্প-বাণিজ্য প্রভৃতির প্রতি দেশবাসীর মনোযোগ আকর্ষিত হইয় ছিল।

সরকারী বিবরণীতে—

(The Administration of Bengal under Sir Andrew Fraser, K.C.S.I. 1903—1908 Calcutta The Bengal Secretariat Book Dep. of 1908)

বঙ্গভঙ্গ সম্পর্কে যেরূপ লিখিত আছে তাহা সাধারণের সুবিধার জন্য ও জানিবার জন্য উদ্ধৃত করিলাম :—

"When the partition of Bengal was announced in July 1905, the failure of this agitation enabled the malcontents to persuade others that constitutional agitation was a failure, and that more vigorous measures should be taken."

BOYCOTT AND SWADESHI

"The first effort of the agitators was to inagurate a boycott movement, i.e., a movement to boycott European goods, and in particular Manchester piecegoods, sugar and salt. These tactics were designed to attract attention to the alleged grievances of the Bengali Hindus, for it was hoped that the stoppage of the sale of Manchester goods would so affect the interests of the English mercantile community, that they would bring pressure to bear on the Home Government to annul the Partition.

In this the agitations appear to have imitated the Chinese, who, in May 1905, had started a boycott of American goods as a protest against an Exclusion Treaty proposed by the United States, closely connected with this movement was another called the *Swadeshi* movement, the object of which was to encourage indigenous industries by starting new ones and reviving extinct or moriband handicrafts and manufacturers :—generally to develop the resources of the country by and through the people, and in particular to substitute home-made for imported goods. The two movements were really distinct, though an effort was made to work them as part of one movement. For the *Swadeshi* movement aimed at developing Indian industries for the supply of the home market, in competition with all other countries, whyle the boycott was intended to enforce a prohibition of the produce of certain European countries and especially British goods".

"The *Swadeshi* movement undoubtedly appealed to the better classes, whose interest in politics was not great; but though it obtained much sympathy, it made little headway, because the industries it sought to develop were nearly all in their infancy. The main efforts of the agitators, therefore, were directed not to the slow and laborious work of building up hare industries, but to enforcing the boycott. In this they met at first with some success, for the Marwari merchants—one of the most important sections of the mercantile community—were induced by commercial considerations to suspend orders for a short time. * * * The services of the schoolboys were also enlisted. They were induced to picket shops and prevent, by force, if necessary, the purchase of any but *Swadeshi* goods. * * * Meetings were held in Hindu emples, and vows to boycott foreign goods were sworn in the name of Kali".

* * * Lastly, but not least, there was a sentimental objection to the change; and the Bengali Hindu is an emotional person, with emotions easily roused and as easily played upon. Their sentiments and credulity had been taken advantage of by the agitators, and on the 16th October there was a remarkable demonstration. In Calcutta a large part of the Bengali Hindu population fasted throughout the day, shops were closed, and the fish supply was stopped. The foundation-stone of a building called the National Federal Hall was laid; a fund was started for building the Hall—an abortive project—and for developing home industries and industrial education. The Hindus tied *rakhis* or yellow threads on their arms as a symbol of unity; and a vow was taken to continue the opposition to the partition. [The Administration of Bengal 1903—1908 P. 12—14.]

বঙ্গ ব্যবচ্ছেদের দরুণ সমগ্র বঙ্গদেশ হইতে ৫০,০০০ হাজার বর্গ মাইল ভূমি এবং ২৫,০০০,০০০ জনসংখ্যার হ্রাস পাইয়াছিল।

১৯০৫ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে বঙ্গ ভঙ্গের বিষয় সরকার ঘোষণা করিলে পর দেশব্যাপী যে প্রবল আন্দোলন চলিতে

থাকে তাহার মধ্যে বয়কট, স্বদেশী, রাখী-বন্ধন, জাতীয় মিলন মন্দির প্রতিষ্ঠা, বিলাতী কাপড় লবণ প্রভৃতি বর্জন, স্বদেশী শিল্পের উন্নতি বিধান ও ব্যবহার, সমিতি ও আখড়ার প্রতিষ্ঠা, লাঠি ও তরবারি খেলা, স্বদেশী সভা ও প্রচার এবং জাতীয় ঐক্য বিধানের মূলমন্ত্র 'বন্দে মাতরম্' উচ্চারণ এবং উক্ত সংগীতের প্রচার এবং 'স্বরাজ' লাভের জন্য দেশব্যাপী সাধনাই হইয়াছিল বঙ্গভঙ্গের প্রতি-বিধানের নিমিত্ত দেশবাসীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টা। বঙ্গ-বিভাগের সময় বাঙলার ছোটলাট ছিলেন স্যার এন্ড্রু ফ্রেজার (Sir Andrew Fraser), তিনি বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ ব্যবস্থার সমর্থন করিয়াছিলেন।

১৯০৫ খৃষ্টাব্দে বঙ্গ-বিভাগ হয় আর ১৯১১ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে সম্রাট পঞ্চম জর্জ যখন সম্রাট-পত্নী মেরীসহ ভারতবর্ষে আগমন করেন, তখন দ্বিতীয় লর্ড হার্ডিং ভারতের বড়লাট ছিলেন (১৯১০—১৯১৫), সম্রাট পঞ্চম জর্জের ভারত আগমনে দিল্লীতে এক বিরাট রাজকীয় দরবার অনুষ্ঠিত হয়, ঐ দরবারে ভারত-শাসন সম্পর্কিত পরিবর্তন বিষয়ে সম্রাট কয়েকটি ঘোষণা করেন। (১) কলিকাতা হইতে ভারতবর্ষের রাজধানী দিল্লীতে স্থানান্তরিত করেন। (২) বঙ্গ-ভঙ্গের পরিবর্তন। দুই বাঙলা এক হইয়া যুক্ত-বঙ্গ প্রেসিডেন্সীতে পরিণত হইল। স-কাউন্সিল গভর্নর বঙ্গীয় শাসনকর্তা নিযুক্ত হইলেন। তদানীন্তন মাদ্রাজের গভর্নর লর্ড কারমাইকেল বাঙলায় প্রথম গভর্নর নিযুক্ত হইলেন এবং তিনি ১৯১২ খৃষ্টাব্দের ১লা এপ্রিল তারিখে বাঙলার শাসনভার গ্রহণ করেন। বিহার ছোটনাগপুর ও উড়িষ্যা লইয়া আর একটি নূতন প্রদেশ গঠিত হইল। সম্রাটের এই অভিষেকোৎসব ও শাসন সম্পর্কে এইরূপ পরিবর্তন মূলে সে সময় দেশমধ্যে আনন্দের স্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল।

স্বদেশী যুগে জাতীয় সংগীত ও কবিতা রবীন্দ্রনাথের

এই স্বদেশী আন্দোলনের সময়, অর্থাৎ বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ উপলক্ষে যে গভীর আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল—যে আন্দোলনে সমস্ত বাঙলা দেশের মধ্যে একটা বিদ্যুৎ-তরঙ্গ বহিয়া গিয়াছিল, সেই বিদ্যুৎ-প্রবাহ প্রেরণার মূলে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তিনি সেই স্বদেশী আন্দোলনের সর্বত্র অব্যাহতভাবে আপনাকে নিয়োজিত করিয়াছিলেন; এক কথায় তিনি ছিলেন একজন প্রধান আহিতাগ্নিক ঋষি। তাঁহার প্রজ্জ্বলিত সেই হোমানলে দেশ পবিত্র ও ধন্য হইয়াছিল।

কবির কাব্যের ধারা অনুশীলন করিলে একটি সত্য অতি সুন্দরভাবে প্রকাশ পায়, তাহা হইতেছে তাঁহার হৃদয়াবেগ। যখন যে কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তখনই তাঁহার মধ্যে আপনাকে সম্পূর্ণভাবে ব্যাপ্ত করিতে চাহিয়াছেন। সংসার-ক্ষেত্রে একটি মহৎ কার্যের মধ্যে আপনাকে নিয়োজিত করিতে ছিল তাঁহার হৃদয়ের তীব্র আকাঙ্ক্ষা। সে তীব্র ব্যাকুলতা ও উদ্দাম হৃদয়ের বিকট উল্লাসে তিনি কোনও বিরাট কার্যের মধ্যে আপনাকে নিয়োজিত করিতে চাহিতে-ছিলেন। তাঁহার পূর্ববিরচিত অনেক কবিতার মধ্যেও সেই আভাস পাই। কবি 'দুরন্ত আশা' কবিতায় বলিয়াছেনঃ

নিমেষ তরে ইচ্ছা করে বিকট উল্লাসে
সকল টুটে যাইতে ছুটে জীবন উচ্ছাসে।
শূন্য ব্যোম অপরিমাণ মদ্য সম পান
মুক্ত করি রুদ্ধ প্রাণ ঊর্দ্ধে নীলাকাশে।
থাকিতে নারি ক্ষুদ্র কোণে আম্র বন ছায়ে
সুপ্ত হয়ে লুপ্ত হয়ে, গুপ্ত গৃহকোণে।

এইবার সেই সুযোগ মিলিল। স্বদেশী আন্দোলন রবীন্দ্রনাথকে গুপ্ত গৃহকোণ হইতে টানিয়া বাহির করিল। তাঁহার বীণার তারে রুদ্রবাণী ঝঙ্কৃত হইল। সেই মধ্যাহ্ন রবির কি অতুলন প্রভাব—কি প্রদীপ্ত প্রকাশ।

১৩১২ সাল হইতে প্রায় ১৩২০ সাল—এই আট বৎসর পর্যন্ত আমরা রবীন্দ্রনাথের সংগীতে, তাঁহার পার্বত্য নির্ঝরিণীর অপূর্ব সঞ্জীবনী ধারার ন্যায় সরস বক্তৃতায়, বীণার রুদ্র সুরে বঙ্গবাসীকেই শুধু নয়, সমগ্র ভারতবাসীকেই বিস্মিত—পুলকিত ও স্বদেশ-সেবার মন্ত্রে নবভাবে দীক্ষা দিয়াছিল।

একদিন কবি ব্যথিত সুরে গাহিয়াছিলেনঃ

কাফি

কেন চেয়ে আছ গো মা মুখ পানে!
এরা চাহেনা তোমারে চাহেনা যে,
আপন মায়েরে নাহি জানে!
এরা তোমায় কিছু দেবে না, দেবে না,
মিথ্যা কহে শুধু কত কি জনে!
তুমিত দিতেছ মা যা আছে তোমারি,

স্বর্ণ শস্য তব, জাহ্নবী বারি,
জ্ঞান ধর্ম কত পুণ্য কাহিনী;—
এরা কি দেবে তোরে কিছু না, কিছু না,
মিথ্যা কহে শুধু হীন পরাণে!

মনের বেদনা রাখ, মা, মনে,
নবয়ন-বারি নিবার নয়নে,
মুখ লুকাও মা ধূলি শয়নে,
ভুলে থাক যত হীন সন্তানে।

শূন্যপানে চেয়ে প্রহর গণি গণি,
দেখ কাটে কি না দীর্ঘ রজনী,
দুঃখ জানায়ে কি হবে জননি,
নির্মম চেতনাহীন পাষাণ প্রাণে।

কিন্তু স্বদেশী আন্দোলন যুগে কবি তাঁহার সংগীত-প্রস্রবণনিঃসৃত অপূর্ব ধারায় 'নির্মম চেতনাহীন পাষাণ প্রাণে'ও দেশের প্রকৃত আদর্শ ও রূপটি ফুটাইয়া তুলিলেন।

রবীন্দ্রনাথ এই আন্দোলনের ভিতর এমন-ভাবে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিলেন যে, প্রায় প্রত্যেক সভা-সমিতিতেই তাঁহাকে দেখা যাইত। কোনরূপ ক্লান্তি ও অবসাদ যেন সেকালে তাঁহার ছিল না।

১৯০৬ খৃষ্টাব্দে বাঙলা ১৩১৩ সালে কলিকাতা মহানগরীতে জাতীয় মহা-সমিতির (National Congress) অধি-বেশন হয়, সেই অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের অমর সংগীত 'বন্দে মাতরমে' সুর-সংযোজন করিয়া গান করেন।

["When the Indian National Congress met in Calcutta in 1906, agitation was at its height, and Rabindranath Tagore attended, and sang this song to music he had himself written." — Thomson; Tagore Poet and Dramatist. p.p 102; 213-14.]

রবীন্দ্রনাথের প্রাণে স্বদেশসেবীর মূলমন্ত্র ছিল—আত্মশক্তিতে বিশ্বাস এবং আপনার দুর্জয় শক্তি ও মনোবল দ্বারা কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়া সাধনায় সিদ্ধিলাভ। ভিক্ষার দ্বারা দ্বারে দ্বারে লাঞ্ছিত ও ঘৃণিত হইয়া নহে; শক্তি দ্বারা অর্জন—শ্রম ও অধ্যবসায় ও ঐক্য মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া পুরুষকারের সহিত যে লাভ, তাহাকেই তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ পাওয়া বা পরম লাভ বলিয়া মনে করিয়া-ছিলেন। ভিক্ষায়? কখনও নহে।

ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ!

কবি 'ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ' কবিতায় বলিয়াছেনঃ

"যে তোমারে দূরে রাখি' নিত্য ঘৃণা করে
হে মোর স্বদেশ,
মোরা তারি কাছে ফিরি সম্মানের তরে
পরি তারি বেশ!
বিদেশী জানে না তোরে, অনাদরে তাই
করে অপমান,
মোরা তারি পিছে থাকি যোগ দিতে চাই—
আপন সন্তান!
তোমার যা দৈন্য, মাতঃ তাই ভূষা মোর,
কেন তাহা ভুলি,
পরধনে ধিক গর্ব, করি করজোড়
ভরি ভিক্ষা-ঝুলি,
পুণ্য হস্তে শাক অন্ন তুলে দাও পাতে
তাই যেন রুচে,
মোটা বস্ত্র বুনে দাও যদি নিজ হাতে,
তাহে লজ্জা ঘুচে!
সেই সিংহাসন, যদি অঞ্চলটি পাত,
কর স্নেহ দান,
যে তোমারে তুচ্ছ করে, সে আমারে, মাতঃ
কি দিবে সম্মান!"

রবীন্দ্রনাথ সে সময়ে লিখিয়াছিলেনঃ

"যদি অকস্মাৎ কোন বৃহৎ ঘটনায়, কোনো মহান্ আবেগের ঝড়ে পর্দা একবার একটু উড়িয়া যায়, তবে এই দেবাধিষ্ঠিত দেশের মধ্যে হঠাৎ আমরা দেখিতে পাইব—আমরা কেহই বিচ্ছিন্ন নহি, স্বতন্ত্র নহি, দেখিতে পাইব। যিনি যুগ যুগান্তর হইতে আমাদিগকে এই সমুদ্র-বিধৌত, হিমাদ্রি-অধিরাজিত উদার দেশের মধ্যে এক ধনধান্য এক সুখ-দুঃখ এক বিরাট প্রকৃতির মাঝখানে রাখিয়া নিরন্তর এক করিয়া

ভুলিতেছেন, সেই দেশের দেবতা দুর্জ্জয়, তাঁহাকে কোন দিন কেহই অধীন করে নাই; তিনি ইংরাজ রাজার প্রজা নহেন, তিনি প্রবল, তিনি চিরজাগ্রত—ই'হার এই সহজমুক্ত স্বরূপ দেখিতে পাইলে তখনই আনন্দের প্রাচুর্যবেগে আমরা অনায়াসেই পূজা করিব, ত্যাগ করিব, আত্ম-সমর্পণ করিব। তখন দুর্গম পথকে পরিহার করিব না, তখন পরের প্রসাদকেই জাতীয় উন্নতিলাভের চরম সম্বল মনে করাকে পরিহাস করিব এবং অপমানের মূল্যে আশু ফললাভের উঞ্ছবৃত্তিকে অন্তরের সহিত অবজ্ঞা করিতে পারিব।"

উঞ্ছবৃত্তির প্রতি অবজ্ঞা রবীন্দ্রনাথের ছিল প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য। আর বাঙলা দেশের যে অখণ্ড স্বরূপ তাঁহার নয়নসমক্ষে প্রতিভাত হইয়া উঠিয়াছিল—আর আমরা কেহই বিচ্ছিন্ন নহি, স্বতন্ত্র নহি—এই উপলব্ধির মর্মবাণী ফুষিয়া উঠিয়াছিল নিম্নলিখিত সংগীতের মধ্য দিয়া ঃ

খাম্বাজ—একতালা

এক সূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন,
এক কার্যে সঁপিয়াছি সহস্র জীবন।
আসুক সহস্র বাধা, বাধুক প্রলয়,
আমরা সহস্র প্রাণ রহিব নির্ভয়। ইত্যাদি

স্বদেশী আন্দোলনের বাঙলা ১৩১২ সাল ও ইংরেজি ১৯০৫ খৃষ্টাব্দকে লর্ড কার্জন যেমন ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন, কেননা তাঁহার সেই সুতীক্ষ্ণ শরাঘাতেই বাঙলা দেশে ভোগবতীর ধারার ন্যায় 'স্বদেশ-প্রেম' উৎসারিত হইয়াছিল। কবি ঐ ১৩১২ সালকে লক্ষ্য করিয়া সেই বৎসরের বিজয়া-সম্মিলনীর বক্তৃতাতে বলিয়াছিলেনঃ

"ধন্য হইল এই ১৩১২ সাল, বাঙলা দেশের এমন শুভক্ষণে আমরা যে আজ জীবন ধারণ করিয়া আছি—আমরা ধন্য হইলাম * * * আজ স্বদেশের স্বদেশীয়তা আমাদের কাছে যে প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে ইহা রাজার কোন প্রসাদ বা অপ্রসাদের উপর নির্ভর করে না—কোন আইন পাশ হউক বা না হউক, বিলাতের লোক আমাদের করুণোক্তিতে কর্ণপাত করুক বা না করুক আমার স্বদেশ আমার চিরন্তন স্বদেশ আমার পিতৃ পিতামহের স্বদেশ আমার সন্তান-সন্ততির স্বদেশ, আমার প্রাণদাতা, শক্তিদাতা, সম্পদ্‌দাতা স্বদেশ। কোন মিথ্যা আশ্বাসে ভুলিব না, কাহারো মুখের কথায় ইহাকে বিকাইতে পারিব না, একবার যে হস্তে উহার স্পর্শ উপলব্ধি করিয়াছি সে হস্তকে ভিক্ষাপাত্র বহনে আর নিযুক্ত করিব না। সে হস্ত মাতৃ-সেবার জন্য সম্পূর্ণভাবে উৎসর্গ করিলাম।"

কবি সত্য সত্যই দেহে মনে প্রাণে সম্পূর্ণ-ভাবে স্বদেশের জন্য তৎকালে আপনাকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। তাই শুনিলাম,

নব বৎসরে করিলাম পণ
লব স্বদেশের দীক্ষা,
তব আশ্রমে, তোমার চরণে,
হে ভারত, লব শিক্ষা!
পরের ভূষণ, পরের বসন,
তেয়াগিব আজ পরের আসন,
যদি হই দীন, না হইব হীন,
ছাড়িব পরের ভিক্ষা।

ইহার মূলে ছিলঃ—
aimed at developing Indian industries for the supply of the home market, in competition with all other countries.

কবির দীক্ষার মন্ত্র শুনিলাম তাঁহারই সুরেঃ

তোমারি ধর্ম, তোমার কর্ম,
তব মন্ত্রের গভীর মর্ম,
লইব তুলিয়া সকল ভুলিয়া
ছাড়িব পরের ভিক্ষা।
তব গৌরবে গরব মানিব
লইব তোমার দীক্ষা।

কবি উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, দেশের মধ্যে বিভেদ থাকিলে দেশ ও জাতির জাগরণ অসম্ভব। তাই তিনি গাহিয়াছিলেন ঃ

রামপ্রসাদী সুর

আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে
ঘরের হয়ে পরের মতন
ভাই ছেড়ে ভাই ক'দিন থাকে।
* * * *
কত দিনের সাধন ফলে,
মিলেছি আজ দলে দলে,
ঘরের ছেলে সবাই মিলে
দেখা দিয়ে আয়রে মাকে।

এই মিলনের আনন্দে কবি-হৃদয় উচ্ছ্বসিত ও উদ্বেলিত হইল, তিনি দেশের নরনারীর সচক্ষে আনন্দধ্বনি জাগাইয়া তুলিলেন। বঙ্গজননীর অখণ্ড সত্ত্বা প্রত্যেকের অন্তর মধ্যে ধ্যানমূর্তির মত অনুভব করিবার জন্য আহ্বান করিলেনঃ

হাম্বির—তালফেরতা

আনন্দ ধ্বনি জাগাও গগনে!
কে আছ জাগিয়া, পূরবে চাহিয়া,
বল উঠ উঠ সঘনে, গভীর নিদ্রা মগনে।
দেখ তিমির রজনী যায় ওই,
হাসে উষা নব জ্যোতির্ময়ী
নব আনন্দে নব জীবনে,
ফুল্ল কুসুমে, মধুর পবনে, বিহগ কুল কূজনে।
হের আশার আলোকে জাগে শুকতারা
উদয় অচল পথে,
কিরণ কিরীটে তরুণ তপন উঠিছে অরুণ রূপে।
চল যাই কজে মানব সমাজে
চল বাহিরিয়া জগতের মাঝে,
থেকো না মগন শয়নে, থেকো না মগন স্বপনে!
ইত্যাদি।

নবীন প্রভাতে নবীন অরুণ কিরণে ঝলসিত স্বদেশের সেই শুভসুযোগে কবি দেখিলেন, মৃতপ্রায় দেশের মধ্যে বিশুষ্কা নদীর বালুকাশয্যায় উছল জল কলরব বান ডাকিয়াছে যে!

এবার তোর মরা গাঙে বান ডেকেছে,
জয় মা বলে ভাসা তরী।
ওরে রে ওরে মাঝি, কোথায় মাঝি,
প্রাণপণে ভাই ডাক্ দে আজি,
তোরা সবাই মিলে বৈঠা নেরে,
খুলে ফেল্ সব দড়াদড়ি।
কেননা এইবার অই শোন তোমারঃ
জননীর দ্বারে আজি ওই
শুনগো শঙ্খ বাজে।
থেকো না থেকো না ওরে ভাই,
মগন মিথ্যা কাজে।

অর্ঘ্য ভরিয়া আনি
ধরগো পূজার থালি।
রত্ন-প্রদীপখানি
যতনে আনগো জ্বালি।
ভরি লয়ে দুইখানি
বহি আন ফুলডালি।
মা'র আহ্বান বাণী
রটাও ভুবন মাঝে।
জননীর দ্বারে আজি ওই
শুনগো শঙ্খ বাজে।

কবি দেখিলেন মায়ের অপূর্ব মূর্তি। সেই অপরূপ সৌন্দর্য ও গাম্ভীর্যপূর্ণ মূর্তি পূর্বেও আর কখনও দেখেন নাই। কবি মাকে চিনিলেন ও দেখিলেন তাঁর ষড়ৈশ্বর্যময়ী মূর্তি। সে মূর্তি কেমন?

বিভাস—একতালা

আজি বাংলা দেশের হৃদয় হতে
কখন্ আপনি
তুমি এই অপরূপ রূপে বাহির
হ'লে জননী।
ওগো মা—
তোমায় দেখে দেখে আঁখি না ফিরে!
তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে
সোনার মন্দিরে!
তোমার মুক্ত কেশের পুঞ্জ মেঘে
লুকায় অশনি;
তোমার আঁচল বাসে আকাশ-তলে
রৌদ্র-বসনী।
ওগো মা—
তোমায় দেখে দেখে আঁখি না ফিরে!
তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে
সোনার মন্দিরে!
যখন অনাদরে চাইনি মুখে
ভেবেছিলেম দুঃখিনী মা,
আছে ভাঙ ঘরে একলা পড়ে
দুখের বুঝি নাইকো সীমা।
কোথা সে তোর দরিদ্র বেশ
কোথা সে তোর মলিন হাসি;
আকাশে আজ ছড়িয়ে গেল
ঐ চরণের দীপ্তি রাশি।
ওগো মা......ইত্যাদি

রবীন্দ্রনাথ সেই স্বদেশী যুগে বাঙালী জাতির মধ্যে যে উৎসাহ উদ্যম ও কর্মক্ষমতার আগ্রহ দেখিতে পাইয়াছিলেন, তাহার মধ্যে তিনি দেখিতে পাইয়াছিলেন মায়ের অপূর্ব মূর্তি। সেজন্যই অবিচলিত কণ্ঠে গাহিতে পারিয়াছিলেনঃ

আজি দুখের রাতে সুখের স্রোতে
ভাসাও ধরণী;
তোমার অভয় বাজে হৃদয় মাঝে
হৃদয় হরণী।

রবীন্দ্রনাথও বাঙলার সেই আন্দোলনের ভিতর দিয়া কোনরূপ জাতীয় বিদ্বেষ গড়িয়া উঠে তাহা চাহেন নাই। তিনি চাহিয়াছিলেন দেশের প্রকৃত উন্নতি অন্য জাতির অনুকরণ ও অনুসরণের সম্বন্ধ দ্বারা নহে। আদান প্রদানের দ্বারা। 'দিবে আর নিবে মিলিবে মিলাবে।' এজন্যই তিনি বলিয়াছিলেন—আজ আমাদের অবহিত হয়ে বিচার করতে হবে যে, যে সত্যে ভারতবর্ষ

আপনাকে আপনি নিশ্চিন্তভাবে লাভ করতে পারে সে সত্যটি কি। সে সত্য প্রধানত বণিকবৃত্তি নয়, স্বারাজ্য নয়, স্বাদেশিকতা নয়; সে সত্য বিশ্ব জাগতিকতা। সেই সত্য ভারতবর্ষের তপোবনে সাধিত হয়েছে, উপনিষদে উচ্চারিত হয়েছে, গীতায় ব্যাখ্যাত হয়েছে, বুদ্ধদেব সেই সত্যকে পৃথিবীতে সর্বমানবের নিত্য ব্যবহারে সফল করে তোলবার জন্য তপস্যা করেছেন এবং কালক্রমে নানাবিধ দুর্গতি ও বিকৃতির মধ্যেও কবির, নানক প্রভৃতি ভারতবর্ষের পরবর্তী মহাপুরুষগণ সেই সত্যকে প্রচার করে গেছেন। ভারতবর্ষের সত্য হচ্ছে জ্ঞানে অদ্বৈততত্ত্ব, ভাবে বিশ্বমৈত্রী এবং কর্মে যোগসাধনা। ভারতবর্ষের অন্তরের মধ্যে যে উদার তপস্যা গভীরভাবে সঞ্চিত হয়ে রয়েছে, সেই তপস্যা আজ হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ এবং ইংরাজকে আপনার মধ্যে এক করে নেবে বলে প্রতীক্ষা করচে, দাসভাবে নয়, জড়ভাবে নয়, সাত্ত্বিকভাবে, সাধকভাবে। যতদিন তা না ঘটবে ততদিন নানাদিক থেকে আমাদের বারম্বার ব্যর্থ হতে হবে।

এজন্যই তাঁহার গীত ঝঙ্কারে মহামানবের মহামেলার কথা শুনিয়াছি। এজন্যই চীন, শক, হূন, পারসিক, গ্রীক্, রোমক, মুসলমান, ইংরাজ, বৌদ্ধ, খৃষ্টান সকলকে লইয়া ভারতবর্ষের মধ্যে মহামানবের মিলন ক্ষেত্র গড়িয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহার বাণী স্বদেশী আন্দোলনকালে কোথাও জাতিগত বা সম্প্রদায়গত বিদ্বেষ প্রচার করে নাই। শুধু এই প্রেরণা ও সাধনার বাণীই কবি প্রচার করিয়াছিলেন:

"দৈন্যের মাঝে আছে তব ধন,
মৌনের মাঝে রয়েছে গোপন
তাই আমাদের দিয়ো।
পরের সজ্জা ফেলিয়া পরিব
তোমার উত্তরীয়।
দাও আমাদের অভয় মন্ত্র,
অশোক মন্ত্র তব!
দাও আমাদের অমৃত মন্ত্র
দাওগো জীবন নব!

যে জীবন ছিল তব তপোবনে,
যে জীবন ছিল তব রাজাসনে,
মুক্ত দীপ্ত সে মহাজীবনে
চিত্ত ভরিয়া লব!
মৃত্যু-তরণ শঙ্কাহরণ
দাও সে মন্ত্র তব!

সেই 'মৃত্যু-তরণ শঙ্কাহরণ' মনে 'অভয়-মন্ত্রে' দীক্ষিত হইয়া কবি তাঁহার সাধনার পথে অগ্রসর হইয়াছিলেন—আর্তের সেবকরূপে ও সাধকরূপে। সে সময়কার জাতীয় শিক্ষার প্রচলনের উদ্যোগে, শ্রমশিল্প ও কুটীর-শিল্পের প্রবর্তনে, কৃষিবিদ্যার প্রচারে এবং শিলাইদহে তাঁতশালার প্রতিষ্ঠায় বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার বিরাট কল্পনার দ্বারা ভারতকে মহামানবের মিলনক্ষেত্রে পরিণত করিবার জন্য তিনি দিবারাত্রি অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করিয়াছেন। সে সময়ে তাঁহার মনে ও প্রাণে এইরূপ দৃঢ়সংকল্প ছিল যে, কিছুতেই লক্ষ্য পথ হইতে দূরে সরিয়া যাইবেন না। কবি উদাস কণ্ঠে গাহিয়াছিলেন:

বাউল

যে তোমারে ছাড়ে ছাড়ুক
আমি তোমায় ছাড়্‌বো না, মা!
আমি তোমার চরণ কর্‌বো শরণ,
আর কারো ধার ধার্‌বো না, মা!

কে বলে তোর দরিদ্র ঘর,
হৃদয়ে তোর রতন-রাশি;
জানিগো তোর মূল্য জানি
পরের আদর কাড়্‌বো না, মা!
আমি তোমায় ছাড়্‌বো না, মা!
মানের আশে, দেশ বিদেশে,
যে মরে সে মরুক্ ঘুরে;
তোমার ছেঁড়া কাঁথা আছে পাতা
ভুলতে সে যে পার্‌বো না, মা!
আমি তোমায় ছাড়্‌বো না, মা!

ধনে মানে লোকের টানে,
ভুলিয়ে নিতে চায় যে আমায়—
ওমা, ভয় যে জাগে, শিয়র ভাগে
কারো কাছেই হারবো না, মা!

এই সময়েই কবি বঙ্গজননীর চিরমাধুর্যময়ী চিরশোভাময়ী মূর্তির অপরূপ রূপ মাধুরী কবিতায় ও সংগীতে জনগণের সম্মুখে নিত্য নূতনভাবে প্রকাশ করিয়াছিলেন। তখন কত জ্যোৎস্নাময়ী নিশীথে, কত শীত, গ্রীষ্ম ও বর্ষার কলকল্লোলের মধ্যেও নিভৃত পল্লীর গৃহকোণে থাকিয়া আমরা শুনিতাম অপূর্ব বাউলের সুরে সোনার বাঙলার জীবন্ত রূপক বর্ণনা:

আমার সোনার বাঙলা,
আমি তোমায় ভালবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস
আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি।
(মরি হায় হায় রে)
ওমা অঘ্রাণে তোর ভরা ক্ষেতে
কি দেখেছি মধুর হাসি।
*   *   *   *
তোমার এই খেলা ঘরে,
শিশুকাল কাটিল রে,
তুই দিন ফুরালে সন্ধ্যাকালে
কি দীপ জ্বালিস্ ঘরে,
(মরি হায় হায় হায় রে)
তখন খেলাধুলা সকল ফেলে
তোমার কোলে ছুটে আসি।

ধেনু-চরা তোমার মাঠে,
পারে যাবার খেয়া-ঘাটে,
সারাদিন পাখী-ডাকা ছায়ায় ঢাকা
তোমার পল্লীবাটে,—

তোমার ধানে ভরা আঙিনাতে
জীবনের দিন কাটে,
(মরি হায় হায় হায় রে)
ওমা, আমার যে ভাই তারা সবাই
তোমার রাখাল, তোমার চাষী।

ওমা, তোর চরণেতে
দিলেম এই মাথা পেতে,
দেগো তোর পায়ের ধূলো, সে যে আমার
মাথার মাণিক হবে।
ওমা, গরীবের ধন যা আছে তাই
দিব চরণতলে
(মরি হায় হায় হায়রে)
আমি পরের ঘরে কিনব না তোর
ভূষণ বলে' গলায় ফাঁসি।

এইভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া কবি রজনীকান্ত সেন ও অন্যান্য কবিরাও একই সুরে ঝঙ্কার তুলিয়াছিলেন। সেই স্বদেশী যুগে বাঙলার পল্লী প্রান্তর নগর বন্দর আকাশ বাতাসে প্লাবন আনিয়া সহস্র সহস্র লক্ষ লক্ষ কণ্ঠে গাহিতে শুনিয়াছি—রবীন্দ্রনাথের সংগীতের সঙ্গে সঙ্গে কবি রজনীকান্তের সুমধুর সংকীর্তন—

'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়,
মাথায় তুলে নেরে ভাই;
দীন দুঃখিনী মা যে তোদের
তার বেশী আর সাধ্য নাই।

সেই মোটা সূতার সঙ্গে,
মায়ের অপার স্নেহ দেখ্‌তে পাই;
আমরা এম্‌নি পাষাণ, তাই ফেলে ওই
পরের দোরে ভিক্ষা চাই।

আবার গাহিলেন কান্ত কবি:

তাই ভালো, মোদের মায়ের ঘরের শুধু ভাত
মায়ের ঘরের ঘি সৈন্ধব,
মা'র বাগানের কলাপাত
ভিক্ষার চেলে কাজ নাই,
সে বড় অপমান;
মোটা হোক্ সে সোনা মোদের
মায়ের ক্ষেতের ধান;
সে যে মায়ের ক্ষেতের ধান

—আমরা দ্বিজেন্দ্রলাল, কবি রজনীকান্ত অতুলপ্রসাদপ্রভৃতির বিষয় পরে আলোচনা করিব। ক্রমশ

তিলাঞ্জলি

সুবোধ ঘোষ

১২

যুদ্ধ ইনফ্লেশন আর ঘুষখোর আমলা—তিন স্পর্শমণির ছোঁয়ায় মুনাফা-বাজের কাছে সোনার ফেরদৌস হয়ে উঠলো কচুরিপানার বাঙলা দেশ। বাঙালীর জীর্ণ মুণ্ডে যেন প্রচণ্ড এক জিজিয়া বসাবার ফরমান পেয়েছে তারা। সদরে, মফঃস্বলে, রাজধানীতে—খালের মুখে, মাঠের ওপর গাছের তলায়—মৃত নিরন্নের মুণ্ডগুলি গুণতে পারলে এই অতিলোভী হিংসার একটা হিসাব দাঁড় করানো যেত।

তবু ব্যাঙ্কার কালিকিঙ্করবাবুর নিদ্রার ব্যাঘাত অদ্ভুতভাবে দেখা দিয়েছে। ঘুমের আবেশে যখন চোখের পাতা নরম করে আনে, তখনই হঠাৎ ধড়ফড় করে উঠে বসেন। ঘন ঘন স্মেলিং সল্ট শুঁকে অবসন্ন মস্তিষ্কটাকে চাঙ্গা করে তোলেন। মাঝ রাত্রে সুপ্তিশয়ান থেকেও হঠাৎ চমকে জেগে ওঠেন। চোখে ঠাণ্ডা জলের ছিটে দিয়ে, টেবিল ল্যাম্পের সুইচটা টিপে দেরাজ থেকে ফাইল টেনে নিয়ে বসেন। অদৃশ্য রত্নপীঠের প্রহরী কোন্ যখের সমস্ত শঙ্কা নিষ্ঠা ও সংশয়ের দায় যেন হঠাৎ তাঁরই স্কন্ধে এসে চেপেছে। তাই প্রতি মুহূর্তে উদ্ব্যস্ত হয়ে থাকেন। হারাই হারাই সদা ভয় হয়—ঘুমিয়ে পড়লে যেন একেবারে অসহায় হয়ে পড়বেন কালিকিঙ্করবাবু। সেই সুষুপ্ত কয়েকটি মুহূর্তের মধ্যেই তাঁর অজ্ঞাতসারে একটা খণ্ডবিপ্লব হয়ে যেতে পারে। জেগে উঠেই হয়তো শুনবেন, আহিরীটোলার চালের ভাঁড়ার লুঠ হয়ে গেছে। অবনী নামে একটা কুৎসিত কালো ছায়া, তার পেছনে একটা নরকরোটির পল্টন—ঘুষ অনুরোধ তোষামোদ ভীতি মৃত্যু তুচ্ছ করে তাঁর চালের ভাঁড়ারের ফটকের দিকে এগিয়ে আসছে। দারোয়ানেরা ঘুমিয়ে পড়েছে, ফোন করলে পুলিশ আসে না, চীৎকার করে ডাকলে প্রতিবেশীরা কেউ সাড়া দিয়ে ছুটে আসে না। চালের ভাঁড়ার লুঠ হয়ে যায়। হায়, হায়। বস্তা বস্তা সোনা যেন ছিঁড়েকুরে নিয়ে পালিয়ে যায় মেঠো ইঁদুরের দল। ফাইলের ওপরেই ঝিমোতে ঝিমোতে আবার চমকে ওঠেন কালিকিঙ্করবাবু। ঘন ঘন স্মেলিং সল্ট শুঁকতে থাকেন।

ছ' মাসে দু লক্ষ ত্রিশ হাজার পিটেছেন। বাকী এই স্টকটাকে কোনমতে সেই চরম দরের দিনটা পর্যন্ত যদি বাঁচিয়ে রাখা যায়, তবে? উগ্র রকমের একটা আনন্দের জ্বালায় ছটফট করে ওঠেন কালিকিঙ্করবাবু। রেডি রেকনার খুলে পেন্সিল হাতে তখুনি কাগজের ওপর আঁকজোক সুরু করেন। শেষ পর্যন্ত কত দাঁড়াতে পারে? পাঁচশো পার্সেন্ট? ছ'শো? আটশো? হাজার পার্সেন্ট হওয়া কি নিতান্তই অসম্ভব? ভগবান সকলকেই জীবনে ঠিক একটিবারের মত সত্যই সুযোগ দেন। যে মূর্খ সেই সুযোগ অবহেলা করলো, ইহকালের সুখের কপাটে বেড়ি পড়ে গেল তার। নইলে এই উনিশ বছর ধরে সুদ-চাটা ব্যাঙ্কারজীবনে শুধু দিনের পর দিন তাঁর শ্রম শক্তি মেধা বৃথা ক্ষয় হয়ে গেছে। পরধন পোদ্দারীর এই কীর্তিপথের শেষে শুধু একটা লালবাতির আলো অবধারিত পরিণামের মত এতদিন শিখায়িত হয়েছিল। তার জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন কালিকিঙ্করবাবু। তিনি জানতেন—ব্যাঙ্ক ডুববে, নিজে দেউলে হবেন। এই তো সেদিন গত বছর এপ্রিল মাসেই ব্যালেন্স সীটের দিকে তাকিয়ে কেঁদে ফেলেছিলেন কালিকিঙ্করবাবু। আজও সেকথা ভাল করেই তাঁর স্মরণে আছে। তাই আজ তাঁর সত্যিই বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করছে—ভগবান মাত্র একবার সুযোগ দেন, এবং সেই সুযোগ এসেছে। এই ভাগবত বিধানের বিরুদ্ধেই অবনী নামে একটি ভুঁইফোঁড় জাতি-সেবক ষড়যন্ত্র পাকিয়েছে। তাই কি বার বার কালিকিঙ্করবাবুর ঘুম ভেঙে যায়?

ভোর না হতেই ঘুম ভেঙে গিয়ে প্রতিদিনের মত কালিকিঙ্করবাবু ভাবছিলেন, হিসেব করছিলেন, চিঠি লিখছিলেন। দারোয়ানের সংখ্যা আর কতই বা বাড়ানো যায়? একটা গোলমাল বাধলে তারাই বা কতটুকু করতে পারবে? মাঝখান থেকে বৃথা ভরসা দিয়ে সিতা কোত্থেকে আর একটা রগচটা লোক নিয়ে এল। চেকগুলো ফেলে রেখে তিরিক্ষে হয়ে চলে গেল ইন্দ্রনাথ। লোকটা নিশ্চয় এতক্ষণে অবনীনাথের কানে সব বৃত্তান্ত শুনিয়েছে। অবনীও এতক্ষণে বোধ হয় অহঙ্কারে আরও দুঃসাহসী হয়ে উঠেছে।

কিন্তু বেশ আছে স্বরূপরাম। তার ইস্ক্রুপের কারখানায় অবনীর চেলাচামুণ্ডারা স্ট্রাইক বাধাবার চেষ্টা করেছিল—সিতার জাগৃতি সঙ্ঘের ছোঁড়ারা নাকি লাল ঝাণ্ডা দিয়ে ঠেঙিয়ে অবনীর চেলাদের বদমাইসী ঠাণ্ডা করে দিয়েছে। ছোঁড়ারা বাহাদুর বটে। এর জন্য কত আর খরচ করেছে স্বরূপরাম?

গুরুদয়ালবাবুও ভাবী জামাইয়ের সঙ্গে গলাগলি হয়ে চুটিয়ে কারবার করছেন। বেশ আছে সবাই।

চা-পানের পর এই প্রশ্নটাই তাঁর চিন্তার ভেতর গুন্‌গুন্ করে ঘুরতে লাগলো। সবাই বেশ আছে। গুরুদয়াল আছে, স্বরূপরাম আছে। আর, আরও কত ভাগ্যবান রয়েছেন। কিন্তু শুধু তাঁরই বেলায় এই সঙ্কটের দুর্ভোগ কেন?

চিন্তা করছিলেন কালিকিঙ্করবাবু। চিন্তায় হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন হয়। হঠাৎ যেন এতদিনের একটা বন্ধ দৃষ্টি খুলে গেল কালিকিঙ্করবাবুর। বর্তমানের ভুলটাকে তিনি দেখতে পাচ্ছেন—দেখে অনুতপ্ত হচ্ছেন। ভবিষ্যতের পথটাও সেই সঙ্গে স্বচ্ছ হয়ে উঠেছে—দেখে খুশি হচ্ছেন। জাগৃতি সঙ্ঘের ওপর হঠাৎ একটা মমতার আবেশে প্রায় বিহ্বল হয়ে পড়লেন কালিকিঙ্করবাবু। এতদিন তাদের ভুল বুঝে কত কটূক্তি করেছেন, তাচ্ছিল্য দেখিয়েছেন—আজ নিজেকে সত্যই অপরাধী মনে করছিলেন তিনি। আজ তাঁর সেই সংশয়টি চরমভাবে ঘুচে গেছে। জাতীয়তা নামে কথাটার মধ্যে কোন জোর নেই, ভরসা নেই, প্রশ্রয় নেই। কংগ্রেস নামে প্রতিষ্ঠানটা আগে বেশ ভাল ছিল। কিন্তু দিনে দিনে ওর মধ্যে বিষ ঢুকতে আরম্ভ করেছে। অবনীর মত লোকগুলিই ওর মধ্যে বেশী প্রশ্রয় পাচ্ছে। ওদের মুখে

শুধু জাতীয়তার বুলি, কিন্তু কাজের বেলায় চাষা ক্ষেপিয়ে জাতির জমিদারদেরই সায়েস্তা করতে চায়। সুযোগ পেলেই জাতি সেবার নাম করে মজুর উস্কিয়ে জাতির কারখানা আর কারবারের ওপর উপদ্রব করতে আসে।

জাতি কথাটার ওপর ভয়ানক ঘৃণা বোধ করছিলেন কালিকিঙ্করবাবু। একটা আদিকেলে ছেঁদো বুলি। তার চেয়ে জন কথাটা ঢের সুন্দর, বেশ ছোটখাট্ট নতুন নামটি। বেশ প্রগ্রেসিভ। জাতীয়তাকে আর বিশ্বাস করা যায় না। অবনীর মত কংগ্রেসানুচর দুর্বৃত্তের মুখেও জাতীয়তার ধ্বনি। কংগ্রেসরথের লাগাম আর ভদ্রলোকের হাতে নেই—যত চাষা ভুষো আর জেলফেরত হাভাতে বেকার গ্র্যাজুয়েটের হাতে পড়ে এই কংগ্রেসটাই দেশে সর্বনাশ ডেকে আনবে।

উদ্ধারের একটি মাত্র পথ আছে। স্বরূপরাম ও গুরুদয়ালবাবু উদ্ধার পেয়েছেন। কালিকিঙ্করবাবু ঠিক করলেন, তিনি জনতাবাদী হয়ে যাবেন, তিনি কম্যুনিস্ট হবেন। অবনীর জাতীয়তা থেকে বাঁচতে হলে জাগৃতি সঙ্ঘের জনতার সঙ্গে এক হয়ে না দাঁড়ালে আর উপায় নেই। জাতীয় বাণিজ্য সেবক সমিতির নাম আজই বদ্‌লে দিতে হবে। আর দেরী করার সময় নেই। এবার থেকে জনবাণিজ্য সেবক সমিতি—কত শ্রদ্ধেয় ও শ্রুতিমধুর শোনাবে এই নতুন নাম। আজই সমিতির সভ্যদের সাধারণ সভা আহ্বান করবেন কালিকিঙ্করবাবু। আজই তাঁরা একযোগে জাগৃতি সঙ্ঘের সদস্য হবেন।

জনবাণিজ্য সেবক সমিতি। কথাটা আবিষ্কার, না তাঁর অন্তরের একটা উপলব্ধি? নিজেকেই শতভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছিলেন কালিকিঙ্করবাবু। আশ্চর্য, আজ শুধু ভগবানে বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয়। তাঁর আহিরীটোলার গুদামের চাল আর কয়েকটি ঘণ্টা পরে জনতার খাদ্যে পরিণত হয়ে যাবে। নামের গুণ। আশ্চর্য!

একটা চিঠি লিখে শেষ করেই মুখ তুললেন কালিকিঙ্করবাবু। ঘরে ঢুকলো সিতা, সঙ্গে জয়ন্ত মজুমদার।

উপলব্ধি ও ঘটনার এই যোগাযোগ দেখে কিছুক্ষণের জন্য বিস্ময়ে ও আনন্দে শুধু অভিভূত হয়ে রইলেন কালিকিঙ্করবাবু। ভগবানে বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হচ্ছিল।

সিতা বললো।—সেদিন আপনি নিশ্চয় আমার ওপর খুব রাগ করেছিলেন মেসো মশাই।

কালিকিঙ্করবাবু।—একটুও না।

সিতা।—আমারই ভুল হয়েছিল মেসোমশাই। ইন্দ্রনাথকে ডাকা উচিত হয়নি।

কালিকিঙ্করবাবু।—ঠেকে শেখা গেল। এই একটা লাভ। যাক্, অন্য একটা কাজের কথা ছিল।

একটু থেমে নিয়ে উৎফুল্লভাবে হাসতে হাসতে কালিকিঙ্করবাবু বললেন।—ভেবে আশ্চর্য হচ্ছি, যাঁর সঙ্গে এই কাজের কথাটা ছিল তিনি আজ নিজেই অভাবিতভাবে এখানে উপস্থিত, জয়ন্তবাবু। আমার সৌভাগ্য দেখে আমি আশ্চর্য হচ্ছি।

জয়ন্ত।—আমি?

কালিকিঙ্করবাবু।—হ্যাঁ।

জয়ন্ত।—বলুন।

কালিকিঙ্করবাবু।—জাতীয় বাণিজ্য সেবক সমিতির জাতীয়তা আজ থেকে বাতিল করে দেব, এ বিষয়ে আপনার সাহায্য চাই।

জয়ন্ত।—যথাসাধ্য করবো।

কালিকিঙ্করবাবু।—জাগৃতি সঙ্ঘের আইডিয়লজিকে আমরাও পালন করতে পারি কি না, সেই সুযোগ আমাদের দিতে হবে।

জয়ন্ত।—বলুন, কি করতে হবে।

কালিকিঙ্করবাবু।—আমরাও আপনাদের সঙ্ঘের সদস্য হব। দেশের লোকের জাতীয়তার স্বরূপ খুব চিনেছি। পেট ভরে গেছে আমাদের। ঐ ছেঁদো কথাটির ওপর আর আমাদের কোন শ্রদ্ধা বা আগ্রহ নেই।

জয়ন্ত সস্মিত মুখে একবার সিতার দিকে তাকালো। তারপর দৃষ্টি ঘুরিয়ে উৎসাহিত হয়ে বলে উঠলো।—বাস্তবিক, কী আশ্চর্য যোগাযোগ। ওঁর কাছে আমি সবই শুনেছি। আপনার ঘরে ঢুকবার আগের মুহূর্তেও ওঁকে বলেছি, ঐ জাতীয়-ফাতীয় কথাগুলি বাদ দিলেই আমাদের সঙ্ঘে আপনারা বিনাবাধায় চলে আসতে পারেন। দেখছি, আপনি নিজেই আগে সেটা বুঝেছেন। আসুন আমাদের সঙ্ঘে। আপনাদের জনবাণিজ্য সমিতির ভেতর দিয়েই আমরা আর একটা ফ্রন্ট খুলবো।

কালিকিঙ্করবাবু চায়ের জন্য বয়গুলিকে ডাকাডাকি করছিলেন। অদ্ভুত রকমের একটা স্ফূর্তিতে তাঁর চিন্তাপীড়িত মনটা লঘু হয়ে উঠেছিল। এ রকম স্বাচ্ছন্দ্যের আস্বাদ বহুদিন পাননি উনি—অথবা জীবনে এই প্রথম। হাস্যালাপের ফাঁকে ফাঁকে তবু এক একবার অন্যমনস্কের মত সিতার দিকে তাকাচ্ছিলেন, এটাও যেন একটি প্রশ্ন।

কালিকিঙ্করবাবু আশা করেছিলেন, সিতাই কথাটা তুলবে এবং সেই কথার একটা নিষ্পত্তি হয়ে গেলে তিনি চূড়ান্তভাবে আশ্বস্ত হতে পারেন। তারপর সত্যই তিনি সুখী।

সিতা হয়তো ভুলে গেছে। অগত্যা কালিকিঙ্করবাবু নিজেই উত্থাপন করার চেষ্টা করলেন।—আপনি নিশ্চয় জানেন জয়ন্তবাবু, অবনীনাথ নামে একটা ন্যাশনালিস্ট একটা দল পাকিয়েছে।

ভূমিকা শুনেই জয়ন্ত বাধা দিয়ে বলে উঠলো।—বুঝেছি, আর বলতে হবে না আপনাকে। অবনীর কথা ভেবে আপনি মোটেই দুশ্চিন্ত হবেন না। জাগৃতি সঙ্ঘ রয়েছে কেন?

তবু যেন একটা খট্‌কা রয়ে গেল। কালিকিঙ্করবাবু বললেন।—আমি বলছিলাম এমন কোন ব্যবস্থা কি করা যায় না, যাতে অবনীর সঙ্গে কোন সংঘর্ষের মধ্যে আদৌ আসতে না হয়?

কি রকম যেন চিবিয়ে চিবিয়ে, চোয়ালটা শক্ত করে কথাগুলি বলছিলেন কালিকিঙ্করবাবু।

জয়ন্ত বললো।—সংঘর্ষ হবেই, তার জন্য এখন থেকেই আমরা তৈরী হচ্ছি। তাই যেভাবে পারে, সঙ্ঘ আজ নিজেকে শক্তিশালী করছে। আপনাদের পেয়েও সঙ্ঘের শক্তি অনেকটা বাড়লো।

কালিকিঙ্করবাবু।—ধরুন, কতগুলি হাভাতে নিয়ে অবনী যদি একটা সত্যাগ্রহ করেই বসে, ঠিক তখন তার সঙ্গে সংঘর্ষ করতে গেলে.........।

জয়ন্ত হেসে ফেললো।—তা'হলে আপনি কি করতে চান বলুন?

কালিকিঙ্করবাবু।—কিছু টাকাকড়ি দিয়ে যদি অবনীকে.........।

জয়ন্ত।—কোন লাভ নেই। টাকা ও নেবে, গোলমাল করতেও ছাড়বে না। পঞ্চমবাহিনীদের স্বভাবই এই।

কালিকিঙ্করবাবু একটু নিষ্প্রভ হয়ে পড়লো।—তা'হলে কি কোন উপায় নেই?

জয়ন্ত বিরক্তি চাপতে গিয়ে একটু গম্ভীর হয়ে কালিকিঙ্করবাবুর কথাগুলি একটু ঔদাসীন্যের সঙ্গে শুনতে লাগলো।

কালিকিঙ্করবাবু।—মারধর করা বা ঐরকম সাংঘাতিক কিছু করতে বলছি না। শুধু তার এই বদ উৎসাহটা ভেঙে দেওয়া যেত, তা'হলেই.........।

জয়ন্ত সেই রকমই গম্ভীর থেকে বললো।—এক কাজ করতে পারেন।

কালিকিঙ্করবাবু।—বলুন।

উত্তর দেবার আগে একবার থেমে গিয়ে জয়ন্ত সিতার দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টি নিয়ে তাকালো।

সিতা বললো।—আমার পরামর্শ শুনে ইন্দ্রবাবুর মারফৎ টাকা দিতে গিয়ে মেসোমশাই অনর্থক একবার নাকাল হয়েছিলেন। তুমি আবার সেইরকম একটা কিছু করতে বলো না। যা বলবে তাতে যেন কাজ হয়।

কিছুক্ষণের মত হঠাৎ স্তম্ভিত হয়ে গেল জয়ন্ত। সিতার কথাগুলিকে যেন সে সমস্ত অন্তরাত্মা দিয়ে পরীক্ষা করে দেখছিল। জয়ন্তের মুখের গাম্ভীর্যের ওপর সিতার কথাগুলি থেকে একটা নির্বিকার নিষ্ঠুরতার আঁচ লেগে ধীরে ধীরে গভীর বিষন্নতার কালি ছড়িয়ে দিচ্ছিলো। সিতাকে যেন জীবনে এই প্রথম ভয়ের চক্ষে দেখলো জয়ন্ত। কালিকিংকরবাবু উৎসুক ভাবে তেমনি তাকিয়ে আছেন। জয়ন্তর হঠাৎ গা-বমি করে উঠলো। রুমালটা জলে ভিজিয়ে ঘাড় আর মুখের ওপর আস্তে আস্তে দুচারবার বুলিয়ে নিয়ে একটু সুস্থ হয়ে নিল জয়ন্ত।

কালিকিংকরবাবু।—বলুন।

জয়ন্ত।—অবনী যে একটি ব্যাংকে কেরাণীগিরি করে, সে খবর আপনি জানতেন?

কালিকিংকরবাবু।—না।

জয়ন্ত।—কাবেরী ব্যাংকে কাজ করে অবনী।

কালিকিংকরবাবু চেঁচিয়ে উঠলেন।—কাবেরী ব্যাংকে? আমার বেয়াই জগৎ ভট্চাযের কাবেরী ব্যাংকে?

জয়ন্ত।—জগৎ ভট্চায আপনার বেয়াই হন, সে খবর অবশ্য জানতাম না।

কালিকিংকরবাবু।—তা'হলে আজই আমি জগৎবাবুকে গিয়ে একবার.........।

জয়ন্ত।—জগৎবাবুকে একটু ভাল করে বুঝিয়ে দেবেন যে, না-জেনে কী ভয়ানক একটি জীব তিনি মাইনে দিয়ে পুষে রেখেছেন।

কালিকিংকরবাবুর যেন তর সইছিল না। —আজই আমি নিজে গিয়ে জগৎবাবুকে তাতিয়ে দিয়ে আসছি। আজই যেন ঐ বিভীষণটাকে পত্রপাঠ বিদায় করে দেন। চিরকাল এই ধরণের একটা দুর্ভাগ্যের সংগে লড়ে আসছি জয়ন্তবাবু। দুধ দিয়ে যাকেই পুষি, সেই কালসাপ হয়ে যায়—আমার চব্বিশ বছরের করবারী জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি। বড় দুঃখে বলছি।

জয়ন্ত।—আমি এইবার উঠবো কালি-কিংকরবাবু।

কালিকিংকরবাবু বিদায় অভ্যর্থনা সরবরাহ করতে গেট পর্যন্ত এলেন।

অন্যমনস্কের মতই গাড়িতে উঠে স্টিয়ারিং ধরে বসে রইল জয়ন্ত। সিতা এল অনেকক্ষণ পরে। সিতাকে আহবান করতে বা সিতার ওঠা পর্যন্ত অপেক্ষা করতেও পারেনি জয়ন্ত। নিজের মনে সোজা চলে এসে গাড়িতে উঠেছে। একটা প্রকান্ড ওলটপালট হয়ে গেল বলতে হবে। সিতাই আজ জয়ন্তকে অনুসরণ করে পেছু পেছু হেঁটে এল। এই বোধ হয় প্রথম।

গাড়িটা ততক্ষণে ডোভার লেনের কাছা-কাছি এসে পড়েছে। সিতা তখনো মনের ভেতর একটা সংশয় বিস্ময় ও অপমানের জ্বালার সংগে লড়ছিল। জয়ন্ত একটা কথা বলা মাত্র এই অপমানের একটা পাল্টা আঘাত দিতে হবে—সেই সুযোগটির জন্য ধৈর্য ধরে নিজেকে সামলে রেখেছিল সিতা। নিজের এইটুকু সংযমও যেন অপমানের মত পীড়াদায়ক হয়ে উঠছিল তার কাছে। ছায়া জয়ন্ত যেন হঠাৎ কঠিনকায় একটি ব্যক্তি হয়ে উঠলো আজ। জয়ন্তকে দু'কথা শুনিয়ে দিতেও আজ তাকে ভাবতে হচ্ছে, কোনদিন যার জন্য মুহূর্তকেও দ্বিধা করতে হয়নি।

শেষ পর্যন্ত জয়ন্ত চুপ করেই রইল। এভাবে জয়ন্তকে কখনো দেখেনি সিতা, এই ধরণের শক্ত সোজা আপন-মনা জয়ন্তের সংগে মেলামেশার রীতি কোনদিনও তার অভ্যাসে নেই। সিতার মনের যত উষ্মা আর মুখরতা ধৈর্যের চূড়ান্তে উঠেও হঠাৎ একটা সশংক সংকোচে একেবারে নীচে নেমে গেল।

যেন এই উদ্‌ভ্রান্তি থেকে মুক্তি পাবার জন্যই সিতা বলে উঠলো।—অবনীনাথের বাড়াবাড়ি এইবার ঠান্ডা হয়ে যাবে।

জয়ন্ত যেন প্রসংগটা এড়িয়ে যাবার জন্যই ছোট একটা উত্তর দিয়ে সেরে দিল।—হুঁ।

সিতা আরও বিব্রত হয়ে উঠলো।—তুমি কি অন্য কোন কাজের কথা ভাবছো?

জয়ন্ত।—কেন জিজ্ঞেসা করছো?

সিতা।—তোমাকে খুবই অন্যমনস্ক মনে হচ্ছে।

জয়ন্ত গাড়ির স্পীড কমিয়ে দিয়ে সীটের ওপর একটু কাৎ হয়ে বসে স্টীয়ারিং ধরে রইল। সিতার মুখের দিকে তাকাবার কোন চেষ্টা না করেই প্রশ্ন করলো।—আচ্ছা, অবনীর বাড়াবাড়ি ঠান্ডা করার জন্য তুমি হঠাৎ এত উৎসাহী হয়ে উঠলে কেন?

সিতা আশ্চর্য হলো।—এরকম অদ্ভুত প্রশ্ন করছো কেন? তুমিও কি উৎসাহী নও?

জয়ন্ত। —ঠিক যে-কারণে অবনীকে আমি সায়েস্তা করতে চাই, তুমিও কি সেই কারণে চাইছ?

সিতা।—নিশ্চয়; সংঘে থাকবো অথচ সংঘের নীতি মেনে চলবো না—অন্তত আমার মধ্যে সে ভন্ডামি পাবে না।

সিতার চোখে পড়লো, জয়ন্তর ঠোঁটের ওপর কুটিল একটা হাসি ধীরে ধীরে দীর্ঘায়ত ও স্পষ্ট হয়ে উঠছে। ভীরুর মত গলার স্বর চেপে সিতা বললো।—তুমি বোধ হয় আমার কথাটা বিশ্বাস করলে না। আজ বারবার তুমি আমায় অপমান করছো। আমি ভেবে

পাচ্ছি না, আজ হঠাৎ কোথা থেকে তোমার এত সাহস.........।

জয়ন্ত চকিতে একবার ঘাড় ফিরিয়ে তাকালো সিতার দিকে। জয়ন্তর চোখের কঠোর দৃষ্টিটা সেই মুহূর্তে সিতার সব মুখরতার গলা টিপে শান্ত করে দিল।

সিতাই আবার প্রশ্ন বলো।—বল, কী বলছিলে?

জয়ন্ত।—অবনীর ওপর তোমার নিজের একটা আক্রোশ আছে। জাগৃতি সংঘের নীতির সংগে এই আক্রোশের কোন সম্পর্ক নেই।

সিতা।—আমার নিজের আক্রোশ? কেন? এর কোন মানে হয় না।

জয়ন্ত।—অবনী জাগৃতি সংঘের কতটুকু ক্ষতি করেছে, জাগৃতি সংঘ সে-খবর রাখে। এ ছাড়াও অবনী যেন তোমার বিশেষ একটা ক্ষতি করেছে, তার জন্যই তুমি অবনীকে ঠান্ডা করে দিতে চাও।

সিতার কথার প্রাচুর্য সেই নিমেষে ফুরিয়ে গেল। জয়ন্তর কথাগুলি নির্লজ্জ কৌন্সুলীর জেরার মত সিতার মনের চারদিকে একটা শক্ত বেড়ার বাঁধ দিয়ে ঘিরে ধরছিল। কথার ফাঁকে পালিয়ে যাবার কোন পথ ছিল না। সিতার স্তব্ধতার ওপর আর একটা আঘাত দিয়ে জয়ন্ত বললো। —আমি সত্যিই ভয় পেয়েছি সিতা। তোমাকে যেন আজ ঠিক চিনতে পারছি। শত্রুকে কিভাবে শেষ করতে হয়, সে-কৌশল আমিও জানি। তবু, তুমি যেন আমাকেও ছাড়িয়ে গেছ।

—কিসে তোমায় ছাড়িয়ে গেলাম? তোমার সাহস মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে জয়ন্ত!

ধারালো ছুরির নিক্কনের মতই সিতার গলার স্বরটা প্রতিবাদ করে উঠলো।

জয়ন্ত আস্তে আস্তে উত্তর দিল। —নির্মমতায়।

সিতার মাথাটা ঝুঁকে পড়লো। জয়ন্ত তখনো শান্তভাবেই বলে যাচ্ছিল। —তবু তোমার প্রশংসা না করে পারি না। শিশিরের জন্য, ভালবাসার জন্য তুমি সব করতে পার। অবনী শিশিরকে সরিয়ে নিয়ে গেছে। তাই আজ অবনীকে ঠান্ডা করছো। কাল আর কাউকে ঠিক এমনিভাবে ঠান্ডা করে দিতে তুমি একটুও দ্বিধা করবে না জানি।

সিতা দুহাত দিয়ে চোখ ঢেকে আর্তনাদ করে উঠলো। —চুপ করো জয়ন্ত।

জয়ন্ত। —আমার সবচেয়ে আশংকা কি হচ্ছে জান? শেষ পর্যন্ত ঐ শিশিরকেই ঠান্ডা করে দেবার জন্য তৈরী হবে তুমি। সেদিন তোমার নির্মমতা আবার কী বিচিত্র-রূপে দেখা দেবে জানি না।

সিতা।—আমার ওপর বড় বেশী রাগ

(শেষাংশ ৩৫৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

রঙ্গজগৎ

'ছদ্মবেশী'—ডি ল্যুক্স পিক্‌চার্সের নতুন বাঙলা ছবি। পরিচালনাঃ অজয় ভট্টাচার্য; কাহিনীঃ উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়; সুর-শিল্পীঃ কুমার শচীন দেববর্মা; ভূমিকায়ঃ জহর গঙ্গোপাধ্যায়, পদ্মা দেবী, ছবি বিশ্বাস, সন্ধ্যারাণী, শান্তি গুপ্তা, ইন্দু মুখার্জি, শৈলেন চৌধুরী, মিহির ভট্টাচার্য প্রভৃতি।

গত ১৫ই জানুয়ারী উত্তরা, পূরবী ও পূর্ণ কলিকাতার এই তিনটি প্রেক্ষাগৃহে সুপরিচিত কবি, গীতিকার ও পরিচালক অজয় ভট্টাচার্য পরিচালিত শেষ বাণী-চিত্র 'ছদ্মবেশী' একযোগে মুক্তিলাভ করেছে। ঐ দিন উত্তরা প্রেক্ষাগৃহে বেলা ১১টার সময় অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে স্বর্গত পরিচালকের স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে একটি বিরাট সভার অনুষ্ঠান হয়েছিল। কলিকাতার চিত্রশিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পরিচালক, সংগীত পরিচালক, অভিনেতা, অভিনেত্রী এবং সুপরিচিত সাংবাদিক ও সাহিত্যিকেরা সেদিন সভায় সমবেত হয়েছিলেন। যথারীতি শোক-সভার অনুষ্ঠানের পর 'ছদ্মবেশী' চিত্রখানি প্রদর্শিত হয়েছিল। চিত্রখানি দেখতে দেখতে শুধু মনে হচ্ছিল পরিচালক অজয়বাবু তাঁর শেষ চিত্রের সাফল্য স্বচক্ষে দেখে যেতে পারলেন না। এ যে কত বড় দুঃখের ব্যাপার, যাঁরা অজয়বাবুকে ব্যক্তিগতভাবে জানতেন না, তাঁরা তা বুঝবেন না। 'ছদ্মবেশী'র সঙ্গে অজয়বাবুর অকাল মৃত্যুর করুণ স্মৃতি বিজড়িত আছে, একথা বাদ দিয়েও স্বীকার করতে দ্বিধা নেই যে, 'ছদ্মবেশী' একখানি প্রথম শ্রেণীর বাঙলা চিত্র হয়েছে। স্বর্গত পরিচালক নিজের বুকের রক্ত দিয়ে বাঙালী দর্শক সাধারণের জন্যে হাসির যে বিপুল আয়োজন করে গেছেন, তা বহুদিন পর্যন্ত তাদের আনন্দ বিধান করতে পারবে—এ বিশ্বাস আমাদের আছে। সত্যি কথা বলতে কি—তাঁর প্রথম চিত্র 'অশোকে'র কথা বিবেচনা করে আমরা ভাবতেই পারিনি যে, 'ছদ্মবেশী'তে পরিচালক অজয় ভট্টাচার্য এত বেশী সাফল্য অর্জন করতে পারবেন। কিন্তু কার্যত দেখলাম তাঁর প্রতিভা আমাদের সকল প্রত্যাশাকে ছাড়িয়ে চলে গেছে। স্বভাবত দরিদ্র বাঙলা চিত্রশিল্প অকালে একজন প্রতিভাবান্ চিত্র-পরিচালককে হারাল—'ছদ্মবেশী' দেখতে দেখতে বারবার এই ব্যথাই বুকে বাজে। ডিল্যুক্স পিকচার্সের কর্তৃপক্ষ অজয়বাবুর স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্যে চিত্রের গোড়ায় তাঁর একখানি প্রতিকৃতি জুড়ে দিয়ে যে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেছেন, সেজন্যে তাঁরা দেশবাসীর ধন্যবাদভাজন হয়েছেন।

নিছক হাসির ছবি বাঙালীর যদি ভাল লাগে, তবে 'ছদ্মবেশী' জনপ্রিয়তা অর্জন করবেই। নিছক আনন্দ দানের জন্যে মিলনাত্মক হাল্কা হাসির ছবি বাঙলায় তোলা হয় না বললেই হয়। বহুদিন পূর্বে কুমার প্রমথেশ বড়ুয়া 'রজত-জয়ন্তী' নামে এই জাতীয় একটি লঘু হাস্যের কমেডি ছবি তুলেছিলেন। আমাদের মতে অজয় বাবুর 'ছদ্মবেশী' 'রজত-জয়ন্তী'র চেয়ে ঢের বেশী উচ্চাঙ্গের চিত্র হয়েছে। জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের মূল কাহিনী অবলম্বনে পরিচালক অজয়বাবু আমাদের জন্যে যে হাসির প্রস্রবণ সৃষ্টি করেছেন, নানা দিক দিয়ে তার তুলনা মেলা মুস্কিল। প্রধানত হাস্যরস সৃষ্টিই যার উদ্দেশ্য সে কাহিনীর মধ্যে ঘটনার অবাস্তবতা কিংবা অসম্ভাব্যতা থাকা খুব অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু পরিচালক ও চিত্রনাট্যকার অজয়বাবু মূল কাহিনীর ঘটনা-বিন্যাসকে এমনভাবে পর্দার গায়ে রূপায়িত করেছেন যে, ঘটনার অস্বাভাবিকতা খুব কম ক্ষেত্রেই আমাদের রসোপভোগকে পীড়িত করে। প্রথম থেকে শেষ অবধি হাল্কা হাসির হাওয়ায় প্রেক্ষাগৃহ মুখর হয়ে ওঠে। কিন্তু তীক্ষ্ণ বাস্তব-বোধ-সমন্বিত অজয়বাবু এই হালকা পরিবেশের মধ্যেও কিছুক্ষণের জন্যে গম্ভীর আবহাওয়ার সৃষ্টি না করে পারেন নি। আমরা বার্থপ্রেমিক শিক্ষিত যুবককে (ছবি বিশ্বাস অভিনীত) কেন্দ্র করে অজয়বাবু যে সর্বহারার দলের ছবি ক্ষণিকের জন্যে আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরেছেন—তা'র কথা বলছি। এই সর্বহারাদের মত কঠিন বাস্তব-সত্য বোধ হয় আর নেই। এদের মধ্যে আমরা অনেকেই কি আমাদের নিজেদের জীবনকে প্রতিফলিত দেখতে পাই না? ছবির এই অংশে পরিচালকের প্রগতিশীল মনের একটা সুস্পষ্ট হদিস মেলে। এই অংশটা ছাড়া সারা কাহিনীতে আর কোন সমস্যা নেই বলা চলে। মূল কাহিনীতে এ অংশটা নেই—এটা অজয়-বাবুর নিজের সৃষ্টি। অথচ মূল কাহিনীর সঙ্গে এই অংশকে তিনি এমন কৌশলে সংযোজিত করেছেন যে, হাল্কা হাসির রেশও কাটে না—অথচ কিছুক্ষণের জন্যে হলেও দর্শকদের ভাবতে হয়। পরিচালকের পক্ষে এটা কম কৃতিত্বের কথা নয়।

কাহিনী এবং পরিচালনার পরেই আসে অভিনয় নৈপুণ্যের কথা। এ বইয়ের অভিনেতা-অভিনেত্রীরা সঙ্ঘবদ্ধভাবে সু-অভিনয় করেছেন বলা চলে। নায়কের ভূমিকায় জহর গঙ্গো-পাধ্যায় অপূর্ব অভিনয়-নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছেন। পরিচালক শৈলজানন্দবাবুর কৃপায় একটি বিশেষ শ্রেণীর টাইপ চরিত্রে অতি-অভিনয় করা তাঁর মুদ্রাদোষ হয়ে দাঁড়িয়েছে প্রায়। 'ছদ্মবেশী'তে তিনি অতি-অভিনয়-দোষ-মুক্ত সুন্দর সাবলীল অভিনয় করেছেন। অন্য ভূমিকায় পদ্মা দেবী সংযত সুন্দর অভিনয় করেছেন। সরল খেয়ালী ব্যারিস্টারের ভূমিকায় সুপরিচিত হাস্যরসিক অভিনেতা ইন্দু মুখোপাধ্যায় বহুদিন পরে সংযত সুসংবদ্ধ অভিনয় করে আমাদের তৃপ্তি দিয়েছেন। শিক্ষিত সর্বহারা বার্থপ্রেমিক যুবকের পার্শ্ব-চরিত্রে ছবি বিশ্বাসের রূপসজ্জা এবং অভিনয় মাঝে মাঝে আমাদের বিদেশী চরিত্রাভিনয়ের কথা মনে করিয়ে দেয়। তাঁর অভিনয়-নৈপুণ্য স্বীকার করলেও, তাঁর অভিনয় কোন কোন দর্শকের ভাল নাও লাগতে পারে। ব্যারিস্টার-গৃহিণীর ভূমিকায় শান্তি গুপ্তার অভিনয় এবং বসুধার ভূমিকায় সন্ধ্যারাণীর অভিনয় ভালই বলা চলে। অধ্যাপকের ভূমিকায় শৈলেন চৌধুরী উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেছেন। সবচেয়ে দুর্বল অভিনয় করেছেন মিহির ভট্টাচার্য।

আবহ-সংগীত এবং কণ্ঠ-সংগীত 'ছদ্মবেশী'র অন্যতম প্রধান সম্পদ। এর জন্যে সুরশিল্পী কুমার শচীন দেববর্মা বিশেষ কৃতিত্বের দাবী করতে পারেন। কণ্ঠ-সংগীতে সাধারণ প্রচলিত চটুল সুর দেবার চেষ্টা না করে—তিনি যে রাগ-রাগিণীর সংমিশ্রণে উপভোগ্য সুর সৃষ্টির প্রয়াস পেয়েছেন—সেটা নিঃসন্দেহে প্রশংসার বিষয়। পটভূমিকা থেকে গাওয়া তাঁর নিজের কণ্ঠের দু'খানি সংগীতও আমাদের ভাল লেগেছে। 'ছদ্মবেশী'র কাহিনী শুরু হবার আগে তিনি যে আবহ-সংগীতের সাহায্যে হাল্কা হাসির সুর ফুটিয়ে তুলেছেন—বাঙলা ছবিতে তার তুলনা মেলে না। এর জন্য শচীন দেব[illegible] বিশেষ প্রশংসার দাবী করিতে পারেন। 'ছদ্মবেশী'র আলোকচিত্র এবং শব্দ-গ্রহণ মোটের উপর ভাল।

ছায়া রঙ্গমঞ্চে 'তাসের দেশ'

পার্বতী দেবীর প্রযোজনায় ও শ্রীশান্তিদেব ঘোষের পরিচালনায় রবীন্দ্রনাথের 'তাসের দেশ' এলিট রঙ্গমঞ্চে ছয় রাত্রি পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে যেরূপ সাফল্যের সহিত অভিনীত হয়েছে তার সমালোচনা ইতিপূর্বে 'দেশ' পত্রিকায় আমরা লিখেছি। বহু দর্শক টিকিটের অভাবে বিফল-মনোরথ হয়ে ফিরে যাওয়ায় এবং জনসাধারণের অনুরোধে কর্তৃপক্ষ ছায়া রঙ্গমঞ্চে পুন-রাভিনয়ের আয়োজন করে ধন্যবাদভাজন হয়েছেন। নৃত্যে গানে সাজসজ্জায় ও অভিনয়ে এমন একটি শ্রেষ্ঠ প্রযোজনা কল্‌কাতায় সচরাচর দেখা যায় না; সুতরাং যাঁরা 'তাসের দেশ' অভিনয় এখনও দেখেন নি, তাঁদের এই সুযোগ না হারাবার জন্যে অনুরোধ জানাচ্ছি। আগামী শনিবার, ২৯শে জানুয়ারী ৬-১৫ মিনিটে ও রবিবার, ৩০শে জানুয়ারী ৩টা ও ৬-১৫ মিনিটে ছায়া রঙ্গমঞ্চে এই অভিনয় হবে।

খেলাধূলা

বাঙলার এ্যাথলেটিকস-এর স্ট্যান্ডার্ড

নিখিল ভারত অলিম্পিক প্রতিযোগিতা শীঘ্রই পাতিয়ালায় অনুষ্ঠিত হইবে। এই অনুষ্ঠানে যোগদান করিবার জন্য ভারতের প্রায় সকল প্রদেশেই তোড়জোড় চলিয়াছে। এমন কি অনেক প্রাদেশিক অলিম্পিক এসোসিয়েশন ইতেমধ্যেই নিজ নিজ প্রদেশের প্রতিনিধি নির্বাচন কার্য শেষ করিয়াছেন। বাঙলার অলিম্পিক এসোসিয়েশনের পরিচালকগণ সকল সময়েই শেষ মুহূর্তে উৎসাহ লাভ করিয়া থাকেন। সেইজন্য এখনও পর্যন্ত তাঁহারা প্রতিনিধি নির্বাচন শেষ করিতে পারেন নাই। তবে শোনা যাইতেছে—সম্প্রতি প্রাদেশিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হইবে তাহার সমাপ্তির পরে প্রতিনিধিদের নাম প্রকাশ করিবেন। কোন্ কোন্ এ্যাথলীট এই তালিকায় স্থান পাইবেন তাহা বলা আমাদের পক্ষে যে একেবারেই অসম্ভব তাহা নহে; তবে হয়তো কাহারও মনে আঘাত লাগিতে পারে এই আশংকায় ইহা হইতে বিরত রহিলাম। তবে এই সময় বাঙলার এ্যাথলেটিকস্ এর স্ট্যান্ডার্ড সম্পর্কে আলোচনা না করা অন্যায় হইবে বলিয়া মনে করি। কারণ, এই বৎসরে বেঙ্গল অলিম্পিক এসোসিয়েশনের অন্তর্ভুক্ত যতগুলি স্পোর্টস সম্পন্ন হইয়াছে তাহার ফলাফল অবলোকন করিয়া আমরা বিশেষ সন্তুষ্ট হইতে পারি নাই। প্রতিযোগিতার অধিকাংশ বিষয়ে বাঙলার এ্যাথলিটগণ যে স্তরের নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন তাহাতে আমরা দৃঢ়তার সহিতই বলিতে পারি যে, বাঙলার এ্যাথলেটিকসের স্ট্যান্ডার্ড এই বৎসরে অন্যান্য বৎসরের তুলনায় খুবই নিম্ন স্তরের হইয়াছে। সুতরাং এই স্ট্যান্ডার্ডের এ্যাথলীটদের লইয়া নিখিল ভারত অলিম্পিক অনুষ্ঠানে যোগদান করিলে বাঙলার সম্মান ও সুনাম রক্ষা পাইবে কিনা সে বিষয় যথেষ্ট সন্দেহ আছে। খুবই আশ্চর্যের বিষয় যে, বেঙ্গল অলিম্পিক এসোসিয়েশনের পরিচালকগণ উৎসাহী এ্যাথলীটদের শিক্ষার ব্যবস্থা পাঁচ মাস পূর্বে করিয়াও এ্যাথলীটদের উন্নততর নৈপুণ্যের অধিকারী করিতে পারিলেন না? আমরা ঠিক জানি না—এজন্য কাহারা দায়ী। তবে অনেক এ্যাথলীট বলিয়া থাকেন, "শিক্ষার কেন্দ্র শহরের নিভৃত কোণে হওয়ায় ও যানবাহনের সুবিধা না থাকায় তাঁহারা ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও কেন্দ্রে যোগদান করিতে পারেন নাই।" ইহা ছাড়াও নাকি অনেক দিন তাঁহারা শিক্ষা-কেন্দ্রে উপস্থিত হইয়া "শিক্ষক বা পরিচালক কাহারও দর্শন পান নাই।" এই সকল উক্তির কতখানি সত্য, কতখানি মিথ্যা সে সম্পর্কে আমরা কিছুই বলিতে চাহি না। তবে আমাদের আশংকা হয়, এই উক্তি করিবার মত কোন কারণ না থাকিলে এ্যাথলিটগণ কখনই এইরূপ বলিতে সাহসী হইতেন না। তাঁহাদের নিশ্চয়ই কখনও না কখনও কেন্দ্রে উপস্থিত হইয়া হতাশ হইয়া ফিরিয়া আসিতে হইয়াছে! তাহা ছাড়া আমরা কিছুতেই বুঝিতে পারি না—এতদিন গড়ের মাঠে অনুশীলন করিবার যে ব্যবস্থা ছিল তাহা বলবৎ না রাখিয়া হঠাৎ এইরূপভাবে অজানা অচেনা, যাতায়াতের অসুবিধাজনক একটি স্থানে শিক্ষার ব্যবস্থা করিবার কি প্রয়োজন হইয়াছিল? শিক্ষকের সুবিধার জন্য যদি এই ব্যবস্থা হইয়া থাকে, তাহা হইলেও এ্যাথলীটদের সুবিধা বা অসুবিধার কথা চিন্তা করা খুবই উচিত ছিল। যাহা হউক ভবিষ্যতে এই সকল ব্যবস্থা করিবার পূর্বে বেঙ্গল অলিম্পিক এসোসিয়েশনের পরিচালকগণ একটু বিবেচনা করিয়া করিলে এই সকল অবান্তর কথা আমাদের শুনিতে হইত না।

নিখিল ভারত অলিম্পিক অনুষ্ঠানে গত কয়েকবার বাঙলার প্রতিনিধিগণ এ্যাথলেটিকসে এই বৎসর অপেক্ষা উন্নততর নৈপুণ্যের অধিকারী হইয়াও বিশেষ সুবিধা করিতে পারেন নাই। কেবল ভারোত্তলন, কুস্তি এবং বিভিন্ন খেলায় সাফল্য লাভ করায় বাঙলা দলগত হিসাবে সুনাম প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম হন। এই বৎসরে কুস্তি-বিভাগে যোগদান করিবার মত ব্যায়ামবীরগণকে এখনও দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না। বাস্কেট বল, ভলিবল প্রভৃতি খেলায় যে-সকল খেলোয়াড় নির্বাচন করা হইয়াছে, তাঁহাদের অধিকাংশরই খেলা পড়িয়া গিয়াছে। একমাত্র ভারোত্তলন প্রতিযোগিতায় বাঙলার প্রতিনিধিগণের সুনাম অর্জন করিবার সম্ভাবনা আছে। এ্যাথলেটিকসে কেহ সুনাম অর্জন করিতে পারিবেন কিনা জোর করিয়া বলা চলে না। তবে আশংকা হয়, এই বিভাগের প্রতিনিধিদের মধ্যে অনেক বৈদেশিক সৈনিক এ্যাথলীটদের নাম দেখিতে পাওয়া যাইবে। সুতরাং দেশের দুর্দিনের সময় জোড়াতালি দেওয়া একটি দল লইয়া আশানুরূপ আশংকার মধ্যে যোগদান করিবার কোনই সার্থকতা আছে বলিয়া মনে হয় না।

যশোবন্ত ক্লাব টেনিস প্রতিযোগিতা

সম্প্রতি ইন্দোরে যশোবন্ত ক্লাবের পরিচালনার এক 'হার্ড কোর্ট টেনিস' প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই প্রতিযোগিতার সিংগলস ও ডাবলস উভয় বিভাগেই গউস মহম্মদ সাফল্য লাভ করিয়াছেন। মিক্সড ডাবলসে তিনি ফাইনালে উঠিয়াও পরাজিত হন। এই প্রতিযোগিতা শেষ হইবার পর সৈনিক যুদ্ধ ভাণ্ডারের সাহায্যের উদ্দেশ্যে একটি প্রদর্শনী টেনিস খেলা হয়, তাহাতে গউস মহম্মদ সৈনিক খেলোয়াড় চয়কে পরাজিত করেন। নিম্নে খেলার ফলাফল প্রদত্ত হইল :

পুরুষদের সিংগলস

গউস মহম্মদ ৬-৩, ৬-৪, ৪-৬, ৬-১ গেমে ইরসাদ হোসেনকে পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডবলস্

গউস মহম্মদ ও কৃষ্ণস্বামী ৭-৫, ৬-১, ৬-১ গেমে জে কল ও এম কলকে পরাজিত করেন।

মিক্সড ডবলস

মিসেস ভগৎ ও জে কল ৬-৩, ৬-১ গেমে মিস্ আংকেলসারিয়া ও গউস মহম্মদকে পরাজিত করেন।

প্রদর্শনী খেলা

গউস মহম্মদ ৪-৬, ৬-২, ৬-২ গেমে চয়কে পরাজিত করেন।

তিলাঞ্জলি

(৩৫৪ পৃষ্ঠার পর)

করছো জয়ন্ত। এত বিদ্রূপ আমি সইতে পারবো না। তোমাকে চিরদিনই.....।

জয়ন্ত।—আমাকে চিরদিনই ভয় করে এসেছ।

সিতা।—আর তুমি?

জয়ন্ত।—আমি তোমাকে ভালবেসে এসেছি, তা তুমিও জান। পৃথিবীতে কোন পুরুষ বোধ হয় এভাবে ভালবাসতে পারে না। যাক্ ওসব কথা।

সিতা চোখ মুছে এতক্ষণে মুখ তুলে তাকালো। —কিন্তু আর তোমায় ভয় করবো না জয়ন্ত।

হঠাৎ গাড়ির ব্রেক দিল জয়ন্ত। গাড়ি থেকে নেমে পড়ার আগে সিতা জিজ্ঞাসুভাবে জয়ন্তর দিকে একবার তাকালো। জয়ন্ত বললো।—কিছু মনে করো না সিতা। একটা সত্য কথা বলবো আজ। আমার কিন্তু ভয় করছে।

(ক্রমশঃ)

সাপ্তাহিক সংবাদ

১৯শে জানুয়ারী

ইতালিতে পঞ্চম আর্মির বৃটিশ সৈন্যরা তিনস্থানে গ্যারিগ্লিয়ানো নদী অতিক্রম করিয়াছে। ক্যাসিনোর দক্ষিণে আমেরিকান সৈন্যরা রাপিডো নদীর পূর্ব তটে পৌঁছিয়াছে। এই নদীটিই মিত্রপক্ষীয় সৈন্যদল এবং জার্মান বহির্ব্যূহের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছে।

মস্কো রেডিও হইতে জানান হইয়াছে যে, গত দুই মাসে সোভিয়েট রণাঙ্গনে জার্মানদের ৪৬ ডিভিসন (মোট ৫,৫০,০০০ সৈন্য) বিনষ্ট হইয়াছে। লেনিনগ্রাদ অঞ্চলে মার্শাল স্ট্যালিনের অভিযান আজ পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইয়াছে এবং ইতিমধ্যেই এই অভিযানে জার্মান ব্যূহের দুই স্থানে ভাঙ্গন ধরিয়াছে।

ওয়াশিংটনের সংবাদে প্রকাশ, ঋণ ও ইজারা অনুসারে আমেরিকা হইতে সোভিয়েট ইউনিয়নে ৭৪০০ বিমান, ৩৭০০ ট্যাঙ্ক এবং অন্যান্য সমরোপকরণ পাঠান হইয়াছে।

মাদ্রাজ সরকারের এক প্রেস নোটে বলা হইয়াছে যে, আদিয়ারের ২ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে তিরুভানমিউর গ্রামে কয়েকজন সৈন্য কর্তৃক নারী নিগ্রহের এক সংবাদের প্রতি গভর্নমেণ্টের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। অপরাধীদিগকে শাস্তি দেওয়ার জন্য পুলিশ ও সামরিক কর্তৃপক্ষ যাবতীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন।

২০শে জানুয়ারী

মস্কোর সংবাদে প্রকাশ, লালফৌজ নভোগোরদ দখল করিয়াছে। ইলমেন হ্রদের উত্তরে নভোগোরদ একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ রেলওয়ে-কেন্দ্র। এই শহরটি ভোলখভ নদী তীরে লেনিনগ্রাদের ১০০ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অবস্থিত। জেনারেল ভাতুতিনের সৈন্যদল দুই দিক হইতে রভ্‌নো অভিমুখে দ্রুত অগ্রসর হইতেছে।

আরাকান রণক্ষেত্রে মংদর দক্ষিণ ও পূর্বে কানিন্দান এবং দক্ষিণ রাজাবিলের মধ্যবর্তী মাগি নদীর কয়েকটি সেতু দখল করার জন্য জাপানীরা ছোটখাট পাল্টা আক্রমণ চালাইয়াছিল। কিন্তু তাহাদের সমস্ত আক্রমণই ব্যর্থ করা হয়।

মার্কিন সমরসচিব মিঃ স্টিমসন সাংবাদিক বৈঠকে বলেন যে, উত্তর নিউগিনিতে জাপ-প্রতিরোধ হয়ত ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। সমগ্র দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরে মিত্রপক্ষীয় সৈন্যরা অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। নিউ বৃটেনে মিত্রপক্ষ অবিরাম সেতুমুখ প্রসারিত করিয়া চলিয়াছে। গ্লস্টার অন্তরীপ এলাকায় ৩১ শত জাপ সৈন্য নিহত হইয়াছে।

কমন্স সভায় মিঃ আমেরী ভারত সম্পর্কে কতকগুলি প্রশ্নের উত্তর দেন। খাদ্য পরিস্থিতি সম্পর্কে এক প্রশ্নের উত্তরে মিঃ আমেরী বলেন যে, সাহায্য-ব্যবস্থা এবং প্রচুর পরিমাণে আমন ধান্য উৎপন্ন হওয়ার ফলে বাঙলায় সাধারণত এখন কোন খাদ্যশস্যের ঘাটতি নাই।

শ্রীযুত সতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত দুই বৎসর মেয়াদের কারাদণ্ড ভোগের পর অদ্য আলিপুর সেণ্ট্রাল জেল হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন।

আগামী ৩১শে জানুয়ারী হইতে কলিকাতা ও বৃহত্তর কলিকাতায় রেশনকৃত খাদ্যদ্রব্য-সমূহের মূল্য প্রতি সের নিম্নরূপ নির্দ্ধারিত হইয়াছেঃ—চাউল—সাড়ে ছয় আনা, গম—সাড়ে চারি আনা, আটা—পাঁচ আনা, ময়দা—ছয় আনা এবং চিনি—সাত আনা।

২১শে জানুয়ারী

আলজিয়ার্সের সংবাদে প্রকাশ, মিত্রপক্ষের অদ্যকার ইস্তাহারে সিনতুর্নো অধিকারের সংবাদ ঘোষিত হইয়াছে।

গতরাত্রে বৃটিশ বিমানবহর বার্লিনের উপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালায়। অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে ২৩০০ টনেরও বেশী বোমা বর্ষিত হয়।

সিন্ধু সরকার জনসাধারণকে এই বলিয়া সতর্ক করিয়া দিয়াছেন যে, আগামী ২৬শে জানুয়ারী 'স্বাধীনতা দিবস' পালন করা হইলে তাহা সংশোধিত ফৌজদারী আইন অনুসারে অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে।

২২শে জানুয়ারী

উত্তর আফ্রিকাস্থ মিত্রপক্ষীয় হেড-কোয়ার্টারের এক বিশেষ ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, জেনারেল ক্লার্কের ৫ম আর্মির বৃটিশ ও আমেরিকান সৈন্যদল অদ্য প্রত্যূষে ইতালীর পশ্চিম উপকূলে শত্রুপক্ষের বর্তমান ঘাঁটির অনেকখানি পিছনে অবতরণ করে। জার্মান সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান জানাইয়াছেন যে, ইতালীর পশ্চিম উপকূলে মিত্রপক্ষ নেতুনো ও টাইবার মোহনার মধ্যবর্তী স্থানে অবতরণ করিয়াছে এবং নেতুনো পোতাশ্রয় অধিকার করিয়াছে। নেতুনো রোমের ৩২ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত।

বাঙলার নবনিযুক্ত গভর্নর মিঃ রিচার্ড কেসি আজ পূর্বাহ্নে বাঙলার গভর্নরের কার্যভার গ্রহণ করেন।

দীর্ঘ দুই মাস পরে ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের ধর্মঘটের নিষ্পত্তি হইয়াছে। আগামী ২৭শে জানুয়ারী স্কুল পুনরায় খোলা হইবে। উক্ত স্কুলের ৭জন ছাত্রছাত্রীর উপর যে বহিষ্কারের আদেশ দেওয়া হইয়াছিল, তাহা বাতিল করা হইয়াছে।

বাঙলার প্রবীণতম কংগ্রেস সেবী ও শান্তি-নিকেতনের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ শ্রীযুত নেপালচন্দ্র রায় তাঁহার বালীগঞ্জস্থ বাসভবনে ৭৭ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন।

বরোদার এক সংবাদে বলা হইয়াছে যে, বরোদার মহারাজা স্ত্রী বর্তমানে পুনরায় বিবাহ করিবার ফলে আইনগত অসুবিধার সৃষ্টি হইতে পারে; কারণ দুই বৎসর পূর্বে বরোদার আইন সভায় যে 'এক পত্নী'র আইন পাশ হইয়াছিল (এই আইনে বরোদার মহারাজার সম্মতি ছিল) [illegible] তাহা লঙ্ঘন করা হইয়াছে।

২৩শে জানুয়ারী

মিত্রপক্ষীয় বাহিনী রোমের দক্ষিণে উপকূল-ভাগে তাহাদের নূতন অবতরণ স্থান হইতে স্থানে স্থানে অভ্যন্তরভাগে কয়েক মাইল পর্যন্ত অগ্রসর হইতে সক্ষম হইয়াছে এবং সন্তোষজনক ভাবেই এই আক্রমণ সম্প্রসারিত হইতেছে। মিত্র-পক্ষের সৈন্যাবতরণ এরূপ আকস্মিক হইয়াছিল যে, জার্মানগণ দুই ঘণ্টার মধ্যে একটিও গোলা বর্ষণ করে নাই।

মস্কো হইতে রয়টারের বিশেষ সংবাদদাতা জানাইতেছেন যে, লেনিনগ্রাদের চতুর্দিকস্থ ২০ মাইল স্থান জুড়িয়া যে জার্মান ব্যূহ ছিল, তাহা দ্রুত ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। সোভিয়েট সৈন্যদল গতরাত্রে ক্রিমিয়ায় কার্চের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে অবতরণ করিয়াছে। শহরের উপর প্রচণ্ড গোলাবর্ষণের পর রুশ সৈন্যদল অবতরণ করে।

পণ্ডিত হৃদয়নাথ কুঞ্জরু মালাবার, কোচিন ও ত্রিবাঙ্কুরের খাদ্যাবস্থা সম্পর্কে সম্প্রতি এই সকল স্থান পরিভ্রমণ করিয়া আসিয়াছেন। তিনি এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন যে, মালাবার হইতে ত্রিবাঙ্কুর পর্যন্ত অঞ্চলে প্রায় এক কোটি লোক অর্দ্ধাশনে কাল কাটাইতেছে।

ইণ্ডিয়া লীগের উদ্যোগে বার্মিংহামে ভারত সম্পর্কে সভা ইত্যাদি হইয়া গিয়াছে। ইহা দ্বারা 'ভারত সপ্তাহ' পালনের উদ্বোধন করা হয়।

উত্তর লণ্ডনের ৪৪ হাজার শ্রমিকের প্রতি-নিধিবর্গের এক সভায় অদ্য পার্লামেণ্টের দুই জন সদস্য মিঃ ডি এন প্রিট ও রেভারেণ্ড সোরেন্সন ভারত সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। রেঃ সোরেন্সন বলেন যে, প্রধানমন্ত্রী মিঃ চার্চিলের একথা বলিতে রাজী থাকিতে হইবে যে, আমরা কেবল সিরিয়া, পোল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও অধিকৃত ইউরোপের অপরাপর পরাধীন দেশের স্বাধীনতাতেই আস্থাবান নহি; ভারতের অধিবাসীদেরও সেইরূপ স্বাধীনতা দিতে হইবে।

২৪শে জানুয়ারী

মস্কো হইতে সরকারীভাবে ঘোষিত হইয়াছে যে, লালফৌজ পুশকিন শহর দখল করিয়াছে। লেনিনগ্রাদ এলাকায় গত ২৪ ঘণ্টায় সোভিয়েট আক্রমণ চরমে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। লেনিনগ্রাদ হইতে নভগোরদ পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকায় ফিল্ড মার্শাল কুইকলারের যে জার্মান বাহিনী রহিয়াছে, তাহাদিগকে পরিবেষ্টন করা বা পশ্চাতে হটাইয়া দেওয়ার জন্য চারিটি সোভিয়েট বাহিনী পরিকল্পনানুসারে সাফল্যের সহিত আগাইয়া চলিয়াছে। জার্মানদের প্রভূত ক্ষতি হইতেছে। গত দশ দিনে একমাত্র লেনিনগ্রাদ রণাঙ্গনেই পঁচিশ হাজারের বেশী জার্মান সৈন্য নিহত হইয়াছে।

উত্তর-আফ্রিকাস্থ মিত্রপক্ষীয় হেড কোয়ার্টার্স হইতে রয়টারের বিশেষ সংবাদদাতা জানাইতেছেন, জেনারেল আলেকজাণ্ডারের অধীন অবতরণকারী সৈন্যদের বর্শাফলক রোম-গামী আপ্পিয়ান রাজপথ হইতে আট মাইলেরও কম দূরে রহিয়াছে। বার্লিনের সংবাদে প্রকাশ, আমেরিকান স্কাউট সৈন্যরা আপ্রিলিয়া গ্রামে প্রবেশ করিয়াছে। আপ্রিলিয়া আপ্পিয়ান রাজপথ হইতে মাত্র ৪ মাইল এবং রোম হইতে ২৩ মাইল দূরে অবস্থিত।

'স্বাধীনতা দিবস' উপলক্ষে সভা সমিতি ও শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ করিয়া মাদ্রাজের পুলিশ কমিশনার এক আদেশ জারী করিয়াছেন। দিল্লীতে ২৫শে জানুয়ারী মধ্যরাত্র হইতে আরম্ভ করিয়া ২৬শে জানুয়ারী মধ্যরাত্রি পর্যন্ত কোন জনসভা বা একস্থানে দশ জনের বেশী লোক জমায়েৎ হইতে পারিবে না বলিয়া আদেশ জারী হইয়াছে।
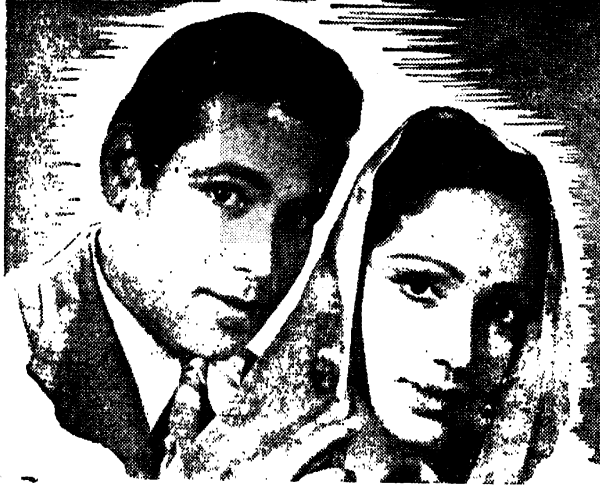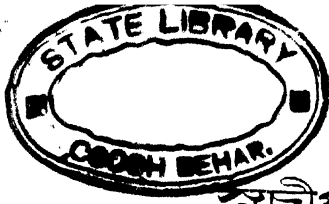
সূচীপত্র

বিষয়	লেখকের নাম		পৃষ্ঠা
সাময়িক-প্রসঙ্গ	...	...	৩৫৯
বিদেশী ভার্যা (উপন্যাস)—শ্রীউপেন্দ্র নাথ গংগোপাধ্যায়		...	৩৬২
কথা-চিত্র (সচিত্র)—শ্রীনারায়ণচন্দ্র বসাক বি এস-সি		...	৩৬৫
আঁকাবাঁকা (গল্প)—শ্রীজগদ্বন্ধু ভট্টাচার্য		...	৩৬৮
বঙ্গের জাতীয় কবিতা ও সংগীত—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত		...	৩৭০
জন্ম (গল্প)—শ্রীতারাপদ গঙ্গোপাধ্যায়		...	৩৭৩
যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় ভারতের ভাগ্যে নূতন দৃষ্টিভঙ্গি—শ্রীযতীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়		...	৩৭৫
অমরার গড়—শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, সাহিত্যরত্ন		...	৩৭৯
সাধনার অধিকার	...	...	৩৮১
তিলাঞ্জলি (উপন্যাস)—সুবোধ ঘোষ		...	৩৮২
খেলাধুলো	...	...	৩৮৫
সাপ্তাহিক সংবাদ	...	...	৩৮৭

'দেশ'-এর নিয়মাবলী

বার্ষিক মূল্য—১০৲　　　ষাণ্মাসিক—৫৲

বিজ্ঞাপনের নিয়ম

"দেশ" পত্রিকায় বিজ্ঞাপনের হার সাধারণতঃ নিম্নলিখিতরূপঃ—

সাধারণ পৃষ্ঠা

		১ বৎসর টাকা		একবারের জন্য টাকা
পূর্ণ পৃষ্ঠা	...	৪৫৲	...	৫৫৲
অর্ধ পৃষ্ঠা	...	২৪৲	...	২৮৲
প্রতি ইঞ্চি	...	২৷৹	...	৩৲

প্রবন্ধাদি সম্বন্ধে নিয়ম

পাঠক, গ্রাহক ও অনুগ্রাহকবর্গের নিকট হইতে প্রাপ্ত উপযুক্ত প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা ইত্যাদি সাদরে গৃহীত হয়।

প্রবন্ধাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় কালিতে লিখিবেন। কোন প্রবন্ধের সহিত ছবি দিতে হইলে অনুগ্রহপূর্বক ছবি সঙ্গে পাঠাইবেন অথবা ছবি কোথায় পাওয়া যাইবে জানাইবেন।

অমনোনীত লেখা ফেরৎ লইতে হইলে সঙ্গে উপযুক্ত ডাক টিকিট দিবেন। লেখা পাঠাইবার তারিখ হইতে তিন মাসের মধ্যে যদি তাহা 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত না হয়, তাহা হইলে লেখাটি অমনোনীত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। অমনোনীত লেখা ছয় মাসের পর নষ্ট করিয়া ফেলা হয়। অমনোনীত কবিতা টিকিট দেওয়া না থাকিলে এক মাসের মধ্যেই নষ্ট করা হয়।

সমালোচনার জন্য দুইখানি করিয়া পুস্তক দিতে হয়।

সম্পাদক—"দেশ"
১নং বর্মণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ম্পাদকঃ শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন   সহকারী সম্পাদকঃ শ্রীসাগরময় ঘোষ

১ বর্ষ]   শনিবার, ২২শে মাঘ, ১৩৫০ সাল।   Saturday, 5th February, 1944   [১৩শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

মন ফসল সংগ্রহের পরিকল্পনা

গত ৩১শে জানুয়ারী হইতে কলিকাতা ং তন্নিকটবর্তী বাণিজ্যপ্রধান অঞ্চল, র্থাৎ হাওড়া, বালী, বেলুড়, গার্ডেনরীচ, উত্ত সুবারবন এবং টালীগঞ্জ মিউনিসি-লিটির এলাকাধীন অঞ্চলে রেশন-ব্যবস্থা র্তিত হইয়াছে। এই পাকিল্পনাকে যথা-ভব সম্প্রসারিত করিয়া উত্তরে কাঁচড়া-ড়া এবং বাঁশবেড়িয়া ও দক্ষিণে বজবজ—ই অঞ্চলের মধ্যবর্তী সকল মিউনিসি-লিটি ইহার অন্তর্ভুক্ত করা হইবে, এরূপ স্বীকৃত হইয়াছে। রেশনিং-ব্যবস্থার দোষ-ণের কথা আমরা এখন তুলিব না; তদ্দ্বারা অন্তত এটুকু সুনিশ্চিত হইল যে, ই অঞ্চলের অধিবাসীদের খাদ্য সরবরাহের ায়িত্ব গভর্নমেণ্ট নিজের হাতে লইলেন; কন্তু কলিকাতার সমস্যাই প্রধান সমস্যা য়; বর্তমান সমস্যার ব্যাপকতা গোটা াঙলা দেশ জুড়িয়া দেখা দিয়াছে। সমগ্র েশের এই ব্যাপকতর সমস্যার সমাধান রিবার জন্য বাঙলা সরকার কিরূপ পরি-ল্পনা অবলম্বন করিতেছেন, এ প্রশ্ন মধিক গুরুতর। শুধু কলিকাতা কিংবা াহার নিকটবর্তী অঞ্চলের অধিবাসীদিগের খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থা করিলেই চলিবে না, বাঙলা দেশের সর্বত্র লোকের অন্ন-সমস্যার যাহাতে সমাধান হয়, কর্তৃপক্ষকে তেমন ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। সম্প্রতি বাঙলা সরকারের অসামরিক বিভাগের মন্ত্রী মিঃ সুরাবর্দী সাংবাদিক-গণের একটি সভায় এই সম্পর্কে সরকারের আমন শস্য সংগ্রহের পরিকল্পনার উপ-যোগিতার উপর জোর দেন। সরকারের উক্ত পরিকল্পনা সার্থক করিবার প্রয়োজনীয়তা আমরাও স্বীকার করি। আমরাও বুঝি, ভবিষ্যতে যাহাতে সংকট না দেখা দিতে পারে, এজন্য সরকারের হাতে কিছু শস্য মজুত থাকা দরকার, ঘাট্‌তি অঞ্চলে খাদ্যশস্য সরবরাহের জন্যও তাঁহাদের এই প্রয়োজন রহিয়াছে। বাণিজ্যপ্রধান অঞ্চলগুলির প্রধান ভার ভারত সরকার গ্রহণ করিয়াছেন বলা চলে; তথাপি বাঙলা সরকারের এ সম্বন্ধে কিছু দা.য়িত্ব এখনও রহিয়াছে এবং সে দায়িত্ব প্রতিপালনের জন্য কিছু শস্য তাঁহাদের হাতে থাকা প্রয়োজন; কিন্তু এ সম্বন্ধে সব চেয়ে বড় কথা এই যে, সরকার যদি বাজার-দর যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রিত করিতে চাহেন, তবে তাঁহাদের নিজেদের হাতে খাদ্যশস্য থাকা দরকার। কারণ, অতীতের অভিজ্ঞতা হইতে সু-নিশ্চিতভাবেই এ সত্য প্রমাণিত হইয়াছে যে, শুধু সরকারী বিবৃতির দ্বারা বাজারের দর নিয়ন্ত্রিত করা যাইবে না। এদেশের লাভখোর এবং ফাটকাবাজের দল বিশেষ সামান্য জীব নয়। তাহাদের পিছনে বড় বড় মাথা রহিয়াছে এবং আইনকে কেমন করিয়া ফাঁকি দিতে হয়, সে সম্বন্ধে আটঘাট তাহাদের ভাল করিয়াই জানা আছে। ইহারা যেখানে সুবিধা পাইবে, খাদ্যশস্য নিজেদের হাতে গুটাইয়া কৃত্রিমভাবে বাজার তেজী করিয়া তুলিবে এবং এইভাবে দেশের লোককে চোরাবাজারের আশ্রয় লইতে বাধ্য করিবে। ইহাদিগকে সায়েস্তা করিবার জন্য যেমন আইনের দিক হইতে কঠোরতা এবং ইহাদের উপর সজাগ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন, সেইরূপ ইহাদের কৌশল সৃষ্ট বাজারের কৃত্রিম অনটন এবং তজ্জনিত অনাস্থার ভাব দূর করিবার জন্য দ্রুততার সঙ্গে আতঙ্কিত অঞ্চলে যথেষ্ট শস্য সরবরাহ করিবার ব্যবস্থাও সরকারের হাতে থাকা দরকার। সুতরাং সরকারী বর্তমান সমস্যা সমাধানের দিক হইতে আমনশস্য সংগ্রহ পরিকল্পনার

গুরুত্ব সকলেই স্বীকার করিবেন ; কিন্তু এক্ষেত্রে কতকগুলি অন্তরায় রহিয়াছে। মিঃ সুরাবর্দী এই সম্পর্কে জনসাধারণের আস্থার উপর গুরুত্ব প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার মতে, জনসাধারণের মনে এখনও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একটা অনাস্থার ভাব রহিয়াছে ; এইজন্যই এই পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করা সম্ভব হইতেছে না। জনসাধারণের মনে যে অনাস্থার ভাব রহিয়াছে ইহা সত্য এবং সে সত্যকে অস্বীকার করা চলে না ; কিন্তু শুধু কথার দ্বারাই আস্থার ভাব সৃষ্টি করা যায় না। লোকে যখন নিশ্চিতভাবে বুঝিবে যে, ভবিষ্যতের খাদ্যের জন্য তাহাদের কোন ভাবনা নাই, তাহাদের মনে তখনই আস্থার ভাব সৃষ্টি হইতে পারে। দেশের বর্তমান অবস্থা দৃষ্টে তাহারা এখনও ততটা নিরুদ্বিগ্ন হইতে পারিতেছে না।

মফঃস্বলে রেশনিং,

মিঃ সুরাবর্দী বলিয়াছেন যে, মার্চ মাসের শেষাশেষি বাঙলা দেশের শহরগুলিতে রেশনিং-ব্যবস্থা প্রবর্তন করা সম্ভব হইবে বলিয়া তিনি আশা করেন ; কিন্তু গ্রামগুলির সম্বন্ধে আপাতত চিনি, কেরোসিন তৈল এবং স্ট্যাণ্ডার্ড কাপড় সাক্ষাৎ সম্পর্কে সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন এই কয়েকটি দ্রব্যের জন্য রেশনিং-ব্যবস্থা প্রবর্তনের চেষ্টা হইবে ; সুতরাং দেখা যাইতেছে, সমগ্র বাঙলার নরনারীর খাদ্য যোগাইবার দায়িত্ব সরকার এখনও লইতেছেন না ; অন্তত প্রত্যক্ষভাবে নয় ; এমন অবস্থায় ভবিষ্যতের সম্বন্ধে ভাবনা দেশের লোকের মনে থাকিবে, ইহা অস্বাভাবিক নয় ; বিশেষত মিঃ সুরাবর্দী নিজেই ইহা স্বীকার করিয়াছেন যে, ধান চাউলের দর যতটা নামা উচিত ছিল, ততটা নামে নাই এবং এখনও যে দর রহিয়াছে, তাহা যোগাইয়া খাদ্যশস্য সংগ্রহ করা অনেকেরই ক্ষমতার বাহিরে। সরকার পক্ষেরই এই কথা। ধান চাউলের দর কমিতেছে না, পক্ষান্তরে কোন কোন স্থানে ইতিমধ্যেই মূল্য বৃদ্ধি পাইতেছে, এমন সংবাদই আমরা পাইতেছি ; কিন্তু কর্তৃপক্ষ একথা স্বীকার করেন না। যদি তাঁহাদের কথাই যদি সত্য হয়, অর্থাৎ দর না বাড়িয়া থাকে, তবে হিসাবপত্রের দ্বারা সে তথ্য দেশের লোকের কাছে তাঁহাদের উপস্থিত করা উচিত ; তাহাতে জনসাধারণের মনে আস্থার ভাব [illegible] পাইতে পারে। ধান চাউলের দর যে কোন কোন স্থানে বাড়িতেছে সেদিন বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে মিঃ সুরাবর্দী নিজেই একথা স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার উক্তি অনুসারে যদি স্বীকার করিয়াও লওয়া যায় যে, দর অধিকাংশ স্থানে বৃদ্ধি পাইতেছে না, তাহাতেও আপাতত সমস্যা মিটে না ; কারণ, সরকারেরই মতে, দর এখনও দেশের অধিকাংশ লোকের ক্রয়ের ক্ষমতার পক্ষে অনেক বেশি। মিঃ সুরাবর্দীর উক্তি অনুসারে ইহাই বুঝা যায় যে, বাজার দর এইরূপ থাকিতে সরকার ব্যাপকভাবে খাদ্যশস্য ক্রয়ে অবতীর্ণ হইতে চাহেন না। তাঁহারা ধীরেসুস্থে কিনিবেন ; যেখানে দর যথেষ্ট পরিমাণ কম দেখিবেন, সেইখানেই কিনিবেন। মিঃ সুরাবর্দী বিশেষ জোর দিয়া এই কথা বলিয়াছেন। এ সম্বন্ধে আমাদের একটি বক্তব্য আছে। সরকার যদি দেশের বর্তমান সমস্যার সকল দিক হইতে কার্যত সমাধান করিতে চাহেন, তাহা হইলে এমন আশ্বস্ত মনে লইয়া অনির্দিষ্ট ভবিষ্যতের জন্য তাঁহাদের নিরুদ্বিগ্নভাবে বসিয়া থাকা চলে না। লাভখোর এবং মজুতদারের দল বাজারে কৃত্রিম তেজি অবস্থা সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছে বলিয়াই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। এ ব্যাপারে কতকগুলি চুণাপুঁটিই ধরা পড়িয়াছে। রুই কাৎলার দল এখনও গভীর জলে অবিকারে সঞ্চরণ করিতেছে এবং নিজেদের উদরপূর্তির চেষ্টায় আছে। ইহাদের পদ-মান-মর্যাদার প্রতি কোন বিচার না করিয়া ইহাদিগকে দমন করিয়া বাজারের দর অবিলম্বে যাহাতে যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস পায়, সর্বপ্রযত্নে ইহা করিতে হইবে। নতুবা খাদ্য-শস্যের মূল্য বর্তমানে বাঙলাদেশে যেরূপ আছে, তাহাতে এ সমস্যা সমাধানে ব্যাপক পরিকল্পনার সার্থকতা সম্বন্ধে আমরা আশাশীল হইতে পারিতেছি না।

রেশনিংএর অবস্থা

কয়েকদিন হইল কলিকাতায় রেশনিং-ব্যবস্থা চলিতেছে। ভারত গভর্নমেণ্টের রেশনিং সম্পর্কিত উপদেষ্টা মিঃ কিরবী রেশনিং-ব্যবস্থার সমর্থন করিয়া লিখিয়াছেন, ভারতবর্ষের যে যে স্থানে এই ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়াছে, সেখানেই জনসাধারণের মধ্যে আস্থার ভাব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং তাহারা নিশ্চিন্ত হইয়াছে ; সুতরাং কলিকাতাবাসীরাই বা কেন হইবে না ? খাদ্য-সংকটের সমাধান করিবার উদ্দেশ্যে এই ব্যবস্থার পথে সরকার সুচিন্তিত বিরাট পরিকল্পনা লইয়া দেশবাসীকে সাহায্য করিতে উদ্যত হইয়াছেন। কলিকাতার নিশ্চয়ই সার্থকতা লাভ করিবে। মিঃ কিরবীর এই উক্তি বাস্তব সার্থকতা লাভ করে, আমরাও ইহাই কামনা করি। তাঁহার উক্তিতে তিনি বোম্বাই এবং মাদ্রাজ শহরের রেশনিং-ব্যবস্থার সার্থকতার ইঙ্গিত করিয়াছেন, আমরা ইহাই দেখিতে পাইতেছি। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, এই দুই শহরে, বিশেষভাবে বোম্বাইয়ে প্রবর্তিত ব্যবস্থাতে যেসব সুবিধা আছে, কলিকাতায় সেগুলি সব বজায় রাখা হয় নাই। এ বিষয়ে কতকগুলি গুরুতর ত্রুটি রহিয়াছে। বাঙালীর প্রধান খাদ্য হইল চাউল এবং এই খাদ্যকেই তাহার অভ্যস্ত খাদ্য বলা যাইতে পারে। এ সম্বন্ধে আমরা যেরূপ ধারণা করিয়াছিলাম, ইতিমধ্যেই তদনুযায়ী নানা রকমের অভিযোগের কথা আমরা শুনিতে পাইতেছি। অভিযোগ এই যে, অধিকাংশ দোকান হইতেই অতি নিকৃষ্ট ধরণের চাউল সরবরাহ করা হইতেছে। বরাদ্দের ক্ষেত্রে আতপ চাউল বেশির ভাগ দেখা যাইতেছে। এই চাউল বেশির ভাগ দেখা যাইতেছে। এই চাউল নূতন এবং প্রায় অর্ধেক পরিমাণ খুদ মিশ্রিত। সিদ্ধ চাউল খুব কম দোকান হইতে দেওয়া হইতেছে এবং দুই রকম চাউলই ক্রেতার ইচ্ছামত লইতে পারে, এমন দোকানের সংখ্যা আরও কম। রেশনিং ব্যবস্থানুযায়ী যে আতপ চাউল মিলিতেছে, তাহা রান্না করা কঠিন। সুসিদ্ধ করিয়া নামাইলে ভাত ডেলা বাঁধিয়া যায়, আবার কিছু আগে নামাইলে অসিদ্ধ থাকে। চাউল নির্বাচন সম্বন্ধে কর্তৃপক্ষের সমধিক অবহিত হওয়া প্রয়োজন। সিদ্ধ এবং আতপ দুই চাউলই লোকের পক্ষে যাহাতে রুচিকর এবং পুষ্টিকর হয়, সেদিকে যদি কর্তৃপক্ষ অবিলম্বে দৃষ্টি না দেন, তবে রেশনিংয়ের ফলেও অনাস্থার ভাব সহজে দূর হইবে বলিয়া আমাদের মনে হয় না। ডাউলের সম্বন্ধেও অভিযোগ রহিয়াছে। এতদিন অসামরিক সরবরাহের ব্যবস্থায় কণ্ট্রোলের দোকান হইতে একঘেয়ে রকমে কেবল অরহরের ডাউলই সরবরাহ করা হইয়াছে। অরহরের ডাউলে বাঙালী পরিবার বিশেষ অভ্যস্ত নয়, মটর, মুগ, মশুর এবং ছোলা এদেশের গৃহস্থ পরিবারে সাধারণত এই ডাউলই চলে। ডাউলের সম্বন্ধে এইরূপ মাঝে মাঝে পরিবর্তন বাঞ্ছনীয় এবং যথাসম্ভব নূতন এবং পরিষ্কার মাল দেওয়া দরকার। আমরা দেখিয়া বিস্মিত হইলাম নিকৃষ্ট ধরণের দ্রব্য সরবরাহ সম্বন্ধে অভিযোগের উত্তরে মিঃ কিরবী উত্তর, পশ্চিম অঞ্চলের মাল-বিক্রেতাদের উপর দোষ চাপাইয়াছেন। কিন্তু কথা এই যে, বিক্রেতারা লাভের চেষ্টাতে থাকিবেই। লাভখোরদের পক্ষে এ একটা মস্ত সুযোগ জুটিয়াছে ; কিন্তু তাহারা যাহা দিবে তাহাই চোখ বুজিয়া মূল্য দিয়া লইতে হইবে, ইহা কেমন কথা। এ সম্বন্ধে বিশেষ দৃষ্টি রাখা হইবে এবং উৎকৃষ্ট চাউল সরবরাহের ব্যবস্থা করা হইবে মিঃ কিরবী আমাদিগকে এই ভরসা দিয়াছেন। ইহাতে আমরা কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়াছি।

দোকানের স্বল্পতা

কলিকাতার রেশনিং ব্যবস্থায় দোকানের স্বল্পতার সম্বন্ধে আমরা জনসাধারণের পক্ষ হইতে এখনও অভিযোগ শুনিতেছি। কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থা অনুসারে পূর্বে সরকারী দোকানে তিন হাজার এবং অনুমোদিত বে-সরকারী দোকানে দেড় হাজার লোকের রসদ সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়। এ সম্বন্ধে তাঁহারা স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছিলেন যে, সরকারী দোকানের সংখ্যা তাঁহারা কিছুতেই বাড়াইবেন না; প্রয়োজন হইলে প্রত্যেকটি সরকারী দোকানে তিন হাজারের অধিক লোকের রেশনিং সরবরাহের ব্যবস্থা করা যাইবে। সম্ভবত এতৎসম্পর্কিত অভিযোগের প্রতিকারের জন্য সম্প্রতি তাঁহারা প্রতি সরকারী দোকানে আরও তিন-শত লোকের বরাদ্দ বাড়াইয়া দিয়াছেন; কিন্তু ইহাতে অসুবিধা বাড়িয়াছে ছাড়া কমে নাই। দোকানগুলিতে সপ্তাহে ছয় দিন কাজ চলে এবং একদিন বন্ধ থাকে ও খোলা থাকার সময় পূর্বে প্রত্যহ সাত ঘণ্টা ছিল; এখন কমাইয়া সাড়ে ছয় ঘণ্টা করা হইয়াছে। এই হিসাব অনুসারে যে দোকানে তিন হাজার লোকের রসদ সরবরাহ করিতে হইবে, সেই দোকানে প্রত্যহ ৫ শত করিয়া লোকের জিনিস দিতে হয়। ঘণ্টার হিসাব মিনিটে করিলে দেখা যাইবে, যদি এক মিনিটের মধ্যে একজন লোককে জিনিস দেওয়া সম্ভব হয়, তাহাতেও ৫শত লোককে জিনিস দেওয়া চলে না; এবং সংখ্যা কোনক্রমেই ৪শতের উপর উঠে না। এদিকে সরকারী যে ব্যবস্থা, তাহাতে একজন লোককে জিনিস দিতে দশ মিনিটের কমে কিছুতেই সম্ভব হয় না। কারণ, এজন্য কতকগুলি নিয়ম রহিয়াছে। প্রথমত, রেশন-কার্ড খাতায় 'এণ্ট্রি' করিতে হইবে, তারপর ক্যাশ-মেমো কাটিতে হইবে, রেশন-কার্ডের পিছনের ঘরগুলিতে কোন্ জিনিস লইবে, তাহা লিখিয়া ভর্তি করিতে হইবে; তার পরে মাল যেখানে ওজন হয়, সেখানে যাইয়া কয়েক প্রস্থ মালের ডেলিভারী লইতে হইবে; ইহার উপর রেজ্‌কি দেওয়া এবং বুঝিয়া লইবার সমস্যা রহিয়াছে। অভ্যস্ত দোকানী যাহারা, তাহাদের পক্ষেও এই সব কাজ গুছাইয়া করিয়া ৫শত লোকের বুঝ দেওয়া কঠিন; সরকারী দোকানে যাঁহারা নিযুক্ত হইয়াছেন, তাঁহারা অনেকেই অনভ্যস্ত লোক; এমন অবস্থায় দোকান হইতে জিনিস পাইতে লোকের যে ঝঞ্ঝাট পোহাইতে হইবে, ইহা একটুও অস্বাভাবিক নয় এবং এই অবস্থার প্রতিকার করিতে হইলে দোকানের সংখ্যা বৃদ্ধি করা ছাড়া অন্য উপায় নাই। তারপর এ সম্বন্ধে জনসাধারণের আর একটি অসুবিধার কারণ ইতিমধ্যেই সৃষ্টি হইয়াছে। আমরা দেখিতেছি বেসরকারী দোকানগুলির সম্বন্ধে যেসব অভিযোগ, সাব-এরিয়ার রেশনিং অফিসারের কাছে শুধু সেইগুলি উপস্থিত করার ব্যবস্থা হইয়াছে; কিন্তু সরকারী দোকানগুলির সম্বন্ধে কোন অভিযোগ করিতে হইলে লোককে টাউনহলে বড় অফিসে ছুটিতে হয়। এ ব্যবস্থারও সংস্কার হওয়া প্রয়োজন।

বাঙলার লোকক্ষয়

দুর্ভিক্ষ এবং তজ্জনিত ব্যাধি-পীড়ায় বাঙলা দেশের কি পরিমাণ লোকক্ষয় ঘটিয়াছে, গত ২৭শে জানুয়ারী পার্লামেণ্টের শ্রমিক সদস্য মিঃ স্টিফেন ডেভিস ভারতসচিবকে পুনরায় এই প্রশ্ন করিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে ভারতসচিবের জবাব একই অর্থাৎ গত ২০শে জানুয়ারী তিনি যাহা বলিয়াছিলেন, এবারও তদতিরিক্ত নূতন কিছু বলিতে পারেন নাই। ভারত গভর্নমেণ্টের প্রদত্ত সংবাদের উপর ভিত্তি করিয়া এ সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা এই যে, দুর্ভিক্ষ ও মহামারীতে বাঙলা দেশে মৃত্যুসংখ্যা দশ লক্ষের অধিক হইবে না। তাঁহার প্রদত্ত এই হিসাব যে পাকা নয়, এদিনও তিনি ইহা স্বীকার করেন। তিনি বলেন, "এ সম্বন্ধে প্রথমত প্রাদেশিক সরকার তথ্য সংগ্রহ করিয়া থাকেন; কিন্তু তাঁহাদের তথ্য সংগ্রহের ব্যবস্থা বিশেষ খুব ভাল বলিয়া মনে হয় না; প্রাদেশিক সরকারের নিকট হইতে পরে ভারত সরকার এই সম্বন্ধে হিসাব পান, পরে সে সংবাদ আমার কাছে পৌঁছে।" এ বিষয়ে আমাদের কথা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি। আমাদের মতে বাঙলার দুর্ভিক্ষ ও মহামারী-জনিত মৃত্যুসংখ্যা দশ লক্ষের চেয়ে অনেক বেশী। পণ্ডিত হৃদয়নাথ কুঞ্জরু সম্প্রতি ভারত ভৃত্য সমিতির পক্ষ হইতে মুন্সীগঞ্জ পরিদর্শন করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলেন, এক মুন্সীগঞ্জ মহকুমাতেই দুর্ভিক্ষ এবং তজ্জনিত রোগাদিতে এ পর্যন্ত ৮৩ হাজারের অধিক লোক মৃত্যু-মুখে পতিত হইয়াছে। পণ্ডিত কুঞ্জরুর হিসাবানুসারে বাঙলা দেশে শুধু দুর্ভিক্ষেই গত ৫ মাসে প্রতি সপ্তাহে ৫০ হাজার করিয়া নরনারী মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। ডাক্তার শ্যামাপ্রসাদ মুখুজ্যে মহাশয়ের মতে বাঙলা দেশে দুর্ভিক্ষের ফলে ২৫ লক্ষ নরনারীর মৃত্যু ঘটিয়াছে; ইহা ছাড়া মহামারীর মৃত্যুসংখ্যা অন্তত দশ লক্ষ। দুর্ভিক্ষ এবং তজ্জনিত মহামারীর ফলে সমগ্র বাঙলা দেশে একটা বড় রকমের সামাজিক বিপর্যয় ঘটিয়াছে, আমরা নানা দিক হইতেই ইহা প্রত্যক্ষ করিতেছি; এরূপ অবস্থায় বাঙলার বুকের উপর দিয়া ধ্বংসলীলার যে তাণ্ডব গিয়াছে, তাহা সামান্য মনে করিবার কোনই কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না এবং সেই সংকটের জের যে এখনও চলিতেছে, একথাও স্বীকার করিতেই হয়। কারণ গত ২৬শে জানুয়ারীর কলিকাতা গেজেটে আমরা দেখিতে পাইতেছি, বাঙলা সরকার চট্টগ্রাম, নোয়াখালি, ত্রিপুরা, খুলনা, ২৪ পরগণা, ফরিদপুর, বরিশাল, বীরভূম, বর্ধমান এবং হাওড়া এই দশটি জেলায় কলেরা মহামারীর আকারে দেখা দিবার আশঙ্কা ঘটিয়াছে বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। সুতরাং অবস্থার বিশেষ উন্নতি ঘটিয়াছে, এখনও এমন কথা বলা চলে না।

শান্তি সম্মেলন ও ভারত

যুদ্ধের পর যে শান্তি সম্মেলনের অধিবেশন হইবে, তাহাতে কে ভারতবর্ষের প্রতিনিধিত্ব করিবেন, তাহা লইয়া প্রবীণ মডারেট নেতা কিছুদিন হইতে নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহার মতে ডাক্তার খারে অথবা স্যার মহম্মদ ওসমানের মত প্রতিনিধির দ্বারা কোন কাজ হইবে না। মহীশূরে সাংবাদিক সমিতিতে বক্তৃতা প্রসঙ্গে শ্রীযুত শাস্ত্রী বলিলেন, মহাত্মা গান্ধী অথবা পণ্ডিত নেহরুর ন্যায় ব্যক্তিকে শান্তি সম্মেলনে প্রেরণ করা একান্ত প্রয়োজন। শাস্ত্রী মহাশয় যে যুক্তি উপস্থিত করিয়াছেন, তাহার মূল্য আমরাও উপলব্ধি করি; কিন্তু আমাদের মতে এক্ষেত্রে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট কর্তৃক ভারতের স্বাধীনতা-স্বীকৃতি সর্বপ্রথমে প্রয়োজন। পরাধীন ভারত ক্রীতদাসের ন্যায় তল্পী বহনের কাজ করিবার জন্য শান্তি সম্মেলনে যাইতে চায় না এবং মহাত্মা গান্ধী কিংবা পণ্ডিত নেহরু কেহই তাহাতে সম্মত হইবেন না।

ইংরেজের দান

ব্রিটিশ শাসন ভারতবর্ষকে কোন কোন দুর্লভ বস্তু দান করিয়াছে, আমেরিকার ব্রিটিশ প্রতিনিধিস্বরূপে লর্ড হ্যালিফাক্স সম্প্রতি তাহার একটি ফিরিস্তি প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু ভারতবাসীদের স্বাধীনতার দাবী প্রতিহত করিবার জন্য সাম্প্রদায়িক নির্বাচন প্রথা ও সংখ্যালঘিষ্ঠের দাবী এবং এই দুই দানকে পোক্ত করিবার জন্য মোস্লেম লীগকে প্রশ্রয় দেওয়া—এই সব দানও যে রহিয়াছে। অথচ লর্ড হ্যালি-ফাক্স ভারতের প্রতি ব্রিটিশের সর্বোত্তম এই দানের কথা এক্ষেত্রে উল্লেখ করিতে বিস্মৃত হইয়াছেন দেখা যাইতেছে।

বিদুষী ভার্য্যা

- শ্রীউপেন্দ্র নাথ গঙ্গোপাধ্যায় -

৩০

তিক্ত বিক্ষত অন্তঃকরণ লইয়া দিবাকর দিন পাঁচেক পরে রাজসাহী হইতে যূথিকার সহিত মনসাগাছায় ফিরিয়া আসিল। মৌমাছি দংশনে মানুষের মুখ যেমন বেদনায় লাল হইয়া ফুলিয়া উঠে, লজ্জা এবং অবমাননার দংশনে ঠিক সেই অবস্থা হইয়াছে তাহার মনের।

যাইবার পথে কতকটা সহজ এবং স্বাভাবিক মন লইয়াই সে রাজসাহী গিয়াছিল। কিন্তু সেই সহজ এবং স্বাভাবিক মনেরই নিভৃত প্রদেশে অসন্তোষের যে বীজ-কণিকা স্তিমিত হইয়া বর্তমান ছিল, রাজসাহীতে উত্তেজক কারণের প্রভাব পাইয়া তাহা একেবারে শতধা অঙ্কুরিত হইয়া উঠিয়াছে। রাজসাহীতে পদার্পণ করিবার পরমুহূর্ত হইতে আরম্ভ করিয়া রাজসাহী ছাড়িয়া আসিবার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত নিরন্তর সকলের নিকট হইতেই যূথিকার তুলনায় নিজের অকিঞ্চিৎকরত্বের নির্দেশ পাইয়া পাইয়া মনে মনে সে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল। সভাস্থলে, সভার পূর্বে, অথবা সভার পরে,—সর্বত্র সব সময়ে কায়ার পিছনে ছায়ার ন্যায় সে যূথিকার অনুগামী হইয়া ফিরিয়াছে ; কোথাও ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায় নাই। যেটুকু সম্মান, যে সামান্য মনোযোগ রাজসাহীতে লাভ করিতে সে সমর্থ হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই সে লাভ করিয়াছে মিসেস্ যূথিকা ব্যানার্জির ভাগ্যবান স্বামীর পরিচয়ের প্রভাবে। কিন্তু যূথিকাকে নিজ-পরিচয়ের জন্য স্বামীর মুখাপেক্ষী হইতে হয় নাই। সে চতুর্দিকে তাহার পরিচয় বিকীর্ণ করিয়াছে আপন ব্যক্তিগত যোগ্যতা এবং প্রতিষ্ঠার মহিমায় ; এবং সেই পরিচয়ের সামর্থ্যে সকলের নিকট হইতে প্রচুর শ্রদ্ধা এবং সমাদর আদায় করিয়াছে।

উৎসব সভায় দিবাকরও একটা মালা লাভ করিয়াছিল বটে; কিন্তু সেখানেও সেই একই কথা। তাহার কণ্ঠে পড়িয়াছিল কয়েকজন সাধারণ মান্য অতিথির সহিত গাঁদা ফুলের একটা এক-হালি মামুলি মালা; অপর পক্ষে, যূথিকার কণ্ঠ লাভ করিয়াছিল উৎকৃষ্ট গোলাপ-ফুল দিয়া রচিত সুপুষ্ট কমনীয় মাল্য।

শুধু মালাতেই নহে। অটোগ্রাফ সংগ্রহ ব্যাপারে, ভিজিটার্স বুকে অভিমত প্রদান করিবার সম্পর্কে, উৎসব সভায় বক্তৃতা দিবার অনুরোধ প্রসঙ্গে, সভায় এবং সভার বাহিরে মিস্টার ফরেস্টার প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সহিত আলাপ-আলোচনার কালে, হীনতার এমন একটা দুর্বহ গ্লানি সে ভোগ করিয়াছে, যাহার উৎপীড়নে তাহার সংক্ষুব্ধ পৌরুষ মুহূর্তের জন্য শান্ত হইবার সুযোগ খুঁজিয়া পায় নাই। অন্তত জন কুড়িক ছেলে-মেয়ে পীড়াপীড়ি করিয়া যূথিকার নিকট হইতে নিজ নিজ খাতায় অটোগ্রাফ সংগ্রহ করিয়াছে,—যাহাদের মধ্যে তিন চারজন বাহুর আঘাতে তাহাকে পাশে ঠেলিয়া দিয়া যূথিকার সমীপে উপস্থিত হইয়াছে, এবং জন দুই তাহাকে চাপিয়া ধরিয়া তাহারই সুপারিশের সাহায্যে যূথিকার নিকট হইতে অটোগ্রাফ আদায় করিয়া লইয়াছে। ইচ্ছা অথবা খেয়াল অনুযায়ী কখনো ইংরেজিতে কখনো বা বাঙলা ভাষায় যূথিকা কাহারো খাতায় শুধু নিজের সই লিখিয়া দিয়াছে, কাহারো খাতায় দুই চার লাইন স্বরচিত বাণী লিপিবদ্ধ করিয়াছে, কাহারো বা খাতায় ইংরেজি অথবা বাঙলা ভাষার কোনো প্রসিদ্ধ লেখকের রচনা হইতে কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছে। যৎপরোনাস্তি আগ্রহ এবং যত্নের সহিত যাহারা এইরূপে যূথিকার অটোগ্রাফ সংগ্রহ করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে একজনেরও,—এমন কি, অভীষ্ট লাভের জন্য যে দুইজনকে দিবাকরের সাহায্য গ্রহণ করিতে হইয়াছিল তাহাদের মধ্যেও কাহারো,—দিবাকরের নিকট হইতে একটা সই লিখাইয়া লইবার কথা মনে হয় নাই। নিজ নিজ পুষ্পোদ্যানে ফুলের গাছ রোপন করিতে যাহারা ব্যস্ত, আগাছার প্রতি তাহাদের কি আকর্ষণ থাকিতে পারে!

পুরস্কার বিতরণের কার্য শেষ হইলে সমাগত ভদ্রলোকদের বক্তৃতা দিবার সময়ে সভাপতি মিস্টার ফরেস্টার দিবাকরকেও বক্তৃতা দিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিল। মনসাগাছার কথা মনে থাকিলেও, একেবারেই আহ্বান না করিলে পাছে দিবাকরকে উপেক্ষা করার মতো দেখায়, সম্ভবত সেই বিবেচনার ফলেই ফরেস্টার দিবাকরকে অনুরোধ

করে। কিন্তু অনুরোধ করিবার মূলে অপর পক্ষের যতখানি সদুদ্দেশ্যই থাকুক না কেন, সেজন্য দিবাকরের সংকটের পরিমাণ কিছুমাত্র লঘু হয় নাই। মনসাগাছায় সেবার তাহাকে এই সংকট হইতে রক্ষা করিয়াছিল সুনীথনাথ; এবার করিয়াছিল ভবতোষ মিত্র। ইহারই ঠিক অব্যাবহিত পূর্বে প্রচুর প্রশস্তি এবং করতালির মধ্যে শেষ হইয়াছিল যূথিকার সুচিন্তিত এবং সুকথিত ইংরেজি বক্তৃতা।

এ অক্ষমতা প্রকাশের লজ্জা এবং গ্লানি তবু কতকটা সহনীয় ছিল, কিন্তু ঘণ্টাখানেক পরে সভা ভঙ্গ হইলে সহসা অতর্কিতে যে ঘটনা ঘটিল, তাহার পর আর মুখ দেখাইবার পথ রহিল না। লাহোর হইতে কলিকাতা আসিবার পথে পাঞ্জাব মেলে গার্ডের সহিত যে ব্যাপার ঘটিয়াছিল, এ ব্যাপারও ঘটিল যেন তাহারই একটা রূপান্তরের মতো। প্রভেদ মাত্র এইটুকু যে, সে ক্ষেত্রে দর্শক ছিল একজন ইংরেজ গার্ড এবং একজন পশ্চিমা ভদ্রলোক; পক্ষান্তরে এ ক্ষেত্রে ছিল একজন ইংরেজ কালেক্টার এবং পনেরো যোলজন ইংরেজ ও বাঙালী স্ত্রী-পুরুষ।

সভাভঙ্গের পর স্কুল-কর্তৃপক্ষের অনুরোধে অভ্যাগতদের মধ্যে প্রধান কয়েক ব্যক্তি হেড্ মিস্ট্রেসের কক্ষে একটা গোল টেবিলের ধারে সমবেত হইয়া বসিয়াছিল। চা এবং খাবার তখনো পরিবেষিত হয় নাই, পরস্পরের মধ্যে কথোপকথন চলিতেছিল, এমন সময়ে হেড্ মিস্ট্রেস্ মিসেস্ পাল স্কুলের ভিজিটার্স বুক্ আনিয়া মিস্টার ফরেস্টারের সম্মুখে স্থাপিত করিল। উল্টাইয়া পাল্টাইয়া কয়েকটা অভিমতের উপর অল্পস্বল্প দৃষ্টি বুলাইয়া মিস্টার ফরেস্টার কয়েক ছত্রে নিজ মন্তব্য লিখিয়া খাতাখানা মিসেস্ পালের হস্তে ফিরাইয়া দিল। ইত্যবসরে সহসা ভিজিটার্স বুকের আবির্ভাবে মিস্টার ফরেস্টারের বাম পার্শ্বে বসিয়া দিবাকর প্রমাদ গণিতেছিল। বিপদ যখন আসে, তখন দুর্ভাগ্য তাহার পথ সুগম করিয়াই দেয়। ফরেস্টারের পর মিসেস্ পাল যদি খাতাখানা যূথিকার নিকট দিত, তাহা হইলে দিবাকরের দিক দিয়া ব্যাপারটা অনেকটা সহজ হইতে পারিত। কিন্তু তাহা না করিয়া খাতাখানা দিবাকরেরই সম্মুখে স্থাপিত করিয়া সে বলিল, "দয়া ক'রে আপনি কিছু লিখে দিন মিস্টার ব্যানার্জি।"

সহসা অনতিবর্তনীয় বিপদের সম্মুখে পড়িলে মানুষের যে অবস্থা হয়, দিবাকরের হইল সেই অবস্থা। একজন ইংরেজ আই সি এস্ অফিসারের মার্জিত ইংরেজি লেখার নিম্নে তাহার ইংরেজি লিখিবার প্রস্তাব শুনিয়া মাঘ মাসের শীতেও সে ঘামিয়া উঠিল। আরক্ত মুখে নতনেত্রে খাতাখানা ঈষৎ নাড়াচাড়া করিতে করিতে মৃদুকণ্ঠে সে বলিল, "আমাকে কেন মিসেস্ পাল,—আর সকলে রয়েছেন তাঁদের দিন,—আমাকে কেন?"

মিসেস্ পাল কিন্তু সহজে ছাড়িবার পাত্রী নহে; মাথা নাড়িয়া বলিল, "না, না, সে কি কথা! আপনি অত বড় গার্লস স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছেন, আপনার অভিমত আমরা অতিশয় মূল্যবান মনে করি।"

ভিজিটার্স বুক্ দেখিয়া ঠিক এই অবস্থা আশঙ্কা করিয়া যূথিকা বোধ করি দিবাকরেরও পূর্বে চিন্তিত হইয়া উঠিয়াছিল। পাঞ্জাব মেলের ন্যায় এবারও সে নিজেই দিবাকরের উদ্ধারকল্পে প্রবৃত্ত হইল। দিবাকরের হস্ত হইতে কতকটা যেন কৌতূহলের ছলে, ধীরে ধীরে খাতাখানা টানিয়া লইয়া পাতা উল্টাইয়া দেখিতে দেখিতে বলিল, "আমাকেও কিছু লিখতে হবে না-কি মিসেস্ পাল?"

আগ্রহভরে মিসেস্ পাল বলিল, "সে কি কথা মিসেস্ ব্যানার্জি? আপনার মতামত আমরা বিশেষভাবে কামনা করি। নিশ্চয় লিখতে হবে আপনাকে।"

"তা হ'লে আমিই না হয় প্রথমে কিছু লিখি। তারপর, যদি দরকার মনে করেন ত উনি লিখবেন।" বলিয়া অভিমতটা লিখিয়া শেষ করিয়া খাতাখানা দিবাকরের সম্মুখে রাখিয়া মৃদুস্বরে যূথিকা বলিল, "উই (We) দিয়ে দুজনের হয়ে সবটা লিখেছি, বোধ হয় আর কিছু লেখবার দরকার নেই। আমার সইয়ের ওপর তুমি সই ক'রে দাও, তা হ'লেই হবে।"

পাঞ্জাব মেলের ঘটনার পুনরভিনয় আর কাহাকে বলে! কিন্তু উপায়ই বা কি আছে? উপস্থিত বিপদ হইতে পরিত্রাণ লাভের জন্য অপর কোনো শোভনতর পথ না দেখিয়া অগত্যা দিবাকর যূথিকার উপদেশই পালন করিল। কিন্তু এক হাত পরিমাণ বস্ত্রের দ্বারা সাত হাত পরিমাণ গলদ ঢাকিতে যাইবার মর্মন্তুদ লজ্জায় তাহার সমস্ত অন্তরিন্দ্রিয় নিপীড়িত হইতে লাগিল। গলদ ত' ঢাকা পড়িলই না, অধিকন্তু গলদ ঢাকিবার আগ্রহের ফলে গলদের স্বরূপ অধিকতর কুৎসিত হইয়া উঠিল। বর্শাবিদ্ধ সর্পের ন্যায় আপনাকে আপনি দংশন করিতে করিতে তাহার বিদ্রোহী অন্তর বারংবার বলিতে লাগিল,—"না, না, এ অবস্থা যেমন ক'রে হোক বদলাতেই হবে! এই লজ্জা, এই অপমান, এই পরাজয় সারা জীবন সহ্য ক'রে চলার হীনতার মধ্যে কিছুতেই নিজের আত্মাকে গলিত করা হবে না! কিছুতেই না, কিছুতেই না!"

মনসাগাছায় ফিরিয়া আসার দিন সন্ধ্যাকালে এক সময়ে দিবাকর যূথিকাকে বলিল, "আর কতবার এই রকম গাঁটছড়া বেঁধে সভাসমিতিতে আমাকে নিয়ে গিয়ে অপমানিত করাবে যূথিকা?"

শান্ত অবিচলিত কণ্ঠে যূথিকা বলিল, "আর একবারও নয়; কারণ, এ জীবনে আর কোনোদিনই আমি সভাসমিতির ছায়া মাড়াব না।"

এক মুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া দিবাকর বলিল, "তোমাকে ত' এ রকম ক'রে শাস্তি নিতে বলছিনে। আমাকে রেহাই দাও, সেই কথাই বলছি।"

"নিজেকে রেহাই না দিলে তোমাকে রেহাই দেওয়ার সুবিধে হবে না।"

"নিজেকে রেহাই দেওয়ার মানে?"

"নিজেকে রেহাই দেওয়ার মানে, তোমাদের বাড়ির আবহাওয়ার, তোমাদের বাড়ির সংস্কারের, তোমাদের বাড়ির ইতিহাসের প্রতিকূল যে-সব

জিনিস,—তা থেকে নিজেকে রেহাই দেওয়া। আমি তোমাদের বলেছি জমিদার বংশের উপযুক্ত হ'তে চেষ্টা করব। রামায়ণ-মহাভারত পড়ব, পূজো-পাঠ করব, ব্রত-পার্বণে মন দোবো; আমার শাশুড়ী-দিদিশাশুড়ীরা যে-পথ ধ'রে চলেছিলেন, নিজেকে চালিত করবার জন্যে সেই পথ খুঁজে পেতে বার করব।"

এক মুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া সহসা চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া যূথিকা বলিল, "সন্ধ্যা হ'ল, এখন আমি চললাম।"

দিবাকরও উঠিয়া দাঁড়াইল; বলিল, "কোন্ পথে?"

যূথিকার মুখে একটা ক্ষীণ হাসি মুহূর্তের জন্য ঝিলিক মারিয়া মিলাইয়া গেল; মৃদু কণ্ঠে বলিল, "কুপথে নয়। তর্কতীর্থ মশায়ের আসবার সময় হোল, তাই যাচ্ছি।" যাইতে যাইতে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "সংস্কৃত পড়া আপাতত না ছাড়লেও বোধ হয় চলবে; কারণ, সংস্কৃত না-জানা অপরাধ ত' নয়ই, জানাও সম্ভবত অপরাধ নয়।"

যূথিকা চলিয়া গেলে দিবাকর ক্ষণকাল নিজের চিন্তার মধ্যে নিমগ্ন হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল; তাহার পর তাড়াতাড়ি বেশ পরিবর্তিত করিয়া পথে বাহির হইয়া পড়িল। কোথাকার উদ্দেশে, তাহা অবশ্য সহজেই অনুমেয়।

ক্রমশ

পুস্তক পরিচয়

যুদ্ধের দক্ষিণা—শ্রীঅনাথগোপাল সেন প্রণীত। মডার্ন বুক এজেন্সী, ১০নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য—দেড় টাকা।

অর্থশাস্ত্র সম্বন্ধে অনাথবাবুর হাত পাকা। তাঁহার 'টাকার কথা', 'কর নীতি' এদেশে বিশেষভাবে সমাদর লাভ করিয়াছে। অর্থনৈতিক বিষয়ের আলোচনা সাধারণ পাঠকদের কাছে দুরূহ হইয়া থাকে, কিন্তু আলোচ্য গ্রন্থের সুচিন্তিত এবং বিস্তৃত ভূমিকায় অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার মহাশয় সতই বলিয়াছেন, অনাথবাবুর এসব বিষয় বুঝিবার ও বুঝাইবার কৌশল বেশ নজরে পড়ে। তাঁহার এসব লেখা সরস এবং হৃদয়গ্রাহী হয়; ইহার কারণ এই যে, বিষয়ের অন্তর্নিহিত গূঢ়তত্ত্বকে তিনি উন্মুক্ত করিতে জানেন এবং পরাধীন ভারতের আর্থিক আলোচনার অন্তর্নিহিত গূঢ়তত্ত্ব হইল বিদেশীর স্বার্থ ও শোষণ; অনাথবাবু প্রতিভা-পূর্ণ শাণিত ক্ষুরধার দৃষ্টিতে ইহার উপর আঘাত হানিবার ক্ষমতা রাখেন। বিজিত, শাসিত ও শোষিতের পক্ষে তাঁহার লেখা এজন্য বিশেষ উপভোগ্য হয়। তাঁহার পাণ্ডিত্য স্বদেশপ্রেম যুক্ত হইয়া পাঠকের চিত্তকে উদ্দীপ্ত করে। আলোচ্য গ্রন্থখানার (১) যুদ্ধের ব্যয়-রহস্য, (২) কর, ঋণ ও ইন্‌ফ্লেশন, (৩) ইনফ্লেশন্ না স্বর্ণমৃগ, (৪) স্ট্যার্লিংয়ের প্রেমালিঙ্গন, (৫) পরাধীন জাতির রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, (৬) আমাদের ব্যালান্সড্ বাজেট, (৭) লেন্ড লিজ্ রসায়ন, (৮) গত যুদ্ধের হিসাবনিকাশ, (৯) জার্মান মার্কের মহাপ্রস্থান—এই কয়েকটি অধ্যায় যুদ্ধ সম্পর্কিত অর্থনীতিক বিপর্যয় বলিতে গেলে সব দিক হইতেই আলোচিত হইয়াছে। অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকারের অভিমত উদ্ধৃত করিয়া আমরা বলিব — 'অনাথবাবুর আলোচনাগুলি চিত্তাকর্ষক; যে কোন পাঠকের পক্ষে সরস ও শাঁসালো মালুম হইবে।' জটিল অর্থনীতির সব দিক খতাইয়া, গোছাইয়া খুঁটিয়া বলিবার ক্ষমতা খুব কম ব্যক্তিরই আছে। বাঙলা ভাষায় তেমন আলোচনা এখনও দুর্লভ বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। গ্রন্থকারের অবদান সেই অভাব দূর করিয়া বাঙলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করিবে। আমরা ঘরে ঘরে এই বইয়ের সমাদর দেখিতে চাই। বাঙলা দেশের যুবকেরা এই পুস্তকের আলোচনা করিলে দেশের বর্তমান অবস্থা সোজাসুজি উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইবে এবং স্বদেশপ্রেমের তাপ অন্তরে অনুভব করিবে। এই দিক হইতে গ্রন্থকার জাতির বর্তমান দুর্দিনে একটি বড় প্রয়োজন সিদ্ধ করিয়াছেন—এজন্য আমরা তাঁহাকে অভিনন্দিত করিতেছি।
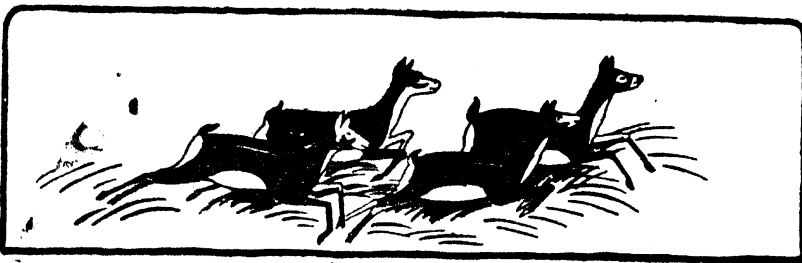
কথাচিত্র

শ্রীনারায়ণচন্দ্র বসাক, বি এস-সি

শব্দ সম্বলিত আলোক-চিত্রকে আমরা সাধারণত কথাচিত্র বলিয়াই পরিগণিত করিয়া থাকি। কিন্তু যিনি এ মতকে সমর্থন করিয়া লইবেন তিনি একটি ভুলই করিয়া বসিবেন। শব্দযুক্ত চিত্রকে কথা-চিত্রের পর্যায় ফেলার কল্পনা সাধারণ লোকের মনেই আসিবে। বিজ্ঞান-জগত বলিলে যাহা বুঝায়—তাহার প্রতি একটু লক্ষ্য রাখিয়া সূক্ষ্ম চিন্তাশক্তির দ্বারাই বুঝিতে পারা যায় যে, শুধু শব্দ সম্বলিত চিত্রকেই কথাচিত্রের পর্যায় ফেলা যায় না। শব্দকে প্রথমে কোন জিনিসের—যেমন, সেলুলয়েড্ নির্মিত ফিল্মের উপর তুলিয়া পরে সেই শব্দকে সম্পূর্ণরূপে পুনরুত্থাপন করার প্রণালীকেই কথাচিত্র বলিয়া উল্লেখ করা যাইতে পারে। যাহা হউক পাঠকগণের নিকট আমার একটি বিশেষ অনুরোধ যে নিম্নলিখিত প্রবন্ধটি পাঠ করিয়া কথাচিত্রের মূল ও গোপন তথ্যগুলির (Secret Theories) সম্যক জ্ঞান লাভ করা সম্ভবপর হইবে কি-না সে প্রশ্নের যথাযোগ্য উত্তর আমি পাঠক-গণের নিকট হইতেই পাইবার অপেক্ষায় রহিলাম।

আধুনিক কালের সিনেমা আমাদিগকে আধুনিক ছাঁচে গড়িয়া তুলিতেছে সত্য, কিন্তু তাহার ভিতর দিয়া আমরা কি শিক্ষা লাভ করিয়াছি সে সমস্যা আশা করি পাঠকগণই সমাধান করিয়া লইবেন। সিনেমা জগতে আজ হলিউড্ যে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া আছে তাহাও স্বীকার করিয়া লইতে পারি; কিন্তু তাই বলিয়া কি সে সভ্যতাকেও আমাদের মানিয়া লইতে হইবে? আমরা সিনেমা দেখি শুধু অভিনেতা ও অভিনেত্রীদিগের দৃষ্টিভঙ্গী, চলন ইত্যাদি বিষয় লক্ষ্য করিতে এবং তাহাদের ভাবভঙ্গী দেখিয়া নিজেরাও অনুকরণ করিতে চেষ্টা করি সন্দেহ নাই। সিনেমা-খবর আমাদের মনে কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিতে বসিয়াছে সংবাদপত্রের 'ষ্টুডিও সংবাদ'এর কথা প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যাইতে পারে। কোন্ অভিনেতা মাসিক কত বেতন পাইয়া থাকেন—অমুক্ অভিনেত্রীর বাড়ি কোথায়, সম্প্রতি কোন্ চিত্রটি কাহার মনে কিরূপ রেখাপাত করিয়াছে ইত্যাদি খবর এমন ছাত্রছাত্রী নাই যিনি না একটু আধটু বলিতে পারেন। টলিউডের ষ্টুডিওগুলিতে কোন্ কোন্ চিত্র মুক্তি প্রতিক্ষায় আছে এ খবর যেন সকলের নখদর্পণে থাকে; কিন্তু কি করিয়া একটি শব্দালোক চিত্র হইতে কথা বাহির হইয়া থাকে সেই রকম দুই একটি প্রশ্নের উত্থাপন করিলে অনেকেই বাক্‌শূন্য অবস্থায় থাকেন। এ নিস্তব্ধতার অর্থ কি? ইহার অর্থ আর কিছুই নয় যে আমাদের মধ্যে অল্পই এই দিক্‌টায় চিন্তা করিয়া থাকেন। বৈজ্ঞানিকরা যে সমস্ত তত্ত্ব আবিষ্কার করেন সেগুলিকে সাধারণ লোকের উপযোগী করিয়া তুলিতে হইলে আবার সাধারণ লোককেই সরল ও সহজ করিয়া বুঝাইয়া দিতে হয়। সাধারণের জ্ঞানলাভের জন্যই কথাচিত্রের তত্ত্বগুলিকে সরল ও সহজ ভাবে লিখিতে প্রয়াসী হইলাম।

আমরা যে চিত্র প্রেক্ষাগৃহে দেখিয়া থাকি সাধারণত আমরা তাহার সঙ্গে কথাও শুনিয়া থাকি। কিন্তু একটু চিন্তা করা দরকার যে এশব্দ আমরা কোথায় হইতে পাইয়া থাকি। একটি সেলুলয়েড্ নির্মিত আলোক-চিত্রের মধ্য হইতে কি করিয়া শব্দ পাইতে পারি সে তথ্যটি আমাদের জানিবার প্রয়োজন হয় না কি?

কথা চিত্রের তত্ত্বগুলি জানিতে হইলে প্রথমেই আমাদের এডিসনের (Edition) ফনোগ্রাফের (১নং চিত্র) নির্মাণ প্রণালী জানিতে হইবে। ফনোগ্রাফের তত্ত্বটি অতি সহজ। একটি ধাতু নির্মিত সিলিণ্ডারের উপরিভাগে মোমের আবরণ থাকা দরকার। মোমের পর্দার ঠিক্ উপরেই একটি আলপিন্‌যুক্ত ডায়াফ্রাম্ রাখিতে হয়। ডায়াফ্রাম্ কথার অর্থ, যে সমস্ত জিনিসের সামনে কথা বলিলে জিনিসগুলি কথা-নুযায়ী কম্পিত হইতে থাকে। ডায়াফ্রাম্ সাধারণত অভ্রের হয়। আজকাল পাতলা ধাতুর পাতের উপর টিনের কলাই করিয়াই ভাল ডায়াফ্রাম্ তৈয়ারী হইয়া থাকে। পিন্‌যুক্ত অভ্রটিকে একটি চোঙাকৃতি ফ্রেমের সঙ্গে যুক্ত করিয়া দিতে হয়। এখন যদি চোঙাটির সম্মুখে কথা বলিতে আরম্ভ করি এবং একই সময়ে সিলিণ্ডার-টিকে একই দিকে ঘুরাইতে থাকি তাহা হইলে মোমের উপরিভাগে দেখিতে পাইব কতকগুলি আঁকা বাঁকা রেখা হইয়াছে। এখন প্রশ্ন করিতে পারি, এই আঁকাবাঁকা রেখাগুলি কি? উত্তরে ইহাই বলিব যে এই রেখাগুলির ভিতরেই রহিয়াছে কথা। এখন কি করিয়া কথাগুলির পুনরাবৃত্তি হইতে পারে দেখা যাউক। উপরোক্ত ধারাল পিন্‌টির পরিবর্তে সেই স্থানেই একটি ভোতা আলপিন্ আটকান গেল এবং ডায়াফ্রামযুক্ত ভোতা আলপিন্‌টিকে মোমের উপরিভাগে আঁকাবাঁকা রেখাগুলির উপর চালাইয়া লইলে পূর্বের কথার শব্দ একই ভাবে বাতাসে কম্পিত হইতে থাকিবে। উপরোক্ত প্রণালীতেই আজকাল রেকর্ডে গান বাজনা, বক্তৃতা ইত্যাদি ওঠান হইয়া থাকে। এখন কি করিয়া আলোক-চিত্রে কথা ওঠান হইয়া থাকে এবং তাহারই পুনরাবৃত্তি ইত্যাদির বিষয়ই আলোচনা করিব।
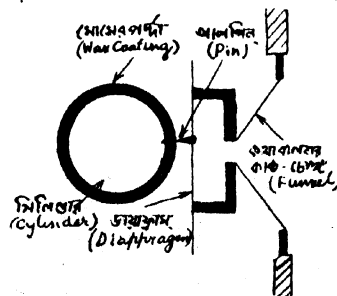
১নং চিত্র

প, ফ ব (২নং চিত্র) তিনটি লৌহদণ্ড পরস্পর পরস্পরকে সমকোণ করিয়া যুক্ত করান হইয়াছে। ইহাদের প দণ্ডটি গ নামে অভ্র ডায়াফ্রমের সহিত সংযুক্ত করান হইয়াছে। গ নামে অভ্রটি ঘ নামে কাষ্ঠ ফ্রেমের সঙ্গে যুক্ত আছে। এখন প ও ব-এর মাঝখানে ক ও খ দুইটি লৌহ চাকতি অপর একটি দণ্ডের সঙ্গে সংযুক্ত করিয়া এমনভাবে প ও ব-এর মাঝখানে রাখা হইল যেন সহজেই ক খ দণ্ডটি একটি বিদ্যুৎ চালিত ডাইনামোর দ্বারা অনায়াসে ঘুরান যাইতে পারে। ক চাকতিটির অগ্রভাগ ধারাল। এই জন্য এই চাকতিটিকে কর্তন চাকতি (Rotating cutter) বলা হয়। এখন একটি আলোক-চিত্রকে এ ভাবে উপরোক্ত যন্ত্রটির সম্মুখে টানিতে লা...ম যেন সর্বদাই কর্তন চাকতিটি ফিল্মের অগ্রভাগে সংলগ্ন অবস্থায় থাকে। এখন ম নামক স্থানে কথা বলিতে থাকিলে এবং একই সময়ে ফিল্ম্‌টিকে একই দিকে টানিতে থাকিলে
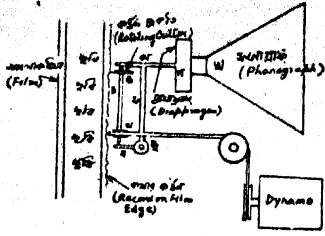
২নং চিত্র

ফিল্মের অগ্রভাগে কি দেখিতে পাইব? দেখিব কথার কমবেশী কম্পনে ক নামক চাকতিটি ফিল্মের অগ্রভাগে কমবেশী কাটিতে আরম্ভ করিবে। এখন যদি পূর্বোক্ত কর্তিত ফিল্মের উপর আবার সম্পূর্ণ যন্ত্রটিকে রাখিয়া অর্থাৎ ক চাকতিকে কর্তিত ফিল্মের উপর রাখিয়া ফিল্মটিকে একই দিকে টানিতে আরম্ভ করি তাহা হইলে পূর্বোক্ত কথাগুলির একই কম্পন বাতাসের ভিতর দিয়া আমাদের কানে আসিতে থাকিবে বলিয়াই পূর্বের কথার একই শব্দ আমরা শুনিতে পারিব। এই ভাবেই পূর্বে ফিল্মের গায়ে কথা ওঠান হইয়া থাকিত। কিন্তু এই প্রণালীতে কথা উঠাইতে গেলে অনেক অসুবিধা আছে। ফিল্মের গায়ে ছবি উঠাইয়া পরে যখন কথা উঠান হইয়া থাকে তখন কথা ও ছবি একই সময়ে হয় না বলিয়াই কথা ও ছবি একই সময়ে শুনিতে ও দেখিতে পাইব না। হয় কথা আগে ছবি পরে অথবা ছবি আগে কথা পরে শুনিয়া থাকিব। এই সকল দোষ দূর করিবার জন্য বর্তমান সময়ে অতি সহজ উপায়ে আলোক-চিত্রে কথা উঠান হয়। নূতন প্রণালীর কথা বলিবার পূর্বে আমাকে কতকগুলি জিনিসের যেমন,—ফটো-ইলেকট্রিক সেল, মাইক্রোফোন, লাউড্-স্পিকার ইত্যাদির নির্মাণ প্রণালী বলিতে হইল। ফটো-ইলেকট্রিক সেলে কতকগুলি ধাতুর প্রয়োজন হইয়া থাকে যেমন,—সেলেনিয়াম্, রুবিডিয়াম্, পটাশিয়াম্ ইত্যাদি। এই ধাতুগুলির একটি বিশেষ ধর্ম আছে। যখন ইহাদের মধ্যে আলোক রশ্মি ফেলা হয় তখন উপরোক্ত ধাতুগুলির ভিতরে চালিত বিদ্যুৎপ্রবাহ অনায়াসেই চলিতে পারে, কিন্তু ধাতুগুলিকে অন্ধকারে রাখিলে অর্থাৎ ধাতুর উপর আলো না পড়িলে ইহাদের মধ্য দিয়া বিদ্যুৎ-প্রবাহ সহজে চলিতে পারে না। সেলেনিয়াম্, ক্যাডমিয়াম্ প্রভৃতি ধাতুগুলির উপর আলোর ক্রিয়া ভালভাবে হইতে পারে না বলিয়াই শেষোক্ত ধাতুটিকেই ফটো-ইলেকট্রিক বাতিতে ব্যবহার করান হইয়া থাকে। এখন সেলের নির্মাণ ও কার্য প্রণালীর কথা বলা যাউক। ফটো-ইলেকট্রিক সেলকে (৩নং চিত্র) দেখিতে একটি সাধারণ বৈদ্যুতিক বাতির মত, কিন্তু একটু পার্থক্য সে সেলের ভিতরে ঠিক্ মাঝখানে একটি ধনাত্মক দণ্ড থাকে অর্থাৎ পজিটিভ্ বিদ্যুৎকে সর্বদাই এই দণ্ডের মধ্য দিয়া প্রবাহিত করিতে হয় এবং সেলের ভিতরের কাঁচের চারিদিকে (এক দিকে আলোর প্রবেশ পথ রাখিয়া) পারদ দিয়া আয়নার মত চকচকে করিয়া লইতে হয় এবং আয়নার ঠিক উপরিভাগে পটাশিয়াম্ হাইড্রাইডের একটি পাতলা পর্দার আবরণ ফেলিতে হয়। সেলের ভিতরের কাঁচের পর্দাকে চকচকে করিবার অর্থ সাধারণত কাঁচের ভিতর দিয়া বিদ্যুৎপ্রবাহ হইতে পারে না, কিন্তু পারদ দিয়া কাঁচকে আয়নার মত চকচকে করিলে কাঁচের ভিতর দিয়া বিদ্যুৎপ্রবাহ সহজেই হইতে পারে। কাঁচ ও পটাশিয়াম্ ধাতুর মধ্যে সর্বদাই ঋণাত্মক (Negative) বিদ্যুৎ
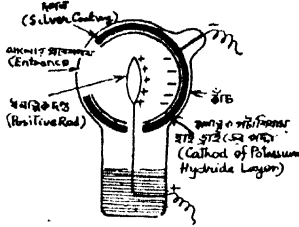
৩নং চিত্র

প্রবাহিত করিতে হয়। কিন্তু সর্বদাই লক্ষ্য রাখা দরকার যেন ধনাত্মক্ দণ্ড ঋণাত্মক্ দণ্ডের সহিত মিলিত না হয়। তাহারা এমন দূরত্বে থাকিবে যেন আলো পড়িলে অমনিই ধনাত্মক্ বিদ্যুৎ ঋণাত্মক্ বিদ্যুতের দিকে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত লাফাইয়া পড়ে, কিন্তু সেলটিকে যদি অন্ধকারে রাখা যায় তাহা হইলে পটাশিয়াম ধাতুর ভিতর দিয়া বিদ্যুৎ প্রবাহের সুবিধা না থাকার দরুণ দণ্ডের ধনাত্মক্ বিদ্যুৎ কাঁচের পটাশিয়ামের দিকে লাফাইয়া পড়িতে পারে না। তাহা হইলে বুঝিতে পারা গেল যে আলোর কম-বেশীতে ফটো-ইলেকট্রিক্ সেলের ভিতর দিয়াও কমবেশী বিদ্যুৎ চলিতে সক্ষম হইবে। এখন কিভাবে উপরোক্ত সেলটিকে কথার কাজে ব্যবহার করান যাইতে পারে ইহারই আলোচনা করিতেছি।

এইবার মাইক্রোফোন্ ও লাউড-স্পিকারের নির্মাণ প্রণালীর সম্বন্ধে কিছু সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিব। মাইক্রোফোন্ (৪নং চিত্র) বলিতে আমরা বুঝিয়া থাকি যে যন্ত্রটিকে সাধারণত কথা বলিবার কাজে ব্যবহার করান হইয়া থাকে। কোথাও বক্তৃতা হইলে বক্তার সামনে এই যন্ত্রটিকে বসান হইয়া থাকে। যন্ত্রটির সহজ নির্মাণ প্রণালী এইরূপঃ

দুইটি কয়লার চাকতি এবং কিছু কয়লার গুঁড়া এই যন্ত্র তৈয়ারী করিতে প্রয়োজন হইয়া থাকে। কয়লার চাকতি দুইটির মাঝখানে কয়লার গুঁড়াগুলিকে এমনভাবে রাখা হয় যেন চাকতির চাপে কয়লার গুঁড়াগুলির সংকুচন হয়। এখানে একটি কয়লার চাকতি ডায়াফ্রামরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কয়লার চাকতি দুইটিকে সাধারণ অবস্থায় রাখিলে কয়লার গুঁড়াগুলি ও (Carbon Dusts) সাধারণ অবস্থায় থাকে অর্থাৎ কয়লার গুঁড়ার মাঝখানে বাতাস থাকার দরুণ কয়লার প্রত্যেক কণা সংযুক্ত অবস্থায় থাকে না এবং সেই সময় কণিকার মধ্যে বিদ্যুৎপ্রবাহ চালাইলে বিদ্যুৎ সহজে প্রবাহিত হইতে পারে না, কিন্তু কয়লার চাকতি কথার কম্পনে সঙ্কুচিত হইলে কয়লার গুঁড়াগুলিও সংকুচিত হয় এবং বিদ্যুৎ চালাইলে অনায়াসেই চলিতে পারে। এইরূপে কথার কমবেশী কম্পনে মাইক্রো-ফোনে প্রবাহিত কমবেশী বিদ্যুৎও একই সময়ে লাউড-স্পিকারে আসিতে থাকে এবং সেই একই কথার-কম্পন বাতাসের ভিতর দিয়া আমাদের কানে আসিতে থাকিলে আমরা পূর্বের কথাগুলিই শুনিতে থাকি।
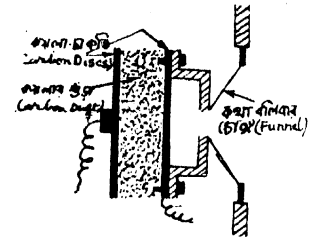
৪নং চিত্র

লাউড-স্পিকার (৫নং চিত্র) তৈয়ারী করিবার প্রণালীও অতি সহজ। ক নামে দুইটি বৈদ্যুতিক চুম্বক্ পরস্পরের সহিত যুক্ত আছে। খ একটি তারের কুণ্ডলী। চ কথা বলিবার কাষ্ঠ-চোঙাকৃতি ডায়াফ্রাম্ এবং গ-কে চ-এর সহিত সংযুক্ত করিয়া রাখা হইয়াছে। ঘ একটি তারের কথার কুণ্ডলী। এখন মাইক্রোফোনের সামনে কথা বলিতে থাকিলে সেই একই কথার কম্পনে বৈদ্যুতিক তারের সাহায্যার্থে ঘ নামক
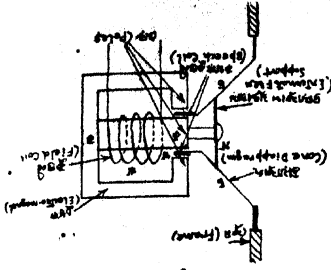
৫নং চিত্র

কুণ্ডলীতে কথার কম্পনানুযায়ী বিদ্যুৎ চলিতে থাকিবে এবং কুণ্ডলীর মধ্যে অনবরত বিদ্যুৎ চলিতে থাকিলে ব-এর সংলগ্ন চ ডায়াফ্রামে কথানুযায়ী আগৃত বিদ্যুতের জন্য একই কম্পন বাতাসের ভিতর দিয়া আমাদের কানে আসিতে থাকিলে আমরা পূর্বের কথারই পুনরাবৃত্তি শুনিতে থাকিব। একটি কথা বলিয়া রাখা ভাল যে, মাইক্রোফোনের কথানুযায়ী বিদ্যুতকে একটি এম্পলিফায়ারের মধ্য দিয়া লাউড-স্পিকারে আসিলে কথা বেশ জোরেই শুনিতে পাইব, কারণ এম্পলিফায়ারের কাজই কথার স্বরকে বাড়াইয়া তোলা। এখন কি করিয়া কথার শব্দকে আধুনিক উপায়ে আলোক-চিত্রে উঠান ও পুনরাবৃত্তি করান হইয়া থাকে তাহারই কথা বলিয়া প্রবন্ধটি শেষ করিব।

৬নং চিত্রের প্রতি লক্ষ্য করিলেই আলোক-চিত্রে কথা উঠাইবার প্রণালী জানিতে পারা যাইবে। প্রথমেই লক্ষ্য রাখা দরকার যে মাইক্রোফোনের সামনে একজন অভিনেতা বা অভিনেত্রী কথা বলিতে থাকিবে। মাইক্রোফোন যুক্ত বৈদ্যুতিক তার দুইটিকে প্রথমে একটি এম্পলিফায়ারের সহিত যুক্ত করিয়া পরে একটি স্পন্দন-বিশিষ্ট বৈদ্যুতিক বাতির সহিত যুক্ত করিয়া দিতে হয়। বাতির সামনে একটি
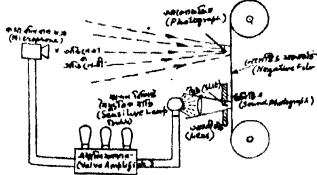
৬নং চিত্র

আতসী কাঁচ এমনভাবে বসান থাকে যেন স্পন্দন বিশিষ্ট বাতির আলো আতসী কাঁচের ভিতর দিয়া সন্নিকর্ষীত হইয়া একটি ছিদ্রের ভিতর দিয়া আলোক-চিত্রের এক ধারে আসিয়া পড়িতে পারে। পরবর্তী চিত্রে (৭নং চিত্র) একটি ধ্বনি-চিত্রের খুটিনাটি দেখান হইয়াছে এবং ইহার দৈর্ঘ্য ও বিস্তার কতখানি তাহাও স্পষ্টভাবেই অঙ্কিত করিয়া দেখান হইয়াছে। এখন চিত্রটিকে লক্ষ্য করিলেই দেখিতে পাওয়া যাইবে যে ফিল্মের বামদিকের গায়ে কতক-
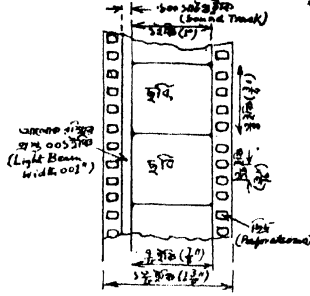
৭নং চিত্র

গুলি সারি সারি রেখা আছে এবং বিশেষভাবে লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে কোন কোন জায়গায় রেখাগুলি খুব ঘন ঘন এবং কোন কোন জায়গায় রেখাগুলির বেশ ফাঁক আছে। এই রেখাগুলিকে সাধারণত সাউণ্ড ট্রাক বলা হয়। বলা বাহুল্য এই রেখাগুলিই চিত্রে রূপান্তরিত অভিনেতা বা অভিনেত্রীদিগের কথার বিভিন্নতা। ৬নং চিত্রের দিকে লক্ষ্য করিলেই দেখিতে পাওয়া যাইবে মাইক্রোফোনের সামনে যে স্বরে কথা বলা হয় ঠিক সেইরূপ বিদ্যুৎপ্রবাহ মাইক্রোফোন-যুক্ত তারের ভিতর দিয়া কম্পন বিশিষ্ট বাতির দিকে আসিতে থাকিবে অর্থাৎ কমবেশী আলোক প্রথমে আতসী কাঁচ ও পরে ছিদ্রের ভিতর দিয়া নেগেটিভ্ আলোক-চিত্রের একধারে আসিয়া পড়াতে ফিল্মের গায়ে কোথায়ও কাল, কোথায়ও সাদা-কাল, এমনকি কোথায়ও সাদা রেখা পড়িবে। এখন ৭নং চিত্রের সহিত মিলাইয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে বাম দিকের সাদা-কাল রেখাগুলিই অভিনেতা বা অভিনেত্রীদিগের কথার চিত্র। নেগেটিভ্ চিত্রে কথা উঠাইবার প্রণালীর কথা বলা এখানেই শেষ হইল, কিন্তু উপরোক্ত চিত্র হইতে রেখাগুলিকে কিভাবে কথায় পুনরাবৃত্তি করান হইয়া থাকে এবার তাহারই আলোচনা করিব। উপরোক্ত যে প্রণালীর কথা বলা হইল এই নিয়মে আজ কাল স্টুডিওতে আলোক-চিত্রে কথা উঠান হইয়া থাকে। পরবর্তী যে প্রণালীর কথা বলিব সে নিয়মে আজকাল প্রত্যেক প্রেক্ষাগৃহে ধ্বনি-চিত্রের রেখাগুলিকে কথায় রূপান্তরিত করান হইয়া থাকে। বিদ্যুতের সাহায্যে ফটো-ইলেক্ট্রিক্ সেলের দ্বারা কি উপায়ে ধ্বনি-চিত্রকে প্রথমে আলোকে (৮নং চিত্র) এবং পরে আলোককে কথায় রূপান্তরিত করা হইয়া থাকে (৯নং চিত্র) চিত্রে তাহা পরিষ্কার-ভাবেই দেখাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ৯নং চিত্রটির দিকে একটু লক্ষ্য করিলেই
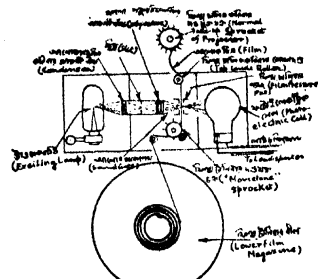
৮নং চিত্র

দেখিতে পাওয়া যাইবে যে প্রথমেই আলোক-চিত্রটিকে (যাহাতে ধ্বনি-চিত্রও থাকে) একটি কার্বন নির্মিত বাতির সামনে অথবা একটি শক্তিশালী বৈদ্যুতিক বাতির সামনে এমনভাবে রাখা হয় যেন আলো ছবির ভিতর দিয়া পর্দায় আসিয়া পড়িতে পারে। ৯নং চিত্রের একটু নীচে লক্ষ্য করিলেই দেখিতে পাওয়া যাইবে যে একটি অল্পশক্তি বিশিষ্ট আলোযুক্ত বাতি ঠিক সাউণ্ড ট্রাকের নিকটে এমনভাবে রাখা হয় যেন আলো সাউণ্ড ট্রাকের ভিতর এবং একটি ছিদ্রের ভিতর দিয়া ফিল্মের অপর পার্শ্বে সমান্তরালভাবে বসান ফটো-ইলেক্ট্রিক্ সেলের ভিতর পড়িতে পারে। এখন স্মরণ থাকা দরকার ফটো-ইলেক্ট্রিক্ সেলের মধ্যে যে শক্তির আলো পড়িবে তদ্রূপ বিদ্যুৎও তারের ভিতর দিয়া এম্লিফায়ারের ভিতর দিয়া লাউড্-স্পীকারে আসিয়া পড়াতে আলোর কম-
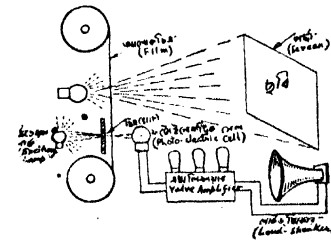
৯নং চিত্র

বেশীতে লাউড্-স্পীকারে কম্পনও কম-বেশী হয়। এই আলোক চিত্রে যেরূপ কথাচিত্র থাকে তদ্রূপ বিদ্যুৎও লাউড্-স্পীকারে আসে বলিয়া তদ্রূপ কথাই আমরা লাউড্-স্পীকারে শুনিয়া থাকি ব্যাপারটা একটু পরিস্কার করিয়াই বলি

(শেষাংশ ৩৬৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

আঁকাবাঁকা

শ্রীজগবন্ধু ভট্টাচার্য

দীর্ঘ গেরুয়া পথ এবার পাহাড়ের আড়ালে লুকিয়ে পড়েছে। পেছনে যতটা দেখা যায়, সর্পিল দেহ এলিয়ে দুলিয়ে সমতলে সে নেমে গেছে। আঁধারের মধ্যে আত্মসমর্পণ করেছে পেছনের পথ; সামনের পথ ডুব দিয়েছে রহস্যে। পৃথিবী থেকে মাথা তুলে সন্ধ্যাতারার দিকে তাকিয়ে আছে পাহাড়ের চূড়া। রহস্যময়, অর্থময়।

এখানে এসে গরুগুলি যেন ক্লান্তিতে আর চল্‌তে পারছে না। মুখ দিয়ে ওদের ফেনা গড়িয়ে পড়ছে—শ্বেত, শুভ্র ফেনা। মাঝে মাঝে পেছন থেকে তা একটু আধটু দেখা যায়। সমস্ত জীবন এবং জাগতিক প্রবাহ মন্থরতায় এগিয়ে চ'ল্‌ছে। এবার দুদিকে দুইটি পাহাড়। বড় বড় পাথর। দানব কঙ্কাল। আবার একটুখানি এগিয়ে গেলে দুপাশে বহদূর বিস্তৃত শালবন। ডান পাশে একটি নালা; তাতে সামান্য জল। জোনাকীর দল এদিকে ওদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বাম দিকে কি যেন একটা কি সুর সুর করে পা ফেলে পাহাড়ের দিকে উঠে গেল। শুক্‌নো পাতায় তার গতিরেখা। আর একটু দূরে জনার গাছের চূড়ায় . ছোট পাখীর ছটফটানি। সমস্ত নিঃসঙ্গতা এবং নৈঃশব্দ ব্যেপে যেন একটা প্রাণ-প্রবাহ। এ জগৎ থেকে যেন কোন অদৃশ্য এবং অস্পষ্ট জগতের ইঙ্গিত—মানব-জীবনের সেটাই যেন বড় সত্য হয়ে উঠে এ সময়। ফেলে আসা জীবনের প্রতি এ সময় এক অসহনীয় মমত্ববোধ জেগে উঠে। রামহরি একান্ত-মনে আজ তাই উপলব্ধি করছিল। বড় ক্লান্তি এসে গেছে আজ তার। দীর্ঘ ছ'বছর আজ প্রেতাত্মার মত এখানে সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে; কোন সময় সাপের খেলা দেখিয়ে বেড়ায়, রেলস্টেসনে কুলীর কাজ করে অথবা আর কিছু না হ'লে দেশে দেশান্তরে ঘুরে বেড়াতে আরম্ভ করে। পলাতক খুনী আসামী ঃ পৃথিবীকে ছলনা ক'রে আজ দীর্ঘ ছ'বছর সে কেবলই ঘুরে বেড়াচ্ছে। তথাপি এক একদিন সজল মেঘে আকাশ ছেয়ে যায় যখন, তেপান্তরের মানুষেরা নিজেদের ঘর খুঁজে নেবার জন্য যখন চঞ্চল হ'য়ে উঠে [illegible] সমস্ত কিছু ছাপিয়ে একখানা ক্ষুদ্র কুটির, তার কল্যাণ হস্ত চোখের পাতায় ভেসে উঠে। আকাশ আবার মেঘমুক্ত হয়ে উঠে, পৃথিবী নূতন সাজ প'রে এসে সামনে দাঁড়ায়। সে এগিয়ে যায়। কিন্তু কতকাল, আর কতকাল এম্নি সে ঘুরে বেড়াবে? দূরে পশ্চিমের আকাশে সন্ধ্যাতারাটি এবার স্থির হ'য়ে রয়েছে। সেদিকে তাকিয়ে রামহরির চোখে ঘুম এল।

জেগে উঠ্‌ল যখন, বাম পাশে একটা খাল; তাতে জল আছে এক আধটু। এখানে সেখানে কালো পাথরগুলো পিঠ উঁচু করে প'ড়ে আছে। জায়গাটা সে চিনতে পারল। রাজবিলাসপুরে। খালের ধার দিয়ে এগিয়ে গেলেই সামনে কয়েক ঘর মানুষের বস্‌তি চোখে পড়ে। কোন ইতিহাস যদিও নাই, তথাপি দুঃখ আনন্দ এবং প্রাত্যহিকতার ঐশ্বর্যে তা পরিপূর্ণ।

প্রতি বছর এক বাজীকর আসে রাজ-বিলাসপুরে। প্রতি বছর বর্ষার মেঘ কেটে যেদিন শরতের সোনালী রোদ ওঠে, সেদিন অলক্ষ্যে, কেমনভাবে না জানি পাহাড় জঙ্গলের পথ দিয়ে সে গাঁয়ের পথে এসে উপস্থিত হয়। দিন চারেক গাঁয়েরই একটা খালি বাড়িতে আড্ডা জমিয়ে বসে, গাঁয়ে গাঁয়ে খেলা দেখিয়ে বেড়ায়। আবার একদিন সমস্ত কিছু গুটিয়ে নিয়ে কেমন-ভাবে কোন্ পথে সে যে গাঁ থেকে বেরিয়ে যায়, কেউ তা টের পায় না। হঠাৎ একদিন খেয়াল হয় তাদের, তখন আর বাজীকর নাই সেখানে। তথাপি আশায় থাকে, একদিন সজল মেঘে আকাশ ছেয়ে যাবে, বনে বনে কুহুকেকা ডেকে উঠ্‌বে. শরৎ-সংগীতে আকাশ ব্যথিত হ'য়ে উঠ্‌বে। চিরপরিচিত ধূলি-ধূমাকীর্ণ পথে অপরিচিত মানুষটি এসে ডাক দেয়, ওরে খোকারা কে আছিস বাড়িতে? প্রতি বছরের মত এবারও রামহরি এসেছে। প্রতি বছরের মত এবারও ডাক শুনে ছেলেমেয়েরা হল্লা করে পথে বেরিয়ে এল। বাজীকর বল্‌লঃ নূতন খেলা দেখাব এবার। সাপের খেলা।

আরম্ভ হ'ল সাপের খেলা। বাঁশি বেজে উঠ্‌ল। ফণা দুলিয়ে নেচে উঠল সাপ। ছেলেরা একে অন্যের দিকে তাকাল। ভাব্‌ল, খেলার মত খেলা এবার একটা দেখলাম। ভোর আর বিকাল। খেলার আর অন্ত নাই। এ পাড়া আর ও পাড়ায় কেবলই খেলা চল্‌ছে। একবার যে দেখেছে, দুবার সে দেখবেই, না দেখে পারে না সে। পাড়ার ছেলেরা দল বেঁধে পেছনে পেছনে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তার ঘরে উঁকি দিচ্ছে। কেউ বল্‌ছে, জানিস না, রাত্তিরে বিছানায় সাপগুলো ওর মাথার উপর ফণা মেলে থাকে। সাপগুলো জানিস, গোপনে লুকিয়ে চুকিয়ে ওকে মন্তর শেখায়।

কৌতুহলের অন্ত নাই, প্রশ্নের অন্ত নাই, সমাধানেরও অন্ত নাই। আর তার মধ্যে বাজীকর ধীর গম্ভীর মূর্তিতে এ বাড়ি থেকে সে বাড়ি, এ পাড়া থেকে সে পাড়ায় খেলা দেখিয়ে বেড়ায়।

সেদিন ও অন্য দিনের মতই পাশের বাড়িতে আহার শেষ করে' বিছানায় শুয়ে পড়ল। অন্ধকার ঘরে হঠাৎ যেন কার ছায়া পড়ল।

—কি, ও?

ছায়ামূর্তি এক চুলও নড়ল না। বিপরীত দিকের দেয়ালে দীর্ঘ ছায়া ফেলে ধীর পদক্ষেপে সে এগিয়ে আস্‌ছে। বাজীকর উঠে বস্‌ল। হঠাৎ তীক্ষ্ণকণ্ঠে শাসিয়ে বলে উঠলঃ কেও, বলো শিগগির, নইলে এক্ষুনি ছেড়ে দিলাম সাপ।

—রক্ষা করো, মেরে ফেলো না, ছেড়ে দিও না সাপ।

ছায়ামূর্তি কেঁপে কেঁপে ঢলে পড়ল বাজীকরের গায়ে। বাজীকর নিজেকে সামলে নিয়ে তাকাল। এক নারীমূর্তি আজ তারই ঘরে, তারই সান্নিধ্যে এসে পড়েছে।

—দেবে নাকি, সাপটি ছেড়ে? বিদ্রূপ ক'রে খিল খিল করে হেসে উঠ্‌ল মেয়েটি। বল্‌লেঃ সবই তোমার পক্ষে সম্ভব।

তীক্ষ্ণভাবে রামহরি বললেঃ বাজে কথার ত কোনই প্রয়োজন নাই; বলে ফেলো কি দরকার এখানে এত রাত্তিরে।

ধীর এবং নিশ্চিত কণ্ঠে লক্ষ্মী বল্‌লেঃ তোমার সাথে চলে যাব বলে আসলাম...... নেবে না?

রামহরি অবাক হ'ল। বল্‌লে, কিন্তু কোথায় যাবে তুমি আমার সাথে?

—যেখানে তুমি যাও। পাহাড়ে, জঙ্গলে, পাড়াগাঁয়, শহরে, যে কোন যায়গায়—

—কিন্তু এ তুমি পারবে না কখ্‌খনো।

মেয়েটি দৃঢ়ভাবে বল্লেঃ এ আমাকে পারতেই হবে। হঠাৎ তার মুখখানা বাজিকরের মুখের কাছে তুলে এনে আদরের সুরে বললেঃ নিয়ে চলো না বাজিকর, সাপের মন্ত্র শেখাবে আমায়, বনে জঙ্গলে নিয়ে ঘুরে বেড়াবে। তারপর একদিন ফেলে রেখে যাবে পথের ধারে বা বনের ধারে। পারবে না? হঠাৎ লক্ষ্মীর কি হ'ল। সে উঠে দাঁড়াল। অন্ধকারে দোরের কাছ

পর্যন্ত এগিয়ে এসে ফিরে জিজ্ঞাসা করল:
কিন্তু আবার তুমি আসছ কবে? আর কি আসবে না?

রামহরির জবাব পাবার আগেই লক্ষ্মী এবার পথে নেমে একক এবং ত্রস্ত পা ফেলে ছায়াময় গ্রামপথে মিলে গেল।

অনেকক্ষণ পর নিজের তন্ময়তা মুছে ফেলে রামহরি তাকাল বাইরের দিকে। সেখানে মহাপ্লাবন। চন্দ্রালোকে আজ সমস্ত পৃথিবী অবগাহন করছে সেখানে। এক টুকরা শ্বেত, শুভ্র মেঘ পূব আকাশের এক প্রান্তে প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে আছে। রামহরি অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল সেদিকে। কোন কিছু যে বুঝতে পারল তাও নয়। কোন কিছু চিন্তা করা তার পক্ষে অসম্ভব। ছায়ার মত যে এল, ছায়ার মতই সে চলে গেল; কিন্তু কেন?

আবার দিন যায়।

অনেকদিন পার হয়ে গেল। এবার তল্পিতল্পা গুটিয়ে নিয়ে তাকে এদেশ ছেড়ে চলে যেতে হবে। আবার একদিন সে নিশ্চয়ই আসবে—কিন্তু তার এখন বহুদিন বাকি রয়েছে। রামহরি অজ্ঞাত ভবিষ্যতের দিকে নিজের দৃষ্টি পাঠিয়ে দিল—তারপর আপনা থেকেই তা গুটিয়ে নিল। অর্থহীন আঁকাবাঁকা পথের কোণে একদিন একজন চোখের পাতায় ডেকেছিল। সকল বাস্তবকে মিথ্যা করে দিয়ে সে অবাস্তব মুহূর্তটি জীবনে অজয় হবার দাবী জানাতে বসেছে আজ। চোখের পাতা ভিজে এল তার।

রামহরি ত্রস্তভাবে হাত চালিয়ে বিছানা-পুঁটলি গুটাতে বসে গেল। কিন্তু হঠাৎ পেছনের দিকে তাকিয়ে দেখল, ঘরের দোর থেকে আরম্ভ ক'রে পথের অনেকটা পর্যন্ত পুলিশের সারি। সর্পিল সাবধানতায় তারা কথা বলছে। সকলের মুখে একটা কথা শুধু 'খুনী'। একবার ইচ্ছে হ'ল তার, বিদ্রোহ করে উঠে বলে উঠে দৃঢ়কণ্ঠে: 'একথা মিথ্যা'। কিন্তু তা হ'ল না। বড় দারোগার বিদ্রূপের মধ্যে তার সমস্ত পুঞ্জীভূত বিদ্রোহ ডুবে গেল।

—খুব যে পালিয়ে বেড়াচ্ছ. চাঁদ?

—সাপের খেলা দেখিয়ে খুব ত ঘুরে বেড়ান হচ্ছে।

গ্রামে সামান্য একটু চঞ্চলতার তরঙ্গ হয়ত বা উঠল। ছেলেরা অনেকেই ছুটে এসে দেখল—রামহরিকে ধরে নিয়ে চলে যাচ্ছে তারা। কোথাও কিছু সে রেখে যায় নাই। শুধু ঘরের এক পাশে ভালুক আর বাঁদরগুলি একে অন্যের দিকে অসহায়তায় তাকাচ্ছে।

কিন্তু আগের দিনের অস্বাভাবিক উপেক্ষাকে অগ্রাহ্য করে সমস্ত পল্লী সেদিন সরব হয়ে উঠল। লক্ষ্মীকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। লক্ষ্মী নাই—লক্ষ্মী কোথাও নাই। লক্ষ্মী নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে। সংসার থেকে সে বেরিয়ে গেছে। আবার বিস্মৃতিতে মিশে গেল লক্ষ্মী।

দিনের পর দিন আসে, যায়, ফুল নিয়ে, ফল নিয়ে নবান্ন নিয়েও বা কোনদিন। ধানের ফসল নিয়েও হয়ত আসবে এ একদিন। কিন্তু লক্ষ্মী আসবে না কদাপি: রামহরিও আসবে না। পাড়ার লোকেরা তাই জেনে নিল।

তারপর একদিন লক্ষ্মীকে দেখা গেল আবার। কিন্তু এবার আর রাত্রির আড়ালে সংকুচিতা যুবতী নয়। প্রভাত আলো। সীমন্তে দীর্ঘ সিঁদুরের রেখা টেনে ছোট্ট পা দুখানা নিঃশব্দে ফেলে ফেলে এক পাগাত্মা নারী কারাগারের লৌহ ফটকের মধ্য দিয়ে তার শীর্ণ সঙ্কুচিত হাতখানা কী যেন দানের প্রত্যাশায় এগিয়ে দিল।

—আসামী রামহরির সাথে তোমার সম্বন্ধ ছিল কী?

—তিনি আমার স্বামী—।

মুহূর্তে লক্ষ্মীর সমস্ত দেহ-মন বিদ্রোহী হয়ে উঠল। মিথ্যা, এর চেয়ে বড় মিথ্যা আর নাই। বহুদিনের একটা পুরাতন সত্যকে এত বড় একটা মিথ্যা উক্তি দিয়ে মানুষের কাছে ঘোষণা করবার প্রগল্ভতায় তার সমস্ত মন আপনা থেকেই ছিঃ ছিঃ করে উঠল।

—আজ ভোরবেলা খুনের অপরাধে তার ফাঁসি হয়ে গেছে—তার মৃতদেহ আপন হাতে দাহ করতে চাও, তুমি।

ঘোমটার আড়াল হ'তে অসহায় কণ্ঠে বলে উঠল: হাঁ।

জেল ফটকের লাল গেরুয়া পথে আবার লক্ষ্মীকে দেখলাম। কিন্তু এবার পদক্ষেপ আর তেমন ধীর নয়। ডোমের কাঁধে রামহরির মড়া তুলে দিয়ে পেছনে ত্রস্ত পা ফেলে অসহায় লক্ষ্মী এগিয়ে আসছে। মাথা থেকে ঘোমটা পড়ে গেল তার, চুলগুলো এলোমেলো হয়ে নাকের উপর মুখের উপর চোখের উপর এসে পড়েছে। ধূলি উড়িয়ে আসছে লক্ষ্মী। এক্ষুণি হয়ত আর্তনাদ করে উঠবে। সিঁথির সিঁদুর সে মুছে ফেলেছে, ইচ্ছে করেই হয়ত।

কথা চিত্র

(৩৬৭ পৃষ্ঠার পর)

আলোক-চিত্রে যেরকম কথার রেখা থাকে, যখন আলো তাহার ভিতর দিয়া লইয়া যাওয়া হয় তখন কথাচিত্রের রেখাগুলির বিভিন্নতার দরুণ কমবেশী আলোকও ফটো-ইলেক্‌ট্রিক্‌ সেলের মধ্যে পড়াতে সেলে প্রবাহিত বিদ্যুৎও কখনও কমে আবা[illegible] কখনও বাড়ে, ফলে এই হয় যে কমবেশী বিদ্যুৎও লাউড্‌-স্পীকারে আসিতে থাকে এবং আলোক-চিত্রে যেরকম রেখা থাকে ঠিক্‌ সেই রকম বিদ্যুৎ প্রবাহ ফটো-ইলেক্‌ট্রিক্‌ সেলের ভিতর দিয়া লাউড্‌-স্পীকারে আসিয়া পড়াতে আলোকে[illegible] কম্পনানুযায়ী কম্পন আমরা লাউড্‌-স্পীক[illegible] পাইতে থাকি অর্থাৎ লাউড্‌-স্পীকা[illegible] [illegible]াহায্যে অভিনেতা বা অভিনেত্রীদিগের আ[illegible]ক-চিত্রে উঠান কথা-চিত্রকে পুনরায় শব্দে রূপান্তরিত করিয়া থাকি।

বঙ্গের জাতীয় কবিতা ও সঙ্গীত

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই অক্টোবর কলিকাতাতে যে রাখী বন্ধন উৎসব হয়, তাহার সংক্ষিপ্ত সরকারী বিবরণীটুকু পূর্বেই উদ্ধৃত করিয়াছি। এই রাখী বন্ধন উৎসব দিনে রবীন্দ্রনাথের রচিত রাখী-সংগীত গীতটি যেখানে যে দেশে বাঙালী ছিলেন সেখানেই গীত হইয়াছিল। সে যে কি পুণ্য দৃশ্য, যাঁহারা না দেখিয়াছেন, তাঁহারা তাহা কল্পনার দ্বারাও অনুভব করিতে পারিবেন কিনা সন্দেহ। সেই অমর সংগীতটি নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি :

রাখী-সংগীত

"বাঙলার মাটি, বাঙলার জল,
বাঙলার বায়ু, বাঙলার ফল,
পুণ্য হউক, পুণ্য হউক,
পুণ্য হউক, হে ভগবান ॥

বাঙলার ঘর, বাঙলার হাট,
বাঙলার বন, বাঙলার মাঠ,
পূর্ণ হউক পূর্ণ হউক
পূর্ণ হউক, হে ভগবান ॥

বাঙালীর পণ, বাঙালীর আশা,
বাঙালীর কাজ, বাঙালীর ভাষা,
সত্য হউক, সত্য হউক,
সত্য হউক, হে ভগবান ॥
বাঙালীর প্রাণ, বাঙালীর মন,
বাঙালীর ঘরে যত ভাইবোন,
এক হউক, এক হউক,
এক হউক, হে ভগবান ॥"

বাঙালী জাতির সর্ববিধ অনৈক্যকে দূর করিয়া মিলন-ক্ষেত্র রচনা করাই ছিল কবির কামনা।

বাঙলার এই স্বদেশী যুগের আলোচনা করিতে গিয়া একজন ইংরেজ লেখক বলেন : বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ জনিত আন্দোলনের মধ্যে বাঙলা দেশের আন্দোলনকারিগণ আবার শাক্ত আদর্শে অনুপ্রাণিত হইলেন। কালী দেশের অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে পূজিতা হইতে লাগিলেন। এই সঙ্গে উগ্র জাতীয়-বাদীদিগকে লক্ষ্য করিয়া লিখিত হইয়াছে :

"Inspiration was drawn by the extremer nationalists from the life of Sivaji, both as regards spirit and method. Surendra Nath Banerjea made Sivaji a power in Bengal, and this was no small feat, since, for generations following the Maratha raids, his name had been a borgey with which mothers hushed their babies. A new sense of helplessness, wr[illegible]lness and bitterness has ag[illegible] come over large sections t[illegible] population." (The S'AKTAS. : Ernest A. Payne).

লেখকদের এই উক্তির মধ্যে সত্য নিহিত আছে। আর এই[illegible]সব উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথের বিরচিত কবিতা দেশ মধ্যে এক অগ্নিমন্ত্রের কাজ করিয়াছিল। সৌভাগ্য-বশত আমার শিবাজী উৎসবে যোগদান করিবার সুযোগ হইয়াছিল এবং টাউন হলে শিবাজী উৎসব উপলক্ষে লিখিত কবিতাটি পাঠ করিয়াছিলেন চন্দননগর নিবাসী স্বর্গত কবি নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। সে সময়ে সম্ভবত নরেন্দ্রবাবু বোলপুর শান্তিনিকেতনে একজন শিক্ষক ছিলেন।

কবি শিবাজীকে লক্ষ্য করিয়া প্রকৃত ঐতিহাসিক সত্যের প্রচার করিয়াছিলেন। সে সময়ে বাঙলা দেশে বীরপূজার প্রচলন করিবার জন্য যে আয়োজন চলিয়াছিল তাহাতে বীরের সন্ধানই মিলিতেছিল না। সত্য সত্যই শিবাজীর দেশেও মহারাষ্ট্রীয়েরা শিবাজীকে ভুলিয়াছিলেন। যথার্থই—until the last century Sivaji had been almost entirely forgotten, and his tomb allowed to fall into ruin. The revival of his memory and the conversion of it into a living force, is ascribed by calantine Chirol, in his book *Indian unrest*, to B. G. Tilak."

একথায় প্রতিবাদ করিবার মত কিছু বলিবার তখন আমাদের ছিল না। স্বর্গত বাল গঙ্গাধর তিলক মহোদয়ই শিবাজী উৎসবের স্রষ্টা আর বাঙলা দেশে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় হইয়াছিলেন অগ্রণী।

রবীন্দ্রনাথ শিবাজীকে লক্ষ্য করিয়া যথার্থই বলিয়াছেন :

"বঙ্গের অঙ্গন-দ্বারে কেমনে ধ্বনিল কোথা হ'তে
তব জয় ভেরি?
তিন শত বৎসরের গাঢ়তম তমিস্রা বিদারি'
প্রতাপ তোমার
এ প্রাচী দিগন্তে আজি নবতর কি রশ্মি প্রসারি'
উদিল আবার?

* * * *

একথা ভাবে নি কেহ তিন শতাব্দকাল ধরি'—
জানেনি স্বপনে—
তোমার মহৎ নাম বঙ্গ-মারাঠারে এক করি'
দিবে বিনা রণে!
তোমার তপস্যা তেজ দীর্ঘকাল পরে অন্তর্ধান
আজি অকস্মাৎ
মৃত্যুহীন-বাণীরূপে আনি দিবে নূতন পরাণ,
নূতন প্রভাত!

* * * *

মারাঠির সাথে আজি, হে বাঙালি, এককণ্ঠে বল
'জয়তু শিবাজি!'
মারাঠির সাথে আজি, হে বাঙালি, একসঙ্গে চল
মহোৎসবে আজি!
আজি এক সভাতলে ভারতের পশ্চিম পূরব
দক্ষিণে ও বামে
সম্ভোগ করুক আজি একযজ্ঞে একটি গৌরব
এক পুণ্য নামে!

অনেকে হয়ত একথা অবগত নহেন যে, সখারাম গণেশ দেউস্কর বঙ্গে এই শিবাজী উৎসবের অনুষ্ঠানের প্রধানতম উদ্যোক্তা ছিলেন এবং প্রধানত তাঁহার চেষ্টা ও যত্নেই বাঙলা দেশে শিবাজী উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। শিবাজী উৎসবের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীযুক্তা সরলা দেবী বীরাঙ্গনা ব্রতের প্রবর্তন করিলেন, প্রতাপাদিত্য উৎসব আরম্ভ হইল—বাঙালী যুবক-যুবতীরা, তরুণ-তরুণীরা দেশের সেবায় নানারূপে প্রবৃত্ত হইলেন। তারপর লর্ড মর্লি যেদিন পার্লামেন্টে বলিলেন : বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের পরিবর্তন কখনও করিবেন না; তখন বাঙালী পণ করিল—আমরাও বিলাতী বর্জন ছাড়িব না। আমরা দুর্বল হইলেও বিধাতার বিধানে বিশ্বাসী। এমন শক্তিমান জাতি পৃথিবীতে নাই যাহার সাধ্য আছে বিধাতার বিধান ভাঙিতে পারে। আমরা আমাদের ক্ষুদ্র শক্তির দ্বারা পরিচালিত হইব এবং বিধাতার ধর্ম-বিধানের উপর নির্ভর করিতেছি। তখন কবির কণ্ঠে শুনিলাম,

বিধির বিধান ভাঙবে তুমি এমন শক্তিমান,
তুমি কি এমন শক্তিমান্!
আমাদের ভাঙাগড়া তোমার হাতে এতই অভিমান
ওগো! এতই অভিমান!

মনে পড়ে বরিশাল প্রাদেশিক সমিতির কথা। সে সময়ে আমি ছিলাম পল্লীবাসী। আমার গ্রামবাসী কয়েকজন বন্ধু শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ ভট্টাচার্য ও শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির অনুরোধে আমরা বরিশাল প্রাদেশিক সমিতির প্রতিনিধিরূপে অধিবেশনে যোগদান করিতে গিয়াছিলাম। আমরা পূর্বদিন সন্ধ্যার সময় চাঁদপুরে এক আত্মীয়ের বাসায় থাকিয়া পরদিন বরিশাল-গামী স্টীমারে বরিশাল যাই। সেকি উত্তেজনা। কলিকাতা হইতে বহু প্রতিনিধি ও নেতৃবর্গ গিয়াছিলেন—তাঁহাদের মধ্যে সুরেন্দ্রনাথ, বিপিনচন্দ্র, মিঃ জে চৌধুরী (শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চৌধুরী), মিঃ সি আর দাস (দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন), কালীপ্রসন্ন কাব্য বিশারদ, কালীপ্রসন্ন দাশগুপ্ত প্রভৃতি বহু যাত্রী ছিলেন। স্টীমারে তিলার্ধও স্থান ছিল না। সেকি আনন্দ অভিযান! প্রত্যেক স্টেশনে গ্রামবাসীরা ফুলের মালা ও বিবিধ খাদ্যদ্রব্য উপহার লইয়া আসিতেছিলেন, স্টীমারের নানাস্থানে সংগীত চলিতেছিল, 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি শুনা যাইতেছিল।

সেই জাহাজেই কালীপ্রসন্ন কাব্য বিশারদের গায়কদল তাঁহার বিরচিত সংগীত গাইতেছিলেন, ময়মনসিংহ হইতে আগত প্রতিনিধি স্বর্গত উমেশচন্দ্র চাকলাদার, ব্রজেন্দ্রলাল গাঙ্গুলী প্রভৃতি গাহিতেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমারতম' সংগীত। বরিশাল স্টীমার ঘাটে স্টীমার থামিলে জনগণ মধ্য হইতে যে আনন্দকোলাহল ধ্বনি উঠিতেছিল, যে ঘন ঘন 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি প্রতিধ্বনত হইতেছিল সেই সহস্র সহস্র মিলিত কণ্ঠের বাণী এখনও কানে বাজিতেছে।

স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল প্রভৃতি নেতৃবৃন্দকে নামিতে দেওয়া হইবে না—এইরূপ ছিল কর্তৃপক্ষের আদেশ। বরিশালের অশ্বিনীকুমার প্রমুখ নেতারা আসিয়া স্টীমারে নেতৃবর্গের মধ্যে নানা কর্তব্য নির্ধারণ সম্পর্কে আলাপ ও আলোচনা করিতেছিলেন—কোন পথ গ্রহণ করা হইবে। সেই দিন আমার সৌভাগ্য হইয়াছিল দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের সহিত প্রথম পরিচয়ের। তিনি অতশত গোলমালের মধ্যেও আমার কেবিনের জানলার পাশে নীরবে চুপ করিয়া বসিয়া নদীর ও আকাশের দিকে চাহিয়াছিলেন। কোনদিকেই তাঁহার লক্ষ্য ছিল না—ধ্যানমগ্ন তাপসের ন্যায় সেই সমাহিত চিত্ত দেশসাধকের সঙ্গে আমার আলাপ হইয়াছিল পল্লী গ্রামের সংস্কার সম্বন্ধে এবং কিভাবে দেশের কাজ করা যায়।

প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশন মণ্ডপে যাওয়ার সময় নেতৃবর্গকে লইয়া যে শোভাযাত্রা চলিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তৎসম্বন্ধে নিষেধাজ্ঞা প্রচার করিলেন। এদিকে নেতৃবর্গও শোভাযাত্রা করিবেন স্থির করিলেন। অশ্বিনীকুমার দত্ত, সুরেন্দ্রনাথ, বিপিনচন্দ্র পাল প্রভৃতি অগ্রসর হইলেন। পুলিশ আসিল, সার্জেণ্ট আসিল। সেদিন একজন সার্জেণ্টের ঘোড়া বিপিন পাল মহাশয়ের উপর আসিয়া পড়িবার উপক্রম করিলে বিপিনবাবু সেই সার্জেণ্টের ঘোড়ার লাগাম ধরিয়া অতি ভৈরবকণ্ঠে গানের সুরে বলিতে লাগিলেন:

> ওদের বাঁধন যত শক্ত হবে
> মোদের বাঁধন খুলবে
> ওদের আঁখি যতই রক্ত হবে
> মোদের আঁখি খুলবে।

বিপিনবাবুর মুখোচ্চারিত এই তেজঃপূর্ণ বাণী একটা অপূর্ব উত্তেজনার সৃষ্টি করিয়াছিল। শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা পুলিশের লাঠির আঘাতে একটা পুষ্করিণীর মধ্যে পড়িয়া গেলেন। তবু সভার অধিবেশন হইয়াছিল। এখানে আমাদের বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া অপ্রাসঙ্গিক। সেই সময়ে স্বর্গত বন্ধুবর কবি দেবকুমার রায় চৌধুরীর আহবানে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনেরও আয়োজন হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ সভাপতি নির্বাচিত হইয়া বরিশাল আসিয়াছিলেন এবং একখানি বজরায় ছিলেন। প্রাদেশিক সমিতির বিবিধ অশান্তির জন্য সাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশন আর হইল না—রবীন্দ্রনাথও চলিয়া আসিলেন।

স্বদেশী যুগে ১৩১২ সাল হইতে ১৩১৮ পর্যন্ত এই ছয় বৎসর রবীন্দ্রনাথ গল্পে, কবিতায়, সংগীতে, প্রবন্ধে নানারূপে স্বদেশের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া বাঙলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তারপর একদিন সহসা কবি স্বদেশী আন্দোলন হইতে আপনাকে বিচ্ছিন্ন করিলেন। একদিন কবি যেমন জাতীয় বিদ্যালয়, পল্লী সমিতি, স্বদেশী সমাজ প্রভৃতির গঠনে অগ্রণী ছিলেন, সহসা সেই কর্মক্ষেত্র হইতে সরিয়া পড়িলেন। এ প্রসঙ্গে স্বর্গত অজিতকুমার চক্রবর্তী লিখিয়াছেন:

"এ একেবারে অপ্রত্যাশিত। বেশ মনে আছে দেশের লোকের কাছে ইহার জন্য তাঁহাকে কি নিন্দাবাদ, কি বিদ্রূপই সহ্য করিতে হইয়াছিল। কিন্তু কেন এরূপ করিলেন?

* * * *

* * * "তিনি একদিকে ক্রমাগত আপনার কল্পনা-রচিত ভাবের মধ্যে দেশকে যেরূপে উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, কর্মক্ষেত্রে নামিয়া সে ভাব বাস্তবের আঘাতে ক্রমাগতই ভাঙিয়া যাইবার দশায় পড়িয়াছিল। অন্যদিকে যে তপোবনের বিশ্ববোধের সাধনায়, আপনাকে সকল হইতে বঞ্চিত করিয়া সকলকে আপনার মধ্যে অনুভব করিবার সাধনায় তিনি তপস্যা করিবেন সংকল্প করিয়া আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন; সেই চিরজীবনের তপস্যা কর্মের সাময়িক উত্তেজনায় ও উন্মত্ততায় আবিল হইয়া বিলুপ্ত হইবার উপক্রম করাতেই তাঁহার ক্ষুধিত চিত্ত আপনাকে সকল বন্ধন হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে দ্বিধা মাত্র বোধ করিল না।"

"এই ঘটনাই কবি জীবনে বারম্বার ঘটিয়াছে। কেবলি বন্ধনে জড়ানো এবং কেবলি বন্ধন ছিন্ন করা। কখনো সৌন্দর্যে, কখনো প্রেমে, কখনো স্বদেশের কর্মক্ষেত্রে—যখনি যাহাতে ঢুকিয়াছেন কি তীব্র আবেগে তাহাদের অনুরঞ্জিত করিয়া অপরূপ করিয়া দেখিয়াছেন—ব্যাস্ ঐখানেই সমাপ্তি বীণায় যেই তাহার পরিপূর্ণ সংগীত ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিয়াছে, অমনি কি তার ছিঁড়িল এবং আবার নূতন তারে নূতন গান গাহিবার জন্য সমস্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল!" [অজিতকুমার চক্রবর্তী লিখিত রবীন্দ্রনাথ দ্রষ্টব্য।]

এ কথাকয়টি কবির জীবনের বিভিন্ন পর্যায় আলোচনা করিলেই অনুভব করা যায়। সেকালের মনোভাব ব্যর্থতা ও বেদনা সমাজ এবং ধর্মের বিশ্লেষণ ও মনস্তত্ত্বের বিকাশ ও সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম ও সমাজের বিভেদ, উপধর্মের প্রভাব এবং বিবিধ সমস্যার সমাধান করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। তারপর কবির বিদায় বাণী শুনিলাম। স্বদেশ সেবায় কর্মক্ষেত্র হইতে বিদায় লইবার সময় ব্যথিত কণ্ঠে বলিলেন:

> "বিদায় দেহ ক্ষম আমায় ভাই
> কাজের পথে আমিত আর নাই।
> এগিয়ে সবে যাও না দলে দলে
> জয়মাল্য লও না তুলি গলে,
> আমি এখন বনচ্ছায়া-তলে
> অলক্ষিতে পিছিয়ে যেতে চাই,
> তোমরা মোরে ডাক দিয়ো না ভাই।"

এই স্বদেশী আন্দোলনের কালে রবীন্দ্রনাথের গানে ও কবিতায় বাঙলার মাটি ও বাঙলার জলের মাধুর্য বিশেষভাবে প্রকটিত হইয়াছিল। বাঙলা দেশকে বাঙালী জাতিকে লক্ষ্য করিয়া অনেক কবিতা ও সংগীত রচনা করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ বরাবরই ছিলেন পল্লীর উন্নতি প্রয়াসী, আর তাঁহার দৃষ্টি ছিল বৃহত্তর মানব সমাজ এবং বৃহত্তর ভারত গড়িয়া তোলেন। তাঁহার আদর্শ ও লক্ষ্য ছিল—

> আগে চল্ আগে চল্ ভাই
> পড়ে থাকা পিছে, মরে' থাকা মিছে,
> বেঁচে মরে' কিবা ফল ভাই!
> আগে চল্ আগে চল্ ভাই!

রবীন্দ্রনাথ এই দেশসেবায় চাহিয়াছিলেন সত্যের আদর্শকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে। যশ, ধন, মান, প্রতিপত্তি প্রভৃতির সর্ববিধ প্রলোভন হইতে দূরে থাকিয়া সর্বপ্রকার পূর্ব-সংস্কার-বিরোধী মন লইয়া দেশের সেবায় আত্মনিবেদন করিত। তাই তাঁহার কণ্ঠে শুনিতে পাইয়াছিলাম,—

> 'মোরা সত্যের পরে মন'
> আজি করিব সমর্পণ।
> মোরা বুঝিব সত্য, পূজিব সত্য,
> খুঁজিব সত্য ধন!

কিন্তু পদে পদে আঘাত পাইলেন তাই তাঁহার কাছেই আমরা শুনিতে পাইয়াছি: "দেশের কাজ করবার জন্য দেশের লোকের যে অধিকার আছে সেটা আমরা আত্মবিশ্বাসের মোহে বা সুবিধার খাতিরে অন্যের হাতে তুলে দিলে যথার্থ পক্ষে নিজেদের দেশকে হারানো হয়। সামর্থ্যের স্বল্পতাবশত যদি বা আমাদের কাজ অসম্পূর্ণও হয় তবু সে ক্ষতির চেয়ে নিজ শক্তি চালনার গৌরব ও সার্থকতা লাভ অনেক পরিমাণে বেশি। এত বড় একটা সাদা কথা লোক ডেকে যে বলতে বসেছিলুম তাতে মনের মধ্যে কিছু লজ্জা বোধ করেছিলুম। কিন্তু বলা হয়ে গেলে পরে লাঠি হাতে দেশের লোকে আমার সেটুকু লজ্জা চুরমার করে দিয়েছিলো।"

কোথায় তাঁ[illegible] বেদনা ছিল এবং কি তিনি চাহিয়া[illegible] তাহাও তাঁহার নিজের ভাষায়ই বলিতে [illegible] "মনে আছে একদা কোনো এক স্বাদে[illegible] সভায় এক পণ্ডিত বলেছিলেন [illegible] [illegible]তবর্ষের উত্তরে হিমগিরি, মাঝখ[illegible] [illegible]রি, দুই পাশে

দুই ঘাটীগিরি, এর থেকে স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে বিধাতা ভারতবাসীকে সমুদ্রযাত্রা করতে নিষেধ করেছেন। বিধাতা যে ভারতবাসীর প্রতি কত বাম তা এই সমস্ত নূতন নূতন কেরানীগিরি ডেপুটিগিরিতে প্রমাণ করচে। এই গিরি উত্তীর্ণ হয়ে কল্যাণের সমুদ্র যাত্রায় আমাদের পদে পদে নিষেধ আসচে। আমাদের শিক্ষার মধ্যে এমন একটি সম্পদ থাকা চাই যা কেবল আমাদের মধ্যে তথ্য দেয় না, সত্য দেয়; যা কেবল ইন্ধন দেয় না, অগ্নি দেয়।"

"আমাদের দেশ আপন শক্তিতে আপন কল্যাণের বিধান করবে এই কথাটা যখন কিছুদিন উচ্চৈঃস্বরে আলোচনা করা গেল তখন বুঝলুম কথাটা যাঁরা মানচেন তাঁরা স্বীকার করার বেশী আর কিছু করবেন না; আর যাঁরা মানচেন না, তাঁরা উদ্যম সহকারে যা কিছু করচেন সেটা আমার সম্বন্ধে, দেশের সম্বন্ধে নয়।"

কবি একদিন যেমন আশা ভরা হৃদয়ে লিখিয়াছিলেন : "আজ বুঝিয়াছি যে মিলন আমাদিগকে বরদান করিবে, জয়দান করিবে, অভয়দান করিবে সে মহামিলন গৃহ প্রাঙ্গণের মধ্যে নহে, সে মিলন দেশে। সে মিলনে কেবল মাধুর্য রস নহে, সে মিলনে উদ্দীপ্ত অগ্নির তেজ আছে, তাহা কেবল তৃপ্তি নহে তাহা শক্তি দান করে।"

মোর হার-ছেঁড়া মণি নেয়নি কুড়ায়ে,
রথের চাকায় গেছে সে গুঁড়ায়ে,
চাকার চিহ্ন ঘরের সমুখে
পড়ে আছে শুধু আঁকা।
আমি কি দিলেম কারে জানে না সে কেউ
ধূলায় রহিল ঢাকা।
তবু রাজার দুলাল গেল চলি মোর
ঘরের সমুখ পথে,
মোর বক্ষের মণি না ফেলিয়া দিয়া
রহিব বলকি মতে?",

* পল্লীর উন্নতি—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রবাসী, বৈশাখ, ১৩২২ দ্রষ্টব্য।

ত্রাণ কর্তা পৃথিবীর নবজন্ম আঁকে

শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

সিঁদুরে রঙের মেঘ দিগন্ত ছাপিয়ে এলো,
গেল বেলা।
ঠাণ্ডা হাওয়া খরতোয়া নদীটারে করে এলোমেলো,
দীর্ঘশ্বাসে চঞ্চলতা পল্লব প্রচ্ছন্ন চোখে করে খেলা।
সৈনিকের ক্লান্ত পদক্ষেপে বাদুড়ের কাঁপে ডানা,
কি যেন একটা ভয়! কেন এ আতঙ্ক!
মৃত্যু দেবে বুঝি নানা—
বিড়ম্বনা।

লঘু হাসি আর পরিহাস,
দিকে দিকে সর্বনাশ,—ইথারের আলোড়নে
ক্ষণে ক্ষণে
বাজে ধ্বংস দেবতার জয়শঙ্খ।

দেখলাম চাঁদ উঠলো আর ডুবলো মেঘেদের ফাঁকে,
শান্তির আভাস
কোথা পাবে! অবসন্ন মানুষেরা পঙ্কমাঝে।

অস্পষ্ট তারার পথে অলস স্বপ্নেরা যায় আসে,
কত রাজ্যের উত্থান আর পতন হোলো;
তুমি যেমন আছ তেমনি থেকেই হয়েছ বঞ্চিতা :
তোমার সন্তান নহেক জোরালো,
ধারালো কথাই বলে,—
পথ চলে।......মাগো! কেঁদোনাক, ওই মহাকাশে—
মহাশক্তি হবে অভ্যুদিতা।
ইলেকট্রোনের ঘূর্ণাবর্তে ধরতে কি পারবে পাগলটাকে!
সে কি মা পাগল!......ত্রাণকর্তা—পৃথিবীর নবজন্ম আঁকে।

জন্ম

তারাপদ গঙ্গোপাধ্যায়

ফাল্গুনের অপরাহ্ন। দূরের শিমুল গাছটায় বাসর পরায়েছে শিমুলের লাল পাপড়ি। য়ুকি-লিপ্টাস গাছটার পাতা নড়ছে দমকা বাতাসে। দূরে ধূসর পাহাড় তার নীচে তিস্তার জলোচ্ছ্বাস—কান পাতলে মনে হয় মত্ত হস্তীর নিঃশ্বাসের মত।

বাসনা বল্লে—কি ভাবছো?

নিরাপদ মুখ ফিরালে—কই, কিছু না, এমনি বসে থাকতে ভাল লাগচে।

—জানো না এটা বিজ্ঞানের যুগ। মানুষ চিন্তা ছাড়া বসে থাকতে পারে না, এটা ধরা পড়েচে। পঞ্চমীর কথা ভাবছো নাকি।

নিরাপদ হাসলো এবার হো হো করে—বুঝেচি তোমার হিংসা হচ্চে। আপনজনের ওপর অন্যের লোভ যতই আধুনিক হও না কেন সহ্য করতে পারে না।

—নিজে ঠিক থাকলেই পারো।

—তোমার কথায় রাগ আছে, এসো কাছে এসে বসো।

এর একটু ইতিহাস আছে। নিরাপদ চাকরীতে ঢুকে প্রথমেই পশ্চিমে যায় একটা ব্রিজ কনস্ট্রাকসানে। সেখানেই এক পাঞ্জাবী পরিবারের সাথে আলাপে পঞ্চমী উঠে এয়েচে সৌগন্ধী ফুলের মত মনে আর দেহে।

—জানোই তো আমি কিছুক্ষণ একা স্তব্ধ হয়ে বসে থাকতে ভালবাসি।

—তুমি ইঞ্জিনীয়ার হলে কেন, ছেনি-হাতুড়ির ব্যাপার—নিছক বাস্তব কাহিনী।

—ভুল বল্লে ; কাজের সময় আমি মত্ত ষণ্ড, কেউ বলতে পারবে না, এই লোকটাই চাঁদের দিকে মুখ ফিরিয়ে নানা স্বপ্ন দ্যাখে —তখন আমি ভীষণ প্র্যাকটিক্যাল। এটা আশ্চর্যের কিছু না, মানুষের দু'টো দিক আছে—একটা অন্দরমহলের আর একটা সদরের। সদরটা খাঁটি বাস্তব, সেখানে জটলা শুধু ইকনমির বাজার।

তার চেয়ে পঞ্চমীর গল্প বলো শুনি বসে বসে।

—খুব ভাল লাগে সে কথা শুনতে, না আমায় পরীক্ষা করো—পঞ্চমী এখনও আমার মনের পাঁজরে পাঁজরে আছে কি না। আচ্ছা, তুমিই জোর করে বলতে পারো, তোমার জীবনটা এদিক দিয়ে নিরঙ্কুশ।

বাসনা হেসে উঠলো—আমরা তো আর পুরুষ নই—নেংটি ইঁদুরের মত মেয়ের পিছু পিছু ছুটিছ।

এবার নিরাপদও হেসে উঠলো হো হো করে।

সেদিন বিকেলে গা ধুয়ে আসতেই নিরাপদ বল্লে—এই দ্যাখো, তোমার বোন রাণী আসছে পুরী থেকে। চিঠি দ্যাখো।

তাই নাকি ?

—খুব খুশি।

—খুশিই তো, বড্ড একলা লাগে। তুমি তো বুঝবে না, কাজে থাকো অনুক্ষণ—আমরা পুড়ে মরি।

—কলকাতায় বদলী হবো?

—বেশ হয় কিন্তু।

—চলো ঘুরে আসি আজকে, বেশ বিকেলটা। ঝুমুর নাচ দেখো পাহাড়ীদের যেন পাহাড়ী ঝর্ণা।

বাসনা খুশি হ'লো। পরক্ষণেই বাসনার মন বদলে গেলো—এসো আজকে বাতি জেলে তুমি রবিঠাকুরের কবিতা পড়ো আমি শুনি। অনেকদিন শুনিনি তোমার আবৃত্তি।

—এত ভাবুক হ'লে কবে থেকে।

—কি করবো আমারও যে একটা অন্দর-মহল আছে।

—সদর।

—হে'সেল।

—এ নিছক মিথ্যা, এত বড় মিথ্যা ভগবানও সইবে না। তবু যদি রামচরণকে দু'একদিনের জন্যে ছুটি দিতে পারতে।

—তোমরা তো এই-ই দ্যাখো। ঠাকুর-চাকর আছে আর আমরা একেবারে সংসারের খড়কুটোটা সরাই না।

—আমি ঘাট স্বীকার করচি, তুমিই হে'সেলের জলজ্যান্ত লক্ষ্মী। ঠাকুর তোমার সহকারী।

বাসনা উঠে গেলো সেখান থেকে।

এর মধ্যে এক অপ্রত্যাশিত ব্যাপার ঘটলো। একদিন নিরাপদ এসে বল্লে তাকে, আসামে বদলী করা হয়েছে—ওয়ারফিল্ডে। এক নিমিষে বাসনার মনটা খচ্‌খচ করে উঠলো, ভিতরের বিশ্রী এক তোলপাড় উঠলো আতংকের।

—কেন, এটা করলো কেন। না তুমি লিখে দাও ক্যানসেল করাতে।

—কর্তার ইচ্ছায় কর্ম। ভয় কি, বন্দুক নিয়ে চলবো—সামনে ট্রেঞ্চ, গোলাবারুদের গন্ধ।

—তোমায় যুদ্ধ করতে হবে নাকি হাতিয়ার নিয়ে?

—তা নয়তো কি।

বাসনার চোখের ওপর পরিকল্পিত যুদ্ধের দৃশ্য কিলবিল করতে লাগলো। বুকের পাঁজড় উড়ে গেছে, মুখ থুবড়ে পড়ে আছে একটা আস্ত মানুষের ধর।

—কোন ব্যবস্থাই করতে পার না!

এবার নিরাপদ হেসে উঠলো হো হো করে—ওসব যুদ্ধটুদ্ধ কিছু না, আমায় গভর্নমেণ্টের একটা এ্যারোড্রাম কনস্ট্রাকসনে যেতে হবে—বন্দুক হাতিয়ার নিয়ে যুদ্ধ করতে নয়।

—তুমি কি বিশ্রী যাচ্ছেতা এসে বক্‌তে আরম্ভ কর।

—ভয় গিয়েচে তাহ'লে। সেখানেও যুদ্ধ হতে পারে। হয়তো জাপানী বোমা পড়লো

—সত্যি যাবে নাকি!

—তোমার কি মনে হয়।

—মনে হবে আবার কি।

—ছ'মাসের তো ব্যাপার। তারপর যেই সেই। ছুটি চেয়েছি পনরদিনের ফ্যামিলি সিফ্‌ট করবার।

—তাহ'লে যাচ্ছোই।

—নিরাপদ হাসলো।

নিরাপদ বাসনাকে নিয়ে এলো বাঙলার এক গণ্ডগ্রামে। সবুজ পাতার ঘন আস্তর দেওয়া গ্রাম। কেউটে আর সাপ্‌লায় ভর্তি বিল। দিগন্তে ছড়িয়ে কাঁচ ধানের ক্ষেত।

নিরাপদ বল্লে—এমন গ্রাম কোথাও পাবে না। পড়োনি ডি এল রায়এর—এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি।

—তুমি ভাবছো আমি খুব ঘাবড়ে গেছি। মোটেই না। মেয়েরাও পাষাণ হ'তে পারে।

—এই তো বেশ বলছো খাঁটি বাঙলা মেয়ে।

নিরাপদের যাবার দিনটি আসে ঘনিয়ে। বাসনার বুক দুরদুর করে, নিরাপদের মা বলে—যাচ্ছিস চিঠি দিস। কত কিছু শুনেচি, খারাপ জায়গা, সে রকম কিছু দেখিস তো চলে আসিস।

নিরাপদ নির্বাক থেকে শুধু হাসে।

তাকিয়ে থাকে বাসনা জানালার ভিতর দিয়ে যতক্ষণ দেখা যায় নিরাপদকে। তারপর কেমন অজানা [illegible]তংক। ক্ষান্তপিসির কাছে শুনেছে [illegible] খারাপ জায়গা—ম্যালেরিয়া আর কা[illegible] সিংগাপুরের যুদ্ধ, জাপানী আত[illegible] আছে কপালে কে জানে!

দু'ফোঁটা জল অ[illegible]াল বেয়ে।

কয়েকদিন পর চিঠি আসে নিরাপদর—শুনে আশ্চর্য হবে একটা মাঠের ভিতর আছি তাঁবুর ভিতর আস্তানা নিয়ে। প্রথম ক'দিন ভালই লেগেছিলো, নির্জন জায়গা, চারদিকে সবুজ বনানীর আস্তর, শালের সারি আর বনালতার ভীড়। এখন একেবারে জড় হোয়ে গেছি—শুধু সিমেণ্ট মাপজোক নিয়ে কারবার। এ্যারোড্রাম তৈরী হবার জিনিস আসচে ট্রাকে ট্রাকে। শুধু কুলি আর মজুর দেখে মন হাসফাঁস করে। রাতে নির্জন হ'লে তোমার কথা মনে করে অবসর কাটাই।

বাসনা চিঠি পড়ে লিখে—কাজ সেরে আসতে পারলেই তাড়াতাড়ি আমি নিশ্চিন্ত। কত সব উড়ো খবর এসে পেঁ'ছে, আমার মন আতংকে ভরে ওঠে। কামনা করচি, ভগবানের কাছে তুমি মংগলমত ফিরে আস।

নিরাপদ খুশি হয়ে উত্তর দেয়—তোমার চিঠি পেয়ে খুশি হয়েচি প্রচুর, এখনো আমি পুরনোপন্থী, উইলফোর্স মানি। তোমার কামনাই আমায় সব বিপদ থেকে রক্ষা করবে।

এমনি চিঠির আদানপ্রদান চলে মাসখানেক। বাসনা খুশি নিরাপদর দিন কাটছে সুখেই। এটাই ওর কামনা, ও ভাল হ'য়ে ফিরে আসুক আবার। ওঁর মন তাজা থাকলেই ও খুশি, পাঁচটা মাস আর কদ্দুর? কাটিয়ে দিতে পারবে না? বাসনা নিজের মনের দিকে তাকায়।

মাস দু'এক পর ঘটনার মোড় নিলো। জাপানীরা ছোঁ মেরে এসে ঢুকলো বার্মার বুকের ওপর। টাভয়, মার্তাবান, মৌলমেন, রেংগুন নিয়ে নিলো পর পর। এগিয়ে আসতে লাগলো আরও অভ্যান্তরে। চীর ধরলো ব্যবসা বাণিজ্যে, জনতায়। ভারতীয়েরা ছুটলো চরাই উপত্যকা ভেংগে আসাম সীমান্তে—জীবনের আতংকে ওরা ছুটলো নিজের নরম মৃত্তিকায়; যেখানে ওরা সহজ আপন নিঃসংকোচ। এর ঝাপ্টা এসে লাগে গণ্ডগ্রামে। আরও রং চড়িয়ে প্রচার হয় জাপানীরা ধেয়ে আসচে আসাম প্রান্তে। বাসনার বুকের ভিতরটায় দুর দুর করে ওঠে। নানা গুজবে মনে আতঙ্ক ভীড় করতে থাকে কি এক অশুভ কল্পনার। আর চিঠিও আসেনি কদ্দিন—কি হয়েছে ওঁর, কেন এই ওঁর এরকম নিঃশব্দ। বাসনা চিঠি লিখে—তোমার খবর পাই না কদ্দিন হয়। এখানে নানা জনরবের ভিতর হাঁপিয়ে উঠেচি। উত্তরটা দিয়ো তাড়াতাড়ি, না হয় আরও হাঁপিয়ে উঠবো।

দিন পনর পর উত্তর আসে—তোমার চিঠি পেয়েছি সময়মতই। আমার নৈরব্যের জন্যে তুমি চিন্তিত। কাজ পড়েচে আমার প্রচুর। তাড়াতাড়ি শেষ করে দিতে হবে। একটা জিনিস দেখে মনটা বড্ড বেহুঁস হয়ে পড়েচে। দলে দলে লোক আসচে বার্মা থেকে—ক্লান্ত, শ্রান্ত। এত বড় নিঃসহায়তা আমি মানুষের চোখে আর দেখি নি। যেই আমাদের সীমান্তে এসে পা দিলো ওরা যেন বাঁচলো—যেন কোন অভংগুর স্থিতি পেয়েচে আপনজনের ভিতর। সেদিন এক গুজরাটী ভদ্রলোক এলেন, মস্ত ব্যবসা ছিল রবারের, এখন নিঃসম্বল। একটা কথা মনে হয় মানুষের বৈষম্যটা নিজের তৈরী—না হয় তার সাথেই এয়েচে বেহারী কুলী-গুলোকে তিনি অজস্র প্রশংসা করেন, অথচ এ'র কথাই শুনলাম, মানুষ চষানোতে এ'র হৃদয়ের উগ্রতাটা বেখাপ্পারূপে বলে প্রকটিত। চিন্তা করো না কিছু, মন নিয়ে তাড়াহুড়া করলে নিজেই কষ্ট পাবে।

দিন সাতেক পর এক চিঠি আসে—চিঠি দিয়েছি কিছুদিন আগে পেয়েছো বোধ হয়। সময় পাই না একদম। যেটুকু ছিটেফোঁটা পাই, যেসব হতভাগ্য বার্মা থেকে আসচে তাদের পেছনেই কাটে। মানুষের এত বড় দুঃখ জীবনে দেখিনি, হয়তো এদের ভিতর সহায়-সম্পত্তি অনেকেই খুইয়েচে। যুদ্ধের প্রকট একটা মূর্তি চোখের সামনে প্রতিভাত হলো। বিশ্বাস করবে না অনেককেই দেখেচি আপনজনদের হারিয়ে এয়েচে পথের মাঝে। কেউ মরে গেচে, আর কেউ ঝড়ো-শালিকের মত নিঃসম্বল হয়ে মনে বিকৃতি নিয়ে এয়েচে।

দু'দিন পর চিঠি আসে—বাসনা তুমি বিশ্বাস করবে কিনা জানি না। একে দুরদৃষ্ট কিম্বা অভিসম্পাৎ বলতে পারো। পাঁচ বছরের এক মেয়ে এলো সেদিন বার্মা-ফেরৎ এক দলের সাথে। নাম বলতে পারে আর বাপ-মাও ছিলো সাথে—তারপরে হারিয়ে গেচে কোথায় জানে না। দুস্থ দৃষ্টি, আমাদের দিকে তাকায় যখন, তখন মনে হয় কি যেন খুঁজে দেখতে চায় আমাদের ভিতর। আমার ক্যাম্পেই রেখে দিয়েচি—এই বিশ্বাসে, তুমি ফেলবে না; আর যদি কোন দিন এর বাপমার দেখা পাই দিয়ে দেবো। টাকা পয়সা আর দিতে পারবো না বেশি একমাত্র দরকার ছাড়া। জানি, তুমি রাগ করবে না। কারণ, সেই টাকা দিয়ে এদের সেবা করা, এটাকে তুমি আরও বড় মনে করো।

বাসনা কিছুক্ষণ গুম্ হয়ে বসে রইলো। রাত্তিরবেলায় নিরালায় বসে উত্তর লিখলে—আমি কিছু চাই না তোমার কাছে, আমি বেশ সুখে আছি। তুমি ওদের দ্যাখো, এতেই আমার মস্ত শান্তি। আমি কি লিখবো খুঁজে পাই না, ইচ্ছে হয় তোমার কাছে যাই—দেখি ওদের, মিলিয়ে যাই ওদের ভিতর আপনজনের মত। মেয়েটিকে রেখে দাও, আমি দেখবো ওকে—রেখে দেখবো ওর হতভাগ্য চোখে আশার সঞ্চার দিতে পারি কি না।

লিখতে লিখতে বাসনার চোখে ভাসে সেই রিক্ত জনস্রোত আর মৃত্যু-পাণ্ডুর দৃষ্টি এবং তার ভিতর নিরাপদর সেবা করবার প্রতীক্ষায় দু'টো প্রসন্ন চোখ।

বাসনা লিখে শেষ করে—তোমার দৃষ্টি আমার মনকে তাজা করুক আমি বাঁচি।

যুদ্ধ প্রচেষ্টায় ভারতের ভাগ্যে নূতন দৃষ্টিভঙ্গী

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

যুদ্ধের অভিঘাতে ভারতের প্রতি নিখিল জগতের দৃষ্টিভঙ্গী বহুল পরিমাণে পরিবর্তিত হইয়াছে। পরাধীন জাতির প্রতি স্বাধীন জাতিগুলির মনোবৃত্তি অনুগ্রহ ও অনুকম্পাসূচক,—বিশেষত যেখানে বর্ণবৈষম্য বিদ্যমান। শ্বেতের প্রতি শ্বেতের যে সম্প্রীতি, পীতের প্রতি শ্বেতের তদ্রূপ নহে; কৃষ্ণের প্রতি তদপেক্ষাও কম। যেখানে শ্বেতের শক্তিমত্তায় পীত কিংবা কৃষ্ণ পরাধীন, সেখানে অনুকম্পার পরিবর্তে অশ্রদ্ধাই প্রবল। এই নিমিত্ত বিগত মহাযুদ্ধের পূর্বে ভারতের প্রতি স্বাধীন জাতিগুলির দৃষ্টিভঙ্গী ছিল অবজ্ঞার। বিগত মহাযুদ্ধের পর বৃটেনকে প্রদত্ত ভারতের অকুণ্ঠিত অপরিসীম সাহায্যের পরিমাণ ও পরিণাম ফলে, অন্যান্য স্বাধীন জাতিগুলির বিস্ময়-দৃষ্টি ভারতের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু শান্তি সংস্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে সে দৃষ্টি স্বচ্ছতা হারাইয়াছিল। বর্তমান মহাযুদ্ধের তুলনায় বিগত মহাযুদ্ধ "মহা" বিশেষণের অধিকারী নহে। বর্তমান যুদ্ধ বিগত মহাযুদ্ধ অপেক্ষা বহু গুণে প্রখর, প্রবল ও বিস্তৃত। বিগত মহাযুদ্ধ ছিল পশ্চিম গোলার্ধে নিবদ্ধ। বর্তমান যুদ্ধ উভয় গোলার্ধে ভীষণভাবে বিস্তৃত। এই যুদ্ধে ভারতের ভৌগোলিক অবস্থিতি এবং তাহার শক্তি-সামর্থ্য, ধনবল ও জনবল এবং যুদ্ধ ও শান্তি, শিল্পোপকরণ সম্পদ অধিকতর পরিমাণে জগতের বিস্ময় ও লালসা উদ্রিক্ত করিয়াছে। ভারতের অধিকারী যে প্রভূত পরিমাণে ধনী ও শক্তিমান, সে সত্য আজ জগতের সমস্ত স্বাধীন জাতির চৈতন্য উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। সুতরাং ভারতের প্রতি অশ্রদ্ধা ও অবজ্ঞার ভাব তিরোহিত হইয়া, তাহার স্থলে আসিয়াছে—অনুগ্রহ ও অনুকম্পার ভাব। জগতের এক-পঞ্চমাংশ অধিবাসী ভারতে অবস্থিত; শিল্প-বাণিজ্য-সমৃদ্ধ জাতির পক্ষে ভারত একটি অতি বিশাল বাণিজ্যক্ষেত্র। সুতরাং এই অনুগ্রহ ও অনুকম্পার অন্তরালে আছে-অর্থ-গৃধ্নুতা। বলপূর্বক দেশ জয় করা যায়, কিন্তু বুদ্ধি ও কৌশল ব্যতীত দেশবাসীকে জয় করা যায় না। দেশবাসীকে জয় করিতে হইলে চাই—তাহাদের সন্তুষ্টি, সম্মতি, সাহায্য এবং সাহচর্য। সুতরাং বলপ্রয়োগের পরিবর্তে মিষ্টকথা ও মৃদু ব্যবহারে তুষ্ট করাই বিধেয়। পরাধীন জাতিকে আয়ত্তাধীন করিতে হইলে প্রয়োজন,—সামনীতি ও সান্ত্বনাবাদ। এই সিদ্ধান্তও বিগত ও বর্তমান উভয় যুদ্ধের তীব্র ও তীক্ষ্ন অভিজ্ঞতার ফল। তাই আজ শ্বেত, পীত সকল স্বাধীন জাতিই ভারতের প্রতি আন্তরিক না হউক, মৌখিক সহানুভূতিসম্পন্ন। কোন জাতি-বিশেষের নিগড়ে নিবদ্ধ না থাকিয়া, ভারত যাহাতে সকল স্বাধীন জাতির অবাধ বাণিজ্য-ক্ষেত্রে পরিণত হয়,, ইহাই হইল বর্তমানে স্বাধীন জাতিমাত্রেরই মুখ্য উদ্দেশ্য।

বুদ্ধিমান বৃটেনের নিকট এ অভিসন্ধি সুপ্রকট। কিন্তু বৃটেন আজ বিপন্ন। মৈত্রীর সাহায্য ব্যতীত তাহার আত্মরক্ষা দুষ্কর। তাই বৃটেনও আজ ভারতকে সাম্রাজ্যান্তর্গত স্বাধীনতার সুখ-স্বপ্ন দেখাইতেছে। কেবল রাষ্ট্রিক স্বাধীনতা নহে, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা এবং শিল্পবাণিজ্যে পরিপূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের প্রলোভনও দেখাইতেছে আত্মশাসনাধীন জাতির প্রতি কোন স্বাধীন জাতির কখন নিরপেক্ষ ব্যবহার করিতে পারে না। কিন্তু "সর্ব্বনাশং সমুৎপন্নে অর্দ্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ।" তাই বিলাতের স্বাধীনচেতা উদারনৈতিক রাজ-নীতিবিদের সহিত, শিল্প-বাণিজ্য-ব্যবসায়ীরাও ভারতের সহিত সর্বক্ষেত্রে সাম্য-মৈত্রী সংস্থাপন দ্বারা সখ্যবন্ধনের পক্ষপাতী। ফলে ভারত-প্রবাসী শ্বেতাঙ্গ বণিকগণেরও দৃষ্টিভঙ্গির কিঞ্চিৎ পরি-বর্তন ঘটিয়াছে। এই পরিবর্তনের পরিচয় আমরা পাইয়াছি পৌষের প্রারম্ভে কলিকাতায় "এসোসিয়েটেড চেম্বার্স অব কমার্স" নামক শ্বেতাঙ্গ বণিক-সঙ্ঘের বাৎসরিক অধিবেশনে। এতাবৎকাল এই সঙ্ঘের সভাপতি বৎসরের পর বৎসর, সরকারের সর্বপ্রকার কঠোর রাজনৈতিক শাসননীতির সমর্থন এবং অর্থনৈতিক কূটনীতির অনুমোদন করিয়া আসিয়াছেন। যখন তাঁহাদের সঙ্ঘের স্বজাতীয় বৃত্তি-ব্যবসায়ীর স্বার্থে আঘাত লাগিত, তখনই তাঁহারা সরকারের বিধি-বিধানের মৃদু সমালোচনা করিতেন। এ বৎসরের সভাপতি মিঃ জে এইচ বার্ডার এই সনাতন নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটাইয়া নির্ভীক ও নিরপেক্ষ-ভাবে সরকারের অর্থনীতিরও ত্রুটিবিচ্যুতির সংযত প্রতিকূল সমালোচনা করিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে। সঙ্ঘ এ বৎসর সর্ব-সম্মতিক্রমে ভারতের কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য এবং এমনকি শিক্ষা সম্বন্ধেও কয়েকটি অতি সমীচীন প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া নূতন দৃষ্টি-ভঙ্গির পরিচয় দিয়াছেন। ফলত, খাদ্যসংকট অথবা অর্থস্ফীতির কুফল এবং যুদ্ধোত্তর সংস্কার-সংগঠন প্রভৃতি কয়েকটি বিষয়ে জাতীয় বণিক সমিতি সমবায়ের (Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry) সহিত এই শ্বেতাঙ্গ বণিক-সঙ্ঘের মতবাদের বিশেষ পার্থক্য নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। একমাত্র স্টার্লিং সংস্থান সাহায্যে ভারতে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত বিলাতি সম্পদ-সম্পত্তিগুলিকে ভারতবাসীর হস্তে হস্তান্তরকরণ বিষয়ে ভারত-প্রবাসী শ্বেতাঙ্গ বণিক সম্প্রদায়ও ভারতের জাতীয় বণিক ও শিল্পী সম্প্রদায়ের মতদ্বৈধ অনিবার্য। এই সম্পর্কে "স্টেটস্‌ম্যান" পত্রিকার ভূতপূর্ব সম্পাদক এবং বর্তমানে "গ্রেট বৃটেন এন্ড দি ইস্ট" পত্রিকার কর্ণধার স্যার এলফ্রেড ওয়াটসন যে তিনটি দৃশ্যত প্রবল বিরুদ্ধ যুক্তির ফতোয়া জারি করিয়াছেন, তাহার আলোচনা আমরা পরে করিব।

কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ও যুদ্ধোত্তর সংস্কার-সংগঠন সম্পর্কে সঙ্ঘ যে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছে, তাহার স্থূল মর্ম এইরূপ। সঙ্ঘের বিশ্বাস যে, যুদ্ধোত্তর সংস্কার-সংগঠন প্রচেষ্টা যে কেবল সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নিবদ্ধ হইবে তাহা নহে, কৃষিজ উৎপাদনের বৃদ্ধি করিতে হইবে এবং যাহাতে নিরক্ষরতা, দারিদ্র্য এবং ব্যাধির প্রকোপ প্রশমিত করিয়া ভারতের অধিবাসীবৃন্দের জীবনযাত্রার ধারা উন্নত করিতে পারা যায়, তাহারও ব্যবস্থা করিতে হইবে। সমাজের অহিতকর না হয়, এরূপ-ভাবে শিল্প-সমন্বয়ন-সম্প্রসারণ ও সাধন করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্য সাধনার্থ সঙ্ঘ ভারত সরকারকে একটি সমিতি সংগঠন করিতে অনুরোধ জানাইয়াছেন। এই সমিতি প্রস্তাবিত পরিকল্পনা রচনায় সুদক্ষ সভ্য কর্তৃক গঠিত হইবে এবং তাঁহাদের কার্য শেষ না হওয়া পর্যন্ত অবিচ্ছিন্নভাবে কর্ম করিবে। প্রচলিত মুদ্রা-প্রকরণ এবং ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কে সঙ্ঘ আন্তর্জাতিক আপোষ-রফা বন্দোবস্তের বিরোধী নহে; কিন্তু এই সম্পর্কে ভারতের অনুন্নত অর্থনৈতিক বিধান (Backwardness of India's Economy) এবং ভারতবাসী জনসাধারণের নিঃস্ব জীবনধারার (Low standard of living) গতি সদ[illegible] লক্ষ্য রাখিতে হইবে —যাহাতে এইরূপ [illegible]বস্তে ভারতের ধনবল ও জনবলের অ[illegible] [illegible]তি এবং জন-সাধারণের জীবনযা[illegible] [illegible]গতি ব্যাহত না হয়। ইতিমধ্যে [illegible] আমদানী-রপ্তানি শুল্কবিধান [illegible] tariff)

এবং আভ্যন্তরীণ করনির্ধারণ (Internal taxation) ব্যবস্থার সর্বদিকব্যাপী বিস্তৃত বিচার-বিবেচনা (Comprehensive review in all its aspects) প্রয়োজন, যাহাতে এই তদন্তের ফলে দৃঢ় এবং নির্ভর-যোগ্য ভিত্তির উপর ভারতের উপযোগী একটি সুসমঞ্জস্ অর্থনীতিক বনিয়াদ সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারে (Ensuring a balanced development of India's economy on sound and secure foundation.)
বিলাত হইতে যন্ত্রপাতির ন্যায় মুখ্য দ্রব্য-সামগ্রী (Capital goods) এবং স্বর্ণ-রৌপ্যের তাল (Bullion) আমদানীর সুযোগ-সুবিধা প্রদানের নিমিত্তও সঙ্ঘ সরকারকে যথাশীঘ্র সম্ভব ব্যবস্থা অব-লম্বনের নিমিত্ত অনুরোধ জানাইয়াছেন। সঙ্ঘ-সভাপতি তাঁহার অভিভাষণে বলিয়া-ছেন যে, সরকার যদি সাধারণ কৃষককুলের দরিদ্র জীবনধারার উন্নতি বিধান করিতে পারেন, তাহা হইলে শিল্পাশ্রয়ীদের একটি মহৎ উপকার সাধিত হইবে (If Government can nurse the simple agriculturist up to a higher standard of living that will be one of the greatest services that the Industrialist can ask of Government). শ্বেতাঙ্গ বণিক সম্প্রদায়ের সম্মিলিত সমিতি-সঙ্ঘের অধিনায়কের মুখে এ নূতন বাণী অভিনব, অনুপম এবং ভবিষ্যৎ আশাপ্রদ। শ্বেতাঙ্গ বণিক সম্প্রদায়ের পূর্বে একটি ভ্রান্ত ধারণা ছিল যে, কৃষিপ্রধান ভারতে কৃষির প্রতি গভীর মনোনিবেশ করিলে শিল্পের প্রবৃদ্ধির ক্ষতি ঘটিবে। কিন্তু কৃষি ও শিল্প অন্যোন্যসাপেক্ষ; একের অভ্যুদয় অন্যের অভ্যুদয়ের প্রতি নির্ভরশীল; একের অবনতিতে অন্যের অবনতি অবশ্যম্ভাবী।

বড়লাট বাহাদুর যদি তাঁহার শাসন-তন্ত্রের অনুমোদন ও সমর্থন দ্বারা ভারত-প্রবাসী শ্বেতাঙ্গ বণিকগণের এই নূতন দৃষ্টিভঙ্গিকে দার্ঢ্য প্রদান করিতেন তাহা হইলে ভারতের কৃষি-শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বলতর হইত। তাঁহার যুদ্ধোত্তর সংগঠন সম্পর্কিত বাণী আশাপ্রদ। তিনি বলিয়াছেন, সম্প্রতি যখন তিনি বিলাতে ছিলেন, তখন ভারতের সহিত সম্পর্কযুক্ত কয়েকজন ব্রিটিশ শিল্প-নায়কের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের সকলকেই ভারতীয় শিল্পের প্রতি হিতৈষণা-সম্পন্ন বোধ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে ভারতীয় শিল্পকে ... কিংবা শাসন করিবার মনোবৃত্তি ... করেন নাই; পরন্তু উভয়পক্ষের ... কর পরিপোষণকেই তাঁহাদের অভিপ্র... যাছিলেন। বড়লাট সাহেবের বিশ্ব... ভারতীয় শিল্পের কয়েকজন না... বিলাতে যাইয়া সেখানকার যুদ্ধকালীন পরিবর্তন-পরিণতি লক্ষ্য করেন এবং ব্রিটিশ শিল্পনায়কগণের সহিত আলাপ-আলোচনা করেন তাহা হইলে ভাল হয়। তাঁহাদের যাতায়াতের ব্যবস্থা সহজেই করিতে পারা যায়। বড়লাট বাহাদুরের মত যে, যত শীঘ্র এই বিলাত-ভ্রমণ কার্য সংঘটিত হয়, ততই মঙ্গল; কারণ, অন্যান্য জাতিরা ইতিমধ্যেই তাহাদের যুদ্ধোত্তর প্রয়োজন বিষয়ে সম্যক্ অবহিত হইয়াছে এবং যন্ত্রপাতি ও মাল-মশলা সংগ্রহের চুক্তি-পত্র স্বাক্ষর করিবার চেষ্টা করিতেছে। এই ইঙ্গিতের উদ্দেশ্য সুধী-জনের প্রণিধানযোগ্য। ব্রিটিশ শিল্পিগণ এতাবৎকাল ভারতকে কাঁচামাল সংগ্রহ এবং পাকা মাল বিক্রয়ের প্রকৃষ্ট ক্ষেত্ররূপে ব্যবহার-বিবেচনা করিয়াছেন; এখন যদি তাঁহাদের এ দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলে আশার কথা সন্দেহ নাই। সম্মিলিত শ্বেতাঙ্গ বণিকসঙ্ঘও আপাতত কিছুদিনের নিমিত্ত বিলাত হইতে ভোগ্য-ভোজ্যদ্রব্যের (Consumers' goods) আমদানি অনুমোদন করিয়াছেন বটে, কিন্তু যন্ত্রপাতি প্রভৃতি মুখ্য দ্রব্যসামগ্রীরও (Capital goods) আমদানি দাবী করিয়া-ছেন। তবে এ মনোবৃত্তি যুদ্ধান্তে দীর্ঘ-স্থায়ী হইবে কি না, সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। আশা ও আশ্বাসের মোহন বাণী আমরা অনেকবার শুনিয়াছি। বড়লাটও যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতির প্রতি কটাক্ষ করিয়া যুদ্ধোত্তর ভারতের একটি মনো-মুগ্ধকর ছবি অঙ্কিত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন: যুদ্ধান্তে ভারত একটি উত্তমর্ণ দেশ হইবে। মানব জাতির ইতিহাসের এই সর্বাপেক্ষা ভীষণ আহবে, অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতের ক্ষতির পরিমাণ অতি কম এবং ব্রিটেন ও আমেরিকা উভয় দেশেই ভারতের প্রতি সহানুভূতি প্রচুর এবং তাহাকে সাহায্য করিবার প্রবৃত্তি প্রবল। স্বদেশে ও বিদেশে ভারতের বর্ধনশীল পণ্যের বিপুল বিক্রয় ঘটিবে এবং ভারত যদি তাহার আন্তর্জাতিক সমস্যাগুলির সমাধান করিতে পারে এবং যুদ্ধোত্তর জগতে শান্তি ও উন্নতি বিধানের নিমিত্ত অন্যান্য জাতির সহিত সম্মিলিতভাবে সহযোগিতা করে, তাহা হইলে ভারত প্রাচ্যে নিশ্চিতই একটি সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী এবং সমৃদ্ধ দেশে পরিণত হইবে।

যুদ্ধাবসানের পরবর্তী কয়েক বৎসর যে ভারতের ভবিষ্যতের উপর সুমহান্ প্রভাব বিস্তার করিবে, সে বিষয়ে সন্দেহমাত্র নাই। কিন্তু সমস্যা ও সঙ্কট প্রচুর। অনুকূলের তুলনায় প্রতিকূল ঘটনা ন্যূন হইবে না। যুদ্ধ-প্রচেষ্টার বিরতির সহিত আসিবে,—সমর-বিমুক্ত বহু বহু সৈনিকের কর্ম-নিয়োগের সমস্যা। বিপুল যুদ্ধ-শিল্পের বিরতির সহিত আসিবে, কর্ম-বিচ্যুত অগণ্য শ্রমিকের শান্তি-শিল্পে নিয়োগ সমস্যা। উদ্বৃত্ত যুদ্ধোপকরণের বিহিত বিক্রয় ও সদ্ব্যবহারের সমস্যা। বহু অর্থনৈতিক শাসন-পদ্ধতির নীতি ও নিয়মের প্রত্যাহার-প্রসূত সাময়িক বিশৃঙ্খলা। এই সকলের যথোপযুক্ত নিয়ম ও নীতি-নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা না ঘটিলে, আর্থিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিপ্লব অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং যুদ্ধ-বিরতির যথাসম্ভব পূর্ব হইতেই এই সকল সমস্যার সমীচীন সমাধানের ব্যবস্থা প্রয়োজন। অন্যান্য দেশের ন্যায় ভারতের জাতীয়-জীবনকে উন্নত পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে এবং তাহার একমাত্র উপায়, জনসাধারণের জীবনযাত্রার ধারাকে সমধিক উন্নত করিতে হইবে। আমরা সকলেই জানি যে, ভারতের জনসংখ্যা প্রতি বৎসর ৪০ হইতে ৫০ লক্ষ পরিমাণে বৃদ্ধি পাইতেছে। সুতরাং দ্রুত বর্ধমান বিপুল জনসংখ্যার যথোপযুক্ত আহার্য-ব্যবহার্য যথাসম্ভব সঙ্গত মূল্যে সরবরাহ করিবার সমস্যা-পূরণ বিপুল আয়াস-সাপেক্ষ। ভরসা এই যে, যুদ্ধান্তে শান্তির নিরঙ্কুশ অবস্থায় ভারতের জাতীয় সমুত্থানকে নিয়ন্ত্রিত করিবার সুযোগ-সুবিধাও প্রচুর। ভারতের স্বাভাবিক বনজ, খনিজ, কৃষিজ ও শিল্পজ সম্পদ্ বিপুল। ভারতে শ্রমিকের অভাব নাই এবং যুদ্ধ-শিল্প বিস্তারের বিপুল প্রচেষ্টায় আমাদের অতি বড় নিন্দাকারীও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন যে, ভারতের শ্রমিকেরা অতি অল্প শিক্ষায় কুশলী কারি-গরে পরিণত হয়। ভারতে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন শিল্পনিষ্ঠ, শিল্পাশ্রয়ী ও শিল্পোৎসাহী ধনিকেরও অভাব নাই এবং তাঁহাদের অধিকাংশই কার্যকুশল এবং অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন। এ সকলই নিঃসন্দেহে আমাদের অনুকূলে। ভারতে সুযোগ-সুবিধার অন্ত নাই; অভাব কেবল সেগুলিকে জাতীয় স্বার্থের অনুকূল করিয়া নিয়ন্ত্রিত করিবার ক্ষমতা,—এক কথায় স্বায়ত্তশাসন।

সরকার অবশ্য যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতির সম্যক্ সুবিধা ও সুযোগ লইবার উদ্দেশ্যে পরিকল্পনা পরিপুষ্ট করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন এবং তদুদ্দেশ্যে কয়েকটি সমিতিও নিযুক্ত করিয়াছেন। কিন্তু এই সমিতি-গুলির কার্য এরূপ অসম্ভব রকম ধীর ও মন্থর গতিতে চলিয়াছে যে, গভর্নমেণ্টের সর্বকার্যের চির-দৃঢ় সমর্থক শ্বেতাঙ্গ বণিক সম্প্রদায়ের মুখপাত্রকেও দুঃখের সহিত প্রতিবাদ জানাইতে হইয়াছে। বস্তুত, ইঁহাদের কার্য অতি ক্ষিপ্রগতিতে নিষ্পন্ন হওয়া অত্যাবশ্যক। শুধু তাহাই নহে, এক্ষেত্রে সরকার ও শিল্পের ঐকান্তিক সহযোগ প্রয়োজন। সুখের বিষয়, বড়লাট বাহাদুর মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন যে,

এই সংস্কার, সংগঠন ও উন্নতি-প্রচেষ্টা ভারতীয় ভিত্তিতে ভারতীয় প্রথায় হওয়া সমীচীন। তবে ইহাও স্বীকার্য যে, ভারতের ভাবী ও সম্ভাব্য সর্বপ্রকার শিল্প-বাণিজ্যে বৈদেশিক সাহায্যের এখন প্রচুর প্রয়োজন আছে; কারণ, আমাদের সঙ্ঘবদ্ধভাবে শিখিবার ও জানিবার এখনও অনেক বাকি। জ্ঞানে ও অভিজ্ঞতায় অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের সহিত আলাপ-আলোচনা করিয়া বড়লাট বাহাদুর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, ভারতের সর্বপ্রথম "প্রয়োজন" যন্ত্র-পরিচালক বৈদ্যুতিক-শক্তি-সরবরাহ প্রতিষ্ঠান। উপযুক্ত পরিমাণে যন্ত্র-পরিচালনার্থ বৈদ্যুতিক-প্রবাহ ব্যতীত আধুনিক যন্ত্র-শিল্পের প্রতিষ্ঠা ও পরিপোষণ প্রায় অসম্ভব। কোন কোন ক্ষেত্রে এই তড়িৎ-প্রবাহের সহিত জলসেচ ব্যবস্থারও সংযোগসাধন করিতে হইবে; যাহাতে দ্রুত কৃষির উন্নতি সাধিত হইতে পারে। কারণ, সর্বপ্রকারে কৃষির উন্নতিসাধনই এখন আমাদের প্রধান লক্ষ্যবস্তু। কৃষিই ভারতের প্রধান শিল্প এবং এখনও ইহার প্রভূত উন্নতিসাধনের অবকাশ আছে। ভূমির উর্বরতা বৃদ্ধি করিয়া উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে হইবে, কৃষি-শিল্পে নিত্য-প্রয়োজনীয় পশুগুলির উন্নতিসাধন করিতে হইবে এবং আমাদের পল্লী-সমাজের কৃষক গৃহস্থ সকলেরই বর্তমান শোচনীয় অবস্থার উন্নতি সম্পাদন করিতে হইবে। ফলত, কৃষি ও শিল্পের যুগপৎ উন্নতি প্রয়োজন; নতুবা ভারতের নিত্য-বর্ধনশীল জনসংখ্যার জীবনযাত্রা নির্বাহের ধারাকে উন্নত করা অসম্ভব। একমাত্র কৃষি ও শিল্পের সুসমঞ্জস উন্নতিই তাহা সম্পাদন করিতে পারে। এই উন্নতি-প্রচেষ্টার সহিত কৃষিজীবী ও শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের উন্নতি দুশ্ছেদ্যভাবে সংবদ্ধ; এবং তাহাদের উন্নতির উপর বুদ্ধিজীবী ও বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের কৃষি-শিল্প, বৃত্তি-ব্যবসায় এবং রাজনীতি, সমাজনীতি ও অর্থনীতি দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত। এই সর্ববিধ উন্নতির মূল্য ভিত্তি—উপযোগী ও উপযুক্ত শিক্ষা। সর্বাঙ্গীণ শিক্ষার প্রসার ব্যতীত নৈতিক, সামাজিক, শারীরিক ও আর্থিক উন্নতি অসম্ভব। কিন্তু এই সর্বপ্রকার উন্নতির মূলে শিক্ষার প্রসার সম্পর্কে মত-দ্বৈধ ঘটিয়াছে বড়লাটের সহিত শ্বেতাঙ্গ বণিকসঙ্ঘের সভাপতির। ভারতের বর্তমান শিক্ষা কমিশনের শিক্ষা-প্রসার প্রস্তাব মিঃ বার্ডার সর্বান্তকরণে অনুমোদন ও সমর্থন করিয়াছেন; কিন্তু বড়লাট বাহাদুর বলেন,—
"Full bellies must come before full minds."

অর্থাৎ মাথাভরা বিদ্যার পূর্বে চাই পেটভরা ভাত। কথাটা আংশিকভাবে সত্য বটে, কিন্তু মূলত যুক্তিসিদ্ধ ও যুক্তিসহ নহে। ব্যবহারিক না হউক, বৃত্তি বিষয়ক কার্যকরী শিক্ষা ব্যতীত শস্য উৎপাদনও সম্ভবপর নহে। বড়লাট বাহাদুরের মতে, প্রথমে যাতায়াত ও গতাগতি, অর্থাৎ রাস্তাঘাট ও যানবাহনের প্রয়োজন, তৎপশ্চাৎ স্বাস্থ্যরক্ষা এবং তৎপরে শিক্ষা। বড়লাট বাহাদুরের মতে, শিক্ষার প্রয়োজনও প্রচুর; কিন্তু যেহেতু শিক্ষা-কমিশনারের প্রস্তাব কার্যে পরিণত করিতে বিপুল অর্থের প্রয়োজন এবং বর্তমানে সে অর্থের একান্ত অভাব, সেই হেতু কৃষি ও শিল্পের প্রসার দ্বারা প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করিয়া পশ্চাতে শিক্ষা বিস্তার বিষয়ে মনোনিবেশ করিলে চলিবে। এই ভ্রান্ত মতের বিষম ভ্রান্তি সুধীজনের সহজবোধ্য, সুতরাং বিস্তৃত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। মানব-সভ্যতার আদিম যুগে, ব্যাকরণের পূর্বে ভাষা, বিদ্যার পূর্বে সহজাত বুদ্ধি এবং প্রয়োজনের তাগিদে আবিষ্কার কার্যকরী হইয়াছিল। এই প্রকরণে সর্বদেশেই শিক্ষা-প্রণালীর পূর্বে শিল্প-প্রণালীর আবিষ্কার ঘটিয়াছিল; কিন্তু অধুনা ব্যাকরণের সাহায্যে ভাষা, বিদ্যার সাহায্যে বুদ্ধি-বৃত্তির পরিস্ফুরণ এবং শিক্ষার সাহায্যে শিল্প-বিস্তার সুকর ও সহজসাধ্য এবং সুবুদ্ধিসম্মত।

এখন আমরা শ্বেতাঙ্গ বণিক সমিতিগুলির সম্মিলিত সঙ্ঘে সর্বসম্মতিক্রমে পরিগৃহীত প্রস্তাবগুলির কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। এই প্রসঙ্গে অপরিমিত অর্থস্ফীতি এবং অপরিসীম দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি নিবারণকল্পে সরকারের সদাজাগ্রত চৈতন্য-প্রণোদিত বিধি-নিষেধের প্রতি লক্ষ্য পড়ে। ইহার কতকগুলি কল্যাণপ্রদ কতকগুলি বিরোধমূলক। অসামরিক জনসাধারণের ভোগ্য-ভোজ্য প্রভৃতি নিত্য-নৈমিত্তিক দ্রব্যসামগ্রীর অধিকতর দ্রুত সরবরাহ অতি কল্যাণপ্রদ। ইহা সর্ববাদিসম্মত যে, অসামরিক ব্যবহারোপযোগী দ্রব্যসামগ্রীর ক্রমবর্ধমান অভাব-অনটন, কাগজের নোটের অজস্র প্রচলন, রৌপ্যমুদ্রার রৌপ্য-পরিমাণ হ্রাসের সহিত মূল্য-মর্যাদার হানি এবং দ্রব্য-মূল্যের মান নির্ধারণের ব্যর্থ-প্রচেষ্টা জনসাধারণের দুঃখ-দৈন্য-দুর্দশা ও দুর্ভিক্ষ হেতু অসংখ্য মৃত্যুর মূল কারণ। ইহার প্রকৃষ্ট প্রতিকার দেশাভ্যন্তরে অসামরিক জনসাধারণের প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রীর যথাসম্ভব দ্রুত উৎপাদন এবং যে-সকল দ্রব্য-সামগ্রীর আশু উৎপাদন সম্ভবপর নহে, তাহাদের যথাসম্ভব দ্রুত আমদানী। কিন্তু বিদেশ হইতে আমদানী যতদূর সম্ভব খর্ব করিয়া উপযুক্ত যন্ত্রপাতি, কল-কব্জা, সাজ-সরঞ্জাম ও মাল-মশলা আমদানী করিয়া ঐ সকল প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রী এই দেশেই উৎপাদন করিবার আশু প্রচেষ্টা সমীচীন। যুদ্ধের পরিস্থিতির অনুকূলে পরিবর্তন হেতু যন্ত্রপাতি প্রভৃতি আমদানীর বাধা বহু পরিমাণে লাঘব হইয়াছে। কিন্তু এই অজুহাতে আমাদের বহুকষ্টে সঞ্চিত স্টার্লিং সংস্থিতি যাহাতে কর্পূরের ন্যায় উবিয়া না যায়, তৎপ্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি প্রয়োজন। বর্তমানক্ষেত্রে কিরূপ দ্রব্যসামগ্রী আমদানী করা অতীব প্রয়োজন তন্নির্ধারণার্থ সরকারের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীর সহিত শিল্পী-বণিক সম্প্রদায়ের আন্তরিক সহযোগ প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে গভর্নমেণ্ট উভয়বিধ সদস্য লইয়া একটি পরামর্শ সমিতি গঠন করিলে ভাল হয়। সেই সঙ্গে সরকারের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির এদেশে ক্রয়ের একটি সর্বোচ্চ মাত্রা নির্ধারণও প্রয়োজন। সরকারের ক্রয়ের উপর সর্বদেশের আভ্যন্তরীণ শিল্পের ক্রমোন্নতি বহুল পরিমাণে নির্ভর করে। রাষ্ট্রের অকুণ্ঠিত পৃষ্ঠপোষকতা স্বদেশী শিল্পের ন্যায্য প্রাপ্য।

এই অতি সমীচীন প্রতিকারের প্রতি যথেষ্ট পরিমাণে অবহিত না হইয়া সরকার সম্প্রতি যে মাল বাঁধাই এবং অতিরিক্ত মুনাফা লাভের প্রচেষ্টাকে ব্যাহত করিবার নিমিত্ত জরুরী আইন (Hoarding and Profiteering Prevention Ordinance) জারি করিয়াছেন, তাহাতে সুফল অপেক্ষা কুফলের আশঙ্কাই সমধিক। এই জরুরী আইন সমস্ত ভোজ্যাভোজ্য দ্রব্যের (Consumers' goods) মূল্য নির্ধারণ করিয়াছে,—দেশাভ্যন্তরে উৎপন্ন দ্রব্যাদির উৎপাদন খরচা এবং বিদেশ হইতে আমদানী দ্রব্যসামগ্রীর এদেশে আনিয়া উপস্থিত করিবার ব্যয়ের উপর শতকরা ২০ অংশ উচ্চতর হারে। উৎপাদন কিংবা আমদানী ব্যয়ের উপরেও বিক্রেতাগণকে আরও কিছু কিছু আনুষঙ্গিক অতিরিক্ত ব্যয় করিতে হয়। এই অতিরিক্ত ব্যয়ের বিষয় বিবেচনা না করিলেও শতকরা ২০ অংশ মাত্র বৃদ্ধি যথোপযুক্ত নহে। কারণ, উৎপন্ন দ্রব্যাদিকে ক্রেতার উপযোগী করিয়া দিতে এবং আমদানী দ্রব্যাদি বন্দর হইতে বিভিন্ন বিক্রয়-কেন্দ্রে পৌঁছাইয়া দিতে, খুচরা বিক্রয়কারিগণকে উৎপাদন ও আমদানী-ব্যয় ব্যতীত আরও কিছু ব্যয় করিতে হয়। দ্রব্য-সামগ্রীর মূল্য যুক্তি-সঙ্গতভাবে [illegible]র পক্ষপাতী সকলেই; কিন্তু ক্রেতার [illegible]র প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বিক্রেতার স্বার্থ [illegible]চনা করিতে হইবে। কোন কোন [illegible]াদন ও আমদানী-

ব্যয়ের উপর শতকরা ২০ অংশেরও কম লাভ লইবার রীতি আছে বটে, কিন্তু আবার এমন অনেক ক্ষেত্র আছে, যেখানে যুদ্ধ-পূর্বেই শতকরা ২০ অংশের অধিক লাভ ধরিবার রীতি ও নীতি প্রচলিত ছিল,—বিশেষত ভঙ্গপ্রবণ ও পচনশীল দ্রব্যাদির ক্ষেত্রে। নিরপেক্ষভাবে একথা বলা সংগত যে, সাধারণ ক্রেতার (consumers) সংখ্যা সমধিক হইলেও উৎপাদক, ব্যাপারী, ব্যবসায়ী ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিক্রেতাগণের প্রতিপাল্য পরিজনবর্গের সংখ্যাও কম নহে। চোরা-বাজারে অসংগত উচ্চ মূল্যে দ্রব্যাদি বিক্রয় বন্ধ করিতে হইলে, উভয় শ্রেণীর লোকের প্রতি তুল্য দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। অধিকাংশ লোকের সহানুভূতি ক্রেতার দিকে হইলেও ইহা নিশ্চিত যে, একদেশদর্শী অথবা পক্ষপাতদুষ্ট নীতি কদাচ সুফল প্রদান করে না।

এই প্রসংগে শ্বেতাঙ্গ বণিক-সংঘের সভাপতি মিঃ বার্ডারের উক্তি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলিয়াছেন, "এই জরুরী আইনের প্রতি সকলেরই সহানুভূতি আছে, কিন্তু ইহা এরূপভাবে গঠিত যে, এদেশে এমন সাধু ব্যবসায়ী খুব কমই আছেন, যিনি এই আইনের সর্ত ভংগ না করিতেছেন। ইহা এমনই একটি ব্যাপার, যাহার আশু প্রতিকার অত্যাবশ্যক। বর্তমানে পরিস্থিতি এইরূপ দাঁড়াইয়াছে যে, গভর্নমেন্টের আশ্বস্তি প্রদান সত্ত্বেও বহু উৎপাদক কিংবা আমদানীকারককে হয় তাহাদের কারখানা ও কারবার বন্ধ করিতে হইবে, নতুবা আইন ভংগ করিতে হইবে এই আশায় যে, আইনভংগ ব্যাপার আদালতে পেঁৗছাইলে, বিচারকগণ আইনের আক্ষরিক অর্থ অপেক্ষা আইন-প্রণেতাদের অভিপ্রায়ের প্রতি অধিকতর লক্ষ্য রাখিয়া ইহার ব্যাখ্যার নির্দেশ দিবেন (গভর্নমেন্টের লক্ষ্য অবশ্য, জনসাধারণের আহার্য-ব্যবহার্য দ্রব্য সামগ্রীর মূল্য যথাসম্ভব হ্রাস করিয়া তাহাদের আয়ত্তীভূত সুলভ ও সুপ্রচুর অর্থের বর্ধিত ক্রয়শক্তিকে সংহত ও নিয়ন্ত্রিত করিয়া মুদ্রাস্ফীতি, ও মূল্য বৃদ্ধি—এই উভয় অনিষ্টের যথাসম্ভব প্রতিকার।) কিন্তু এই উদ্দেশ্যে যে সকল বিধি-নিষেধ অবলম্বিত হইয়াছে, তাহাতে অনেক ত্রুটি ও ছিদ্র রহিয়া গিয়াছে। প্রথমত মাল বাঁধাই ও অতিরিক্ত মুনাফা নিষেধাত্মক জরুরী আইনে "আর্টিকল্" (Article) কথাটিকে অত্যন্ত অস্পষ্ট ও ব্যাপক রাখা হইয়াছে। [illegible] ছিল যে, সুতীবস্ত্র, কাগজ, চিনি [illegible] ও মূল্য-শাসিত দ্রব্যাদি এই [illegible]র বাহিরে থাকিবে; কিন্তু কায[illegible] া করা হয় নাই। "দ্রব্য"-সংজ্ঞা[illegible] না রাখিয়া, একটি নির্দিষ্ট দ্রব্যাদির তালিকা প্রকট করিলে ভাল হইত। দ্বিতীয়ত উৎপাদক, ব্যবসায়ী এবং ক্রেতা সকলের পক্ষেই মাল বাঁধাই নিবারণকল্পে, গুদামজাত মালের যে নিয়মিত ফিরিস্তি (Returns of stocks) দাখিল করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহাতে কারবারীদের বিশেষ অসুবিধা ঘটিবে। মাল-চলাচলের অনিশ্চয়তা হেতু সকলকেই প্রচুর পরিমাণে কাঁচামাল (Raw materials), ভাণ্ডার দ্রব্য (Stores) এবং উৎপন্ন মাল গুদামে সঞ্চিত রাখিতে হয়। সুতরাং এগুলির যথোপযুক্ত সংস্থান রাখিবার স্বাধীনতা কারবার ও কারখানা মালিকদের থাকা কর্তব্য। নতুবা, সামরিক ও অসামরিক উভয় প্রকার প্রয়োজনে যথাসময়ে উপযোগী ও উপযুক্ত সরবরাহে বিঘ্ন-বিপত্তি অনিবার্য।

আমরা সকলেই জানি যে, মুদ্রাস্ফীতি হেতু দ্রব্যমূল্যে বৃদ্ধি নিবারণের অন্যতম উপায় কর-বৃদ্ধি। শিল্প-বাণিজ্যে-সমৃদ্ধ দেশসমূহে এ উপায় অতি স্বাভাবিক ও সমীচীন; কিন্তু ভারতের ন্যায় কৃষি-প্রধান, অর্ধভুক্ত ও অর্ধউলঙ্গ দরিদ্র-কৃষক-পরিপূর্ণ দেশে কর-বৃদ্ধি, তাহাদিগকে অনাহারে হত্যা করিবার নামান্তর মাত্র! অথচ কেন্দ্রীয় সরকার নাকি এই মর্মে ইতিমধ্যে প্রাদেশিক শাসনযন্ত্র (তন্ত্র কি?) গুলিকে প্ররোচিত করিয়াছেন। পরাধীন দুর্ভাগা ভারতে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক করভার ইতিপূর্বেই চরমে পৌঁছিয়াছে। অধিকন্তু, প্রাদেশিক শাসন যন্ত্রগুলি ইতিমধ্যেই অতিরিক্ত যুদ্ধ-সংক্রান্ত ব্যয় নির্বাহার্থ তাহাদের বাজেটের (অগ্রিম আয়-ব্যয় হিসাব) ঘাটতি পূরণার্থ বিবিধ প্রকারে নূতন নূতন কর ধার্য, অথবা পুরাতন কর বৃদ্ধি করিয়াছেন। ফলে, "ইনফ্রেশন"-নিবারক বিধি-নিষেধ দ্বারা যে হতভাগ্যদিগকে "ইনফ্রেশনের" পীড়ন হইতে রক্ষা করিবার প্রচেষ্টা,—তাহাদের অবস্থা,—"বল্ মা তারা দাঁড়াই কোথা?" যুদ্ধারম্ভ হইতে ভারতে করভার অত্যধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে; এবং একুন আয়ের সহিত একুন ব্যয়ের এবং প্রত্যক্ষ করের সহিত পরোক্ষ করের সমানুপাতে অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতের করসমষ্টি কোন অংশে ন্যূন নহে। নিম্নে প্রদত্ত তালিকায় চারিটি দেশের করের পরিমাণ দেওয়া গেল,—

একুন ব্যয়ের তুলনায়

দেশ	খৃষ্টাব্দ	কর সমষ্টির শতকরা হার
ভারতবর্ষ	১৯৪২-৪৩	শতকরা ৫৫ অংশ
যুক্তরাষ্ট্র	"	" ৫০ "
যুক্তরাজ্য	"	" ২৬ "
ক্যানাডা	"	" ৫০ "

একুন করের তুলনায়
প্রত্যক্ষ করের শতকরা হার

দেশ	খৃষ্টাব্দ	
ভারতবর্ষ	১৯৪২-৪৩	শতকরা ৬১ অংশ
যুক্তরাষ্ট্র	"	" ৬৪ "
যুক্তরাজ্য	"	" ৭০ "
ক্যানাডা	"	" ৬৪ "

ভারতে প্রত্যক্ষ করের এই বৃদ্ধি যোগায়,—অতিরিক্ত লাভকর (Excess Profits Tax) এবং আয়-করের উপর ঊর্ধ্বতম কর সহ অতিরিক্ত বাড়তি কর (Surcharge on Income Tax including Super Tax)। সাধারণ আয়করের পরিমাণ ১৯৩৮-৩৯ খৃষ্টাব্দের ১৫ কোটি হইতে ১৯৪৩-৪৪ খৃষ্টাব্দে ৩২ কোটিতে উন্নীত হইয়াছে। অতিরিক্ত লাভ করের আতিশয্যে যে কেবল অপচয় এবং অপটুত্ব (waste and inefficiency) নিবারণের প্রবৃত্তি হ্রাস পাইয়াছে, তাহা নহে, পরন্তু অবশিষ্ট উদ্বৃত্তের (Marginal profits) অন্তর্ধানের সহিত যুদ্ধ-হেতু স্থগিত সম্পূরণ ও সংস্কার নিমিত্ত সঞ্চয়ের (Reserves for deferred renewals and repairs) পরিমাণও অত্যন্ত হ্রাস পাইয়াছে। অধিকন্তু, অতিরিক্ত লাভ-কর নির্ধারিত (Fixed) এবং কার্যকরী (Working) উভয়বিধ মূলধনের অন্তরায় উপস্থিত করিয়াছে; অথচ এই সকল সংস্থানের উপর দেশের শিল্প ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। নূতন যৌথ কারবার অথবা পুরাতনের প্রসার বৃদ্ধির নিমিত্ত সর্বসাধারণের নিকট হইতে মূলধন সংগ্রহের পথও সংকীর্ণ করা হইয়াছে। সংগৃহীত মূলধনের অধিকাংশই সরকারী ঋণে আবদ্ধ হওয়ার ফলে, যুদ্ধ কালে, অথবা যুদ্ধান্তে, আবশ্যক অনুযায়ী যন্ত্রপাতি ইত্যাদি ক্রয় করিবার এবং যুদ্ধ হেতু স্থগিত সম্পূরণ-সংস্কারের নিমিত্ত উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত অর্থ দুষ্প্রাপ্য হইবে। যুদ্ধান্তে যুদ্ধকালীন শিল্প সকলকে শান্তি কালের উপযোগী শিল্পে পরিণত ও পরিবর্তিত করিতে বিশেষ ক্ষতির সম্ভাবনা আছে; এবং সেই ক্ষতি পরিহার ও পূরণ করিবার উদ্দেশ্যে যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হইবে তাহার অভাব অনটন ঘটিলে, দেশের শিল্প ব্যাহত হইয়া, পরদেশী পণ্যে দেশ ছাইয়া যাইবে। ইতিমধ্যে মার্কিনের রপ্তানী পণ্যের আমদানী ভারতে দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের প্রথম এগার মাসে এই পণ্যের মূল্য দাঁড়াইয়াছিল দুই হাজার

মিলিয়ন ডলারে। ১৯৩৮-৩৯ খৃষ্টাব্দে ভারতের আমদানী পণ্যে মার্কিনের অংশ ছিল শতকরা সাত এবং বৃটেনের শতকরা একত্রিশ। ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগে মার্কিনের ভারতে প্রেরিত রপ্তানী পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছিল শতকরা তের অংশ এবং বৃটেনের অনুরূপ রপ্তানী পণ্যের মূল্য হ্রাস পাইয়াছিল শতকরা দশ অংশ। বৎসরের শেষভাগে এই উত্থান ও পতনের পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। শক্তিমান জাতি ব্যতীত কাহারও রাজ্য-বিস্তারে আকাঙ্ক্ষা নাই; কিন্তু বাণিজ্য-বিস্তারের আকাঙ্ক্ষা ক্ষুদ্র-বৃহৎ সর্ব বৈদেশিক জাতির তীব্র ও উগ্র। যুদ্ধ পরিচালন ব্যাপারে ভারতের ভৌগোলিক অবস্থিতি, ধনবল, জনবল এবং শিল্প সম্পদের বৈচিত্র্য ও প্রাচুর্য শিল্প-বাণিজ্যে সমুন্নত সমস্ত বৈদেশিক জাতির লালসা বৃদ্ধি করিয়াছে এবং সকলেরই লোলুপ দৃষ্টি এখন বিশাল ভারতের বিপুল বিক্রয়-ক্ষেত্রে। সুতরাং বহির্জগতে ভারতের মর্যাদা বৃদ্ধি তাহার কাঁচা মালের লুণ্ঠন এবং পাকা মালের বিনিময়ে তাহার অর্থ শোষণের নির্দেশ দেয়। যুদ্ধান্তে ভারতের বাজার অধিকার করিবার নিমিত্ত শিল্প-বাণিজ্যে এবং শক্তি-সামর্থ্যে সমুন্নত জাতিগুলির মধ্যে কুরুক্ষেত্রের পুনরাভিনয় ঘটিবে, তাহার পূর্বাভাস ইতিমধ্যেই সুপ্রকট।

সাহিত্য-সংবাদ

প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা

হাওড়া ডিষ্ট্রিক্ট স্টুডেন্টস্ কালচারাল এসোসিয়েশনের উদ্যোগে প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা হইবে। প্রবন্ধের বিষয়ঃ—কলেজের ছাত্রছাত্রীদের জন্য—সমাজের উপর সাহিত্যের প্রভাব। স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের জন্য—ভারতে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তনের প্রয়োজনীয়তা। প্রবন্ধ বাঙলায় লিখিতে হইবে। যে-কোনও স্কুল এবং কলেজের ছাত্রছাত্রীরা এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করিতে পারেন। প্রত্যেক প্রতিযোগীকে তাঁর নাম এবং ঠিকানা স্কুল বা কলেজের নাম, শ্রেণী, প্রবন্ধের সঙ্গে ফেব্রুয়ারী মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে নিম্নলিখিত ঠিকানায় সম্পাদকের কাছে পাঠাইতে হইবে। শ্রেষ্ঠ প্রতিযোগীদের মধ্যে প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থান যাঁহারা অধিকার করিবেন, তাঁহাদের প্রগতিমূলক বই পুরস্কার দেওয়া হবে। সম্পাদক, পঙ্কজকুমার দাশ, হাওড়া ডিষ্ট্রিক্ট স্টুডেন্টস্ কালচার এসোসিয়েশন, ৩৬নং জয়নারায়ণবাবু আনন্দ দত্ত লেন, হাওড়া।

প্রেম তারি লাগি মোর

ভাতু মুখার্জি

(১)

পিয়াসী দিয়েছে ঢেলে;
শত জনমের সুপ্ত পিয়াষ তাই ত উঠেছে জ্বলে।
পান করি যত সুধামাখা হিয়া,
পরাণ আমার ওঠে না ভরিয়া,
মিটাবার তরে এ পিয়াষ মোর হৃদয় দিয়াছি খুলে;
শত জনমের সুপ্ত পিয়াষ তবুও উঠিছে জ্বলে।

(২)

যাহারে গেঁথেছি মনে;
রুদ্ধ করিয়া রেখেছি তাহারে অন্তরতম কোণে।
বাহিরের বাধা আসি বার বার,
ভাঙিতে চাহিছে বাঁধন আমার,
যে বাঁধন লাগি নিজেরে সঁপেছি ভুলিয়া আপন জনে
অমর করিয়া রেখেছি তাহারে অন্তরতম কোণে।

(৩)

প্রেম তারি লাগি মোর;
জীবনে আমার সেই ত নায়িকা সে যে মোর চিতচোর
পারিবু না আমি ভুলিতে তাহারে,
কাঁড়িতে দিবনা কেহ যদি কাড়ে,
যে প্রেম গড়েছি তাহার ধেয়ানে বসিয়া জনমভোর।
তারেই করেছি জীবন-নায়িকা প্রেম তারি লাগি মোর।

অমরার গড়

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, সাহিত্য রত্ন

জেলার ইতিহাস সংগৃহীত না হইলে সারা বাঙলার ইতিহাস সম্পূর্ণ হইবে না। যে সমস্ত পল্লীর প্রবাদ-পরম্পরা ও কিম্বদন্তী বিশ্লেষণ করিলে ইতিহাসের যৎসামান্য মালমসলাও সংগৃহীত হইতে পারে, সেই সমস্ত পল্লীর কথাও উপেক্ষার বস্তু নহে। কয়েকখানি শিলালিপি, তাম্রশাসন ও মুদ্রা লইয়া ইতিহাসের একটা কঙ্কাল প্রস্তুত হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিতে হইলে, জেলার ইতিহাস সংগ্রহ করিতে হইবে। আমরা বর্ধমান জেলার এইরূপ একটি পল্লীর কথা লিপিবদ্ধ করিতেছি।

ইস্ট ইণ্ডিয়ান রেলপথে মানকর স্টেশন হইতে দুই মাইল উত্তর-পূর্বে অমরার গড় একসময় গোপালভূমি বা গোপভূমের রাজধানী ছিল। মানকরও অখ্যাত স্থান নহে। নিদানের সুপ্রসিদ্ধ মাধবকর মানকরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার বংশধরগণ আজিও মানকরে বাস করিতেছেন। মানকর কিশোর বয়সে পক্ষধরের পক্ষশাতন কারী নব্য-ন্যায়ের স্রষ্টা বঙ্গগৌরব রঘুনাথ শিরোমণির জন্মভূমি। মানকরের 'কদমা' দেশবিখ্যাত। কেহ কেহ মনে করেন, এই মানকরের প্রান্তরেই নবাব আলিবর্দী মারাঠা দস্যু ভাস্কর পণ্ডিতকে হত্যা করেন।

অমরার গড় সম্বন্ধে প্রবাদ—মহাভারতোক্ত বিদুরথের পুত্র 'ধর্মদান'-পর্বতে ভল্লুকের পদতলে রক্ষিত হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার বংশ ভল্লুক-পাদ নামে পরিচিত হয়। এই বংশীয় কোন ব্যক্তি সৌরাষ্ট্র হইতে তীর্থ-পর্যটনব্যপদেশে রাঢ়ে আসিয়া উপস্থিত হন। সঙ্গে তাঁহার গর্ভবতী পত্নী ছিলেন। মানকর অঞ্চল তখন জঙ্গলে পূর্ণ ছিল। একবারে তিনি আসিয়া এখানে ছাউনী ফেলেন। এবং তথায় তাঁহার পত্নী এক পুত্র প্রসব করেন। মৃত মনে করিয়া সেই সদ্যোজাত পুত্রকে পরিত্যাগপূর্বক এই দম্পতি পুরীধামের উদ্দেশে প্রস্থান করিলে এক সন্ন্যাসী শিশুকে কুড়াইয়া আশ্রমে আনিয়া প্রতিপালন করেন এবং শিশুর নাম রাখেন রাঘব। প্রবাদ আছে, ইহা ৫৪২ বঙ্গাব্দের ঘটনা। এই শিশু ভল্লুকপাদ বংশজাত—সন্ন্যাসী সে পরিচয় জানিয়া রাঘবের বাসস্থানের নাম রাখেন 'ভল্লুকা বা ভাল্লুকা, অপভ্রংশে ভালকী। রাঘবের পুত্র গোপাল। গোপাল নাকি [illegible] বাহুবলে ৩৬৫ খানি গ্রাম অধিকা[illegible]ন এবং রাজ উপাধি গ্রহণপূর্বক আ[illegible]জ্যের নামকরণ করেন—গোপালভূমি [illegible]ভূমি। গোপাল নীলপুরের রাজকন্[illegible]বাহ করেন। নীলপুর অজয়ের [illegible]বীরভূম জেলায় অবস্থিত। [illegible]ছে—"ঘোড়ার দাবনে যত ধুলো উড়ে গেল। নীলপুর ছিল নাম ধুলপুর হলো॥" ইছাই ও লাউসেনের যুদ্ধকালে 'নীলপুর' 'ধুলপুর' নামে খ্যাত হয়। অজয়ের উত্তর তীরে আজিও ধুলপুর নামে একখানি গ্রাম আছে। গোপালের পুত্রের নাম মহেন্দ্র। মহেন্দ্র অমরাবতী নাম্নী এক রাজকন্যাকে বিবাহ করিয়া মহিষীর নামানুসারে নবপ্রতিষ্ঠিত রাজধানীর নামকরণ করেন—অমরার গড়।

পাঁচশত বিয়াল্লিশ বঙ্গাব্দে—খৃষ্টাব্দ ছিল বোধ হয় এগার শত ছত্রিশ ; সুতরাং অনুমান করিতে হয়, মহেন্দ্রের সময় তুর্কীরা বাঙলার পশ্চিমাংশ জয় করিয়াছিল। প্রবাদ আছে, মহেন্দ্রের শেষ-জীবনে সৈয়দ বস্নান নামক এক তুর্কী সেনাপতি 'অমরার গড়' আক্রমণ করিয়াছিলেন। মহেন্দ্রের সহিত যুদ্ধে সৈয়দ নিহত হইলে, মহেন্দ্র তাঁহাকে সসম্মানে সমাধিস্থ করেন। সেই স্থানে আজিও 'বস্নান-তলা' নামে বিখ্যাত। প্রতি পৌষ-সংক্রান্তির দিন এখানে মেলা হয়। বহু হিন্দু-মুসলমান নরনারী মেলায় আসিয়া আজিও সৈয়দের উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করে।

মহেন্দ্রের দুই কন্যা ও এক পুত্র হয়। কন্যা দুইটির নাম যমুনা ও কালিন্দী। মহেন্দ্র শিবাদিত্য সিংহ রায়ের সঙ্গে যমুনার বিবাহ দিয়া তাঁহাকে সিহুরিয়া বা সিউর গড়ে স্থাপন করেন। সিউর বীরভূম জেলায় ইস্ট ইন্ডিয়ান রেলপথের লুপ-লাইনে আমদপুর স্টেশনের নিকট। সিউরগড়ে আজিও শিবাদিত্যের বংশধরগণ বাস করিতেছেন। শিবাদিত্যের কুলদেবতা রামেশ্বরী দেবী সিউরে প্রতিষ্ঠিতা রহিয়াছেন। আগামী সংখ্যায় আমরা সিউরের কথা বলিব।

কালিন্দীর সঙ্গে কনকসেনের বিবাহ হইয়াছিল। কনকসেনের রাজধানী এখন ঝাঁকসা পালাগড় নামে পরিচিত। কনকসেনের বংশ নাই। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত কনকেশ্বর শিব আছেন।

মহেন্দ্রের পাঁচজন সেনাপতির নাম খট্টাংগ, ওড়ম্বর, শিশুনাগ, প্রতিহার এবং কর্ণহার বা কীর্ণাহার। ইঁহারা এক একজন এক-একটি স্থানে সামন্তরূপে গোপভূমের সীমান্তরক্ষার্থে বাস করায় সেই সেই স্থান উঁহাদের নামানুসারে বিখ্যাত হইয়াছে। খটংগা গ্রামে খট্টাংগের বংশধর আছেন। উপাধি রায়, কুলদেবী কালী। ওড় গ্রামে ওড়ম্বরের বংশধরগণ বাস করেন, কুলদেবী ত্রৈলোক্যতারিণী, উপাধি রায়। শিশুনাগের বংশধরগণ সুসুনে ও বৈঁচিতে বাস করিতেন। প্রতিহারের সংবাদ জানিতে পারি নাই। কর্ণহার বা কীর্ণাহারের নামানুসারে বীরভূমে কীর্ণাহার বা কুর্ণাহার গ্রাম রহিয়াছে। কর্ণহার বা কীর্ণাহার বীরভূমে মহাকবি চণ্ডীদাসের বাসভূমি নানুরের রাজা সাতরায়কে বিনাশ করিয়া এই অঞ্চল অধিকার করেন। কীর্ণাহারে বা কুর্ণাহারে কর্ণহার বা কীর্ণাহারের বংশধর কেহ নাই।

মহেন্দ্রের পুত্র নরেন্দ্র। নরেন্দ্রের পুত্র শতক্রতু কীর্ণাহারের পৌত্রী অর্থাৎ কীর্ণাহারপুত্র নীলধ্বজের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন এবং আপনার জাতির মধ্যে পুত্র-কন্যার বিবাহের জন্য আটঘরে সমীকরণ করিয়াছিলেন। এই আটটি থাক্ বা শ্রেণী এখনও আছে। এই আট থাকের নাম—সিউড়, কাঁকসা, ওড়ুম্বর, খটংগা, সুসুনে, বৈঁচি, প্রতিহার ও কীর্ণাহার। ইঁহারা আপনাদিগকে কোঁয়ার সংগোপ নামে পরিচয় দেন।

শতক্রতুর পুত্র অজয়, অজয়ের পুত্র যোধকুমার। যোধকুমার হইতে অধস্তন চতুর্দশ পুরুষে বৈদ্যনাথ বর্গীর হাঙ্গামার ভাস্কর পণ্ডিতের সঙ্গে যুদ্ধে নিহত হন। বর্গীরা 'অমরার গড়' ধ্বংস করে ও সর্বস্ব লুঠিয়া লয়। প্রায় চারি শত বিঘা স্থান ব্যাপিয়া অমরার গড়ের ধ্বংসস্তূপ ও তাহার বিশাল পরিখা-প্রাকারের শেষ-চিহ্ন দর্শকের বিস্ময়োৎপাদন করে। গড়ে শিবাখ্যা নাম্নী দেবী আছেন।

গোপভূমি নাম কত দিনের পুরাণো, ঐতিহাসিকগণ তাহার অনুসন্ধান লইলে উপকৃত হইবেন। প্রাচীন আভীর জাতির দুইটি শাখা এক সময় রাঢ়ে অত্যন্ত পরাক্রান্ত হইয়া উঠেন। ঈশ্বর ঘোষকে লইয়া বিতর্ক উঠিয়াছে। আসামে ঢেক্করী নামে স্থান ও জটোদা নদীর সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। এই লিপির পাঠোদ্ধার নাকি সঠিকভাবে হয় নাই। ঐতিহাসিকগণ চেষ্টা করিলে তাহারও মীমাংসা হইতে পারে। ধর্মমঙ্গলের ইছাই ঘোষ পল্লব-গোপ বা গোয়ালা ছিলেন, এইরূপ প্রবাদ। একখানি ধর্মমঙ্গলে আছে—
"শনিবার সপ্তমী সম্মুখে বারবেলা।
আজি রণে যেওনারে ইছাই গোয়ালা।"
এই দুইটি পংক্তি কবিতা আজিও জয়দেব কেন্দুবিল্ব অঞ্চলের লোকের মুখে মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। গোপভূমের রাজারা জাতিতে সংগোপ ছিলেন বলিয়া পরবর্তীকালে তাঁহাদের বংশধর বা তাঁহাদের সঙ্গে সম্বন্ধ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের বংশধরগণ ও আধুনিক অর্থশালী সংগোপগণ নিজেদের "কুমার সংগোপ" নামে পরিচয় দিয়া থাকেন। দরিদ্র কৃষক শ্রেণীর সংগোপগণ সাধারণত "চাষা" নামে অভিহিত হন।

সাধনার অধিকার

অধিকার-ভেদের কথা অনেকেই তোলেন, সাধনার পথের বিচার করতে গেলে এ প্রশ্নটি সাধারণত এসে পড়ে। অধিকার ভেদের প্রশ্ন উড়িয়ে দিতে চাই না, কিন্তু সরল প্রাণে এবং স্বার্থ-সংস্কারশূন্য মনে এ বিষয়ের বিচার করা দরকার বলে আমি মনে করি। প্রথমে দেখতে হবে এবং এই সত্যকে এ ক্ষেত্রে স্বীকার করলে বলতে হবে যে, অন্যের অধিকারের বিচার করবার বেলায় আমরা অনেক সময়ই নিজের নিজের স্বার্থের দিকটাই বড় করে দেখে থাকি এবং সেই পথে অন্যের অধিকার সঙ্কোচ করবার জন্যেই আমাদের যুক্তি বুদ্ধি উন্মুখ হয়ে উঠে। কিন্তু সমান স্বার্থের ক্ষেত্র না হলে অধিকারের সম্বন্ধে স্বচ্ছভাবে বিচার করা যায় না। এ দেশে তত্ত্বদর্শিগণ এই উদার সম-স্বার্থের উপরই অধিকারের ভিত্তিকে দাঁড় করিয়েছিলেন। তাঁরা অপরকে দাবাতে চাননি পক্ষান্তরে বৃহত্তর এক সমস্বার্থের আদর্শের অভিস্টসিদ্ধির জন্য সকলের অধিকারের সমান মূল্য উপলব্ধি করেছিলেন। তাঁরা কাউকে ছোট দেখেন নি। তাঁরা সমাজ-জীবনে সকলের অধিকারের সমান প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকার করেছিলেন। ব্রাহ্মণ, বৈশ্য বা শূদ্রকে তুচ্ছ করেননি। 'যৎ বৃত্ত্যা পরিতোষণং' বলে শূদ্রের পরিচর্যা বৃত্তির প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেছিলেন; প্রকৃতপক্ষে জাতির জীবনে সমাজবোধ তখন ব্যাপক ছিল, সকলের মধ্যে উদারতা ছিল এবং প্রয়োজন ছিল সেই দিকে; এ বোধ অনেকাংশে রাজনৈতিক অবস্থার উপর নির্ভর করে। রাষ্ট্রগত স্বার্থবোধকে ভিত্তি করে অপরের অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধার ভাব নিজের স্বার্থের দিক থেকেও আমাদের অন্তরে প্রখর থাকে। স্বাধীন রাষ্ট্রের সুগঠিত সর্বাঙ্গীন জীবনেই স্বাস্থ্যের এমন পরিপূর্ণ লক্ষণ বজায় থাকা সম্ভব হয়। পরাধীন জীবনে রাষ্ট্রগত এই সমস্বার্থ বোধ, সকলে মিলে সমাজরূপী বিরাট পুরুষকে পূজো করবার এই উদার দৃষ্টি ক্রমেই ক্ষুণ্ণ হয়ে পড়ে; এবং সঙ্কীর্ণ ব্যক্তি-স্বার্থই বড় হয়ে দাঁড়ায়; এর ফলে অধিকার বোধের যুক্তি তখন বড় হয়ে ওঠে জন্ম বা কুলগত কেন্দ্রকে অবলম্বন করে। অপরের অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা-বুদ্ধি শিথিল হয়ে নিজের জন্ম এবং কুলের অহঙ্কারই জেঁকে ওঠে; আর সেই জোরে অন্যের ঘাড়ে চেপে থাকবার ফন্দিই ধর্মের নামে পেকে পেকে উঠতে থাকে। ফলে অন্তর্দ্বন্দ্ব আরম্ভ হয়, ভেদ বিরোধ বড় হয়ে অধিকারের লড়াইতে জাতিকে মানুষের অধিকার থেকে বঞ্চিত করে এবং জাতি এইভাবে উৎসন্ন যায়। আমাদের ও বর্তমানে এই দুর্দশা চরমে এসে ঠেকেছে। অধিকারের বড়াই আমরা খুবই কচ্ছি; কিন্তু সাধন-জগতে প্রবেশ করবার অধিকার, উদার সার্বভৌম আত্মতার অনুভূতি; সে তো দূরের কথা, মানুষের মত বেঁচে থাকবার অধিকারও শত সহস্র যুক্তি আওড়ানো সত্ত্বেও আমাদের জীবনে সত্য হচ্ছে না। সুতরাং আমাদের অধিকার বিচারে গোল ঘটছে বুঝতে হবে; বস্তুতপক্ষে ঋষিরা যে অধিকারের ভিত্তিতে সার্বভৌম সত্যকে জীবনে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তাঁদের উক্তি আওড়ালেও তাঁদের উক্তির মূলে যে অনুভূতি ছিল তা থেকে আমরা বঞ্চিত হয়েছি। তাঁদের জীবনে সেবা সত্য ছিল, আমাদের জীবনে জন্ম-গৌরবের জাঁকে অধিকারের নামে স্বার্থ-সংস্কারই বড় হয়ে উঠেছে। এ বিষয়ে ভাবের ঘরে চোখ ঠাওরালে চলবে না। ধর্মজীবনে সে পথ পথ নয়, আর লৌকিক জীবনও সে পথ স্বচ্ছন্দ হয় না। অধিকার সম্পর্কে আমাদের উদার দৃষ্টির বিপর্যয় ঘটেছে; আর এ ঘটতে বাধ্য; কারণ আমরা যতই উচ্চ আধ্যাত্মিকতার বুলি আওড়াই না কেন, অধিকারের বিচারের প্রয়োজন-বোধ জেগে থাকে যে স্তরে, তা ব্যবহারিক; এবং ব্যবহারিক এই জীবনের উপর অর্থের একান্ত প্রভাব রয়েছে। জাতি পরাধীন হবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সামাজিক জীবনে আর্থিক বিপর্যয় ঘটেছে এবং তার চাপে আমরা বিভিন্ন বর্ণের, বিভিন্ন জাতির অধিকারের গৌরব যতই করি না কেন, আমাদের বৃত্তির ধারা বদলে যাচ্ছে। এ পরিবর্তনের দুর্নিবার গতি জাতির অর্থনৈতিক সংস্থানকে ভেঙেচুরে দিচ্ছে। পেটের দায়ে সকলকে সকলের বৃত্তি গ্রহণ করতে হচ্ছে। অধিকারের যুক্তিকে একান্তভাবে দাঁড় করিয়ে নিজেদের আত্মতৃপ্তিটুকু বোধ করতে হচ্ছে এখন জন্ম ও কুলের দোহাই দিয়ে। পরাধীন অবস্থায় এই বিপর্যয়ে সমাজের বিভিন্ন অংশের সঙ্গে স্বার্থবোধগত সেবার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি আমরা হারিয়ে ফেলছি। আমাদের দৃষ্টি এখন কেবল ঘুরছে নিজের নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থের গণ্ডীকে ঘিরে। এ পথ সংঘর্ষের পথ, বিরোধের পথ—কামের পথ; এ পথে ঐহিক বা পারত্রিক কোন দিক থেকে শান্তি বা তৃপ্তি আসতে পারে না; ধর্মজীবনের ফাঁকা কতকগুলো সূত্রই এ অবস্থায় আবৃত্তি করা যায় মাত্র; প্রকৃতপক্ষে সে জীবনের বিরুদ্ধেই চলে আমাদের গতি। এ বিচারে জাতির বাঁচবার উপায় নেই, ত্যাগ সেবা এসব হারিয়ে এতে পশুত্বই লাভ হয়। আমাদিগকে যদি বাঁচতে হয়, তবে আত্যন্তিক সেবার ভাব বর্জিত জন্মগত অধিকারের এই স্পর্ধা, এই মোহকে ছাড়তে হবে। তবে মনের এই স্বার্থগত সংস্কারকে বিচার করে ছাড়া বড়ই কঠিন, এ অবশ্য বোঝা যায়; কিন্তু যুগের প্রয়োজনে, ভাগবৎশক্তি রূপ কালের ক্রীড়নক হয়ে আমাদের এ ছাড়তে হবেই। যদি স্বেচ্ছায় এ স্পর্ধা পরিত্যাগ না করি, তবে কালশক্তির আঘাতেই এ এলিয়ে পড়বে। জন্মের এই অহঙ্কার টিকবে না; কেউ মানবে না। শক্তি স্থায়ী হয় সেবার পথে, ভালবাসার পথে, সেই পথে চললেই লোকে মানে গণে। সকলের অন্তরে এক ভগবানই রয়েছেন। কারো অশ্রদ্ধা বা অহঙ্কারে তিনি নতি স্বীকার করেন না। এ সত্য আজ আমাদের স্বীকার করাই ভাল যে, জন্মগত সমাজ-বিন্যাসের পথে যে ন্যাস বা ত্যাগের ধারা আমাদের সমাজ জীবনকে সরস রেখেছিল, পরাধীনতার তাপে আর্থিক বিপর্যয়ে তা শুকিয়ে গেছে। এ অবস্থাকে যদি ঘোরাতে হয় এবং ঋষিদের পরিকীর্তিত বর্ণাশ্রম ধর্ম্মকে সত্যকার আদর্শে সঞ্জীবিত করতে হয়, তবে স্বাধীনতা আগে দরকার। চাতুর্ব্বর্ন্য ধর্ম্ম দেশে নাই। সে আদর্শে যাদের আন্তরিকতা আছে, তাদের বলি, গোঁড়ামী ছেড়ে আগে স্বাধীনতার চেষ্টা দেখতে পারেন কি? যদি সে বেলা ভয়ে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়, তবে ওকথা তুলবেন না। সোজা দেখা যাচ্ছে সমাজ-জীবনের জন্মগত ভিত্তিকে একমাত্র আঁকড়ে ধরে, আমরা ঋষিদের প্রসাদ সেই সেবার রসে আর নিজেদের অবসাদ ঘুচাতে পাচ্ছি না, জন্মগত অধিকারের বড়াইতে প্রমাদই পাকিয়ে তুলছি। মানুষের সকল অধিকারের সার্থকতা হল সমাজ-জীবনে, সকলের অধিকারের অবিরোধী এক বৃহত্তর আত্মীয়তার অনুভূতিতে। আমাদের বোঝা দরকার যে, জন্ম বা গৌরবকে ধরে বর্তমান অবস্থায় বৃত্তির জন্মগত অবশ্যম্ভাবী সংঘাতের মধ্যে সমত্ববোধকে সত্য করে পাওয়া সম্ভব নয়; সুতরাং প্রকৃত মানুষের জীবন লাভ করতে হলে ঐ পথের গোঁড়ামী আমাদের ছাড়তে হবে। বৃত্তিগত সংঘাত পরাধীনতার ফলে সমাজ-জীবনে অনিবার্য হইয়াছে—এ সত্য জন্মোচিত বৃত্তি, এ বিষয়ে যাঁরা অতিমাত্র নিষ্ঠাবাদী তাঁরাও, বাস্তব জীবনে বজায় রাখতে পাচ্ছেন না। এমন অবস্থায় জন্মগত বৃত্তির বিপর্যয়জনিত এই সংঘাতের মধ্যেও সমত্বের অনুভূতি কিভাবে আমরা বজায় রাখতে পারি, কোন্ পথে এই দুর্দশার মধ্যেও সকলকে ভালবাসতে পারি, আত্মীয় করে নিতে পারি, এই বিষয় স্বার্থসংস্কারশূন্য মনে ভেবে দেখতে হবে। আমি ব্রাহ্মণের কুলে জন্মগ্রহণ করেছি, অর্থ-প্রয়োজনে নিজের বৃত্তি বাধ্য হয়ে ছেড়েছি; কিন্তু তা বলে, সকলের প্রতি উদার-বুদ্ধি আমার মনে রয়েছে, একথা মুখে বললে চলবে না, অন্যের ভিতর আমার সেই সমত্ববোধের সাড়া সাক্ষাৎ-সম্পর্কে অর্থাৎ কাজের দ্বারা জাগাতে হবে। সে উপায় কি? কিসে সে শক্তি স্বচ্ছন্দ হয়ে বৃত্তিগত এই বিপর্যয়ের মধ্যেও আমাদের সমাজ-জীবনকে একটা উদার এবং অখণ্ড বাস্তব আদর্শের অনুপ্রেরণা দেয়, সেই পথেই এ অবস্থায় বর্ণাশ্রমের অন্তর্নিহিত উদার এবং সার্বভৌম সত্যের মর্যাদা রক্ষিত হতে পারে, আর সে সার্থকতা পরমার্থতা লাভের পক্ষেও সমভাবে সহায়ক হয়। সমাজ-জীবনের মধ্যে সমত্ববোধের এই চেতনাটি যদি আমরা জাগিয়ে রাখতে না পারি, তবে ব্যক্তিসর্বস্ব আচার-বিচারের গোঁড়ামীই ধর্মের নামে আমাদের কাছে বড় হবে আর সে ধর্ম আমাদের ইহকালের জন্যও কাজে আসবে না, পরকালের তো দূরের কথা। ভয়াবহ পর ধর্মই সেক্ষেত্রে আমাদের জীবনকে কার্পণ্যে অভিভূত করে ফেলবে। দারুণ এই সমাজ-বিপর্যয়ের সন্ধিক্ষণে সোজাসুজি এই সত্যটি উপলব্ধি করা দরকার হয়ে পড়েছে। বাইরের বিচারের খুঁটিনাটির বিচার করতে গিয়ে দেহব্যসনই যেন আমাদিগকে পেয়ে না বসে, [illegible] নামে আমরা যেন জীবনের মূলে আ[illegible]ত্যের প্রতিষ্ঠাকে ছেড়ে না দেই; সোনা ছেড়ে [illegible]লে গেরো দেবার গৌরব নিয়ে আত্মপ্র[illegible] করি। সেবাই বাঁচবার পথ, ত্যাগে[illegible] প্রেরণাই জীবন, প্রেমই সত্যকার ধর্ম[illegible]বাইরের আঁটঘাট বাঁধতে গেলে এটি [illegible] না, ভিতরের

থেকেই এ জিনিস ফুটে উঠে। ভিতর রসে ভরপুর হ'লে বাইরে এ ভাব ছড়িয়ে পড়ে এবং সমাজ-জীবনে আর লৌকিক-জীবনে সেই সত্য শক্তিমত্তায় পরিস্ফূর্ত হয়। স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি, এমন আসুরিক যুগ এসেছে যে, বাইরে সত্যকার জীবনে যত সম্বল—সব যেন ভেঙ্গে পড়ছে; এমন অবস্থায় বাঁচতে হলে ভিতরে যেয়ে ধরতে হবে। আপনারা বলবেন, 'ভিতরে যাবো কি করে? সেজন্যেই তো আচার-বিচারের দরকার।' এর উত্তর এই যে, ঐ যুক্তি অনেক ক্ষেত্রেই আমাদের অহঙ্কারেরই বিকার। আচার-বিচারকে আমি উড়িয়ে দিতে বলছি না, যা খুসি তাই করবো, এতে জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য থাকে না; আর জীবনের সব সৌষ্ঠব নষ্ট হয়। সে জীবন তো পশুর জীবন। সে জীবন ঘৃণিত এবং কেবল ঘৃণিত নয় — দৈন্যগত। সংযমই জীবনে সৌষ্ঠব আনে এবং উদারবোধই সেবার প্রেরণা জীবনে জাগিয়ে সংযমকে সত্য করে। এই উদারবোধ এবং সেবার প্রেরণা জীবনে জাগাতে হলে, যাতে সাহায্য পাই, সেই আচারই .সত্যকার আচার। তেমন আচার অন্তরজগতের সম্পদকে উন্মুক্ত করে, তাতে বাইরের খুঁটিনাটি সার হয় না; ভিতর থেকে ত্যাগের একটা সাড়া জেগে ওঠে। এ যুগে ভিতরে ঢুকবার সোজা পথ রয়েছে। মহাপ্রভুর পথ সেই পথ। রূপ রস গন্ধে স্পর্শে তিনি অন্তরের আনন্দময় আশ্রয়কে সোজাসুজি নিত্য করে এবং সত্য করে ধরিয়ে দিয়েছেন; আর ডাইনে বাঁয়ে বেশী চাইবার দরকার নেই; ভগবানের কৃপার স্পর্শ মনে লাগাতে পারলেই হল। এই স্পর্শ লাগাবার মত কৌশল তিনি ব্যক্ত করে, সকল অব্যক্তকে—নিয়তি, অদৃষ্ট, কর্ম-সংস্কার, যত কিছু পরোক্ষতা বা আপেক্ষিকতা—সকল বালাই দূর করে আনন্দময় সত্যে ও অনুভূতিতে সঞ্জীবিত হবার উপায় বলে দিয়েছেন। তার পথ ধরলে পূর্বজন্মের কর্ম-সংস্কারের সকল ভার যেমন সদ্য সদ্য কেটে যায় তেমনই প্রত্যক্ষ সত্যের সঙ্গে অনুভূতিগত সুদৃঢ় সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হবার ফলে আপেক্ষিকতাকে আশ্রয় করে ভবিষ্যতের দিকে অব্যক্ত সূত্রে কালের যে বিস্তার তাহাও বিলুপ্ত হয়। সোজা কথায় পূর্বজন্মের কর্মসংস্কারের পীড়ার ভয় যেমন থাকে না, তেমনই পরজন্মের চিন্তা আশঙ্কা বা উদ্বেগও সূর্যের উদয়ের অন্ধকারের মতই একেবারে বিলীন হয়ে যায়। এ অবস্থায় জীবনে এক অপূর্ব সত্য অনুভূত হয়। পূর্ব-জন্মের কর্মসংস্কার আমার ভিতর কাজ করছে অব্যক্তরূপে, আর অন্য দিকে তারই ধাক্কায় ভেসে চলছি পরজন্মরূপ অব্যক্ত কোন আঁধারের অভিমুখে ব্যক্ত মধ্য আমি। আমার দুই দিকে এই অব্যক্ত শক্তির সূত্রে কালের লীলা চলছে। আমি এই দুই অব্যক্তের টানাপোড়েনের জালে বাঁধা পড়ছি। মহা প্রভুর প্রেমের পথে এই জাল একেবারে কেটে যায় এবং যে অবস্থাকে দুই অব্যক্তের মাঝে পড়ে আমার পক্ষে ব্যক্ত-মধ্য মনে হচ্ছে, তাই সদ্য সদ্য আনন্দ রসে অসংশয়িত নিত্যতত্ত্বে প্রদ্যোতিত হয়। তখন বিনা দৈন্যে জীবন এইখানে অর্থাৎ এই দেহেই খুঁজে পাওয়া যায়। একেই বলে সত্যকার যোগ। গীতার ভাষায় দুঃখ-সংযোগ-বিয়োগের অবস্থা। তর্কের প্যাঁচ অনেক রয়েছে আমি বুঝি; কিন্তু শুধু কথায় তো পেট ভরবে না, ভয় কাটবে না। কৃপাকে না মানা পর্যন্ত ভয় থাকবেই। সোজা কথা এই যে, ভগবানের কৃপাকেও মানব, আর পূর্বজন্মের কর্মের দায়িত্ব ভোগ করব বা পরজন্মে কি হবে, এই চিন্তায় আধমরা হয়ে থাকব, এ হ'তে পারে না। তাঁর কৃপায় সব হতে পারে, এভাবে কৃপাকে না মানলে আর মহাপ্রভুকে মানা কি হল। তাঁর অযাচিত প্রেম বিলাবার লীলার মাধুর্য কি স্বীকার করা হল, আমার কিন্তু ধারণাতেই আসে না। ভগবানের কৃপার স্বরূপ উপলব্ধি না করা পর্যন্তই অদৃষ্ট, নিয়তি এবং তাদের নিয়ামক কাল যত কিছু জঞ্জাল। কৃপার সঙ্গে সঙ্গে অব্যক্ত কিছুই থাকে না, সবই ব্যক্ত। মহাপ্রভুর লীলায় এই কৃপার মহিমা সব ব্যক্ত হল। সম্ভবত এই সত্য উপলব্ধি করেই শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন, ভগবান এমন করে আর কোন লীলায় নীচে নেমে আসেন নি। তিনি যে লীলায় উজ্জ্বল রসের প্রেমময় ধাম নিয়ে নিজে নেমে এলেন, তখন বলব 'উপরি ন'; আমাদের চেষ্টাচরিত্র করে উপরে যাবার আর দরকার নেই; এ মনের বিকার ছেড়ে দিয়ে তাঁর কৃপার অনুধ্যানে ডুবে যাওয়াই ভাল। এই অনুধ্যানের ভিতর দিয়েই মন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হবে আর দেহযন্ত্রে তাঁর সুর বেজে উঠবে; আমার কৃত্যের কোলাহল বন্ধ হয়ে যাবে, আর তাঁর কলগান দেহমনেপ্রাণে ঝঙ্কৃত হয়ে উঠবে। বাঙলার সাধনা এই সত্যকেই ঘোষণা করেছে। শক্তি সাধনা আর বৈষ্ণব সাধনা এই দুই তারে একই সুর এখানে বেজেছে। মহাপ্রভুর তত্ত্ব বাঙলার এই দুই সাধনার ভিতরই সত্য স্বরূপে রয়েছে। সে সত্য হল সাধন সম্পর্কে ভগবানের কৃপাকে পাওয়া, তাঁর লীলার সঙ্গে লগ্ন হয়ে যাওয়া। ভবিষ্যতের ভরসায় শুকিয়ে থাক, নয় —তাজা জিনিস পেয়ে এখানেই জ্যান্ত হওয়া। আগে জীবনের প্রতিষ্ঠা প্রয়োজন, বিচার আচার যদি দরকার হয়, পরের জন্যে রেখে দেওয়া ভাল; কিন্তু এগুলোর আপাতত একটু পরোক্ষ করে যদি কৃপাকে একবার মুখ্যভাবে আঁকড়ে ধরা যায়, তখন দেখা যাবে, ওগুলো সব কোথায় সরে গেছে। তখন বুঝা যায় আমার কর্মবন্ধন কিছুই নেই, কর্ম শুধু আনন্দস্বরূপে তর্পণ; কিন্তু মাথা ঘুরিয়ে আমরা নাক ছুঁইব, আমাদের এমনই হয়েছে বিপাক; এ একটা ব্যক্তিক কতকটা ব্যায়রামেরই মত বলতে হয়।' আমরা ভগবানকে দয়াময় প্রেমময় বলি, কিন্তু তাঁর দয়া বা কৃপাকে একটুও স্বীকার করিনে; যদি তাই না করলাম, তবে প্রেমময় দয়াময় এসব কথা ভগবানের সম্বন্ধে আমাদের না বলাই ভাল, এতে শুধু মিথ্যাচারই হয়। এই মিথ্যাচার ছেড়ে কৃপাকে অঙ্গীকার না করা পর্যন্ত ভাগবত জীবন—অর্থাৎ সত্যকার জীবন আরম্ভ হয় না; শুধু মুহূর্তে মুহূর্তে কালের ঘড়ির টিক-টিকানী শুনতে শুনতে শঙ্কিত চিত্তেই জীবন কাটাতে হয়। একে তো ধর্ম বলা ঠিক হবে না, এ হল আমার পক্ষে ভয়াবহ, সুতরাং স্বধর্ম নয়, এ হচ্ছে পরধর্ম। মহাপ্রভুর পথই স্বধর্মের পথ, এতে ভয় থাকবার উপায় নেই, সাক্ষাৎ সম্পর্কে সৎফল। কৃপার সঙ্গে যুক্ত হয়ে এ পথে জীবনকে সফল করা সম্ভব হতে পারে। কিন্তু কৃপার সম্বন্ধে ধারণা শুধু কথার কথা থাকলে চলবে না, কৃপার স্পর্শ জীবনে নিত্য সত্য করে পেতে হবে। সে সুধা রসে আপ্যায়ন বা স্নপন, এ দেখে বুঝে নিয়ে, তবে নিশ্চিন্ত হওয়া দরকার। এজন্য ঋষিদের কথা মেনে নিতে হয়, প্রত্যক্ষদর্শী সাধকদের কথা শুনতে হয়; কলি যুগে ভগবানের নাম ছাড়া অন্য কিছু আবশ্যক করে না—অসংশয়িতভাবে এবং এক-গুঁয়ে রকমে সমস্ত অন্তর দিয়ে এই বিশ্বাস নিয়ে চলতে পারলেই সব হয়ে গেল। কিন্তু অহঙ্কারের বিপাক আমাদের খসে না, কৃপায় অবিশ্বাসে এ দিক ও দিক নজর চলতেই থাকে; এপথে জীবনের প্রতিষ্ঠা হবার উপায় নেই—সংশয়াত্মা বিনশ্যতি। ভগবৎ কৃপার গূঢ়তত্ত্ব আমাদের কাছে উন্মুক্ত নয়, এতো বুঝি; কিন্তু অত গূঢ়তার জন্যে গবেষণা নাই বা হ'লো, বাঙলার প্রেমের ঠাকুরের পতিত এবং তাপিতকে কোলে তুলবার আর সকলকে ভাল-বাসার লীলার যেটুকু আমার মত মূর্খে বাইরের ব'লে মনে করে, সেটুকুর ভাব ধরতে পারলেও তো হয়! তার মধ্যেই নিত্যলীলার সূত্র রয়েছে কৃপার রাজ্যে নিয়ে যাবার টান রয়েছে, রয়েছে চাহনি। একবার যে কোন রকমে সে লীলার দিকে তাকালেই তো হল; মনে স্মরণ একটু জাগলেই হল; আর না জাগবার কোন কারণও নেই; কারণ সকলকে ভালবাসার ভাবই রয়েছে এ লীলাতে; এজন্যেই এ লীলা মহাভাবদ্যুতি-সুবলিত। আসুন এই সত্যকে স্বীকার করে— আমাদের কাজের বিচার, অধিকারের হিসাব, পূর্বজন্মের ছোপ এবং পরজন্মের ছাপ সব দূরে ফেলে দিয়ে প্রেমময়ের প্রেমের লীলার অনুধ্যানে নিমগ্ন হই।*.

---

*'দেশ' সম্পাদকের বক্তৃতা হইতে অনুলিখিত।

তিলাঞ্জলি

সুবোধ ঘোষ

(১৩)

প্রকাশবাবুর ঘরের দরজার কড়া নাড়বার জন্য হাতটা তুলেই ইন্দ্রনাথ স্তব্ধ হয়ে গেল, হাত নামিয়ে নিল।

স্কুল মাস্টার আশুবাবু কৌতূহলী হয়ে চোখের ইসারায় জিজ্ঞাসা করলেন—কি?

দুটী অভিযাত্রী আবিষ্কারকের মত এক রহস্যে পরিকীর্ণ গুপ্ত গুহার মুখে যেন উৎকর্ণ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল ইন্দ্রনাথ আর আশুবাবু।

—তোমাকে দেখে আমার কি মনে হয় জান রুমি?

প্রকাশবাবুর গলার স্বর। অত্যদ্ভুত এক প্রণয়নম্রতায় কথাগুলি যেন ঘরের ভেতর লুটিয়ে পড়ছিল। শোনা গেল, প্রকাশবাবু আবার বলছেন,—তোমাকে দেখে আমার সব সময় লা পাসিয়োনারার কথা মনে পড়ে রুমি।

—কেন লজ্জা দিচ্ছ আমায়। উত্তর দিতে গিয়ে উর্মিলা কাঞ্জিলালের কথা আর হাসিটা অনুরাগের দীনতায় যেন একটা রুমালের আড়ালে ধীরে ধীরে লুকোচুরি খেলতে লাগলো।

প্রকাশবাবু—এইবার আমি নতুন করে জীবন আরম্ভ করবো উর্মিলা।

উর্মিলা—কর।

প্রকাশবাবু—কিন্তু আমি একা কিকরে পারবো উর্মিলা?

উর্মিলা—ভেবে দেখ।

প্রকাশবাবু—না, আর ভাববার কিছু নেই। শেষ পর্যন্ত ভেবে দেখেছি, আমার জীবনে তোমাকে আসতেই হবে রুমি।

উর্মিলার কণ্ঠস্বর থেকে একটা সন্ত্রস্ত চাঞ্চল্যের আভাষ বন্ধঘরের বুক ভেদ করে দরজার বাইরেও যেন ছটফট করে পালিয়ে আসছিল। খুবই করুণ হয়ে শোনাচ্ছিল কথাগুলি। উর্মিলা বললো—মাপ করো প্রকাশ, এত সাহস আমার নেই।

প্রকাশবাবু—তোমার সাহস নেই? আমি বিশ্বাস করতে পারি না উর্মিলা। তোমারই সাহসের প্রেরণা পেয়ে আমাদের সঙ্ঘের প্রাণ দুঃসাহসী হয়ে উঠেছে। সবার আগে এগিয়ে চলেছ তুমি, পেছনে চলেছে পার্টি আর সঙ্ঘ। তোমারই ওপর পার্টির শত শত ছেলেমেয়ের জীবনের আদর্শ নির্ভর করছে। আমাদের নতুন সংসারের সত্য তোমার মধ্যে প্রথম সার্থক হয়ে উঠবে, তুমি পথ দেখাবে; তোমার মত ধ্রুবা স্বচ্ছা সাহসিকা......

হঠাৎ থেমে গেলেন প্রকাশবাবু। উর্মিলা কাঞ্জিলালও যেন নিঝুম হয়ে রয়েছে। এই নিঃশব্দতাকে সহ্য করার ধৈর্য রাখতে পারছিল না ইন্দ্রনাথ। কড়া নাড়বার জন্য আবার হাত তুলতেই প্রকাশবাবুর গলার শব্দ চমকে দিল ইন্দ্রনাথকে।—ছি ছি, তুমিও মুসড়ে পড়ছো উর্মিলা। আর কেউ নয়, তুমি! তোমাকে আমি এতদিন যেভাবে ভালবেসে, শ্রদ্ধা দিয়ে, বিশ্বাস দিয়ে......।

উর্মিলা কাঞ্জিলাল একটু শান্তভাবেই জবাব দিল—না, মুসড়ে পড়ছি না।

প্রকাশবাবু—এত ভাবনাই বা হচ্ছে কেন তোমার?

উর্মিলা—না ভেবে যে পারছি না প্রকাশ। সেই ভদ্রলোকটির কথা কি তুমিও একটু ভেবে দেখছ না?

প্রকাশবাবু—কাঞ্জিলাল মশাইয়ের কথা বলছো?

উর্মিলা—হ্যাঁ।

প্রকাশবাবু—তোমার মত নারীর জীবনে ভদ্রলোক কতটুকু গৌরব এনে দিতে পেরেছে উর্মিলা?

উর্মিলার গলার স্বর কেঁপে কেঁপে যেন সায় দিল।—কিছুই নয়।

প্রকাশবাবু—তবে? তবে এত দ্বিধা কেন উর্মিলা?

উর্মিলা—শক্তিতে কুলোচ্ছে না প্রকাশ। কিসের দ্বিধা তাও ঠিক বুঝতে পারছি না।

প্রকাশবাবু—আশ্চর্য হচ্ছি উর্মিলা। তোমার মত মেয়ে একটা জীর্ণ কন্‌ভেনশনকে, বল্লালী যুগের একটা পোকা-খাওয়া রীতিকে দূরে ঠেলে ফেলতে পারছে না, একথা আমায় বিশ্বাস করতে বল?

উর্মিলা—ওটা সমাজেরই কনভেনশন নয় কি প্রকাশ?

প্রকাশ—তাতে কি আসে যায়?

উর্মিলা যেন নিজেকেই সান্ত্বনা দিয়ে বলে উঠলো।—না, তাতে অবশ্য কিছু আসে যায় না।

প্রকাশবাবুর উৎসাহিত গলার স্বর হঠাৎ যেন প্রমত্ত গোক্ষুরার মত উর্মিলার সঙ্কোচ ও সংশয়কে চারদিক থেকে পাক দিয়ে জড়িয়ে অবশ করে আনছিল।—কাঞ্জিলাল মশাই তোমার স্বামী, আজ একথা বললে একটা মিথ্যাকেই প্রশ্রয় দেওয়া হয়। আলো আর অন্ধকারের মত তোমরা দুজনে ভিন্ন। তিনি কেরাণী, তাঁর জীবনের কাম্য হলো পেন্সন। তুমি জাগৃতি সঙ্ঘের অগ্রনায়িকা, তোমার কাম্য মু[illegible]।

উর্মিলা—আম[illegible]ন ক্ষতি হবে না তো প্রকাশ?

প্রকাশবাবু—ক্ষ[illegible]মি আমি নতুন করে ভালবাসার [illegible] তৈরী করবো উর্মিলা। আমাদে[illegible] এক হয়ে

পার্টিকে শক্তিতে ও গৌরবে সুন্দর করে তুলবে। যদি জানতাম তুমি আমাকে......।

প্রকাশবাবু তাঁর আবেগ একটু সংযত করলেন। ঊর্মিলা হেসে ফেলে বললো—কি বলছিলে?

প্রকাশবাবু—যদি জানতাম তুমিও আমাকে ভালবাসতে পারনি, তবে...।

কথার মাঝখানেই ঊর্মিলা উত্তর দিল।—ভালবাসতে পেরেছি প্রকাশ। তোমাকে যেদিন দেখেছি, সেদিনই আমার বার-বার থেলমানের কথা মনে পড়ছিল।

প্রকাশবাবু ডাকলেন।—রুমি?

ঊর্মিলা—কি প্রকাশ?

প্রকাশবাবু—এতদিন জীবনটাকে একটা তপস্যার মত শুধু ভুগে ভুগে টেনে নিয়ে এসেছি ঊর্মিলা। আজ মনে হচ্ছে, সব শূন্যতা কানায় কানায় ভরে গেল। জীবনে প্রথম স্নানধনুর মত তোমায় আমি পেলাম ঊর্মিলা।

ঊর্মিলা—এত তাড়াতাড়ি সংঘকে সব কথা জানিয়ে দিও না প্রকাশ।

প্রকাশবাবু আপত্তি করে উঠলেন—আবার সঙ্কোচ কেন? এ এখবর শুনে সমস্ত সংঘ কত খুশী হবে, অনুমান করতে পার? তোমার আমার বিয়ের কথা ঘোষণা করে কালই আমরা পার্টির আশীর্বাদ গ্রহণ করবো।

দরজার কড়া কর্কশ শব্দে বাজতে লাগলো। দরজা খুলে দিয়েই প্রকাশবাবু ভ্রূকুঞ্চিত করলেন—কি খবর ইন্দ্র?

ইন্দ্রনাথ আর আশুবাবু ঘরের ভেতর গিয়ে বসতেই ঊর্মিলা কাঞ্জিলাল বললো—আমি উঠি এবার প্রকাশবাবু। আপনারা আলাপ করুন।

টেবিলের ওপর কাগজপত্র গোছাতে গোছাতে প্রকাশবাবু বললেন—তুমি বড় ফাঁকি দিয়ে বেড়াচ্ছ ইন্দ্রনাথ। সঙ্ঘের কাজে একটু গা লাগিয়ে কিছু কর এবার। নইলে......।

ইন্দ্রনাথ—সঙ্ঘের সঙ্গে সম্পর্ক অনেক দিন চুকিয়ে দিয়েছি।

প্রকাশবাবু চেহারাটিকে একটু কঠোর করে নিয়ে বললেন—কথাটা কি আন্তরিক-ভাবে বলছো?

ইন্দ্রনাথ—হ্যাঁ।

প্রকাশবাবু—বেশ। এর পর আর কি বলবার আছে?

ইন্দ্রনাথ—আপনাকে চেনবার জন্যই এত-দিন ছিলাম, চেনা হয়ে গেল।

প্রকাশবাবু উদ্ধত হু[illegible]—কী বলছো?

ইন্দ্রনাথ—সুন্দর এ[illegible] আশ্রম তৈরী করেছেন প্রকাশবা[illegible] আশ্রম চালনার বৈজ্ঞানিক মনস্তত্ত্ব[illegible] ভাল করে জানেন আপনি।

প্রকাশবাবুর[illegible]টা শতমুখী হয়ে ইন্দ্রনাথকে বিদ্ধ করে যেন তার আজকের উদ্ধত শোণিতের আস্বাদ নেবার চেষ্টা করছিল।

ইন্দ্রনাথ নির্বিকারভাবেই বলে চললো।—আপনাকে আমি চিনেছি প্রকাশবাবু, এই-বার আপনিও নিজেকে চিনতে শিখুন।

প্রকাশবাবু—এই তত্ত্ব তুমি আজ আমায় শেখাতে এসেছ?

ইন্দ্রনাথ—স্মরণ করিয়ে দিতে এসেছি।

প্রকাশবাবু—কি

ইন্দ্রনাথ—একবার হাতড়ে দেখুন, শিরদাঁড়াটি আছে কি না?

প্রকাশবাবু—তুমি এবার উঠতে পার ইন্দ্র।

ইন্দ্র—জীবনে অনেক দুঃখ কষ্ট করেছেন, অনেক আঘাত নির্যাতন সহ্য করেছেন, কিন্তু তার ফলে আপনার মনুষ্যত্ব বলিষ্ঠ হয়নি প্রকাশবাবু। ভেতরে যে এতখানি ক্ষয় হয়ে গেছেন আপনারা এতটা বুঝে উঠতে পারিনি। ঊর্মিলা কাঞ্জিলালকে বিয়ে করবেন, সেটা দোষের কিছু নয়। মানুষের ইতিহাসে চিরকাল এ রকম ব্যতিক্রম চলে আসছে। কিন্তু পাপটা কোথায় হলো জানেন? পাপ হলো ঐ ছুতোগুলি—পলিটিক্স, প্রগ্রেস, আদর্শ।

আশুবাবু অস্বস্তিতে কিছুক্ষণ উসখুস করে বললেন—উঠুন ইন্দ্রবাবু।

প্রকাশবাবু—আমি তো বার বার বলছি, উঠুন আপনারা। যে তত্ত্ব আপনাদের বুদ্ধির ধাতে সইবে না, তা নিয়ে বৃথা কথা খরচ করবেন না।

আশুবাবু উষ্মা বোধ করলেন—তত্ত্বটা যে আজ পর্যন্ত মুখ ফুটে বলতে পারলেন না মশাই। তা হলে নয় একবার বুঝতে চেষ্টা করতাম।

প্রকাশবাবু বিদ্রূপের ভঙ্গীতে ঠোঁট কুঞ্চিত করলেন—নানা দেশের সাম্যবাদী সমাজ বিপ্লবের ইতিহাসের পাতাগুলি এক-বার উল্টে দেখবেন।

ইন্দ্রনাথ হেসে ফেললো। আশুবাবু শান্ত-ভাবে চিবিয়ে চিবিয়ে উত্তর দিলেন—একটা পাতা সামনেই খোলা রয়েছে দেখতে পাচ্ছি। টালির নালার জলের চেহারা দেখে ওটাকে ব্রহ্মাকমণ্ডলু নিঃসৃত বারিধারা বলতে বড় বিবেকে বাধে প্রকাশবাবু।

প্রকাশবাবু—এর অর্থ আপনার দৃষ্টিটা নোংরা হয়ে গেছে। যা দেখছেন তা-ই নোংরা মনে হচ্ছে।

ইন্দ্রনাথ—আর আপনারা একেবারে দৃষ্টি হারিয়ে ফেলেছেন।

আশুবাবু—নইলে দেখতে পেতেন যে, আপনাদের কম্যুনিস্ট পার্টি আছে, কিন্তু কম্যুনিজম্ নেই; যেমন জার্মান সিলভারে জার্মানত্ব আছে, সিলভার নেই।

ইন্দ্রনাথ আর আশুবাবুর সৌজন্যহীন বিদ্রূপ প্রশ্ন আর উত্তরের আক্রমণে বিপর্যস্ত হয়েও চেষ্টা করে যেন নিজেকে একটু সংযত করলেন প্রকাশবাবু। একটু ইতস্তত করে আস্তে আস্তে বললেন—কী এমন ব্যাপার হলো যে তুমিও আজ নিঃসঙ্কোচে আমায় অপমান করছো ইন্দ্র-নাথ?

ইন্দ্রনাথের মনের ভেতরটা বেদনায় মোচড় দিয়ে উঠলো। তারই আবাল্য শ্রদ্ধায় মহিমান্বিত একটা মূর্তি যেন হঠাৎ তারই হাতের আঘাতে মাটিতে লুটিয়ে অভিমানে তাকিয়ে আছে তার দিকে। প্রকাশ বাবু তেমনি নিষ্প্রভ চোখে শঙ্কাতুর দৃষ্টি দিয়ে ইন্দ্রনাথকে দেখছিল। আশুবাবুরও কষ্ট হতে লাগলো। তাই অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বসে রইলেন।

ইন্দ্রনাথ বললো।—আপনাকে অপমান করলাম প্রকাশ বাবু, এটা আমার জীবনের প্রথম শাস্তি। চিরদিন আপনার আদেশ নিঃসংশয়ে মেনে চলেছি। কিন্তু আপনি ফুরিয়ে গেছেন, কাজেই আমার একটা ভরসাই ফুরিয়ে গেছে। আপনি থেমে গেছেন, আপনি শ্রান্ত। আপনি নিরুপদ্রব জীবন খুঁজছেন। পলিটিক্স করার শক্তি যোগ্যতা আর উৎসাহ নেই আপনার। কিন্তু পলিটিক্সের অভিমান আপনার বিশ বছরের অভ্যাসে মিশে আছে। তাই এমন একটি পলিটিক্স খুঁজছিলেন, যার মধ্যে কাজ নেই, ত্যাগ নেই, সংগ্রাম নেই। আপনার এই ব্যর্থতাকে মনভোলানো সান্ত্বনা দেবার জন্যই যেন জাগৃতি সঙ্ঘ নামে সংঘটি গড়ে তুলেছেন।

ইন্দ্রনাথের অভিযোগের আবর্তের মধ্যে যেন অসহায়ের মত ভাসছিলেন প্রকাশ বাবু। কোন সাড়া দিচ্ছিলেন না।

ইন্দ্রনাথ বললো,—সব চেয়ে দুঃখের বিষয় কি হলো জানেন প্রকাশ বাবু? কাজকে ফাঁকি দিতে গিয়ে আপনারা পার্টিকে আশ্রম করে ফেললেন। এখন এই আশ্রমিক বিকৃতির গলদকে ঢাকবার জন্য একে একে শুধু নতুন ফাঁকির আশ্রয় নিতে হবে। এইভাবে কোথায় গিয়ে শেষে ঠেকবেন কে জানে। হয়তো হতভাগ্য ভারতবর্ষের সমাজ আর একটা জাত হয়ে উঠবেন আপনারা। আমার শেষ অনুরোধ প্রকাশ বাবু, এই আশ্রমিক প্যাটার্নটি ভেঙে ফেলুন। নইলে দেশের যত অসামাজিক অপরাধীর আশ্রয় হয়ে উঠবে আপনার পার্টি আর সঙ্ঘ।

প্রকাশ বাবু হঠাৎ তাঁর মৌনতা ভেঙে একটু ক্লান্ত ভাবেই বললেন। —অনেকদূর এগিয়ে গেছি, আর ফেরা যায় না।

সূক্ষ্ম একটা আশাভরা ইঙ্গিতের নিশানা

পেয়ে যেন ইন্দ্রনাথ আগ্রহে বলে উঠলো—কেন ফেরা যাবে না প্রকাশবাবু? নিশ্চয় ফেরা যাবে; আপনি শুধু একবার......।

প্রকাশবাবু মুহূর্তের মধ্যে বদলে গিয়ে সপ্রতিভভাবে বললেন—কী আবোল তাবোল বকছো? আমাদের আরও এগিয়ে যেতে হবে।

আশুবাবুর দিকে তাকিয়ে ইন্দ্রনাথ বললো—চলুন আশুবাবু।

ঘর ছেড়ে প্রকাশবাবুর বাসার বাইরে পথের ওপর পেঁৗছে আশুবাবু প্রথম কথা বললেন—কোন্ দিকে যাবেন ইন্দ্রবাবু।

অনামনস্কভাবেই ইন্দ্র উত্তর দিল—যাবার আর কোন পথ নেই।

আশুবাবু সন্দিগ্ধভাবে ইন্দ্রনাথের মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন। প্রচ্ছন্ন কোন বেদনার জ্বালায় যেন ইন্দ্রনাথের মুখটা পুড়ে যাচ্ছে। চোখ দুটো লাল হয়ে ঝলসে উঠেছে। কোন প্রিয়তম আত্মীয়ের চিতাবহ্নি নিভিয়ে যেন এই মাত্র চলে আসছে ইন্দ্রনাথ। সেই শোকের আগুনের আঁচ লেগে মুখটা কালো হয়ে আছে।

আশুবাবু আস্তে আস্তে ডাকলেন—শুনেছেন ইন্দ্রবাবু?

উত্তর দিতে না পেরে ইন্দ্রনাথ একটা নিঃশ্বাসকে গিলতে গিয়ে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিল।

আশুবাবু বললেন—আপনি অবনীনাথের সঙ্গে একবার দেখা করুন ইন্দ্রবাবু।

ইন্দ্রনাথ—সেখানে যাবার সামর্থ্য নেই আশুবাবু।

আশুবাবু উৎসাহিতভাবে চেঁচিয়ে যেন একটু অনুযোগ করলেন—কেন ছেলেমানুষী করছেন ইন্দ্রবাবু। পুরানো কথা নিয়ে মনটা ভারী করে রাখবেন না। মন খারাপ করবেন না।

সাদাসিধে শান্তদর্শন এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক পথ দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ জিজ্ঞাসুভাবে এগিয়ে এলেন—এইটেই কি আঠাশ নম্বর?

আশুবাবু—কাকে খুঁজছেন আপনি?

আগন্তুক ভদ্রলোক বললেন—অটাম স্কুল অব পালিটিক্সের অফিস কি এইটা?

আশুবাবু উত্তর দিলেন—না, এটা প্রকাশ সরকারের বাসা।

আগন্তুক ভদ্রলোক উৎফুল্লভাবে বললেন—হাঁ হাঁ, তাঁকেই খুঁজছিলাম। তিনি হলেন ঐ স্কুলের অধ্যক্ষ।

ইন্দ্রনাথ আর আশুবাবু দুজনেই বিস্মিতভাবে ভদ্রলোকের কথাগুলির মর্মার্থ বুঝবার চেষ্টা করছিল। ভদ্রলোক নিজে থেকেই একটু হৃদ্যতার সুরে বললেন—আমার স্ত্রীও এই স্কুলের টীচার।

ভদ্রলোকের আলাপের রীতির মধ্যে একটা মফঃস্বলসুলভ সঙ্গপ্রিয়তার আভাষ ছিল। ইন্দ্রনাথ তাই কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করলো—আপনার নাম?

ভদ্রলোক—দ্বিজেন্দ্র কাঞ্জিলাল।

ইন্দ্রনাথ আর আশুবাবু পরস্পরের দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণের জন্য একটা বিমূঢ় অবস্থার মধ্যে স্তম্ভিত হয়ে রইল। দ্বিজেন কাঞ্জিলাল তখন আলাপের সূত্রটাকে ভাল করে ধরে কথা বিস্তার করে চলেছিলেন।—আমি আসছি পাবনা থেকে। পাবনা আমার বাড়ি নয়, চাকরীর জন্যই সেখানে থাকি।

আশুবাবু—আর আপনার স্ত্রী?

দ্বিজেনবাবু—উনি আছেন কল্‌কাতায়, এই স্কুলে টীচারী করেন।

ইন্দ্রনাথ—আপনি কল্‌কাতায় হঠাৎ...।

দ্বিজেনবাবু—হ্যাঁ হঠাৎ চলে এসেছি—ছোট মেয়েটিকে নিয়ে; গলায় একটা টিউমারের মত হয়েছে, অপারেশন করাতে হবে। বড় বিব্রত বোধ করছি মশাই। বাপ করবে চাকরী, মা করবে চাকরী—উদরান্নের দাবী মেটাতে গিয়ে আমরা দুজনাই উদ্‌ভ্রান্ত, এ দিকে মেয়েটার অবস্থা কাহিল। তারপর, উনি পড়ে রয়েছেন বিদেশে। হাঁ, আপনারা ওঁর নাম শুনে থাকতে পারেন...।

দ্বিজেনবাবু একটু সতর্কভাবে গলার স্বর নামিয়ে বললেন—উনি দেশের কাজে জেল খেটেছেন একবার, ওঁর নাম ঊর্মিলা কাঞ্জিলাল, নাম শুনেছেন বোধ হয়।

ইন্দ্রনাথ আর আশুবাবু বিমর্ষভাবে উত্তর দিল—হাঁ, তাঁর নাম খুবই শুনেছি আমরা।

দ্বিজেনবাবু কৃতার্থভাবে বললেন—আপনাদের সঙ্গে আলাপ করে বড় উপকৃত হলাম মশাই। এবার আসি। দুঃসংবাদ নিয়ে এসেছি, শুনেই তো মেয়ের মা আঁৎকে উঠবেন। কতদিক সামলাই বলুন। সংসারধর্ম সত্যিই এক ল্যাঠা। বড় বিব্রত বোধ করছি মশাই।

নমস্কার জানিয়ে দ্বিজেনবাবু প্রকাশ-বাবুর বাসার ভেতর ঢুকলেন। আশুবাবু সেইদিকে তাকিয়ে যেন একটা যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠলেন। আর সহ্য হচ্ছে না ইন্দ্রবাবু। চলুন, আর এখানে নয়।

(ক্রমশঃ)

ইন্দ্রনাথ বললো।—ভদ্রলোককে ডেকে বরং বলে দিন যে, ঊর্মিলা কাঞ্জিলাল মারা গেছেন।

আশুবাবু।—যাক্ ওসব কথা। শীগ্‌গির চলুন এখান থেকে, মাথা ঘুরছে আমার।

(ক্রমশ)

খেলাধুলা

বেঙ্গল অলিম্পিক স্পোর্টস্

বেঙ্গল অলিম্পিক এসোসিয়েশন পরিচালিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক অলিম্পিক অনুষ্ঠান সম্প্রতি সম্পন্ন হইয়াছে। বাঙলার প্রায় সকল বিশিষ্ট এ্যাথলীটই এই অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই তুলনায় অধিকাংশ বিষয়ের ফলাফল খুব উচ্চাঙ্গের হয় নাই। তবে পাঁচটি বিষয়ের নূতন রেকর্ড হইয়াছে। এই পাঁচটি বিষয়ের মধ্যে মাত্র একটির রেকর্ড সৃষ্টি করিয়াছেন একজন বাঙালী এ্যাথলীট। অপর সকল বিষয়ের রেকর্ড করিবার গৌরব অবাঙালী এ্যাথলীটগণ লাভ করিয়াছেন। নিম্নে নূতন রেকর্ডের তালিকা প্রদত্ত হইল:—

(১) ১৫০০ **মিটার দৌড়:**—ডি জি পার্সিভ্যাল (সৈন্যদল) ৪ মিঃ ১৪ ২/৫ সেঃ।

(২) **হপ স্টেপ জাম্প:**—পি গডফ্রে (ক্যালকাটা ওয়েস্ট ক্লাব) ৪৪ ফিট দূরত্ব অতিক্রম করেন। ইতিপূর্বে এন সিং (বি এণ্ড রেল) ৪২ ফিট ১ ইঞ্চি অতিক্রম করিয়া রেকর্ড করিয়াছিলেন।

(৩) ৫০০০ **মিটার ভ্রমণ:**—এ কে দত্ত ২৬ মিঃ ১২ ১/৫ সেঃ (নূতন ভারতীয় রেকর্ড); ইতিপূর্বে ইনিই নিখিল ভারত অলিম্পিক অনুষ্ঠানে উক্ত দূরত্ব ২৬ মিঃ ৩০½ সেকেণ্ডে অতিক্রম করিয়া রেকর্ড করিয়াছিলেন।

(৪) ৪০০ **মিটার হার্ডল:**—সি এইচ কং ৫৯ ১/৫ সেকেণ্ডে অতিক্রম করিয়া নূতন রেকর্ড করিয়াছেন। ইতিপূর্বে জি সার্জেণ্ট উক্ত দূরত্ব ১ মিনিটে অতিক্রম করিয়া রেকর্ড করিয়াছিলেন।

(৫) ৪০০ **মিটার দৌড়:**—জি ই হাউইট (ওয়েস্ট ক্লাব) ৫০ ৩/৫ সেকেণ্ডে অতিক্রম করিয়া নূতন রেকর্ড করিয়াছেন। ইতিপূর্বে এফ গ্যাঞ্জার উক্ত দূরত্ব ৫১ ১/৫ সেকেণ্ডে অতিক্রম করিয়া রেকর্ড করিয়াছিলেন।

বাঙলার প্রতিনিধিগণ নির্বাচিত

পাতিয়ালায় শীঘ্রই যে নিখিল ভারত অলিম্পিক অনুষ্ঠান হইবে তাহাতে বাঙলার পক্ষ সমর্থন করিবার জন্য এ্যাথলীট ও খেলোয়াড়গণ নির্বাচিত করা হইয়াছে। এ্যাথলীটদের তালিকা অবলোকন করিলে খুবই দুঃখিত হইতে হয়। কারণ প্রকৃত বাঙালী এ্যাথলীট খুব কম সংখ্যকই এই দলে স্থান পাইয়াছেন। এই অবস্থা যে কত দিনে বিদূরিত হইবে জানি না। নিম্নে নির্বাচিত এ্যাথলীটদের নাম প্রদত্ত হইল:—

এম ফেরন (ক্যালকাটা ওয়েস্ট ক্লাব) ১০০ মিটার ও ২০০ মিটার দৌড়ের জন্য। এম এইচ খাঁ (মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব) ১০০ মিটার ও ২০০ মিটার দৌড়ের জন্য। আর সি মানলে (আর এ এফ) ৩০০০ মিটার ও ৫০০০ মিটার দৌড়ের জন্য। জি হাউইট (ক্যালকাটা ওয়েস্ট ক্লাব) দৈর্ঘ্য লম্ফন, হপস্টেপ জাম্প, হার্ডল ও রিলে। পি গডফ্রে (ক্যালকাটা ওয়েস্ট ক্লাব) হপস্টেপ জাম্প ও দৈর্ঘ্য লম্ফন। এ কে দত্ত (আই এ ক্যাম্প) ভ্রমণের জন্য। আনন্দ মুখার্জি (ক্যালকাটা পুলিশ) পোল ভল্টের জন্য। আর কে মেহেরা (শ শ্বর স্পোর্টিং) সাইকেল রেসের জন্য। জি পার্সিভাল (সৈন্য) ১৫০০ মিটার ০ মিটার দৌড়ের জন্য। জে ফটার (এফ) লৌহ বল ও ডিসকাস্ নি না। এডমাশুস (আর এ এফ) জে ক্ষেপের জন্য। এম এইচ ওয়েদারল ১ ৫০০০ মিটার দৌড়ের জন্য। সি এইচ কং (আই এ ক্যাম্প) হার্ডল রেস্ ও ঊর্ধ্ব লম্ফনের জন্য। এস ম্যাথুজ (জামালপুর) ৪০০ মিটার ও রিলের জন্য। রুস্তম আলী (ক্যালকাটা এ আর পি) উচ্চ লম্ফন জন্য। এম এইচ হোসেন (ক্যালকাটা পুলিশ) বর্শা নিক্ষেপের জন্য। সাজাহান (মহমেডান স্পোর্টিং) ৪০০ মিটার, ৮০০ মিটার ও রিলের জন্য। বি বসু (আই এ ক্যাম্প) অধিনায়ক নির্বাচিত হইয়াছেন।

মাদ্রাজ রণজি ক্রিকেটের সেমি-ফাইন্যালে

মাদ্রাজ ক্রিকেট দল রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার সেমি-ফাইন্যালে উন্নীত হইয়াছে। বর্তমানে এই দলকে সেমি-ফাইন্যালে বাঙলার দলের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে হইবে। এই খেলাটি আগামী ১৯শে ফেব্রুয়ারী হইতে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত হইবে বলিয়াই শোনা যাইতেছে। এই পর্যন্ত রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার বিভিন্ন খেলায় মাদ্রাজ দল যেরূপ খেলিয়াছে, তাহাতে এই দলকে খুব শক্তিশালী দল বলা চলে না। এই দলের অনন্তনারায়ণ ও রাম সিং ব্যতীত অপর কোন খেলোয়াড়কে এই পর্যন্ত কোন খেলায় ব্যাটিংয়ে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতে দেখা যায় নাই। পার্থসারথী, গোপালন্ প্রভৃতি ব্যাটস্‌ম্যানগণ পূর্বের ন্যায় আর খেলিতে পারিতেছেন না। বোলারের অভাবও এই দলে বিশেষভাবে অনুভূত হইতেছে। কানন, রঙ্গচারী প্রভৃতি দলে আছেন সত্য, কিন্তু তাঁহাদের এই পর্যন্ত কোন খেলায় অসাধারণ কিছু করিতে দেখা যায় নাই। সেইজন্য ধারণা হয়, রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার সেমি-ফাইন্যাল খেলায় মাদ্রাজ দলকে পরাজিত করিতে বাঙলা দলকে বিশেষ বেগ পাইতে হইবে না। ক্রিকেট খেলার ফলাফল সম্পর্কে পূর্ব হইতে কিছুই সঠিক করিয়া বলা চলে না। তবে এই কথা ঠিক যে, বাঙলার খেলোয়াড়গণ হোলকার দলের বিরুদ্ধে যেরূপ দৃঢ়তার সহিত খেলিয়াছিলেন, যদি এই খেলাতেও সেইরূপ খেলিতে পারেন, মাদ্রাজ দলের পক্ষে বাঙলার বিজয়ের পথ রোধ করা খুবই কঠিন হইবে।

মাদ্রাজ দল দক্ষিণাঞ্চলের ফাইন্যাল খেলায়

হায়দরাবাদ দলের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া প্রথম ইনিংসের ফলাফলে বিজয়ী হইয়াছেন। এই খেলাটি সেকেন্দ্রাবাদে অনুষ্ঠিত হয়। মাদ্রাজ দল প্রথম ব্যাটিং লাভ করেন ও ৩৪৯ রানে ইনিংস শেষ করেন। এই দলের তরুণ খেলোয়াড় অনন্তনারায়ণ একা ১০১ রান করিয়া ব্যাটিংয়ে কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। পরে হায়দরাবাদ দল খেলিয়া প্রথম ইনিংসে মাত্র ১৮৩ রান করিতে সক্ষম হয়। মাদ্রাজ দল দ্বিতীয় ইনিংস ১৯১ রানে শেষ করে। তখন হায়দরাবাদ দল দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে। কিন্তু এই ইনিংসের খেলা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শেষ করা হয় না। খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়। রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার তিনদিনব্যাপী খেলার নিয়মানুসারে মাদ্রাজ দল প্রথম ইনিংসে অগ্রগামী থাকায় খেলায় জয়লাভ করেন। নিম্নে খেলার ফলাফল প্রদত্ত হইল—

মাদ্রাজ প্রথম ইনিংস—৩৪৯ রান (অনন্তনারায়ণ ১০১, রাম সিং ৮৯, গোপালন্ ৩১; মেটা ৯৩ রানে ৫টি ও গোলাম আমেদ ৯৯ রানে ৩টি উইকেট পান)।

হায়দরাবাদ প্রথম ইনিংস—১৮৩ রান (আসঘর আলী ৭০, গোলাম আমেদ ২৮; রঙ্গচারী ৬৪ রানে ৫টি উইকেট পান)।

মাদ্রাজ দ্বিতীয় ইনিংস—১৯১ রান (রাম সিং ৫৯, মেটা ৫০ রানে ৬টি উইকেট পান)।

হায়দরাবাদ দ্বিতীয় ইনিংস—২ উইকেটে ১৬১ রান (আঘর আলী ৭৮, আসাদুল্লা ৫৭)।

যশোহর উইংগেট কাপ বিজয়ী বেংগলী বক্সিং এসোসিয়েশনের মুষ্টিযোদ্ধাগণ ও পরিচালকগণ

দক্ষিণ পাঞ্জাব ক্রিকেট দল বিজয়ী

রনজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার উত্তরাঞ্চলের খেলায় দক্ষিণ পাঞ্জাব ক্রিকেট দল শোচনীয়ভাবে এক ইনিংস ও ২০১ রানে দিল্লী দলকে পরাজিত করিয়াছে। দক্ষিণ পাঞ্জাব দলের পক্ষে খেলিয়া অমরনাথ ব্যাটিং ও বোলিং উভয় বিষয়েই কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। অমরনাথের খেলা পড়িয়া গিয়াছে বলিয়া যে গুজব সম্প্রতি রটিয়াছিল তাহা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত বলিয়াই এই খেলায় প্রমাণিত হইয়াছে।

সাপ্তাহিক সংবাদ

২৫শে জানুয়ারী

অদ্য জার্মান ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, কার্চে রুশ সৈন্যদের চাপ বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং ট্যাঙ্ক ও বিমানের সাহায্যে তাহারা এখনও আক্রমণ চালাইয়াছে।

অদ্য সেক্রেটারিয়েটে এক সাংবাদিক সম্মেলনে অসামরিক সরবরাহ সচিব মিঃ এইচ এস সুরাবর্দি কলিকাতায় রেশনিং ব্যবস্থা সম্পর্কে জানান যে, একজন বয়স্ক ব্যক্তির চাউল এবং গম অথবা গমজাত দ্রব্যের মিলিত সাপ্তাহিক বরাদ্দ বৃদ্ধি করিয়া সাড়ে তিন সের হইতে চারি সের ধার্য করার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। মিঃ সুরাবর্দি বলেন যে, এতাবৎ ৴৩॥ সের বরাদ্দ ছিল, তন্মধ্যে কোন ব্যক্তি চাউল সর্বোচ্চ পরিমাণে ৴২ সের এবং অবশিষ্ট ৴১॥ সের গমজাত দ্রব্য লইতে পারিতেন। কেহ ইচ্ছা করিলে তিনি তাঁহার বরাদ্দ সবটাই গমজাত দ্রব্য লইতে পারিতেন। কিন্তু সরকার এখন বরাদ্দ বৃদ্ধি করিয়া ৴৪ সের করিয়াছেন এবং চাউলের সর্বোচ্চ পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া ৴২॥ সের এবং গমজাত দ্রব্যের সর্বোচ্চ পরিমাণ ৴৩॥ সের ধার্য করিয়াছেন।

জলগাঁও সিটির প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট জলগাঁওয়ে হিন্দী কমিউনিস্ট পার্টির সেক্রেটারী সদাশিবনারায়ণ ভালেরাও-এর প্রতি মুক্তির আদেশ দেওয়ায় বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে যে আপীল করিয়াছিলেন, অদ্য বোম্বাই হাইকোর্ট তাহা খারিজ করিয়া দিয়াছেন। রায়ে এই মন্তব্য করা হইয়াছে যে, কোন গবর্নমেণ্ট সম্পর্কে তিরস্কার বা নিন্দাত্মক ভাষা প্রয়োগ করিলেই তাহা রাজদ্রোহ হয় না।

বেরিলীর সিটি ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ বি এল চতুর্বেদী ভারতরক্ষা আইনের ৮১ বিধি অনুসারে যুক্তপ্রাদেশিক খাদ্যশস্য নিয়ন্ত্রণ আদেশের (১৯৪৩) ৩নং ও ৫নং ধারা অমান্য করিবার অপরাধে কলিকাতার কোন চাউল ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের এজেণ্ট মির্জা আব্দুল ওয়াহাবকে ছয়মাস সশ্রম কারাদণ্ড ও পাঁচশত টাকা অর্থদণ্ড, অনাদায়ে আরও তিনমাস সশ্রম কারাদণ্ডে এবং তাঁহার ভৃত্য আব্দুল সকুরকে তিনমাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

২৬শে জানুয়ারী

মিত্রপক্ষের উত্তর আফ্রিকাস্থিত রয়টারের বিশেষ সংবাদদাতা জানাইতেছেন যে, মার্কিন পঞ্চম আর্মির টহলদার সৈন্যদল কাসিনো শহরে প্রবেশ করিয়াছে। এতদ্দ্বারা হয়তো জার্মানদের ইতালির দক্ষিণ রণাঙ্গন ত্যাগের পূর্বাভাষ সূচিত হইতেছে। এক্সিস সূত্রে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, মার্শাল কেসেলরিং-এর গুরুত্বপূর্ণ যোগপথসমূহ অতিক্রম করিয়া মিত্র বাহিনী আগাইয়া চলিয়াছে এবং এই অগ্রগতির পথে অবস্থিত লিত্তোরিয়া ও আপ্রিলিয়া অধিকারের জন্য অদ্য ঘোরতর সংগ্রাম শুরু হইয়াছে।

মস্কোর সংবাদে প্রকাশ, সরকারীভাবে ঘোষিত হইয়াছে যে, লালফৌজ গার্টসিনা অধিকার করিয়াছে। গার্টসিনা লেনিনগ্রাদের ২০ মাইল দক্ষিণে এবং টসনোনার্ভা ও লেনিনগ্রাদ-লুগা রেল লাইন এখানে মিলিত হইয়াছে।

জার্মানদের মূল লেনিনগ্রাদ অবরোধ ব্যূহে গার্টসিনা তাহাদের অন্যতম প্রধান ঘাঁটি ছিল।

ওয়াশিংটনের সংবাদে প্রকাশ, সরকারীভাবে ঘোষিত হইয়াছে যে, সোভিয়েট রাশিয়া রুশ-পোল বিবাদ সম্পর্কে আমেরিকার মধ্যস্থতা করার প্রস্তাব মানিয়া লইতে অসম্মত হইয়াছে।

২৭শে জানুয়ারী

মস্কোর সংবাদে প্রকাশ, লেনিনগ্রাদ এক্ষণে সম্পূর্ণরূপে জার্মান-অবরোধমুক্ত হইয়াছে।

মিত্রপক্ষের ইস্তাহারে প্রকাশ, রোমের দক্ষিণে যে মার্কিন ও বৃটিশ সৈন্যদল অবতরণ করিয়াছিল, তাহাদের শক্তি বৃদ্ধি করা হইয়াছে এবং মিত্রপক্ষীয় সৈন্যদল স্থানে স্থানে অগ্রসর হইয়া উপকূল অঞ্চলে তাহাদের অবস্থার উন্নতি করিয়াছে। আরও দক্ষিণে ফরাসী সৈন্যদল পঞ্চম আর্মি রণাঙ্গনে একটি গুরুত্বপূর্ণ টিলা দখল করিয়াছে।

আজ বার্মিংহামে ভারতের স্বাধীনতা দিবস প্রতিপালন উপলক্ষে এক সভায় বক্তাগণ মিঃ আমেরীকে ভারত সচিবের পদ হইতে অপসারিত করার দাবী জ্ঞাপন করেন। সভাটি মিঃ আমেরী যে নির্বাচন কেন্দ্র হইতে নির্বাচিত হইয়াছেন, সেই কেন্দ্রেই হয়।

অসামরিক সরবরাহ সচিব মিঃ সুরাবর্দি এক সাংবাদিক বৈঠকে ঘোষণা করেন যে, শীঘ্রই সমগ্র বাঙলায় রেশনিং প্রবর্তিত হইবে।

আসামের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শ্রীযুক্ত গোপীনাথ বরদলৈকে আসাম-সরকার ভগ্নস্বাস্থ্যের দরুণ গতকল্য গৌহাটি জেল হইতে মুক্তি দিয়াছেন।

২৮শে জানুয়ারী

মস্কোর সংবাদে প্রকাশ, লেনিনগ্রাদ অঞ্চলের ১০ লক্ষ এক্সিস সৈন্যের এক-তৃতীয়াংশকে বিচ্ছিন্ন ও ধ্বংস করার চেষ্টায় লালফৌজ এক্ষণে তাহাদের ব্যাপক অভিযানে লুগা হইতে মাত্র ২৮ মাইল দূরে রহিয়াছে। লালফৌজের অবরোধ-জাল বিস্তৃত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশ আরও অধিকসংখ্যক জার্মান ডিভিসনের বিপদ বৃদ্ধি পাইতেছে। ইতিপূর্বে লালফৌজের অভিযানে এই অঞ্চলের প্রায় দেড় লক্ষ জার্মান সৈন্য বিপদাপন্ন হয়, কিন্তু এক্ষণে প্রায় তিন লক্ষ এক্সিস সৈন্য বিপদে পড়িয়াছে।

আলজিয়ার্সের সংবাদে প্রকাশ, রোমের দক্ষিণে মিত্রপক্ষের সেতুমুখ আরও সম্প্রসারিত হইয়াছে এবং সমুদ্রপথে নূতন নূতন সৈন্য আমদানী করিয়া মিত্রপক্ষের শক্তি বৃদ্ধি করা হইতেছে। ক্যাসিনোর উত্তরে প্রচণ্ড সংগ্রাম চলিতেছে এবং জার্মান মাইনক্ষেত্র পার হইয়া মিত্র বাহিনী ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে।

ভারত সরকারের পক্ষ হইতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যা শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডুর উপর এক আদেশ জারী করা হইয়াছে। উক্ত আদেশে শ্রীযুক্তা নাইডুকে ভারতের কোন স্থানে জনসভা ও মিছিলাদিতে যোগদান না করিতে অথবা সংবাদপত্রে বিবৃতি না দিতে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

সিন্ধু সরকার সিন্ধুর ব্যবস্থা পরিষদে কংগ্রেসী দলের নেতা শ্রীযুত আর কে সিদ্ধকে মুক্তির আদেশ দিয়াছেন।

মেদিনীপুরের কংগ্রেস নেতা শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ দাস মুক্তিলাভ করিয়াছেন।

২৯শে জানুয়ারী

মস্কোর সংবাদে প্রকাশ, রুশ বাহিনীর পুরোভাগে অবস্থিত সৈন্যদল এস্তোনিয়ার নার্ভা হইতে ত্রিশ মাইলের কম দূরে রহিয়াছে। অদ্য তাহারা বল্টিক রাষ্ট্রসমূহের ঐ প্রবেশ-পথ অভিমুখে ধাবিত হইয়াছে। ভোলখভ রণাঙ্গনে সোভিয়েট সৈন্যগণ আক্রমণ চালাইয়া টোস্নো এবং লুবান শহর ও রেল ষ্টেশন দখল করে। ফলে মস্কো হইতে লেনিনগ্রাদ পর্যন্ত অক্টোবর বিপ্লবের স্মৃতিচিহ্ন অক্টোবর রেলপথটি এক চুডোভো ছাড়া সমগ্র রেলপথটিই শত্রু কবলমুক্ত হইল।

ওয়াশিংটনে বৃটিশ দূত লর্ড হ্যালিফাক্স ভারতে বৃটিশ নীতি সমর্থন করিয়া এক বক্তৃতায় বলেন যে, আটলাণ্টিক সনদ রচিত হইবার অনেক আগেই বৃটিশ গভর্নমেণ্ট ভারতে আটলাণ্টিক সনদের নীতি প্রয়োগ করে।

৩০শে জানুয়ারী

হের হিটলার তাঁহার ক্ষমতা অধিকারের একাদশ বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে জার্মান জাতির উদ্দেশ্যে এক বেতার ঘোষণায় বলেন, "একটা কথা সুনিশ্চিত যে, বর্তমান যুদ্ধে একটি মাত্র শক্তিই বিজয়লাভ করিবে। সে শক্তি হয় সোভিয়েট রুশিয়া, আর না হয় জার্মানী। জার্মানীর জয়ের অর্থ ইউরোপ রক্ষা, আর রুশিয়ার জয়ের অর্থ ইউরোপের ধ্বংস।"

মস্কোতে সরকারীভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, চুডোভো অধিকৃত হইয়াছে। ইহার ফলে লেনিনগ্রাদ-মস্কো রেলপথ এক্ষণে সম্পূর্ণ জার্মান কবলমুক্ত হইল।

৩১শে জানুয়ারী

কলিকাতা এবং হাওড়া, বালী-বেলুড়, গার্ডেনরীচ, সাউথ সুবার্বন ও টালীগঞ্জ—এই পাঁচটি মিউনিসিপ্যালিটির এলাকায় রেশন-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়াছে। উপরোক্ত সমগ্র অঞ্চলে রেশন বিতরণের জন্য ৪৫০টি সরকারী দোকান, [illegible]০০টি বে-সরকারী দোকান এবং ৭০০টি মালি[illegible]দের দোকানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। [illegible]সরকারী দোকানগুলির মধ্যে ৪০০টি কলিক[illegible] অবস্থিত। কলিকাতায় সরকারী দোকানের [illegible] ৪৫০টি।

সম্পাদকঃ শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন

সহকারী সম্পাদকঃ শ্রীসাগরময় ঘোষ

১১ বর্ষ । শনিবার, ২৯শে মাঘ, ১৩৫০ সাল। Saturday, 12th February, 1944 [১৪শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

লিকাতায় রেশনিং

দুই সপ্তাহ হইতে চলিল কলিকাতায় রশনিং প্রবর্তিত হইয়াছে। ৩০ লক্ষ লাকের জন্য বরাদ্দ-প্রথায় খাদ্য-ব্য সরবরাহ এবং সুপরিচালিতভাবে তাহার ণ্টন ব্যাপারটি যেমন ব্যাপক, তেমনই টিল ও গুরুত্বপূর্ণ। এমন ব্যবস্থায় প্রথম থম কিছু দোষ-ত্রুটি দেখা দিবেই, ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে সেগুলি ধরা ড়ে এবং সেগুলির প্রতিকার সাধন সম্ভব য়, ইহাই স্বাভাবিক। সকলের জন্য ই ব্যবস্থা, সুতরাং এতৎসম্পর্কিত ায়িত্বও সকলের। ইহা উপলব্ধি করিয়া কাজে জনসাধারণের সহযোগিতা যেমন াবশ্যক, সেইরূপ সেই সহযোগিতা লাভের নুকূল প্রতিবেশ সৃষ্টির উপযোগী ্যবস্থা অবলম্বন এবং তৎসম্পর্কিত দায়িত্ব বষয়ে কর্তৃপক্ষের সচেতন থাকা তমনই প্রয়োজন। রেশনিং সম্পর্কে ানা বিষয়ে অসুবিধার অভি-যাগের কথা আমরা এখনও শুনিতে পাইতেছি। আমরা শুনিতেছি যে, একই রিবারের অধিকাংশ লোক কার্ড পাইয়াছে, কিন্তু দুই একজন বাদ পড়িয়াছে; নূতন লোকের পক্ষে এ সমস্যা তো আছেই। আমাদের মনে হয়, কর্তৃপক্ষ যদি এ সম্পর্কে জনসাধারণের সমধিক সহযোগিতা গ্রহণ করিতেন, তবে এ কাজ অনেকটা সহজ হইত। কলিকাতার বিভিন্ন অঞ্চলের পল্লীতে যেসব জনরক্ষা সমিতি এবং তৎসংশ্লিষ্ট ফুড কমিটি আছে, তাহার কর্মিগণ এ কাজে তাঁহাদিগকে সাহায্য করিতে পারেন এবং তাঁহাদের সাহায্য পাইলে কার্ড বিলি করিবার কাজ সহজ হয় এবং তৎসংশ্লিষ্ট অভিযোগের অবিলম্বে প্রতিকার করা সম্ভব হইতে পারে। ইহা ছাড়া পল্লীর অধিবাসীদের এইভাবে সহযোগিতার ফলে দোকান সম্পর্কিত অসুবিধা এবং অভিযোগের কারণও সহজে দূর হইতে পারে। পল্লীর কর্মিগণ দোকানী এবং জনসাধারণের মধ্যে আত্মীয়তার ভাব গড়িয়া তুলিতে পারেন এবং সেই উপায়ে সকল দিকে একটি আস্থা-পূর্ণ আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়। এই ধরণের ব্যবস্থার সাফল্য প্রধানত এমন আস্থার ভাবের উপরই নির্ভর করে। আমরা এই দিকের প্রয়োজনীয়তার প্রতি কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। এদেশের তরুণেরা জনসাধারণের সেবার জন্য সর্বদাই উন্মুখ এবং জনসাধারণও অফিসের কেতা বা কায়দায় সম্পূর্ণ অভ্যস্ত নহে। সেক্ষেত্রে তাহাদের একটা সঙ্কোচ ভয়ের ভাব সাধারণত থাকেই; এই জন্যই এইরূপ ব্যবস্থা সার্থক করিতে হইলে জন-সেবক কর্মীদের সহযোগিতা লাভ আমরা সর্বপ্রথমে প্রয়োজন বলিয়া মনে করি।

সাধারণ অভিযোগ

রেশনিংয়ের চাউলের সম্বন্ধেই বর্তমানে সর্বপ্রধান অভিযোগ দেখা যাইতেছে। বরাদ্দ-প্রথার জন্য নির্দিষ্ট দোকানগুলিতে হরেক রকম চাউল আসিয়াছে; এ সমস্যা থাকিবেই; কারণ চাউল আটা ময়দার মত পিণ্ট বা চূর্ণ প[illegible] নয়, ইহার শ্রেণীগত ইতর বিশেষ থাকে[illegible] কিন্তু তাহা এক্ষেত্রে প্রধান বিবেচ্য নয়; [illegible] ব্যাপারে একই ধরণের চাউল সব[illegible] [illegible]ব সময়ে সর-বরাহ করা হইবে, এরূপ [illegible]শ্চয়তা দান করাও কঠিন; ইহা বুঝি, [illegible]বে চাউল সরু

হউক কিংবা মোটা হউক—যাহাতে স্বাস্থ্যহানিকর জিনিস না হয়, তৎপ্রতি কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। দেববিগ্রহের সেবার বিশেষ বরাদ্দ করা হইয়াছে। কিন্তু হিন্দু বিধবাদের জন্য কোন বিশেষ ব্যবস্থা এখনও হয় নাই। আমাদের মতে, কর্তৃপক্ষ বর্তমান ব্যবস্থার বিশেষ পরিবর্তন না করিয়াও এই অভিযোগের প্রতিকার স্বচ্ছন্দেই করিতে পারেন ; কারণ দেখা যাইতেছে, চাউল সরবরাহের পক্ষে অভাব তাঁহাদের কিছুই ঘটিবে না এবং তাঁহারা যে চাউল সরবরাহ করিতেছেন, তাহা সাধারণত আতপ চাউল। নির্দিষ্টভাবে হিন্দু বিধবাদের জন্য কিছু পরিমাণে এই চাউলের বরাদ্দ-ব্যবস্থা সহজেই করা যাইতে পারে ; হিন্দু পরিবারের বিধবাদের জন্য তাঁহারা যে চাউল সরবরাহ করিবেন, তৎসম্পর্কে পরিমাণ বৃদ্ধির কোন প্রশ্ন উঠে না ; কারণ, এই সব বিধবা বরাদ্দ-ব্যবস্থার মধ্যে পড়িবেনই ; সুতরাং তাঁহাদের জন্য চাউল সরবরাহ কর্তৃপক্ষকে করিতেই হইবে ; শুধু তাঁহাদিগের জন্য কিছু আতপ চাউলের নির্দিষ্টভাবে ব্যবস্থা রাখা। সে চাউলের অপ্রতুলতা ঘটিবার কোন আশংকাই নাই। আমরা দেখিয়া সুখি হইলাম, কর্তৃপক্ষ দেববিগ্রহ সেবার জন্য বরাদ্দ-ব্যবস্থা করিতে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন; আশা করি, হিন্দু বিধবাদের জন্যও তাঁহারা নির্দিষ্টভাবে আতপ চাউলের ব্যবস্থা করিবেন। সপ্তাহের বরাদ্দ একবারে গ্রহণ করিতে অনেকের অসুবিধা হইতেছে, আমরা এই অভিযোগ পাইতেছি ; সতাই একসঙ্গে টাকার যোগাড় করা, যাহারা দিন আনে দিন খায়, তাহাদের পক্ষে কঠিন। সপ্তাহে দুইবার দিবার ব্যবস্থা করিলেই এই অসুবিধা দূর হইতে পারে। এসব দিক বিবেচনা করিলে দোকানের সংখ্যা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তাও কর্তৃপক্ষ সহজেই উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইবেন।

বিক্রয়কর বৃদ্ধির প্রস্তাব

বাঙলা সরকারের ১৯৪৪-৪৫ সালের বাজেটে এবার অনেক টাকা ঘাটতি পড়িবে। এই ঘাটতি পূরণের জন্য বাঙলা সরকার বিক্রয়কর বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সম্প্রতি একটি আইন জনমতের বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও নিজেদের পক্ষের ভোটের জোরে পরিষদে পাশ করাইয়া লইয়াছেন। কিন্তু [illegible]তে এই বিধান অবলম্বনের যুক্তিযুক্ততা প্রতিপন্ন হয় না। বর্তমানে বিক্রয়কর টাকায় তিন পাই হিসাবে আর নূতন ব্যবস্থায় ইহা বৃদ্ধি করিয়া ৬ পাই অর্থাৎ দ্বিগুণ করা হইল। বাঙলা সরকারের বর্তমান বৎসরে ঘাটতি পড়িবে, ইহা অনুমান করা কঠিন নয় ; কারণ, বাঙলাদেশের উপর দিয়া যে বিপর্যয় গিয়াছে, তাহার প্রতিকার করিতে সরকারকে অনেক টাকা ব্যয় করিতে হইয়াছে। দুর্ভিক্ষজনিত সমস্যার সমাধানের জন্য সরকারকে এ পর্যন্ত ১১৷৷ কোটি টাকা ব্যয় করিতে হইয়াছে বলিয়া আমরা শুনিতেছি ; এবং সে সমস্যার এখনও সম্যক সমাধান হইয়াছে বলা যায় না ; আগামী কয়েক মাসে তজ্জন্য আরও অনেক টাকা খরচ করিতে হইবে। ইহা ছাড়া বিপর্যস্ত দেশের সামাজিক পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে বিপুল অর্থের প্রয়োজন রহিয়াছে। বিক্রয়কর বৃদ্ধির দ্বারা সেই বিপুল অর্থের প্রয়োজন সিদ্ধ হওয়া সম্ভব নহে। বর্তমান বৎসরের বাজেটে দেখা যাইতেছে, বিক্রয়কর হইতে তাঁহাদের ৯০ লক্ষ টাকা আয় হইয়াছে। সরকারী কর-বৃদ্ধির প্রস্তাবে এই পরিমাণের দ্বিগুণ, অর্থাৎ ইহার উপর এক কোটি টাকা আয় বাড়িতে পারে মাত্র। সুতরাং প্রয়োজনের তুলনায় এই আয় বৃদ্ধি কিছুই নয়। এরূপ ক্ষেত্রে ভারত গভর্নমেণ্টের সাহায্য ব্যতীত বাঙলার এই আর্থিক সমস্যার সমাধান হইবার কোন সম্ভাবনাই দেখা যায় না। নূতন ব্যবস্থায় বিক্রয়কর বৃদ্ধির ফলেও সমস্যা মিটিবে না, পক্ষান্তরে অনেক দিক হইতে এই সমস্যা সমধিক জটিল আকার ধারণ করিবে বলিয়াই আমরা মনে করি।

দরিদ্রের সংকট

আজকাল কর-বৃদ্ধি করিবার সকল যুক্তির সার হইয়াছে মুদ্রাস্ফীতির যুক্তি। বাঙলার অর্থসচিব বিক্রয়-কর বৃদ্ধির প্রস্তাবের সমর্থনে এই মুদ্রাস্ফীতির মামুলী যুক্তি উপস্থিত করিয়াছেন। তিনি দেখাইতে চাহিয়াছেন যে, দরিদ্রের উপর এই কর-বৃদ্ধির চাপ পড়িবে না ; পড়িবে, যুদ্ধের দৌলতে যাঁহাদের মুদ্রার ভার পরিস্ফীত হইয়াছে, তাঁহাদের উপর। এতদর্থে সরকার তাঁহাদের প্রস্তাব উপস্থিত করিবার বেলায় যেসব দ্রব্যের উপর কর ধার্য হইবে না, তাহার একটি তালিকা দিয়াছিলেন—এই তালিকায় কাপড়ের কথাও ছিল। কিন্তু আমাদের এ সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, কোন্ জিনিসের দাম বাড়ে নাই এবং সেই মূল্যবৃদ্ধিজনিত চাপ কয়জনের উপর পড়িতেছে না ? বর্তমান বিপর্যয়ে বাঙলাদেশের যাঁহারা মধ্যবিত্ত পরিবার, তাঁহারাও আজ দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছেন। বিক্রয়কর বৃদ্ধির এই আইন বলবৎ হইলে দেশের বিপুল জনসাধারণের দুর্দশা অধিকতর ব্যাপক হইয়া পড়িবে। অথচ এই কর-বৃদ্ধিজনিত আয়ের দ্বারা বাঙলার জটিল আর্থিক সমস্যারও কিছুই প্রতিকার হইবে না ; সুতরাং ইহা অনর্থক হইবে, এই কথাই বলিতে হয়। আমাদের মতে, এসব বিবেচনা করিয়া এই কর-বৃদ্ধির প্রস্তাব হইতে প্রতিনিবৃত্ত হওয়াই সরকারের পক্ষে উচিত ছিল।

শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু

শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু গত ৩রা ফেব্রুয়ারী কলিকাতায় আগমন করেন; পাঁচ দিন অবস্থান করিবার পর তিনি বোম্বাইতে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। শ্রীযুক্তা নাইডু বিশ্বের সুধীসমাজের সুপরিচিতা। বাঙলার বর্তমান এই সংকটকালে তিনি দেশের সংগঠন কার্যে অনেক সাহায্য করিতে পারিতেন। এ সম্পর্কে তাঁহার আহ্বান একদিকে যেমন দেশবাসীকে অনুপ্রাণিত করিয়া তুলিত; সেইরূপ অন্যদিকে বাঙলার প্রকৃত অবস্থার প্রতি বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিত; ইহাতে বাঙলার বর্তমান দুরবস্থার প্রতিকার সাধনের কাজ সহজ হইত ; কিন্তু তাঁহার উপর ভারত সরকার হইতে এই নিষেধাজ্ঞা জারী করা হইয়াছে যে, তিনি ভারতবর্ষের কোন স্থানে কোনও জনসভায় ও শোভাযাত্রায় যোগদান করিতে পারিবেন না ; অথবা সংবাদপত্রে প্রকাশার্থ কিছু দিতে পারিবেন না; এই নিষেধাজ্ঞা জারীর ফলে বাঙলার রাজধানী কলিকাতা আসিয়া শ্রীযুক্তা নাইডুর পক্ষে বাঙলা দেশের বর্তমান দুর্দশার প্রতিকারের জন্য প্রকৃতপক্ষে তেমন কোন কাজ করা সম্ভব হয় নাই। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যাদিগের মধ্যে শ্রীযুক্তা নাইডুই বর্তমানে কারাগারের বাহিরে আছেন। ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের যদি ইচ্ছা থাকিত, ভারতের বর্তমান রাজনীতিক অচল অবস্থা সমাধানের পথে তাহারা তাঁহার সাহায্য পাইতেন; কিন্তু ভারত গভর্নমেণ্টের আদেশের ফলে রাজনীতির ক্ষেত্রে তো দূরের কথা—অ-রাজনৈতিক কোন ব্যাপারেও শ্রীযুক্তা নাইডুর পক্ষে কোন কাজ করিবার সুযোগ রাখা হয় নাই। এ সম্বন্ধে ভারত গভর্নমেণ্টের স্বরাষ্ট্র-সচিব সম্প্রতি কেন্দ্রীয় পরিষদে যে কৈফিয়ৎ দিয়াছেন, তাহাতে আমরা সন্তুষ্ট হইতে পারি নাই। দুর্গত বাঙলা দেশের পক্ষে শ্রীযুক্তা নাইডুর প্রতি ভারত গভর্নমেণ্টের নিষেধাজ্ঞা জারীর স্মৃতি বেদনাদায়ক হইয়া থাকিবে। কারণ, ভারত সরকারের ঐ নিষেধাজ্ঞার জন্য অ-রাজনৈতিক ভাবেও শ্রীযুক্তা নাইডু বাঙলার পক্ষে কোন কথা প্রকাশ করিতে সমর্থ হইতেছেন না।

গরু-মহিষ রক্ষার ব্যবস্থা

সেনাদলের খাদ্য সরবরাহের প্রয়োজনে বাঙলা দেশে গবাদি পশু ক্রয় এবং হত্যা যথাসম্ভব নিয়ন্ত্রিত করা উচিত এই মর্মে একটি প্রস্তাব সম্প্রতি বাঙলার ব্যবস্থা পরিষদে গৃহীত হইয়াছে। দেশের অবস্থা সম্বন্ধে যাঁহারা অভিজ্ঞ তাঁহারা জানেন কয়েক বৎসরের মধ্যে নানা কারণে বাঙলাদেশে গবাদি পশুর সংখ্যা দ্রুত হ্রাস পাইতেছে। বরিশাল প্রভৃতি কয়েকটি জেলায় কিছু দিন পূর্বে গোমড়কে বহু পশু ধ্বংস হইয়াছে; গত বৎসর মেদিনীপুর এবং দামোদরের বন্যায় অনেক পশু নষ্ট হইয়াছে; তারপর দুর্ভিক্ষের ফলে বহু গরু-মহিষ মরিয়াছে—এই সঙ্গে সেনাদলের টানও রহিয়াছে। গবাদি পশুর অভাবের জন্য বর্তমানে বাঙলা দেশে খাদ্য-সমস্যা এবং কৃষি সমস্যা গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছে। পল্লী গ্রামের অধিকাংশ স্থানে যেসব জায়গায় ছয় পয়সা বা বড় জোর দুই আনা সের দুগ্ধ বিক্রয় হইত, এখন সেসব স্থানে দুগ্ধের সের পাঁচ আনা, ছয় আনায় উঠিয়াছে। ঘৃত ছানা এতকাল কলিকাতার ন্যায় শহরেই দুর্লভ ছিল, কিন্তু এখন মফঃস্বলেও তাহা সমভাবেই দুর্লভ। আমরা আশা করি, পরিষদে এই প্রস্তাব পরিগৃহীত হইবার পর গভর্নমেণ্ট এ সম্বন্ধে জনমতের গভীরতা উপলব্ধি করিবেন এবং বাঙলা দেশের বলদ এবং গাভী ও মহিষ প্রভৃতি হত্যা নিয়ন্ত্রণে অধিকতর মনোযোগী হইবেন।

পুনর্গঠনের পরিকল্পনা

দুর্ভিক্ষজনিত বিপর্যয় হইতে বাঙলার পল্লীকে রক্ষা করিয়া সামাজিক সংস্থিতি পুনঃপ্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে শ্রীযুত সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয় একটি পরিকল্পনা উপস্থিত করিয়াছেন। সতীশবাবুর পরিকল্পনার মর্ম এই যে, প্রত্যেকটি গ্রামকে নিজের নিজের প্রয়োজনীয় বিষয় সম্পর্কে আত্মস্বতন্ত্র করিয়া তুলিতে হইবে এবং জেলা বা মহকুমায় এই গ্রামগুলির এক একটি কেন্দ্রীয় সঙ্ঘ থাকিবে। ঐ কেন্দ্র হইতে গ্রামগুলির খাদ্য, ঔষধ, পরিচ্ছদ, যানবাহন, চিকিৎসক ইত্যাদি সরবরাহ করা হইবে। সতীশবাবুর প্রস্তাবিত পরিকল্পনার মধ্যে খুব জটিলতা নাই, ইহা সহজ এবং সরল। তাঁহার মতে, ১০ হইতে ১৫ হাজার টাকার মধ্যেই এক একটি গ্রামকে আত্মস্বতন্ত্র করা সম্ভব হইতে পারে এবং পল্লীর বৃত্তিজীবী শ্রেণীকে এই পথে সঞ্জীবিত করিয়া তোলা সম্ভব হয়। সতীশবাবুর পরিকল্পনার মূলবস্তু হইল সেবার ভাব লইয়া কার্য করিবার প্রবৃত্তি; ইহা জাগাইতে হইলে ত্যাগব্রতী কর্মীদের সর্বাগ্রে প্রয়োজন। বাঙলার বহু সেবাপরায়ণ কর্মী এখনও কারা-প্রাচীরের অন্তরালে অবরুদ্ধ রহিয়াছেন; সরকার তাঁহাদিগকে মুক্তিদান করিয়া দেশের বিপর্যস্ত সমাজ-জীবনের পুনর্গঠনে অগ্রসর হইবেন কি?

রেলের ভাড়া বৃদ্ধি

ভারত সরকার সত্বরই রেলের ভাড়া বৃদ্ধি করিবেন, এইরূপ মনস্থ করিয়াছেন বলিয়া শুনা যাইতেছে। আমরা জানিলাম, শতকরা ২৫ টাকা হারে তাঁহারা ভাড়া বৃদ্ধি করিবেন। ইতিপূর্বে রেলপথের আয় কমিলেই সাধারণত ভাড়া বৃদ্ধি করা হইত; কিন্তু কর্তৃপক্ষ বর্তমানে বিপরীত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে উদ্যত হইয়াছেন। রেলপথের আয় তো কমেই নাই; পক্ষান্তরে বর্তমান বৎসরে এই আয় ঐতিহাসিক পরিমাণেই বৃদ্ধি পাইয়াছে; তথাপি ভাড়া বৃদ্ধি করা হইতেছে; কারণ কর্তৃপক্ষের মতে রেলপথে ভ্রমণার্থীর পরিমাণ অসম্ভব রকমে বাড়িয়াছে এবং তাঁহাদের বিশ্বাস এই যে, যুদ্ধের ফলে লোকের আয় অত্যধিক রকমে বাড়িয়া গিয়াছে এবং লোকে এই টাকা অন্য পথে ব্যয় করিয়া হ্রাস করিতে পারিতেছে না, এজন্য তাহারা দলে দলে রেলপথে ভ্রমণ করিয়া সাধ মিটাইতেছে। ভারত গভর্নমেণ্টের এই যুক্তি অত্যন্তই উদ্ভট। রেলপথে ভ্রমণকারীর সংখ্যা বাড়িয়াছে, আমরা স্বীকার করি; কিন্তু দেশের লোকের ধনৈশ্বর্যের পরিস্ফীতি তাহার কারণ নয়; ইহার অন্য কারণ কতকগুলি রহিয়াছে। প্রথমত, রেলপথে ভ্রমণকারীদের কতজন সেনা ও সেনাদল সম্পর্কিত ব্যক্তি এবং কতজন সাধারণ লোক, এ হিসাব লওয়া প্রয়োজন; দ্বিতীয়ত, পেট্রোলের অভাবে বাস প্রভৃতি যানের গতিবিধি বর্তমানে বিশেষভাবে সঙ্কুচিত হইয়াছে। এখন রেলপথই গতিবিধির পক্ষে একমাত্র আশ্রয় হইয়াছে; সুতরাং রেলভ্রমণার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধির কারণ এদিক হইতেও রহিয়াছে; নূতন ব্যবস্থায় রেলের ভাড়া বৃদ্ধি রেলভ্রমণকারীদের সংখ্যা হ্রাস করিবার পক্ষে সহায়ক হইবে আমরা মনে করি না। ইহার একমাত্র ফল ইহাই হইবে যে, গরীব এবং মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়, যাঁহারা বর্তমানে আর্থিক সঙ্কটে পতিত হইয়াছেন, তাঁহাদের দুর্দশা আরও বাড়িবে; এমন ব্যবস্থা কখনই সমীচীন হইতে পারে না।

স্টালিনের দূরদৃষ্টি

স্ট্যালিনের রণনীতির চাতুর্য বর্তমানে বিশ্ববাসীকে বিস্মিত করিয়াছে। তাঁহার সমর-কৌশলে সমগ্র রুশিয়া জার্মানীর প্রভাব হইতে মুক্ত হইবে এমন সম্ভাবনা সুনিশ্চিত হইয়াছে; কিন্তু আমাদের মনে হয়, স্ট্যালিনের রণচাতুর্যের চেয়ে রাজনীতিক চাতুর্য এবং তৎ-সম্পর্কিত দূরদৃষ্টি অনেক বেশী। সেদিন সোভিয়েট পররাষ্ট্র-সচিব মলোটভ গর্ব সহকারে বলিয়াছেন, পূর্বে জগতের প্রধান প্রধান শক্তি সোভিয়েটকে আমল না দিয়া চলিতে চাহিত; কিন্তু এখন আর সে অবস্থা নাই। ব্রিটিশ এবং মার্কিনের সঙ্গে রুশিয়া সৌহার্দ প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। মলোটভের উক্তির তাৎপর্য কতকটা এইরূপ যে, ব্রিটিশ এবং মার্কিণ সোভিয়েটের সঙ্গে সৌহার্দ প্রতিষ্ঠা করিতে বাধ্য হইয়াছে এবং সে তাৎপর্যে বিশেষ অসঙ্গতি আছে, ইহাও বলা যায় না। রুশিয়া বর্তমানে জার্মানীর সঙ্গে প্রচণ্ড সংগ্রামে লিপ্ত—যুদ্ধের এই অবস্থার অজুহাতে ব্রিটিশ ভারতবর্ষের স্বাধীনতার দাবী পিছাইয়া দিতেই ব্যস্ত; কিন্তু বিপ্লবী স্ট্যালিনের সবই বৈপ্লবিক। তিনি এই অবস্থার মধ্যেই রুশিয়ায় যতগুলি সোভিয়েট আছে, সবগুলিকে পূর্ণ স্বাধীনতা দান করিয়াছেন। রাশিয়ার এই শাসনতন্ত্রের সংস্কারের মধ্যে রণ চাতুর্যের চেয়ে রাজনীতিক চাতুর্য বেশী আছে বলিয়াই আমরা মনে করি। এই নীতি অবলম্বনের ফলে জাতীয়তাবাদীদের সহানুভূতিও রুশিয়া আকর্ষণ করিল। যুদ্ধের পর বিভিন্ন রাষ্ট্রের পুনর্গঠন ব্যবস্থার প্রশ্ন নির্ধারণে এতদ্দ্বারা তাহার পক্ষে জোর বাড়িল এবং এই উদামে রুশিয়া ফ্যাসিস্টবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ উভয়কেই আঘাত করিল।

তিলাঞ্জলি

সুবোধ ঘোষ

(১৪)

পিসিমা মালা জপছিলেন। অরুণা এসে বললো।—শিশিরবাবুকে চলে আসতে খবর পাঠালাম পিসিমা।

পিসিমা খুসী হয়ে সমর্থন জানালেন। —ভাল করেছ। জ্বর-জ্বালা নিয়ে কোথায় যে পড়ে রয়েছে, আহা! বড় ভাল ছেলেটি।

অরুণা। —ইন্দ্রকেও চিঠি দিলাম, যেন একবার দেখা করতে আসে।

পিসিমা নিরুত্তর রইলেন। পিসিমা ইন্দ্রকে চেনেন না।

অরুণা যেন মনে মনে বিচিত্র এক দৌত্যের দায় তুলে নিয়েছে। কদিন থেকে অরুণার আচরণ একটা নতুন উৎসাহে আবিষ্ট হয়ে রয়েছে। বিপিন ও টুনার মা, দুজনে মিলে যেদিন অরুণাকে প্রণাম করে শান্তভাবে চলে গেল, সেইদিনই যেন অরুণার চিন্তায় রশ্মিময় এক পরিকল্পনার দীপালি জ্বলে উঠলো অকস্মাৎ। টুনার মাকে এক কৌট সিঁদুর উপহার দিয়েছে অরুণা। অবনী সে-খবর জানে না। জানবার জন্য বোধ হয় অবনীর কোন ইচ্ছাও নেই। হোম পলিটিক্সে মাথা ঘামাবার সময় নেই অবনীনাথের—রাগ করে বললেও এই অভিযোগের ইঙ্গিতটি বুঝতে দেরী হয়নি অরুণার। সময় নেই, না সামর্থ্য নেই? কথাটা মনে পড়তে বার বার হেসে ফেলেছিল অরুণা। মায়া হচ্ছিল অবনীনাথের জন্য। নিরন্নদের জন্য ভাতের দাবীর লড়াইয়ের ভাবনা নিয়ে, ধ্যানস্থ হয়ে আছে ভদ্রলোক। এই ধ্যানে মজে থাকুন তিনি। প্রণয়-বিরহ-মিলন—চিত্তলীলার এই ধাঁধার ভেতর টেনে এনে ভদ্রলোককে নাকাল করে লাভ নেই। তার সামর্থ্য নেই। যা-কিছু করতে হয় সব অরুণাকেই করতে হবে। নতুন এক সাধনার গর্ব যেন কুড়িয়ে পেল অরুণা।

পিসিমার কাছ থেকে সরে এসে অবনীর কাছে দাঁড়ালো অরুণা। —ইন্দ্রকে আসতে লিখে দিলাম।

অবনী আশ্চর্য হয়ে বললো। —কেন?

অরুণা। —জোছু বড় ভাবিয়ে তুলেছে।

অবনী আরও আশ্চর্য হলো। —কি ভাবিয়ে তুলেছে জোছু?

অবনীর প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে হঠাৎ ফাঁপরে পড়ে গেল অরুণা। অরুণার বোধ হয় সিদ্ধান্তটিই তৈরী ছিল, প্রমাণগুলি ছিল না।

অরুণার দ্বিধা দেখে অবনী একটু স্পষ্ট করেই জিজ্ঞেসা করলো। —কিসে প্রমাণ পেলে?

অরুণার উত্তরটা তেমনি অস্পষ্ট হয়ে গেল।—দেখেই বোঝা যায়।

অবনী। —তুমি ভুল বুঝেছো।

অরুণা জোর করে বললো। —না, আমি ঠিকই বলছি।

অবনী চুপ করে রইল। অরুণার কথাগুলি একটানা আবেগে তার গোপন পরিকল্পনার কিছুটা আভাষ যেন ধরিয়ে দিয়ে গেল।—ইন্দ্রকে স্পষ্ট জিজ্ঞাসা করাই ভাল। আমার বিশ্বাস, ইন্দ্র আমাদের সবার ওপর একটা অভিমান নিয়েই দূরে সরে রয়েছে। ইন্দ্র জোছুকে ভালবাসে, একথা জেনেও আমরা সবাই চুপ করে রইলাম—এতে ইন্দ্রকে সত্যিই অপমান করা হয়েছে।

অবনী। —আমি তোমাকে জোছুর কথা জিজ্ঞাসা করছিলাম। তুমি বলছো, জোছু ভাবিয়ে তুলেছে। কি করে বুঝলে?

অরুণা একটু সংকুচিতভাবে জবাব দিল। —জোছুকে দেখে আমার তাই মনে হয়।

অবনী। —কী মনে হয়?

অরুণা। —ইন্দ্রকে অপমান করা হয়েছে, জোছু যেন এই ঘটনাটাকে চুপ করে সহ্য করার চেষ্টা করছে। কিন্তু দেখে বুঝতে পারি, সহ্য করতে পারছে না।

অবনী। —তোমার অনুমান মিথ্যে হতে পারে।

অরুণা। —কিন্তু মিথ্যে হলে কি করে চলবে?

অরুণার কথাতে একটা হতাশার আক্ষেপ লুকিয়েছিল। অবনী হেসে ফেললো। —তাই বল! জোছু কিছুই ভাবিয়ে তোলেনি, কিন্তু তোমার ইচ্ছে জোছু তোমাদের ভাবিয়ে তুলুক। তাই নয় কি?

অরুণা অপ্রস্তুত হয়ে বললো। —এ আবার কিরকম কথা হলো?

অবনী অন্যদিকে তাকিয়ে একটু শান্তভাবেই বললো। —শুধু ইন্দ্রনাথের জন্যই জোছু তোমাদের ভাবিয়ে তুলুক, এইটাই বোধ হয় তুমি চাইছ।

অরুণা সশঙ্কভাবে যেন অবনীর কথাগুলিকে দেখছিল। নিষ্প্রভ মুখটা বিনা কারণে ক্রমেই করুণ হয়ে উঠছিল।

অবনী বললো। —ইন্দ্রকে ডাকিয়ে তুমি সমস্যাটাকে সরলভাবে মিটিয়ে দিতে চাও, এই তো?

অরুণার চোখের দৃষ্টিটা অস্বাভাবিক রকম স্থৈর্যে স্তব্ধ হয়ে ছিল। অবনীর কথাগুলি এক-একটি লোষ্ট্রাঘাতের মত তার মনের গহনে যেন তরঙ্গ-ক্ষোভ জাগিয়ে তুলছিল। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থেকেও ক্লান্ত হয়ে পড়ছিল অরুণা।

অবনী।—তুমি আশা করছো, ইন্দ্র এলে একটি দুর্ভাবনা থেকে তুমি মুক্তি পাবে।

আর একটু উৎসাহের প্রেরণা ভরে দিয়ে কথাগুলি বললো অবনী। কিন্তু কথাগুলি থেকে আলোর বদলে শুধু একটা জ্বালা এসে অরুণার মনের ওপর যেন ছড়িয়ে পড়ছিল।

মুখ ঘুরিয়ে অরুণার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ বিস্ময়ে ও সমবেদনায় বিচলিত হয়ে উঠলো অবনী। —একি? তুমি মুসড়ে পড়ছো কেন? আমি তো তোমায় কোন বাধা দিচ্ছি না অরুণা! যা ভাল বোঝ, তাই করবে; এর মধ্যে এত অভিমান করার কি আছে?

অরুণার চোখের সুমুখ থেকে একটা শাস্তির ভ্রূকুটি যেন মিথ্যা ভয় দেখিয়ে এতক্ষণে সরে গেল। দুর্লক্ষ্য একটা দুর্বলতা নিজেরই সংশয়ের বিষে অন্ধ হয়ে অবনীর কথাগুলিকে চিনতে পারছিল না এতক্ষণ। কী লজ্জাকর দুর্বলতা।

অরুণা বেশ সুস্পষ্টভাবেই বললো। —এর মধ্যে আমাকে টেনে আনছো কেন? আমি মুক্তি পাব, একথার কোন অর্থ হয় না।

—আজ আমার কথাগুলি তুমি যেন কিছুতেই বুঝতে পারছো না অরুণা।

উত্তর দিতে গিয়ে অবনীর কথার সুরটা যেন সূক্ষ্ম একটা ধিক্কার দিয়ে হঠাৎ ছিঁড়ে গেল।

প্রসঙ্গটা এইখানে এসে একটু শ্রান্ত হয়ে পড়লো। অগ্রসর হবার আর কোন পথ যেন সহসা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। কিছুক্ষণ স্তব্ধতার পর অরুণাই বললো।—শিশিরবাবুকে খবর পাঠালাম, যেন পত্রপাঠ চলে আসেন।

অবনী চমকে উঠে প্রশ্ন করলো। —কেন?

অরুণা ভয়ে ভয়ে জবাব দিল। —জ্বর হয়ে পড়ে রয়েছেন ভদ্রলোক।

অবনী। —জ্বর সেরে গেলে আবার নিজের কাজে চলে যাবেন তো?

অরুণা। —এ প্রশ্নের উত্তর আমি কি করে দেব?

অবনী। —সেই কথা তাঁকে লেখা হয়েছে কি না?

অরুণা। —না।

অবনী। —তাহ'লে বল, জ্বরের জন্য তাঁকে ফিরে আসতে লেখনি। শুধু ফিরে আসার জন্যেই লিখেছ।

মাথা হেঁট করে মাটির দিকে তাকিয়েছিল অরুণা। অবনীর কথাগুলি যেন দুর্বোধ্য একটি তূণীরের মত, সুতীক্ষ্ম শরের মত এক একটি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত মাঝে মাঝে ছিটকে পড়ছে।

অবনী। —ইন্দ্রনাথকে কেন আসতে লিখেছ, তা বুঝতে পারছি। জোছু যদি তাতে খুসী হয়, আমি খুসী হব। কিন্তু শিশিরবাবু ফিরে আসবেন কেন?

ক্রমেই যেন নিঝুম হয়ে পড়ছিল অরুণা। অরুণার কাছে এগিয়ে এসে তেমনি শান্ত শান্তি সুরে অবনী বললো।—কথা বলছো না যে অরুণা?

অরুণা অবনীর হাতটা দুহাতে আবেগে ধরে কথা বলবার জন্য মুখ তুললো। চোখ দুটো চকচক্ করছিল অরুণার।—তুমি আজ আমাকে কোন কথার উত্তর দিতে দিচ্ছ না কেন অবনু? কী ভাবছো তুমি?

অরুণাকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে চোখের উপর চুমো দিতেই ঠোঁট ভিজে গেল অবনীর।—ছি ছি, তুমি কাঁদছো অরুণা?

অরুণা।—আমি আবার চিঠি দিয়ে দিচ্ছি, কাউকেই আসতে হবে না।

অবনীর চোখের দৃষ্টি কৌতুকে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিল।—এরই মধ্যে হাল ছেড়ে দিলে?

অরুণা।—হ্যাঁ, আমার সে শক্তি নেই।

অবনী।—খুব আছে।

অরুণা।—আবার তুমি আমার সব ভুল করিয়ে দিও না।

অবনী।—কোন ভুল হবে না তোমার। তুমি ভাল ভেবে যা করবে, তাই ঠিক। শুধু আমাকে এর মধ্যে ডেক না।

—ইন্দ্রকে একবার দেখা করে যেতে চিঠি দিলাম জোছু।

অরুণার কথাটা শুনতে পেল না জোছু। খোলা বইটা কোলের ওপর পড়েছিল; কিন্তু বইয়ের পাতার বাইরে, বহুদূরে, উদাস চিন্তায় আচ্ছন্ন কোন লোকে জোছুর মনটা বোধ হয় তখন একাকী পথের পর পথ পার হয়ে চলেছিল। অরুণা জোছুর গায়ে হাত দিয়ে আস্তে একটা ঠেলা দিয়ে হেসে ফেললো।—এত ভাবনা ভাল দেখায় না জোছু।

চমকে অরুণার দিকে তাকিয়ে জোছু বইটার ওপর আবার মনস্থ হবার চেষ্টা করলো। বইটা কেড়ে নিয়ে অরুণা বললো। —ইন্দ্রকে একবার দেখা করে যাবার জন্য চিঠি দিলাম।

জোছু বোধ হয় বিরক্তি চাপতে গিয়েই বললো।—বইটা দাও।

অরুণা।—আগে আমার কথার উত্তর দাও।

জোছু।—তুমি অনর্থক আমার ওপর উপদ্রব করছো বৌদি।

অরুণা।—উপদ্রব?

জোছু।—হ্যাঁ।

অরুণা বিমর্ষ হয়ে বললো।—ইন্দ্র দূরে সরে থাকলেই কি তোমার ভাল হবে জোছু?

জোছু।—আমার ভালর কথা জিজ্ঞাসা করছো কেন?

অরুণা। —হ্যাঁ, এটা তোমারই ভাল মন্দের প্রশ্ন।

জোছু।—ভুল হচ্ছে বৌদি।

অরুণার সতর্কতা সত্বেও তার উত্তরের মধ্যে একটা তিক্ততা ফুটে উঠলো।—বেশ, তাহলে ইন্দ্রকে আসতে বারণ করে দিই। তবে এটা কিন্তু খুবই অশোভন ব্যাপার হলো জোছু।

জোছু চুপ করে রইল। অরুণা যেন জোছুর মুখের দিকে তাকিয়ে দুর্বোধ্য একটা লিপির পাঠোদ্ধারের চেষ্টা করছিল। সেই অশোভন সত্যের কাহিনীটাই যেন কঠোরভাবে উৎকীর্ণ হয়ে রয়েছে।

অরুণা বললো।—শিশির বাবুকে আসতে লিখেছি।

জোছু উৎসাহিত ভাবেই প্রত্যুত্তর দিল। —আরও আগেই লেখা উচিত ছিল বৌদি।

খুবই নির্লজ্জ হয়ে জোছুর কথাগুলি অরুণার কাণে বেজে উঠলো। বিশ্বাস করে উঠতে পারছিল না অরুণা। সেই সংশয়িত সত্যটাকে চরম ভাবে যাচাই করার জন্যই যেন অরুণা আবার বললো।—কিন্তু আমার সন্দেহ হচ্ছে, শিশিরবাবু আসবেন না। তুমি যদি অনুরোধ করে লেখ, তবেই আসতে পারেন।

জোছু হেসে ফেলে বললো।—তুমি জেনে শুনে একটা ভয়ানক রকমের উল্টো কথা বললে বৌদি। এটা উচিত হলো না তোমার।

জোছুর প্রতিবাদটা স্পষ্টতায় উদ্ধত হয়েই শোনালো। অরুণা যেন পাশে দাঁড়িয়ে মধ্যাহ্ন-ছায়ার মত সংকোচে ছোট হয়ে পড়তে লাগলো। অনেক সাহস গর্ব ও ভরসায় একটা অভিযানের নেশা নিয়ে যেন এগিয়ে চলেছিল অরুণা। কিন্তু পদে পদে ব্যর্থ হয়ে যেতে হচ্ছে তাকে। এর জন্য বোধ হয় প্রস্তুত ছিল না অরুণা। তাই ক্ষণে ক্ষণে সামান্য এক একটা বাধায় অসহায় হয়ে পড়তে হয়। কোথায় যেন দুরন্ত একটা ভুল তাকে দুর্বল করে রেখেছে। তাই পথটা এত কুটিল কঠিন ও অবুঝ মনে হয়।

অরুণার মৌনতায় একটু বিচলিত হয়ে পড়লো জোছু।—ভুল বুঝে আমার ওপর রাগ করো না বৌদি।

অরুণা।—হ্যাঁ, আমারই শুধু ভুল হচ্ছে। তুমিও একথা বলছো, তোমার দাদাও তাই বলে।

নিতান্ত অর্থহীন অভিমানের মত শোনালো কথাগুলি।

চলে যাচ্ছিল অরুণা। জোছু শুধু একবার বললো।—এসব নিয়ে দাদার সঙ্গে কোন আলোচনা করো না বৌদি।

মনের ভেতর এক বোঝা অস্বস্তি নিয়ে চলে গেল অরুণা। কোন উত্তর দিল না। আজ এতক্ষণ সে যেন দ্বার থেকে দ্বারে শুধু পরাভব কুড়িয়ে ফিরেছে। পরের জন্যই এই পরাভব।

এঘর থেকে ওঘরে বৃথা অনেকক্ষণ কাজ খুঁজে বেড়াচ্ছিল অরুণা। আলমারীটাকে নতুন করে সাজিয়ে, আলনাগুলিকে সরিয়ে, সিন্দুক খুলে বাসনগুলিকে রোদ্রে দিয়ে, একটা ছেঁড়া সোয়েটারের উল খুলে —তবু কাজ ফুরোচ্ছিল না। নিতান্ত নিরাস্বাদ কতকগুলি কাজ।

অবনীর আলোয়ানটা তুলে নিয়ে রোদে মেলতে গিয়ে আত্মাপরাধের একটা চিহ্ন আবিষ্কার করে দুঃখে ও লজ্জায় অরুণার মনের ভিতরটা কেঁদে উঠলো হঠাৎ। আলোয়ানের পাড়ের কাছে এক জায়গায় অনেকখানি ছিঁড়ে গেছে, তবু রিপু করতে ভুলে গেছে অরুণা। অরুণা জানে, লোকটিও তেমনি মানুষ, কস্মিনকালেও স্মরণ করিয়ে দেবে না; কোন অসুবিধার কথা মুখ ফুটে বলবে না। তেষ্টা পেলে এক গেলাস জল চাইবার মত উদ্যমটুকু পর্যন্ত হারিয়ে বসে আছে ভদ্রলোক। অরুণাকেই নিজে থেকে অবনীর যত অভাবিত ও অযাচিত দাবী মন দিয়ে বুঝে নিতে হয়। অবনী যেন তার প্রতিটি

নিশ্বাসের হিসাব অরুণার ওপর ছেড়ে দিয়ে বসে আছে। ভালবেসে সব দিয়ে দিয়েছে অবনী, তাই না অবনী আজ এত ভারমুক্ত স্বচ্ছন্দ ও নিশ্চিন্ত।

জীবনে ভালবেসে সুখী হয়েছে অরুণা। এমন অকৃপণ ভাগ্য ক'জনের হয়? ভালবাসা দুরূহ হয়ে থাকবে, বিচ্ছেদটাই শুধু নিয়তি হয়ে দাঁড়াবে—জীবনে এর চেয়ে বড় অভিশাপ কল্পনা করতে পারে না অরুণা। জোছুর কথা মনে পড়তে তাই এত বিচলিত হয়ে পড়তে হয় তাকে। ইন্দ্রনাথের জন্য মমতা হয়। বিপিনের কথা ভেবে তাই এত খুসী হয় অরুণা। বিপিন তার সংসারের বীভৎস ভগ্নস্তূপ থেকে হারানো হৃদয়কে আবার উদ্ধার করে ফিরে গেছে। সুখী হোক্ ওরা। বিপিন আর টুনার মা যেন ভালবাসাকে সকল অক্ষমা ও অবনতি থেকে ঊর্ধে তুলে জয়ী হয়ে চলে গেছে।

এই সাহসেই ভর করে সাগ্রহে এগিয়ে গিয়েছিল অরুণা। জীবনে মিলনই শুধু নিয়তি হয়ে উঠুক্। তবুও, এই সুন্দর সাধনার আয়োজন আরম্ভেই কেন যেন একটি অভাবিত আঘাতে চূর্ণ হয়ে গেল। জোছু একটু ভেবেও দেখলো না, কার স্বার্থের জন্য এই উপদ্রব?

অনেকক্ষণ ধরে টুকিটাকি নানা কাজের অস্থিরতার মধ্যে মনের ভেতর এই বার্থতার ক্ষোভটুকুকে যেন ছেঁকে ফেলতে চেষ্টা করছিল অরুণা। পরের প্রেমের হিসাব মিলাতে গিয়ে নাকাল হবার আর কোন দরকার নেই তার। সে শক্তি তার নেই। কিন্তু ইন্দ্রর কাছে চিঠি চলে গেছে। জোছুর কথা লেখা হয়েছে চিঠিতে। নিশ্চয় আসবে ইন্দ্র। বেচারা ইন্দ্র জানে না যে পাথরের ফুলের মত হৃদয়হীন হয়ে গেছে জোছু। স্রোতের গতি ফেরাতে গিয়ে নেহাৎ মূর্খের মত একটা আবর্ত তৈরী করে তুললো অরুণা। শিশিরবাবুও হয়তো আসবেন। তারপর? এসেই বা কী লাভ হবে তার। কোন উত্তর খুঁজে পায় না অরুণা। ঠাঁই না করেই হঠাৎ দুটি নিরীহ মানুষকে আতিথ্যে নিমন্ত্রণ করে বসলো অরুণা।

আবছা একটা শঙ্কায় বুকের ভেতরটা শিউরে উঠতে লাগলো অরুণার। সামর্থ্য নেই, অথচ প্রচুর উপচারের সমারোহে ভরা এক ব্রত যেন মানত করে বসে আছে সে। উতলা বাতাসের মত ভাবনাগুলি শুধু অরুণার মনের ওপর খোলোবালি খড়কুটো উড়িয়ে এনে উপায় পথের শেষ দাগটুকুও ঢেকে ফেলছিল। কাজ ভুলে গিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়েছিল অরুণা।

এই আনমনা আবেশ থেকে হঠাৎ চমকে জেগে উঠে অরুণা শুনলো—এত কী ভাবছো বৌদি? কথাটা বলেই ব্যস্তভাবে চলে গেল

দুঃসহ লজ্জায় যেন লুটিয়ে পড়তে চাইছিল অরুণা। আজ প্রত্যেকটি ঘটনা যেন বার বার তাকে মিথ্যা প্রমাণিত করতে চাইছে। কেউ তো কিছু ভাবছে না। অবনী নয়, জোছু নয়। সব ভাবনা একান্ত ভাবে তারই নিজস্ব বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ যেন তার নিজেরই ভাবনা। এর মধ্যে কোন ভুল নেই। জোছুর কথাটা যেন আকাশবাণীর মত গোপন চেতনার একটা মুখচোরা সত্যকে স্পষ্ট করে শুনিয়ে দিয়ে গেল।

একটা ভীরু সংশয় ঠাণ্ডা নিশ্বাসের মত অরুণার মনের ভেতর শেষ আলোর দর্পটুকু নিভিয়ে আনছিল। হয়তো জোছু আবার ঘরে এসে আরও স্পষ্ট করে বলে যাবে—তোমারও নিশ্চয় কোন স্বার্থ আছে বৌদি; তাই তোমার এত ভাবনা অভিমান আর হতাশা। নিজের জন্যই তোমার এই পরাভবের দুঃখ।

যেন বাতাস হাতড়ে হাতড়ে অবসন্নের মত ঘরের ভেতর এসে ঢুকলো অরুণা। যার কাছে লুটিয়ে পড়তে সব চেয়ে ভাল লাগবে, চিরকাল ভাল লেগে এসেছে—অরুণা যেন তারই খোঁজ করে ফিরছে। কিন্তু অবনী ঘরের ভেতর ছিল না। কলতলার দিক থেকে একটা সাড়া পেয়ে এগিয়ে গিয়ে অরুণা দেখ্লো, অবনী বেশ নিবিষ্ট মনে সাবান দিয়ে কতগুলি রুমাল আর তোয়ালে কাচ্ছে।

চোখ দুটো পুড়ে যাচ্ছিল অরুণার। এ দৃশ্যের নিষ্ঠুরতা সহ্য করার মত ধৈর্য তার ছিল না। সমস্ত ভুলের সঙ্গে সঙ্গে শাস্তিটাও এইভাবে তৈরী হয়ে ছিল, স্বপ্নেও অনুমান করতে পারেনি অরুণা।

অবনীর হাত থেকে সাবানটা কেড়ে নিয়ে অরুণা ধমক দিল।—শীগ্গির ওঠ বলছি।

অবনীকে কোন প্রতিবাদ করার অবকাশ না দিয়েই অরুণা আবার বললো।—কোন কথা শুনতে চাই না। ওঠ তুমি। অফিসের বেলা হয়ে গেছে, খেয়াল আছে কিছু?

অবনী একটু অপ্রস্তুতের মত বললো।—হ্যাঁ, সে খবরটা তোমাকে এখনো বলা হয়নি।।

অরুণা।—কিসের খবর?

অবনী।—অফিসের।

অরুণা।—কি?

অবনী।—চাকরীর পাট চুকে গেছে। কালকেই অফিসে গিয়ে দেখলাম—বিদায়পত্র এবং এক মাসের দক্ষিণা তৈরী হয়ে আছে। ব্যাঙ্কের বড়কর্তা দুঃখের সঙ্গে জানিয়েছেন যে, অনিচ্ছাসত্ত্বেও বাধ্য হয়ে আমার মত কেজো কেরাণীকে ছাড়িয়ে দিতে হলো।

অবনীর হাতটা শক্ত করে ধরে দাঁড়িয়ে রইল অরুণা।

অবনী ঠাট্টার সুরে বললো।—এ কী? পড়লে।

অরুণার চোখদুটো ছলছল করছিল। —সবাই মিলে তোমার এত ক্ষতি করছে কেন অবনু? এমন কী দোষ করেছ তুমি?

অবনী।—সবাই মিলে আমার ক্ষতি করছে, কে বললে? একজনের নাম জানা গেল, ব্যাঙ্কের কর্তা জগৎ ভট্চায। আর কে?

অবনীর হাতের ওপর চোখ দুটো ঘসে নিয়ে অরুণা বললো। —না, আর কেউ নয়। ষাট্, আর কেউ তোমার ক্ষতি করবে না অবনু? কেউ ক্ষতি করতে পারবেও না।

—কী শুনলাম রে অবু, চাকরীর পাট চুকে গেছে?

পিসিমার গলার স্বরে, চমকে উঠে মাথার কাপড় টেনে অরুণা একটু দূরে সরে গিয়ে দাঁড়ালো। জপের মালা হাতে নিয়েই হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসেছেন পিসিমা।

অবনী আপশোষের সুরে উত্তর দিল। —হ্যাঁ পিসিমা। বিনা দোষে ছাড়িয়ে দিলে।

পিসিমার চোখ থেকে সংশয়ের ছায়াটা তখনো সরে যায় নি। —বিনা দোষে কি কারও চাকরী যায় অবু? নতুন কথা শেখাচ্ছিস্ আমাকে?

পিসিমার কথাগুলি থেকে প্রচ্ছন্ন একটা গঞ্জনা উপ্চে পড়ছিল। আশ্চর্য হচ্ছিল অবনী। পিসিমা উপদেশ দিলেন।—দোষ করে থাকিস্ তো মাপ চেয়ে আবার চাকরীটা ঠিক করে নে অবু। বড় মানুষের কাছে মাপ চাইতে কোন লজ্জা নেই। লজ্জা করলে চলবে কেন?

অবনী হেসে জবাব দিল।—সত্যিই আমি কোন দোষ করিনি পিসিমা।

—বুঝলাম না বাপু। পিসিমা যেন রাগ করেই কথাটা বলে চলে গেলেন।

সাইরেণ বেজে উঠলো। সারা দিনের যত দুঃসঙ্কেতের ভরা যেন পূর্ণ হয়ে উঠলো এতক্ষণে। অবনীর হাত ধরে আস্তে আস্তে ঘরের ভেতর এসে ঢুকলো অরুণা।

অবনী বললো।—তোমার গা'টা কেমন গরম মনে হচ্ছে, জ্বর হয়নি তো?

অরুণা।—না। আমার কাছে বসো তুমি। তোমার কোলে মাথা রেখে শোব।

বাইরের রাস্তায় পথিকের দৌড়দৌড়ি আর এ-আর-পি কর্মীদের হুইসিলের শব্দ থেমে গেছে, ত্রস্ত ঝড়ের বিলাপের মত দূরে ও নিকটে সাইরেণগুলি একটানা বেজে বেজে থেমে গেল। চল্লিশ কোটি শৃঙ্খলিত মনুষ্যত্বের সকল দুর্দশাকে টিটকারী দিয়ে, সাইরেণের কাতরানি ছাপিয়ে, আকাশে ও মাটিতে বিস্ফোরকের নির্লজ্জ উল্লাস মধ্যদিনের কলকাতার দাসসুখী আত্মার সাড়া কিছুক্ষণের জন্য স্তব্ধ করে দিল।

সাহিত্যিক

শ্রীসন্তোষকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

ঘরের মধ্যে থাকলেও মনটা যে বেশির ভাগই বাইরে থাকে, এ অতি পুরোনো কথা; কিন্তু জিতেনের মুখচোখ ও অঙ্গভঙ্গির বিশেষ অভিব্যক্তি সম্পূর্ণ নূতন ধরণের। তার সব বিষয়ে এড়িয়ে-চলা উদাস ভাব খুব সাধারণ চোখে লক্ষ্য করা গেলেও, মূলগত কারণ সম্বন্ধে যে নানা মতবাদের সৃষ্টি তা ওর বন্ধুমহলে অবসর বিনোদনের আমোদপ্রদ উপাদানের সৃষ্টি করেছে। বেচারা ক'দিন হোল বিদেশে হোস্টেলে আশ্রয় নিয়েছে—ছোট-নাগপুরে নূতন চাকরী পেয়ে। কিন্তু সে বাড়ি ছেড়ে বিদেশে বেরিয়েছে ও এই নূতন। ও এখন জীবনের একটা স্তর থেকে আর একটা স্তরে এসে পেঁছিল। জীবনের গতিপথের নূতন আর একটা দিক, যেটা সামলে নেওয়ার দায়িত্ব ও ঝক্কিটা বড় কম নয়। কিন্তু একবার সামলে নিলে অনেক দরদীর মতে এটা গরুর গাড়ির মোড় ফেরার মতই ফিরতেই যা কষ্ট, তারপর তার ধিকির ধিকির আস্তে চলা ঠিকই থাকবে। জিতেনের উপর তার নূতন সমপন্থী বন্ধুদের যে বিশেষ মমতা ছিল তা অকারণ নয়। কারণ, গোড়ার বছরগুলো সে কাটিয়ে-ছিল গুচ্ছের বই আর বাড়ি থেকে স্কুল, কলেজে পেঁীছে-দেওয়া গাড়ি ঘোড়ার সাথে। তখন সে বেচারা ভাবতেও পারে নি যে, তারা খসে যাওয়ার মত বিশ্ব-বিদ্যালয়ের মধ্যবর্তী আকর্ষণ থেকে খসে পড়ে কোন এক কাজের জঙ্গলে পড়ে থাকবে।

ভবিষ্যতে কাজের তাগিদ বা কঠোর জীবনযাত্রা স্বাবলম্বনের জন্য অনেকেরই জীবনধারণের কান্ডারী। আবার ভাগ্যবান পুরুষ সেগুলোকে এড়িয়ে চলে। কিন্তু পূর্বাভাস গুরুজনদের কাছ থেকে আগেই পাওয়া যায়।

কল্পনাবিলাসী জিতেন পৃথিবীর নানা স্তরের সফল কর্মীদের নামের তালিকা মনে মনে রচনা করে নিজের পথও বেছে নিয়েছিল সাহিত্য। সাহিত্যসেবায় সে তার কম অধ্যবসায় দেখায়নি। গ্রামের স্কুলের ছোট্ট তোরণ-দরজা পেরিয়ে সে এসেছিল কলকাতার মস্ত শহরে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাসমুদ্র মন্থন করতে কোমর বেঁধে। কলকাতায় কোন আত্মীয় তার ছিল না, হোস্টেলে থাকবার আর্থিক অবস্থাও তার নয়। অগত্যা গ্রাম-সম্বন্ধে এক পাতান আত্মীয়ের বাটীতেই ঘাটি করবার হীনতা তাকে স্বীকার করতে হয়েছিল। অবশ্য প্রথমে উদ্যোগী তিনিই ছিলেন।

সে ভদ্রলোকের নাম রামরতন চৌধুরী। বহুদিন থেকে তিনি কলকাতায় সরকারী আপিসে মোটা মাইনের চাকরী করতেন। সংসারে তাঁদের মাত্র তিনটি প্রাণী—তিনি, তাঁর স্ত্রী ও একমাত্র কন্যা সুজাতা। জিতেনের বাপের সঙ্গে তাঁর খুবই বন্ধুত্ব ও ঘনিষ্ঠতা ছিল এবং সে সম্বন্ধ দুজনের দু'জায়গায় ছটকে পড়ায় এবং আর্থিক অবস্থার অনেকটা তারতম্যে যথেষ্ট ম্লান হয়েছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু একেবারে তিরোহিত হয়নি। জিতেনের ম্যাট্রিক পাসের খবর তিনিই আগ্রহের সঙ্গে তার বাবাকে জানান এবং আরও পড়লে যে উন্নতির সীমানা আরও বেড়ে যাবে, এরূপ মন্তব্যও প্রকাশ করেন। পরিশেষে তাঁর বাড়িতে থেকে কলকাতার কোন কলেজে ভর্তি করবার অনুরোধও করেন।

শ্যামবাজারে রামরতনবাবুর বাড়িতে জিতেন এলো, কলেজেও ভর্তি হলো। তার স্বভাবগত সাহিত্যিক ভাব শুধু সাহায্য করেছিল ওর কলেজ ম্যাগাজিনের কয়েকটা পাতা ভরাতে, তাছাড়া পরিশ্রম ভিন্ন আর কোন কাজে আসেনি। কলেজে প্রফেসার ও ছাত্রমহলে ও একটা উপাধিও পেয়েছিল—আন্‌সোশ্যাল; কিন্তু সেটা তার ন্যায্য প্রাপ্য। গ্রামের স্কুলে মেলা-মেশা তার সাথে বিশেষ কারও ছিল না। অনেকে তার কারণও দর্শিয়েছিল যে, ওটা ওর উদীয়মান সাহিত্যিক মনোবৃত্তি। ওর টেনে-আনা গম্ভীরভাবের মুখোস খুলতে অনেক সদয় সহপাঠী মৃদু এবং কঠোর প্রচেষ্টার ত্রুটি করেনি। কিন্তু তাতে করে তারা একটা 'উড্‌ বী আন-কমন জিনিয়স্‌'-এর প্রাক্তন গন্ডীর অভি-ব্যক্তির ক্রমবর্ধনের সহায়তা করেছিল মাত্র। বন্ধুদের সঙ্গে সে যখন কথা কইত, তার মুখে চোখে আভাস পাওয়া যেত যেন কতকটা 'কান্‌ডেসেন্‌শেসনাল্‌' ভাব। বন্ধুরা তা বুঝতো। অনেকে তাকে বলত আত্মগর্বী। আবার অনেকে তাকে বন্ধু-বর্গে কথা বলতে অনভ্যস্ত বলে মন্তব্য করতো। আসল কথা, জিতেনের স্বভাব-দোষেই হউক কিংবা বন্ধুদের ভুলের জন্যই হউক, ওর বন্ধু মেলেনি। জিতেন সেটাকে অভাব বলে বোধ করত না।

সুজাতার বন্ধুরা জিতেনের সম্বন্ধে বিশেষ করে তার কাছেই বলে। সে তার উত্তরে অনেক কিছুই বলেছে। তার সব শেষের কথা হচ্ছে এই যে, ও-কথা তাকে বলা অহেতুক, কিন্তু কেউ মানেনি। সকলেই বলে ওটা ওর লজ্জার কথা। সুজাতা অনেক সময়ই প্রতিবাদ জানিয়েছে যে, এমন কোন কারণ ঘটেনি কেবল একসঙ্গে কলেজে আসা ও বাড়ি যাওয়া ছাড়া, তাও সব দিন নয়, যার জন্যে জিতেনের পক্ষপাতিত্ব তার কাছে আশা করা যেতে পারে। ওরা যখন জিতেনের নিন্দে করত, সে কোন দিন তার পক্ষ সমর্থনের চেষ্টা করেনি পাছে কোন দুর্বলতা প্রকাশ পায়; কিন্তু উৎসাহও দেয়নি।

কলেজের সব বক্তৃতা শেষ হয়ে গেলে, জিতেন ও সুজাতা পাশাপাশি দাঁড়াল বাসের প্রতীক্ষায়। একে একে কলেজের কৌতূহলী চক্ষু অকারণে অনুসন্ধিৎসু হয়ে রইল—এটা নৈমিত্তিক। কিন্তু আজ সুজাতা সহজভাবে থাকতে পারল না। যেটা অন্য দিন তার কাছে খুব স্বাভাবিক ও সরল ছিল, যার জন্যে এতটুকু দ্বিধা মনে জড়াবার কোন কারণ ঘটেনি, আজ সেইখানেই এলো তার নিজের দিক থেকে একটা অজানা আতঙ্ক—একান্ত অব্যক্ত,

একটা ক্ষতির আশঙ্কা। জিতেনের সাথে আলাপ-আলোচনায় ও হাসি-ঠাট্টায় তা যে কয়দিন কেটেছে, তার মূলে রতি-দেবীর একটা অলক্ষ্য নির্দেশ আছে, এ চিন্তার কোন অবসর সে পায়নি। এখনও সে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে না,—বন্ধুদের কটাক্ষ নির্দেশেও নয়; তবুও যেন একটা প্রগাঢ় লজ্জা তাকে পেয়ে বসল। আজ লোকচক্ষুর সামনে জিতেনের সান্নিধ্য তাকে কাঁটার মত বিঁধতে লাগল।

নির্দিষ্ট জায়গায় বাস দাঁড়ায়। ভাবুক জিতেন যন্ত্রচালিতের মত তার উদাসীন দেহটাকে টেনে নিয়ে লেডিস' সিটে এসে বসল। রক্তিম মুখে সুজাতা বসল তারই পাশে। জিতেনকে একান্ত করে দেখবার চেষ্টা সুজাতা কোন দিনই করেনি। আজ বোধ হয় নূতন করে তার দিকে চেয়ে দেখলে। কল্পনাবিলাসী জিতেন কোলাহলময় নগরীর মধ্যে, এই শব্দমুখর যান্ত্রিকবাহনের অনেক দূরে সে নিজেকে সরিয়ে রেখেছিল। কল্পনার রঙীন জাল তার বর্তমান পরিস্থিতিকে এক বিরাট কালো আবরু দিয়ে ঢেকে রেখেছে। আজ সে দেখল জিতেনের এই স্বাভাবিক ঔদাসীন্যের মধ্যে কিসের পূর্তি রয়েছে। আজ যেন খানিকটা বাড়াবাড়ি করেই সে দেখল যে, নিজের চেহারার প্রতি খুব তাচ্ছিল্য সত্বেও তার মুখে চোখে একটা দুর্লোক্ষ্য ছায়ার আমেজ আছে, যেটা ওর ঘুমিয়ে থাকা আসল মানুষের জ্যোতি। তার অগোছাল অসৌষ্ঠব নিজ-দেহ সংশ্লিষ্ট সাজগোজ প্রভৃতির মধ্যেও একটা অশ্রদ্ধ ভাবের মধ্যেও তার নিজত্ব সাড়া দিয়েছিল যেন অম্লান পূর্ণিমা জ্যোৎস্নার অস্পষ্ট অব্যক্ত জ্যোতি কালো মেঘে আভাস পাচ্ছে। সাহিত্য-চিন্তার উন্মাদনায় জিতেন এতক্ষণ বাসশুদ্ধ লোকের অস্তিত্ব ভুলে গিয়েছিল। হঠাৎ একটা কঠিন চুড়ির আঘাতে সে সজাগ হয়ে উঠল।

"নামবে না জিতুদা?"

"হ্যাঁ, চল।"

পথ চলতে চলতে সুজাতা প্রশ্ন করল, "এত অন্যমনস্ক কেন?"

"হ্যাঁ, আজ তুমি আছ বলে মনটাকে একটু অন্য করে রেখেছিলাম"—জিতু বললে।

"কেন, তুমি আমাকে কি মনে কর?" সুজাতার কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ন।

"কিছুই না, তবে তুমি থাকলেই যেন আমার মনটা পথ চিনে নেওয়ার দায়িত্ব থেকে ছুটি নেয়।"

"এ ধরণের প্রশ্রয় মনকে দেওয়া চলে না; কাল থেকে আমাকেও পথ চিনে নেওয়ার দায়িত্ব থেকে মুক্তি দিও।"

জিতেনকে কে যেন চাবুক মেরে জাগিয়ে দিলে।

"তুমি হঠাৎ ক্ষেপে গেলে কেন, সুজাতা?"

"ক্ষেপিনি, তবে অযথা প্রশ্রয় আর তোমাকে দেব না। কাল থেকে একা তুমি কলেজে আসবে, আমার অপেক্ষায় থাকার কোন প্রয়োজন হবে না।"

"তা আসব, কিন্তু চটলে কেন?"

"এ চটার কথা নয়, এ শাসন, যা তোমার একান্ত প্রয়োজন হয়েছে।"

জিতেনের গল্পের প্লট গুলিয়ে গেল। তার চিন্তা হঠাৎ কল্পলোক থেকে বাস্তবে নেমে এল। কলেজ প্রাঙ্গণে ছোটখাট ঘটনার বা দুর্ঘটনার দাম সে কোন দিন দেয়নি। আজ মনে হোল তার ফলের সঙ্গে কারণ চিন্তা করবার প্রেরণা। কলেজে আর পাঁচজনের মত সুজাতাও যে একজন মেয়ে, এ রকম সহজ ধারণাও তার ছিল না; ওকে যেন একটু সে বিচ্ছিন্ন করেই দেখতে চায়। হয়ত গতানুগতিকের মধ্যে একটু স্বাতন্ত্র্যের ভাব ওর মধ্যে রয়েছে। তাই এই ছোট্ট কথাবার্তার মধ্যে জিতেনের মনটা ব্যথিত হয়ে উঠল,—একটা অব্যক্ত যন্ত্রণার সঙ্গে সে ক্ষণিকের মত ভেবে নিল সুজাতা একটি সুজাতা নয়, আর পাঁচজনের মধ্যে একজন সুজাতা।

অস্বাভাবিক জোরে হেঁটেই ওরা বাড়ি ফিরল, পথে দুজনে আর কোন কথা হয়নি।

চান করে মনোমোহিনী বেশ ধারণ করা ছাড়াও সুজাতার বিকেলে আরও দুটো কাজ ছিল। প্রথমটি জিতেনের এদিক-ওদিক ছড়ান বই-খাতা, কাপড় গুছিয়ে ঠিক করা, আর দ্বিতীয়টি তার বন্ধুর বাড়িতে বেড়াতে যাওয়া। কোন কারণে এ দুটোর মধ্যে একটি ফাঁক গেলে সে-দিনটা তার কাছে অনেকটা বাকি থেকে যেত। এই দুটো কাজই তার অভ্যাসের সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িয়ে ছিল। কিন্তু আজ সে দৃঢ়সংকল্প, জিতেনের টেবিল সে গুছোবে না। ও যদি ওর নিজের জিনিস নিজেই না গুছিয়ে রাখতে পারে, তার দায়িত্ব ও নিজেই নিক। সেদিন সত্যই সুজাতা তার টেবিলে হাত দিল না, আর তার লেখাপড়ার বইপত্তর, আসবাব অন্য ঘরে নিয়ে গেল। একটু অস্বাভাবিক তাড়াতাড়িতে সে তার সব কাজগুলো সেরে নিলে, পরে সে একটু নিবিড়ভাবে মনোযোগ দিল তার বেশচ্ছটায়। চান করে এসে ও বেছে নিলে সব চেয়ে দামি নীল বেনারসী ও তদুপযুক্ত ব্লাউজ যা সে খুব মহাসমারোহসংক্রান্ত ঘটনার সংস্পর্শ ছাড়া হাত দেয়নি। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের রূপবর্ধনের নেশা ওর লাগল। বেশভূষায় দৈহিক প্রলেপনের এতটুকু ত্রুটি সে মার্জনা করলে না। বহু চেষ্টায় যখন সে এতটুকু দোষ পেল না, না জানি কি ভেবে আয়নার দিকে চেয়ে নিজের রূপ দেখতে লাগল—যৌবনের যে রূপ সারা দেহে লীলায়িত ভঙ্গিতে একটা আকর্ষণী শক্তি রচনা করে। ওর বেশভূষা ওর রূপ, যেটা যৌবনের মধ্যাহ্নের সূর্যকিরণের মত, যার তেজ, যার মধ্যে আছে শুধু জ্বালা, সাজসজ্জার ঘটায় ও যেন তাকেই বিস্ফারিত করল।

বন্ধুর বাড়িতে যাবার আগে ঘর থেকে বেরিয়েই সে হঠাৎ পড়ল জিতেনের সামনে। জিতেন খানিকক্ষণ অবাক হয়ে সুজাতার দিকে চেয়ে রইল, কিন্তু তাতে সুজাতার চলা বন্ধ হলো না।

"খুব ব্যস্ত যে, আজ কার অভিসারে সুজাতা?"—জিতেন মৃদু হাসল।

"দেখ, ঠাট্টাটা যখন তখন ভাল লাগে না।"

"এটা কি অসময়? মনে কোন রঙের ছোঁয়া লেগেছে তাই না এত সাজসজ্জা, এমন লগ্নে সে ভাগ্যবান্‌টি কে?"

"আর যেই হোক, তুমি ত নও।"

"তোমার কথাটা আজ যেন কেমন শানাচ্ছে সুজাতা। তোমার এই বেশে এ রণের রাগ ঠিক মানাচ্ছে না। তা হলেও স লোকটির হিংসা আজ আমি করব। ার ব্যক্তিত্ব এতখানি যে তোমার বহু-াঙ্খিত সেরা জিনিসের উপর হাত ড়েছে, সেটা মনে করবার একটা অধিকারও ত আছে।"

সুজাতার চলা অনেক আগেই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, এবার ঘুরে দাঁড়িয়ে এগিয়ে এল, চাইল তার মুখের পানেঃ যেখানে একটা অনবদ্য প্রশান্ত হাসি বরাজ করছে। এ হাসি সে চেনে. একটা স্মিত হাস্যের নির্মল দিপ্তি যা বহু-দন বহু কথায় বহু আলাপের মাঝখানে সুজাতা মর্মের অতল স্তরে ঘা পেয়েছে। ওর হাসির প্রহেলিকায় সুজাতার হৃদয়ে বদ্যুৎ খেলে যায়। ও একটু ক্ষিপ্রতার সাথেই জিতেনের পড়ার ঘরে ঢুকছিল।

"সুজাতা শেষে কি আমিই বাধা হয়ে দাঁড়ালাম!" জিতেনের মুখে কৌতুকের হাসি। "না তুমি যেতে পার. আমি শুধু উপভোগ করছিলাম তোমার অভি-সার যাত্রার শুরুটাকে।"

"তুমি সাহিত্যিক মানুষ ওসব বড় কথা না বললে মানাবে কেন?"

জিতেনের ঘরে পড়ার টেবিলে হঠাৎ একটা আকস্মিক পরিবর্তন দেখে, এবং ঘরের ছিরিও যে একেবারে বদলে গেছে লক্ষ্য করে সে তার মনের কোন অবচেতন স্তরে একটা ঘা খেল, সেটা ভালো করে উপলব্ধি করবার পূর্বেই ওর চোখের সামনে ভাসল এই সুজাতার মোহিনী সাজ—যেটা তার মনে একটা নূতন রসের সৃষ্টি করেছিল, যা সুজাতার সাথে কথা বলবার সঙ্গে সঙ্গে মাঝে মাঝে প্রকট হয়ে উঠেছিল। এখন সুজাতাকে তার অভিসার যাত্রা থেকে হঠাৎ ফিরে পুনরায় টেবিল গোছাতে দেখে ব্যাপারটা কিঞ্চিৎ রহস্যের আকার ধারণ করল। সুজাতার পড়ার টেবিল যে হঠাৎ তার পড়ার ঘর থেকে অন্তর্ধান হোয়েছে এটাই সে লক্ষ্য করেছিল খুব বেশী। হায় জাতি যে মনভোলা তারও এমন কিছু থাকে যার অভাবে মৃগনাভীর মত সে চর্তুর্দিক ছুটে বেড়ায় আর যা হারিয়েছে তার সম্বন্ধেও চেতনা খুব স্পষ্ট নয়। আজ তার নূতন করে মনে হল সুজাতার কথাগুলো, "না, ক্ষোপনি, তবে অযথা প্রশ্রয় আর তোমাকে দেব না।"

জিতেন তার রহস্যালাপ এইখানেই সাঙ্গ করে হঠাৎ তার টেবিলের কাছে গিয়ে মিনতি করে বলল, "সুজাতা, লক্ষ্মী বোনটি এবার তুমি যাও বেড়িয়ে এস, আমার টেবিল আমিই গুছিয়ে নিচ্ছি।"

"থাক খুব হয়েছে।"

"না সুজাতা তুমি যাও বেড়িয়ে এস।"

"কেন বল দেখি? আমার খুশি আমি টেবিল গোছাব, তোমার দরকার হয় তুমি ছাদে গিয়ে বসে কবিতা লেখগে যা তোমার কাজ।"

বহুকষ্টে মুখে বেদনার ছায়াটুকু লুকিয়ে জিতেন হেসে বলল, "আমার সব কাজগুলো করে দিয়ে আমাকে পঙ্গু করে রেখ না সুজাতা। তুমি শ্বশুর বাড়ি গেলে আমার কি উপায় হবে।"

"তখন আর একজন জুটবে তোমার লাগাম ধরবার, আমায় রাগিও না জিতুদা।"

"কিন্তু............।"

"তুমি এঘর থেকে যাও, আমার কাজে বাধা দিও না।"

জিতেন আর কথা কইতে পারলে না। হঠাৎ সুজাতার দিকে চেয়ে তার দুই চক্ষু আনত হল। বাইরে থেকে ডাক পড়ল "জিতু"।

"যাই মাসীমা।" আরেকবার সে চেয়ে দেখলে সুজাতা নিবিষ্টমনে তার বইগুলো গুছিয়ে দিচ্ছে। বেরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে একটা দীর্ঘশ্বাস তার নিজের অজ্ঞাতে আত্মপ্রকাশ করল। টেবিল অন্তর্ধানের নূতন ব্যবস্থা তার মনে একটা নূতন আশঙ্কা এনে দিলে। মনের কোণ থেকে একটা অজ্ঞাত কাঁটা তার মনকে ক্ষতবিক্ষত করতে লাগল। তার এলোমেলো চিন্তার আকাশে কখন একটি ব্যথার তারকা তার ক্ষীণ রেখা-জ্যোতিটুকু নিয়ে দেখা দিল। মাসীমার আহ্বানের অনেক পরেই জিতেন ঘর থেকে বেরোয়। সুজাতাকে তার অভি-নব ব্যবস্থার মানে জিজ্ঞাসা করবার ইচ্ছা ছিল; কিন্তু সব সময়েই একটা অজ্ঞাত ভয় এসে তার কণ্ঠরোধ করে দিচ্ছিল। শেষপর্যন্ত তাকে কোন কথা না বলেই সে মাসীমার সঙ্গে দেখা করতে এল।

"জীতেন একটা কাজ করবি বাবা!"

"কী মাসীমা।"

কাল সুজিকে দেখতে আসবে সকাল-বেলা। গুছিয়ে গাছিয়ে দেবার মত আর কেউ ত নেই। ওর মাসীকে একবার খবর দিতে হবে। যাবি একবার আমার সঙ্গে।"

"আচ্ছা চলুন।"

কিন্তু পরক্ষণেই জিতেন অন্যমনস্ক হয়ে গেল। বেশ খানিকটা কষ্ট করে হেসে জিতেন বললে, "তাহলে সুজির বিয়েটা শীঘ্র বলুন?"

কথাটার মধ্যে যে একটা অস্বাভাবিকতা ছিল সেটা মাসীমা লক্ষ্য করেন নি। আসনের সামনে একটা রেকাবীতে খানিকটা হালুয়া, দুটো মিষ্টি ও এক-কাপ চা রেখে দিয়ে বললেন, "তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও বাবা, আমি তৈরী হয়ে নি।"

জিতেন বহুকষ্টে পুনরায় আনন্দ প্রকাশ করে বললে, "সুজির বিয়ে খুব কাছেই বলুন?" মাসীমা এবার জবাব দিলেন, "কি জানি বাবা পাত্রত ভালই, হলে ভালই হয়। এখন মেয়ের অদৃষ্ট।"

জিতেন বুঝল এ অবস্থায় তার মাসীমাকে কৃত্রিম আনন্দের ভাব দেখান ভব্যতার দিক থেকে অবশ্য কর্তব্য; কিন্তু বার্তাটা যে সাঁড়াশী হয়ে তার হৃৎপিন্ডটা টেনে বার করতে চাইছে। এই মর্মন্তুদ বেদনার মধ্যে আনন্দ প্রকাশ করার শক্তিটা যে কতখানি দরকার তা এক জিতেন ছাড়া আর কারো বোঝা কঠিন।

মাসীমা যখন গোছগাছের জন্য চোখের আড়াল হলেন তখন পৃথিবীর রূপেটা জিতেনের চোখে কিভাবে দেখা দিয়েছিল তা একমাত্র জিতেনেরই বোধগম্য। হয়ত খবরটা সে এমনভাবে কানে নিয়েছিল যেমনভাবে কোন ছোট ছেলে শোনে যে তার আদরের খেলনা তার চেয়েও খুব বেশী আদরে ছেলেকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে গেলেই খেলনার পরিবর্তে বেত্র-দণ্ডই প্রাপ্য। একটু একটু করে তার মনের মধ্যে যে আনন্দের নীড় বাসা বেঁধেছিল, মাসীমার বার্তার প্রচণ্ড ঝড়ে বুঝি তা আজ ভেঙ্গে পড়ে।

ট্যাক্সিতে চলতে চলতে হঠাৎ মাসীমা বললেন, "জিতেন একটা কথা বলতে ভুলে গেছি।"

অন্যমনস্কভাবে জিতেন বললে, "কী মাসীমা।"

"তোমার মামা আসছেন ছোটনাগপুর থেকে।"

"কবে আসবেন মাসীমা?"

"ছুটিতে আসবেন। তিনি নাকি তোমার চাকরীর ব্যবস্থা করেছেন। তোমার বাবা বোধ হয় তাঁকে এর জন্যে বিশেষ অনুরোধ করেছিলেন।"

"তা হবে।"

জিতেন ভাবল আত্মহত্যার মত এই চাকরীটা নেওয়া তার এখন সর্বাপেক্ষা উচিত। তার কল্পনা এখন সুজাতাকে নিয়ে তার প্রথম কোলকাতা আসা অবধি সকল ঘটনা খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। তার চলার পথে কোন দ্রষ্টব্য ও অদ্রষ্টব্য লক্ষ্য করা আবশ্যক বলে সে মনে করে না। কিন্তু হঠাৎ একটা পথের মোড় ফিরতেই তার লক্ষ্য পড়ল সুজাতা একটা বড় ফটকের মধ্যে ঢুকছে। আজ সে নূতন চোখে সুজাতাকে দেখতে লাগল। কিন্তু হায় ট্যাক্সির নিষ্ঠুর গতি মুহূর্তের মধ্যে সুজাতাকে আড়াল করে দিল। প্রেমের না হলেও একটা অলক্ষ্য আকর্ষণ সুজাতা ও জিতেনের মধ্যে রচেছিল, সেটা অস্বীকার্য নয়। আজ হঠাৎ কি করে সে আবিষ্কার করে বসল, সুজাতা আলেয়া। কোন পথিককে আশা দিয়ে জ্বলে উঠেছিল বটে, ওটা কেবল তার আশাটাকে জীয়িয়ে একটা ধাঁধার মধ্যে ফেলাই তার উদ্দেশ্য। সুজাতার এই আলেয়ার আলো হঠাৎ নিভে কোথায় যাবে আর দেখা যাবে না। কিন্তু তার প্রভাব যেভাবে কার্যকরী হবে ওটা ধাঁধান পথিকের মত। পথিকটি ত চলেছিল বেশ, কিন্তু তাকে বাঁধা দিতে ঐ আলেয়ার আলোটাই কেন এল? বিদেশে কলেজে পড়বার মধ্যে সুজাতাকে তার কোন প্রয়োজন ছিল? জিতেনের মনটা ক্ষণে ক্ষণে কান্নার বেদনায় গুমরে উঠতে লাগল। অসহায়ের মত চাইতে চাইতে সে গন্তব্যস্থানে কার্য সমাধা করে ফিরে এল।

জিতেন সে রাত্রেই ফিরে দেখলে সুজাতা তারই ঘরে তারই টেবিলের কাছে বসে। হাতে কতকগুলি কাগজ আর টেবিলের উপর একটা লেপাফা ছেঁড়া তাতে জিতেনের নাম লেখা। লেপাফাটা তুলেই জিতেন বুঝতে পারলে যে তারই একটা লেখা অমনোনীত হয়ে পত্রিকা আপিস থেকে ফিরে এসেছে। এই লেখাটার উপর জিতেনের কতখানি সাধনা, কতখানি চেষ্টা, কতটা ঐকান্তিকতা ছিল সুজাতা জানে। সুজাতা জানে ঐ লেখাটার জন্য ও কতদিন খাওয়া নাওয়া ভুলে গেছে। আর তাকে বিরক্ত করতে গিয়ে সুজাতা ভীষণভাবে তাড়া খেয়েছে। অবশ্য পরে জীতেন এর জন্য ক্ষমাও চেয়েছে। এরই চিন্তায় জিতেন তার সমপাঠীদের কাছে "হতাশ প্রেমিক" এই উপাধিটাও পেয়েছে। তার লেখার এই অপমান সুজাতা সহ্য করতে পারছিল না। একটা বোধ হয় নারীসুলভ করুণ মমতা সুজাতার হৃদয়কে বেদনার রসে আপ্লুত করেছিল। জিতেনের টেবিল গোছাতে গিয়ে অনেকদিন সে চুরি করে এই লেখা পড়েছিল; আজও পড়ছিল। তার মনে হল, কেন পত্রিকায় আরও কত এর চেয়ে খারাপ লেখা বেরয় এটা ত তাদের মধ্যে সামান্য আশ্রয় নিতে পারত। সে কল্পনা করে নিলে, এই প্রত্যাখ্যাত লেখা জিতেনকে কতখানি আঘাত দেবে।

বার বার মনের উপর এই নিষ্ঠুর আঘাত জিতেন আর সহ্য করতে পারলে না। সমস্ত রক্ত তার মাথার উপর গিয়ে চড়ল। এক নিমেষের মধ্যে ঐ লেখাটা সুজাতার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে ফেলে দিতে গেল। সুজাতা তার ডান হাতটা জোর করে ধরে বলল, "জিতুদা তোমার পায়ে পড়ি ওলেখাটা তুমি ফেল না, ওটা আমার কাছে থাক।" ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া আর হল না। জিতেন সুজাতার দিকে নির্নিমেষে চেয়ে রইল। একটা কথাও তার মুখ দিয়ে বেরল না। তার মনের মধ্যে কে যেন দারুণ গ্রীষ্মে বর্ষার ধারা বইয়ে দিল। কাগজগুলো গুছিয়ে নিয়ে সুজাতা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

পাকা দেখার পর সুজাতার বিয়ের পাকা কথা হয়ে গেল, তারই দিন কয়েক পরে জিতেনের মামা ছোটনাগপুর থেকে এলেন। জিতেন সুজাতার কাছ থেকে শেষ বিদায় নিয়ে মামার সাথে তার চাকরীস্থলে গেল। দুইমাস পরে সে সুজাতার একটি চিঠি পেলে, "জিতুদা আমাদের বিয়ে খুব সমারোহের সঙ্গে চুকে গেছে। ওঁকে বলে তোমার লেখা "মনোহারী"তে ছাপিয়ে দিয়েছি, তুমি আরও লিখো।"

সাহিত্যিক জিতেনের আর কলম চলে নি।

শিবপুর বা সিউড় গড়

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন

অমরার গড় সম্পর্কে যে প্রবাদের উল্লেখ করিয়াছি, তাহার মূলে যে সত্য আছে, শিবপুর বা সিউড়গড়ের কাহিনী হইতে তাহা প্রমাণিত হয়। পূর্ব প্রবন্ধে উল্লেখ করিয়াছি, সিউড় বীরভূম জেলায় ইস্ট ইণ্ডিয়ান রেলপথের লুপ লাইনে আমদপুর স্টেশনের নিকট অবস্থিত। গ্রামের কয়েক ঘর ব্রাহ্মণ ও অপরাপর স্বল্পসংখ্যক জাতিসহ অমরার গড়ের অধীশ্বর রাজা মহেন্দ্রের জামাতা রাজা শিবাদিত্যের বংশধরগণ বাস করিতেছেন। আজি সে রামও নাই, সে অযোধ্যাও নাই। গ্রাম ধ্বংসোন্মুখ, শিবাদিত্যের বংশধরগণ অধুনা দরিদ্র সংগোপ মাত্র। তথাপি তাঁহারা কুমার সংগোপ নামে পরিচিত এবং পার্শ্ববর্তী গ্রামের লোকে আজিও তাঁহাদের যথেষ্ট সম্মান করিয়া থাকেন। তাঁহাদের আতিথেয়তা ও ভদ্র ব্যবহার সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শিবাদিত্যের মন্ত্রীর উপাধি ছিল নাগ, জাতিতে মোদক। ইনি মনসাদেবীর বা নাগের উপাসক ছিলেন। তাঁহার বাসভূমি আজিও "নাগপাত্র" বা নাগপাতর নামে পরিচিত। গ্রামে নাগের পাষাণ মূর্তি আজিও সসম্মানে পূজিত হন। গ্রামখানি প্রাচীন শিবপুর রাজধানীর প্রান্তেই অবস্থিত। দেখিতেছি যে, রাজা মহেন্দ্র ও তাঁহার সম্পর্কীয় সেনাপতি ও জামাতাগণ সকলেই দেবী-উপাসক শাক্ত। শিবাদিত্যের কুলদেবী রামেশ্বরী দশভুজা মহিষমর্দিনী দুর্গা। দেবীর নিত্য সেবা ও শীতল হয়। মধ্যাহ্নভোগ হয় না, যৎসামান্য আতপ ও মিষ্টান্ন দিয়া পূজা হয়। শীতলে মিষ্টান্ন বা দুধ ও মিষ্টান্ন নিবেদিত হয়। শারদ সপ্তমীতে নবপত্রিকাসহ চারিদিন ব্যাপিয়া দেবী বিশেষরূপে পূজিতা হন। সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমীতে দেবীর সম্মুখে ছাগবলি হয়। দশমীর দিন ইক্ষু বলি। শারদ নবমীর রাত্রে দেবীর বিশেষ পূজার ব্যবস্থা আছে। বসন্তকালে শ্রীরামনবমী ও সীতা নবমীর দিনও বিশেষ পূজা ও বলি নিবেদিত হয়। নিত্য-পূজারী ব্রাহ্মণ দৈনিক আধ সের উষ্ণ চাউল ও নৈবেদ্যাদি প্রাপ্ত হন। দেবীর ধ্যান—

ধ্যায়েদ্দশভুজাং দেবীং মহিষাসুর মর্দ্দিণীং সিংহ পৃষ্ঠে সমারূঢ়াং চন্দ্রার্ধকৃত শেখরাং শঙ্খং চক্রং ধনুর্ঘণ্টাং ত্রিশূলং চর্ম্মবিভ্রতী তুলা কৃষ্ণ শরশ্চৈব তীক্ষ্ম খড়্গ দুরাসদ মুদগরঞ্চ তথা পদ্মং ত্রিনেত্রামীশ্বরেশ্বরীং

গ্রামের মধ্যস্থলে প্রায় চল্লিশ বিঘা স্থান ব্যাপিয়া রাজবাড়ি চতুর্দিকে বিশাল পরিখা ও অত্যুচ্চ প্রাচীরে পরিবেষ্টিত ছিল। প্রাচীরের উপরে, পার্শ্বে ও নিম্নদিকে, চতুর্দিক জুড়িয়া ঘন সন্নিবিষ্ট কণ্টকাকীর্ণ বেউড় বাঁশের ঝাড় রাজবাড়ি তথা প্রাচীর পরিখাকে সেকালের নিয়মে শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিত। এই সেদিনও পরিখার গভীর জলে প্রচুর মাছ ছিল। এখন পরিখার অধিকাংশ ভরাট হইয়া গিয়াছে। কিয়দংশ রাজবাটীর অধিবাসিগণের খিড়কী পুষ্করিণীর অভাব মোচন করে। কিছুদিন পূর্বেও বৎসরের একটি বিশেষ দিনে রাজবংশের সর্বাপেক্ষা প্রধান ব্যক্তি ধুমধামের সহিত ভগ্ন সিংহদ্বারে গিয়া বসিতেন এবং তাঁহার অভিষেক উৎসবের অভিনয় হইত, এমনই করিয়াই তাঁহারা পূর্ব স্মৃতি রক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন; ইদানীং সে প্রথা উঠিয়া গিয়াছে। তবে রাজবংশীয় কোন পরলোকগত ব্যক্তির বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধ করিতে হইলে পূর্বকথিত সিংহদ্বারের ভগ্নস্তূপেই গিয়া সম্পন্ন করিতে হয়। সিংহদ্বারে দ্বাররক্ষক বা দ্বারবাসিনী নামে কয়েকটি ভগ্নমূর্তি ও একটি অর্ধভগ্ন বাসুদেব মূর্তির পূজা হয়। একটি প্রস্তর স্তম্ভ কালরুদ্র নামে পূজিত হন। গ্রামের বাহিরেও প্রায় দুই ক্রোশ জুড়িয়া পরিখা প্রাকারের শেষ চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রামে ব্রাহ্মণ, কুমার সংগোপ, কলু, শুঁড়ি, কৈবর্ত, বাইতি, মালবাগ্দী, ডোম, মুচি, ধাঙগড় প্রভৃতি জাতির বাস। লোকসংখ্যা প্রায় পাঁচশত হইবে। ঘরের সংখ্যা আন্দাজ দেড়শত। গ্রামে পূর্বে সমৃদ্ধি ছিল। সে সময় অনেকগুলি গুণী ব্যক্তি গ্রামের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। মাখন মুখোপাধ্যায়, উমেশ মুখোপাধ্যায় প্রখ্যাত নামসংগীতবিদ্ ছিলেন। ইঁহাদের সঙ্গে সাতকড়ি মুখোপাধ্যায় প্রখ্যাত নামসংগীতবিদ্ ও বীরভূমের বাহিরেও খ্যাতি ছিল। পাঁচকড়ি দাস রসকীর্তন গায়ক ও হরিচরণ, উমেশ, গোপাল ও মহানন্দ বাইতি যশস্বী মৃদঙ্গবাদক ছিলেন। গ্রামে বাহুবলেরও চর্চা ছিল। শুকময় মাল ও তাঁহার সাগরেদগণ চোর ডাকাইতের আতঙ্ক সৃষ্টি করিত। গ্রামে কতকগুলি বড় বড় পুষ্করিণী আছে। দুর্সতিনী নামক পুষ্করিণীর পরিমাণ প্রায় চল্লিশ বিঘা। দীঘি, সায়র ও কুমার পুষ্করিণীর প্রত্যেকটির পরিমাণ প্রায় কুড়ি বিঘা হইবে। রাজমাতা ও রাণীগঙ্গাও ক্ষুদ্র পুষ্করিণী নহে। বলিতে ভুলিয়াছি, শিবাদিত্যের মন্ত্রী কূটনীতির জন্য ব্যাসদেব নামে পরিচিত ছিলেন। নাগপাত্রের অপর নাম ব্যাসপুর। গ্রামে নাগদেবী ও নিদারুণ অনাদি শিব আছেন। বর্গীর হাঙ্গামায় সিউড় ছারখার হইয়া যায়। রাজবাটী লুণ্ঠিত হয়, বাড়ির প্রাচীনা দাসী ছয়মাসের শিশু রাজবংশীয় উদয়সিংহকে লইয়া পলাইয়া রাজবংশকে রক্ষা করেন। পলাইবার কালে আপনার শিশুপুত্রকে রাজবেশ পরাইয়া উদয়সিংহকে হীন বাসে আপনার পুত্ররূপে সাজাইয়া জীতকণ্ঠে রাজবাটী হইতে গ্রামান্তরে পলাইয়া যান। বর্গীরা এই দাসীপুত্রকে হত্যা করে। বর্গীর হাঙ্গামা যতদিন চলিয়াছিল, দাসী আত্মপ্রকাশ করে নাই। সকলেই ভাবিয়াছিল, দাসীর সঙ্গে রাজপুত্রও নিহত হইয়াছে। বহুদিন পরে দাসী রাজপুত্রকে লইয়া রাজবাটীতে আসিয়া উপস্থিত হয়। সকলেই রাজপুত্রসহ দাসীকে সানন্দে গ্রহণ করেন এবং দাসীর মুখে সমস্ত কথা শুনিয়া শোকাচ্ছন্ন হন। এই অশিক্ষিতা তথাকথিত্য নীচজাতীয়া পল্লীরমণী ধাত্রী পান্নার মতই আমাদের পূজনীয়া। এতদিন পরে আমরা সেই অজ্ঞাতনামা রমণীর উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিতেছি এবং নিজদিগকে ধন্য মনে করিতেছি। সন ১২০৭ সালে রাজবাটীর বিষয়সম্পত্তি লইয়া বৃটিশ রাজকর্মচারিগণ গোলযোগ উপস্থিত করিলে তদানীন্তন রাজবংশধর শ্রীসমর সিংহ রায় বীরভূমের সদর সিউড়ীর জজ আদালতে যে দরখাস্ত করিয়াছিলেন, আমরা তাহার অবিকল নকল উদ্ধার করিয়া দিলাম।

"সুরত হাল হকিকর লিখিতং শ্রীসমরসিংহ রায়, ওলদে প্রতাপসিংহ রায় ইরণে রণসিংহ রায় সাকিম মৌজা শিবপুর পং (পরগণে) সাবেক মৌড়েশ্বর মত্তালকে জেলা বীরভূম আমার বৃদ্ধ প্রপিতামহ উদয়সিংহের লাখেরাজ খানাবাড়ি, পুষ্করিণী ও বাগাত ও খোসবাস অনেককালীয় রাজা সাবেক জমিদারি শিবাদিত্যের দত্ত খানাবাড়ি কাত ৮৷৷ সাড়ে আট বিঘা ও খোসবাস ৮ কিত্তার কাত ২৷৷৪ দুই বিঘা চৌদ্দ কাঠা ও পুষ্করিণী ৫ কাত ৩০/ ত্রিশ বিঘা ও

(শেষাংশ ১৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বিদুষী ভার্যা

—শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়—

৩১

এক সুরে বাঁধা দুইটা তারের যন্ত্রের মধ্যে একটা অপরটা হইতে আধ পর্দা-টাক চড়িয়া অথবা নামিয়া গেলে যে অবস্থা হয়, যূথিকা এবং দিবাকরের মধ্যে দুই তিন দিন ধরিয়া সেই অবস্থা চলিয়াছে। দিনের মধ্যে অধিকাংশ সময়ই তাহারা পরস্পরের সহিত কথা না কহিয়া চুপচাপ করিয়া থাকে, কিন্তু কথা কহিলেই একটা বেসুরা কর্কশ সুর বাজিয়া উঠে।

রাজসাহী যাইবার পূর্বে এ অবস্থার ঠিক এতটা আতিশয্য ছিল না। তখনো মাঝে মাঝে বেদনার আঘাতে মনের বায়ুমণ্ডল স্পন্দিত হইত, কিন্তু সে স্পন্দন তখনো দুঃখ অথবা অভিমানের এলাকা অতিক্রম করিয়া অপর কোনো বিষমতর এলাকায় প্রবেশ করিতে আরম্ভ করে নাই। তখন, বেদনা যেমন ছিল, সমবেদনাও ছিল। নিজের অজ্ঞাতসারে, এবং কয়েকজনের চক্রান্তের ফলে, বিবাহের দ্বারা দিবাকর যে নিরুপায় এবং অনভিলষিত অবস্থা-সঙ্কটের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, তজ্জন্য যূথিকার মনে সমবেদনার অভাব ছিল না। এমন কি, সেই চক্রান্তের মধ্যে তাহার নিজের দিক হইতে অনুমোদন এবং লিপ্ততা ছিল বলিয়া সমবেদনার সহিত একটা আত্ম-গ্লানিও সে মাঝে মাঝে ভোগ করিত। এখনো যে সে সমবেদনা নাই তাহা নহে। কিন্তু বিকারগ্রস্ত অচেতন রোগীর সকল প্রকার অত্যাচার এবং উপদ্রব সর্বতো-ভাবে ক্ষমনীয় জানিয়াও শুশ্রূষাকারী যেমন মাঝে মাঝে ধৈর্য হারাইয়া বিরক্ত হইয়া উঠে, সেই অবস্থা হইয়াছে যূথিকার।

বেলা তখন তিনটা বাজিয়াছে। দ্বিতলের শয়ন-কক্ষের সম্মুখে বারান্দায় বসিয়া দিবাকর এবং যূথিকার মধ্যে কর্কশ সুরেরই একটা পালা চলিয়াছিল। তাহারই মধ্যে এক সময়ে যূথিকা বলিল, "সাধারণ সভাসমিতির কথা ত' সেদিন শেষ হয়ে গিয়েছে, সে কথা বলছিনে। আমি বলছি ঘরুয়া বিয়ে-পৈতের উৎসবের কথা। ধর, শেফালীর বিয়ের সময়ে তোমাকে যদি লাহোরে টেনে নিয়ে যাই, তা হ'লেও কি তোমাকে অপমানিত করবার জন্যেই নিয়ে যাওয়া হবে ব'লে মনে করবে? আমাদের জামাইবাবু ত' এম্-এ পাশ, মেজজামাইবাবু শিবপুরের বি-ই; ধর, শেফালীর স্বামীও যদি এক-জন পি-এইচ্-ডি কিম্বা ঐ রকম কিছু হয়,—তা হ'লে?"

দিবাকর বলিল, "তা হ'লে এই কথাই মনে করব যে, আমার মতো লোকের পক্ষে, ঘরই বল আর বাহিরই বল, কোনো জায়গাই নিরাপদ নয়।"

"আচ্ছা, আমি যদি ম্যাট্রিক পাশও না হতাম, তা হ'লে কি আমাদের এম্-এ পাশ জামাইবাবু আর বি-ই পাশ মেজজামাইবাবুদের মধ্যে তুমি নিজেকে নিরাপদ মনে করতে?

এক মুহূর্ত মনে মনে চিন্তা করিয়া দিবাকর বলিল, "হয়ত' করতাম।"

"কেন? তা কেন করতে?"

"কারণ, তা হ'লে বামন হ'য়ে চাঁদে হাত দেওয়ার অবিবেচনার অপরাধে কেউ আমাকে অপরাধী করতে পারত না"

"কিন্তু, আমি ম্যাট্রিক পাশও নই মনে ক'রে তুমি আমাকে বিয়ে করেছ, এ কথা জানলে কেউ ত' তোমাকে সে অপরাধে অপরাধী করতে পারবে না।"

যূথিকার কথা শুনিয়া দিবাকরের মুখে কৌতুক এবং বিদ্রূপ মিশ্রিত একটা তীব্র হাসি জাগিয়া উঠিল। ঈষৎ তীক্ষ্নকণ্ঠে সে বলিল, "তা হ'লে ত' সে কথা সকলকে জানিয়ে দেওয়ার ভার আমাকেই নিতে হয়। শেফালীর বিয়ের রাত্রে বাসর ঘরে তার স্বামীর কানে কানে সাফাই গেয়ে রাখতে হয় আমাকেই। কিন্তু এ রকম ক'রে নিজের মান নিজে বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব ব'লে মনে কর কি তুমি?"

যূথিকা দেখিল, তর্কের এই ধারা অনুসরণ করিয়া কোনো সুসিদ্ধান্তে উপনীত হইবার আশা নাই। তখন সে ভিন্ন পথ অবলম্বন করিয়া বলিল, "আচ্ছা, আমি ম্যাট্রিক পাশও না হ'লে তুমি খুশি হতে?"

দিবাকর বলিল, "দুঃখিত হতাম না।"

"খুশি হতে?"

"হতাম।"

"এর চেয়েও?"

"বোধহয় এর চেয়েও।"

'বোধহয়' কথাটা যে কেবল সামান্য-একটু ভদ্রতা অথবা সান্ত্বনা দিবার জন্য ব্যবহৃত, তাহা বুঝিতে যূথিকার বিলম্ব হইল না। কি বলিবে সহসা ভাবিয়া না পাইয়া সে চুপ করিয়া রহিল।

দিবাকর বলিল, "দুঃখ কি জানো যূথিকা? দুঃখ এই যে, এ শুধু আমারই স্বখাত সলিল নয়। তা হ'লে দোষ কারো নয় গো মা, আমি স্বখাত সলিলে ডুবে মরি শ্যামা' ব'লে সান্ত্বনা পেতে পারতাম। এ সলিল সৃষ্টি করবার জন্যে অনেকেই কোদাল পেড়েছে। দিদি পেড়েছেন, জামাইবাবু পেড়েছেন, তোমার বাবা-মা পেড়েছেন, এমন কি তুমিও দু'চার কোপ পাড়তে কসুর করোনি।"

দিবাকরের কথা শুনিয়া যূথিকার মনে সমবেদনা পুনরায় উদ্যত হইয়া উঠিল।

ব্যথিত কোমল কণ্ঠে সে বলিল, "আচ্ছা, এ ব্যাপারটা তোমাকে কি একটু বেশী মাত্রায় বিচলিত করে না? আমার ত' মনে হয় এত বিচলিত হবার তেমন কোনো কারণ নেই।"

মৃদু হাসিয়া দিবাকর বলিল,"একাধিক বার এ কথার উত্তর দিয়েছি। তার-পরও যদি জিজ্ঞাসা কর তা হ'লে এবার বলব, 'কি যাতনা বিষে বুঝিবে সে কিসে, কভু আশীবিষে দংশেনি যারে'। তুমি বলছ, তেমন কোনো কারণ নেই, সুনীথ-দাদাও বলেন, তেমন কোনো কারণ নেই; নিশাকে জিজ্ঞাসা করলে সে-ও হয়ত' বলবে, তেমন কোনো কারণ নেই। কিন্তু তোমাদের ত' আশীবিষে দংশন করে নি, বিষের জ্বালা যে কি জ্বালা, তোমরা তা বুঝবে কিসে!"

এক মুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া যূথিকা বলিল, "একটা কথা বলব, শুনবে?"

"কি কথা, বল।"

"আমার কাছে তুমি ইংরেজি শিখতে আরম্ভ কর। আমি আমার সমস্ত শরীর আর মন নিযুক্ত করব তোমাকে শেখানোর কাজে। পূজোপাঠ ছেড়ে দেবো, সংস্কৃত পড়া ত্যাগ করব, স্কুলের কাজকর্মে ইস্তফা দোবো,—সকাল দুপুর সন্ধ্যে রাত্রি—শুধু তোমাকে পড়াব। ইংরেজিতে তোমার সঙ্গে কথা কয়ে কয়ে তোমাকে ইংরেজিতে কথা কওয়ার অভ্যেস করিয়ে দোবো। আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি, বছর চারেকের মধ্যে এমন তৈরী করে দোবো তোমাকে, যাতে তুমি চার বছর পরের ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির এম্-এ পরীক্ষার প্রশ্নের উত্তর লিখলে, দেখবে ফার্স্ট ক্লাসের মার্ক পাবার উপযুক্ত হয়েছ তুমি। বিশ্বাস কর, এ আমি পারি।"

দিবাকর বলিল, "বিশ্বাস করছি, কিন্তু এতে আমি রাজি নই।"

"কেন"

"সে কৈফিয়ৎ দিতেও রাজি নই।"

যে কোমল ভাব কিছু পূর্বে যূথিকার মুখমণ্ডলে নামিয়া আসিয়াছিল, তপ্ত-ক্ষেত্রে বারিকণার ন্যায়, সহসা তাহা লুপ্ত হইল। ঈষৎ তীক্ষ্ণকণ্ঠে সে বলিল, "কিন্তু তোমার অন্যায় কথা;) এ তোমার অবিচার! পাশ করার কথা লুকিয়ে রেখে তোমাকে বিয়ে করেছি ব'লে মনে মনে আমাকে অপরাধী করে রাখবে, অথচ সে অপরাধ ক্ষালনের সুযোগ দেবে না আমাকে!"

দিবাকর বলিল, "এ সুযোগ দিলেও তোমার অপরাধ ক্ষালন হবে না। চার বৎসর পরের এম্-এ 'পরীক্ষার প্রশ্নের উত্তর লিখে ফুল মার্ক পেলেও ম্যাট্রিক ফেলের সুনাম আমার কাঁধে সওয়ার হ'য়ে থাকবে। জাতও যাবে, অথচ পেটও ভরবে না।"

তীক্ষ্ণতর কণ্ঠে যূথিকা বলিল, "পেট ভরবে না, সে কথা না-হয় বুঝলাম। কিন্তু জাত যাবে কিসে বলছ?"

দিবাকর বলিল, "সে কথা শুনলে কোনো লাভ হবে না তোমার। যে কথা শুনলে কিছু হ'তে পারে সেই কথা বলি শোনো। তুমি চার বছরের কোর্সের কথা বলছ, কিন্তু যে উপায় আমি স্থির করেছি তা'তে বছর দুয়েকের কোর্সেই কেল্লা ফতে করতে পারব। ভারতবর্ষে থেকে তা অবশ্য হবে না; বিলেত যেতে হবে তার জন্যে।"

সকৌতূহলে যূথিকা বলিল, "বিলেত যাবে তুমি?"

"যাব।"

"বেশ ত, আমাকেও সঙ্গে নিয়ে চল।"

যূথিকার কথা শুনিয়া দিবাকর হাসিয়া উঠিয়া বলিল, "তা হলেই হয়েছে! তা হ'লে কালা আদমির লাঠির সাহায্যে চলাফেরা করে দু'বছর পরে খোঁড়া হয়েই দেশে ফিরতে হবে। যে দিবাকরবাবু সেই দিবাকরবাবুই থেকে যাব আমি, লাভের মধ্যে তুমি আর-একটু চড়া পর্দার মেমসায়েব হয়ে আসবে।"

যূথিকা বলিল, "সে ভয় যদি থাকে তা হ'লে আমাকে নিয়ে যেয়ো না। কিন্তু বিলেত গিয়ে দু বছরের কোর্স কি নেবে, তা বুঝতে পারছিনে।"

দিবাকর বলিল, "সে কোর্স আরম্ভ হবে, বোম্বাইয়ে জাহাজে পা দেওয়া থেকেই। আমার শিক্ষার অধ্যাপক অধ্যাপিকা হবে জাহাজের ইংরেজ ক্যাপ্টেন, স্টিউয়ার্ড, ইংরেজ যাত্রী-যাত্রিনী; ইংল্যাণ্ডের রেল স্টেশনের ইংরেজ পোর্টার; ইংরেজ ল্যাণ্ডলেডির ছেলেমেয়ের দল; ইংরেজ দাসদাসী, বন্ধুবান্ধব। ব্রাহ্মণের কাছে দীক্ষা নিয়ে যেমন দ্বিজত্ব লাভ করতে হয়, তেমনি ইংরেজের কাছে দীক্ষা নিয়ে সাহেবিয়ানা লাভ করব আমি। তার মধ্যে দেশি রক্তের সংস্পর্শ রেখে জিনিসটাকে ভেজাল করব না। তারপর বছর দুই পরে লণ্ডনের সব চেয়ে অ্যারিস্টোক্র্যাটিক দোকানের বিলিতি সুট পরে মুখে মূল্যবান মোটা চুরুটের সঙ্গে বিলিতি বুলি আওড়াতে আওড়াতে যখন ভারত-বর্ষে এসে পদার্পণ করব, তখন তোমার এখানকার পাঞ্জাব আর ক্যালকাটা ইউনি-ভার্সিটির এম-এ ডিগ্রী সেই বিলেত থেকে আনা বিলিতি সভ্যতার এক গণ্ডুষ জলের মধ্যে লজ্জায় ডুব মারবে।"

যূথিকার মনের অবস্থা প্রসন্ন ছিল না, তথাপি দিবাকরের কথার শেষাংশ শুনিয়া একটা ক্ষীণ অবাধ্য হাস্য মুহূর্তের জন্য অধর প্রান্তে উপস্থিত হইয়া মিলাইয়া গেল। মৃদু কণ্ঠে সে বলিল, "বিলেত থেকে আর একটা জিনিস যদি সঙ্গে আনতে, তাহলে ডুব মেরে আর উঠত না।"

"কি আনতাম?"

"একটা ইংরেজ বউ।"

ক্ষণিকের জন্য দিবাকরের মুখ ঈষৎ আরক্ত হইয়া উঠিল; কিন্তু তখনই পরিহাসটা পরিপাক করিয়া লইয়া সহজ সুরে বলিল, "নিতান্ত মন্দ বলনি। তা হলে, এমন কি, মিস্টার ফরেস্টারের পিঠ চাপড়ে একটা মধুর সম্পর্কের মিষ্ট সম্ভাষণ করা যেতেও পারত। কিন্তু ঠিক অতটা সৎসাহসের যোগান পাব বলে ভরসা হয় না।"

এ কথার কোন উত্তর না দিয়া যূথিকা নীরবে বসিয়া রহিল।

দিবাকর বলিয়া চলিল, "তুমি হয়ত পরিহাস করছ, কিন্তু আমি করছিনে। তোমার যদি বিশ্বাস না হয় তা হলে আমি একটি ভদ্রলোককে সাক্ষী মানব, যাঁর কথা হঠাৎ মনে পড়ায় বিলেত যাবার সংকল্প আমার মনে উদয় হয়েছে। আমার বড়মামার ভায়রাভাই মিস্টার ডি ভাটা-চারিয়ার কথা বলছি। তিনি অর্থাৎ শ্রীমান দেবদাস ভট্টাচার্য থার্ড ক্লাস ফেলের বিদ্যে পেটে পুরে বিলেত গিয়ে

কয়েক বৎসর সেখানে বাস করার পর টেমস্ নদীর জলে স্নান করে সাহেবত্ব পেয়ে দেশে ফিরে এলেন একেবারে ডি ভাটাচারিয়া হয়ে। সাহেবি উচ্চারণের ইংরেজি কথার দাপটে বি এ পাশ এম এ পাশরা ম্লান হয়ে গেল। তারপর ডি ভাটাচারিয়া একে একে হয়েছেন গোটা দুই ব্যাঙ্ক আর ইনসিওরেন্স কোম্পানীর ডিরেক্টর, দেশের মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান, ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান, কয়েকটা অ্যাডভাইসরি কমিটির মেম্বার, আরও অনেক—অনেক কিছু যা আমি ঠিক জানিনে। উপস্থিত কলকাতা শহরের তিনি একজন গণ্য এবং মান্য ব্যক্তি; যাঁর সঙ্গে আলাপ করে বড় বড় বিলিতি ফার্মের হোমরা-চোমরা বড়সাহেব মেজ সাহেবেরা আপ্যায়িত হয়। ডি ভাটাচারিয়ার নজিরের সামনে তুমি আমাকে বিলেত যেতে মানা করবে যূথিকা?"

শান্ত মৃদুকণ্ঠে যূথিকা বলিল, "না, করব না। কিন্তু একটা কথা তুমি আমাকে বলবে?"

"কি কথা?"

"আমি যদি তোমার মূর্খ স্ত্রী হতাম। যদি কোন পাশটাশ না করতাম, তা হলে তুমি বিলেত যেতে?"

"উপস্থিত এখন? না, কখনই যেতাম না। কখনো যদি দেশ ভ্রমণের উদ্দেশ্যে সখ করে যেতাম ত সে কথা আলাদা।"

"তা হলে এ কথা বোধ হয় বলা যেতে পারে যে, উপস্থিত আমার জন্যেই তুমি বিলেত যাচ্ছ?"

"নিশ্চয় বলা যেতে পারে, কারণ পাঞ্জাব মেলে গার্ডের সঙ্গে যে ঘটনা ঘটেছিল, কিম্বা রাজসাহীতে ভিজিটার্স বুক উপলক্ষে সেদিন যে ঘটনা ঘটল, তার মতো আরো দু-চারটে ঘটনা আমার জীবনে ঘটে তা আমি একেবারেই চাইনে। সেইজন্যে তোমার উপযুক্ত হওয়ার চেষ্টায় আমাকে বিলেত যেতে হবে।"

এক মুহূর্ত মনে মনে কি চিন্তা করিয়া যূথিকা বলিল, "আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করলেই উপস্থিত সব কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করা হয়।"

"কি বল?"

কিন্তু সে কথা জিজ্ঞাসা করিবার সুযোগ হইল না। বারান্দার অপর প্রান্তে বাঁকের অন্তরাল হইতে এক মুখ হাসি লইয়া সহসা আবির্ভূত হইল ক্ষীরোদ-বাসিনী।

ক্ষীরোদবাসিনীকে দেখিয়া দিবাকর ও যূথিকা তাড়াতাড়ি চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

স্মিতমুখে দিবাকর বলিল, "এস এস ক্ষীরোদ ঠাকমা! স্বাগতম্, সুস্বাগতম্! কিন্তু শিবানী কই? সে আসেনি?"

আগাইয়া আসিতে আসিতে ক্ষীরোদ-বাসিনী বলিল, "এসেছে বই কি, পেসন্নর কাছে বসে গল্প করছে। আমি লুকিয়ে চুরিয়ে যুগল-মিলন দেখতে এলাম।"

যূথিকা তাড়াতাড়ি আগাইয়া গিয়া নত হইয়া ক্ষীরোদবাসিনীর পদধূলি গ্রহণ করিল। (ক্রমশ)

শিবপুর বা সিউড়গড়

(১১ পৃষ্ঠার পর)

জলহরি ৪ কাত ৪/ চারি বিঘা একুনে ৪ ৫/৪ পঁয়তাল্লিশ বিঘা চারি কাঠা ও পরগণে পুরন্দরপুর দরুণ মৌজে গঙ্গপুরের বাগাত ১ কাত ৯৭২ নয় বিঘা সতর কাঠা একুনে ৫৫/১ পঞ্চান্ন বিঘা এক কাঠা দুই পরগণে এই সকল মৌজে মহন্দরে আছে। ঐ লাখেরাজ খানাবাড়ি ও পুষ্করিণী ও বাগাত ও খোসবাস মহন্দর আমার বৃদ্ধ প্রপিতামহ অবধি আইজ পর্যন্ত পুরুষানুক্রমে ভোগদখল করিয়া আসিতেছি ঐ লাখেরাজ ও পুষ্করিণী ও বাগাত মহন্দরে জমিদার মহসুপের দস্ত সনন্দ সন ১১৫৪ সালে বর্গীর হাঙ্গামে খোয়া গিয়াছে। সনন্দের সন তারিখ জ্ঞাত নহি লাখেরাজ ও পুষ্করিণী ও বাগাত ও খোসবাস মহন্দর আমার পুরুষানুক্রমে আইজ পর্যন্ত ভোগদখলে আছে ইহার যে কেহ জ্ঞাত আছে এই খতে হালে আপন আপন সাইদ লেখাই ইতি তারিখ ১২০৮ সাল তারিখ ১৯শে মাঘ

ইসাদ ইসাদ ইসাদ
শ্রীরাজিধর শর্মা শ্রীভারত শর্মা শ্রীহরি ঘোষ
সাং শিবপুর সাং শিবপুর সাং বাজার

নানা কারণে প্রায় দেড়শত বৎসরের পুরাতন এই দলিলখানি বিশেষ মূল্যবান। ইহা হইতে এইটুকুও অন্তত জানা যায় যে, অমরার গড়ের মহেন্দ্রের ও তাঁহার জামাতা শিবাদিতোর সঙ্গে ঐতিহাসিক সত্যের সম্বন্ধ আছে। রাজবংশীয় শ্রীঅবিনাশ-চন্দ্র সিংহ ও শ্রীশশধর সিংহ বলেন—রণসিংহের পিতার নামই উদয়সিংহ। ইনিই বর্গীর হাঙ্গামায় দাসী কর্তৃক রক্ষাপ্রাপ্ত হন। উদয়সিংহের পিতার নাম গোপাল-সিংহ। গ্রামের ব্রাহ্মণ সন্তানগণ ও রাজবংশীয়গণ এবং নিকটবর্তী বিক্রম-ইকড়া গ্রামনিবাসী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রক্ষাকর ভট্টাচার্য মহাশয় গ্রামের সমস্ত স্থানে ঘুরিয়া এবং প্রবাদ সংগ্রহ করিয়া ও কাগজ দেখাইয়া বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। এই অবসরে ইঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। বহু চেষ্টা করিয়াও বিশুদ্ধ কষ্টিক প্রস্তরে নির্মিতা দেবী রামেশ্বরীর ও বাসুদেব মূর্তির ও নিকটবর্তী গ্রামের নাগদেবী প্রভৃতি মূর্তির আলোকচিত্র সংগ্রহ করিতে পারি(নাই।

ভ্রাতৃ মিলনপীঠ চিত্রকূট

শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ

চারি-পাঁচ হাজার বৎসর রামায়ণ মহাভারতে বর্ণিত চরিত্রগুলির মহান্ আদর্শ ভারতের নর-নারীকে অনুপ্রাণিত করিয়া আসিতেছে। রামায়ণের কবি যে সমস্ত মহান্ চরিত্র সৃজন করিয়াছেন, তাহার মধ্যে ভরতের চরিত্র অপূর্ব। ভরতের ভ্রাতৃভক্তি, অগ্রজের প্রতি অনুরাগ, রামচন্দ্রের প্রতি একনিষ্ঠ আনুগত্য মানবসমাজে দুর্লভ। কবি বাল্মীকি অপূর্ব কৌশলে, মধুর ভাষায় ভরতের ভ্রাতৃপ্রেম অপার মহিমায় মণ্ডিত করিয়া রামায়ণ মহাকাব্যে গাহিয়া গিয়াছেন, সেই মহান্ আদর্শের সহিত চিত্রকূট স্থানটি জড়িত থাকায় চিত্রকূট পরম পবিত্র তীর্থ।

কেবল পুণ্যস্থানরূপে চিত্রকূট প্রসিদ্ধ নহে, প্রকৃতির মনোরম লীলার আকররূপেই বিরাজিত। কবি ভারতে রামলীলার স্থানগুলি যেন স্বচক্ষে দর্শন ও স্বশরীরে ভ্রমণ করিয়া তাঁহার কাব্যে সন্নিবেশিত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার কাব্যে বর্ণিত সরযূ নদী, অযোধ্যা, নাসিকের পঞ্চবটী বন, রামগিরি (বর্তমান রামটেক), গোদাবরী তীরের আশ্রম, রামেশ্বর, ধনুস্কোটী, সেতুবন্ধ, দণ্ডকারণ্য আজও সেই চারি হাজার বৎসরের পূর্বের প্রকৃতির মোহন ছবির কথা চিত্তে উদয় করিয়া দিতেছে। আজও ভারতের শত সহস্র নরনারী সেই সব পুণ্য স্থানগুলি দেখিবার জন্য আগ্রহান্বিত। গৌরবময় ভারতের উজ্জ্বল ছবি, ভারতের সংস্কৃতি, ভারতের ঐতিহ্যের প্রমাণ যেন এই পুণ্যতীর্থগুলি বক্ষে ধারণ করিয়া রাখিয়াছে। যুগযুগের প্রকৃতির তাড়না, মানবের অত্যাচার—এই পুণ্যস্থানগুলির মাহাত্ম্য লুপ্ত করিতে পারে নাই।

ভরতমাতা কৈকেয়ী স্বপুত্রকে অযোধ্যার রাজসিংহাসনে বসাইবার ইচ্ছায় স্বামী রাজা দশরথের নিকট হইতে জ্যেষ্ঠপুত্র রামচন্দ্রের পরিবর্তে ভরতকে রাজ্যদান ও স্বপতিপুত্র রামচন্দ্রের চৌদ্দ বৎসর বনগমন আদেশের বর দুইটি কৌশলে আদায় করিয়াছিলেন। তাঁর এই অপকর্ম মাতৃভক্ত ভরতই সফল হইতে দেন নাই। নিজ স্বার্থ ও মাতৃ-ইচ্ছা উপেক্ষা করিয়া ভরত রামচন্দ্রকে ফিরাইয়া আনিবার নিমিত্ত রামের অনুসন্ধানে বাহির হইলেন। রামচন্দ্র যখন চিত্রকূট পর্বতের আশ্রমে বাস করিতেছেন, তখন ভরত পাত্র-মিত্র লইয়া চিত্রকূট পর্বতের পাদদেশে উপনীত হইলেন। যেখানে ভরত রামচন্দ্রের সাক্ষাৎ পাইয়াছিলেন, চিত্রকূট পর্বতের সেই স্থান আজও "ভরত মিলাপ পীঠ" নামে পরিচিত।

ভরতের মুখে পিতা রাজা দশরথের মৃত্যু সংবাদ এই চিত্রকূট পর্বতে বসিয়া রাম শ্রবণ করেন এবং মন্দাকিনী গঙ্গাতীরে যে ঘাটে পিতৃশ্রাদ্ধ করেন, তাহা এখনও 'রামঘাট' নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে। স্বচ্ছ-সলিলা পুণ্য-তোয়া মন্দাকিনী গঙ্গা অনুচ্চ পার্বত্য প্রদেশের মধ্য দিয়া কুল কুল নিনাদে মৃদুমন্দ গতিতে এখনও চলিয়াছে। মন্দাকিনীর তীর স্তরে স্তরে প্রস্তরমণ্ডিত হইয়াছে। অসংখ্য সোপানশ্রেণী ও প্রশস্ত বহু ঘাট চিত্রকূটে বিরাজ করিতেছে। এই সব ঘাট বাহিয়া উপরে উঠিলে পাহাড়ের সমতল স্থানে নদীর তীরে মন্দির, মঠ, ঠাকুর বাটী এখনও দণ্ডায়মান দেখা যায়। সংস্কার অভাবে অধিকাংশ সৌধই পতনোন্মুখ।
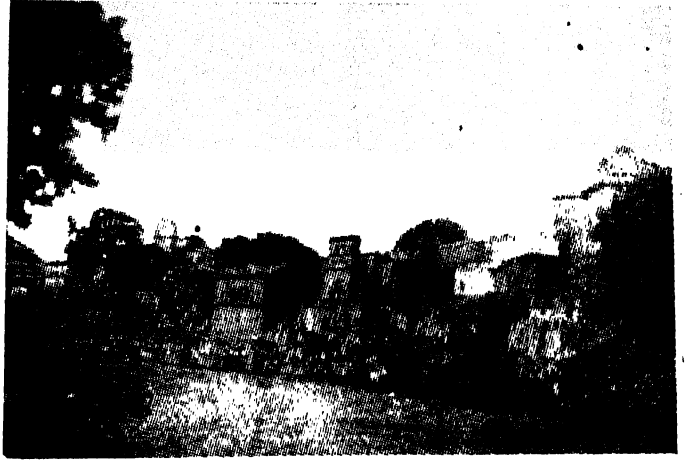
মন্দাকিনী তীরে—চিত্রকূট

কথিত আছে, রামঘাট নামে যে বিস্তৃত ঘাট রহিয়াছে, সেই স্থানেই রামচন্দ্র পিতৃ-মৃত্যু সংবাদ পাইয়া শ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন। কোন উপকরণ না পাইয়া ইঙ্গুদী ফল চূর্ণ দিয়াই পিতৃশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিতে বাধ্য হন। তদবধি হিন্দুরা এই স্থানে পিতৃ-পুরুষগণের শ্রাদ্ধ ও পিণ্ডদান করা পরম পুণ্য মনে করেন। তুলসীদাস রামায়ণে রামঘাটে শ্রাদ্ধ করার মহাত্ম্য বর্ণিত আছে।

ভোর ভয়ে রঘুনন্দনজী, যো মুনি
আবুস দীহ্‌।
শ্রাদ্ধ ভক্তি সমেত প্রভু, সো সব
শ্রাদ্ধ কীহ্‌॥
করি পিতু ক্রিয়া বেদজস্ বরণী
ভি, পুণীতে পাতক তম তরণী।
জাসু নাম পাবক অর্ঘ্য তুলা,
সোভিরত সকল সুমঙ্গল মূলা॥

সংস্কৃত রামায়ণ যেমন হাজার হাজার বৎসর ভারতবাসীকে অনুপ্রাণিত করিয়া আসিতেছে, বহু কবি, দার্শনিক ধর্ম-নেতাদের আদর্শের উৎস, তেমনই বাঙলা ভাষায় কৃত্তিবাস, হিন্দী ভাষায় তুলসীদাস কোটি কোটি নর-নারীকে অনুপ্রাণিত করিয়া থাকে। এখনও বাঙলাদেশে কৃত্তিবাস রামায়ণের বিভিন্ন সংস্করণের পুস্তক প্রতি বৎসর লক্ষাধিক বিক্রয় হইয়া থাকে।

তুলসীদাসের রামায়ণ লক্ষ লক্ষ হিন্দী ভাষা-ভাষী নর-নারীর চিত্তে অপার শান্তি ও সুগভীর ভক্তির উৎস হইয়া আছে। সেই অমর কবির সাধন-পীঠ এই চিত্রকূটের রামঘাট। রামঘাটের উপর অবস্থিত "তুলসীকুঞ্জ"-এ বসিয়া তুলসীদাস ১৬৩২ সম্বৎ হইতে হিন্দি ভাষায় রামায়ণ রচনা আরম্ভ করেন। শেষ জীবনে কাশীধামের চৌখাম্বা অঞ্চলে গোবিন্দজীর মন্দিরের পশ্চিম অংশে একটি ছোট কুঠুরীতে বসিয়া রামায়ণ রচনা শেষ করিয়াছিলেন। তাঁহার সেই আবাস স্থানটি সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ একখানি প্রস্তর ফলকে উৎকীর্ণ করিয়া চিহ্নিত করিয়া রাখিয়াছেন।

তুলসীদাস এই চিত্রকূট হইতে বার মাইল দূরে বান্দা জিলায় রাজপুর পল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার তিরোধান ১৬৮০ সম্বতে কাশীধামে হইয়াছিল। এই সাধকের 'রাম নাম সত্য হায়' বাণী আজ চিত্রকূটের মহিমা আরও বাড়াইয়াছে। চিত্রকূট যেমন মনোরম, তেমনই জনপ্রিয় স্থান। ভক্ত তুলসীদাসের সাধনায় গৌরবান্বিত।

ই আই রেলের জব্বলপুর-এলাহাবাদ লাইনের মাণিকপুর একটি বড় সংযোগ স্টেশন—তথা হইতে ঝান্সী পর্যন্ত এক রেল লাইন গিয়াছে, তাহার উপর কারাউই ও চিত্রকূট স্টেশন অবস্থিত। কারাউই স্টেশনে নামিয়া মোটরবাস বা গরুর গাড়ি করিয়া চার মাইল যাইলে চিত্রকূট তীর্থে উপনীত হওয়া যায়। চিত্রকূট স্টেশনে নামিয়া দুরূহ পার্বত্য পথ দিয়া গোযানে ৩ মাইল যাইলে চিত্রকূটে উপনীত হওয়া যায়।

রামঘাটের উপর রায় বাহাদুরের বৃহৎ নবনির্মিত ধর্মশালাটি অতি মনোরম। ইহা ব্যতীত আর এক মাড়োয়ারীর একটি বড় ধর্মশালা রহিয়াছে। ধর্মশালাগুলি যাত্রীদের অবস্থানের সুবিধা দেয়-সেই জন্য ভারতবাসীরা-সল্প ব্যয়ে বা বিনা ব্যয়ে ভ্রমণ করিবার সুযোগ পায়।

চিত্রকূট ছোট শহর হইলেও মন্দাকিনীর তীরে অবস্থিত সোপানশ্রেণী, দেবালয়, মন্দির, সৌধাবলী বারাণসী, মথুরা, হরিদ্বার, গয়া আদি তীর্থস্থানের ন্যায়ই শ্রীমণ্ডিত। চিত্রকূটে সমস্ত তীর প্রস্তর দ্বারা বাঁধান। রামঘাটের দক্ষিণে পর্ণকুটীর যজ্ঞবেদী, রাম-লক্ষ্মণ-সীতা সহ ভরত ও অযোধ্যাবাসীর সম্মেলন স্থান পবিত্ররূপে পূজিত হয়। মত্তগজেন্দ্র মন্দির, পান্নার রাজার ঠাকুর বাটী, বড় মঠ দেখিবার মতন সৌধ। অদূরে বৃহৎ এক প্রাসাদের এক অংশে রামচন্দ্র দাতব্য ঔষধালয় ও বিদ্যাপীঠ অবস্থিত। মন্দাকিনীর তীরে বড়ো হনুমানজীর মন্দির, চরখারী রাজার মন্দির, ছবিকিশোর মন্দির, আচারিয়ার মন্দির দেখিলে চিত্ত আনন্দে পূর্ণ হইয়া উঠে।

চিত্রকূট স্বাস্থ্যকর স্থান। আহার্য দ্রব্য সমস্তই বিশুদ্ধ ও সল্প মূল্যে প্রাপ্য। বাঙালী ডাঃ পি মুখার্জি 'সেবাশ্রম' নামে একটি যাত্রী-নিবাস পরিচালন করেন। বাঙালী নরনারীর চিত্রকূট বাসের সুবিধা এখানে পাওয়া যায়।

জানকী কুণ্ড—চিত্রকূট

মন্দাকিনী নদীর তীর হইতে দেড় মাইল দূরে চিত্রকূট পর্বত অবস্থিত। স্থানীয় লোকের এই পর্বতকে 'কামদাগিরি' নামে অভিহিত করে। পর্বতের তলদেশে যাইবার রাস্তার পার্শ্বে পার্শ্বে পুরান লঙ্কা, হনুমানজীর মন্দির অক্ষয় বট, সংস্কৃত পাঠশালা, রাজধর মন্দির কয়েকটি সাধুর আশ্রম দেখিতে পাওয়া যায়। চিত্রকূট পর্বতের পাদদেশে একটি ছোট বাজার আছে। ১৩৪৬ সালেও এক আনায় এক সের দুগ্ধ এবং চারি আনা মূল্যে এক সের খাঁটি রাবড়ী পাওয়া যাইত। সুস্বাদু ক্ষীরের পেঁড়া ছয় আনা সের মূল্যে বিক্রয় হয়। এই স্থান হইতে পর্বত পরিক্রমা নগ্ন পদে আরম্ভ করিতে হয়। জুতা সেই স্থানে খুলিয়া রাখিয়া যাইতে হয়। সেই অঞ্চলের নরনারী পরদ্রব্য অপহরণ করিতে আদৌ অভ্যস্ত নহে।

চিত্রকূট পর্বতটি 'পরিক্রমা' করা যেমন পুণ্য কর্ম তেমনই আনন্দদায়ক। গিরিটিকে চারিদিক পরিবেষ্টন করিয়া একটি পথ আছে। পরিক্রমার সুবিধার নিমিত্ত পান্নার নরেশ এই চারি মাইল পথটি প্রস্তর দিয়া বাঁধাইয়া সমতল ও সুগম করিয়া ধন্য হইয়াছেন। পর্বতটি যেন এক বিরাট নৈবেদ্যর তণ্ডুল স্তূপ এবং পথটি নৈবেদ্যর থালার কাণার ন্যায় শোভা পাইতেছে, পথপার্শ্বে বিশ্রাম স্থান ও দেবালয়গুলি যেন নৈবেদ্যর উপকরণ স্বরূপ সজ্জিত রহিয়াছে।

হনুমান ধারা

বাজার হইতে কয়েকটি প্রস্তরমণ্ডিত সোপান অতিক্রম করিলে রামচবুতরা উপনীত হওয়া যায়। রামচবুতরা হইতে বাম দিক দিয়া অর্থাৎ পূর্ব হইতে পরিক্রমা আরম্ভ করিতে হয়। ক্রমে ক্রমে সদাব্রত মন্দির, পূর্ব দরজা মুখারবিন্দ, জানকীচরণ, নরসিংহ মন্দির, একাদশী পীঠ, বৈরাগী কা মন্দির, সাক্ষী গোপাল, ব্রহ্মকুণ্ড, বিরজা কুণ্ড, সুরাগায় থানী, দক্ষিণ দরজা মুখরাবিন্দ, চরণ-পাদুকাস্থান (যেখানে রামচন্দ্র ও ভরত মিলন হইয়াছিল), লক্ষ্মণ পীঠ, পশ্চিম দরজা মুখারবিন্দ, রাম
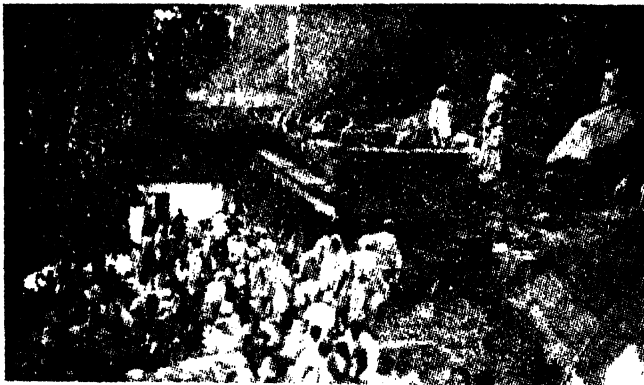
পীঠ, সরয়ূতীর্থ, উত্তর দরজা মুখরাবিন্দ দেব দেউলগুলি দেখিতে দেখিতে পরিক্রমা-শেষ করিয়া রামচবুতরায় উপনীত হইতে হয়।

চিত্রকূট পর্বতটি পরিক্রমা করিতে অতি আনন্দ পাওয়া যায়। একটি পর্বতে চারিদিক দিয়া ঘুরিয়া আসার সুযোগ অন্যত্র প্রায় পাওয়া যায় না। চিত্রকূট পর্বতের চারি পার্শ্বের বনের ভিতর বহু মুনিঋষিগণের আশ্রম আজও রহিয়াছে। সুপ্রাচীন রামায়ণের যুগ হইতে এই স্থানে সাধন ভজন করিবার জন্য আশ্রম করিয়া থাকেন। চিত্রকূট পর্বতের নিকটবর্তী বন মধ্যে সাধুদের আশ্রমগুলি দর্শন করিলে ভারতীয় গৌরবময় অতীত যুগের প্রাচীন ঋষিদের তপোবনের স্বরূপ ছবি অনুমান করা যায়। এখনও অনেক সাধুকে এইখানকার বিজন বনে বাস করিতে দেখা যায়। তাঁহাদের কোন পার্থিব আশা আকাঙ্ক্ষা নাই। পরমাত্মার ধ্যানই তাঁহাদের প্রধান কাম্য। বনের ফল মূলই তাঁহাদের জীবন রক্ষার প্রধান উপাদান। তাঁহারা কখনও লোকালয়ে আসেন না। প্রণামী স্বরূপ অর্থ দিলেও গ্রহণ করেন না। তুলসী তলায় রাখিবার জন্য ইঙ্গিত করেন মাত্র। অধিকাংশ সাধু মৌন ব্রত অবলম্বী দেখা যায়। বস্তুতন্ত্র প্রাধান্য যুগে এমন চিত্ত বৃত্তি নিরোধ ব্রত পালনের উদাহরণ থাকা সম্ভব দেখিয়া বিস্মিত ও পুলকিত হইতে হয়। ইহাই চিত্রকূটের মাহাত্ম্য।

অনুসূয়া—সেই সব আশ্রমগুলির মধ্যে অতি পবিত্র স্থান। তুলসীদাস রামায়ণে লিখিত আছে—

> এক সময় চুন কুসুম সোহাগে,
> নিজ কর ভূষণ রাম বনায়ে।
> সীতাহি পহিরায়ে প্রভু সাজর,
> বৈঠে ফটিকে শিলা পর সুন্দর॥

অর্থাৎ রামচন্দ্র সুন্দর ফটিকশীলা পাহাড়ের উপর বসিয়া স্বহস্তে কুসুম চয়ন করিয়া সীতাদেবীকে সাজাইয়া দিয়াছিলেন। সেই 'ফটিকশালা' চিত্রকূটের অদূরে অবস্থিত। অনুসূয়া আশ্রমটি অতি মনোরম স্থান। রামঘাট হইতে নৌকায় মন্দাকিনী নদী পার হইয়া পূর্বদিকে চারি ক্রোশ পার্বত্য ও জঙ্গলাকীর্ণ প্রদেশের মধ্য দিয়া গমন করিলে 'অনুসূয়া' আশ্রমে উপস্থিত হওয়া যায়। নদী তীর হইতে পদব্রজে রামধাম, কেশগড়, দাস হনুমান গড়, প্রমোদবন, জানকী কুণ্ড, শৃঙ্গারবন হইয়া এক মাইল যাইলে ফটিকশীলায় উপনীত হওয়া যায়। সেখান হইতে তিন মাইল জঙ্গল মধ্য দিয়া বাবু গ্রামের নিকট সুরী নদী পার হইয়া অনুসূয়া যাইতে হয়। ইহার মধ্যে এক মাইল পথ এমনই জঙ্গলাকীর্ণ যে সূর্যের আলোক সে স্থানে কিছুমাত্র প্রবেশ করিতে পারে না। এই অনুসূয়া আশ্রমে মন্দাকিনী সহস্র ধারায় প্রকট হইয়াছে।

হনুমান ধারা—চিত্রকূট অঞ্চলে আর এক প্রসিদ্ধ স্থান। চিত্রকূট হইতে সাত মাইল দূরে সংকর্ষণ গিরি। তথা হইতে সুশীতল জলের ঝরণা পাতাল গঙ্গাতে পতিত হইতেছে। তাহারই নাম হনুমান ধারা। পাণ্ডা রাম খেলওয়ান দ্বারা 'চিত্রকূট মাহাত্ম্য' হিন্দি ভাষায় লিখিত পুস্তকে হনুমান ধারার বর্ণনা আছে। স্থানটি মনোরম, জনবিরল তপস্যার উপযুক্ত, অনেক সাধু এখনও বাস করিতেছে। বৈদিক যুগের তপোবনের চিত্র চিত্তে উদয় করিয়া দেয়।

পুস্তক পরিচয়

বঙ্কিম সাহিত্যের ধারা—লেখক শ্রীক্ষীরোদকুমার দত্ত, এম এ; প্রকাশক দত্ত মুখার্জি পাবলিশার্স, ১০ ডিকসন্ লেন, কলিকাতা; মূল্য দেড় টাকা।

লেখক ইতিপূর্বে কয়েকখানি সমালোচনা পুস্তক লিখিয়া সুধী পাঠকসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। আলোচ্য পুস্তকটিও একখানি সমালোচনা পুস্তক। বঙ্কিম-সাহিত্য ব্যাপক ও ক্লাসিক; সে সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গেলে যতখানি মননশীলতা ও পাণ্ডিত্যের প্রয়োজন, লেখকের তাহা আছে। তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গি নূতন, চিন্তাশক্তি প্রখর ও স্বকীয়তায় উজ্জ্বল। মূলত বঙ্কিমের উপন্যাসগুলির ক্রমবিকাশের ধারাটিকে লেখক উপলব্ধি করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। মূলে লেখকের সহিত সমালোচকের একটি অন্তর্গূঢ় নিরপেক্ষ অথচ সহানুভূতিশীল সম্পর্ক থাকা প্রয়োজন। লেখকের তাহা আছে বলিয়াই তাঁহার সমালোচনা সার্থক ও রসোত্তীর্ণ হইয়াছে। পুস্তকটি পড়িতে পড়িতে কুন্দনন্দিনী, নবকুমার, বিমলা, শৈবলিনী, কপালকুণ্ডলা প্রভৃতি আমাদের বিস্মৃতি-মলিন মনে আবার নবতর রূপে স্পষ্ট হইয়া জাগিয়া ওঠে। সাহিত্যরসিক পাঠক ও ছাত্রসমাজকে বইখানি আনন্দ দিবে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।

ধনংদেহি

শ্রীজগদিন্দ্র মিত্র

খুব ভোরে বেলা বিলের ধারে স্তব্ধভাবে দাঁড়ানো মুক্তার যেন অভ্যাস। পূব আকাশ যখন সবে আলোময় হইয়া উঠিতে থাকে, তখন উঠিয়া বসে। নন্দর মাকে ডাকিয়া বলে,—"যাবে দিদি।"

নন্দর মা বয়সে অনেক বড়, বলে—"কোথায়।"

—"বিলের ধারে।"

এইবার সত্যই বিস্মিত হয় নন্দর মা, বলে,—"এত সকালে! কেন!"

—"এমনি।"

—"শোন, আমার আহ্লাদি মেয়ের কথা, বেড়াতে যাবে এখন! আমরা বাপু বুড়ো হয়ে গেছি; তোদের বয়েস আছে তোদের মানাবে—যা না—আমি পারবো না।"

মুক্তা তখন কিছু বলে না, একাই আসিয়া দাঁড়ায়। তাহার সামনে থাকে বহুদূর-ব্যাপী শান্ত জলরাশি, এবং ইহার উপর চন্দ্রাতপের মত কুয়াসার এক স্তর। পূব আকাশে ফুটিয়া উঠিতে থাকে রংএর পর রং, ইহার পরশ লাগে। মুক্তা দাড়াইয়া দেখে এই রং বিকাশের এই খেলা। ইহা যেন এক বিস্ময়।

ইহার আগে মুক্তা আর বিলে আসে নাই, বিল সম্বন্ধে অনেক গল্প সে গ্রামে শুনিয়াছে; বিলকে তাহার মনে হইয়াছে রহস্যাবৃত। মানুষের ত্রুটি সে ক্ষমা করে না, মৃত্যুর যবনিকা টানিয়া ইহার শাস্তি দেয়, আবার কখনও বা প্রসন্ন হইয়া দেয় মুঠা মুঠা প্রচুর অর্ঘ্য। এর জন্য বিলকে ভয় করে কৈবর্ত জেলেরা; তবু ইহাকে তাহারা এড়াইতে পারে না। শুভ্র জল-ভরা বিল হাতছানি দিয়া যেন তাহাদের ডাকে; জেলেরা তখন চঞ্চল হইয়া উঠে। রক্তপ্রবাহে কিসের এক টান অনুভব করে, তাহাদের শান্ত জীবনে দেখা দেয় ঘর-ছাড়ার এক নেশা। ঘর হয় তখন বন্দীশালা, উন্মুক্ত আকাশের নীচে বহুবিস্তৃত জলরাশির এক কল্প ছবিতে যেন সব কিছু একাকার হইয়া যায়। সাজ সরঞ্জাম ঠিক করিয়া নেয়, পুটলি বাঁধিয়া, কাপড় জামা গুছাইয়া নেয়। বিলাস প্রসাধনের সামগ্রী, আয়না চিরুণী নেয় কেহ কেহ, এইগুলি রাখে তাহারা সযত্নে; হয় নিজের নিমার পকেটে না হয় ফুল-আঁকা টিনের সুটকেশে। তারপর শুভদিন দেখিয়া তাহারা রওনা হয় বিলের দিকে। বর্ষার শেষভাগে দেখা যায় বিগত-স্রোতা নদীর ঘোলাটে জলের উপর দিয়া সারি সারি নৌকা চলিয়াছে।

ঘর ছাড়ার এই নেশায় একটা সুটকেশ ও বিছানা বগলে করিয়া কিশোরী আসিয়া দাঁড়াইল খুড়ীর বাড়ির কাছে। তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে।

সোজা ভিতরে ঢুকিয়া কহিল,—"খুড়ী।"

খুড়ীর বয়স প্রাচীন, যৌবনের ইতিহাস তাহার কামমদিরায় রাঙা। তখন তাহার নামছিল টগর, কিন্তু যৌবন অন্তমিত হওয়ার সাথে সাথে তাহার নামও ডুবিয়া গিয়াছে, এখন সকলে তাহাকে ডাকে খুড়ী।

খুড়ী ঘরেই ছিল; বিলে যাইবার আগে কয়দিন কিশোরী এখানে থাকে। খুড়ী বিস্মিত হইল না, হাসিয়া বলিল,—"আয় ভিতরে।"

খুড়ীর এই কথার কোন প্রয়োজন কিশোরীর ছিল না, বরাবরের মত সে সোজাই ঘরে চলিয়া আসিত। কিন্তু বাড়ির ভিতর ঢুকিতে প্রথমে পড়ে রান্না-ঘর, প্রায় বারই কিশোরী দেখিত খুড়ী সেখানে বসিয়া পাক করিতেছে। পুটুলি-পত্র বারান্ডায় রাখিয়া কিশোরী ঘরে আসিয়া বলিত,—"কেমন আছ খুড়ী।"

খুড়ী হাসিয়া বলিত—"ভাল। খুড়ীর শরীর লোহা দিয়ে গড়া, খারাপ হতে সহজে পারে না। তুই কেমন আছিস কেমন।"

প্রশ্ন কুশলবাদের পর শুরু হইত চা খাওয়ার পালা। যৌবনের অনেক বিলাস খুড়ীর এখন নাই, একে একে অনেক কিছুই সে বিদায় দিয়াছে; পরে সে সাদা থান কাপড়। চুল বাঁধে সত্য কিন্তু পাতায় পাতায় ঢেউএ ফাঁপা খোপার বিন্যাস সে করে না, সাধারণভাবে আঁচড়াইয়া মুঠা করিয়া চুল বাঁধে। দুই ভ্রূর মাঝখানে কালো ফোঁটা উল্কি করা। অপর্যাপ্ত সাদা গুড়ায় মাড়িসমেত তাহার দাঁতাগুলি কালো। তবে তাহার উৎসব-রজনী-মুখর যৌবনের একটি অভ্যাস সে বিদায় দিতে পারে নাই, ইহা চা খাওয়া। কিশোরী ইহা জানে এবং এখানে আসিবার সময় খুড়ীর জন্য নিয়া আসে প্যাকেটে বাঁধা চা।

চা খাইতে খাইতে গল্প চলে অনেকক্ষণ। কিন্তু এইবার রান্নাঘরে উঁকি মারিয়া কিশোরী বিস্মিত হইয়া গেল। খুড়ীর জায়গায় যে বসিয়া রহিয়াছে, বয়স তাহার অল্প। উনোনের আগুনে দীপ্ত মেয়েটির দিকে চাহিয়া কিশোরী তাহাকে চিনিতে পারিল না। অপরিচয়ের কুয়াসায় মেয়েটি তাহার কাছে আরো রহস্যময় হইয়া উঠিল।

তাহার এই হতচেতন অবস্থায় খুড়ী তাহাকে ডাকিল,—"এদিকে আয় কিশোরী।"

ঘরের ভিতর নিজের বিছানার পুটুলি নামাইয়া সে বলিল —"একটু পরিবর্তন যেন দেখছি।"

কথাটা খুড়ী অতি সহজেই বুঝিল, তবু হাসিয়া কহিল,—"কোথায় পরিবর্তন দেখলি আবার। আমার শরীরে, তা হবে, দিন দিন বুড়ো হয়ে যাচ্ছি, না রে!"

কিশোরী বলিল,—"বয়স বাড়লেও তোমার রূপ বাড়বে। কিন্তু পাকের ঘরে ও কে?"

খুড়ী হাসিয়া কহিল,—"অনুমান কর।"

—"অনুমানের মাথামুণ্ডু অনেক সময় থাকে না, অতএব না করাই ভাল।"

—"তবে আমি কিচ্ছু বলবো না, তোকেই চিনে নিতে হবে।" বলিয়া খুড়ী কিশোরীর কানের কাছে মুখ আনিয়া হাসিয়া কহিল, —"কি-রে পছন্দ হয়েছে!"

কিশোরীর মুখ লজ্জায় লাল হইয়া গেল, এই কথার কোন জবাব সে দিতে পারিল না; তাহার কাঁপন-লাগা বোধ-শক্তির সাগর হইতে ফুটিয়া উঠিল একখানা মুখ,—সূর্যকরোজ্জল কচি কোমল পাতার মত ইহা মোহময়।

খুড়ীর যৌবনকুঞ্জে অনেক ভ্রমরের আবির্ভাব হইয়াছে, মন দেওয়া ও নেয়ার ব্যাপারে অতি সূক্ষ্ম রহস্য ও জানে; —"তবে এখন হাত পা ধুয়ে আয়।"

রাত্রির খাওয়ার পর অন্যান্য বারের মত গল্প তেমন জমিল না যেন, খুড়ীর হাসি-ঠাট্টার পাকে আসর যখন একটু জমাট বাঁধিয়া আসে, খুড়ীর পিছনে নত-মুখী একটি মেয়ের দিকে চাহিয়া কিশোরী কেমন যেন একটু অন্যমনস্ক হইয়া যায়। ঠাট্টার বদলে ঠাট্টা সে ফিরাইয়া দিতে পারে না। গল্প তাহাদের জমে জমে করিয়াও জমিয়া উঠিতে পারে না। খুড়ীর দিকে চাহিলে কিশোরীর চোখ সহজেই পড়ে সরমমেদুর মেয়েটির দিকে। তাহার-ই নাম মুক্তা, যৌবনের সবে আবির্ভাব হইয়াছে তাহার দেহে; স্বাস্থ্যের নিপুন বাঁধনে তাহার কালো রংও স্নিগ্ধ হইয়া উঠিয়াছে।

পর দিন কিশোরীর কোন কাজ ছিল না, দুপুরের আগেই বোধহয় ঘুমাইয়া পড়িয়া-ছিল। হঠাৎ ডাক শুনিয়া চমকিয়া উঠিল।

ডাকিতেছিল মুক্তা, বলিল,—"বেলা হয়ে গেছে, আপনি স্নান করে আসুন।"

কিশোরী বলিল,—"খুড়ী বাড়ি নেই।"

—"না, বাবুদের বাড়ি গেছেন, আসবেন বোধহয় বিকাল বেলা। আমার পাক হয়ে গেছে, আপনি স্নান সেড়ে আসুন। বেলা কম হয় নি।"

"—এই যাচ্ছি।"

খাইতে বসিয়া কিশোরী কিছু কথা বলিতে পারিল না। আচ্ছন্ন ঠিক নয়, এই নীরবতার মধ্যে এক চঞ্চল মৌন ভাষার ভারে তাহার মনের উপরে নামিয়া আসিল বিমূঢ় নিষ্ক্রিয়তা। কেমন যেন তাহার ভিতরটা মাঝে মাঝে থর থর করিয়া কাঁপে; কথা কহিবার ইচ্ছা জিভের কাছে আসিয়া কেমন যেন স্তব্ধ হইয়া যায়। অথচ মুক্তার যেন সংকোচ নাই, অবাধ গতিছন্দে সে পরিবেশন করিয়া চলিয়াছে।

মুক্তা কহিল,—"আপনার আর কিছু লাগবে।"

কিশোর বলিল,—"না। খুড়ী আসেন নি।"

মুক্তা মৃদু হাসিয়া কহিল,—"না আসেন নি। কিন্তু এর জন্য কম করে যেন খাবেন না।"

এই কথার উত্তরে কিশোরীর কিছু বলা হয়ত উচিত ছিল, কিন্তু লজ্জায় সংকুচিত সে শুধু কহিল,—"না।"

এই পর্যন্ত!

বিলে আসিয়া কয়েকদিন কাটিয়া গেল নানা ব্যস্ততায়। চারিদিকে বিস্তৃত জল-রাশির মধ্যে দ্বীপের মত কিছুটা জায়গা জলের উপরে সবুজ সজ্জায় পড়ে থাকে। সেখানে ঘর বাঁধে কৈবর্ত জেলেরা। ছন-বাঁশের ঘর বাঁধে, তারপর যেখানে পাখীর ডাকের সহিত মিলিত জলের কলোচ্ছ্বাস, সেখানে পড়ে মানুষের পদচিহ্ন; তাহাদের সুখ-দুঃখ আঁকা জীবন প্রবাহে চঞ্চল হইয়া উঠে। ইহার আগে অনেকেই এখানে আসিয়াছে। বিলের জীবনধারার সহিত তাহারা পরিচিত। কিন্তু মুস্কিল হইল মুক্তার। কেমন তাহার বিস্ময়, পদে পদে সে যেন অনুভব করে কিসের এক সংকোচ। অজানা এক শংকার এক সুপ্ত চেতনায় তাহার মন উদ্বেলিত হইয়া উঠে মাঝে মাঝে। সমবয়সী তাহার এখানে কেহ নাই; যাহারা আছে মিল নাই তাহাদের সঙ্গে—বয়সের এবং মনের।

খুড়ীর উপর ভার সমস্ত মেয়েদের এবং লোকজনের রান্না বান্নার। ভোর বেলা সে উঠে, কিন্তু প্রথমেই তাহার চাই চা। ইহার জোগাড় করিতে হয় মুক্তাকে। খুড়ীর ভোরের এই চা আসরে কিশোরী আসিয়া একদিন জুটিল।

ব্যাপারটা এই;

বিলে আসিয়াই মাছ ধরা আরম্ভ হয় না। প্রথম শেষ করিতে হয় ইহার আয়োজন উদ্যোগ। এই ব্যাপারও কম নয়। তখন বিল পাহারা দিতে হয় দিবারাত্র। কয়েক-স্থানে নৌকার উপর লোক তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকে চারিদিকে। কোথাও শব্দ হইলে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করে, দরকার হইলে দ্রুতগতিতে নৌকা চালাইয়া সেখানে যায়।

রাত্রিবেলা পাহারা দিতে আসিয়া আসন্ন ভোরের স্তিমিত আলোয় বিলের পারে দেখিতে পাইল ছায়ার মত এক মূর্তি দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। কাছে আসিয়া দেখিল, মুক্তা। বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, —"তুমি এখানে।"

মৃদু হাসিয়া মুক্তা বলিল—"অবাক হয়ে গেলেন বোধ হয়, কিন্তু আমি রোজ এখানে আসি।"

—"আমি কিন্তু আর দেখিনি।"

—"সে চেষ্টা বোধ হয় করেন নি।"

কিশোরী লজ্জিত হইয়া কহিল,— "এদিকে পাহারা অবশ্য আমার দিতে হয় না, থাকতে হয় অন্যদিকে। রোজই আস কি এই দিকে।"

—"হ্যা।"

—"কিন্তু এত সকালে ঠাণ্ডা লাগানো ভাল নয়।"

মুক্তা হাসিয়া ইহার জবাব দিল, কহিল, —"সারারাত বাইরে বোধহয় আপনাকেও থাকতে হয়েছে।"

কিশোরী একটু চুপ রহিয়া বলিল, —"আমাদের সহ্য হয়ে গেছে, তাছাড়া চাকরী। চলো তোমাকে এগিয়ে দিয়ে আসি।"

সেইস্থান থেকে মুক্তাদের ঘর খুব দূরে নয়, ঘাসের উপর দিয়া পায়ে চলার রাস্তার দাগ ধরিয়া অল্প সময়ের মধ্যেই তাহারা গিয়া পৌঁছিল। তখন অনেকেই উঠিয়াছে। খুড়ীও উঠিয়াছে, এখন তাহার চা খাওয়ার পালা। অন্যদিন হইলে এতক্ষণ হয়ত মুক্তা সরঞ্জাম নিয়াই ব্যস্ত থাকিত। কিন্তু আজ বিলের উপর কিশোরীর মত কাহাকে অনুমান করিয়া সে দাঁড়াইয়াছিল স্থির হইয়া। তাহার মনে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছিল এক তিতিক্ষা, শরীরের উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছিল থর থর করিয়া কাঁপা এক শিহরণ।

এমন সময় আসিল কিশোরী, তাহাকে সঙ্গে নিয়া ঘরে ফিরিতে দেরী হইয়া গিয়াছে কিছু।

মুক্তা ও কিশোরীকে দেখিয়া খুড়ী সরব করিয়া উঠিল। হাসিয়া কহিল,— —"পোড়ারমুখী ওকে নিয়ে এলি কোথা হতে।"

মুক্তা কিছু বলিবার আগেই উত্তর দিল কিশোরী, কহিল,—"স্বর্গ থেকে।"

—"খুব বাহাদুর, আবার কথা বলা হচ্ছে, স্বর্গ-ই বটে। এতদিনে একবারও এসে খোঁজ নিতে পারলি না, তোদের খুড়ী আছে কি মরেছে।"

কিশোরী হাসিয়া কহিল,—"খুড়ী মরবে কেন, মরব আমরা। সময় পাইনি খুড়ী।"

—"ওসব কথা রাখ, বিলে আমি নূতন নয়; সময় পাওয়ার কথা আমি জানি।"

কিশোরী হাসিয়া চুপ করিয়া রহিল।

এমন সময় চা নিয়া আসিল মুক্তা; হাতল ভাংগা একটা চায়ের কাপ খুড়ীর দিকে আগাইয়া দিয়া কালাই করা টিনের কাপ আগাইয়া দিল কিশোরীর দিকে; কহিল, —"চা নিন।"

কিশোরী যেন একটু বিস্মিত হইয়া গেল, কহিল, —"চা।"

তাহার বিস্মিত ভাব দেখিয়া মুক্তা এবং খুড়ী দুইজনেই হাসিয়া ফেলিল। খুড়ী কহিল,—"অবাক হওয়ার কথা বটে, কিন্তু তোর খুড়ী যতদিন থাকবে চা ততক্ষণ বন্ধ হবে না। নে খা।"

সেইদিন হইতে দেখা গেল কিশোরী সেখানে এই চায়ের আসরে নিয়মিত উপস্থিত থাকে। অলস মুহূর্তের এই অবসর সময়টুকু তাহাদের জমিয়া ওঠে জমাট গল্পে, রসিকতা, ঠাট্টায়। কেহ মুড়ী নেয় বাটি ভরিয়া; সেইখানের অন্যান্য মেয়েরা অনেকে বিধবা, চা খাইবার অনুরোধ করিলে নাক সিটকাইয়া বলে,—"বিধবার ও দ্রব্যি খেতে নাই, ও মা-গো কি ক্রিশ্চানি কথা।"

খুড়ী হি হি করিয়া হাসে, বলে, —"আমি বুঝি খুব ক্রিশ্চান হয়েছি— —না লো।"

উত্তর দেয় কিশোরী, হাসিয়া বলে, —"কম নয় খুড়ী, কাকা থাকলে তোমাকে মেম সাহেবের পোষাক বানিয়ে দিত।"

সকলে হাসিয়া উঠে।

তারপর চায়ের আসর ভাংগে; খুড়ী যায় তাহার কাজে, কিশোরীও যায়, কিন্তু যায় একটু দেরী করিয়া। তখন মুক্তার সহিত কথা হয়।

মুক্তা বলে, —"আমাদের একদিন বেড়িয়ে নিয়ে আসুন।"

কিশোরী বলে, —"কোথায়।"

—"এই বিলে।"

—"বিলে আবার জায়গা কোথায়, সব যে জল।"

—"জলের উপর-ই নৌকা করে বেড়াবো।"

কিশোরী হাসিয়া বলে,—"আচ্ছা দেখবো।"

আলাপরত কিশোরী ও মুক্তাকে দেখিয়া খুড়ী মনে মনে হাসে, এই দুইটি যুবক-যুবতীর মধ্যে যে একটা আকর্ষণ দুর্নিবার হইয়া উঠিতেছে, ইহা তাহার বুঝিতে বাকী থাকে না; এবং এই নিয়া রসিকতা করিতেও ছাড়ে না।

কিশোরীকে বলে,—"কিরে পাজি, এখানে বুঝি মধুর সন্ধান পেয়েছিস।"

কিশোরী হাসিয়া বলে,—"মধু নয়, চা।"

—"চাও অনেক সময় অমৃত হয়, কেমন লাগছে!"

মুক্তাকে বলে,—"কি লো পোড়ামুখী, কিশোরীকে কেমন লাগছে।"

মুক্তা লজ্জায় লাল হইয়া যায়, বলে, —"যাও খুড়ী।"

অন্যান্য মেয়েরা পরিহাস করে মুক্তাকে। তাহার সরমে রাঙিয়া যাওয়ার পরক্ষণে দেহমনে নামিয়া আসে কেমন এক মধুর আবেশ! আনন্দের আলোয় তাহার সারা অন্তর ঝলমল করিয়া উঠে। মুক্তার জীবনে ইহা এক অদ্ভুত অনুভূতি। কিশোরীর কথা ভাবিয়া সংরমপুলকে তাহার মনে রং ধরিয়া উঠে ক্ষণে ক্ষণে। চায়ের আসরের জন্য তাহার মন ব্যগ্র হইয়া থাকে। সেইক্ষণে তাহার নিঃসঙ্গ মনে ফুটিয়া উঠে ভাবের রংধরা বিচিত্রিত পুঞ্জ পুঞ্জ ফুল।

এই বিল ইজারা লইয়াছে অক্ষয় কৈবর্ত, সে আসে নাই। মাছ ধরার দুই একদিন আগে সে আসিয়া উপস্থিত হইল। সম্পর্কে সে অনেকের আত্মীয়, তবু অধঃস্তন কর্মচারী এবং সমুদয় জেলে মহলে চঞ্চলতার আভাস দেখা দিল। তাহার বয়স বোধহয় চল্লিশের কাছাকাছি, প্রথম জীবন তাহার দুঃখ দরিদ্রতায় ভরা, কিন্তু এখন সে বিপুল ধনের অধিকারী। প্রথম জীবনের রিক্ততার প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছে এখন তাহার জীবনে। সৌখিন বিলাসের উপচারে সে সাজাইয়া রাখিতে চাহে তাহার জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত। গ্রামোফোন কিনিয়াছে, তাহা বাজাইয়া আভিজাত্যের ব্যবধান সে বজায় রাখে সকল সময়। সুগন্ধি তেল মাখে, গায়ে দেয় দামী জামা। খুড়ীর প্রমত্ত যৌবনের মধুবনে সে ছিল মধুকর; কিন্তু নিঃশেষ-মধু টগর আজ খুড়ী। তবু তাহারা দুইজনে যখন একত্রিত হয়, খুড়ীর দুই চোখের মদিরাময় দৃষ্টিতে, চটুল হাসির রেখায় রেখায় সে আবার জাগাইয়া তুলিতে চায় আকর্ষণ।

অক্ষয় আসিয়া প্রথমেই দেখা করিল খুড়ীর সাথে, এইটা তাহার রীতি। কিন্তু ইহার অর্থ জানে খুড়ী। অক্ষয়ের বসবাসের ঘর মেয়েদের ঘরের কাছে।

কিশোরীর কাছে এই গোপন রসলীলার কথা অজানা নয়, এবং অক্ষয়ের আগমনে দুর্ভাবনায় চঞ্চল হইয়া উঠিল সে বেশী।

মুক্তা এতদিন খুড়ীর কাছে থাকিয়া আসিয়াছে সত্য, কিন্তু অক্ষয় তাহাকে দেখে নাই। বিলে আগত বেশীর ভাগ বিধবা এবং প্রৌঢ়া মেয়েদের মধ্যে যৌবনপুষ্ট মুক্তাকে তাহার নজরে সহজেই পড়িল।

খুড়ীকে জিজ্ঞাসা করিল,—"ও কে?"

খুড়ী বলিল—"হরিদাসের বোন, ওর নাম মুক্তা।"

—"ওই কি তোমার কাছে ছিল এতদিন।"

"হাঁ।"

—"কিন্তু ওকে আমি এতদিন দেখি নি।"

—"এখন মুক্তাকে দেখতে পাবে।" বলিয়া খুড়ী মুখ টিপিয়া হাসিল; এই হাসির অর্থ সুস্পষ্ট। কিন্তু অক্ষয় হাসিল না, চুপ করিয়া রহিল।

বিকালবেলা মুক্তা একলা ছিল, এই সময় অক্ষয় তাহার কাছে কহিল—"তোমার নাম মুক্তা!"

মুক্তা মৃদুস্বরে কহিল,—"হাঁ।"

—"এখানে তুমি এর আগে আসো নি।"

—"না।"

—"কেমন লাগছে। বোধ হয় খারাপ লাগছে না।" এ বলিয়া অক্ষয় একটু হাসিল।

মুক্তা এই কথার কোন জবাব দিল না, নতমুখে চুপ করিয়া রহিল। অক্ষয় তাহার দিকে চাহিয়া আবার হাসিয়া বলিল,— "প্রথম ভাল লাগে না অবশ্য, তাছাড়া এখানকার বাতাসও অনেকে সহ্য করতে পারে না, অসুস্থ হয়ে পড়ে। ধাতটা সয়ে এলে পরে ভাল লাগবে দেখ। তোমার অসুখ করে নি তো?

মুক্তা বলিল—"না।"

—"বেশ ভাল, তবু একটু সাবধানে থাকবে।"

খুড়ী যেন ওত পাতিয়াছিল, অক্ষয় চলিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গেই সে সহাস্যমুখে মুক্তার সামনে আসিয়া কহিল—"কি লো বাবু কি বলল তোর সাথে।"

খুড়ীর হাবভঙ্গির মধ্যে মিশানো ছিল কেমন একটা কুৎসিত ভাব, মুক্তা ইহাতে বিস্মিত হইয়া গেল। তবু সহজভাবেই কহিল,—"এমন কিছু বলেন নি।"

খুড়ী হি হি করিয়া হাসিয়া উঠিল, কহিল,—"যেখানে গোপন সেখানেই মধু। পোড়ারমুখি তুই দেখি সবাইকে হার মানাবি। পান, তামাক দিয়েছিলি তো।"

মুক্তা স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল অনেকক্ষণ আগেই, খুড়ীর দিকে একবার চাহিয়া সে আস্তে আস্তে দূরে চলিয়া আসিয়া কহিল— "না।"

কিন্তু এত সহজে সে রেহাই পাইল না। ইহার পর রোজই দেখা যাইত, তাহাদের রান্নাঘরে; সকালবেলা ছোট আঙিনায় হাস্যমুখর ছোটখাট একটা আড্ডা মুক্তাকে কেন্দ্র করিয়াই যেন জমিয়া উঠিতে চাহিতেছে; ইহার প্রধান উৎসাহী অক্ষয় এবং সহচর সেই খুড়ী।

মুক্তা নীরব থাকে সকল সময়। কেমন অস্বস্তির মেঘে তাহার মনের আলো আবছা হইয়া আসে। তখন তাহার গোপন হিয়ায় অলক্ষ্যভাবে আসে এক কামনা— কিশোরী কেন আসে না। কিসের এক আবির্ভাব আশায় কণ্টকিত থাকে তাহার মন, তবু এই হাসির মধ্যে সে ম্রিয়মান থাকে।

খুড়ী এই বিষয়ে ঘুঘু, অক্ষয়ের বৈভবের কথার স্তবকে স্তবকে সে মুক্তার অবসর সময়ের বিরল সময়টুকু ভরিয়া রাখিতে চায়।

বলে—"এবার মাছের দর যে রকম, বাবুকে আর পায় কে! বাবু বললেন, লাভ হবে অনেক। টাকা পেয়ে এবার কি করবে জানিস।"

মুক্তা বলে,—"না।"

—"শহরে বাড়ি কিনবে, বাবু আবার একটু সৌখিন কিনা। আমোদ বড় ভালবাসে। এবার জানি কার কপাল খুলে।" বলিয়া খুড়ী মুক্তার দিকে চাহিয়া মুখ টিপিয়া হাসিল।

মুক্তা কিন্তু হাসে না, এই রকম ইংগিত সে অনেকবারই শুনিয়া আসিতেছে; স্তব্ধ হইয়া দাঁড়ায়। অক্ষয়ের বৈভব সে কিছু দেখিয়াছে, বাড়িতে তাহার দালান, ধানের গোলায় সিন্দুকে টাকার স্তূপে লক্ষ্মী বাঁধা পড়িয়াছে সেইখানে। সে ইহা জানে, এতদিন ভয় মিশানো কৌতূহল ছিল তাহার; অক্ষয়ের প্রাচুর্যের কথায় তাহার বিস্ময় লাগিত, এখন মনে আসে আশঙ্কা। কেন সে বুঝিতে পারে না। কিন্তু পরক্ষণেই বসন্তের সাড়া পড়িয়া যায় তাহার মনে। মৃদু বাতাসের মত আরামের স্বস্তির পরশে তাহার দেহ মনে আসে কাঁপনলাগা আমেজ। কিন্তু ইহাও যেন ফিকা হইয়া আসে।

খুড়ী মাঝে মাঝে ঠাণ্ডা করিয়া বলে,— "অক্ষয়ের সাথে যদি তোর বিয়ে হয়; রাজার হালে থেকে হয়ত আমাদের ভুলে যাবি তুই।"

মুক্তা বলে,—"যাও।"

কিন্তু কিসের খটকা যেন আসে তাহার মনে। তাহার বিয়ের ফুলের পরাগ পাখায় মাখিবে কোন্ সে ভ্রমর।

দুইদিন হয় বিলে মাছ-ধরা আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। কাজও বাড়িয়া গিয়াছে অনেক। মাছ ধরার কলরবে বিলে এক নূতন প্রাণের সঞ্চার হইয়াছে যেন। কিসের এক উন্মাদনায় জেলেরা সকল সময় ব্যস্ত থাকে। ভোর না হইতেই শীতের হিমশীতল বাতাসের মধ্যে কুয়াশার স্তর সরাইয়া তাহারা বাহির হয় নৌকা লইয়া হৈচৈ-এর বিপুল রবে তাহারা মাতিয়া উঠে। কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ

থাকে না, শুধু এক নেশা—মাছ ধরিবার নেশা।

ব্যাপারীর নৌকা আগে হইতেই ভিড় করিয়াছে দরদস্তুরের বালাই চুকিয়া গিয়াছে অক্ষয় কৈবর্তের সাথে। মাছ ধরিবার সাথে সাথেই নিজেদের ছোট ছোট নৌকায় তুলিয়া নেয়। তারপর পাঁচটি বা আরো বেশী দাঁড় জলের উপর তাল ফেলিয়া ফেলিয়া দ্রুতগতিতে মাছসমেত নৌকা নিয়া চলে নিকটস্থ বাজার বা রেল স্টেশনের দিকে।

কিশোরী আসিতে পারে নাই কয়েকদিন।

সেইদিন সন্ধ্যার পর অক্ষয়ের ঘরে মুক্তার ডাক পড়িল। খুড়ী হাসিয়া বলিল,——"এবার হয়ত তুই রাজরাণী হবি, দেখিস বাবুর জন্য পান নিতে ভুলিস না।"

কম্পিত হৃদয়ে এক শঙ্কা নিয়াই মুক্তা ঘরে প্রবেশ করিয়া মৃদুস্বরে বলিল,—"আমায় ডেকেছেন।"

অক্ষয় একটা চৌকির উপর চুপ করিয়া বসিয়াছিল, সামনে তাহার হ্যারিকেন আলো।

মুক্তার দিকে চাহিয়া দেহের ভঙ্গিতে আনিল আয়াস ভাব, তারপর বলিল,—"হাঁ, বস।"

মুক্তা বসিল না, দাঁড়াইয়া রহিল।

অক্ষয় বলিল—"খুড়ী তোমাকে কিছু বলেছে।"

মুক্তা বলিল—"কিসের কথা।"

"তোমার বিয়ের কথা।"

—"না।"

একটু চুপ রহিয়া অক্ষয় বলিল,—"তবে থাক। কিন্তু তোমাকে ডেকেছি একটু কাজের জন্য, আমার এই টাকাগুলি তুমি গুণে দাও।"

এই বলিয়া কাঁচা টাকা ও নোটের স্তূপ মুক্তার সামনে ঢালিয়া দিয়া কহিল,—"এক হিসাব নিয়েই আমি পারিনে, তারপর টাকা গুণে ঠিক রাখা সেও কম হাঙ্গাম নয়, কি বল তুমি।"

মুক্তা হাঁ বা না কিছুই বলিল না, নত হইয়া টাকা গুনিতে লাগিল। সে গুনিয়া যায়, শেষ হইতে চায় না। অগণিত টাকার যে কল্পনা ছিল তাহার মনে সুপ্ত, ইহাই স্তরে স্তরে তাহার সামনে সাজানো; সে ইহা গুণিয়া চলিয়াছে। গুণিতে গুণিতে স্পর্শে যেন মাদকতা সে অনুভব করে, লোভ আসে মনে, চোখ জ্বলিয়া উঠে। ইস, এত টাকা। নিজেই যেন শিহরিয়া উঠে।

টাকা গণা শেষ করিয়া দাঁড়াইতে অক্ষয় তাহার দিকে চাহিয়া হাসিয়া কহিল,—"পরিশ্রম হয়েছে বুঝি খুব।"

মুক্তা কহিল,—"না, এতে পরিশ্রম আর কি!"

"এই নাও মজুরী।" বলিয়া অক্ষয় একখানি দশ টাকার নোট মুক্তার সামনে মেলিয়া ধরিল।

ইহা মুক্তার কাছে অচিন্তনীয়, সে স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। অক্ষয় তাহার কাছে আসিয়া হাতের মধ্যে নোটটি গুজিয়া দিয়া খপ করিয়া মুক্তার এক হাত ধরিয়া হাসিয়া কহিল—"এতে লজ্জার কিছু নেই। কেউ জানবেও না।"

মুক্তা ফিরিয়া আসিল উত্তেজনা নিয়া, নিজের ঘরে আসিয়া শক্ত হইয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

খুড়ী হাসিয়া বলিল,—"পোড়ামুখী তোর কপাল ভাল, আমাদের কেউকে বাবু ডাকে না, ডাকলে তোকে, আবার টাকা গুণে দিতে। বলি ব্যাপার কি, বিয়ের বাজনা কবে।"

মুক্তা উদাসীন ভাবে বলিল,—"আমি কি জানি।"

"সব জানিস তুই। আচ্ছা মুক্তা সত্যি করে তুই বল, কিশোরীকে তুই ভালবাসিস।"

এই প্রশ্ন শুনিয়া মুক্তা থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল, চকিতা হরিণীর মত খুড়ীর দিকে চাহিল, বলিল—"এই প্রশ্ন কেন!"

খুড়ী একটু হাসিয়া বলিল,—"না, এমনি।" তারপর একটু চুপ রহিয়া বলিল,—"আচ্ছা বাবু যদি তোকে বিয়ে করতে চায়, তুই কি এতে রাজী হবি।"

মুক্তা কোন উত্তর দিল না।

খুড়ী বলিল,—"এ আমার কথা নয়, বাবুই আমাকে জিজ্ঞেস করতে বলেছে। তাছাড়া একটু কারণও আছে।"

মুক্তা বলিল—"কি?"

—"হরিদাসের সাথে অক্ষয়ের খাতির ছিল খুব। একত্রে অনেক কষ্ট তারা দুজনে সয়েছে। হরিদাস এখন নেই, আর অক্ষয় বড়লোক। হরিদাসের ইচ্ছে ছিল এবং এমন কথাও নাকি ছিল অক্ষয়ের সাথে তোর বিয়ে হবে।"

মুক্তা একটু স্তব্ধ রহিয়া বলিল,—"একথা আমি জানিনে।"

খুড়ী বলিল—"হরিদাস যেভাবে মরেছে, তোকে বোধ হয় জানাতে সময় পায়নি। কিন্তু এখন জানতে পেরেছিস, এখন তোর মত কি।"

মুক্তা সহসা কোন উত্তর দিতে পারিল না। হতভম্বের মতই বসিয়া রহিল অনেকক্ষণ। উত্তেজনায় তাহার প্রতিটি তন্ত্রী যেন চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে প্রবলভাবে। নিজেকে একটু সংযত করিয়া বলিল—"যেখানে মত দেওয়া হয়ে গিয়েছে এবং দিয়েছেন আমার দাদা, এর রদবদল হওয়ার কারণ আমি দেখিনে।"

খুড়ী জোরে হাসিয়া উঠিল, কহিল—"ইস্ মা-গো! কী মেয়ে গো তুই। এবার আমরা বিয়ের আয়োজনে লেগে যাই।"

কিন্তু বলিবার আগেই মুক্তা ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল বেগে। কি যেন হইয়াছে মুক্তার। কিসের আবেগে তাহার দেহ কাঁপিয়া উঠিল বারে বারে। অক্ষয় তাহাকে বিবাহ করিবে, সে হইবে এই বিপুল অর্থের অধিকারী। অভাব থাকিবে না তাহার কিছুর, প্রাচুর্যের মধ্যে তাহার সংসারের যাত্রা হইবে শুরু। তাহার হাতের এই রঙ্গীন কাঁচের চুড়ীর স্থানে ঝলমল করিবে সোনার গোছা গোছা চুড়ি, গলায় থাকিবে সোনার হার। সালঙ্কারা নিজের এক কল্পমূর্তি যেন জীবন্ত হইয়া উঠিল তাহার চোখের সামনে। সে অনুভব করিল তীব্র এক অনুভূতি, এই যেন শিরায় শিরায় আনন্দের কলহাস। কিশোরীকে দেখিয়া তাহার মনে উষার আকাশের গায়ে মৃদু রং বিকাশের শান্ত সাড়ার মত এক অপূর্ব স্নিগ্ধতা নামিয়া আসিত। কিন্তু আজকার অনুভূতি তাহার তীব্রতর, এ যেন মধ্যাহ্নের খরতাপ, উত্তাপ আছে, তীব্রতা আছে, নেশা আছে, নাই শুধু কোমলতা।

তবু যেন কিশোরী তাহার মনে খচ করিয়া উঠিল। কিশোরীকে দেখিয়া তাহার আয়ত চোখে অনুচ্চারিত ভাষা ইশারায় রূপ পাইয়াছে, আত্মনিবেদনের ছন্দের রেখাপুঞ্জে তাহার দেহ হইয়া উঠিত আনন্দময়, আজ যেন মিথ্যা হইয়া গিয়াছে সব।

কিন্তু কি করিবে মুক্তা, অর্থের পরশ তাহার মনের চারিদিকে রচিয়াছে এক জ্বালাময়ী শিখা; ইহাতে নিঃশেষে পুড়িয়া ছাই হইয়া গিয়াছে তাহার প্রেম, হৃদয়ের সজীব সৌকুমার্য। সত্যি সে নিরুপায়। তাহার এখন চাই শুধু অর্থ।

সুদূর প্রাচ্যে ইংরাজ-ফরাসী পত্তনের কাহিনী

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

এশিয়ার দক্ষিণ-পূর্ব খণ্ড, বিশেষত ব্রহ্ম-মালয় রত্নগর্ভা। বর্তমানকালে জাপান সেই দিকে ঝুঁকিয়া আচমকা সমগ্র ভূভাগ ও জলপথ দখল করিয়া অনেক প্রতিষ্ঠা-সম্পন্ন জাতিকে হীনবল করিয়া ফেলিয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রের অনেক মালমসলা মালয়, শ্যাম, জাভা-সুমাত্রা দ্বীপমালা হইতে আমদানী হইত। ইহার মধ্যে খনিজ পদার্থ আছে তা ছাড়া রবার ও কুইনাইন আছে। যুক্তরাষ্ট্রের সম্পদ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে পৃথিবীর এই অংশের সহিত জড়িত। প্রশান্ত মহাসাগরে জাপানের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে তাই যুক্তরাষ্ট্র নারাজ ছিল। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত মালের আমদানী অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য প্রচুর চেষ্টা করিয়াছিল। জাপানই আমেরিকার সব সলা-পরামর্শ ফাঁসাইয়া দিয়া বিদ্যুৎ বেগে প্রশান্ত মহাসাগরের এক মাথা হইতে আরেক মাথা পর্যন্ত রণতরী দিয়া ঘিরিয়া ফেলিল।

ভারত, বৃহত্তর ভারতের দ্বীপমালা এবং চীন—এই ভূখণ্ডের দিকে ইউরোপীয় জাতিদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়, প্রতি দেশের বাণিজ্য সম্ভার ও শিল্প কৌশলের খ্যাতিতে। এই সব দেশ হইতেই ইউরোপের নানা দেশের জীবনযাত্রার মালমসলা চালান যাইত। অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়া পর্যন্ত ইউরোপের নিজস্ব সম্পদ বলিতে কিছু ছিল না। ষোড়শ শতাব্দী হইতে অষ্টাদশ শতাব্দী এই দুইশত বৎসর নানা ইউরোপীয় জাতি সাত-সমুদ্র পার হইয়া বণিক, ধর্মযাজক প্রভৃতি নির্বিরোধী দলরূপে গোড়াপত্তন করে এবং ক্রমশ দেশ দখলে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। পরে Industrial Revolution বা শিল্প অভিযানের ফলে (যাহার মূলে এশিয়ার এই সব দেশের সম্পদ ও ধনদৌলত প্রচুর পরিমাণে ছিল) এশিয়ায় আধিপত্যের জন্য কাড়াকাড়ি কমিয়া গিয়াছিল। এই সব দেশের বাসিন্দাদের আত্ম-চেতনা খানিকটা বাহিরের লোলুপ দৃষ্টিকে সাবধান করিয়া দিয়াছিল। ইউরোপীয় জাতিরা নিজেদের মধ্যে কাড়াকাড়ির রফা করিয়া অধিকৃত স্বত্বটি কায়েমী করিয়াছে। একশত বৎসরে যে যতটা পারিয়াছে দেশ দোহন ও শোষণ করিয়াছে। এই শতাব্দীর প্রারম্ভে জাপানের বিস্ময়কর সফল অভিযানের ফলে মোড় ঘুরিয়া গিয়াছে। ইউরোপীয় জাতিরা প্রত্যেকেই তাহাদের অধিকৃত দেশের 'শৃঙ্খলা' রক্ষায় ব্যস্ত থাকায় দেশ-বিস্তারের সুবিধা হয় নাই।

জাভা-সুমাত্রা দ্বীপমালার সুগন্ধি ভেষজ, ভারতের ধনরত্নের ঐশ্বর্য ও বস্ত্রাদির সম্ভার এবং চীনের রেশম সর্বপ্রথম পর্তুগীজ নাবিকদের ঘরছাড়া করে। তাহারা জাহাজ ভাসাইয়া ঠিক জায়গায়ই নোঙর ফেলিয়াছিল। এখনও ভারতে পর্তুগীজদের পত্তনের চিহ্ন বর্তমান। স্পেনের নাবিকেরা ভুলপথে গিয়া আমেরিকায় উঠিয়াছিল। তাহাদের অভিযানের ফলে মেক্সিকো ও দক্ষিণ আমেরিকার বহু দেশে স্প্যানিশ্ সংস্কৃতির ছাপ এখনও বর্তমান। ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ এককালে স্পেনের অধীনে ছিল। পর্তুগীজেরা ভারতে পত্তন বসাইয়া পূর্ব-দক্ষিণের দ্বীপমালায়ও আসর বসাইয়াছিল। প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জে পর্তুগীজ ও স্পেনিশদের মধ্যে প্রতিযোগিতার সূত্রপাত হয়। কিন্তু স্পেনের লোকেরা ধর্মপ্রাণ ছিল বলিয়া বাণিজ্যের লেনদেনের চেয়ে ধর্মপ্রচারকের অবাধ গতিটাই তাহাদের অভিযানে বড় জিনিষ ছিল। পর্তুগীজদের সেইজন্য বাণিজ্যের আধিপত্য লাভ করিতে বিশেষ বেগ পাইতে হয় নাই। কিন্তু ক্রমশ ইংরেজ ও ডাচ বণিকেরাও এই দিকে জাহাজ নিয়া আসিলেন। ইহাদের হাতে পর্তুগীজ বণিকেরা হটিয়া গেলেন। তাহারা পরে আসিয়া পর্তুগীজদের যে সব দোষে লোক অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল, সেই সব এড়াইয়া ব্যবসার ভিত্তি পাকা করিয়া ফেলিল, কালের গতিতে বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ডে পরিণত হইল। ইংরেজরা ভারতেই প্রথমে মনোযোগ দিয়াছিল। সেইখানে কায়েমী হইয়া ডাচদের জাভা-সুমাত্রায় অনেক স্বাধীনতা দিয়া দিল। ডাচরা সেই সুযোগে এক সম্পদশালী রাজ্যের অধিকারী হইয়া গেল। ফরাসী-ইংরেজের হানাহানি ভারত-ব্রহ্ম-চীন এই বিস্তীর্ণ ভূভাগে ঘটিয়াছে এবং শেষ পর্যন্ত বোধ হয়, অন্তর্দাহে পরিসমাপ্তি পাইয়াছে। সেই দাহন নানারূপে পরবর্তীকালে প্রকাশ পাইয়াছে।

ভারতভূমির সংলগ্ন যে ভূভাগ প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে যাইয়া শেষ হইয়াছে, তাহার উপর কর্তৃত্ব না থাকিলে ভারতের নিরাপত্তা সম্পূর্ণ করা অসম্ভব। দ্বিতীয়ত ব্রহ্ম-মালয়-চীনের ঐশ্বর্যও ইংরেজ বণিককে প্রেরণা দিয়াছিল এই দিকে বৃটিশ সিংহের থাবা বাড়াইতে। এই দেশের অধিকার লইয়া ফরাসীর সহিত ইংরেজকে মুখোমুখি হইতে হইয়াছে। ১৬১১ সালে ফরাসী জাহাজ প্রথম পূর্বদিকের দেশের খোঁজে আসে। ফরাসী ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি গঠিত হয় ১৬০৪ সালে। জাহাজ তখন আসিত আফ্রিকা ঘুরিয়া। এই রাস্তা ছোট করিবার জন্যই সুয়েজ খাল কাটার কাজে উদ্যোগী ছিল ফরাসীরা। ফরাসী ইঞ্জিনিয়ারের তত্ত্বাবধানে ১৮৬৯ সালে প্রথম সুয়েজ খাল দিয়া জাহাজ আসে। ১৮৭৯ সালে ইংরেজের প্রধান মন্ত্রী ডিজরেলী ইজিপ্টের রাজা খেদিভের অসচ্ছল অবস্থার সুযোগ নিয়া সুয়েজ খাল কোম্পানির শতকরা ৪৪ ভাগ শেয়ার ইংরেজ গভর্নমেণ্টের নামে কিনিয়া লন। এই সূত্রে বর্তমানে খালের কর্তৃত্ব ইংরেজের হাতে। শাসনেও ফরাসীর ক্ষমতা লোপ পাইয়া ইংরেজের কবলেই সব ছিল। এখন শাসনরজ্জু খানিকটা শ্লথ হইয়াছে। আশ্চর্যের বিষয় ফরাসী দেশের কোম্পানি হইলেও ফরাসী গভর্নমেণ্টের বণিক মনোবৃত্তি ছিল না বলিয়াই গভর্নমেণ্টের তরফ হইতে কোন শেয়ার সুয়েজ খাল কোম্পানিতে ছিল না। ইংরেজ গভর্নমেণ্ট এই খালের দৌলতে রাষ্ট্রের তহবিলে প্রচুর টাকা সংগ্রহ করিয়াছেন।

আফ্রিকা ঘুরিয়া আসিবার সময় মাদাগাস্কার দ্বীপে ১৬৩১ সাল হইতে ফরাসী নাবিকদের এক আড্ডা ছিল। দুর্ধর্ষ ফরাসী নাবিকেরা এই সুযোগে পূর্বদিকে বহুদূর পর্যন্ত জাহাজ ভাসাইয়া চলিয়া আসিয়াছিল। বণিককুলের সঙ্গে সঙ্গে ফরাসী ধর্মপ্রচারকের দল আলোকবর্তিকা সাজাইয়া ১৬৬৩ সালের মধ্যেই ব্রহ্মের সমুদ্র তীর শ্যাম ও কাম্বোডিয়ায় (পরে ইন্দোচীনের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে) ঘুরিয়া গিয়াছে। ব্রহ্মের নিম্ন প্রান্তে টেনাসেরিম শহরের পাশ দিয়া মালয় উপদ্বীপের ভিতর দিয়া তাহারা শ্যামের পথে অগ্রসর হইয়াছিল। ইতিমধ্যে ইংরেজের ভারতে আধিপত্য বিস্তার লাভ করিতেছিল। ফরাসীরা অবস্থা প্রতিকূল দেখিয়া ভারতের আড্ডা গুটাইয়া রেঙ্গুনের নিকটবর্তী তীরে এক বন্দর গড়িবার কথা লিখিয়া পাঠাইয়াছিল। ১৬৯০ সালে ফরাসীদের ছয়খানি জাহাজের এক অভিযান বঙ্গোপসাগরে আসিয়াছিল উদ্দেশ্যে ছিল ব্রহ্ম ও শ্যামের সঙ্গে বাণিজ্য সম্বন্ধ স্থাপন। ফরাসীরাই অগ্রগামী হইয়া এই দুই দেশে আসিয়াছিল

সপ্তদশ শতাব্দীতে যদিও ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতে কায়েমী হইয়া উঠিতেছিল, তাহারা ব্রহ্ম-শ্যামে ফরাসীর আধিপত্য ক্ষুন্ন করিতে পারে নাই। দক্ষিণ ভারতে ফরাসীদের একেবারে হটাইয়া দিয়া (১৭৪৬—১৭৬১) ভারতে একচ্ছত্র অধিকারী হইয়া ইংরেজ ভারতের পূর্বদিকের দেশগুলির দিকে নজর দিতে শুরু করে। ইংরেজ কোম্পানীর পিছনে রাজমন্ত্রণা-সভার আনুকূল্য ছিল, কিন্তু ফরাসীদের ভাগ্যে পঞ্চদশ লুই নিজের মত্ততায় মগ্ন ছিলেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফরাসী অধিনায়ক ডুপ্লে ইংরেজদের সঙ্গে হানাহানি বাঁচাইবার জন্যই বোধ হয় ব্রহ্মের দিকে ঝোঁকেন। নূতন অভিযানের ভিত্তি গড়িবার জন্য ব্রহ্মের উপকূলে ঘাঁটি করিবার সুপারিশ লুইয়ের সভায় পাঠান। জাহাজ তৈরীর জন্য ভাল সেগুন কাঠ পাওয়া যাইবে এই আকর্ষণই প্রধানভাবে দেখান হইয়াছিল এবং এই সূত্রে ব্রহ্ম ও শ্যামের সঙ্গে সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠও হইবে তাহাও ভরসা ছিল। ব্রহ্মের উত্তর ও দক্ষিণভাগ তখন নিজেরাই কাটাকাটি করিতেছিল। সেই অন্তর্বিরোধের সুযোগ লইয়া ডুপ্লে দেশের ভিতরে ঢুকিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু ইংরেজও গোলযোগের সংবাদ জানিত এবং তাহারাও সুযোগ ব্যবহার করিবার জন্য ১৭৫৫ সালে এক পক্ষের মিত্র হইয়া যোগ দেয়। আলাঙপায়া বংশ ইংরেজের সহায়তায় টালাইঙগ বংশের সৈন্যদের অন্তরালে ফরাসীদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে। ফলে ফরাসীদের প্রথম চাল ফাঁসিয়া গেল এবং ইংরেজ ভবিষ্যতে দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থায় নিজেকে মিশাইয়া রাখিবার পথ সুগম করিয়া নিল। কিন্তু ফরাসীরা হারিয়া গেলেও ব্রহ্মের সমীপবর্তী ইংরেজের আড্ডায় নেগ্রেস দ্বীপের অধিবাসীদের ক্ষেপাইয়া ইংরেজদের ব্রহ্মে ঢুকিবার সিঁড়ি ভাঙিয়া দিল। ইংরেজ তখন তাহাদের অভিপ্রায় ঢাকা রাখিয়া আশে পাশে নানা দলে নানা পথে লোক ঢুকাইয়া দিল। অভিযানকারীরা সজাগ ছিলেন ফরাসীদের সঙ্গে দেশীয় লোকদের মিলনের মাপটা ঠিক করিবার জন্য। ব্রহ্ম, শ্যামে ও কোচিন চীনে ১৭৯৫ সাল হইতে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত অনধিক পঞ্চাশ বৎসরে ১১ দল লোক ইংরেজের স্বার্থে অপরিচিত জায়গায় ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে।

পর্যটক মারফৎ ইউরোপে চীন দেশের সুখ্যাতি বহু পূর্বেই ঘোষিত ছিল। কিন্তু চীনের বন্দরে পৌঁছিতে মালয় উপদ্বীপ ঘুরিয়া যাইতে হইত, সেই জন্যই মালয় উপদ্বীপের মাথা ও ব্রহ্মের লেজের কাছাকাছি স্থলপথের একটা খোঁজ সকলেরই কাজের মধ্যে ছিল। ফরাসীরা হাঁটিয়া পথের একটা কিনারা ঠিক করিয়াছিল; কিন্তু বাণিজ্যের জন্য একটা সুগম পথ বাহির করা প্রয়োজন। বিশেষ করিয়া কোন নদী বা খালের সহিত ভারত মহাসাগরের সংযোগ করিতে পারিলে বাণিজ্যপোতের সরাসরি চীনে পৌঁছিবার সুবিধা হইবে। চীনের বড় নদী ইয়াংসি ব্রহ্মের উপর দিয়া হাঁটা পথে বঙ্গোপসাগরের তীর হইতে ৬০০ মাইলের মধ্যে। জলপথের দূরত্বে চীনের সাংহাই শহর কলিকাতা হইতে ভারত মহাসাগরের মধ্য দিয়া ৪৩০০ মাইলের পথ। ইয়াংসির সঙ্গে যোগসাধন সম্ভব এই রকম কোন নদীর খোঁজ বণিকদের ব্যস্ত করিয়া তুলিল। সেই জন্য ব্রহ্ম-ইন্দোচীন সীমান্তে অনেক অভিযানকারী বাহির হইলেন। ইংরেজেরা সেই সময়ই আসামের মধ্য দিয়া রাস্তা বাহির করিবার খুব চেষ্টা করিয়াছিল। ১৮৭৩ সালে প্রকাশিত ১০ খণ্ড পুস্তকে এই সম্পর্কে আসাম-ব্রহ্ম-চীন সীমানার বহু তথ্য দেওয়া আছে। এই সীমানায় বহু পাহাড় জঙ্গল দুর্গম বলিয়া বর্তমান যুদ্ধের হিড়িকে ব্রহ্মের মধ্যপূর্ব অঞ্চলে লাসিও শহরের মধ্য দিয়া চীনে মাল পাঠাইবার রাস্তা হইয়াছিল। এই রাস্তার উত্তরে তিনটি দক্ষিণগামী নদী-ইয়াংসি মেকং (ইন্দোচীনে) ও সালুইন (ব্রহ্মে)—৪৮ মাইলের মধ্যে পাশাপাশি বহিয়া আসিতেছে, ইহাদের মাঝে যে পাহাড় আছে, তাহার সর্বোচ্চ শৃঙ্গ ৮০০০ ফুট—১৷৷ মাইলের কিছু বেশী। এই তিন নদী স্রোতের মিলন কোন কৃত্রিম উপায়ে সম্ভব কিনা সেই খোঁজে প্রথম ফরাসীরাই অগ্রণী হয়।

১৮৫৮ সালে ফরাসীরা বর্তমান ইন্দোচীনের রাজধানী সাইগন দখল করে। ১৮৬২ সালে এক সন্ধির সর্তানুযায়ী আনামের রাজদরবার সাইগনের চতুষ্পার্শ্বস্থ দেশ কোচীন চীন ছাড়িয়া দেয়। পাঁচ বৎসরের মধ্যেই কাম্বোডিয়াতেও ফরাসীরা প্রভুত্ব শুরু করে। ফ্রান্সিস গারনিয়ার আনামের সঙ্গে চুক্তির ফলে দেশীয় ব্যাপারের পরিদর্শক (Inspector of Native affairs) নিযুক্ত হন। মেকং নদীর উপর যাতায়াতের যে বাধা ছিল বিদেশীদের পক্ষে সেই বাধা ফরাসীদের মাথা হইতে উঠিয়া গেল। দেশের লোকদের দৃষ্টির অন্তরালে পূর্ব এশিয়ার ভিতর যাতায়াতের জন্য স্থলপথ আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে গারনিয়ার সাহেব এক অভিযান বাহির করিয়া দেন। ইউরোপের পরস্বলোলুপ জাতিদের পক্ষ হইতে এই প্রথম সঙ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টা। ইহার আগে ১৬৪১ সালে ডাচ বণিক জেরাড ফ্যান ভুস্টফ মেকংয়ের তীরবর্তী শ্যাম-ইন্দোচীনের যুক্ত সীমানা পর্যন্ত পৌঁছিয়াছিলেন। গারনিয়ার এই সীমানা পার হইয়া ব্রহ্ম-শ্যাম-ইন্দোচীনের সীমানার সংযোগস্থলে পৌঁছিয়াছিলেন। ইংরেজ বণিকের কাপড়ের দোকান তখন তাহারা দেশের অত ভিতরে দেখিয়াছিলেন। মেকংয়ের বাম তীরের লোকেরা শ্যামের কর্তৃত্ব মানিত, কিন্তু নদীর প্রধান ঘাটিগুলিতে ব্রহ্মের রাজদরবারের আড়কাঠি ছিল। ১৮৬৭ সালের মাঝামাঝি গারনিয়ারের দলের দালাগুরি ব্রহ্মের সীমার অন্তর্ভুক্ত কেংটুং শহরে গিয়া উঠেন। এই খবর ব্রহ্মবাসী ইংরেজদের কানে যায়। তাহারা তখন সবেমাত্র নীচের দিকেই ঘোরাফেরা করিতেছেন এবং ব্রহ্মের উপরে যাইবার আশা সজাগ রাখিয়াছিলেন। ফরাসীদের উত্তর-পূর্ব প্রান্তে প্রবেশদ্বারের খবর স্বভাবতঃই তাহাদের মনে সন্দেহের দোলা দিল। গারনিয়ার আরও উপরে গিয়া চীনের সীমান্তে পৌঁছিয়াছিলেন এবং ইউনান প্রদেশ অতিক্রম করিয়া এক মুসলমান রাজ্যে চলিয়া গিয়াছিলেন। সেখান হইতে বিদেশী বলিয়া তাড়া খাইয়া এবং মধ্যপথে দ্য লাগরির মৃত্যু হওয়ায়, চীনের উপর দিয়া হ্যাংকাউ চলিয়া আসেন। সেখান হইতে আমেরিকান জাহাজ 'প্লিমাথ রকে' করিয়া সাংহাই পৌঁছেন। মেকং নদীর উৎপত্তি-স্রোতের আরো কাছাকাছি গিয়াছিলেন ম্যাকলাউড নামে ইংরেজ জাহাজের কাপ্তেন। গারনিয়ারের অভিযানের ৩০ বৎসর আগে হাতী চড়িয়া মোলমীন হইতে তিনি মেকংয়ের তীরে কিয়াং হুং শহরে যান এবং সেখান হইতে সালুইনের তীর ধরিয়া চীনের প্রান্তে প্রবেশ করিয়াছিলেন।

গারনিয়ারের ভ্রমণকাহিনী ক্রমশ ছড়াইয়া পড়িল। গারনিয়ার যে ভামোতে পৌঁছিবার সন্ধান পাইয়া যাইবেন এবং তাহার ফলে ইরাবতীর স্রোতপথের সহিত যোগসূত্রে ব্রহ্ম-চীনের বাণিজ্য পথের উপায় সুগম করিয়া লইবেন, তাহা বুঝিয়া ইংরেজরা আতঙ্কিত হইয়া উঠিল। ভীত হইয়া ব্রহ্মের রাজদরবারে চালবাজী করিয়া ব্রহ্মদেশের অধিকারে ইংরেজরা কায়েমী হইয়া নিল। মেজর জেনারেল এ্যালবার্ট ফিচ বৃটিশ চীফ কমিশনার ছিলেন। তিনিই রাজা মিনডনের সঙ্গে চুক্তি করিয়া ব্রহ্মের স্বাধীনতা খর্ব করিয়া রাখিলেন। বাণিজ্যের শুল্ক আদায়ের কাছারীতে খবরদারী করিবার জন্য ইংরেজ লোক বসাইল এবং ব্রহ্মের উপর দিয়া চীনদেশে বাণিজ্যপথে ব্রহ্মের কর্তৃত্ব দখল করিয়া লইল। ১৮৭৯ সালে এই সব ঘটিয়া গেল। মান্দালয়ে ব্রহ্মের দরবারে ইংরেজ প্রতিনিধি পাকা আসন লইলেন। ইরাবতীতে ইংরেজের

জাহাজ চলাচল শুরু করিয়া দিল। ভামো শহর চীনদেশের প্রান্ত হইতে মাত্র ৮০ মাইল পথের শেষে। সেইখানে চীনের সীমান্ত দৃষ্টির অধীনে রাখিবার জন্য ইংরেজ দূত হিসাবে ক্যাপ্টেন স্লোডারকে পাঠাইল। ইংরেজ তাহার জন্য মানোয়ারী জাহাজ রাখিবার সুপারিশ জানাইয়াছিল এবং সংগে সংগে এ ব্যর্থ চেষ্টা করিয়াছিল এই দূতকে ব্রহ্মের সংগে বহির্দেশের সম্পর্কে উপদেষ্টা হিসাবে আসীন করা। এই দূত ১৮৬৮ সালেই কার্যে ব্রতী হইয়াছিলেন।

ল্যাসিও হইতে চীনের প্রান্তে যাইবার রাস্তার মাঝামাঝি জায়গায় চীন দেশের তালি শহর। ভামো ল্যাসিওর উত্তরে। কিন্তু যেহেতু ল্যাসিও হইতে চীনের একটা রাস্তা ছিল সেইজন্য ভামো পর্যন্ত পক্ষ বিস্তার করিয়াও সুস্থির হইয়া ইংরেজ বসিতে পারিতেছিল না। ল্যাসিও হইতে তালির পথটা জানিয়া তাহার কর্তৃত্বের ব্যবস্থা করিবার জন্য ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে জেনারেল ফিচ ভারত সরকারকে রাজী করান এবং ব্রহ্মের দরবারের অনুমতি লইয়া এক দলকে যাত্রা করাইয়া দেন। গারনিয়ারের উদ্দেশ্যকে নিজেদের করায়ত্তে আনিবার জন্যই এই যাত্রা। কিন্তু চীনের প্রান্তদেশে বিদ্রোহ হইবার ফলে দল বেশী দূর আগাইতে পারে নাই। বিদ্রোহের ফলে ব্রহ্মে মাল আসিত না; কিন্তু মালয়ের পথে চীনে ফরাসীরা আস্তে আস্তে বাণিজ্যের সুব্যবস্থিত করিয়া ফেলিল।

ফরাসীদের বাণিজ্য বিস্তারে আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া ইংরেজ বণিকদের প্ররোচনায় লর্ড স্যালিসবারী ১৮৭৫ সালে আবার পথের সন্ধানে ভামো হইতে এক দল পাঠাইলেন। কিন্তু সেই দলের এক অগ্রগামী সংগী নিহত হন। ইহার ফলে দল আর অগ্রসর হইতে সাহসী হয় নাই। হত্যার সুযোগে তিনজন ইংরেজ প্রতিনিধি হ্যাংশে হইতে ইউনানের রাজদরবারে হত্যার জন্য ক্ষতিপূরণ দাবী করিবার অছিলায় আসিয়াছিলেন। তাঁহারা খোঁজ করিয়া পথ নিদর্শন অতিশয় দুঃসাধ্য কাজ এই অভিমত বিলাতে পাঠান। ইহার পর আর কোন অভিযান হয় নাই। বর্তমান যুদ্ধের হিড়িকে আবার ব্রহ্ম-চীনের সংযোগ স্থাপিত হইয়াছিল। প্রথম পথ শত্রু কর্তৃক অধিকৃত হওয়ায় ভারত চীনের মধ্যে যোগ স্থাপন করা হইয়াছে। তিব্বতের ভিতর দিয়া অতি দুর্গম পথে সামান্য চলাচল হইতেছে। বেশী কাজ আকাশমার্গেই হইতেছে।

ব্রহ্মেতে যখন ইংরেজ-প্রভুত্ব কায়েমী করিবার তোড়জোড় চলিতেছিল তখন ভারতের ইংরেজ কর্তারা পূর্বদিকের দেশগুলিকে গ্রাস করিবার জন্য কেন জানি উৎসাহ পান নাই। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে তখন আফগানিস্থানের ভিতর দিয়া রুশদের অভিযানের আশংকা প্রবল ছিল এবং সেই সীমান্ত রক্ষার ভার ভারত সরকারকে গুরুভাবে বহন করিতে হইয়াছে, কারণ ভারতের নিরাপত্তার জন্য ইহাই আশু প্রয়োজন ছিল। ১৮১৬-১৮১৮ সালের নেপাল যুদ্ধের সময় ভারত সরকার চীনের প্রতি লোলুপ দৃষ্টি ত্যাগ করেন। সংগে সংগে পার্বত্যপথ পরিক্রমা বন্ধ হইয়া গেল। লর্ড লরেন্স ও লর্ড মেয়ো দুই বড়লাট পূর্বদিকের বিস্তৃতির বিশেষ ঘোরতর আপত্তি তুলিয়া ইংরেজ বণিকদের পক্ষে চীনের পথ রুদ্ধ করিয়া দিলেন। পরে অবশ্য জলপথে ইংরেজ চীনের সমুদ্র তীরেও বাণিজ্য সম্পদে অনেক অধিকার অর্জন করিয়া নিয়াছিল।

ভারত সরকার ভারতে নির্ঝঞ্ঝাটে থাকিবার জন্যই পূর্বের সীমানায় খাল কাটিয়া কুমীর আনিতে বাধা দিয়া আসিয়াছেন, ইংরেজ বণিকেরা কিন্তু চীনে ফরাসীদের বাণিজ্য সাফল্য শুনিয়া ঈর্ষান্বিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। সেইজনাই ব্রহ্মের পার্শ্ববর্তী চীনের প্রান্তে তাড়াতাড়ি প্রবেশ করিয়া আসন পাতিবার উদ্দেশ্যে নানাভাবে বিলাতে মন্ত্রীসভাকে উদ্ব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। ১৮২৪-১৯০০ সালের পার্লামেন্টের রিপোর্টে অন্যূন কুড়িটি পার্বত্য পথ পরিক্রমার ও বাণিজ্য পথের বিষয়ে বিভিন্ন প্রস্তাব পাওয়া যায়। ব্রহ্ম-চীনের সংযোগ করিবার উদ্দেশ্যে রেলপথের কথাও সেই সময় উঠিয়াছিল। কলচুহন নামে ব্রহ্মের এক ইংরেজ ডেপুটি কমিশনার ও হ্যালেট নামে এক ইংরেজ ইঞ্জিনীয়ার এক লম্বা রেলপথের নক্সা করিয়াছিলেন। ১৮৮৭ সালে সেই রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহা ছাড়া সান রাজ্যে হাতী চড়িয়া হ্যালেট সাহেব দেশের এক বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। রেলপথ বঙ্গোপসাগরের তীর হইতে কুনমিং পর্যন্ত বিস্তৃত হইত, কিন্তু যে ভূমির উপর দিয়া পথ টানা হইয়াছিল তাহা নীচু, ম্যালেরিয়াকীর্ণ ও জনবিরল দেশের অংশ। যদিও সংক্ষিপ্ত পথের নির্দেশ এই নক্সায় ছিল, বর্তমান ব্রহ্মের রেলপথ বা হাঁটা পথ কোনটাই ঐ নক্সা অনুযায়ী করা হয় নাই।

চীনের ভিতরে প্রবেশ করিয়া ফরাসীরা ধীরগতিতে এবং স্থিরভাবে ব্রহ্মে আসন পাকা করিতেছিল। ফরাসীরা ব্রহ্মে রেলপথের বিষয় এক চুক্তি করিয়া নিয়াছিল। উপরন্তু ফরাসীদের কর্তৃত্বে ব্যবসায়ের লেনদেনের জন্য ব্যাংক খুলিবার কথাও এই চুক্তিতে ছিল। ব্রহ্মকে সশস্ত্র করিবার ভারও ফরাসীরা নিয়াছিল। এছাড়া ফরাসীরা ডাক বিভাগের ও ইরাবতীতে স্টীমার চলাচলের বন্দোবস্তও করিয়া লইয়াছিল। এই চুক্তির খবরে ইংরেজকে পূর্বসীমান্তে আবার ক্রীয়াশীল করিয়া তুলিল। ১৮৮৫ সালে ছলে ও ভীতি প্রদর্শন করিয়া ব্রহ্মকে ইংরেজ ভারত সরকারের কুক্ষিগত করিয়া নিল। সংগে সংগে চীনের সীমান্তে ফরাসীর উপনিবেশ সব ছন্নছাড়া করিয়া দিল এবং ইংরেজ রাজা থিবর উত্তরাধিকারী হিসাবে অনেক ফরাসী ঘাঁটি দখল করিয়া নিল। ফরাসীকে সন্তুষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে ইংরেজ নিজেদের অধিকৃত খানিকটা দেশের সংগে শ্যামের একফালি জমি জুড়িয়া ব্রহ্মের বাহিরে ফরাসীর এক রাজ্য গড়িবার সুযোগ করিয়া দিল। শ্যামকে যে দেশ দিয়া ইংরেজ ভুলাইয়াছিল তাহা পরে ফরাসীরা অধিকার করিয়া লইয়াছিল। ফরাসীরা ভারত হইতে হটিয়া গিয়া চীন-ব্রহ্মে পত্তন গড়িবার আশায় ছিল। তাহাতে ইংরেজ বাদ সাধিলেও ইংরেজের স্বার্থের খাতিরে ফরাসীরা ব্রহ্মের পূর্বে সীমান্তে ইন্দোচীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়া ফেলিল।

ব্রহ্ম-চীন প্রান্তে রেলপথ, খনি ইত্যাদি বাণিজ্য সম্পর্কিত ব্যাপারে ইংগ-ফরাসী বিরোধ এই শতাব্দীর গোড়াতেও মাঝে মাঝে জাগিয়া উঠিয়াছে। দুই জাতির পারস্পরিক ঈর্ষার ফলে কোন স্থলপথ শেষ পর্যন্ত দুই দেশের সংযোগ সাধনে নির্মিত হয় নাই। ব্রহ্মের উত্তর প্রান্তের উপর দিয়া চীন হইতে আসামের সীমান্ত পর্যন্ত এক পরিক্রমা হইয়াছিল ১৮৯৫ সালে। রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে ইংগ-চীনের ১৮৯৭ সালে চুক্তির ফলে ইউনানে রেলপথ নির্মাণের ক্ষমতা এবং তাহার সংগে ব্রহ্মের পথের সংযোগ সাধনের ব্যবস্থা হইয়াছিল। কিন্তু এই বিষয়ে ইংরেজ ভামো ও ল্যাসিও ছাড়াইয়া জরীপ কাজে হাত দেন নাই। ফরসীরাও ১৮৯৮ সালের চুক্তি অনুযায়ী চীনের ভিতরে কিছু পথ রেললাইন পাতিয়াছিল কিন্তু সেই লাইন আর বেশীদূর আগাইয়া দুই দেশের যোগসূত্র করিবার উৎসাহ পায় নাই। দুই দেশের ইংরেজ ও ফরাসী অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে শ্যামরাজ্যের অবস্থা সঙ্গীন হইয়া উঠে। ব্রহ্ম ও ইন্দোচীনের মাঝে নিষ্ক্রিয় রাজ্য (Buffer State) হিসাবে শ্যাম টিকিয়া যায় এবং তার স্বাধীনতা লইয়া টানাটানিও হয় না। কিন্তু তার অনেক জমি ফরাসীদের অধিকারে পূর্বেই চলিয়া গিয়াছিল। ইংরেজেরাও সুবিধা বুঝিয়া শ্যামের অক্ষম শাসনভার হইতে মালয় উপদ্বীপের অনেক অংশ নিজেদের শাসনে লইয়া আসে। ১৮১৯ সাল হইতে সিঙ্গাপুর ইংরেজের হাতে

(শেষাংশ ২৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

খেলাধূলা

বাঙলার হকি খেলা

বাঙলার হকি খেলার মরসুম আরম্ভ হয়েছে। প্রতি বৎসরের ন্যায় এই বৎসরেও মরসুমের সূচনা হইতে বহুসংখ্যক দল বেঙ্গল হকি এসোসিয়েশন পরিচালিত কলিকাতা হকি লীগ প্রতিযোগিতায় যোগদান করিয়াছে। বিশিষ্ট ক্লাবসমূহের পরিচালকগণও নিজ নিজ ক্লাবের সুনাম রক্ষা করিবার জন্য চেষ্টার কোনরূপ ত্রুটি করিতেছেন না। কলিকাতার গড়ের মাঠে বৈকালিক ভ্রমণে বাহির হইলে সকল মাঠেই হকি খেলার বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হইবে। সুতরাং বাঙলায় হকি খেলার জনপ্রিয়তা কোনরূপ হ্রাসপ্রাপ্ত হয় নাই, ইহা নিঃসন্দেহেই বলা চলে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, বাঙলার হকি খেলার স্ট্যাণ্ডার্ড গত দশ বৎসর হইতে উত্তরোত্তর উন্নতির পথে চালিত না হইয়া ক্রমশঃই নিম্নগামী হইতেছে। এই বৎসরের হকি খেলা সবে মাত্র আরম্ভ হইয়াছে, অতএব স্ট্যাণ্ডার্ড সম্পর্কে বর্তমানে কিছু বলা অন্যায় হইতেছে বলিয়া কেহ কেহ প্রতিবাদ করিতে পারেন। কিন্তু তাঁহাদের প্রতিবাদের প্রত্যুত্তরে আমরা দৃঢ়তার সহিতই বলিতে পারি যে, দশ বৎসর পূর্বে বাঙলার হকি খেলার যে স্ট্যাণ্ডার্ড ছিল, এই বৎসরের মরসুমের শেষে বাঙলার হকি খেলোয়াড়গণ শত চেষ্টা সত্ত্বেও সেই স্তরের নৈপুণ্য প্রদর্শন করিতে পারিবেন না। তাহার কারণ—কোন খেলায় স্ট্যাণ্ডার্ডের উন্নতি মাত্র কয়েক মাসের প্রচেষ্টায় হয় না; ইহার জন্য কয়েক বৎসরের আন্তরিক প্রচেষ্টার প্রয়োজন হয়। সেই প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য পরিচালকগণকে অনেক প্রকার ব্যবস্থা করিতে হয়। কেবল মাত্র খেলার ব্যবস্থা করিয়া অথবা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া কোন খেলার উন্নতি হয় না। উৎসাহী খেলোয়াড়গণকে একত্র করিয়া বিশিষ্ট হকি ক্রীড়াবিশারদের শিক্ষাধীনে রাখিতে হয়। ক্রীড়াশিক্ষক নিযুক্ত করিলেই কার্য শেষ হয় না। নিয়মিতভাবে খেলোয়াড়গণ যাহাতে সেই শিক্ষার ব্যবস্থা অনুসরণ করে, তাহার দিকেও দৃষ্টি রাখিতে হয়। যদি কোন খেলোয়াড় এই সকল ব্যবস্থার মধ্যে থাকিয়াও ক্রীড়া-কৌশলের উন্নতি করিতে না পারে, তবে না করিবার কারণ অনুসন্ধান করিবারও প্রয়োজন হয়। যদি এই অনুসন্ধান করা নিজেদের পক্ষে সম্ভব না হয়, তবে বাহিরের বিশিষ্ট ক্রীড়া-শিক্ষকের সাহায্যও গ্রহণ করিতে হয়। সম্ভব হইলে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়দের উন্নতি করিবার পথ অনুসন্ধান করিয়া সেই পথে নিজ নিজ দেশের উৎসাহী খেলোয়াড়দের অনুসরণ করিতে উৎসাহিত করিতে হয়। এমন কি, ঐ সকল খেলোয়াড়দের ক্রীড়া-কৌশলের ছায়াচিত্র সংগ্রহ করিয়া দেশের খেলোয়াড়দের সম্মুখে প্রদর্শন করিবার ব্যবস্থা করিতে হয়। ইহা ছাড়া আরও অনেক ব্যবস্থার কথা আমরা উল্লেখ করিতে পারি, কিন্তু আমাদের ন্যায় গরীব দেশের পক্ষে সেই সকল ব্যবস্থা করা সম্ভব নহে বলিয়া প্রকাশ করিলাম না। আমরা যে কয়েকটি ব্যবস্থা উল্লেখ করিয়াছি, তাহার মধ্যে যদি একটিও অনুসৃত হয়, তবে আমরা নিজেদের ধন্য মনে করিব। এই সকল ব্যবস্থা অনুসরণ করিবার পর বিভিন্ন দেশ উন্নতি করিয়াছে, ইহা অবলোকন করিয়াছি বলিয়াই প্রকাশে সাহসী হইলাম। এই সকল ব্যবস্থা আমাদের কল্পনাপ্রসূত নহে। বাঙলার হকি খেলোয়াড়গণ বাঙলার মাঠে, এমনকি ভারতের মাঠে সর্বশ্রেষ্ঠ নাম অর্জন করুক—ইহাই আমাদের আন্তরিক ইচ্ছা।

আন্তঃপ্রাদেশিক হকি খেলা

আন্তঃপ্রাদেশিক হকি প্রতিযোগিতায় বাঙলা দল প্রেরিত হইবে বলিয়া বেঙ্গল হকি এসোসিয়েশন প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন দেখিয়া আমরা খুবই আনন্দিত হইয়াছি। হকি খেলা যখন বাঙলায় অনুষ্ঠিত হইতেছে, তখন আন্তঃপ্রাদেশিক প্রতিযোগিতায় যোগদান না করা খুবই অন্যায় হইত। তাহা ছাড়া ভারতের প্রায় সকল প্রদেশের দলই যখন যোগদান করিতেছে, তখন বাঙলা প্রদেশের প্রতিযোগিতায় যোগদান করা খুবই ন্যায়সংগত হইবে। তবে আমাদের পরিচালকগণের প্রতি বিশেষ অনুরোধ, যেন তাঁহারা বাঙলার দল গঠন সময় কোন ব্যক্তি বিশেষের প্রতি কৃপাদৃষ্টি নিক্ষেপ না করেন। আন্তঃপ্রাদেশিক হকি প্রতিযোগিতা প্রবর্তনের পর হইতে মাত্র এক বৎসর বাঙলা বিজয়ীর সম্মান লাভ করিয়াছে। পুনর্বার সেই গৌরব যাহাতে লাভ করে, তাহার জন্য প্রচেষ্টা হওয়া উচিত। উৎসাহের অভাব যেখানে নাই, সেখানে গৌরব সুপ্রতিষ্ঠিত হইতেছে না, ইহা খুবই দুঃখের বিষয়।

সুদূর প্রাচ্যে ইংরেজ-ফরাসীর পত্তনের কাহিনী

(২৪ পৃষ্ঠার পর)

গড়িয়া উঠিল। ইতিমধ্যে সুয়েজ খাল কাটা হওয়াতে ভারতে জাহাজ আসিবার পথ সুগম হইল। এবং ১৮৬৯ সাল হইতে আমেরিকার উপর দিয়া রেলপথের সাহায্যে প্রশান্ত মহাসাগর পাড়ি দিয়া পূর্ব প্রান্তের বাজারে সওদা করিতে বণিকদের বেশ সুবিধা হইল। পথ আরো সংক্ষিপ্ত করিবার জন্য ব্রহ্মের লেজের নীচে ক্রা খাল কাটিবার সব জরীপ ফরাসীদের ব্যবস্থায় ১৮৮২ সালে সমাপ্ত হইয়াছিল। ১৮৮৩ সালে সুয়েজ খালের ফরাসী ইঞ্জিনীয়ার ফার্ডিনাণ্ড দ্য লেসেপ্স্ শ্যামের রাজদরবারে নক্সা লইয়া হাজির হইয়াছিলেন।

১৯১০ সালের পর আর রাজ্য বিস্তারের চেষ্টা হয় নাই। লর্ড কার্জন ইংরেজ সাম্রাজ্যের ভিত্তি পাকা করিয়া গাঁথিয়া ফেলেন। ফরাসীদের কয়লা বোঝাই করিবার বন্দর মস্কটে কূটনীতির বলে কার্জন ফরাসীদের পত্তনী উঠাইয়া দিলেন। শ্যামের রাজার সঙ্গে লেখালেখি করিয়া তাহার আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থায় এই রকম কর্তৃত্ব জোগাড় করিলেন যে, পূর্বপ্রান্তে প্রহরী হিসাবে শ্যামের রাজা ইংরেজ সাম্রাজ্যের প্রান্তরক্ষক বলিয়া পরিগণিত হইল। কার্জনের আরো স্বপ্ন ছিল। ক্যালে হইতে (ইংলণ্ড হইতে ইউরোপে আসিবার প্রথম বন্দর) সাংহাই পর্যন্ত ভারতের উপর দিয়া রেলপথ নির্মাণ করিবার জন্য মেজর ডেভিস ইউনানে পরিদর্শন করিতে গিয়াছিলেন। ইউরোপের ভিতর দিয়া রেলপথকে ভারতে যোগ করিয়া সেই লাইনকে চীনে লইয়া যাইবার মতলব ছিল।

চীনে বাণিজ্যের সুবিধার জন্য সালুইন-ইরাবতী-মেকং নদীর যোগে পথ বাহির করা লইয়াই ইংরেজ-ফরাসীর বিবাদের সূত্রপাত হয়। ইন্দোচীনের ভিতর দিয়াও চীনে যাওয়া যায় কিনা তাহা ঠিক করিবার জন্যও কম চেষ্টা হয় নাই। ১০০ বছরের নানা প্রচেষ্টা ও রাজনৈতিক বিরোধের ভিতর দিয়া এই চেষ্টা দুরাশায় পর্যবসিত হইয়া গেল। ব্রহ্ম হইতে ইংরেজ তাহার অধিকৃত রাজ্য রক্ষার জন্য প্রান্ত আঁকড়াইয়া ধরিল আর ফরাসীরা ভবিষ্যতে পত্তনের সুবিধা হইবে ভাবিয়া কিছু দেশ গলাধঃকরণ করিয়া রহিল। ফরাসীর পত্তনের ব্যবস্থা ও অবস্থার শিথিলতা কিছুদিন আগেও লেবাননের দৃষ্টান্তেই পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল।

সাপ্তাহিক সংবাদ

১লা ফেব্রুয়ারী

মস্কো বেতারে বলা হয়, সোভিয়েট নেতা মঃ মলোটভ অদ্য সুপ্রীম সোভিয়েটে (নিখিল সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র পার্লামেণ্ট) প্রস্তাব করেন যে, সোভিয়েট ইউনিয়নের অন্তর্গত সাধারণ-তন্ত্রসমূহ বৈদেশিক রাষ্ট্রগুলির সহিত স্বাধীন-ভাবে সম্পর্ক স্থাপন করিতে পারিবে। তিনি আরও বলেন যে, প্রত্যেক সোভিয়েট সাধারণ-তন্ত্রের স্বতন্ত্র সৈন্যদল থাকিবে। আলোচনার পর সুপ্রীম সোভিয়েটের উভয় পরিষদই মঃ মলোটভের প্রস্তাব গ্রহণ করেন।

মার্কিন সৈন্যেরা মার্শাল দ্বীপপুঞ্জে অবতরণ করিয়াছে।

এস্তোনিয়া সীমান্তের অদূরবর্তী শেষ রুশ বড় শহর কিংইসেপ রুশ সৈন্যগণ কর্তৃক অধিকৃত হইয়াছে।

বোম্বাই সরকারের এক ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, শ্রীযুক্তা কস্তুরবাঈ গান্ধী গতকল্য ভীষণভাবে হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হন। তিনি অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়িয়াছেন।

"হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড" পত্রিকার সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ গুপ্ত গত ২৩শে জানুয়ারী তারিখে পরলোক গমন করিয়াছেন।

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের বাজেট অধিবেশনের প্রথম দিনে বাঙলার ধান চাউলের দর সম্বন্ধে বিরোধী পক্ষের এক মুলতুবী প্রস্তাবের আলোচনা হয়। বিরোধী পক্ষের বিভিন্ন বক্তা বলেন যে, এবার ধান কাটার সময়ের প্রথম দিকে ধান, চাউলের দর কমের দিকে ছিল; কিন্তু গভর্নমেণ্ট তাঁহাদের চীফ এজেণ্টরূপে কলিকাতার কয়েকটি বড় ব্যবসায়ীকে নিয়োগ করিয়া তাঁহাদের মারফৎ আমন ধান্য সংগ্রহের পরিকল্পনা ঘোষণা করায় এবং চীফ এজেণ্ট-গণের অধীন সাব-এজেণ্টগণ বাজারে ধান চাউল কিনিতে আরম্ভ করায় ধান চাউলের দর বৃদ্ধি পাইতে থাকে। খাদ্য সরবরাহ বিভাগের মন্ত্রী মিঃ সুরাবর্দী ধান চাউলের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ার কথা দৃঢ়তার সহিত অস্বীকার করেন। প্রস্তাবটি শেষ পর্যন্ত আলোচনামাত্রে পর্যবসিত হয়।

ফরিদপুরের জেলা ও দায়রা জজ অদ্য ভাঙ্গা দারোগা হত্যা মামলার রায় দিয়াছেন। অধিকাংশ জুরীই হত্যা ও দাঙ্গা-হাঙ্গামার অভিযোগ সম্পর্কে ২৮ জন আসামীকেই নির্দোষ সাব্যস্ত করেন। তবে জজ দাঙ্গা-হাঙ্গামার অভিযোগ সম্পর্কে অধিকাংশ জুরীর সিদ্ধান্তের সহিত একমত হইতে না পারিয়া উহা হাইকোর্টে প্রেরণ করেন।

২রা ফেব্রুয়ারী

ইতালীতে মিত্রবাহিনী ক্যাসিনোর উত্তরে প্রস্তুত ব্যূহ ভেদ করিয়াছে।

সোভিয়েট ইস্তাহারে এস্তোনিয়ান সীমান্ত হইতে এক মাইল দূরবর্তী ওরুলা দখলের সংবাদ ঘোষণা করা হইয়াছে।

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে গভর্নমেণ্ট পক্ষ হইতে বঙ্গীয় বিক্রয়-কর সংশোধন বিল (১৯৪৪) আলোচনার্থ উত্থাপিত করা হয়। বর্তমানে বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে গভর্নমেণ্ট পক্ষ হইতে বঙ্গীয় বিক্রয়-কর সংশোধন বিল (১৯৪৪) আলোচনার্থ উত্থাপিত হয়। বর্তমানে যে হারে বিক্রয়-কর ধার্য আছে, বিলে তাহা দ্বিগুণ করিয়া টাকা প্রতি এক পয়সা হইতে বাড়াইয়া দুই পয়সা হারে বিক্রয়-কর ধার্যের ব্যবস্থা আছে। বিরোধী দলের পক্ষ হইতে বিলের তীব্র সমালোচনা করা হয় এবং বিলটি জনমত সংগ্রহার্থ প্রচার করার জন্য অনুরোধ করিয়া কয়েকটি সংশোধন প্রস্তাব উত্থাপিত হয়।

৩রা ফেব্রুয়ারী

মার্শাল দ্বীপপুঞ্জে মার্কিন বাহিনী রয় দ্বীপ অধিকার করিয়াছে। রয় দ্বীপ মার্শাল দ্বীপপুঞ্জের সর্বশ্রেষ্ঠ বিমান ঘাঁটি ছিল। নামুর ও কোয়াজালিন দ্বীপে আরও সৈন্য অবতরণ করিয়াছে।

অদ্য শেষ রাত্রিতে প্রতিপক্ষের একখানি বিমান উড়িষ্যার উপকূলে উপস্থিত হয় এবং সামান্য কয়েকটি বোমাবর্ষণ করে। কোনরূপ ক্ষতি হয় নাই, কেহ হতাহত হয় নাই।

বঙ্গীয় বিক্রয়-কর সংশোধন বিলটি জনমত সংগ্রহার্থ প্রচারের জন্য বিরোধী দলের পক্ষ হইতে যে সংশোধন প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়াছিল, অদ্য বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশনে তাহা ৬৩—৯০ ভোটে অগ্রাহ্য হয়।

৪ঠা ফেব্রুয়ারী

অদ্য রাত্রে একখানি শত্রু-বিমান ভিজাগাপট্টম এলাকায় বোমাবর্ষণ করে। কেহ হতাহত হয় নাই এবং ধন সম্পত্তির কোন ক্ষতি হয় নাই।

মার্কিন বাহিনী মার্শাল দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত নামুর দখল করিয়াছে।

লালফৌজ কর্তৃক এস্তোনিয়ার চারিটি শহর দখলের সংবাদ মস্কোতে সরকারীভাবে ঘোষিত হইয়াছে।

পরিষদের কংগ্রেসী সদস্য ও বর্তমানে ভারত-রক্ষা বিধানের ২৬ ধারা অনুসারে ফরক্কাবাদ জেলে আটক সিকিউরিটি বন্দী শ্রীযুত বিশ্বম্ভরদয়াল ত্রিপাঠীর পক্ষ হইতে হেবিয়াস কর্পাস ধরণের একখানি আবেদন পেশ করা হইলে এলাহাবাদ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি মন্তব্য করেন, "আমার ধারণা এই যে, ভারতরক্ষা আইনের বিধানগুলি আমাদিগকে একেবারে পঙ্গু করিয়া ফেলিয়াছে—আমাদের কোনই ক্ষমতা নাই।"

৫ই ফেব্রুয়ারী

মার্শাল স্ট্যালিন তাঁহার অদ্যকার বিশেষ ইস্তাহারে সোভিয়েট বাহিনী কর্তৃক রভনো ও লুক্ অধিকারের সংবাদ ঘোষণা করিয়াছেন। মস্কোর সংবাদে প্রকাশ, কানিয়েভ্ অঞ্চলে অবরুদ্ধ এক লক্ষ ২০ হাজার জার্মান সৈন্যের উদ্ধারের আশা ক্রমশ বিলুপ্ত হইতেছে এবং তাহারা রুশ বেষ্টনীর বহির্ভাগস্থ ম্যানস্টাইনের নিকট বেতারযোগে মরিয়া হইয়া সাহায্য প্রার্থনা করিতেছে।

৬ই ফেব্রুয়ারী

মার্শাল দ্বীপপুঞ্জে মার্কিন বাহিনী কুয়াজালীন, এবেগে ও লয় দ্বীপ অধিকার করিয়াছে।

ইতালীতে আলাজিও অঞ্চলে প্রতিপক্ষের সম্ভাব্য পাল্টা আক্রমণের বিরুদ্ধে নিজেদের ঘাঁটি সুদৃঢ় করার কার্যে ব্যস্ত বৃটিশ ও মার্কিন সৈন্যদলকে ঘোরতর সংগ্রামে ব্যাপৃত থাকিতে হইয়াছে। ক্যাসিনোর রাস্তায় রাস্তায় ও উহার নিকটবর্তী অঞ্চলে ঘোরতর সংগ্রাম চলিতেছে এবং কেসেলরিং কর্তৃক নূতন নূতন সৈন্যদল নিযুক্ত হওয়ায় এই অঞ্চলে জার্মানদের প্রতিরোধ ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতেছে।

৭ই ফেব্রুয়ারী

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে বিক্রয়-কর সংশোধন বিল (১৯৪৪) ৯৭—৫৪ ভোটে গৃহীত হইয়াছে।

অদ্য কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের বাজেট অধিবেশন আরম্ভ হয়। এই দিন পরিষদে শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডুর উপর নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে সরকারের কাজের নিন্দা করিয়া শ্রীযুত অখিলচন্দ্র দত্ত একটি মুলতুবী প্রস্তাব আনয়ন করেন। প্রস্তাবটি ৪২—৪০ ভোটে অগ্রাহ্য হয়। মুসলিম লীগ, কংগ্রেস এবং জাতীয় দল প্রস্তাবটির পক্ষে ভোট দেন। পরিষদে সভাপতি অথবা বড়লাট পাঁচটি মুলতুবী প্রস্তাব না-মঞ্জুর করেন।

ডাঃ সুরেশচন্দ্র ব্যানার্জি এম-এল-এ পূর্ণ দণ্ডভোগান্তে মুক্তিলাভ করার সঙ্গে সঙ্গে পুনরায় ভারতরক্ষা বিধানবলে গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া কম্যাণ্ডের হেড্ কোয়ার্টার্স হইতে প্রচারিত মিত্রপক্ষের এক সামরিক ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, ৪ঠা ফেব্রুয়ারী আরাকান রণাঙ্গনে মিত্রবাহিনীর ক্রমবর্ধমান চাপের ফলে প্রত্যাশিত প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। এই সময় একদল জাপ সৈন্য মিত্রপক্ষের টহলদার সৈন্যদলের দৃষ্টি এড়াইয়া তউং বাজার দখল করে।

মার্কিন যুদ্ধজাহাজ হইতে খাস জাপানের উপর গোলাবর্ষণ করা হইয়াছে। প্রায় ২০ মিনিট ধরিয়া এই গোলাবর্ষণ করা হয়। গোলা-বর্ষণ করিয়া প্যারামুসিরো দ্বীপের দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত কুরাবু পয়েণ্টের পোতাশ্রয় এবং তীরস্থ বাড়িঘর ধ্বংস করা হইয়াছে। প্যারামুসিরো দ্বীপটি কিউরাইল দ্বীপপুঞ্জের উত্তর প্রান্তে অবস্থিত।

মস্কোতে সরকারীভাবে ঘোষিত হইয়াছে যে, লালফৌজ নীপার বাঁক এলাকায় নিকোপোলের উপকণ্ঠে পৌঁছিয়াছে। ঐ অঞ্চলে আরও পাঁচ ডিভিসন জার্মান সৈন্য পরিবেষ্টিত হইয়াছে। এস্তোনিয়ান সীমান্তের অব্যবহিত পশ্চিম দিক দিয়া যে নদী প্রবাহিত হইতেছে, রুশ বাহিনী সেই নদীর পূর্ব তীরে অবস্থিত নার্ভার পূর্ব উপকণ্ঠে প্রবেশ করিয়াছে।